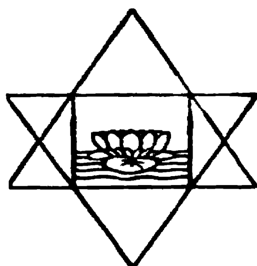


শ্রীঅরবিন্দ

দিব্য জীবন বার্ত্তা

[The Life Divine-এর বঙ্গানুবাদ

দ্বিতীয় খণ্ড

বিদ্যা এবং অবিদ্যা—আধ্যাত্মিক পরিণতি

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী—২

অনুবাদক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু

প্রথম সংস্করণ – অক্টোবর, ১৯৬২

পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস দ্বারা মুদ্রিত

361/59/500

অনুবাদকের নিবেদন

কি জন্য শ্রীঅরবিন্দের এই মহাগ্রন্থ, The Life Divine অনুবাদ করিবার অতি দুরূহ প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলাম তাহা দিব্য জীবন বার্ত্তার ১ম খণ্ডে অনুবাদকের নিবেদনে প্রকাশ করিয়াছি। এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিব না।

দিব্য জীবন বার্ত্তা দ্বিতীয় খণ্ডের সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য এই যে ইহার প্রথম খণ্ড প্রধানতঃ ছিল The Life Divine Book One-এর মর্ম্মানুবাদ এবং তাহার প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে মূল হইতে কিছু বাদ দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে আক্ষরিক অনুবাদ করিবার সেরূপ প্রয়াস পাই নাই। কিন্তু এ-খণ্ডে, The Life Divine Book Two-র অনুবাদে কোথাও মূলের কিছু বাদ দিই নাই এবং যতটা সম্ভব আক্ষরিক অনুবাদই করিতে চাহিয়াছি এবং তাহা করিতে গিয়া ভাষার সাবলীলতা যাহাতে নষ্ট না হয় সেদিকে আমার সাধ্যমত দৃষ্টি রাখিয়াছি। এ দুরূহ কার্য্যে কতটা সফলকাম হইয়াছি তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

পুস্তকে ব্যবহৃত পরিভাষা সম্বন্ধে এই বলিতে চাই যে ভাষা সহজবোধ্য করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণতঃ প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে সেরূপ শব্দ খুঁজিয়া পাই নাই তথায় প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত বা গঠিত অপর মনীষীগণের ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি যে শ্রীঅনির্ব্বাণকে অনুসরণ করিয়া 'subliminal' শব্দের অনুবাদে সর্ব্বত্র 'অধিচেতন' শব্দ, 'knowledge by identity'র অনুবাদে কোন কোন স্থানে 'তাদাত্ম্য জ্ঞান' এবং 'penultimate'-এর স্থানে 'উপধা' ব্যবহার করিয়াছি। তবে বই-এর মধ্যে যেখানে সাধারণভাবে প্রচলিত নাই এরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি সেইখানে—অন্ততপক্ষে যেখানে প্রথমে সেই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে- পাশে বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজী মূল শব্দটি দিয়াছি।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডের অনুবাদ কার্য্যে যে সমস্ত বন্ধু আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং যাঁহারা মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় নির্ব্বাহে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অবশেষে সানন্দ ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে জানাইতেছি যে আমার পরম সুহৃদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত এ খণ্ডের প্রথম কয়েকটি অধ্যায় এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ঋষভচাঁদ সামসুখা বাকী সকল অংশ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, আর সোদরপ্রতিম বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ দেখিয়া দিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধনীয়। ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু

দ্বিতীয় ভাগ

জ্ঞান

এবং

আধ্যাত্মিক ক্রমাভিব্যক্তি

২য় খণ্ড- দ্বিতীয় ভাগ

সূচী

পঞ্চদশ অধ্যায়

সমস্ত এবং পূর্ণ জ্ঞান

এই আত্মাকে সত্য এবং সম্যক্‌ বা পূর্ণজ্ঞান দ্বারা লাভ করিতে হইবে।

মুণ্ডকোপনিষদ ৩।১।৫

সমগ্রভাবে আমাকে কি করিয়া জানিবে তাহা শুন।...কেননা সাধকগণের মধ্যে যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে একজনও আমার সত্তার সকল সত্য জানেন কিনা সন্দেহ।

গীতা ৭।১, ৩

তাহা হইলে ইহাই অবিদ্যার কারণ ও প্রকৃতি এবং এই সমস্তই তাহার সীমা। জ্ঞানের সঙ্কোচ হইতেই তাহার উৎপত্তি, নিজেরই পূর্ণ এবং অখণ্ড সত্য হইতে নিজের জীব-সত্তাকে পৃথক করাই তাহার বিশিষ্ট প্রকৃতি; চেতনার এই বিবিক্ত ভাবের পুষ্টিই তাহার সীমার নির্দ্দেশ করে, কতদূর তাহার অধিকার তাহা নির্ণয় করিয়া দেয়; কেননা অবিদ্যাই আমাদের খাঁটি আত্মা ও জগতের খাঁটি আত্মা এবং বস্তুর সমগ্র প্রকৃতিকে আবৃত করিয়া প্রতিভাসের বহিশ্চর ক্ষেত্রে বাস কবিতে আমাদিগকে বাধ্য করে। অখণ্ড পূর্ণতার দিকে ফিরিয়া দাঁড়ান এবং অগ্রসর হওয়া, সীমার সঙ্কোচ দূব করা, ভেদ-জ্ঞানকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া, অবিদ্যার অধিকার ছাড়াইয়া যাওয়া, আমাদের অখণ্ড এবং স্বরূপ সত্যকে পুনরায় লাভ করা—এই সমস্তই জ্ঞানের অন্তরাভিমুখে আবর্ত্তিত হওয়ার চিহ্ন এবং লক্ষণ, যে লক্ষণ অবিদ্যার ঠিক বিপরীত। বিবিক্ত এবং সীমিত চেতনাকে সরাইয়া দিয়া তাহার স্থানে আত্মা এবং জগতের আদি ও সমগ্র সত্যের সহিত একীভূত স্বরূপগত অখণ্ড পূর্ণ চেতনাকে বসাইতে হইবে। অখণ্ড পূর্ণ সত্য বস্তুতে অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান নিত্যবিরাজিত; ইহা সত্য নহে যে এ জ্ঞান একটা নূতন বস্তু, বর্ত্তমানে যাহার অস্তিত্ব নাই এমন একটা বস্তু যাহাকে মন দ্বারা সৃষ্টি, অর্জ্জন, লাভ, উদ্ভাবন বা গঠন করিতে হইবে; বরং তাহাকে কেবল খুঁজিয়া বাহির বা আবিষ্কার করিতে হইবে অথবা আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার

সাক্ষাৎ পাইতে হইবে ; এ সত্য অধ্যাত্ম-সাধনায় আপনিই ফুটিয়া উঠে ; কেননা আমাদের বৃহত্তর এবং গভীরতর আত্মার মধ্যে আবৃত হইয়া ইহা বর্ত্তমান আছে ; আমাদের অধ্যাত্ম-চেতনার ইহাই মূল উপাদান ; আমাদের বহিশ্চর চেতনাও যখন এই পরাজ্ঞানের মধ্যে জাগরিত হইবে তখনই তাহাকে আমরা পূর্ণরূপে পাইব। এক অখণ্ড পূণ আত্মজ্ঞান আছে, যাহা আমাদিগকে ফিরিয়া পাইতে হইবে, এবং যেহেতু আমাদের আত্মাই জগতের আত্মা এই অখণ্ড আত্মজ্ঞানই অখণ্ড জগৎজ্ঞান। এমন জ্ঞান আছে যাহাকে অর্জন করিতে হয়, মন যাহাকে গড়িয়া তোলে, সে জ্ঞানের মূল্য এবং সার্থকতাও আছে ; কিন্তু এখানে অজ্ঞানের সঙ্গে যে জ্ঞানের কথা বলা হইল সে জ্ঞান এরূপ মনদ্বারা গঠিত জ্ঞান নয়।

অখণ্ড চিন্ময় চেতনায় সত্তার সকল বিভাবের জ্ঞানই বর্ত্তমান আছে, মধ্যগত সমস্ত বিভাবের মধ্য দিয়া সত্তার উচচতম ভূমির সহিত নিম্নতম ভূমির সংযোগ সাধন করিয়া ইহা একটি অখণ্ড অবিভাজ্য বস্তুরূপে প্রকাশ পায়। সত্তার উচচতম শৃঙ্গে ইহা সেই পরম সত্য বস্তুতে পৌঁছে, যাহা নিজের আত্ম-চেতনা ছাড়া অন্যত্র অতিচেতন বলিয়া অনির্ব্বাচ্য এবং অনির্দ্দেশ্য। অন্য-দিকে সত্তার নিম্নতম প্রান্তে, যথা হইতে আমাদের পরিণতির ধারা আরম্ভ হইয়াছে সেই নিশ্চেতনাকে ইহা অনুভব করে ; কিন্তু সেই সঙ্গেই সেই গভীর গহনে যে এক এবং সর্ব্ব স্বয়ংগূঢ় হইয়া অবস্থিত আছেন তাহাকেও দেখিতে পায় ; ইহা নিশ্চেতনার মধ্যস্থিত গোপন চেতনার আবরণ উন্মোচন করিয়া দেয়। সকল রহস্যের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনকারী, সর্ব্বপ্রকাশক, সত্তার দুই চরম কোটির মধ্যে বিচরণশীল এই চেতনার দিব্যদৃষ্টি আবিষ্কার করে বহুর মধ্যে একের প্রকাশ, বহু বিচিত্র সান্তের মধ্যে একই অনন্তের লীলা, শাশ্বত কালের মধ্যে কালাতীত শাশ্বত সত্তার নিত্যস্থিতি ; এই দৃষ্টিতে বিশ্বের পূর্ণ তাৎপর্য্য তাহার নিজের কাছে উদ্‌ভাসিত। এই চেতনা বিশ্বকে মুছিয়া ফেলে না, পরন্তু তাহাকে উপরে তুলিয়া নেয় এবং তাহার অন্তর্গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়া তাহাকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত করে ; এ চেতনা ব্যষ্টি ব্যক্তিকেও লোপ করে না, পরন্তু ব্যষ্টি সত্তা এবং তাহার প্রকৃতির খাঁটি তাৎপর্য্য তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া এবং দিব্য সত্যবস্তু ও দিব্য প্রকৃতির সহিত তাহাদের ভেদজ্ঞান দূর করিতে সমর্থ করিয়া তাহাদের অপরূপ দিব্য রূপান্তর সাধন করে।

পূর্ণ অখণ্ড এক জ্ঞান আছে বলিলেই ধরিয়া লইতে হয় যে সে জ্ঞানের

সদ্বস্তু এবং পূর্ণ জ্ঞান

অধিকারী এক সদ্বস্তু আছে, কেননা এ জ্ঞান ঋতচিতেরই শক্তি এবং ঋতচিৎ সেই সদ্বস্তুরই চেতনা। আমাদের চেতনা যে স্থিতিতে অবস্থিত এবং যেমন তাহার ক্রিয়া, যেমন তাহার দৃষ্টি, যেমন তাহার চেষ্টা ও শক্তি, যেমন তাহার গ্রহণ-সামর্থ্য, সদ্বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এবং অনুভব তদনুরূপেই ফুটিয়া উঠে; সে দৃষ্টি বা চেষ্টা প্রগাঢ়ভাবে কোন এক বিশেষভাবে নিবদ্ধ ও ব্যতিরেকী অথবা ব্যাপক এবং উদারভাবে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া সর্ব্বাবগাহী হইতে পারে। সাধনার পথে এক অনির্ব্বাচ্য এবং অনির্ণেয় পরম সদ্বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা, তাহাই একমাত্র সত্যবস্তু বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং আত্মভাবের সিদ্ধির জন্য ব্যষ্টিসত্তা এবং জগৎসত্তাকে সত্যের ধারণা এবং বোধ হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলা সম্পূর্ণ সম্ভব, তাহার নিজস্ব বিশেষ ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এক উচচ সাধনার ধারায় এ ভাবনারও একটা মূল্য বা প্রামাণিকতা আছে। পরম ব্রহ্মই ব্যষ্টিসত্তার এবং বিশ্বের স্বরূপ সত্য; কালের ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে আপাতপ্রতীয়মান ব্যষ্টিসত্তা একটা প্রতিভাস; বিশ্বও তেমনি কালের মধ্যে একটা বৃহত্তর এবং জটিলতর প্রতিভাস, জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই এই প্রতিভাসের অন্তর্গত; চরম বা নির্ব্বিশেষ অতিচেতনায় পোঁছিতে হইলে এ উভয়কে অতিক্রম করিতে হইবে; তথায় পৌঁছিলে অহংচেতনা এবং জগৎচেতনা বিলুপ্ত হইয়া যায়, কেবলমাত্র পরম তত্ত্ব বর্ত্তমান থাকে। কেননা সে পরম ব্রহ্ম কেবল নিজের একত্বের মধ্যেই অবস্থিত এবং অন্য সকল জ্ঞানের অতীত; সেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের কোন ধারণা থাকে না সুতরাং যেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ে আসিয়া একত্র হয় সেই জ্ঞানও থাকিতে পারে না, তাহাদের ধারণা লয় হয়; তাহারা অতিক্রান্ত এবং তাহাদের প্রামাণিকতা লুপ্ত হয়, সেই জন্য পরম ব্রহ্ম চিরকাল বাক্য এবং মনের অগোচর থাকিয়া যান। এই মতের বিরুদ্ধে অথবা ইহার পরিপূরকরূপে আমরা বলিয়াছি যে অবিদ্যা, দিব্য জ্ঞানের সীমিত বা সঙ্কুচিত না হয় সংবৃত বা আচ্ছাদিত ক্রিয়া বা বৃত্তি মাত্র—খণ্ডচেতনজীবে সঙ্কুচিত, এবং অচেতন বস্তুতে সংবৃত; এই অন্য দিক হইতে (অর্থাৎ যে কোটিতে শুধু ব্রহ্ম আছেন জীব জগৎ নাই, সেই দিক হইতে) বলিতে পারি যে জ্ঞান নিজেই শুধু একটা উচচতর অজ্ঞান; কেননা জ্ঞান চরম বস্তুর সান্নিধ্যে আসিয়াই থামিয়া গিয়াছে, ইহার পরপারস্থিত সে পরমবস্তু স্বয়ংবেদ্য (অর্থাৎ তাহা নিজে শুধু নিজেকে জানে) এবং মনের কাছে অজ্ঞেয়। অবশ্য এই নির্ব্বিশেষবাদ ভাবনার এবং অধ্যাত্ম চেতনার পরম

অনভূতির সত্যের একটা বড় দিক সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু ইহাকেই অধ্যাত্ম ভাবনার সর্ব্বগ্রাহী পূর্ণ এবং সমগ্রপ্রত্যয় বা সত্য বলিতে পারি না, অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রের পরম অনুভূতির সকল সম্ভাবনা ইহাতেই নিঃশেষ হইয়া যায় না।

সত্য, চেতনা এবং জ্ঞান সম্বন্ধে প্রচলিত নির্ব্বিশেষবাদ প্রাচীন বেদান্তের এক অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাহাই সমগ্র বেদান্ত নহে। উপনিষদে, প্রাচীনতম বেদান্তের প্রেরণালব্ধ শাস্ত্রে অনির্ব্বচনীয় জগদতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভতি-জাত ধারণা দেখিতে পাই, সেই সঙ্গে তাহার বিরোধী রূপে নয়, অনুসিদ্ধান্ত (corollary) রূপে পাই, বিশ্বপুরুষ বা বিশ্বাত্মার ও বিশ্বরূপে ব্রহ্ম-সম্ভূতির অনুভূতি জাত ধারণা। ঠিক তেমনিভাবে আমরা পাই ব্যষ্টিসত্তার মধ্যেও সেই দিব্য সত্য-বস্তুর স্বীকৃতি; ইহাও অনুভূতিজাত ধারণা, যাহা কেবলমাত্র প্রতীয়মান হইতেছে এরূপ প্রতিভাসরূপে নয়, কিন্তু সম্ভূতির বাস্তব সত্যরূপে দেখিতে পাই। নির্ব্বিশেষ পরম বস্তু ছাড়া আর কিছু নাই, নেতি-বাদের এই চরম একত্ববাদের স্থলে আমরা তথায় দেখিতে পাই অস্তিত্ব বা ইতি-ভাবের অতিব্যাপক মতবাদকে তাহার চরমে আনিয়া ফেলা হইয়াছে। বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত এই উভয়কে একসঙ্গে দৃষ্টিতে মিলাইয়া সদ্বস্তু ও জ্ঞানের এই যে ধারণা উপনিষদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা মূলতঃ আমাদের ধারণার সহিত মিলে, কেননা ইহাতে বুঝা যায় যে অজ্ঞান জ্ঞানেরই এক অর্দ্ধাবৃত অংশ এবং জগৎজ্ঞান আত্মজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। ঈশ-উপনিষদ বলে পরম ব্রহ্মের সকল প্রকাশ সত্য এবং একেরই প্রকাশ; তাহা সত্যকে কোন এক বিভাবে নিবদ্ধ করিতে অস্বীকার করে। ব্রহ্ম একদিকে নিশ্চল স্থিতি অন্যদিকে সচল গতি, ভিতর এবং বাহিরের সর্ব্ববস্তু, আধ্যাত্মিকভাবে অথবা দেশকালের প্রসারে যাহা কিছু নিকটে এবং যাহা কিছু দূরে তাহা সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই স্বয়ম্ভূ-সত্তা আবার ব্রহ্মই সকল সম্ভূতি, তিনি শুদ্ধ অশব্দ অলক্ষণ নিষ্ক্রিয় আবার তিনিই কবি বা দ্রষ্টা মনীষী বিশ্ব ও বস্তুরাজির বিধাতা; সেই পরম অদ্বয়স্বরূপই জগতে এই যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বভূতে অনুস্যূত আছেন, সর্ব্বভূতের মধ্যে বাস করিতেছেন আবার যাহার মধ্যে বাস করিতেছেন তাহাও তিনি। এ উপনিষদ তাহাকেই পূর্ণ এবং মুক্তিপ্রদ জ্ঞান বলে যাহা আত্মা অথবা তাহার বিসৃষ্টি কিছুকেই বাদ দেয় না; সীমিত এবং অহং-এর দ্বারা প্রভাবিত মন বাহির হইতে আপনার সত্তা হইতে পৃথকভাবে যেমন সব কিছুকে দেখে, সেরূপভাবে না দেখিয়া যে দৃষ্টি ও চেতনা বিশ্বকে নিজের মধ্যে

অনুভব করে, মুক্ত পুরুষ সেই অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টি ও চেতনা দিয়া দেখিতে পান যে এই যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা স্বয়ম্ভূ সত্তারই সম্ভূতি, অর্থাৎ যিনি আপনাতে আপনি নিত্য বর্ত্তমান তিনিই এ সমস্ত হইয়াছেন। যাহারা বিশ্বগত অবিদ্যার মধ্যে বাস করে তাহারা অন্ধ বটে কিন্তু যাহারা শুদ্ধ বিদ্যায় ঐকান্তিকভাবে অভিনিবিষ্ট হয় তাহারাও অন্ধ; একত্রে বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে যুগপৎ জানা, সম্ভূতি এবং অসম্ভূতি উভয়ের দ্বারা একসঙ্গে পরম পদে উত্তীর্ণ হওয়া, বিশ্বাতীত এবং বিশ্বগত আত্মার উপলব্ধি যুগপৎ লাভ করা, লোকোত্তর এবং লোকবিসৃষ্টির মধ্যে আত্মজ্ঞানে এক সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—ইহাই অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান, ইহাই অমৃতত্ব লাভ। এই সমগ্র চেতনা তাহার পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে দিব্যজীবনের ভিত্তি গড়িয়া তোলে এবং তাহা লাভ করা সম্ভব করিয়া তোলে। ইহা হইতে আমরা এই পাই যে পরম ব্রহ্মের পরম সত্য অনির্দ্দেশ্য দৃঢ় একত্ব শুধু নয়, যাহার মধ্যে শুদ্ধ আত্মসত্তা ছাড়া আর কিছু নাই এবং বহু ও সান্তকে বর্জন না করিলে যাহাকে পাওয়া যায় না তেমন এক অনন্ত নহে; সে সত্য এমন কিছু যাহা এই সকল বিশেষণের অতীত, নেতি বা ইতি ভাবের কোন বর্ণনা দ্বারা তাহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। সকল ইতিবাদ ও সকল নেতিবাদ দুইই তাহার বহু বিভাব মাত্র প্রকাশ করে এবং যুগপৎ চরম ইতি এবং চরম নেতি এই উভয় ভাবের মধ্যে দিয়া আমরা সেই পরম নিত্যবস্তুতে পৌঁছিতে পারি।

তাহা হইলে আমাদিগের নিকট সত্যবস্তুরূপে এক দিকে উপস্থাপিত করা হইল নির্ব্বিশেষ এক স্বয়ম্ভূ সদ্বস্তু, অদ্বিতীয় শাশ্বত এক আত্মসত্তা; এবং আমরা নিষ্ক্রিয় এবং নিঃশব্দ আত্মা বা নিঃসঙ্গ নিশ্চল পুরুষের অনুভূতির মধ্য দিয়া অলক্ষণ অব্যবহার্য্য এই পরম বস্তুর দিকে অগ্রসর হইতে পারি, সৃষ্টি শক্তির—তাহা ভ্রমাত্মিকা মায়াই হউক বা গঠনক্ষমা প্রকৃতিই হউক—সকল ক্রিয়া নিরুদ্ধ করিতে পারি, বিশ্ব ভ্রমের সকল চক্রাবর্ত্তন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, শাশ্বত শান্তি এবং নৈঃশব্দ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি, ব্যক্তিসত্তার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া অদ্বয় পরম সতের মধ্যে আত্মহারা হইয়া যাইতে অথবা আত্মভাব লাভ করিতে পারি। অন্য দিকে পাইতেছি এক সম্ভূতি, যাহা স্বয়ম্ভূ সত্তারই খাঁটি এক গতি বা ক্রিয়া এবং সত্তা ও সম্ভূতি এই উভয়ই এক অদ্বয় পরম সত্যবস্তুর সত্য বিভাব। এ দুই দিকের প্রথমটির ভিত্তি হইল সেই দার্শনিক ধারণা, যাহা আমাদের ভাবনার এক চরম অনুভূতিকে রূপায়িত

আমাদের আপেক্ষিক প্রাকৃত চেতনার পক্ষে কি সাধ্য কি অসাধ্য তাহা দিয়া চরম বা পরম চেতনার সামর্থ্যের বিচার বা পরিমাণ করা চলে না ; যাহা আত্মসংবিৎ বা আত্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, সেখানে প্রাকৃত চেতনার কোন ধারণা প্রযুক্ত হইতে পারে না ; নিজের নিকট হইতে পলায়ন করিবার জন্য আমাদের মনোময় অবিদ্যার পক্ষে যাহা প্রয়োজন, সেই পরম তত্ত্বের পক্ষে তাহার প্রয়োজন নাই, কেননা নিজের নিকট হইতে পলায়ন করিবার অথবা যাহা জানিবার যোগ্য তাহাকে না জানিবার কোন আবশ্যকতা তাহার নাই।

সেই অবিজ্ঞেয় অব্যক্ত তত্ত্ব আছে ; আর এই ব্যক্ত জ্ঞেয় তত্ত্বও আছে, আমাদের অবিদ্যার কাছে তাহার কতকাংশ ব্যক্ত, যে দিব্য জ্ঞানস্বরূপ নিজের আনন্ত্যের মধ্যে ইহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহার কাছে ইহার সমস্তই ব্যক্ত। ইহা সত্য যে আমাদের অজ্ঞান অথবা আমাদের মনোময় জ্ঞানের চরম প্রসার দ্বারাও অজ্ঞেয়কে আমরা ধরিতে পারি না, সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে আমাদের জ্ঞান অথবা অজ্ঞানের মধ্য দিয়া সে অবিজ্ঞেয়ই নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, কেননা তাহা আপনা ছাড়া আর কিছু প্রকাশ করিতে পারে না যেহেতু তাহা ছাড়া যে কিছু নাই ; বিসৃষ্টির এই বৈচিত্র্য তাহার একত্বেরই প্রকাশ এবং এই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আমরা তাহার একত্বের সংস্পর্শে আসিতে পারি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, অজ্ঞেয় এবং জ্ঞেয় তত্ত্বের এই সহভাব স্বীকার করিলেও, সম্ভূতি বা ব্যক্ত জগৎকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া রায় দেওয়া এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ সত্তায় ফিরিয়া যাওয়া প্রয়োজন ইহা স্থির করা যাইতে পারে ; চরম তত্ত্বের খাঁটি সত্য এবং যাহা মানুষকে বিপথে চালিত করে আপেক্ষিক জগতের সেই আংশিক সত্যের মধ্যে বিভেদ দর্শনের ভিত্তিতে এই রায় দেওয়া যাইতে পারে।

কেননা জ্ঞানের এই উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে চেতনায় দ্বৈতবোধ দেখা দেয়, এক এবং বহু, সান্ত এবং অনন্ত, যাহা সম্ভূত হয় এবং যাহা অসম্ভূত নিত্য সৎ, যাহা রূপ গ্রহণ করে এবং যাহা রূপ গ্রহণ করে না, চিৎ এবং জড়, চরম অতিচেতনা এবং নিম্নতম নিশ্চেতনা—এইরূপ বহু ভাবে দ্বৈত দেখা দেয় ; এই দ্বৈতবোধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, এই দ্বৈতবোধের এক কোটিকে বিদ্যার অন্য কোটিকে অবিদ্যার অধিকারে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব ; তাহা হইলে আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য হইবে সম্ভূতির নিম্নতর সত্য হইতে অসম্ভূতির উচ্চতর সত্যে উন্নীত হওয়া—অবিদ্যা

হইতে বিদ্যার মধ্যে লম্ফ প্রদান এবং অবিদ্যাকে বর্জন করা, বহুত্ব হইতে একত্বে, সান্ত হইতে অনন্তে, রূপ হইতে অরূপে, জড় বিশ্বজীবন হইতে চিৎসত্তায়, অচেতনার অধিকার হইতে অতিচেতন সত্তায় উত্তীর্ণ হওয়া। এই সমাধানে ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে প্রতিক্ষেত্রে আমাদের সত্তার এই দুই কোটির মধ্যে অনপনেয় একটা বিরোধ একটা চরম অসামঞ্জস্য আছে। অথবা উভয় কোটি যদি ব্রহ্মের প্রকাশের উপায় হয়ও, তবু নিম্নতর কোটি আমাদিগকে যে পথ দেখায় তাহা মিথ্যা এবং অপূর্ণ, তাহা আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় নয়, তাহারা আমাদিগকে যে সম্পদ দেয় তাহাতে আমাদের চরম পরিতৃপ্তি কখনও হইতে পারে না। তাই মনে হয় বহুত্বের সকল গোলযোগে বিরক্ত হইয়া, এমন কি তাহা যে উচ্চতম আলোক, শক্তি এবং আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে, তাহা ঘৃণা বা উপেক্ষার যোগ্য মনে করিয়া এ সকলের অতীত অবস্থায়, যেখানে সকল বৈচিত্র্য লোপ পায় সেই অদ্বৈত প্রত্যয়ের চরম একাগ্রতার বা সেই পরম পদের একত্বের দিকে আমাদিগকে চলিতে হইবে। যখন অনন্তের দাবী এবং আবাহন আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছে তখন সান্তের বন্ধনে চিরকাল বাস করিতে অথবা তথায় তৃপ্তি, উদারতা এবং শান্তি পাইতে পারি না ; সুতরাং ব্যষ্টি এবং বিশ্ব প্রকৃতির সকল বন্ধন কাটিয়া সান্তের সকল তাৎপর্য্য, সকল প্রতীক, সকল প্রতিরূপ, সকল আত্মবিশেষণ বর্জন বা নষ্ট করিয়া, যিনি অমেয় তাহার নিজের উপর আরোপিত সমস্ত সীমা ভাঙ্গিয়া দিয়া যিনি নিজের অনন্ত ভাব লইয়া চিরতৃপ্ত সেই পরমাত্মার মধ্যে আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্রতা সমস্ত ভেদবুদ্ধি ডুবাইয়া দিতে হইবে। রূপের উপর বিতৃষ্ণ এবং তাহাদের মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণের মোহ হইতে মুক্ত, চঞ্চল ক্ষণস্থায়িত্ব এবং ঘটনার বৃথা পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্ত এবং নিরাশ হইয়া আমাদিগকে প্রকৃতির চক্রাবর্ত্তন হইতে উত্তীর্ণ এবং অরূপ অলক্ষণ শাশ্বত সত্তার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। জড় এবং তাহার স্থূলতায় লজ্জিত, জীবনের উদ্বেগ এবং উদ্দেশ্যশূন্য বিক্ষোভে অসহিষ্ণু এবং মনের লক্ষ্যহীন চঞ্চল গতিতে পরিশ্রান্ত হইয়া অথবা তাহার সকল আশা ও উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া, শুদ্ধ চিৎস্বরূপের শাশ্বত শান্তির মধ্যে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। নিশ্চেতনা একটা সুপ্তির ঘোর অথবা একটা কারাগার, সচেতনভাবে জগতে আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার কোন চরম উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহা এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ মাত্র ; সুতরাং আমাদিগকে অতিচেতনার মধ্যে জাগরিত হইতে হইবে, যেখানে শাশ্বত আনন্দ

স্বরূপের আত্মজ্যোতি ও আনন্দের মধ্যে নিশ্চেতনার অন্ধকার রাত্রি এবং অবিদ্যার অর্দ্ধালোকিত প্রদোষ এ উভয়ই লয় পাইবে। শাশ্বত নিত্য বস্তুই আমাদের পরম আশ্রয় স্থান; তাহা ছাড়া অন্য কোন কিছুর কোন মূল্য নাই, তাহা অবিদ্যা এবং তাহার গোলকধাঁধা, প্রাতিভাসিক প্রকৃতির মধ্যস্থিত আত্মার নিজের হতবুদ্ধিকর পরিভ্রমণ মাত্র।

কিন্তু জ্ঞান এবং অজ্ঞানের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহাতে এই পরস্পর বিরোধ ও প্রতিষেধের স্থান নাই; দুরূহ হইলেও একটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ দুই-এর এক সামঞ্জস্য আমরা দেখিতে পাই। কেননা আমরা জানি এক এবং বহু, রূপ এবং অরূপ, সান্ত এবং অনন্তের মধ্যে যে আপাতবিরোধ দেখি বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে, তাহারা বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক; এই দ্বন্দ্ব ব্রহ্মে যে পর্য্যায়ক্রমে দেখা দেয় তাহা নহে, এমন নহে যে ব্রহ্ম বিসৃষ্টিতে বহুরূপে নিজেকে দেখিতে গিয়া তাহার একত্ব হারাইয়া ফেলেন, বহুত্বের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার মধ্যে নিজের অদ্বয়স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে তিনি অশক্ত হইয়া পড়েন, আবার একত্ব লাভ করিলে বহুত্বকে পুনরায় হারাইয়া ফেলেন, কিন্তু একত্ব ও বহুত্ব তাঁহার যুগপৎ প্রকাশিত দুই বিভূতি, ইহারা পরস্পরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে; ইহা ঠিক নয় যে এই দুইএর মধ্যে অনপনেয় বিরোধ আছে অতএব পর্য্যায়ক্রমে ছাড়া তাহারা প্রকাশিত হইতে পারে না, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা একই সত্য বস্তুর দুইটি মুখ, দুইটি দিক; তাই তাহাদের পৃথক অনুশীলনে নয় কিন্তু উভয়ের যুগপৎ উপলব্ধিতে আমরা সেই সত্যবস্তুতে পৌঁছিতে পারি—অবশ্য পৃথক অনুশীলনও বৈধ হইতে পারে, এমন কি জ্ঞানলাভের পথে তাহা একটি অপরিহার্য্য ধাপ বা অংশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহা নিঃসন্দেহ যে মূল সত্তার উপলব্ধি বা একত্বের জ্ঞানই বিদ্যা; আর সেই সত্তার আত্মবিস্মৃতি, বহুর মধ্যে নিজেকে পৃথক বলিয়া অনুভব, যাহাকে ভালরূপে বুঝি না সেই সম্ভূতির গোলকধাঁধার মধ্যে বাস করা অথবা তাহার মধ্যে আবর্ত্তিত হওয়া—ইহাই অবিদ্যা; কিন্তু অবিদ্যার এ ঘোর কাটিয়া যায় যখন সম্ভূতির মধ্যস্থিত আত্মার মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ হয়, যখন সে জানে যে এক পরম সৎই বহুত্বের মধ্যস্থিত সকল বস্তু হইয়াছেন, যখন বুঝে যে ইহা অসম্ভব নয়, কেননা বহুর সত্য কালাতীত অদ্বয় তত্ত্বের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই নিহিত ছিল। ব্রহ্মের অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান এমন এক চেতনা, যাহাতে এক এবং বহু যুগপৎ বর্ত্তমান আছে; এ দুইএর একদিক ঐকান্তিকভাবে অনুসরণ করিলে,

সদ্বস্তু এবং পূর্ণ জ্ঞান

সর্ব্বগত সত্যবস্তুর একদিক মাত্র আমরা দেখিতে পাই, অন্যদিক সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া পড়ি। সকল সম্ভূতিকে অতিক্রম করিয়া যে পরমসত্তা আছে তাহাকে লাভ করিলে আমরা বিশ্বের মধ্যে থাকিয়াও, বাসনা এবং অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং এই স্বাতন্ত্র্যের ফলে আমরা স্বাধীনভাবে সম্ভূতি ও বিশ্ব-জীবনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারি ; সম্ভূতির জ্ঞানও অখণ্ড জ্ঞানের অংশ, এ জ্ঞান আমাদের কাছে শুধু যে অবিদ্যা রূপেই প্রকাশ পায় তাহার কারণ এই যে নিত্যসতের একত্ববোধ হারাইয়া, অবিদ্যার অন্তস্তলে 'অবিদ্যায়ামন্তরে' কারারুদ্ধ হইয়া আমরা বাস করি ; জানি না সেই অখণ্ড নিত্য সদ্বস্তুকে, যিনি ইহার ভিত্তি এবং উপাদান, ইহার তাৎপর্য্য ও বিসৃষ্টির কারণ, যিনি না থাকিলে ইহার অস্তিত্বই সম্ভব হইত না।

বস্তুতঃ ব্রহ্ম সকল সম্বন্ধের অতীত অলক্ষণ অবস্থায় যে শুধু এক তাহা নহে, বিশ্বের বহুধা বিসৃষ্টিতেও তিনি এক। বিভজনশীল মনেব ক্রিয়া তিনি জানেন, কিন্তু তাহা দ্বারা সীমিত হন না ; বহুত্বের নানা সম্বন্ধের বা সম্ভূতির মধ্যেও যেমন সহজভাবে নিজেকে এক বলিয়া জানেন, তেমনি যখন বহুত্ব, সম্বন্ধ এবং সম্ভূতি হইতে সরিয়া দাঁড়ান তখনও নিজেকে সেই একই দেখেন। পূর্ণরূপে ব্রহ্মের একত্বকে পাইতে হইলেও আমাদিগকে বিশ্বের মধ্যে তাহার অনন্ত আত্মবৈচিত্র্যেব মধ্য দিয়াই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, কেননা সেই একই যখন বহু হইয়াছেন তখন বহুত্বের মধ্যেও সে একত্ব আছে। বহুগত অনন্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং সমর্থন তখনই দেখা যায়, যখন তাহা একের আনন্ত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং তাহা দ্বারা অধিকৃত দেখিতে পাই, আবার একের অনন্ত ভাবই বহুব মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিয়া বহুগত অনন্তের মধ্যে নিজেকে লাভ করে। মুক্ত পুরুষের দিব্য শক্তি এই যে, নিজ বীর্য্যধারাকে ঢালিয়া দিতে সক্ষম হইয়াও তিনি নিজে তাহার মধ্যে আত্মহারা হইয়া যান না, অন্তহীন এবং অজস্র ভেদ ও ঘটনা বিপর্য্যয়ে পরাভূত হইয়া জগদতীত সত্তায় প্রত্যাবৃত্ত হন না, আত্মবৈচিত্র্যের অকুণ্ঠ বিস্তারের মধ্যেও তিনি অখণ্ড এবং অবিভক্ত থাকেন, ইহাই যাহার মধ্যে শাশ্বত আত্মজ্ঞান নিত্য বর্ত্তমান সেই স্বাধীন চিন্ময় পুরুষের দিব্য শক্তি। যাহার মধ্যে আত্মজ্ঞানহারা হইয়া মন বিধৃত এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, আত্মার সেই সান্ত আত্মবৈচিত্র্য অনন্ত স্বরূপের অস্বীকৃতি নহে, বরং সে সমস্তও অনন্তের অন্তহীন প্রকাশ, তাহাদের অস্তিত্বের অন্য কোন কারণ বা তাৎপর্য্য নাই ; অনন্তস্বরূপের মধ্যে যেমন আছে তাহার

অমেয় সত্তার আনন্দের অধিকার তেমনি আছে জগতের মধ্যে অন্তহীন আত্ম-বিশেষণের দ্বারা ঐ অসীমতার দিব্য আনন্দ সম্ভোগ। স্বরূপতঃ সকল রূপের অতীত বলিয়া দিব্য পুরুষ যে অগণিতভাবে রূপায়িত হইতে অশক্ত, ইহা সত্য নহে ; অথবা ইহাও সত্য নহে যে রূপকে স্বীকার করিলে তাহার ভগবত্তা নষ্ট হইয়া যায়, বরং ঐ সমস্ত রূপেব মধ্যে তিনি তাঁহার সত্তার আনন্দ এবং দেবত্বের মহিমা ঢালিয়া দেন ; স্বর্ণ যখন নানা অলঙ্কারে পরিণত হয় অথবা নানা দেশের নানা মূল্যের মুদ্রায় রূপান্তরিত হয় তখনও তাহা স্বর্ণই থাকিয়া যায় ; অথবা বহুরূপা জড়প্রকৃতির তত্ত্বরূপিণী পৃথ্বীশক্তি যখন জীবধাত্রী ধরিত্রীতে পরিণত হয় অথবা পর্ব্বতে কন্দরে সমতলে নদী তড়াগ সমুদ্রে রূপায়িত হয়, যখন সে গৃহস্থালীর তৈজস পত্রে অথবা অস্ত্র এবং যন্ত্রের কঠিন ধাতুতে নিজেকে আকারিত করিতে দেয় তখন তাহার অপরিবর্ত্তনীয় দিব্যভাব হারাইয়া বসে না। সূক্ষ্ম বা স্থূল মৃন্ময় বা মনোময় যাহাই হউক না কেন জড় চিতেরই রূপ এবং দেহ ; যদি তাহাকে ভিত্তি করিয়া চিৎবস্তুর আত্ম-প্রকাশ সম্ভব না হইত তবে তাহার সৃষ্টিই হইত না। যাহা কিছু জ্যোতির্ম্ময়ী অতিচেতনার মধ্যে শাশ্বতভাবে আপনা হইতে ব্যক্ত হইয়া আছে, জড়বিশ্বের আপাত নিশ্চেতনা তাহাব সমস্তকেই গোপনে নিজের অন্ধকারের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে ; কালের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে ধীরে ধীরে প্রকাশ করিয়া তোলাতেই প্রকৃতির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনন্দ এবং তাহার কালচক্রাবর্ত্তনের চরম লক্ষ্য।

কিন্তু সদ্বস্তু এবং জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও সিদ্ধান্ত আছে যাহা আলো-চনার যোগ্য। একটা মত আছে যাহা বলে যে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই আমাদের মনের মনোময় বিসৃষ্টি, চেতনা দিয়া গড়া কিছু ; চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র আপনাতে আপনি অবস্থিত কোন বস্তুগত সত্তার অস্তিত্ব ভ্রম মাত্র ; কেননা সেরূপ স্বতন্ত্র এবং অন্যনিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আমরা পাই না বা পাইতে পারি না। এই ধরণের দৃষ্টি শেষে আমাদিগকে বলিতে পারে যে সৃষ্টিশীল চেতনা ছাড়া অন্য কোন সত্য বস্তু নাই অথবা সকল অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া বলিতে পারে যে অসৎ বা নিশ্চেতন এক শূন্যই একমাত্র সত্য বস্তু। কারণ এক মতে চেতনা দিয়া গড়া বস্তুর কোন বাস্তব সত্তা নাই, তাহারা মনের কল্পনার একটা আকার মাত্র ; এমন কি যে চেতনা তাহা-দিগকে গড়িয়া তোলে তাহা নিজেও অনুভবের একটা প্রবাহ মাত্র, এই অনুভব

তাহার অন্তরস্থ যোগসূত্র ও বিরামবিহীনতার জন্য ধারাবাহিক কালের একটা বোধ জন্মায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সমস্তের কোন স্থির ভিত্তি নাই, তাহারা সত্য রূপে প্রতীয়মান হয় কিন্তু সত্য বস্তু নহে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে আত্মসচেতন সত্তা এবং সকল গতি বা ক্রিয়া এ উভয়েরই যুগপৎ শাশ্বত শূন্যতা বা অসদ্ভাবই হইল সত্য ; এবং মন দ্বারা গঠিত বিশ্বরূপে যাহা বোধ হইতেছে তাহা হইতে শূন্যতায় ফিরিয়া যাওয়াই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানে দুই দিক হইতে পূর্ণ আত্মবিলয় ঘটিবে, পুরুষেয় বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিরও হইবে নিবৃত্তি বা নাশ, কেননা সচেতন আত্মা এবং প্রকৃতি আমাদের সত্তার দুইটি বিভাব, আমাদের অস্তিত্ব বলিয়া যাহা কিছু বুঝি তাহার সবই এই দুইএর মধ্যে আছে, এই দুইএর নাশের নামই মহানির্ব্বাণ। তাহা হইলে নিশ্চেতনাই একমাত্র সত্য যাহার মধ্যে এই প্রবাহ এবং ক্ষণস্থায়ী রূপ দেখা দিতেছে অথবা সত্য বস্তু হইবে এক অতিচেতনা যাহা আত্মা বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে সব ধারণা আছে তাহার অতীত। যদি আমাদের বহিশ্চর মনকেই আমাদের সমগ্র চেতনা মনে করি তবেই বিশ্ব বা তাহার প্রতিভাসের সম্বন্ধে কেবল এই সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে ; মনের ক্রিয়ার বিবৃতি হিসাবে ইহাকে প্রামাণিক বলা যাইতে পারে ; নিশ্চিতই এ সকল একটা প্রবাহ এবং ক্ষণস্থায়ী চেতনায় গড়া একটা রূপ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বৃহত্তর এবং একত্ববোধজাত গভীরতর এক আত্মজ্ঞান এবং জগৎ-জ্ঞান যদি থাকে, যদি থাকে এমন এক চেতনা, যাহার পক্ষে সেই জ্ঞান স্বাভাবিক এবং এমন এক সত্তা সেই চেতনাই যাহার শাশ্বত আত্মবোধ, তবে আমরা এই সিদ্ধান্তকে সত্তার সমগ্র পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না ; কেননা সেই সত্তা এবং চেতনার অন্তর্গত বিষয়ী এবং বিষয়রূপে (subjective and objective) এ উভয়ই সত্য হইতে পারে, উভয়ই তাহার অংশ, সেই অন্বয় তত্ত্বের দুইটি বিভাব, উভয়ই তাহার অস্তিত্বে প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে।

পক্ষান্তরে গঠনশীল মন বা চেতনাই যদি সত্য এবং একমাত্র সদ্বস্তু হয়, তাহা হইলে জড়জগতের সত্তা এবং বস্তুর এক অস্তিত্ব থাকিতে পারে কিন্তু তাহা হইবে বিশুদ্ধ মনোময় উপাদানে চেতনার আপনার মধ্য হইতেই গড়া বস্তু, চেতনার দ্বারা তাহা বজায় থাকিবে এবং অন্তকালে চেতনার মধ্যে তাহাদের বিলোপ ঘটিবে। কারণ, যদি আর কিছু না থাকে অন্য কোন মৌলিক সদ্বস্তু বা সত্তা সৃষ্টিশক্তিকে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান না থাকে, আবার অন্যপক্ষে আধার

এবং আশ্রয়রূপে কেবল শূন্যতা বা অসৎ আছে ইহা যদি স্বীকার না করি, তাহা হইলে এই যে চেতনা, যাহা সব কিছু স্বষ্টি করিতেছে, তাহার নিজের অস্তিত্ব আছে অথবা তাহা কোন সত্তা বা বস্তু ; তাহা যদি কোন বস্তু গড়িয়া তুলিতে পারে তবে সে বস্তু হইবে তাহার নিজেরই উপাদানে গড়া অথবা তাহার নিজ সত্তার কোন রূপায়ণ। যে চেতনা কোন সত্তার চেতনা নয় অথবা স্বয়ং সত্তাস্বরূপ নয় তাহা নিজেই অসৎ, অবাস্তব, তাহাকে শূন্যের মধ্যে জাত শূন্যের এক অনুভব শক্তি বলিতে পারি, তাহা যাহার অস্তিত্ব নাই এমন বস্তু দিয়া অসত্য অবাস্তব রূপ মাত্র গড়িয়া তুলিতেছে—ইহাও একটি সিদ্ধান্ত হইতে পারে, কিন্তু অন্য সকল সিদ্ধান্ত অপ্রামাণিক বলিয়া সাব্যস্ত না হইলে এ সিদ্ধান্ত সহজে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টতঃ এই দাঁড়ায় যে যাহাকে আমরা চেতনা বলিয়া দেখি তাহা এমন কোন সত্তা বা অস্তিত্ব যাহার চিন্ময় উপাদানের দ্বারাই সব কিছু স্বষ্ট হইয়াছে।

এইভাবে যদি সত্তা ও চৈতন্যের এই দ্বৈত তত্ত্বের দিকে ফিরিয়া যাই তবে হয় আমরা বেদান্তের সঙ্গে বলিতে পারি যে অনাদি এক পুরুষ অথবা সাংখ্যমত গ্রহণ করিয়া মানিয়া লইতে পারি যে বহু পুরুষ আছেন ; এই পুরুষ বা পুরুষগণের কাছে চৈতন্য অথবা যে শক্তিকে আমরা চেতনধর্মী মনে করি এমন কোন শক্তি তাহার নিজের গড়া বিস্বষ্টি উপস্থাপিত করে। অনাদি এবং বিবিক্ত বহু পুরুষই যদি কেবল সত্য হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পুরুষই তাহার নিজের চেতনায় তাহার জগৎরূপ ধারণ বা নিজের জগৎ স্বষ্টি করিবে বলিয়া জগতের মধ্যে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করা দুরূহ হইয়া পড়ে ; সাংখ্য মতে সদৃশ বহু পুরুষের অনুভূতির ক্ষেত্রে এক প্রকৃতি, আমাদিগকে তদনুযায়ী ভাবে বলিতে হয় এক চেতনা বা এক শক্তিই আছে তাহার মধ্যে মন দিয়া গড়া একই জগতে বহু পুরুষ মিলিত হয়। এ সিদ্ধান্তের সুবিধা এই যে ইহাতে বহু পুরুষ ও বহু বস্তুর একটা ব্যাখ্যা মিলে তাহাদের অনুভূতির বৈচিত্র্যের মধ্যে যে একটা একত্বের ভাব দেখা যায় তাহারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে এ-মত প্রত্যেক ব্যষ্টিপুরুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং নিয়তিকে একটা বাস্তবতা অর্পণ করে। কিন্তু ইহা যদি স্বীকার করা যায় যে এক চেতনা বা এক শক্তি নিজেরই বহুরূপ স্বষ্টি করিয়া নিজের জগতে বহু পুরুষের স্থান দিতে পারে, তবে এক অনাদি পুরুষ বহু পুরুষের বা বহু আত্মার আধার ও আশ্রয় হইতে অথবা বহুপুরুষরূপে—সে সমস্ত পুরুষ হইবে অদ্বয় সত্তার বহু আত্মা

বা চিন্ময় শক্তি সকল—নিজেকে রূপায়িত করিতে যে পারে ইহা স্বীকার করিতে কোন বাধা থাকে না ; তাহা হইলে আরও এই অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে সর্ব্ববস্তু বা চেতনার সকল রূপ হইবে সেই পরম পুরুষেরই বহুরূপ। তখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই বহুত্ব এই সমস্ত রূপ কি এক সত্যবস্তুর বহু সত্য রূপাবলি, অথবা তাহারা শুধু তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যক্তিপুরুষ এবং প্রতিরূপ, অথবা মন দিয়া গড়া তাহার প্রতীক বা প্রতিচ্ছবি। এ প্রশ্নের সমাধান অনেকটা নির্ভর করিবে আর একটা প্রশ্নের উত্তরের উপরে; কি এখানে ক্রিয়াশীল হইয়াছে ? যে রূপে আমরা মনকে জানি কেবল মনের সেই রূপ, অথবা এক গভীরতর এবং বৃহত্তর চেতনা, মন যাহার বহিশ্চর কারণ বা যন্ত্র, তাহার প্রবর্ত্তনার সাধন, তাহার প্রকাশের বাহন ? যদি প্রথম কল্প সত্য হয় তাহা হইলে মন দ্বারা গঠিত এবং সৃষ্ট জগতের সত্য হইবে কেবল মনোময়, প্রতীকধর্ম্মী এবং সত্যবস্তুর প্রতিচ্ছায়ারূপী ; আর যদি দ্বিতীয় কল্প সত্য হয় তাহা হইলে বিশ্ব এবং তন্মধ্যস্থ প্রাকৃত সত্তা ও বস্তু হইবে সেই অদ্বয় সত্তার খাঁটি তত্ত্ব বা সত্য, হইবে তাঁহারই আত্মশক্তি দ্বারা বিসৃষ্ট তাঁহারি বীর্য্য বা রূপাবলি। একদিকে সর্ব্বগত সদ্বস্তু এবং অন্যদিকে তাহার সৃষ্টিশীলা চৈতন্যময়ীশক্তি, চিৎ-তপস, প্রকৃতি বা মায়ার বিসৃষ্টির মধ্যে মন কেবল দোভাষীর কাজ করিবে।

ইহা স্পষ্ট যে আমাদের বহিশ্চর বুদ্ধি রূপে যে মনের প্রকাশ তাহা সত্তার একটা গৌণ শক্তি মাত্র। ইহার দেহে অসামর্থ্য এবং অবিদ্যার যে ছাপ আছে তাহাতেই প্রকাশ হয় যে ইহা অন্য কিছু হইতে উদ্ভূত, অনাদি সৃষ্টিশক্তি নহে ; আমরা দেখিতে পাই, যে বস্তুর অনুভূতি সে লাভ করে সে বস্তুকে সে জানে না বা বুঝে না, তাহাকে স্বচ্ছন্দে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই ; তাহাকে জানা এবং নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি বহু আয়াসে লাভ করিতে হয়। এ সমস্ত যদি মনের নিজের গড়া বস্তু, তাহার আত্মশক্তির বিসৃষ্টি হইত তাহা হইলে এই প্রাথমিক অসামর্থ্য তাহার মধ্যে থাকিতে পারিত না। ইহা বলা যাইতে পারে যে ব্যষ্টি মনের জ্ঞান এবং শক্তি শুধু বহির্ভাগে অবস্থিত এবং অন্য হইতে জাত, কিন্তু এক বিশ্বমন আছে যাহা সমগ্র, সর্ব্বজ্ঞতা এবং সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিভূষিত। কিন্তু আমরা মনকে যাহা জানি তাহাতে দেখিতে পাই যে জ্ঞানান্বেষী অজ্ঞানই তাহার স্বরূপ ; ইহা ভগ্নাংশ শুধু জানে, খণ্ড বস্তুরাজি লইয়া কারবার করে, তাহাদের সমষ্টিতে পৌঁছিতে বা জোড়া তাড়া দিয়া সমগ্রতা গড়িয়া তুলিতে চায়, কিন্তু বস্তুর স্বরূপ বা সমগ্ররূপ কোনটির পরই তাহার অধিকার

নাই ; সেই একই প্রকৃতিবিশিষ্ট বিশ্বমন তাহার বিশ্বব্যাপ্তির জন্য আপনার খণ্ডভাবের সমষ্টিকে হয়ত জানিতে পারিবে, কিন্তু বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান তাহার থাকিবে না এবং স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব হইলে প্রকৃত পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে না। যে চেতনায় স্বরূপ-জ্ঞান এবং পূর্ণজ্ঞান আছে, যাহা সত্তার মর্ম্ম হইতে সমগ্রতায় এবং সমগ্রতা হইতে তাহার প্রতি অংশে পরিব্যাপ্ত হয়, তাহাকে আর মন বলা চলে না ; তাহা পূর্ণ ঋত-চিৎ, তাহার মধ্যে আত্ম-জ্ঞান এবং জগৎ-জ্ঞান স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে। এই ভিত্তি হইতেই সত্য সম্বন্ধে আমাদের মনোময় ধারণাকে দেখিতে হইবে। ইহা সত্য যে চেতনা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তুতন্ত্র সত্য (objective reality) নাই ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে বস্তুতন্ত্রতাতেও (objectivity) একটা সত্য আছে, সে সত্য এই বস্তুর সত্য, তাহারি অন্তর্নিহিত কিছুর মধ্যে নিহিত আছে, সে সত্য আমাদের মন তাহাদের যে ব্যাখ্যা দেয় অথবা আমাদের ভূয়োদর্শন তাহার যে রূপ গড়িয়া তোলে, তাহার উপর নির্ভর করে না অথবা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এইভাবে গড়া রূপ জগতের মনোময় প্রতিচ্ছবি বা চিত্র বটে কিন্তু জগৎ এবং তন্মধ্যস্থ বস্তুরাজি কেবল প্রতিচ্ছবি বা চিত্র নহে। মূলতঃ তাহাবা চেতনার বিস্সৃষ্টি, কিন্তু সেই চেতনার যাহা সত্তার সহিত একীভূত, যাহাব এবং যাহার বিস্সৃষ্টির উপাদান সেই সত্তারই উপাদান সুতরাং তাহারা সত্য। এই দিক দিয়া দেখিলে জগৎকে শুধু বিশুদ্ধ অন্তর্ম্মুখী বা প্রত্যক্‌বৃত্ত চেতনার স্সৃষ্টি বলা যায় না ; বস্তুতঃ বিষয়ী ও বিষয়, অন্তর্ম্মুখী চেতনা এবং বাহিরের বস্তু এ উভয়ই সত্য, একই সত্য বস্তুর দুইটি বিভাব বা দিক।

এক হিসাবে মানুষের আপেক্ষিক এবং ব্যঞ্জনাত্মক ভাষা ব্যবহার করিয়া বলিতে পারি যে সর্ব্ববস্তুই প্রতীক মাত্র, এই প্রতীকের মধ্য দিয়াই যাহা আমাদের এবং জগতের আধার ও আশ্রয় সেই সৎস্বরূপের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইবার পথ রহিয়াছে। একত্বের অনন্ত যেমন এক প্রতীক, বহুত্বগত অনন্তও তেমনি আর এক প্রতীক, আবার যেহেতু বহুত্বের প্রত্যেক ভাব পুনরায় একত্বের দিকে ইশারা করে এবং যেহেতু আমরা যাহাকে সান্ত বলি তাহার প্রত্যেক বস্তু অনন্তের এক প্রতিরূপ, পুরোভাগে অবস্থিত একটি রূপায়ণ, অনন্তের মধ্যস্থিত কোন কিছুর একটা ছায়া, তখন বিশ্বে যাহা কিছু বিশেষিত হইয়া উঠিতেছে, বিশ্বের সমস্ত বস্তু সমস্ত ঘটনা, ভাব এবং প্রাণের সমস্ত রূপায়ণ—

এ সমস্তের প্রত্যেকটি একটা প্রতীক, একটা দ্যোতনা। অন্তর্মুখী মনের কাছে সত্তার আনন্ত্য একটা প্রতীক, অসত্তার (non-existence) আনন্ত্যও অন্য এক প্রতীক। নিশ্চেতনার অনন্ত এবং অতিচেতনার অনন্ত, চরম সত্তা বা পরম ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশের দুই মেরু বা প্রান্ত, আমাদের জীবন এই দুই প্রান্তের মধ্যস্থলে অবস্থিত, এই দুইএর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তের দিকে চলিয়াছে আমাদের অভিযান, অব্যক্তের এই ব্যক্তরূপ আমরা ক্রমশঃ বেশী করিয়া অনুভব করিতেছি, সর্ব্বদা তাহার তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিতেছি এবং অন্তর্ম্মুখীভাবে সে প্রকাশ আমাদের মধ্যে গড়িয়া তুলিতেছি। এইরূপে আমাদের আত্মসত্তার ক্রমোন্মীলনের মধ্য দিয়া আমাদিগকে সেই অনির্ব্বচনীয় পরম সত্তা যে সর্ব্ব-ঘটে বিদ্যমান এই চেতনায়, আমাদের এবং জগতের স্বরূপ জ্ঞানে পৌঁছিতে হইবে, তখন বুঝিব যে যাহা কিছু আছে বা যাহা কিছু নাই, তাহা তাহার প্রকাশ, যাহা নিজের শাশ্বত পরম আত্ম-জ্যোতি ছাড়া নিজেকে পূর্ণরূপে অনাবৃত ভাবে অন্য কোথাও প্রকাশ করে না।

কিন্তু বস্তু সকলকে এমনভাবে দেখা মনের ক্রিয়ার একটা ধরণ, মন এই ভাবেই সত্তার সহিত বাহিরে যাহা সম্ভূতিরূপ ধারণ করিয়াছে তাহার সম্বন্ধ বুঝিতে চায়; বিসৃষ্টির কোন সত্যের মনোময় চলচ্চিত্র হিসাবে ইহার প্রামাণি-কতা আছে, কিন্তু সাবধান হইতে হইবে যে এইভাবে প্রতীকের মধ্য দিয়া দেখিতে গিয়া, গণিতের বস্তুনিরপেক্ষ সঙ্কেতের বা সূত্রের মত বা জ্ঞানলাভের জন্য অন্য যে সব চিহ্ন মন ব্যবহার করে তাহাদের মত, আমরা বস্তুকে যেন শুধু অর্থপূর্ণ সঙ্কেতমাত্রে পর্য্যবসিত না করি; কেননা রূপ এবং ঘটনা শুধু প্রতীক নয় তাহারা সত্যবস্তু এবং পরম সত্যের অর্থ প্রকাশ করে; যাহাকে তৎস্বরূপ বলা হইয়াছে সেই ব্রহ্মের তাহারা আত্মপ্রকাশ, তাহারি সদ্‌ভাবের শক্তি ও ক্রিয়া। প্রতি রূপের মধ্যে সেই তৎস্বরূপ বাস করিতেছেন এবং প্রতিরূপ যে আছে, তাহার কারণ এই যে তাহা তৎস্বরূপের কোন না কোন শক্তির বহিঃপ্রকাশ; বিসৃষ্টির সক্রিয় ক্রিয়াধারার মধ্যে প্রতি ঘটনা সত্তার কোন সত্যকে ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিবার জন্যই ঘটে। রূপ এবং ক্রিয়ার এইরূপ অর্থ আছে বলিয়াই, মন তাহাদের প্রামাণিক তাৎপর্য্য খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং অন্তর্মুখ চেতনায় বিশ্বের এক রূপ গড়িয়া তুলিতে পারে; আমাদের মনের প্রধান কাজ অনুভব এবং অর্থনির্ণয় করা, গৌণভাবে এবং অন্য কিছু হইতে জাত শক্তিরূপে (derivatively) মাত্র তাহাকে স্রষ্টা বলা চলে। বস্তুতঃ মনোময়

অন্তর্মুখী চেতনার মূল্য এবং সার্থকতা এই যে, তাহাতে সত্তার কোন সত্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু সে সত্য প্রতিবিম্ব নিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্র ভাবেই বর্ত্তমান থাকে, সেই স্বাতন্ত্র্য কখনও প্রকাশ পায় জড়বস্তুস্বরূপে কখনও বা অতীন্দ্রিয় কিন্তু মনোগ্রাহ্য জড়োত্তর সত্য রূপে। তাহা হইলে মন বিশ্বের আদি স্রষ্টা নহে, মধ্যবর্ত্তী শক্তিরূপে সত্তার কতকগুলি বাস্তব প্রকাশ বা ভূতার্থকে সে গ্রহণ ও প্রমাণ করিতে পারে; বিশ্বাতীত এবং বিশ্বপুরুষে নিত্য বর্ত্তমান এক চেতনা, এক শক্তিই প্রকৃত জগৎ স্রষ্টা, মন তাহার কার্য্যকারক বা প্রতিনিধি এবং মধ্যস্থ-রূপে সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করে, সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করে।

সদ্বস্তু এবং জ্ঞানের সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তও আছে; সে সিদ্ধান্ত বলে বস্তুতান্ত্রিক সত্যই একমাত্র পূর্ণ সত্য, এবং বস্তু বা বিষয়-জ্ঞানই একমাত্র পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জ্ঞান। জড় সত্তাই বিশ্বের আদি মৌলিক সত্য, আত্মা বা চিৎ-বস্তু কিছু আছে কিনা তাহা সন্দেহ; চেতনা, মন, আত্মা বা চিৎ-বস্তু বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা বিশ্বক্রিয়ারত জড়শক্তি হইতে জাত অচিরস্থায়ী বস্তু—এই সমস্ত ধারণা এবং ভাবনা হইতে এ মত আসিয়াছে। যাহা কিছু স্থূল বা বস্তুতান্ত্রিক নহে বস্তুতঃ তাহা জড় এবং বাহ্য বস্তুর উপরে নির্ভরশীল নিম্নতর সত্য; যাহা কিছু জড়াতীত তাহাকে সত্যের রাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র পাইতে হইলে জড়গত মনের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে অথবা জড় বাহ্যবস্তুর সত্যের সহিত তাহার যে কোন সম্পর্ক আছে, তাহা যাহাতে সমীক্ষা ও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করা যায় এমন ভাবে দেখা-ইয়া ও বুঝাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে এই সিদ্ধান্ত পুরাপুরি গ্রহণ করা যায় না, কেননা তাহার মধ্যে সমগ্র দৃষ্টি নাই; ইহা সত্তার একটি বিভাব বা একটি দেশের এবং সে দেশেরও একটি প্রদেশ বা একটি জেলার উপর শুধু দৃষ্টিপাত করে এবং অন্য সমস্ত অব্যাখ্যাত রাখিয়া দেয়, তাহাদের মূল সত্য এবং তাৎপর্য্য স্বীকার করে না অথবা দেখিতে পায় না। জড়বাদকে যদি চরম অবস্থায় লইয়া যাওয়া যায় তবে তাহার কাছে ভাবনা, প্রেম, সাহস, প্রতিভা, মহত্ত্ব এমন কি মানুষের যে আত্মা এবং মন এই অজানা ও বিপদসঙ্কুল বিশ্বের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে আয়ত্তে আনিতেছে, সে সমস্ত অপেক্ষা একখণ্ড প্রস্তর বা একটা তালের বড়া অনেক বেশী সত্য; এ সমস্ত নিম্নস্তরের স্বাতন্ত্র্যহীন এমন কি অবাস্তব এবং ক্ষণস্থায়ী সত্য। কেননা আমাদের অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে এত মহৎ এ সমস্ত বস্তু জড়বাদীর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় আধারের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-

গ্রাহ্য জড়বস্তুর সংস্পর্শ বা সংঘাতজাত প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়; এ সমস্ত যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য বস্তুর সহিত কারবার করে এবং নিজদিগকে তাহাদের উপর কার্য্যকর করিয়া তুলিতে পারে কেবল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা প্রামাণিক; মানুষের আত্মা বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা বস্তুতান্ত্রিক অতিবাস্তব জড়প্রকৃতির একটা ঘটনা বা অবস্থান্তর মাত্র। কিন্তু পক্ষান্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের ফলেই বস্তু বা বিষয় সার্থকতা লাভ করে; কালের মধ্যে আত্মার প্রগতির পথে বস্তু বা বিষয় হইল ক্ষেত্র, নিমিত্ত বা উপায়; বিষয়ীর আত্মপ্রকাশের আধার বা ক্ষেত্ররূপেই বিষয় বা বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে। বস্তুগত এই বিশ্ব চিৎস্বরূপের সম্ভূতির এক বাহ্যরূপ মাত্র; ইহা তাহার আদ্যরূপ এবং প্রকাশের ভিত্তি হইলেও সত্তার স্বরূপ বা মুখ্য সত্য নহে। বিষয় ও বিষয়ী ব্যক্ত সত্যবস্তুর দুইটি অপরিহার্য্য তুল্যমূল্য বিভাব; বিষয়ের রাজ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যতটা প্রামাণিক, চেতনা-গ্রাহ্য জড়াতীত বিষয়েরও প্রামাণ্য ঠিক ততটাই; তাহাকে পূর্ব্ব হইতেই মনের ভ্রম বা কুহক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

বস্তুতঃ বিষয় এবং বিষয়ী দুইটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, তাহারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল; সত্তা বা পুরুষই চেতনার মধ্য দিয়া বিষয়ের দ্রষ্টা বা বিষয়ীরূপে নিজেকেই দেখিতেছেন; আবার তিনিই নিজের চেতনাতে বিষয়ীর নিকটে বিষয় বা দৃশ্যরূপে নিজেকে উপস্থাপিত করিতেছেন। একদেশদর্শী জড়-বাদ যাহা শুধু চেতনায় আছে তাহার কোন স্বতন্ত্র বাস্তবতা স্বীকার করে না, আরও নিখুঁত করিয়া বলিতে গেলে যাহা আমাদের অন্তশ্চেতনা কি অন্তরিন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় কিন্তু বাহ্যেন্দ্রিয় যাহাকে কোনরূপে ধরিতে বা প্রমাণিত করিতে পারে না, তাহাকে জড়বাদী সত্য বলিয়া মানিতে চায় না। কিন্তু বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য হয় কেবল তখনই, যখন তাহাদের দ্বারা ধৃত বিষয়ের অনুবাদ চেতনার কাছে উপস্থাপিত করিলে চেতনা সে বিবরণে একটা অর্থ সংযোগ করে, ইন্দ্রিয়ের দেওয়া বহির্মুখীতার সঙ্গে অন্তরের বোধি-প্রত্যয়জাত ব্যাখ্যা জুড়িয়া দেয়, এবং যুক্তি দিয়া সে ব্যাখ্যা সমর্থন করে; কারণ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য নিজে সর্ব্বদাই অপূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়, অতি নিশ্চিত বলিয়া তাহা গ্রহণ করা কখনই যায় না; কেননা একেত ইন্দ্রিয় খণ্ড বা একদেশদর্শী, তাহার উপর সর্ব্বদাই তাহার ভুল করিবার সম্ভাবনা আছে। বস্তুতঃ বাহ্যেন্দ্রিয়গণ যাহার করণ বা যন্ত্র আমাদের সেই অন্তশ্চেতনার দৃক্-

শক্তি ছাড়া দৃশ্য জগৎকে জানিবার কোন উপায়ই আমাদের নাই ; শুধু সে চেতনার কাছে নয়, সে চেতনার মধ্যেই জগতের যে রূপ ফুটিয়া উঠে তাহাকেই আমরা জানি। মনোময় বা জড়াতীত দৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে বিশ্বস্তচক্ষু এই চেতনার সাক্ষ্যকে না মানিয়া তাহাদিগকে যদি অসত্য বলি, তাহা হইলে এমন কোন কারণের প্রাচুর্য্য নাই যে জন্য বাহ্য দৃশ্যবস্তুসমূহ সম্পর্কে সেই চেতনার সাক্ষ্যেই আস্থা স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সত্য বলিব ; চেতনার দ্বারা অনুভূত মনোময় বা অতীন্দ্রিয় দৃশ্যবস্তু সকল যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে দৃশ্যমান জড় জগৎ মিথ্যা হইবে না কেন ? প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিয়া এবং বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং পরীক্ষা দ্বারা তাহা সমর্থিত হইলে তবে তাহাকে খাঁটি সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ; কিন্তু তাহা বলিয়া সত্যকে পরীক্ষা বা যাচাই করিয়া দেখিবার পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রে এক হইতে পারে না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বস্তুর বেলায় যে প্রমাণ পদ্ধতি নিখুঁতভাবে সার্থক, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের পক্ষে সে পদ্ধতি চলিতে পারে না। অন্তরের অনুভবকে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কাছে সাক্ষ্য দিবার জন্য হাজির করা যায় না ; তাহার নিজস্ব দৃষ্টিধারা আছে, এবং প্রামাণ্য সিদ্ধির অন্তরগত উপায় আছে ; তেমনি তাহাদেব বিশিষ্ট প্রকৃতির জন্য জড়াতীত বা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সমূহকে জড় এবং ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ী মনের আদালতে বিচারের জন্য হাজির করা চলে না, যদি তাহারা নিজেকেই জড়ের ক্ষেত্রের মধ্যে অভিক্ষিপ্ত (projected) না করে ; কিন্তু তখনও তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করিবার খাঁটি সামর্থ্য জড়াশ্রয়ী মনের নাই, তাই সে মন কোন রায় দিলেও তাহাকে সতর্কভাবেই গ্রহণ করিতে হয়। জড়াতীত বস্তুর বাস্তবতা নির্দ্ধারণের জন্য অন্য ধরণের বোধশক্তি প্রয়োজন, তাহাদের সত্য স্বরূপ এবং প্রকৃতি জানিবার জন্য তদনুরূপ সূক্ষ্মভাবের পরীক্ষা এবং বিচারের অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়।

তত্ত্বের বিভিন্ন স্তর বা ভূমি আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় জগৎ তাহাদের মধ্যের একটা ভূমিমাত্র। প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়ের নিকট সুস্পষ্ট বলিয়া বহির্মুখী জড়াশ্রয়ী মনের কাছে জড় জগৎ সত্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, কিন্তু সে মনের কাছে অন্তর্মুখী চেতনার অথবা জড়াতীত বস্তুর, খণ্ড খণ্ড কতকগুলি লক্ষণ, সামান্য একটু আধটু তথ্য ও অনুমান ছাড়া আর কিছু পৌঁছে না, তাই তাহা হইতে যে সিদ্ধান্ত করা হয় তাহা হয় খণ্ড, প্রতিপদে তাহাতে ভুলের সম্ভাবনা

থাকিয়া যায়, অতএব সে মনের পক্ষে জড়াতীত বস্তুকে পূর্ণরূপে জানিবার কোন উপায় নাই। ঘটনার যে রাজ্যে আমাদের অন্তর্মুখী ক্রিয়াবলি এবং অন্তরের অনুভব সমূহ রহিয়াছে তাহা বাহ্য জড় জগতের ঘটনার রাজ্যের মতই সত্য; ব্যষ্টি মন অপরোক্ষ অনুভবের দ্বারা তাহার নিজের মধ্যে যাহা ঘটে তাহার কিছু জানিতে পারে, অপরের চেতনায় কি ঘটে তাহা সাক্ষাৎ ভাবে জানিবার তাহার কোন উপায় নাই, শুধু নিজের সঙ্গে তুলনা এবং বাহির হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে চিহ্ন বা তথ্য সে দেখিতে পায় এবং সেই অসম্পূর্ণ চিহ্ন এবং তথ্য হইতে যে অনুমান সে করিতে পারে তাহাদের দ্বারা অপরের চেতনার বৃত্তি সম্বন্ধে একটা অতি অপূর্ণ ধাবণা সে গড়িয়া তোলে। এই জন্য অন্তর্দৃষ্টিতে আমি আমার কাছে সত্য হইলেও অপরের জীবন আমার দৃষ্টির অগোচর, আমার মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের পরে তাহাদের যে ছাপ পড়ে তাহা দিয়া আমরা তাহার পরোক্ষ সত্য শুধু অনুভব করি। মানুষের জড়াশ্রয়ী মন এই সীমার মধ্যে নিবদ্ধ, তাই পূর্ণরূপে শুধু জড়কে বিশ্বাস করাই তাহাব মজ্জাগত অভ্যাসে পবিণত হইয়াছে; যাহা তাহার নিজের অনুভব বা বুদ্ধির সীমার মধ্যে আসে না অথবা যাহা তাহার বিদ্যার মাপকাঠিতে মাপা যায় না বা তাহার অর্জিতজ্ঞানের সমষ্টির সহিত মিলে না তাহাকে সন্দেহ এবং তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিতে সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

এই অহংকেন্দ্রিক চেতনাকে জ্ঞানের প্রামাণিকতার খাঁটি মাপকাঠি করিবার এই একটা প্রবৃত্তি আধুনিক কালে দেখা দিযাছে; প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে এই মতকে যেন স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে যে, সকল সত্যকেই প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত মন, বুদ্ধি এবং অনুভবের নিকট বিচারের জন্য উপস্থিত করিতে হইবে অথবা সাধারণ বা সার্ব্বজনীন অনুভবের দ্বারা সমর্থিত বা অন্ততপক্ষে সমর্থনযোগ্য না হইলে কোন সত্যই প্রামাণিকতার সনদ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু সত্য বা জ্ঞানকে এই মাপকাঠি দ্বারা বিচার করা স্পষ্টতঃই ভুল; কেননা তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে এ বিষয়ে সাধারণ বা মাঝামাঝি প্রাকৃত মন এবং তাহার সীমিতসামর্থ্য এবং অনুভবই সর্ব্বেসর্ব্বা, এবং যাহা অতীন্দ্রিয় বা মাঝামাঝি বুদ্ধির অগোচর, সত্যাসত্য নির্ণয়ে তাহার কোন স্থান নাই। ব্যষ্টিব্যক্তিই সব কিছুর একমাত্র বিচারক, চরমে এ দাবি একটা অহংগত ভ্রম এবং জড়গত মনের একটা কুসংস্কার, জনসাধারণের মনের একটা স্থুল এবং বর্ব্বর ভ্রান্তি। এ মনোভাবের পিছনে এই সত্যটুকু আছে যে প্রত্যেক মানুষকে

নিজের সামর্থ্য অনুসারে নিজে ভাবিতে নিজে জানিতে হইবে, কিন্তু তাহার সিদ্ধান্ত তখনই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার যোগ্য হইবে যখন সে বৃহত্তর সত্যকে জানিবার এবং তাহার কাছে নিজেকে উন্মীলিত করিবার জন্য প্রস্তুত ও উৎসুক হইয়াছে। যুক্তি দেখানো হয় যে, জড়গত মাপকাঠি যদি বর্জন করি ব্যক্তিগত বা সার্ব্বজনীন ভাবে বিচার করিয়া প্রামাণ্য স্থির করিবার পদ্ধতি যদি ছাড়িয়া দিই তবে বিষম ভ্রান্তিতে পতিত হইব, অপরীক্ষিত অসমর্থিত সত্য এবং মনোময় কল্পনা বা অপচ্ছায়াকে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিব। কিন্তু জ্ঞানানুসরণের পথে ভ্রম, বঞ্চনা, অনুসরণকারীর ব্যক্তিগত সংস্কার বা মনোময় কল্পনা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, জড়গত বা বস্তুনিষ্ঠ মাপকাঠি এবং পদ্ধতিতেও সে সমস্ত বর্জিত হয় না। ভুল হইতে পারে বলিয়া সত্য আবিষ্কা-রের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইবে একথা যুক্তিযুক্ত নয়; অন্তর্জগতের সত্যকে জানিতে হইলে, অন্বেষণ পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার পদ্ধতিও হইবে মনোময় এবং অন্তর্দৃষ্টিমূলক; যে পদ্ধতিতে আমরা জড় বস্তুর বিশ্লেষণ করি অথবা জড় শক্তির ক্রিয়াধারা নির্ণয় করি সে পদ্ধতি এখানে খাটিবে না, জড়াতীত বিষয়ের গবেষণার জন্য উপযোগী উপায় ও পদ্ধতি আমাদিগকে বাহির এবং গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা আমাদের পরীক্ষা কার্য্য চালাইতে হইবে।

ইউরোপ এক সময় ধর্ম্ম-সংস্কারের মূঢ়তাবশতঃ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তারের বিরোধিতা করিযাছিল, প্রাক্তন কোন সংস্কার বা ধারণার বশে যদি আমবা সত্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হইতে অস্বীকার করি তাহা হইলে আমাদিগকেও তদনুরূপ মূঢ়তা পাইয়া বসিবে এবং জ্ঞানের প্রসারতার পথে বাধা সৃষ্টি করিবে। অন্তর্জগতের বৃহত্তম আবিষ্কার সমূহ, স্বয়ম্ভূ সৎস্বরূপ আত্মার অনুভব, বিশ্বচেতনা, মুক্ত আত্মার অন্তরের প্রশান্তি, মনের সঙ্গে মনের সাক্ষাৎ সংযোগ ও তজ্জনিত প্রভাববিস্তার, চেতনার সঙ্গে চেতনার বা বিষয়ের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হেতু তাহাদের অপরোক্ষ জ্ঞান এবং যাহার প্রকৃত মূল্য আছে এমন আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকাংশকে সাধারণ প্রাকৃত মনেব আদালতে হাজির করা যায় না, কেননা সে মনের এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে কোন অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা নাই, সে মন নিজের অভিজ্ঞতার অভাব বা অনু-ভূতির অসামর্থ্যই তাহাদের অস্তিত্ব না থাকার অথবা তাহাদের প্রামাণিকতা-হীনতার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে। মনের আদালতে বাহ্যবস্তু পর্য্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল স্থূলজগতের সত্য, সূত্র বা আবিষ্কারকে শুধু উপস্থিত করা

যাইতে পারে কিন্তু সেখানেও খাঁটিভাবে বুঝিতে বা বিচার করিতে হইলে শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা মনের শক্তিকে পূর্ব্বেই উদ্বোধিত করিয়া তোলা চাই ; আপেক্ষিকতা বাদের (Theory of relativity) মধ্যে যে গণিতের প্রয়োগ আছে তাহা অথবা অন্য কোন দুরূহ বৈজ্ঞানিক সত্য কোন অশিক্ষিত মন বুঝিতে বা সে সমস্ত সত্যের ফল বা তাহাদের আবিষ্কার-পদ্ধতিব প্রামাণিকতা বিচার করিতে পারে না। অবশ্য সকল তত্ত্ব বা সকল অনুভব কেবল উদ্বোধিত শক্তি-যুক্ত সেই বা তদনুরূপ মনের অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় পাশ হইলে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ; ঠিক তেমনি ভাবে বস্তুতঃ প্রত্যেক লোকই কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিতে পারে, তাহার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পরীক্ষা দ্বারা নিজেই তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারে কিন্তু তাহা করা সম্ভব হইবে তখনই যখন সে-সামর্থ্য সাধনার দ্বারা সে অর্জন করিয়াছে অথবা যাহাতে সে অনুভূতি এবং পরীক্ষা-প্রণালীর অন্তরে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারে, অনুশীলনেব ফলে এমন অবস্থা লাভ করিয়াছে। সত্যের এই প্রাথমিক সহজ বদ্ধিগম্য কথাটা একবার তোলাব প্রয়োজন হইয়াছে এই জন্য যে কিছুদিন যাবৎ এই সহজ সত্যের একটা বিপরীত ধারণা মানুষের চিত্ত অধিকার করিয়াছে ; সে-ধারণার শক্তি অল্পে অল্পে কমিয়া আসিতে থাকিলেও, তাহা জ্ঞানের বিপুল প্রদেশ জয়ের যে সম্ভাবনা মানুষের আছে তাহাকে ব্যাহত করিযাছে। মানবাত্মার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন এই যে জড়াশ্রয়ী মন এবং সংকীর্ণ ও বাহ্য স্থূল বস্তুর কারাগার হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া এমন স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে যাহাতে সে অন্তর্জগতের বা অধিমানস সত্যের, আধ্যাত্মিক অনুভূতির এবং এখনও যাহা তাহার কাছে অতিচেতন রহিয়াছে সেই তত্ত্বের গভীবতা পরিমাপ করিতে পারিবে ; শুধু এই পথেই আমাদের মনন যে অবিদ্যার মধ্যে বাস করে তাহার পাশ ছিন্ন হইবে এবং আমরা পূর্ণ চেতনার উদার ক্ষেত্রে সত্য এবং পূণ আত্মোপলব্ধি এবং আত্মজ্ঞানের মধ্যে মুক্তি পাইব।

পূর্ণজ্ঞান মানুষের কাছে এই দাবি করে যে সে চেতনা এবং অভিজ্ঞতার সম্ভাবিত সকল রাজ্যে বিচরণ করিয়া তত্তৎস্থানের সকল বস্তুকে অনাবৃত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিবে। কেননা এই বাহ্য স্তরের অন্তরালে আমাদের সত্তার অন্তশ্চেতনার এক বিপুল সমুদ্র আছে ; তাহারও গভীরে ডুবিয়া অনুভবের যে সমস্ত রত্ন আহরণ করিতে পারিব তাহা দিয়া আমাদের সমগ্র জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। অন্তরের মধ্যে মানব-

চেতনার আধ্যাত্মিক অনুভবের এক বিশাল দেশ আছে, সে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে,তাহার সুদূরতম প্রদেশে ও গভীরতম গুহায় অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে। জড়াতীত এবং জড় সত্তা সমান ভাবেই সত্য, জড়াতীতের জ্ঞান পূর্ণ জ্ঞানেরই অংশ। জড়াতীতের জ্ঞানকে আমরা ভাবকালি (mysticism) বা রহস্য-বিদ্যার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখি, রহস্য-বিদ্যাকে কুসংস্কার এবং আজগুবী কাণ্ড মনে করি, তাহাকে ভ্রমের এলাকায় ফেলি, এবং তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করি। কিন্তু যাহা রহস্যাবৃত তাহাও তো সত্তার একটা অংশ, কিন্তু প্রকৃত রহস্যবিদ্যাব অনুশীলন জড়াতীত সত্যসমূহের আবিষ্কারের এবং বহিঃস্তরে স্পষ্টভাবে যাহা দেখা যায় না, সত্তা এবং প্রকৃতির সেই সমস্ত গোপন বিধানের আববণ উন্মোচনেব চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নহে। মন প্রাণ ও সূক্ষ্ম ভূত এবং তাহাদের শক্তির যে সমস্ত গোপন নিয়ম প্রকৃতি এখনও বহিশ্চেতনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের গোচর করে নাই, রহস্যবিদ্যা তাহাদের মর্ম্মসত্য নির্ণয়ের চেষ্টায়ই বাহির হইয়াছে, যাহাতে মানবাত্মার প্রভুত্ব দেহ-প্রাণ-মনের সাধারণ কার্য্যধারাকে অতিক্রম করিয়া অধিকতর বিস্তৃত হয় তজ্জন্য রহস্যবিদ্যা প্রকৃতির এই সমস্ত গোপন সত্য এবং শক্তির প্রয়োগও কবিতে চায়। চিৎ-জগৎ বহিশ্চর মনের কাছে রহস্যাবৃত,কেননা তথাকার অনুভব অপ্রাকৃত এবং অতীন্দ্রিয়; কিন্তু এই বহস্য লোকেই আমরা চিন্ময় আত্মার সন্ধান পাই, শুধু তাহাই নহে, অধ্যাত্মচেতনা এবং আত্মার শক্তির, চিন্ময় জ্ঞানের ও চিন্ময় কর্ম্মধারার যে আলোক আমাদিগকে উপবে তুলিতে, জ্ঞান দান কবিতে এবং যথার্থ পথে পরিচালিত করিতে পারে তাহারও সন্ধান এখানেই পাওয়া যায়। এই সমস্ত বস্তুকে জানা এবং তাহাদের সত্য ও শক্তিকে বিশ্বমানবের জীবনে সংক্রামিত করা প্রকৃতি-পরিণামের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। বলিতে গেলে জড়বিজ্ঞানও তো এক প্রকার রহস্যবিজ্ঞান; কেননা ইহা প্রকৃতির গোপন সূত্র বা সত্য আবিষ্কার কবিয়া প্রকৃতি এখনও তাহার সাধারণ কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে যাহা অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় নাই সেইরূপ কর্ম্মধারাকে মুক্ত করিবার জন্য এবং প্রকৃতির গোপন সত্য শক্তি এবং ক্রিয়া-পদ্ধতিকে মানুষের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য সে জ্ঞান ব্যবহার করিতে পারে; ইহাও ত জড়ের ক্ষেত্রের একটা বিরাট ইন্দ্রজাল; কেননা ইন্দ্রজাল সত্তার গোপন সত্য, প্রকৃতির গোপন শক্তি এবং ক্রিয়াধারার প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কি ইহাও হয় ত দেখা যাইবে যে জড়ের জ্ঞানকে পূর্ণ করিবার জন্য জড়াতীত বিদ্যার প্রয়োজন আছে,

কেননা জড়প্রকৃতির ক্রিয়াধারার পশ্চাতে একটা জড়াতীত উপাদান, মনোময় প্রাণময় এবং চিন্ময় শক্তি ও ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে, জড়াতীত বিদ্যা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সে-সমস্ত আমরা ধরিতে পারি না।

বস্তু বা বিষয়গত তত্ত্বকে একমাত্র অথবা মৌলিক সত্য বলিয়া মানিতে হইবে এই জিদের মূলে আছে 'জড়ই বিশ্বের মূল সত্য' এই বোধ; কিন্তু এখন ইহা স্পষ্ট হইয়াছে যে জড় কখনও মূল সত্য বস্তু হইতে পারে না, জড় শক্তি দিয়াই গঠিত; এমন কি আজকাল এমন একটা সন্দেহও উপস্থিত হইতেছে যে গোপন এক মন বা সচেতন শক্তির ক্রিয়া ছাড়া এই জড় শক্তির ক্রিয়া এবং বিসৃষ্টির ব্যাখ্যা হইতে পারে না, সেই শক্তির সূত্র বা বিধান হয়ত জড় শক্তির ক্রিয়া এবং গঠনের ধারা রূপে দেখা যাইতেছে। অতএব আজকালকার যুগে জড়ই একমাত্র সত্যবস্তু একথা আর বলা চলে না। জড়কে দিয়া সকল জিনিসের ব্যাখ্যা করিবার জন্য অতীতে যে জড়বাদ আসিয়াছিল তাহা বিশ্বের একদিকে, শুধু জড়ত্বের দিকে মানুষের চেতনার এক ঐকান্তিক অভিনিবেশের ফলেই দেখা দিয়াছিল, এ অভিনিবেশের একটা উপযোগিতা ছিল, সুতরাং তাহা গ্রাহ্য হইয়াছিল, আধুনিক কালে জড়বিজ্ঞানের অনেক বৃহৎ এবং অগণিত সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী তত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা এ অভিনিবেশ নিজেকে সমর্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু একদেশদর্শী এক ব্যতিরেকী (exclusive) জ্ঞান দিয়া সত্তার সমগ্র সমস্যা সমাধান করা যায় না, আমাদিগকে যেমন জড় ও তাহার ক্রিয়া-পদ্ধতি তেমনি প্রাণ মন এবং তাহাদের ক্রিয়া-পদ্ধতিও জানিতে হইবে, আরও জানিতে হইবে জড়ের বহিঃস্তরের অন্তরালে চিৎপুরুষ বা আত্মা বা অন্য যাহা কিছু আছে সে সমস্ত; কেবল তখনই আমরা সমস্যা-সমাধানের উপযোগী পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিব। এই জন্যই যে-সমস্ত মতবাদ প্রাণ অথবা মনকে প্রধান বা একান্তভাবে গ্রহণ করিয়া প্রাণ বা মনকেই একমাত্র মূল সত্যবস্তু বলিতে চাহিতেছে তাহাদের ভিত্তিতেও এমন প্রসারতা নাই যাহার জন্য তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারি। এমন একান্তবাদীর ঐকান্তিক অভিনিবেশের ফলে প্রাণ অথবা মনের অনেক সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় তত্ত্বের আবিষ্কার হয়ত সম্ভব হইতে পারে কিন্তু তাহাতে বিশ্বসমস্যার পূর্ণ সমাধান হয় না। আবার ইহাও হইতে পারে যে অধিচেতন সত্তার প্রতি প্রধান বা ঐকান্তিক ভাবে অভিনিবিষ্ট হইলে এবং সেই সঙ্গে বহির্জগৎকে অন্তর্জগতের একমাত্র সত্যের বহিঃপ্রকাশের জন্য প্রতীক মাত্র মনে করিলে, অধিচেতনার তত্ত্ব

এবং তাহার ক্রিয়াধারার উপর অত্যুজ্জ্বল আলোক পড়িবে এবং মানুষের শক্তি বহুগুণ প্রসারতা লাভ করিবে, কিন্তু কেবল তাহাতে আমাদের সমস্যার পূর্ণ সমাধান হইবে না, সত্যবস্তুর পূর্ণ জ্ঞানে আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিবে না। আমাদের মতে চিৎপুরুষ বা আত্মাই বিশ্বের মূল সত্য; কিন্তু যদি এই মূল সত্যের উপরে ঐকান্তিকভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া জড় প্রাণ মনের সকল সত্যকে বর্জন করি অথবা তাহাদিগকে যদি আত্মার উপর একটা আরোপ মনে করি কিম্বা চিতের একটা অবাস্তব ছায়ামাত্র মনে করি তবে তাহা হয় ত স্বাধীন ও মৌলিক আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভে সাহায্য করিবে কিন্তু তাহার ফলেও বিশ্ব বা ব্যক্তিসত্তার সত্য সম্বন্ধে পূর্ণ প্রামাণিক সমাধান সম্ভব হইবে না।

সৎ-স্বরূপের প্রত্যেক বিভাবের সত্য পৃথক রূপে জানা এবং প্রত্যেকের সঙ্গে সর্ব্বের এবং সর্ব্বের সহিত চিৎস্বরূপের সকল সম্বন্ধ সকল দিক হইতে সম্যক্‌ভাবে জানাই হইল অখণ্ড পূর্ণজ্ঞান। বর্ত্তমানে আমরা অবিদ্যাচ্ছন্ন, কিন্তু বহুমুখী জ্ঞান-পিপাসা আমাদের আছে; মানুষ সব কিছুর সত্যই জানিতে চায়; এই জন্য দেখা যায় যে, যে মূল সত্য বিশ্বের অপর সকল সত্যের ব্যাখ্যা দিতে পারিবে, যে সত্য সকল বস্তুর ভিত্তি, তাহার সম্বন্ধে মানুষ নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে কত বিচিত্র কল্পনা জল্পনা করিয়াছে এবং করিতেছে, কিন্তু বস্তুর স্বরূপ বা মূলগত সত্যের সাক্ষাৎ তখনই মিলিবে যখন মূল সার্ব্বভৌম অনাদি সত্যবস্তুকে সে আবিষ্কার করিতে পারিবে; তাহাকে আবিষ্কার করিলে দেখিতে পাইবে যে তাহা সর্ব্বকে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্ব কিছুর ব্যাখ্যাতারূপে বর্ত্তমান,—"যাহাকে জানিলে সব কিছু জানা হইয়া যায়" (যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি), সেই মূল সত্যবস্তু নিশ্চয়ই সর্ব্বভাব বা সর্ব্ব সত্য এবং সর্ব্ব বস্তুর স্বরূপ এবং আধাব ও আশ্রয়স্থল হইবে তাহার মধ্যে থাকিবে ব্যষ্টির সত্য, বিশ্বের সত্য এবং যাহা কিছু বিশ্বাতীত তাহার সত্য। সত্যবস্তুকে খুঁজিবার এই আকূতির জন্য মানুষ জড় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার উচ্চতর তত্ত্বের প্রত্যেককে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "তুমিই কি আমার সেই পরম ঈপ্সিত বস্তু", ভুল বোধি দ্বারা চালিত হইয়া যে মানুষ ইহা করিতেছে তাহা সত্য নহে। এ জন্য তাহার পক্ষে প্রয়োজন, শেষ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া চলা এবং অনুভবের উচ্চতম এবং চরম স্তরকেও পরীক্ষা করা।

কিন্তু অবিদ্যা হইতে যাত্রা করিয়া আমরা জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতেছি

বলিয়া প্রথমে আমাদিগকে অবিদ্যার গোপন প্রকৃতি কি এবং তাহার পূর্ণ প্রসারের সীমা কোথায় তাহা জানিতে হইবে। দেশ ও কালের ক্ষেত্রে জড়-জগতে পরস্পর হইতে পৃথকভাবে ভেদের মধ্যে আছি বলিয়া আমাদিগকে যে অবিদ্যার মধ্যেই সাধারণতঃ বাস করিতে হইতেছে তাহাকে যদি বিচার করিতে চাই তবে যে দিক দিয়াই বিচারে অগ্রসর হই না কেন আমরা দেখিতে পাই যে তাহার অন্ধকারময় দিকটা বহুমুখী এক আত্মজ্ঞানহীনতা ছাড়া আর কিছু নয়। যে চরম এবং পরম তত্ত্ব সকল সত্তা এবং সকল সম্ভূতির মূল উৎস তাহাকে আমরা জানি না, সত্তার কতকগুলি খণ্ড তথ্য এবং সম্ভূতির কালগত সম্বন্ধকেই আমরা অস্তিত্বের সমগ্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, ইহাই হইল আমাদের প্রথম ও মৌলিক অবিদ্যা। দেশ কালাতীত নিষ্ক্রিয় অক্ষর আত্মাকে আমরা চিনি না, দেশে ও কালে বিশ্ব-সম্ভূতির মধ্যে যে ক্রিয়া এবং পরিবর্ত্তন নিত্য চলিতেছে তাহাই অস্তিত্বের সমগ্র তত্ত্ব মনে করি, ইহা হইল আমাদের দ্বিতীয় বা বিশ্বগত অবিদ্যা। আমবা আমাদের নিজেদের বিশ্বরূপ, বিশ্ব চেতনা, বিরাট সার্ব্বভৌম সত্তাকে চিনি না, জানি না যে সকল সত্তা সকল সম্ভূতির সহিত আমরা অনন্তরূপে একীভূত, আমাদের অহঙ্কার, বিমূঢ় সীমিত মন প্রাণ এবং দেহকেই আমরা আমাদের খাঁটি আত্মা মনে করি এবং তাহা ছাড়া অন্য সব কিছুকে অনাত্মা বলিয়া দেখি, এই হইল আমাদের তৃতীয় বা অহংগত অবিদ্যা। অনন্তকালের মধ্যে যে আমাদের শাশ্বত সম্ভূতি আছে তাহা আমরা জানি না, দেশের এক ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে কালের অতি সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে আমাদের এই যে দুদিনের ক্ষুদ্র জীবন ইহাকেই আমরা আমাদের আদি, মধ্য এবং অন্ত বলিয়া গ্রহণ করি, ইহাই হইল চতুর্থ বা কালগত অবিদ্যা। এমন কি আমাদের এই সঙ্কীর্ণ কালগত সম্ভূতির মধ্যেও আমাদের বৃহত্তর এবং বিচিত্র জটিল সত্তার, আমাদের বহিশ্চর সম্ভূতির অন্তরালে অবস্থিত অতিচেতনা, অবচেতনা, অন্তশ্চেতনা এবং পরিচেতনার (circumcient) বিশাল রাজ্যের পরিচয় আমরা অবগত নহি; দৃশ্যমান মনোময় অনুভবের সামান্য পুঁজির সহিত আমাদের বহিশ্চর সম্ভূতিকে আমাদের অস্তিত্বের সবখানি মনে করি; এই হইল পঞ্চম বা মনোগত অবিদ্যা। সম্ভূতিতে আমরা কি দিয়া গঠিত তাহাও খাঁটিভাবে জানি না, কখনও দেহকে কখনও প্রাণকে কখনও মনকে আবার কখনও ইহাদের যে কোন দুই অথবা তিনকেই আমাদের আধারের মূলতত্ত্ব বা আমরা যাহা তাহার সবকিছু বলিয়া মনে করি; যাহা দেহ মন প্রাণকে গঠিত

এবং প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, গোপনে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং যাহা একদিন উন্মিষিত হইয়া তাহাদের ক্রিয়াধারা আপনার বশে আনিয়া পরিচালিত করিবে ইহাই নিয়তির নির্দ্দেশ, তাহাকে আমরা জানি না ; ইহাই হইল আমাদেব ষষ্ঠ বা গঠনগত বা আধারগত অবিদ্যা। এই সমস্ত অবিদ্যার ফলে আমরা প্রকৃত জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হই, আমাদের জগৎ-জীবনকে আপন বশে আনিতে বা ভোগ করিতে পারি না, আমাদের ভাবনা, সঙ্কল্প, সংবেদন এবং ক্রিয়াতে অবিদ্যাচ্ছন্ন থাকি, জগৎ প্রশ্নরূপে নিয়ত যে অভিঘাত আমা-দিগকে দিতেছে প্রতিপদে তাহার ভুল বা অপূর্ণ জবাব দিই ; ভ্রম এবং বাসনা, প্রয়াস এবং ব্যথতা, সুখ এবং দুঃখ, পাপ এবং স্খলনের গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়া মরি, কুটিল পথে চলি, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য অন্ধের মত হাতড়াইয়া বেড়াই—এই হইল আমাদের সপ্তম বা ব্যবহারিক অবিদ্যা।

অবিদ্যার ধারণা দ্বারাই আমাদেব বিদ্যা বা জ্ঞানের ধারণা নিরূপিত হইবে এবং তাহা হইতেই মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও বিশ্বক্রিয়াধারার লক্ষ্য কি তাহা জানা যাইবে, কেননা আমাদেব অবিদ্যা যদিও জ্ঞানকে অস্বীকার করিতেছে তবুও সেই সঙ্গেই সে সর্ব্বদা তাহাকে খুঁজিতেছে। তাহা হইলে পূর্ণ জ্ঞানের অর্থ হইবে এই সপ্ত অবিদ্যার মধ্যে যাহা নাই বা যাহাকে তাহারা অস্বীকার করিতেছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া তাহাদের বর্জন এবং আমাদের চেতনায় আত্মজ্ঞান বা আত্মজ্যোতির সপ্তধা প্রকাশ :—পূর্ণ জ্ঞানে আমরা সর্ব্ব মূলাধার চবম নিত্যবস্তু বা পরম ব্রহ্মকে জানিব, আত্মা বা চিন্ময় পুরুষকে জানিব এবং সেই সঙ্গে জানিব বিশ্ব সেই আত্মারই সম্ভূতি, চিন্ময় সত্তার লীলা, চিৎপুরুষের আত্মপ্রকাশ, জানিব যে আমাদের প্রকৃত আত্মার চেতনায় আমরা বিশ্বের সহিত এক, সুতরাং যে ভেদজ্ঞানে এবং বিবিক্ত অহংএর জীবনে আমরা পৃথক হইয়া পড়িয়াছি তাহা দূর করিব ; জানিব যে আমাদের চৈত্য সত্তা কালের ক্ষেত্রে অমরত্ব এবং অমৃতত্বময়, তাহা মৃত্যু ও পার্থিব সত্তার অধিকার বহির্ভূত, জানিব যে বহিস্তরের পশ্চাতে আমাদের অন্তরতর এবং বৃহত্তর সত্তা আছে, জানিব যে আমাদের মন প্রাণ দেহের সঙ্গে আমাদের অন্তরাত্মার এবং তাহাদের উপরে যে অতিচেতন চিন্ময় অতিমানস সত্তা আছে তাহার সত্য সম্বন্ধ কি ; অবশেষে জানিব কিরূপে আমাদের ভাবনা, সঙ্কল্প এবং ক্রিয়ার সমন্বয় ও সুষমার পূর্ণ যথাযথ ব্যবহার দ্বারা আমরা আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে

আত্মা, দিব্য চিৎপুরুষ বা অখণ্ড চিন্ময় সত্য স্বরূপের সত্যের সচেতন প্রকাশ-রূপে পরিণত করিতে পারিব।

কিন্তু ইহা বুদ্ধিগত জ্ঞান নহে, সুতরাং আমাদের চেতনার বর্ত্তমান ছাঁচ যতদিন বজায় থাকিবে ততদিন এ জ্ঞানকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত কবা যাইবে না; সে জন্য চাই দিব্য অনুভূতি, এক নূতন ভাবের সম্ভূতি, সত্তা ও চেতনার রূপান্তর। এই কথায় সম্ভূতির প্রকৃতিতে যে পরিণতির ধারা আছে এবং আমাদের পরিণতির পথে আমাদের মনোময় অবিদ্যা যে একটা ধাপ মাত্র এই সিদ্ধান্ত মনে পড়ে। অতএব পূর্ণজ্ঞান আমাদের সত্তা এবং প্রকৃতির ক্রমপরিণতির পথেই কেবল আসিতে পারে এবং মনে হয় পরিণতি-পথে অন্য যে সমস্ত রূপান্তর হইয়াছে তাহাদের মত তাহা কালের অতি মন্থর ধারার মধ্য দিয়াই আসিবে। কিন্তু এই অনুমানের বিরুদ্ধে এই তথ্যের উল্লেখ করা চলে যে পরিণতির ধারা এখন সচেতন হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বে যেমন অবচেতন ভাবে পরিণতি চলিয়াছে বর্ত্তমানে তাহার ক্রিয়াধারা এবং ধাপসমূহ ঠিক তেমনি প্রকৃতিরই হইবে, ইহা ঠিক না হইতে পারে। চেতনার রূপান্তর হইতেই যখন পূর্ণজ্ঞান আসিবে, তখন যে ধারা ধরিয়া পূর্ণজ্ঞান আসিবে তাহার মধ্যে আমাদের সঙ্কল্প এবং সাধনার একটা স্থান থাকিবে; সে ধারাব মধ্যে সঙ্কল্প ও সাধনা তাহাব বিশিষ্ট ক্রিয়া ও পদ্ধতি আবিষ্কার এবং তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারিবে; তখন সচেতন আত্মরূপান্তর দ্বারাই পূর্ণজ্ঞান আমাদের মধ্যে উন্মিষিত এবং পুষ্ট হইবে। সুতরাং এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে পরিণামের এই নূতন ধারায় তত্ত্ব কি হওয়া সম্ভব এবং তাহাতে যে পূর্ণ জ্ঞান অপরিহার্য্য রূপে উন্মিষিত হইবে তাহার ক্রিয়া এবং গতি কি হইবে অর্থাৎ দিব্য জীবনের ভিত্তি হইবে যে চেতনা কি হইবে তাহার প্রকৃতি এবং কি করিয়া সে জীবনকে ফুটাইয়া তোলা যাইবে অথবা সে নিজে ফুটিয়া বা মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে, অথবা বলা যাইতে পারে যে বাস্তবে পরিণত হইবে বা সিদ্ধ হইয়া উঠিবে।

ষোড়শ অধ্যায়

পূর্ণ জ্ঞান এবং জীবনের উদ্দেশ্য

সিদ্ধান্ত চতুষ্টয়

হৃদয়ে যে সমস্ত বাসনা সংসক্ত হইয়া থাকে কোন মর্ত্ত্য যখন তাহা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে তখন সে অমৃত হয় এবং এইখানেই শাশ্বত ব্রহ্মকে লাভ করে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪।৪।৭

সে ব্রহ্ম হয় এবং ব্রহ্মে মিশিয়া যায়।

বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬

এই অশরীরী ও অমৃত প্রাণ এবং তেজই ব্রহ্ম

বৃহদারণ্যক ৪।৪।৭

প্রাচীন পন্থা দীর্ঘ এবং সংকীর্ণ, আমি সে পথ স্পর্শ করিয়াছি, সে পথের সন্ধান পাইয়াছি, সেই পথে ব্রহ্মবিদ ধীর জ্ঞানীরা বিমুক্ত হইয়া, এখান হইতে উর্দ্ধতন স্বর্গলোকে প্রযাণ করেন।

বৃহদারণ্যক ৪।৪।৮

আমি পৃথিবীর পুত্র, ভূমি আমার মাতা।...পৃথিবী যেন তাহাব বিচিত্র সম্পদ এবং গোপন ধনরাজি আমাকে দান কবেন।...হে পৃথিবী, তোমার গ্রামে এবং বনে, সভায় এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে, তোমার যে মাধুরী আছে আমরা যেন তাহাব কথা বলিতে পারি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।১২, ৪৪, ৫৬

অতীত এবং ভবিষ্যতের ঈশ্বরী পৃথিবী আমাদের জন্য বিপুল জগৎ যেন প্রস্তুত করেন। ...যিনি সমুদ্রে জল হইয়াছিলেন, মনীষীরা তাঁহাদের জ্ঞানের মায়ায় যাঁহার পথ অনুসরণ করেন, পরম ব্যোমে যাঁহার অমৃতময় হৃদয় সত্যে আবৃত হইয়া আছে সেই পৃথিবীই সেই উচ্চতম রাজ্যে আমাদের জন্য তেজ ও বল প্রতিষ্ঠিত করুন।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।১,৮

পূর্ণ জ্ঞান এবং জীবনের উদ্দেশ্য

হে অগ্নি, তুমি দিনে দিনে দিব্য জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মর্ত্ত্যকে পরম অমৃতে প্রতিষ্ঠিত কর, যাহার উভয় জন্মের জন্য তৃষ্ণা জাগিয়াছে সেই দ্রষ্টার জন্য দিব্য আনন্দ এবং মানুষী সুখ সৃষ্টি কর।

ঋগ্বেদ ১।৩১।৭

হে দেব, অনন্তকে (অদিতিকে) আমাদের জন্য রক্ষা কর এবং সান্তকে (দিতিকে) আমাদের মধ্যে ঢালিয়া দাও।

ঋগ্বেদ ৪। ২।১১

চেতনার ঊর্দ্ধ্ব পরিণামের তত্ত্ব এবং ধারা কি তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পূর্ণ জ্ঞানের সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সত্যবস্তু এবং তাহার বিসৃষ্টির মূলতত্ত্বগুলি কি এবং কার্য্যকরী দিক এবং সক্রিয় বিভাব বলিয়া যাহা স্বীকার করি কিন্তু জগৎ ও জীবনের পূর্ণ সমাধানের উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, সে সমস্তই বা কি এই সমস্ত বিষয়ের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন আছে। কারণ জ্ঞানের সত্যের উপরই আমাদের জীবন-সত্যের ভিত্তি স্থাপন এবং তাহা দ্বারাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে হইবে; এখানে পরিণতির ধারা আদি নিশ্চেতনার মধ্যে গোপনভাবে অবস্থিত সত্তার সত্যেরই ক্রমিক বিকাশ; এক উন্মিষন্ত চেতনা এ সত্যকে নিশ্চেতনা হইতে বাহিরে আনিয়া প্রকাশ করে এবং সে চেতনা তাহার আত্মউন্মিলনের ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া অবশেষে নিজের মধ্যে বস্তুর পূর্ণ সত্য এবং পূর্ণ আত্মজ্ঞানকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। যে সত্য হইতে পরিণতির ধারা আরম্ভ হয় এবং যাহাকে রূপায়িত করিয়া তোলাই পরিণতির লক্ষ্য সেই সত্যের প্রকৃতির উপর পরিণতির গতি-ধারা নির্ভর করে, তাহাই তাহার ক্রিয়াধারার পর্ব্বগুলি এবং অর্থ বা মূল্য নিয়ন্ত্রিত করে।

আমরা প্রথমেই বলি যে এক চরম নিত্য বস্তু সব কিছুর উৎস, আশ্রয় এবং গোপন সত্য। এই চরম বস্তু অনির্দ্দেশ্য এবং অনির্ব্বচনীয়, মনের ভাবনা কিম্বা মনের ভাষা দিয়া তাহাকে প্রকাশ করা যায় না; সকল চরম তত্ত্বের মত তিনি স্বয়ম্ভূ ও স্বপ্রকাশ, কিন্তু আমাদের মনের ইতিবাদ বা নেতিবাদ, পৃথক ভাবে অথবা একত্রে তাহাকে সীমিত বা নিরূপিত করিতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা উচিত যে এক অধ্যাত্ম চেতনা, একত্ববোধজাত বা আধ্যাত্মিক এক জ্ঞান আছে, যাহা সেই সত্য বস্তুর স্বরূপ বা মূল বিভাব এবং তাহার প্রকাশিত

শক্তি ও রূপকে ধরিতে পারে। যেখানে যাহা কিছু আছে তাহা এই বিবরণের মধ্যে পড়ে এবং এই জ্ঞান দিয়া তাহাদের নিজ সত্য এবং গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিলে দেখিতে পাইব যে সব কিছুই সেই সত্যবস্তুর আত্মপ্রকাশ, এবং তাহারা সকলেই সত্য। বিসৃষ্টির সত্যও এই সমস্ত মূল বিভাবের মধ্যে স্বয়ম্ভূ-রূপে নিত্য বর্ত্তমান আছে, কেননা সমস্ত মৌলিক সত্য, নিত্য বস্তুর মধ্যে শাশ্বত সত্যরূপে যাহা নিত্য অনুস্যূত আছে, তেমন কিছুরই অভিব্যক্তি; কিন্তু যাহা কিছু মৌলিক নহে, জন্য বা অপর হইতে জাত, যাহা কিছু কালাবচ্ছিন্ন এবং প্রাতিভাসিক, তাহাও যে সত্যকে তাহা প্রকাশ করে তাহারই আশ্রিত রূপ বা শক্তি, সেই সত্যের জন্য তাহাও সত্য, তাহারও তাৎপর্য্যে তাহার অন্তর্নিহিত সত্যেরই অভিব্যঞ্জনা আছে, কেননা তাহাও সেই সত্য বস্তু, আকস্মিক, অমূলক, ভ্রমাত্মক বা ব্যর্থ কোন রূপ নহে। এমন কি যাহা কিছু আবৃত এবং বিকৃত করে—যেমন জগতে মিথ্যা সত্যকে আবৃত ও বিকৃত করে অথবা অশিব শিবকে আবৃত ও বিকৃত করে—তাহাও নিশ্চেতনার সত্য পরিণামরূপে সাময়িকভাবে সত্য, কিন্তু এই সমস্ত বিপরীত রূপ নিজেদের ক্ষেত্রে সত্য হইলেও স্বরূপসত্য নহে তাহাবা বিসৃষ্টির সহায়ক মাত্র তাহারা বিসৃষ্টিরই সাময়িক রূপ বা শক্তিরূপে সৃষ্টিশক্তির সেবাকার্য্য করে। অতএব সেই নিত্যবস্তুর অধিষ্ঠানবশতঃ তাহারই আত্মবিসৃষ্টিরূপে এ বিশ্ব সত্য, এবং বিশ্ব সত্য বলিয়া তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে, যাহাকেই সে রূপায়িত করিয়াছে তাহাও সত্য।

নিত্যবস্তুর আত্মপ্রকাশ হয় দুইরূপে, একটি তাহার স্বয়ম্ভূ সত্তা অপরটি তাহার সম্ভূতি, প্রথম বিভাব মৌলিক সত্য, দ্বিতীয় বিভাব পরিণামী সত্য; সম্ভূতি স্বয়ম্ভূ তত্ত্বেরই সক্রিয় শক্তি ও পরিণাম, সৃষ্টিশীলা শক্তি ও ক্রিয়াধারা; স্বরূপে যিনি অরূপ ও অক্ষর, সম্ভূতি তাহার পরিবর্ত্তনশীল ক্ষরধর্ম্মী অথচ প্রবাহরূপে নিত্য বর্ত্তমান রূপায়ণ বা পরিবর্ত্তনপরম্পরা। সুতরাং যে সব সিদ্ধান্তে সম্ভূতিকে নিজেতে নিজে পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তারূপে অভিহিত করে তাহারা অর্দ্ধসত্য মাত্র, যাহা তাহারা স্বীকার করে এবং দেখে তাহার উপর ঐকান্তিক অভিনিবেশের ফলে লব্ধ বিসৃষ্টির কিছু জ্ঞানের পক্ষে তাহা প্রামাণিক, কিন্তু আর এক দিক দিয়া দেখিলে সে সব সিদ্ধান্তকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা যায়, কেননা স্বয়ম্ভূসত্তা সম্ভূতি হইতে পৃথক নহে, তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান, সেই সত্তাই সম্ভূতির রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অতি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে তাহার

অন্বেয় প্রসার এবং বিস্তারে অনুস্যূত হইয়া সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। সম্ভূতি যখন নিজেকে স্বয়ম্ভূ সত্তা বলিয়া জানিতে পারে তখনই তাহার নিজেকে পূর্ণ-রূপে জানা হয়, সম্ভূতির মধ্যস্থিত আত্মা যখন পরম নিত্যবস্তুকে জানে এবং অনন্ত শাশ্বত সত্তার প্রকৃতি লাভ করে তখনই তাহার আত্মজ্ঞান হয়, সে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। এই আত্মজ্ঞান ও অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আমাদের পরম পুরুষার্থ; কেননা তাহাই আমাদের স্বরূপসত্য, তাই তাহাব জন্য আমাদের এক নিত্য আকূতি আছে, তাহাই আমাদের সম্ভূতিব অপরিহার্য্য পরিণাম; আমাদের সত্তার মধ্যে স্থিত এই সত্য আত্মাব আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন রূপে দেখা দেয়, এই সত্য জড়ের মধ্যে এক গোপন শক্তি, প্রাণের মধ্যে বাসনা ও প্রবৃত্তি, আবেগ ও এষণা, মনের মধ্যে সঙ্কল্প আকূতি প্রয়াস ও অভিপ্রায়ের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে চাহিতেছে; প্রথম হইতেই তাহার মধ্যে গোপনে অব্যক্তভাবে যাহা আছে তাহাকে ব্যক্ত এবং প্রকাশ করাই প্রকৃতি-পরিণামের সমস্ত গোপন প্রবৃত্তির মূল কথা।

সুতরাং বিশ্বাতীত নিত্যবস্তুকে স্থাপিত কবিতে প্রয়াসী দর্শনসমূহ যে সত্যের উপর দাঁড়াইতে চায় আমরা সে সত্যকে স্বীকাব করি; মায়াবাদের চরম সিদ্ধান্তকে আমরা অস্বীকার করি বটে তবু মনের মধ্যস্থ আত্মা বা মনোময় সত্তা যখন সম্ভূতির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া চরম তত্ত্বে পৌঁছিতে বা অনু-প্রবিষ্ট হইতে চায় তখন বাস্তব আধ্যাত্মিক অনুভবের জন্য তাহাকে যে ভাবে দেখিতে বা চলিতে হয় তাহার পন্থারূপে মায়াবাদকেও স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু সম্ভূতি যখন সত্য, অনন্ত শাশ্বত বস্তুর আত্মশক্তির মধ্যে অপরিহার্য্য রূপে যখন তাহা বর্ত্তমান, তখন সম্ভূতিকে ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিয়া যে দর্শন সৃষ্টি হয় তাহাকে পূর্ণ দর্শন বলিতে পারি না। সম্ভূতির মধ্যস্থিত আত্মা যুগপৎ নিজেকে স্বয়ম্ভূসত্তারূপে জানিতে এবং সম্ভূতিকে অধিকার করিতে পারে, সে জানিতে পারে যে, সে নিজে স্বরূপে অনন্ত হইলেও সান্তের মধ্যে অনন্তরূপে তাহার আত্মপ্রকাশ চলিতেছে, তাহারই কালাতীত শাশ্বত সত্তা আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও শাশ্বত কালের মধ্যে অধিষ্ঠান এবং পরিণতিশীল গতিরূপে নিজেকে এবং নিজের ক্রিয়াকেই অনুভব করিতেছে। এই অনুভূতিই সম্ভূতির চূড়ান্ত সীমা, ইহাই স্বয়ম্ভূসত্তার নিজের সক্রিয় সত্যের মধ্যে নিজের পূর্ণচরিতার্থতা। অতএব ইহাও অখণ্ড সত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ, কেননা কেবল ইহার মধ্যেই বিশ্বের একটা পূর্ণ চিন্ময় তাৎপর্য্য, এবং আত্মার এই আত্মপ্রকাশের একটা

সমর্থন খুঁজিয়া পাওয়া যায় ; যে ব্যাখ্যাতে বিশ্ব এবং ব্যষ্টি উভয়ই নিরর্থক বলিয়া সাব্যস্ত হয় তাহাকে পূর্ণ ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে অথবা সে সমাধানকে রহস্যের এক মাত্র সত্য সমাধান বলিয়া মানিতে পারি না।

আমাদের আর একটা বক্তব্য এই যে আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে নিত্য চরম বস্তুর মৌলিক সত্য দিব্য সত্তা, চৈতন্য এবং আনন্দরূপে প্রকাশিত হয়, এই স্বয়ম্ভূ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ জগদতীত এক সত্যবস্তু কিন্তু তেমনি আবার তাহা সমস্ত বিসৃষ্টির ভিত্তিরূপে তাহার অন্তর্নিহিত সত্য, কেননা স্বয়ম্ভূসত্তার যাহা মূল সত্য তাহাই অপরিহার্য্যরূপে হইবে সম্ভূতিরও মূল সত্য। বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই তৎস্বরূপ ব্রহ্মের বিসৃষ্টি বা আত্মপ্রকাশ, এমন কি যাহারা আপাত দৃষ্টিতে তাঁহার বিরোধী বলিয়া মনে হয় তাহাদের মধ্যেও তিনি বাস করিতেছেন, এবং তিনিই গোপনে থাকিয়া তাঁহাকেই ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিতেছেন, ইহাই হইল ক্রম-পরিণতির কারণ ; এইভাবে বাধ্য হইয়া নিশ্চেতনার মধ্য হইতে তাহার মধ্যস্থিত গোপন চেতনা উন্মিষিত এবং পুষ্ট হইতেছে, অব্যক্ত আপাত অসৎ হইতে তাহার মধ্যস্থিত নিগূঢ় চিৎসত্তা ফুটিয়া উঠিতেছে, বোধশক্তিহীন অসাড় জড়ের মধ্যে সত্তার বিচিত্র আনন্দ উন্মিষিত হইতেছে—যে আনন্দ সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বরূপে প্রকাশিত নিজেরই গৌণ বিভাবের হাত হইতে মুক্ত হইয়া তাহার সত্তার চিন্ময় স্বরূপানন্দে রূপান্তরিত হইবে।

স্বয়ম্ভূসত্তা এক এবং অদ্বিতীয় কিন্তু তাহার একত্বই অনন্ত এবং তাহার মধ্যে নিজেরই অন্তহীন বহুত্ব আছে ; যিনি এক তিনিই সর্ব্ব, যিনি স্বরূপে একসত্তা তিনিই আবার সর্ব্বসত্তা। একদিকে একের অনন্ত বহুত্ব অন্যদিকে অন্তহীন বহুত্বের শাশ্বত একত্ব—এ দুইই অখণ্ড সত্য বস্তুর দুইটি সত্য বা দুইটি বিভাব, এবং এই দুই বিভাবই বিসৃষ্টির ভিত্তি। বিসৃষ্টির এই মূল সত্যের জন্য স্বয়ম্ভূ-সৎ আমাদের বিশ্বানুভবে তিন রূপে আবির্ভূত হন,—বিশ্বাতীত সত্তা, বিশ্বাত্মা এবং বহুর মধ্যে ব্যষ্টি আত্মা বা জীবাত্মা। কিন্তু বহুত্বের প্রকাশ ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক ক্ষেত্রে চেতনাকে বিভক্ত করিয়াও দেয়, এক কার্য্যকরী অবিদ্যা সৃষ্টি করে যাহার মধ্যে অবস্থিত হইয়া ব্যষ্টিবহু বা জীবগণ শাশ্বত স্বয়ম্ভূ অদ্বয় তত্ত্বের সহিত নিজের একত্ব বোধ হারাইয়া ফেলে, বিশ্বের মধ্যে যে একই আত্মা রহিয়াছে তাহা ভুলিয়া যায় ; অথচ এই পরম একের মধ্যে এই একের দ্বারা তাহারা আত্মসত্তা লাভ করে, বাঁচিয়া থাকে এবং ক্রিয়া

করে। আবার গোপনে স্থিত এই একের শক্তিতে, সম্ভূতিতে স্থিত জীবাত্মা তাহার নিজের অদৃশ্য সত্যের এবং প্রকৃতি পরিণামের গোপন চাপের প্রেরণায় এই অবিদ্যার হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রণোদিত হয় এবং অবশেষে অখণ্ড দিব্যপুরুষের জ্ঞান এবং তাঁহার সহিত নিজের একত্ববোধ ফিরিয়া পায় এবং সেই সঙ্গেই সকল ব্যষ্টি জীব এবং সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাহার চিন্ময় একত্বের অনুভূতিও সে পুনরায় লাভ করে। শুধু নিজেকে বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত জানিলে তাহার চলিবে না, তাহাকে জানিতে হইবে যে বিশ্বও তাহার অন্তর্ভুক্ত এবং বিশ্বপুরুষ তাহারই বৃহত্তর আত্মা ; আত্মপ্রসারণ দ্বারা ব্যষ্টি সত্তাকে যেমন জানিতে হইবে যে সে সর্ব্বভূতাত্মা, তেমনি তাহাকে সেই সঙ্গেই জানিতে হইবে তাহার নিজের বিশ্বাতীত তুরীয় সত্তাকে। বিশ্বাতীত, বিশ্বাত্মা এবং ব্যষ্টি জীবরূপে সত্য বস্তুর যে তিন বিভাব আছে, আত্মাব এবং বিশ্ব বিসৃষ্টির পূর্ণ সত্যের মধ্যে এই তিনের সত্যকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, এবং তাহা দ্বারাই প্রকৃতি পরিণামের চরম ধাবা এবং তাৎপর্য্য নিরূপণ কনিতে হইবে।

যে সমস্ত মতে বিশ্বাতীত তত্ত্বের কোন খবর নাই অথবা সে তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করে তাহা কখনও সত্তাব সত্যেব পূর্ণ পরিচয় হইতে পাবে না। সর্ব্বব্রহ্ম-বাদ (Pantheism) বলে যে ব্রহ্ম এবং বিশ্ব এক ; তাহা সত্য ; কেননা বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহা ব্রহ্ম, কিন্তু এ মত বিশ্বাতীত সত্যকে হারাইয়া বসে বা বাদ দেয় বলিয়া সমগ্র বা পূর্ণ সত্যে পৌঁছে না। পক্ষান্তরে যে সমস্ত মতবাদ শুধু বিশ্বকে মানে এবং ব্যষ্টি জীবকে বিশ্বশক্তির অবান্তর সৃষ্টি বা উপ-সৃষ্টি (by-product) মনে করিয়া তাহাকে হিসাব হইতে বাদ দেয় তাহারাও ভুল করে, বিশ্বক্রিয়ার আপাত দৃশ্যমান তথ্যের দিকে তাহারা অত্যধিক জোর দেয় বলিয়া এ ভুল হয় ; প্রাকৃত ব্যষ্টিজীবের বেলায় কেবল ইহা সত্য কিন্তু তাহার সম্বন্ধেও ইহা সমগ্র সত্য নহে, কেননা প্রাকৃত ব্যষ্টি বা প্রাকৃতসত্তা বিশ্বশক্তি হইতে জাত হইয়াছে তাহা ঠিক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিতে হইবে যে সে জীবাত্মারই প্রাকৃতব্যক্তিত্ব বা প্রকৃতির মধ্যস্থ অভিব্যক্তি, অন্তরাত্মা বা অন্তর-পুরুষের এক ব্যক্ত রূপায়ণ ; এই অন্তরাত্মা নশ্বর একটি জীবকোষ, বা বিশ্বাত্মার নাশশীল এক অংশ নয়, কিন্তু তাহার আদি অমৃত স্বরূপ বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে নিহিত আছে। ইহা সত্য যে বিশ্বাত্মাই ব্যষ্টিসত্তার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু ইহাও সত্য যে বিশ্বাতীত সদ্বস্তুই ব্যষ্টি এবং বিশ্ব এ উভয় সত্তার মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন ; তাই জীব পরম

পুরুষেরই সনাতন অংশ, প্রকৃতির এক খণ্ড ভাব নয়। আবার যে মত বলে যে বিশ্ব শুধু ব্যষ্টিজীবের চেতনাতেই আছে স্পষ্টতঃ তাহা তেমনই একদেশদর্শী দর্শন, তাহাতে এক খণ্ড-সত্যেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; ব্যষ্টি ব্যক্তির আধ্যাত্মিক চেতনায় যখন সে সমগ্র বিশ্বকে আলিঙ্গন করিবার শক্তি লাভ করিবে যখন সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সে যে পরিব্যাপ্ত এই বোধ তাহাতে জাগিবে তখন তাহার মধ্যে এ মতের সমর্থন মিলিবে, কিন্তু বিশ্ব বা ব্যষ্টি চেতনাকে সত্তার মূল সত্য বলিতে পারি না, কেননা ইহাদের উভয়ের অস্তিত্ব বিশ্বাতীত দিব্য পুরুষের উপর নির্ভর করে।

এই দিব্যপরুষ বা সচ্চিদানন্দের মধ্যে নৈব্যক্তিকতা এবং ব্যক্তিকতা যুগপৎ বিদ্যমান আছে, একদিকে তিনি সৎস্বরূপ সকল সত্য, শক্তি, বীর্য্য এবং সত্তার উৎস ও আশ্রয়, আর অন্যদিকে তিনিই বিশ্বাতীত চিৎপুরুষ এবং সর্ব্ব-পুরুষ (All-Person), সকল সচেতন সত্তা সকল অন্তরাত্মা যাহার ব্যক্তিভাবের অভিব্যক্তি; কেননা তিনিই তাহাদের উচ্চতম আত্মা বা পরমাত্মা তিনিই অন্তর্য্যামী রূপে সর্ব্বের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন। নিজের এই সত্যকে জানা এবং এই সত্যের মধ্যে জাগিয়া উঠাই বিশ্বের মধ্যস্থিত জীবাত্মার নিয়তি, বিসৃষ্টির মধ্যস্থিত শক্তিব চরম উদ্দেশ্য, তাই পরিণতি ধারায় তাহার অন্তরের অভিযান চলিয়াছে এই দিকে; তাই জীবাত্মাকে দিব্যপুরুষের সহিত এক হইতে হইবে, তাহার প্রকৃতিকে দিব্য প্রকৃতিতে এবং তাহার সত্তা দিব্য সত্তায় উন্নীত, তাহার চেতনা দিব্য চেতনায় রূপান্তরিত, তাহার সত্তার আনন্দকে দিব্য সত্তার পরমানন্দে পরিণত করিতে হইবে, তাহার পর এই সমস্তকে আবার তাহার সম্ভূতিতে গ্রহণ বা সম্ভূতিকে উচ্চতম সত্যের প্রকাশ ক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে, নিজের ভিতরে দিব্যপুরুষ বা নিজ সত্তার প্রভুকে লাভ করিতে এবং সেই সঙ্গে তাহার দ্বারা পূর্ণরূপে অধিকৃত হইতে, তাঁহারই দিব্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতে এবং পূর্ণভাবে আত্মদান ও আত্মসমর্পণের মধ্যে বাঁচিতে এবং ক্রিয়া করিতে হইবে। ঈশ্বরবাদী এবং দ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে যখন দেখা যায় যে ঈশ্বর ও জীবের অস্তিত্ব সত্য ও শাশ্বত এবং দিব্যশক্তির অস্তিত্ব ও তার বিশ্ব-ক্রিয়াও সত্য এবং শাশ্বত, তখন তাহা অখণ্ড সত্তার এক সত্যই প্রকাশ করে, কিন্তু এ সমস্ত মতবাদ ঈশ্বর এবং জীবাত্মার স্বরূপগত একত্ব অথবা তাহারা নিবিড়ভাবে যে এক হইয়া যাইতে পারে এ সত্য যদি অস্বীকার করে এবং প্রেমের মধ্য দিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার

সহিত এক পরম একত্বে মিলিত হইয়া নিজেকে তাহাতে লয় বা তাহার চেতনা পরম চেতনায় তাহার অস্তিত্ব পরম সৎস্বরূপের অস্তিত্ব সাগরে নিঃশেষে বিলয় করিয়া এক পরম অনুভূতি যে লাভ করিতে পারে ইহা যদি না মানিতে পারে তাহা হইলে তাহাদের দর্শন পূর্ণ সত্যের সন্ধান পায় নাই ইহাই বলিতে হইবে।

এই বিশ্বে স্বয়ম্ভূসতের প্রকাশলীলা সংবৃতির (involution) রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা হইতে আবার বিবৃতির (evolution) সচনা দেখা দিয়াছে, জড় তাহার নিম্নতম ধাপ এবং চিৎসত্তা উচ্চতম শিখর। সংবৃতির অবতরণ ধারায় প্রকাশিত সত্তার সাতটী তত্ত, প্রকাশশীল চেতনার সাতটী স্তর আছে, এখানে তাহাদিগকে আমরা পৃথকরূপে চিনিতে তাহাদের আবেশ বা উপস্থিতি ও অনুপ্রবেশ বাস্তবরূপে (concretely) উপলব্ধি করিতে অথবা তাহাদের প্রতিবিম্ব গ্রহণ ও অনুভব করিতে পারি। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি আদি ও মূল তত্ত্ব, তাহারা চেতনার সর্ব্বগত ভূমি যাহাতে আমরা উন্নীত হইতে পারি, যখন তথায় পৌঁছি তখন চিন্ময় সদ্বস্তুর আত্মরূপায়ণের অথবা মূল আত্মপ্রকাশের পরম ভূমি বা স্তরত্রয়ের সাক্ষাৎ পাই, ব্রহ্মের সদ্‌ভাবের, দিব্য চেতনার ও শক্তির এবং পরম ব্রহ্মানন্দের একত্ব পূবোভাগে ভাসিয়া উঠে, এখানকার মত সেখানে তাহারা গোপন বা ছদ্মবেশী নয়, কেননা সেখানে অনাবৃতভাবে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও সত্যকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। এই ত্রিতত্ত্বের সহিত অতিমানস বা ঋতচিতের চতুর্থ তত্ত্ব যুক্ত আছে, ইহা অনন্ত সত্তার আত্মবিভাবনার সেই বিশেষ শক্তি যাহার দ্বারা অন্তহীন বহুত্বের মধ্যে তাহার একত্ব প্রকাশ হয়। ব্রহ্মের শাশ্বত আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, পরম সৎ, চিৎ, আনন্দের এই শক্তিচতুষ্টয় লইয়া ব্রহ্মের প্রকাশ-লীলার পরার্দ্ধ গঠিত হইয়াছে। সত্যবস্তু এ সমস্ত ভূমিতে অনাবৃত ভাবে বর্ত্তমান, এই সব পরম তত্ত্বের মধ্যে অথবা তাহাদের কোন একটা ভূমিতে যদি প্রবেশ করি, আমরা তাহাদের মধ্যে পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ স্বাধীনতার সাক্ষাৎ পাই। সত্তার অন্য তিন শক্তি বা ভূমির সহিত আমরা এখনই পরিচিত আছি; মন, প্রাণ এবং জড়রূপী এই তিনকে লইয়া সত্তার অপরার্দ্ধ গঠিত হইয়াছে। এই তিন তত্ত্ব স্বরূপে উচ্চতর তত্ত্বেরই শক্তি বা বিভূতি, কিন্তু তাহারা তাহাদের চিন্ময় উৎস হইতে প্রকাশের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে চ্যুত হইবার ফলে, তাহাদের অবিভক্ত প্রকৃত সত্তার স্থলে বিভক্ত সত্তায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে; এই পতন, এই বিভাগ সীমিত জ্ঞানের এক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে, যে জ্ঞান নিজের সীমিত বিশ্বে ঐকান্তিকভাবে

অভিনিবিষ্ট, তাহার পশ্চাতে যাহা কিছু বা ভিত্তিরূপে যে একত্ব আছে তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছে, তাই তাহা বিশ্বগত এবং ব্যষ্টি-জীবগত অবিদ্যা হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের প্রাকৃত জীবন যে জড়ভূমি হইতে জাত, তাহার মধ্যে সংবৃতির অবতরণ ধারা অবশেষে আসিয়া এক পূর্ণ নিশ্চেতনাতে পরিণত হইয়াছে, এই নিশ্চেতনা হইতে সংবৃত সত্তা এবং চেতনাকে ধীরে ধীরে উন্মিষিত হইয়া উঠিতে হইবে। এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি প্রথমে জড় ও জড়বিশ্বকে ফুটাইয়া তোলে বা তুলিতে বাধ্য করে; তাহার পর জড়ের মধ্যে প্রাণ এবং দেহধারী প্রাণীর আবির্ভাব হয়, তাহার পর প্রাণের মধ্যে হয় মনের প্রকাশ এবং দেহধারী মননশীল প্রাণী দেখা দেয়, জড় রূপের মধ্যে থাকিয়া যে মনের শক্তি এবং ক্রিয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে সেই মনেব মধ্যে নিশ্চেতনার মধ্যস্থিত শক্তির বশে অতিমানস ঋতচিৎ বা সত্য জ্ঞানকে অপরিহার্য্যরূপে আবির্ভূত হইতে হইবে, কেননা তাহাকে অভিব্যক্ত করিবাব প্রয়োজনীয়তা প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে। অতিমানসের আবির্ভাবে অতিমানসময় প্রাণীর মধ্যে আত্মজ্ঞান এবং পূর্ণজ্ঞান প্রকাশ পাইবে এবং সেই একই নিয়মে সত্তার স্বাভাবিক প্রয়োজন বশে এখানে সৎ, চিৎ এবং আনন্দের সক্রিয় প্রকাশ অপরিহার্য্যরূপে দেখা দিবে। ইহাই পার্থিব পরিণামের পরিকল্পনার তাৎপর্য্য, এই প্রয়োজনই তাহার তত্ত্ব এবং কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত করিবে তাহা দ্বারাই বিভিন্ন ধাপ বা স্তর নির্ণীত হইবে। ক্রমপরিণতির ফলে মন প্রাণ এবং জড় সিদ্ধ শক্তি রূপে দেখা দিয়াছে, ইহারা আমাদের কাছে ভালভাবে পরিচিত, অতিমানস এবং সচ্চিদানন্দের তিন বিভাব আমাদের মধ্যে গোপনভাবে অবস্থিত তত্ত্ব, এখনও তাহাদিগকে আমাদের সত্তার সম্মুখভাগে স্থাপিত করা হয় নাই, প্রকাশের ক্ষেত্রে সিদ্ধরূপে তাহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; আমরা কেবল আভাসে ইঙ্গিতে তাহাদের আংশিক এবং খণ্ডিত ক্রিয়ার অল্প পরিচয় পাই, তাহাদের ক্রিয়া এখনও নিম্নতর ক্রিয়ার সহিত জড়ীভূত হইয়া আছে, তাই সহজে তাহাদিগকে চেনা যায় না। কিন্তু তাহাদের উন্মেষ এবং প্রকাশও সম্ভূতির মধ্যস্থিত জীবাত্মার নিয়তির অঙ্গীভূত, পার্থিব জীবন ও জড়ের মধ্যে কেবল যে মন সক্রিয় ভাবে সিদ্ধ হইয়া প্রকাশ পাইবে তাহা নহে, পরন্তু মনের উপরে যাহা আছে যাহা কিছু সংবৃতির ধারায় অবতরণ করিয়া পার্থিব জীবন এবং জড়ের মধ্যে আজিও লুক্কায়িত আছে তাহার সমস্তই ক্রমে ফুটিয়া উঠিবে।

পূর্ণ জ্ঞান এবং জীবনের উদ্দেশ্য

পূর্ণ জ্ঞানের সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্তে মনকে সত্তার সৃষ্টিসমর্থ এক তত্ত্ব বা শক্তিরূপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং বিসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহাকে একটা স্থানও দেওয়া হইয়াছে, সে সিদ্ধান্তে প্রাণ এবং জড়কেও চিদ্বস্তুর শক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও সৃষ্টি-শক্তি আছে। কিন্তু যে মতে মনই একমাত্র বা প্রধান সৃষ্টি-শক্তি বলিয়া গৃহীত হয় এবং যে সকল দর্শনে প্রাণ বা জড়কে তদ্রূপ একমাত্র বা প্রধান তত্ত্ব বলিয়া জানে সে সমস্ত মত বা সে সকল দর্শন পূর্ণসত্যের সাক্ষাৎ পায় নাই, পাইয়াছে অর্দ্ধ সত্য মাত্র। ইহা সত্য যখন জড় প্রথম উন্মিষিত হয় তখন তাহাই প্রধান তত্ত্ব হইয়া দাঁড়ায়; নিজের ক্ষেত্রে জড়ই তখন হয় সর্ব্ব বস্তুর ভিত্তি, উপাদান এবং অন্ত; কিন্তু দেখা যায় যে জড় নিজে এমন কিছুর পরিণাম যাহা জড় নয় যাহা শক্তি, আবার এই শক্তি শূন্যে অবস্থিত থাকিয়া ক্রিয়াশীল কোন স্বয়ম্ভূবস্তু নহে, কিন্তু যখন গভীরভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় তখন মনে হয় শক্তি গোপন এক চেতনা এবং সত্তার ক্রিয়া ও স্পন্দন, যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং অনুভূতি লাভ হয় তখন এ ধারণা সুনিশ্চিত সত্যে পরিণত হয়, দেখা যায় যে জড়ের মধ্যস্থিত সৃষ্টিশীল শক্তি চিদ্বস্তুর শক্তিরই এক গতি ও ক্রিয়া। জড় নিজে আদি এবং চরম সদ্বস্তু হইতে পারে না। আবার যে দৃষ্টি জড় এবং চিৎ পরস্পর হইতে পৃথক এবং পরস্পর বিরোধী মনে করে তাহাকেও সত্য বলিয়া মানিতে পারি না; জড় চিতেরই একরূপ, চিৎ-পুরুষের আবাসভূমি এবং এখানে এই জড়ের মধ্যে চিৎ-স্বরূপের পরম উপলব্ধিও লাভ হইতে পারে।

আবার ইহাও সত্য যে যখন প্রাণ উন্মিষিত হয় তখন তাহাই প্রধান প্রভু শক্তি হইয়া দাঁড়ায়, তখন সে জড়কে আত্মপ্রকাশের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে, মনে হয় প্রাণই বুঝি গোপন আদি তত্ত্ব, প্রাণই জড়রূপের মধ্যে নিজেকে আবৃত রাখে এবং বিসৃষ্টিরূপে বাহিরে প্রকাশ পায়; এই ভাবে যাহা দেখা যায় তাহার মধ্যেও এক সত্য আছে, সে সত্যকেও পূর্ণ জ্ঞানের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। প্রাণ আদি সত্য বস্তু না হইলেও ইহা সত্য বস্তুরই এক রূপ এবং শক্তি, জড়ের মধ্যে সৃষ্টির প্রবেগ জাগাইয়া তোলাই তাহার জীবনব্রত। তাই প্রাণকেই আমাদের ক্রিয়া সাধনের উপায়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারই সক্রিয় আধারে আমাদিগকে দিব্য সদ্‌ভাবের ধারা ঢালিতে হইবে; প্রাণকে এই ভাবে গ্রহণ যে করা যায় তাহার একমাত্র কারণ এই যে তাহা দিব্য শক্তিরই এক রূপ, যাহা বস্তুতঃ নিজে প্রাকৃত প্রাণন-শক্তি অপেক্ষা বড় বস্তু। কিন্তু প্রাণ-তত্ত্বকে

সব কিছুর পূর্ণ ভিত্তি ও উৎস বলিতে পারি না, তাহার সৃষ্টি-ক্রিয়া পূর্ণ সামর্থ্য এবং পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে, এমন কি নিজের সত্য গতি ও ক্রিয়াও সে বুঝিতে পারে না, যতক্ষণ সে যে দিব্য স্বয়ম্ভূ সত্তার শক্তি ইহা জানিতে এবং নিজের ক্রিয়াকে সূক্ষ্ম ও উর্দ্ধ্বস্রোতা করিয়া নিজেকে পরা প্রকৃতির শক্তি প্রবাহের মুক্ত প্রণালীরূপে রূপান্তরিত করিতে না পারে।

আবার যখন মন উন্মিষিত হয় তখন প্রকৃতির রাজ্যে তাহারই আধিপত্য স্থাপিত হয়, মন প্রাণ এবং জড়কে নিজের প্রকাশের উপায়রূপে গ্রহণ এবং তাহাদিগকে নিজের পুষ্টি ও প্রভুত্বের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করে, সে তখন এমন ভাবে ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে যেন সে-ই খাঁটি সত্য বস্তু এবং মনে হয় সে জীবন বা সত্তার শুধু সাক্ষী নয় স্রষ্টাও বটে। কিন্তু ইহাও সত্য যে মনও সীমিত এবং অন্য বস্তু হইতে জাত শক্তি, মন অধিমানসের পরিণাম অথবা প্রাকৃত জগতের উপর পতিত দিব্য জ্যোতির্ম্ময় অতিমানসের ছায়া মাত্র, বৃহত্তর এক জ্ঞানের আলোক নিজের মধ্যে আসিলেই কেবল সে নিজের পূর্ণ স্বরূপে পৌঁছিতে পারে ; তাহার অবিদ্যাচ্ছন্ন অপূর্ণ এবং বিরোধী শক্তিসমূহকে দিব্যভাবে ক্রিয়াশীল শক্তিতে এবং অতিমানসের সত্য জ্ঞানের সুষমাময় ছন্দে রূপান্তরিত করিতে হইবে। অপরার্দ্ধের সমস্ত শক্তি এবং বৃত্তি অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, শাশ্বত আত্মজ্ঞানের পরার্দ্ধ হইতে আলোক অবতরণের ফলে তাহাদের দিব্য রূপান্তর ঘটিলে তাহাদের আত্মস্বরূপের সন্ধান তাহারা পাইতে পারে।

নিশ্চেতনাই এই তিন নিম্নতর শক্তির ভিত্তি, মনে হয় যেন ইহাই তাহাদের উৎস এবং আশ্রয়, বিপুল পক্ষ বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ এই নিশ্চেতনার অন্ধকারময় পৃষ্ঠের উপর যেন সমগ্র বিশ্বের ভার রহিয়াছে, ইহারই শক্তিতে বস্তুর প্রবাহ আবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে, ইহারই অস্পষ্ট আভাস বা ইঙ্গিত হইতে চেতনার যাত্রারম্ভ হইয়াছে, সকল প্রাণাবেগ উৎপন্ন হইয়াছে। নিশ্চেতনা হইতে সকলের এই যাত্রারম্ভ এবং তাহার এই প্রাধান্য দেখিয়া বর্ত্তমানে কোন কোন মতবাদ তাহাকেই বিশ্বের খাঁটি উৎস এবং স্রষ্টা বলিয়া মনে করে। ইহা অবশ্য সত্য যে এক নিশ্চেতন উপাদান হইতে এক নিশ্চেতন শক্তির বশে বিশ্বপরিণাম আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু তাহা হইতে যাহা উন্মিষিত হইতেছে তাহা সচেতন চিন্ময় বস্তু, অচেতন সত্তা নহে। নিশ্চেতনা এবং তাহা হইতে যাহা প্রথমে জাত হইয়াছে তাহার মধ্যে সত্তার উচচ হইতে উচচতর শক্তির ক্রমিক ধারা-সকল প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং তাহাদিগকে চেতনাব অধীন করা হইয়াছে—

পূর্ণ জ্ঞান এবং জীবনের উদ্দেশ্য

যাহার প্রভাবে পরিণাম-ধারার সকল বাধা, সীমা ও সঙ্কোচের সকল বৃত্ত ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সত্য-জ্ঞানরূপী সূর্য্যদেবের জ্যোতির বাণে বিদ্ধ হইয়া নিশ্চেতনার নাগকুণ্ডলী এলায়িত হইয়া পড়িবে ; এইভাবে আমাদের জড় উপাদানের সকল সীমা সকল বাধা ক্রমশ: হ্রাস পাইবে এবং অবশেষে দিব্য চেতনা, শক্তি এবং চিন্ময় আত্মার বৃহত্তর বিধান জড়ত্বের বিধানকে অতিক্রম করিয়া দেহমনপ্রাণ অধিকার করিবে এবং তাহাদের রূপান্তর সাধন করিবে। পূর্ণ জ্ঞান সকল মতবাদের মধ্যস্থিত প্রামাণিক সত্য সকলকে অঙ্গীকার করিয়া লয়, আপন আপন অধিকারের মধ্যে তাহাদের প্রামাণিকতা স্বীকার করে, সেই সঙ্গে সেসমস্ত দর্শনের মধ্যে যেসমস্ত সঙ্কোচ এবং অপর সত্যের অস্বীকৃতি আছে তাহা দূর করিতে এবং যে বৃহত্তর সত্য এক অখণ্ড সর্ব্বগত সত্তার মধ্যে আমাদের সত্তার সকল দিককে সকল বৈচিত্র্যকে পূর্ণ করিয়া তোলে সেই বৃহত্তর সত্যের মধ্যে এই সমস্ত খণ্ড সত্যকে মিলিত, সমন্বিত এবং সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলিতে চায়।

এইখানে আমাদিগকে আর একটু অগ্রসর হইতে হইবে, এতক্ষণ যে দার্শনিক তত্ত্বের কথা আলোচনা করিয়াছি তাহাকে শুধু আমাদের ভাবনা এবং অন্তর বৃত্তির নিয়ামক বা অধিকনায়করূপে না দেখিয়া জীবনেব দিশারী এবং আমাদের আত্মানুভব এবং বিশ্বানুভবের সক্রিয় সমাধানের পথপ্রদর্শকরূপেও দেখিতে হইবে। আমাদের তত্ত্ববিদ্যা, বিশ্বের মূল সত্য এবং অস্তিত্বের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আমাদের মতবাদ, স্বভাবতই জীবনের সমগ্র ধারণা এবং বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, ইহাই হওয়া উচিত ; আমাদের জীবনের আদর্শ এই সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তিতেই গড়িয়া তুলিতে হইবে। তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় দর্শনে আমরা মূল সত্যবস্তুসমূহ এবং তাহাদের তত্ত্বাবলিকে তাহাদের ক্রিয়াপদ্ধতি এবং তজ্জাত পরিণামের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করি। অথচ ক্রিয়াধারাসমূহ মূল সত্যবস্তুর উপরই নির্ভর করে, আমাদের নিজের জীবনের আদর্শ, জীবনের ধারা, কর্ম্মের পদ্ধতি, আমরা সত্তার যে সত্য দার্শনিক জ্ঞানে জানিয়াছি তদনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, তাহা না হইলে তত্ত্ববিদ্যার কোন সক্রিয় প্রয়োজন থাকে না তাহা একটা বুদ্ধির কসরত বা খেলা মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। একথা ঠিক যে বুদ্ধির পক্ষে সত্যের জন্যই সত্যান্বেষণে রত হওয়া উচিত, জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন পূর্ব্বজাত ধারণা বা সংস্কার যাহাতে সে অন্বেষণে অন্যায়ভাবে কোন বাধা জন্মাইতে না পারে, তাহা

অবশ্যই দেখিতে হইবে। কিন্তু তবু কোন সত্যের একবার দেখা পাইলে, আমাদের অন্তরের সত্তায় এবং বাহিরের ক্রিয়ায় তাহার রূপ দিতে হইবে একথা অস্বীকার করা চলে না, তাহা যদি না হয় তবে বুদ্ধির ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও জীবনের সমগ্রতার পক্ষে তাহার বিশেষ কোন মূল্য থাকে না, শুধু বুদ্ধির ক্ষেত্রে যাহাব মূল্য আছে তেমন সত্য, আমাদের পূর্ণ জীবনের নিকট বুদ্ধি দ্বারা কোন ধাঁধার উত্তর বাহির করা অথবা যাহার মালিক পাওয়া যায় নাই এমন চিঠি পড়া অথবা যাহার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই এমন বস্তু লইয়া বস্তুনিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করার মতই নিবর্থক। সত্তার সত্যই আমাদের জীবন-সত্যের শাস্তা ও নিয়ন্তা হইবে ইহাই কাম্য, এ দুই-এব মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই এবং তাহারা পরস্পবের উপর নির্ভরশীল নয় ইহা হইতেই পারে না। তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনায় জীবনের পরম তাৎপর্য্য বলিয়া যাহা জানিয়াছি, সত্তার মূল সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, আমাদেব ব্যবহারিক জীবনের উদ্দেশ্য এবং আদর্শের তাৎপর্য্য বলিয়া তাহাই গ্রহণ কবিতে হইবে।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে মোটামুটি ভাবে প্রধানত চারিটি বা চারি ধরণের মতবাদের সাক্ষাৎ পাই, সৎ-স্বরূপের চারিপ্রকার বিভিন্ন ধারণার অনু-রূপ চারিপ্রকার মনোময় দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবনের আদর্শের দেখা মিলে। এই মতবাদগুলিকে বলিতে পারি—বিশ্বাতীত, বিশ্বগত এবং ঐহিক, অপার্থিব বা পাবলৌকিক, এবং পূর্ণ ও সমন্বয়মূলক। প্রথম তিনটি মতবাদের প্রত্যেকটি অপর মত হইতে পৃথক রূপে নিজেকে স্থাপন করিতে চায়, শেষেরটিতে অপর তিন মতের অথবা তাহাদের যে কোন দুই মতের সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস আছে। এই শেষোক্ত ধরণের মতবাদ-সমূহের মধ্যে আমাদের মতও পড়ে, আমরা আমাদের জাগতিক জীবনকে সম্ভূতির লীলা এবং দিব্য সৎ পুরুষকে তাহার উৎস ও লক্ষ্য বলিয়া মানি, আমরা বলি একটা চিন্ময় পরিণতি বা ক্রমশঃ অধিকতর রূপে সত্তার আত্মপ্রকাশ চলিতেছে, বিশ্বাতীত সত্তা এ সম্ভূতি ও পরিণতির উৎস এবং আশ্রয়, পরলোক তাহার নিমিত্ত এবং যোগসূত্র বা সেতু, বিশ্ব এবং ইহলোক তাহার সাধনার ক্ষেত্র, আর মানুষের মন প্রাণ হইতেছে সেই বিন্দু যাহা হইতে উচচতর এবং উচচতম পূর্ণতার মধ্যে মুক্তির পথে সে ফিরিয়া দাঁড়াইবে। আমরা এখন প্রথম তিনটির দিকে দৃষ্টি দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব জীবনের অখণ্ড এবং পূণতম আদর্শের সঙ্গে তাহাদের ভেদ কোথায়, ও ইহাদের সত্যসমূহ কতদূর তাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

পূর্ণ জ্ঞান এবং জীবনের উদ্দেশ্য

বিশ্বাতীত ভাবের দৃষ্টিতে পরম সৎই একমাত্র পূর্ণ সত্যবস্তু। বিশ্ব এবং ব্যষ্টিসত্তাকে কতকটা অলীক বোধ করা বা ভ্রমরূপে দেখা এ দর্শনের একটা বৈশিষ্ট্য, অথচ এইভাবের একটা ভাবধারা যোগ করিয়া দেওয়া এ দর্শনের প্রধান চিন্তাধারার অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। এ ভাবের চিন্তাধারার চরম এক মতে মানবজীবন অর্থহীন, ইহা আত্মার এক ভ্রান্তি অথবা বাঁচিবার ইচ্ছার একটা প্রলাপ কিম্বা একটা ভ্রম বা অবিদ্যা যাহা কোন উপায়ে পরম সত্যবস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। বিশ্বাতীতই একমাত্র সত্য, অথবা পরম ব্রহ্মই সব কিছুর আদি ও অবসান, মধ্যবর্ত্তী স্থানে যাহা কিছু আছে তাহার কোন স্থায়ী তাৎপর্য্য নাই, তাহা সার সত্য নহে। যদি তাই হয়, তাহা হইলে যখনই আমাদের অন্তরের পরিণতি অথবা চিদ্‌বস্তুর কোন গোপন বিধান আমাদিগকে সামর্থ্য দিবে সেই মুহূর্ত্তে ঐহিক বা পারলৌকিক সকল জীবন হইতে দূরে চলিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের একমাত্র কর্ত্তব্য একমাত্র প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য এই ভ্রম নিজের কাছে সত্য অর্থাৎ মায়ার রাজ্যে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ মনে হয় মায়া সত্য, ততক্ষণ এই অলীক বস্তু অর্থ এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ মনে হয়, যতক্ষণ এই ভ্রমের মধ্যে আমরা বাস করি ততক্ষণ ইহার বিধান এবং তথ্য আমরা মানিয়া চলিতে বাধ্য, তবে বলিতে হইবে তাহা মায়িক তথ্য, শুধু তথ্য—সত্য নয়, ব্যবহারিক-ভাবে সত্য—পরমার্থতঃ নয়। কিন্তু খাঁটি জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী বা খাঁটি সত্যের দিক হইতে দেখিলে এই সমস্ত আত্মবঞ্চনা বিশ্বজোড়া এক উন্মাদাগারের বিধান বলিয়া মনে হইবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা উন্মাদগ্রস্ত আছি এবং আমাদিগকে এই উন্মাদাগারে থাকিতে হইতেছে ততক্ষণ আমাদিগকে বাধ্য হইয়া তাহার আইন কানুন মানিয়া চলিতে হইবে এবং আমাদের রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে তাহা হইতে সুযোগ লাভ করিব বা দুর্যোগ ভোগ করিব, কিন্তু সব সময়ে এই উন্মাদরোগ হইতে মুক্তি পাওয়া এবং আলোক, সত্য এবং স্বাধীনতার দেশে প্রস্থান করাই আমাদের যথার্থ লক্ষ্য হইবে। এই ভাবে যুক্তির কঠোরতাকে যতই লঘু করা হউক না কেন, জীবন এবং ব্যক্তিসত্তাকে সাময়িকভাবে যে বৈধতাই দেওয়া হউক না কেন, তথাপি এই মতে যাহা ক্ষিপ্রতম ভাবে আমা-দিগকে আত্মজ্ঞানে পৌঁছাইয়া দিতে এবং নির্ব্বাণের সোজা পথে পরিচালিত করিতে পারে, তাহাই হইবে আমাদের জীবনের খাঁটি বিধান, আমাদের খাঁটি আদর্শ হইবে ব্যষ্টি এবং বিশ্বের প্রলয় ঘটানো, পরম বস্তুর সত্তার মধ্যে নিজেকে

নিঃশেষে ডুবাইয়া দেওয়া ! আত্মবিলয়ের এই আদর্শ বৌদ্ধেরা নির্ভীকভাবে অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, বেদান্ত ইহার নাম দিয়াছে আত্মোপলব্ধি বা আত্ম-আবিষ্কার ; কিন্তু ব্যষ্টিসত্তার বৃদ্ধি ও পুষ্টি দ্বারা পরম বস্তুর সত্য সত্তায় পৌঁছিয়া তাহার আত্ম-আবিষ্কার সম্ভব হইতে পারে, যদি এই উভয়ই পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সত্যবস্তু হয় ; কিন্তু সেখানে একথা খাটে না যেখানে সেই ব্যষ্টি জীবচেতনার নিকট হইতে মিথ্যা ব্যক্তিসত্তাকে মুছিয়া ফেলিয়া, সকল ব্যষ্টিসত্তা ও বিশ্বসত্তার প্রলয় ঘটাইয়া অবাস্তব বা ক্ষণস্থায়ী ব্যষ্টিসত্তার স্থানে অবশেষে পরব্রহ্মের জগৎধ্বংসকর আত্মপ্রতিষ্ঠা করা হইবে অথচ এদিকে নিরুপায় ভাবে অপরিহার্য্যরূপে পরব্রহ্মের অনুমোদনে বিশ্বব্যাপী শাশ্বত এবং অবিনাশী অবিদ্যার মধ্যে বিশ্বে এই সমস্ত ভ্রম অক্ষুণ্ন ভাবেই বর্ত্তমান থাকিবে।

কিন্তু সত্য বস্তু যে বিশ্বাতীত এই মতবাদে জীবন পূর্ণরূপে অলীক এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা অপরিহার্য্য নয়। উপনিষদে যে বেদান্তের সাক্ষাৎ পাই তাহাতে ব্রহ্মের সম্ভূতিকেও সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, অতএব সত্যের রাজ্যে সম্ভূতির'ও একটা স্থান আছে, সম্ভূতির সেই সত্যে জীবনের খাঁটি বা ঋতময় বিধান দেখা দেয়, আমাদের সত্তার মধ্যে কালের ক্ষেত্রে সুখ ভোগের জাগতিক আনন্দলাভের যে আকূতি আছে তাহার যথাযথ পরিতৃপ্তির একটা অনুমোদন পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে চেতনার যে কার্য্যকরী শক্তি আছে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা যায় ; কিন্তু সম্ভূতির সত্য এবং বিধান একবার চরিতার্থতা লাভ করিলে অন্তরাত্মাকে তাহার চরম আত্মোপলব্ধির দিকে ফিরিয়া যাইতে হয়, কেননা জীবের স্বাভাবিক চরম সার্থকতা হইল নিজের অনাদি এবং শাশ্বত আত্মা, নিজেরই কালাতীত সত্তা ও সত্যের মধ্যে মুক্তিলাভ। সম্ভূতির চক্র শাশ্বত সত্তা হইতে আরম্ভ হয়, আবার তাহাতে আসিয়া শেষ হয় ; পরব্রহ্মকে পুরুষ বা পুরুষোত্তম ভাবে দেখিলে তাহার দিক হইতে সম্ভূতি এবং পার্থিব জীবনযাত্রা হইবে একটা অস্থায়ী খেলা—একটা লীলা-বিলাস। স্পষ্টতঃ এখানে জীবনের একমাত্র তাৎপর্য্য হইতেছে সত্তার সম্ভূত হওয়ার ইচ্ছা এবং আকূতি, সম্ভূতির দিকে চেতনার সঙ্কল্প এবং তাহার শক্তির আবেগ, সম্ভূতির আনন্দের সম্ভোগ ; কেননা ব্যষ্টি ব্যক্তির পক্ষে যখন সম্ভূতির আকূতি ছাড়িয়া যায় অথবা চরিতার্থতা লাভ করিবার পর নিবৃত্ত হয় তখন সম্ভূতির খেলাও থামিয়া যায়, অথচ বিশ্ব ব্যাপার চলিতে থাকে অথবা সর্ব্বদাই প্রকাশ বা বিসৃষ্টি আবার দেখা দেয়, কেননা সম্ভূতির আকূতি নিত্যই বর্ত্তমান আছে,

তাহা নিত্য বর্ত্তমান থাকিবারই কথা কেননা শাশ্বত সদ্বস্তুতে ইহা নিত্য অনুস্যূত আছে। এই মতের একটা ক্রটির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইহাতে ব্যষ্টি সত্তা বা জীবও যে একটা মূল সত্য তাহার স্বাভাবিক বা আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার যে একটা স্থায়ী মূল্য এবং তাৎপর্য্য আছে ইহা স্বীকৃত হয় না ; কিন্তু তাহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে, ব্যক্তি সত্তার চিরন্তন তাৎপর্য্য বা শাশ্বত স্থিতির দাবি আমাদের অবিদ্যাচ্ছন্ন বহিশ্চর চেতনার একটা ভ্রম মাত্র ; ব্যষ্টি-সত্তা স্বয়ম্ভূসত্তার অস্থায়ী সম্ভূতি, এবং তাহাই তাহার যথোচিত মূল্য এবং তাৎপর্য্য। ইহাও বলা যাইতে পারে যে বিশুদ্ধ নির্বিশেষ নিত্যবস্তুর বেলায় মূল্য এবং সার্থকতার কোন কথা উঠিতে পারে না, বিশ্বে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতি বস্তুর মূল্য নিশ্চযই আছে, যদিও তাহা আপেক্ষিক এবং অস্থায়ী বস্তু ; কালের ক্ষেত্রে কোন চরম বা পরম মূল্য, কোন শাশ্বত স্বতঃসিদ্ধ তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না। মনে হয় এ যুক্তির আর কোন জবাব নাই এবং এ বিষয়ে আর কিছু বলিবার নাই। তথাপি প্রশ্ন থাকিয়া যায়, কেননা ব্যষ্টি সত্তার উপর যেরূপ জোর দেওয়া এবং তাহার কাছে যেরূপ দাবি করা হয় ব্যক্তিগত পূর্ণতা এবং মুক্তির যেরূপ মূল্য দেওয়া হয় তাহাতে ব্যষ্টি সত্তা বা জীব-লীলাকে বিশ্ব ব্যাপারের একটা গৌণ ক্রিয়া মাত্র বলিতে পারি না, বলিতে পারি না যে শাশ্বত সদ্‌বস্তুর বিশ্বব্যাপী সম্ভূতিচক্রের বিরাট আবর্ত্তনের মধ্যে জীবের এই কুণ্ডলী রচনা করা এবং তাহার পাক খোলা অতি অকিঞ্চিৎকর।

এবার আমরা বিশ্বগত-ঐহিক মতবাদের আলোচনা করিব, এ মত বিশ্বাতীত মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহার নিকট জগৎ সত্যবস্তু ; আরও অগ্রসর হইয়া ইহা বলে যে জগৎই একমাত্র সত্য বস্তু এবং সাধারণতঃ তাহার দৃষ্টি জড় জগতের জীবনের উপর নিবদ্ধ। ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন তবে তিনি এক শাশ্বত সম্ভূতি মাত্র, আর ঈশ্বর যদি না থাকেন তাহা হইলে, প্রকৃতিকে জড় অথবা বিশ্বগত অমিত প্রাণ লইয়া শক্তির এক খেলা বলিয়া ভাবিতে পারি, অথবা প্রাণ ও জড়ের মধ্যগত এক বিরাট নৈর্ব্বক্তিক মনকেও স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতিকে যাহা কিছু ভাবি না কেন তাহাকেই চিরন্তন সম্ভূতি বলিতে হইবে। পৃথিবী সম্ভূতির সাময়িক এক ক্ষেত্র অথবা বহু ক্ষেত্রের অন্যতম, মানুষ হয়তো তাহার চরম সম্ভাবিত রূপ অথবা সম্ভূতির সাময়িক রূপের মধ্যে অন্যতম মাত্র। ব্যষ্টি মানুষ পূর্ণরূপে নশ্বর বস্তু হইতে পারে, পৃথিবীর আয়ুষ্কালের মধ্যে মানবজাতি অল্পকাল স্থায়ী মাত্র হইতে পারে,

সৌর জগতের বিশালতর আয়ুর মধ্যে পৃথিবীর আয়ু আর কিছু অধিকতর কাল স্থায়ী হইতে পারে ; এমন কি সৌর-জগৎও এক দিন শেষ হইয়া যাইতে পারে অন্ততঃ পক্ষে সম্ভূতির ক্ষেত্রে সে আর সক্রিয় বা সৃষ্টিশীল না থাকিতে পারে, যে বিশ্বে আমরা বাস করি তাহাও হয়ত একদিন লয় পাইতে পারে অথবা সঙ্কুচিত হইয়া নিজ শক্তির বীজরূপে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু সম্ভূতির তত্ত্ব শাশ্বত—অন্ততঃ পক্ষে অন্ধকারাবৃত অল্পবিজ্ঞাত জগতে কোন বস্তু যতটা শাশ্বত হইতে পারে ততটা শাশ্বত। কাল-প্রবাহের মধ্যে চৈত্যসত্তারূপে ব্যষ্টিব্যক্তির একটা স্থায়িত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে, এই পৃথিবীতে অথবা বিশ্বের অন্য জড় জগতে বার বার দেহ ধারণ করিবার জন্য তাহার ছেদহীন এক অস্তিত্ব থাকিতে পারে যদিও তাহার পক্ষে প্রেতলোক বা পরলোক বলিয়া কিছু নাই, ইহা যদি হয় তবে মনে করা যাইতে পারে যে সদা বর্দ্ধমান পূর্ণতা বা পূর্ণতায় পৌঁছিবার এক আদর্শের অথবা বিশ্বের কোথাও এক স্থায়ী আনন্দের দিকে অভিযানেব আকূতিই তাহার অন্তহীন সম্ভূতিকে পরিচালিত করিতেছে। কিন্তু ঐহিক সত্তাকে একান্ত বা চরম মনে করিলে এমত বজায় রাখা খুবই শক্ত হইয়া পড়ে। মানুষের কোন কোন জল্পনা এই দিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে কিন্তু কোন সুনিশ্চিত রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। সাধারণতঃ এক বৃহত্তর জড়াতীত সত্তার সঙ্গে সম্ভূতিব নিত্য বর্ত্তমানত্ব যুক্ত করা হয়।

যাহারা পার্থিব জীবনকে একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করে অথবা এই পৃথিবীকে বিশ্বের মধ্যে চলিবার পথে মানুষের একটা সীমাবদ্ধ ও অচিরস্থায়ী বাসস্থান—কেননা হয়ত অন্যান্য গ্রহে মননধর্ম্মীয় প্রাণীর বসতি আছে—রূপে দেখে, তাহাদের পক্ষে হয় মানুষের মরণ ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া লইয়া নিষ্ক্রিয়-ভাবে সমস্ত সহ্য করা ও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সঙ্কীর্ণ জীবন এবং জীবনাদর্শের অনুশালনে সক্রিয়ভাবে প্রবৃত্ত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। মানুষ তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুসরণ করিয়া অথবা জীবনান্ত পর্য্যন্ত কোনরূপে জীবন যাপন করিয়া তৃপ্ত যদি না থাকিতে পারে তবে তাহার ব্যষ্টিগত জীবন-ধারার পক্ষে একটিমাত্র উচচ এবং ন্যায়ানুমোদিত পন্থা হইতেছে এই যে তাহাকে সম্ভূতির বিধান ভালরূপে জানিতে হইবে এবং তাহার সাহায্যে যে-সমস্ত সম্ভাবনা তাহার বা তাহার স্বজাতির মধ্যে রহিয়াছে, নিজের বা জাতির মঙ্গলের জন্য, বুদ্ধি দিয়া হউক বা বোধি দিয়া হউক অন্তরের জীবনে অথবা বহির্জীবনের সক্রিয়তার মধ্যে তাহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে ; তাহার কাজ হইবে যাহা

ঘটিয়াছে তাহাকে পূর্ণরূপে কাজে লাগাইয়া যাহা এখানে প্রকাশ হইতে পারে বা প্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়াছে সেই সমস্ত উচচতব সম্ভাবনাকে ধরা, তাহাদের দিকে অগ্রসর হওয়া। কেবল সমগ্র মানবজাতি সকল ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত ক্রিয়াধারা অনুসরণ করিয়া উপযুক্ত কালে, তাহার জাতিগত অভিজ্ঞতার ক্রম-পরিণতিতে পূর্ণ ফলদায়ীরূপে ইহা সিদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু ব্যষ্টি মানব তাহার সীমার মধ্যে যতটা পারে ইহাকে সাহায্য করিতে এবং তাহার ক্ষুদ্র আয়ুষ্কালের মধ্যে এই সমস্ত, নিজের জীবনে যতটা সম্ভব ফুটাইয়া তোলার চেষ্টা করিতে পারে ; কিন্তু বিশেষতঃ তাহাব জাতির বর্ত্তমান শিক্ষা-দীক্ষা এবং কল্যাণের জন্য, জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রগতিব পথে উপহাররূপে তাহার ভাবনা এবং ক্রিয়া নিয়োগ করিতে পাবে। তাহাব জীবনকে মহৎ কবিয়া তোলার কিছু শক্তি তাহার আছে, তাহাব ব্যষ্টি সত্তার অপরিহার্য্য শীঘ্র বিলয় স্বীকার করিয়া লইলেও যে সংকল্প এবং ভাবনা তাহার মধ্যে প্রকাশিত ও পুষ্ট হইযাছে তাহার পূর্ণ ব্যবহার করিতে বা মহৎ কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত কবিতে পারে অথবা এমন কোন মহাদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহা পরিচালিত করিতে পারে যাহা ভাবী মানব সফল করিবে বা করিতে পারে। অস্তিত্ব সম্বন্ধে চরম জড়বাদীর মত গ্রহণ না করিলে, মানবের সমষ্টিগত সত্তাব জীবন অচিবস্থায়ী হইলেও খুব বেশি কিছু আসে যায় না, কেননা যতদিন পর্য্যন্ত বিশ্ব সম্ভূতি মানবদেহ এবং মানবমনের আকারে ফুটিয়া উঠিবে, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের মধ্যে যে ভাবনা এবং ইচছাশক্তি পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহা সক্রিয়ভাবে তাহার গন্তব্যপথে চলিবে, বুদ্ধির সহিত সেই প্রগতির ধারা অনুসবণ করা হইবে মানব-জীবনের স্বাভাবিক বিধান এবং শ্রেষ্ঠ পথ। যতদিন পৃথিবীতে মানুষ আছে ততদিন মানবজাতিব কল্যাণ ও প্রগতির তপস্যাই হইবে আমাদেব কর্ম্মের বৃহত্তম ক্ষেত্র এবং ঐহিক জীবনের পুরুষার্থ ; তাহাই আমাদের সাধ্যের সীমা ; মানবজাতির বৃহত্তর কালব্যাপী জীবন, সমষ্টিগত জীবনের মহত্ত্ব এবং উপযোগিতা দ্বারাই আমাদের জীবনের আদর্শ এবং তাহার ক্ষেত্র নির্ণীত হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের কর্ম্ম নয় বলিয়া মানমজাতির কল্যাণ এবং উন্নতির চেষ্টা যদি ছাড়িয়া দিই অথবা তাহা বৃথা এবং অলীক যদি মনে করি তবুও তো ব্যষ্টিসত্তার একটা দায় আমাদের থাকিয়া যায়, তাহাকে যথাসম্ভব পূর্ণ করিয়া তোলা অথবা তাহার প্রকৃতির দাবী যে পথে চায় সেই পথে তাহাকে সার্থক করিয়া তোলাই হইবে জীবনের তাৎপর্য্য এবং আদর্শ।

অপার্থিব বা পারত্রিক দর্শন জড় বিশ্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে এবং বলে যে পৃথিবী ও মানবজীবন অচিরস্থায়ী, প্রাথমিক তথ্যরূপে ইহা মানিয়া লইয়াই আমাদিগকে চলিতে আরম্ভ করিতে হইবে; কিন্তু ইহাও বলে যে পৃথিবী ছাড়া অন্য লোক বা অন্য ভূমি আছে যাহা শাশ্বত অথবা শাশ্বত না হইলেও পৃথিবী হইতে অনেক বেশি স্থায়ী; মানুষের মরণধর্ম্মী দৈহিক জীবনের পশ্চাতে তাহার মধ্যে এক অমর আত্মা আছে এ মত ইহাও অনুভব করে। তাই তাহার মতে জীবনের ধারণার মূল কথা হইল দেহাতিরিক্ত মানবাত্মার অমরত্ব বা নিত্য স্থিতিতে বিশ্বাস স্থাপন করা। এই বিশ্বাস থাকিলেই ভূলোক বা পৃথিবী ছাড়া অন্য উর্দ্ধ্বতর লোক বা ভূমির অস্তিত্বে বিশ্বাসও আসিয়া পড়ে, কেননা যে বিশ্বে সকল শক্তিকেই—তাহারা চিন্ময়, মনোময়, প্রাণময় বা অন্নময় যাহাই হউক কেন—জড়ের মধ্যে জড়রূপকে লইয়াই প্রতি কাজটি করিতে হয়, সেই বিশ্বে বিদেহী আত্মার কোন বাসস্থান থাকিতে পারে না। এই মতবাদ হইতে এই ধারণা জাত হয় যে মানুষের সত্যধাম পরপারে বা পরলোকে, এ পৃথিবীতে সে দুদিনেব অতিথি মাত্র, তাহার অমর জীবনের মধ্যস্থলে অল্পদিনের জন্য সে এখানে আসিয়াছে, তাহার প্রকৃত বাসস্থান জড়াতীত লোকে, অথবা সে তাহার চিন্ময় স্বর্গধাম হইতে স্খলিত হইয়া এই জড জগতে আসিয়া পড়িয়াছে।

এখন তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে এই স্খলন বা চ্যুতির প্রকৃতি কি তাহার হেতু কি এবং পরিণামই বা কি। প্রথমেই আমরা কয়েকটি ধর্ম্ম মতের সাক্ষাৎ পাই যাহারা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাদের ভিত্তি অনেকটা নড়িয়া গিয়াছে, অনেকেব কাছে অবিশ্বাস্য হইয়া পড়িয়াছে; তাহাদের মতে পৃথিবীতে মানুষ প্রথমতঃ জড় দেহধারী প্রাণী রূপেই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বশক্তিমান এক স্রষ্টার আদেশে এক নবজাত দিব্য আত্মাকে সঞ্চারিত বা যুক্ত করা হইয়াছে। শুধু একবারের জন্য ঘটে মানবাত্মার এই দেহধারণ, একবার মাত্র এই জীবনে তাহাকে মুক্তিলাভের সুযোগ দেওয়া হয়, সাধারণভাবে তাহার সুকৃতি বা পুণ্য এবং দুষ্কৃতি বা পাপের দিকে দৃষ্টি করিয়া অথবা এ দুইএর কোনটার ভাগ বেশী তাহা নির্ণয় করিয়া অথবা কোন বিশেষ ধর্ম্ম মত বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি, বিশেষ দিব্য মধ্যস্থ বা ধর্ম্মপ্রচারককে গ্রহণ বা বর্জনের, মানা বা না মানার ফলে মানুষকে অনন্ত স্বর্গসুখ বা অনন্ত নরকযন্ত্রণাময় কোন জগতে ফিরিয়া যাইতে হইবে, অথবা স্রষ্টার কোন খেয়ালবশতঃ

তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত হইয়া আছে। সন্দেহজনক এই গোঁড়া মত এবং সাধন-পদ্ধতির জন্য পারত্রিক দর্শনের এই জীবনাদর্শ যুক্তিযুক্ত বা বিচার সহ নহে। স্থূলে বা জড়ে জন্মের সঙ্গেই আত্মার জন্ম হয় এবং তথা হইতে আত্মার যাত্রারম্ভ হয় ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াও বলা যাইতে পারে যে একটা সাধারণ স্বাভাবিক বিধান সকলের পক্ষে খাটে; গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইয়া আকাশের বিপুল আলোকের মধ্যে তাহার রঙ্গীন পাখা বিস্তার করিয়া যেমন আনন্দে বিচরণ করে তেমনিভাবে আমাদের আত্মা তাহার আদি জড়ময় গর্ভাশয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীবাত্মার অস্তিত্বের বাকি অংশ জড় জগতের অতীত কোন অপার্থিব লোকে কাটাইবে ইহাই হইল সে বিধান। অথবা আমরা আরো সুন্দর এই কল্পনা করিতে পারি যে পার্থিব অস্তিত্বের পূর্ব্বে আত্মার অস্তিত্ব ছিল, তথা হইতে জড়ের মধ্যে সে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে বা অবতরণ করিয়াছে এবং পুনরায় সে স্বর্গে তাহার স্বধামে ফিরিয়া যাইবে। যদি আমরা আত্মার প্রাক্-অস্তিত্ব স্বীকার করি তবে কোন কোন সময়ে যে এরূপ আধ্যাত্মিক ঘটনা ঘটিতে পারে, অথবা অন্য কোন লোকবাসী কোন সত্তা কোন কারণবশতঃ যে মানব-দেহ এবং প্রকৃতি স্বীকার করিয়া এখানে অবতীর্ণ হইতে পারে, ইহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু ইহাকে মর্ত্ত্যজীবনের সার্ব্বজনীন বিধান অথবা জড়বিশ্ব-সৃষ্টির যুক্তিসঙ্গত যথার্থ বিবরণ বলা উচিত হয় না।

কোন কোন সময়ে মনে করা হয় যে এই জগতে জীবের একবার মাত্র আসা তাহার দীর্ঘ উন্নয়ন পথের একটি ধাপ মাত্র; এবং তাহার আদি মহিমায় পুনরায় ফিরিবার পথে যে লোক-পরম্পরার দর্শন তাহার মিলে তাহারা তাহার ক্রমিক অভ্যুদয় ও পুষ্টির পথের সোপানমালা, তাহার পরিভ্রমণের পর্ব্বসমূহ। তাহা হইলে জড়বিশ্ব অথবা বিশেষত এই পৃথিবী স্রষ্টার দিব্য শক্তি, জ্ঞান অথবা খেয়ালের বশে সৃষ্ট নানা জাঁকজমকপূর্ণ এক রঙ্গমঞ্চ—যেখানে তাহার দীর্ঘ জীবননাট্যের এক মধ্য পর্ব্ব অভিনীত হইবে। শিক্ষা বা সংস্কার অনুযায়ী আমরা যে মতবাদ গ্রহণ করিতে চাই তদনুসারে এ জগৎকে আমরা জীবের পরীক্ষাস্থান, তাহার পুষ্টির ক্ষেত্র অথবা আত্মার পতন ও নির্ব্বাসনের ভূমিরূপে দেখিতে পারি। ভারতীয় এক মতে এ জগৎ দিব্য পুরুষের লীলার জন্য সৃষ্ট এক প্রমোদ কানন, এখানে অপরা প্রকৃতির এই জগতে বিশ্ববস্তুর পরিবেশের মধ্যে তাহার এক খেলা চলিতেছে, জন্ম জন্মান্তরের দীর্ঘ ধারার

মধ্যে মানুষের আত্মা তাঁহার এ খেলার অংশ গ্রহণ করে, অবশেষে একদিন সে লীলাময়ের স্বধামে উত্তীর্ণ হইবে এবং সেখানে তাঁহার শাশ্বত সামীপ্যে বাস এবং তাঁহার সহিত মিলনের আনন্দভোগ করিবে এবং প্রেমালাপে নিমগ্ন থাকিবে, ইহাই তাহার নিয়তি; এ মতে সৃষ্টি-ব্যাপার এবং জীবের অধ্যাত্ম সাধনার কতকটা যুক্তিপূর্ণ এরূপ বর্ণনা পাই যাহা এই ধরণের জীবগতি বা জগৎ-চক্রের অন্য কোন বর্ণনায় একেবারেই দেখিতে পাই না অথবা অতি অস্পষ্টভাবে মাত্র সূচিত হয়। কিন্তু সাধারণ সূত্রের এই সমস্ত বহু বর্ণনার মধ্যে তিনটি মূল বিশিষ্ট ধারার সন্ধান সর্ব্বদাই পাওয়া যায়, প্রথমতঃ ব্যষ্টি মানবাত্মার অমরত্বে বিশ্বাস, দ্বিতীয়তঃ এই বিশ্বাসেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম রূপে ধারণা করা যে আত্মার চলিবার পথে সাময়িক ভাবে অথবা তাহার নিজের শাশ্বত স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া অবস্থিতির স্থান হইল এই জগৎ এবং সেই সঙ্গে বিশ্বাস করা আত্মার স্বধাম এই পৃথিবীর ওপারে—স্বর্গলোকে বা দিব্য জগতে, তৃতীয়তঃ নৈতিক এবং অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা সত্তার অভ্যুদয় ও পুষ্টি সাধনই উন্নয়ন এবং মুক্তিলাভের উপায় এই বিশ্বাসের উপরে জোর দেওয়া, তাই সেই সাধনাই জড় জগতের জীবনে জীবের একমাত্র পুরুষার্থ এই বিশ্বাস পোষণ করা।

আমাদের সত্তা বা জীবন সমন্ধে তত্ত্বদর্শনের পূর্ব্বোক্ত তিনটি মূল মতবাদ গৃহীত হইতে পারে, জীবন সম্বন্ধে ইহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব মনোময় দৃষ্টিভঙ্গী আছে, অন্য সমস্ত দর্শন কোন মতকে একান্ত ভাবে না ধরিয়া সাধারণতঃ একটা মধ্য পথ নিয়াছে, অথবা যাহাতে সমস্যার জটিলতাকে নিজেদের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে তজ্জন্য কিছু পরিবর্ত্তন বা সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কারণ কার্য্যক্ষেত্রে এই তিন মতের কোন একটির প্রধান সিদ্ধান্তগুলি একান্তভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের দ্বারা নিজের জীবন স্থায়ী-ভাবে গঠিত ও পরিচালিত করা দুই চারি জনের পক্ষে সম্ভব হইলেও মানব-জাতির পক্ষে তাহার প্রকৃতির উপর অন্য মতের দাবি উপেক্ষা করিয়া তেমন একান্তভাবে এক মত লইয়া থাকা অসম্ভব। মানুষ ইহাদের দুই বা তিনটি মতকে লইয়া একটা খিচুড়ী সৃষ্টি করে, অথবা তাহার জীবনের প্রবৃত্তি ইহাদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে বা সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়, অথবা তাহার জটিল সত্তার নানা প্রবৃত্তির এবং সে সমস্ত প্রবৃত্তি যাহার সমর্থন চায় সেই মনোময় বোধির নানা বাণীর সঙ্গে কারবার করিতে গিয়া এই সমস্ত মতের কোন প্রকার একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে। প্রায় সব মানুষই স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের

পূর্ণ জ্ঞান এবং জীবনের উদ্দেশ্য

পার্থিব জীবন যাপন, পার্থিব প্রয়োজন সাধন বা স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, কামনা বা বাসনার তর্পণ অথবা ব্যক্তিগত বা জাতিগত আদর্শের সফলতা সাধনের জন্য তাহাদের শক্তির প্রধান অংশ ব্যয় করে। অন্য কিছু হইতে পারিত না, কেননা পার্থিব সত্তার বিশিষ্ট ধর্ম্ম এবং প্রকৃতির জন্যই মানুষ দেহের পরিচর্য্যা করে, প্রাণময় এবং মনোময় সত্তার যথাযথ পুষ্টি এবং পরিতৃপ্তি চায়, এবং স্বাভাবিক উন্নতি ও পুষ্টির দ্বারা যে পূর্ণতা লাভ করা বা যে পূর্ণতার নিকটে পৌঁছা তাহার পক্ষে সম্ভব মনে করে, তাহার ধারণা হইতে জাত ব্যক্তিগত বা জাতিগত উন্নত ও বৃহৎ আদর্শের পথে সে চলিতে চায়; এই সমস্তই পার্থিব সত্তার বিধানের অঙ্গ বা অংশ, তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং জীবনধারা, ইহাদের দ্বারাই তাহার পুষ্টি, এসমস্ত ছাড়া মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিত না। যে জীবন-দর্শন এ সমস্তকে উপেক্ষা করে, অযথাভাবে খর্ব্ব করে অথবা অসহিষ্ণু-ভাবে নিন্দা করে, তাহাতে অন্য দিকের সত্য, গুণ বা উপযোগিতা যাহাই থাকুক অথবা বিশেষ কোন রুচি-বিশিষ্ট মানুষের কাছে তাহা যতই উপাদেয় হউক অথবা অধ্যাত্ম-সাধনার বিশেষ কোন পর্ব্বে যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন, এই উপেক্ষা এবং নিন্দা করিবার জন্যই সে সমস্ত দর্শন মানুষের জীবনের সাধারণ এবং পরিপূর্ণ বিধান হইতে পারে না। এই সমস্ত উদ্দেশ্য এবং আদর্শ ক্রম-পরিণতির অপরিহার্য্য অঙ্গ এবং মানবজাতি যাহাতে তাহাদিগকে অবহেলা না করে তজ্জন্য প্রকৃতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে; কারণ আমাদের মধ্যে যে দিব্য পরিকল্পনা রহিয়াছে তাহার ক্রিয়াধারা এবং সোপানাবলির মধ্যে ইহারা পড়ে; এবং তাহার প্রথম সোপানাবলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তাহাদের মনোময় ও জড়ময় ভিত্তিকে বজায় রাখা প্রকৃতির অবশ্যকরণীয় কার্য্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে, এগুলিকে কিছুতেই সে অবহেলা করিতে পারে না, কেননা যে সৌধ সে গড়িতে চায় ইহারাই তাহার ভিত্তি এবং কাঠামো।

ইহা ছাড়া প্রকৃতি আমাদের অন্তরে আর একটি বোধ নিহিত করিয়া রাখিয়াছে যে আমাদের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা মানুষের এই প্রাথমিক পার্থিব প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যায়। এই কারণে যে মতবাদ এই উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর বোধকে উপেক্ষা করে এবং মানুষকে পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ প্রাকৃত জীবনে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, মানুষ বেশী দিন পর্য্যন্ত সে মতকে গ্রহণ বা অনুসরণ করিতে পারে না। জগদতীত কোন কিছুর

বোধি এবং দেহ মন প্রাণ হইতে অন্যতর, তাহাদের অপেক্ষা বৃহত্তর, তাহাদের সংস্কারে এবং বিধানে বদ্ধ নয়—আমাদের মধ্যস্থিত এমন এক আত্মা বা চিদ্বস্তুর বোধ এবং অনুভূতি আমাদের নিকট ফিরিয়া ফিরিয়া আসে এবং অবশেষে আমাদের চিত্তকে অধিকার করিয়া লয়। সাধারণ মানুষ এই অধ্যাত্মবোধের দাবিকে সহজেই মিটাইয়া ফেলে জীবনের কোন বিশেষ শুভ মুহূর্ত্ত অথবা যখন পার্থিব বস্তুর সরসতা কতকটা মন্দীভূত হইয়া পড়ে, সেই বৃদ্ধ বয়স তাহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া, অথবা ইহা তাহাব স্বাভাবিক ক্রিয়ার পশ্চাতে বা বাহিরে অবস্থিত এমন কিছু যাহার দিকে তাহার প্রাকৃত সত্তা শুধু কম বা বেশী অপূর্ণ ভাবেই অগ্রসর হইতে পারে, এই ধারণাকে মাত্র পোষণ করিয়া; অসাধাবণ কোন কোন ব্যক্তি আবাব এই অপার্থিব তত্ত্বকেই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং বিধান মনে করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায় এবং দিব্য ভাব পরিপুষ্ট করিবাব আশায় পার্থিব ভাবকে যতটা পারে খর্ব্ব বা দমন করে। জগতে এমন যুগও আসিয়াছে পাবলৌকিক দর্শন যখন মানুষের মনে প্রবল আধিপত্য লাভ করিয়াছে এবং মানুষ দেখিযাছে এক দিকে আছে মানুষের অপূর্ণ প্রাকৃত জীবন যাহা বৃহত্তের মধ্যে তাহার স্বাভাবিক বিস্তার লাভ করিতে পারিতেছে না আর একদিকে আছে স্বর্গীয় জীবনের জন্য এক তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসমূলক আকৃতি যাহার বিশুদ্ধ এবং মধুব উত্তম ফল কতিপয় অসাধারণ ব্যক্তি শুধু লাভ করিতেছে এবং মানুষ দ্বিধাকুণ্ঠিত চিত্তে এই দুই ভাবের মধ্যে দোল খাইয়া ফিবিয়াছে। এই দ্বিধাই একটা চিহ্ন যাহাতে বুঝা যায় যে আমাদেব সত্তার মধ্যে একটা মিথ্যা বিরোধ দেখা দিয়াছে, কেননা হয় আমরা প্রকৃতি-পরিণামের স্বাভাবিক নির্দ্দেশ এবং সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া এক আদর্শ এবং সাধন-পন্থা খাড়া কবিয়াছি, না হয় আমাদের প্রকৃতির দিব্য বিধান অনুসারে আমাদের মধ্যে এই দুই ভাবের যে সমন্বয়ের সূত্র আছে তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া কোন এক ভাবের উপব অতিবিক্ত ঝোঁক দিয়া ফেলিয়াছি।

কিন্তু অবশেষে যখন আমাদের মনোময় জীবন গভীরতা লাভ করে এবং সূক্ষ্মতর জ্ঞান ফুটিয়া উঠে তখন আমাদের মধ্যে এই বোধ জাগে যে পার্থিব এবং পারলৌকিক তত্ত্বই আমাদের সত্তার সবখানি নয়, তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা ইহলোক এবং পরলোক এ উভয়েরই অতীত এবং সেই উচ্চতম বস্তুই আমাদের সত্তার সুদূরের উৎস। এই সুদূরের আহ্বানের সঙ্গে সহজেই আসিয়া দেখা দেয় আধ্যাত্মিক আবেগ এবং উৎসাহ বা আত্মার উচ্চ আস্পৃহার

উদ্দীপনা ; তত্ত্বদর্শীর নির্বিকার উদাসীনতা বা জাগতিক বিষয়ে শানিত বুদ্ধির অসহিষ্ণুতা, সেই অবস্থালাভের জন্য ইচ্ছাশক্তির অধীরতা ; অথবা সহজেই জীবনের বাধা-বিপত্তিতে নিরুৎসাহিত অথবা আশাভঙ্গের জন্য ব্যথিত প্রাণের রুগ্ন এক বিতৃষ্ণা,—ইহাদের যে কোন ভাবের অথবা সকল ভাবের একত্র সমাহারের জন্য মনে হয় সেই সুদূর পরম বস্তু ছাড়া অন্য সব কিছুই পূর্ণরূপে অসার এবং মিথ্যা, মানুষের জীবন বৃথা, জগতের অস্তিত্ব অবাস্তব, এ পৃথিবী নিষ্ঠুর কুৎসিত তিক্ততায় ভরা, স্বর্গসুখ অকিঞ্চিৎকর, পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ উদ্দেশ্য-পরিশূন্য। এখানেও সাধারণ মানব বস্তুতঃ এই সমস্ত ভাব লইয়া চলিতে পারে না, যে জীবনে তাহাকে বাস করিতেই হইবে তাহার মধ্যে এ সমস্ত ভাব একটা ধূসরতার ছায়া, একটা অতৃপ্ত অস্থিরতা শুধু আনিয়া ফেলে, কিন্তু অসাধারণ মানুষ এ সত্যের দেখা পাইলে সকল ছাড়িয়া ইহাকেই অনুসরণ করে, এ সমস্ত ভাব তাহার আধ্যাত্মিক আবেগের প্রয়োজনীয় খাদ্যের কাজ করে, অথবা যে একমাত্র বস্তু তাহার জীবনের লক্ষ্য ও কাম্য হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে লাভ করিবার জন্য তাহাকে অনুপ্রাণিত করে। এক এক যুগে এবং এক এক দেশে এই মত অতি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তখন মানবসমাজের এক প্রধান অংশ সন্ন্যাসীর জীবনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে,—তাহাদের সকলের মধ্যে যে প্রকৃত ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা সত্য নহে—সমাজের বাকী অংশ সাধারণ জীবনে রত থাকিলেও জগতের অবাস্তবতার একটা বিশ্বাস গোপনে তাহাদের অন্তরে আসিয়া পড়িয়াছে ;দৃঢ়তার সহিত পুনঃপুনঃ আবৃত্তি বা শ্রবণের ফলে এই বিশ্বাস মানুষের জীবনের প্রবেগ মন্দীভূত, তাহার জাগতিক জীবনের উদ্দেশ্যসকলকে তুচ্ছ ও শক্তিহীন করিয়া দেয়, এমন কি সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়ারূপে সাধারণ সঙ্কীর্ণ জীবনেই মানুষ অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে, দিব্যপুরুষের বিশ্বলীলার বৃহত্তর আনন্দে স্বাভাবিকভাবে সাড়া দিতে পারে না, মানবকল্যাণের প্রগতিশীল মহান যে আদর্শবাদ সমষ্টির হিতসাধনে প্রবৃত্তি দেয় এবং মহৎ জীবন লাভের জন্য যুদ্ধ বা সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে তাহাও তখন অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। ইহাতেই বোধ হয় বিশ্বাতীত দর্শনে তত্ত্বের বিবৃতিতে কোথাও একটা অপ্রাচুর্য্য রহিয়া গিয়াছে, হয়ত তাহাতে একটা অতিরঞ্জন আছে অথবা বুঝিবার ভুলের জন্য একটা বিরোধ দেখা দিয়াছে, যে দিব্য সূত্রে উভয়ের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় তাহা হারাইয়া গিয়াছে, সৃষ্টির সমগ্র তাৎপর্য্য এবং স্রষ্টার পূর্ণ সঙ্কল্পের পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

সে যোগসূত্র কেবল তখনই আবিষ্কার করিতে পারিব যখন বিশ্বের গতি ও ক্রিয়ার মধ্যে আমাদের সমগ্র জটিল মানবপ্রকৃতির তাৎপর্য্য এবং যথার্থ স্থান জানিতে পারিব। ইহার জন্য নানা উপাদানে গঠিত আমাদের জটিল সত্তার প্রত্যেক অংশের এবং বহুমুখী আকৃতির যথার্থ এবং ন্যায়সঙ্গত মূল্য দেওয়া এবং তাহাদের ঐক্য ও বৈশিষ্ট্যের মূল সুর আবিষ্কার করা প্রয়োজন। সমন্বয় এবং অংশসমূহের সংযোজন করিয়া পূর্ণতা সাধন দ্বারাই এ আবিষ্কার সম্ভব হইবে আর যখন স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে ক্রমিক পুষ্টি মানবাত্মার বিধান বা স্বধর্ম্ম, তখন খুব সম্ভব পরিণামের পথে সমন্বয়সাধনের দ্বারাই সে আবিষ্কার সম্ভব হইবে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই ভাবের এক সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। ভারত জীবনের চারিটি ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য বা পুরুষার্থ মানিয়াছিল; প্রথম অর্থ বা মানুষের প্রাণধর্ম্মের অনুকূল উপকরণের সঞ্চয়, দ্বিতীয় কাম বা কামনার পরিতৃপ্তি, তৃতীয় ধর্ম্ম- বা সাধন-জীবন যাপন, চতুর্থ মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক জীবনের চরম লক্ষ্য ও নিয়তির পূর্ণতা সাধন অর্থাৎ প্রথম দুইটিতে দেহ, প্রাণ ও হৃদয়ের এবং তৃতীয়টিতে ঈশ্বর, প্রকৃতি ও মানুষের বিধান বা ধর্ম্মের জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নৈতিক এবং ধর্ম্মজীবনের দাবী মিটিবে, চতুর্থটিতে জগদতীত পরম বস্তুর দিকে তাহার যে চিন্ময় আকৃতি আছে, মানুষ অবিদ্যাচ্ছন্ন পার্থিব জীবন হইতে চরম মুক্তি লাভ করিয়া যে আকৃতির পরিতৃপ্তি চায় সে আকৃতির দাবী মিটিবে। ইহার সঙ্গে আবার সমগ্র জীবনকে চারিভাগে ভাগ করিয়া চারি আশ্রমের পরিকল্পনা যোগ করা হইয়াছিল, জীবনের এই ভাব ও আদর্শকে ভিত্তি করিয়া প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শিক্ষা লাভ করিবার এবং জীবনযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল, দ্বিতীয় বা গার্হস্থ্যাশ্রমে ছিল নীতি ও ধর্ম্মের অনুশাসন দ্বারা সংযমিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া বাসনা এবং প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য স্বাভাবিক সাংসারিক জীবন যাপন করা, তৃতীয় বাণপ্রস্থাশ্রমে সংসার ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত এবং চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রমে ব্যবস্থা ছিল জীবনের সমস্ত আসক্তি বর্জন করিয়া সকল ছাড়িয়া চিন্ময় স্বরূপে অবগাহন করা। স্পষ্টতঃ যদি এ ব্যবস্থা সার্ব্বজনীন করা হয়, যদি প্রত্যেককে এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করিয়া চলিতে বলা হয় তবে ভুল হইবে, কেননা সকলের পক্ষে এক ক্ষুদ্র জীবনকালের মধ্যে উন্নতি ও পরিপুষ্টির এই সমস্ত ধাপগুলি উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়া অসম্ভব; কিন্তু এ ব্যবস্থাকে এই মত দ্বারা সংযত করা হইত যে বহু জন্ম-পরম্পরার মধ্য দিয়া

পূর্ণ জ্ঞান এবং জীবনের উদ্দেশ্য

পূর্ণ পরিণতি লাভ না করিলে কেহ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মুক্তি বা মোক্ষ লাভের উপযুক্ত হইতে পারে না। প্রাচীন ভারতের এই সমন্বয়ের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি, আদর্শের ঔদার্য্য, একটা সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য ও পূর্ণতার পরিকল্পনা ছিল ; তাই ইহা মানুষের জীবনের সুর খুব উচ্চে তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল ; কিন্তু অবশেষে ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িল ; সন্ন্যাসের উপর মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁকের ফলে এ ব্যবস্থার সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া গেল এবং জীবনের গতি ও ক্রিয়া পরস্পর-বিরোধী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল ; একটি হইল নীতি এবং ধর্ম্মের রঙে অনুরঞ্জিত কামনা ও প্রবৃত্তির সাধারণ প্রাকৃত জীবন, অপরটি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত অন্তর্জীবন। বস্তুতঃ এই অতিরঞ্জনের বীজ প্রাচীন সমন্বয়ের মধ্যেই নিহিত ছিল এবং তাই কালক্রমে সে বীজ বৃক্ষে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক, জীবন হইতে পলায়নই যদি পুরুষার্থ হয়, প্রাকৃত জীবন যাহাতে সার্থক হইতে পারে এমন কোন উচ্চ ও উদার আদর্শ দ্বারা চিত্তকে যদি উদ্বুদ্ধ না করা হয়, জীবনের যদি দিব্য তাৎপর্য্য কিছু না থাকে, তাহা হইলে মানুষের বুদ্ধি ও সঙ্কল্প অসহিষ্ণু হইয়া ক্লান্তিকর মন্থর সাধন ধারা পরিহার করিয়া মোক্ষলাভের সংক্ষিপ্ত পথ আশ্রয় করিবে ইহাই ত স্বাভাবিক ; যদি তাহা না করিতে পারে অথবা যদি এই সংক্ষিপ্ত পথ অনুসরণ করিবার শক্তি তাহার না থাকে তাহা হইলে অহংকে লইয়াই থাকিতে হয় এবং তাহার পরিতৃপ্তি সাধন করা ছাড়া এই প্রাকৃত জীবনে লাভ করিবার মত বৃহত্তর কিছু সে দেখিতে পায় না। তখন চিন্ময় এবং মৃন্ময়, সন্ন্যাস এবং সংসার, এই দুই ভাগে জীবন বিভক্ত হইয়া পড়ে ; আমাদের প্রকৃতির এই দুই অংশের মধ্যে কোন সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, দুএর ব্যবধান পার হওয়ার জন্য উল্লম্ফন ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না, একটাকে ছাড়িয়া হঠাৎ অপরটি গ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

একটা চিন্ময় উর্দ্ধ-পরিণাম আছে, জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই জগতের মধ্যে সত্তার উন্মীলন হয়, এই পরিণতির পথে মানুষই মুখ্য যন্ত্র বা সাধন, মানুষের জীবন যখন উচ্চতার শিখরারূঢ় হয় তখন উত্তরায়ণের পথে ফিরিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়—এই সমস্ত যদি স্বীকার করি তবে সংসারজীবন এবং অধ্যাত্ম-জীবনের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের সূত্র বাহির করিতে পারিব ; কেননা এই উদার দৃষ্টিতে মানুষের সমগ্র প্রকৃতিকে আমরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং পৃথিবী, স্বর্গ এবং পরম সত্যবস্তুর দিকে মানুষের যে ত্রিস্রোতা আকর্ষণ আছে

তাহাকেও যথাযথ স্থানে স্থাপন করিতে পারিব। কিন্তু কেবল যে-ভিত্তিতে বিরোধের সমাধান হইতে পারে তাহা এই যে নিম্নতর অন্নময়, প্রাণময় এবং মনোময় চেতনা তাহাদের চরম সার্থকতা শুধু তখনই লাভ করিবে যখন উচ্চতর আধ্যাত্মিক চেতনার আলোক, শক্তি ও আনন্দ তাহাদিগকে গ্রহণ করিবে এবং তাহাদেব রূপান্তর সাধন করিয়া নূতন ভঙ্গিতে তাহাদিগকে প্রকাশ করিবে ; উচ্চতর তত্ত্ব যদি নিম্নতরকে শুধু বর্জন করে তবে তাহার সঙ্গে তাহার যে সত্য সম্বন্ধ আছে তাহা দেখা হইবে না, সে দেখা সম্ভব হইবে যদি সে উচ্চতর নিম্নতরকে গ্রহণ এবং শাসন করিয়া তাহার মধ্যে যাহা অপূর্ণ আছে তাহা পূর্ণ করিয়া তাহাকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত এবং এক নূতন ভাবে প্রকাশিত করিতে পারে অর্থাৎ যদি তাহার মনোময় প্রাণময় এবং অন্নময় প্রকৃতিকে চিন্ময় ও অতিমানস করিয়া তুলিতে পারে। পার্থিব দর্শনের আদর্শই আধুনিক মনকে অধিকার করিয়াছে, এ আদর্শ মানুষের পার্থিব জীবনকে এবং সমষ্টি-মানবের আশা আকাঙক্ষাকে প্রধান স্থান দিয়াছে এবং জীবন-সমস্যার সমাধানের জন্য দৃঢ়ভাবে দাবী করিতেছে, এ দর্শন আমাদের এই উপকার করিয়াছে। কিন্তু জাগতিক জীবনের বাড়াবাড়ি এবং তাহাতে ঐকান্তিক অভিনিবেশের ফলে মানুষের সম্ভাবনার পরিধি সে অন্যায়ভাবে খর্ব্ব করিয়াছে, জীবনের উচ্চতম এবং অবশেষে যাহা উদারতম সেই সম্ভাবনাকে সে দেখিতে পায় নাই, এবং এইভাবে সীমানির্দ্দেশের ফলে তাহার নিজের লক্ষ্যও পূর্ণভাবে অনুসরণ করিতে পারিতেছে না। মানুষের মধ্যে এবং বিশ্বপ্রকৃতিতে মনই যদি চরম তত্ত্ব হয় তাহা হইলে এ বিফলতার কথা উঠে না ; তবু ইহাতে তাহার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সঙ্কীর্ণ এবং দৃষ্টির দিগ্‌বলয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু মন যদি চেতনার আংশিক উন্মীলন মাত্র হয় এবং তাহার অতীত ক্ষেত্রে এমন শক্তি থাকে যাহা লাভ করা মানুষের যদি সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে জগদতীত বস্তুর কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই সমস্ত শক্তির উন্মেষ ও পুষ্টির উপর এই পৃথিবীতে সিদ্ধিলাভ যে শুধু নির্ভর করিবে তাহা নহে তাহাই হইবে আমাদের উর্দ্ধ্ব-পরিণতির একমাত্র প্রকৃত পথ।

শুধু মানুষের মন যাহার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সেই বৃহত্তর এবং মহত্তর চেতনার উন্মেষ না ঘটিলে মন ও প্রাণ কখনও পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। অধ্যাত্ম-চেতনাই সে বৃহত্তর ও মহত্তর চেতনা, কেননা অধ্যাত্ম-চেতনা শুধু যে অন্য সকল চেতনা হইতে উচ্চতর তাহা নহে, পরন্তু তাহা অন্য

চেতনাকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। এ চেতনা যেমন বিশ্বময় তেমনি বিশ্বাতীত, ইহা নিজের আলোকের মধ্যে প্রাণ ও মনকে গ্রহণ করিতে এবং তাহারা যাহা অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে তাহার সত্য ও চরম উপলব্ধি দান করিতে পারে; কেননা এই দিব্য চেতনাতে আছে জ্ঞানের বৃহত্তর সামর্থ্য, আছে গভীরতর শক্তি ও সঙ্কল্পের প্রস্রবণ, আছে প্রেম আনন্দ এবং সৌন্দর্য্যের অমেয় প্রসারতা ও প্রবলতা। আমাদেব দেহ প্রাণ এবং মন এই সমস্ত বস্তুই খোঁজে, খোঁজে জ্ঞান শক্তি এবং আনন্দ; যাহার প্রভাবে তাহারা এই সমস্তের পরম প্রাচুর্য্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তাহাকে বর্জন করিলে তাহাদেরই চরমোৎকর্ষ লাভ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। উল্টাদিকে আর একটা বাড়াবাড়ি আছে যাহা এক প্রকার অবর্ণ শুভ্র চিন্ময় সংস্বরূপে পৌঁছিতে এবং চিদ্বস্তুর সৃষ্টিশীল ক্রিয়া বন্ধ করিতে এবং দিব্য পুরুষ তাহার আপন সত্তায় যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের সমস্ত হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে চায়, ইহা পরিণামবাদের স্থান দেয় বটে কিন্তু তাহা অর্থহীন এবং লক্ষ্যশূন্য হইয়া পড়ে, কেননা আজ পর্য্যন্ত পরিণতির ক্ষেত্রে যাহা কিছু উন্মিষিত হইয়াছে তাহার মূলোৎপাটনই হইবে তাহার পরম পুরুষার্থ; ইহাতে আমাদের সত্তার ক্রিয়াধারা হইয়া পড়ে একটা অর্থহীন পরিভ্রমণ, অর্থ ও উদ্দেশ্যশূন্য ভাবে একবার অবিদ্যার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়া আবার তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন অথবা তাহা বিশ্বসম্ভূতির এমন একটা চক্রাবর্ত্তন হইয়া দাঁড়ায়, পলায়নই হয় যাহার একমাত্র নির্গম-দ্বার। একদিকে পার্থিব দর্শন অন্যদিকে বিশ্বাতীত দর্শন এই দুইএর মধ্যস্থিত পারলৌকিক দর্শনের আস্পৃহা আবার সত্তার উর্দ্ধতম এবং নিম্নতম এ উভয় দিকই কাটিয়া ফেলিতে চায়; ইহা একত্বের উচ্চতম অনুভূতির দিকে অগ্রসর হয় না, তাই সত্তার উচ্চতম অংশের সার্থকতায় বাধা জন্মে আবার অন্যদিকে প্রাকৃত ভূমিতেও তাহাকে খর্ব্ব করে কেননা জড় বিশ্বে আত্মার আবির্ভাবের এবং স্থূল দেহের মধ্যে তাহাব প্রাণপ্রকাশের গভীর তাৎপর্য্যের প্রতি আমাদের বোধশক্তিকে যথাযথভাবে জাগ্রত করে না। একত্বের দ্বারা বৃহৎভাবে সর্ব্ব সম্বন্ধ বিনির্ণয় এবং বিভিন্ন অংশের সংযোজন দ্বারা এক অখণ্ড পূর্ণতা স্থাপন করিতে পারিলে নষ্ট সাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সত্তার সমগ্র সত্য আলোকোদ্ভাসিত এবং প্রকৃতির সকল পর্ব্ব যোগসূত্রে গ্রথিত হইয়া উঠিবে।

এই সম্যক জ্ঞানে বা অখণ্ড দর্শনে বিশ্বাতীত পরম সত্তাই পরম সত্য বস্তু;

তাহাকে উপলব্ধি করাই আমাদের চেতনার উচ্চতম সীমা। কিন্তু এই পরম সত্য বস্তুই বিশ্বপুরুষ, বিশ্বচেতনা, বিশ্বসঙ্কল্প এবং বিশ্বপ্রাণ; তিনি তাঁহার সত্তার বাহিরে নন পরন্তু ভিতরেই এই সমস্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, ইহারা তাঁহার বিরোধী তত্ত্ব নয় পরন্তু তাঁহার নিজেরই আত্ম-উন্মীলন এবং আত্মপ্রকাশ। বিশ্বসত্তা এক অর্থহীন খেয়াল বা ভ্রম বা আকস্মিক প্রমাদ নয়, তাহাতে দিব্য অর্থ এবং সত্য আছে; নানারূপে চিৎস্বরূপের আত্মপ্রকাশ ইহার পরম তাৎপর্য্য; দিব্যপুরুষ নিজেই তাঁহার আত্ম-রহস্যের চাবি। সেই চিদ্বস্তুর পূর্ণ আত্মপ্রকাশই আমাদের এই বিশ্বসত্তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু পরম সত্য বস্তুর চেতনা অন্তরে স্ফুরিত না হইলে এ লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নয়, কেননা কেবল পরম এবং চরম বস্তুর সংস্পর্শের ফলে আমাদের চরম অবস্থা বা পরা চেতনা লাভ হয়। কিন্তু বিশ্বগত সত্যবস্তুকে বাদ দিলে এ পরম অবস্থা লাভ হয় না। আমাদিগকে সার্ব্বজনীনতা লাভ করিতে হইবে, কেননা সার্ব্বজনীন ভাবের মধ্যে উন্মীলিত হইতে না পারিলে ব্যক্তিসত্তাও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। সর্ব্ব হইতে নিজেকে বিবিক্ত করিয়া ব্যষ্টিসত্তা যদি পরম সত্তায় পৌঁছিতে চায় তবে পরম চেতনার সেই উত্তুঙ্গ শিখরে সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে, বিশ্বচেতনাকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলে সে নিজেকে পূর্ণরূপে ফিরিয়া পায়, তথাপি বিশ্বাতীতের মধ্যে তাহার যে পরম লাভ হইয়াছে তাহাও নষ্ট হয় না; বিশ্বাতীত এবং নিজের ব্যষ্টিসত্তা এ উভয়ই বিশ্বভাবের পূর্ণতার মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিশ্বাতীত, বিশ্ব এবং ব্যষ্টি যে এক ও অখণ্ড, এই উপলব্ধি চিৎস্বরূপের পূর্ণ আত্মপ্রকাশের অপরিহার্য্য অঙ্গ, কেননা বিশ্বই তাহার পূর্ণ আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র এবং ব্যষ্টিপুরুষের মধ্য দিয়া এখানেই পরিণতিতে তাহার আত্ম-উন্মীলন চরম অবস্থায় পৌঁছে। কিন্তু তাহা হইতে গেলে ব্যষ্টির এক সত্য সত্তা যে নিশ্চয়ই আছে এই জ্ঞান যে শুধু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে তাহা নহে, পরন্তু পরম সত্তা এবং সকল বিশ্বসত্তার সহিত গোপনে শাশ্বতভাবে সে যে পরম একত্বে গ্রথিত এই বোধ এই উপলব্ধিও তাহাকে লাভ করিতে হইবে। তাই আত্মভাবের অখণ্ড স্বরূপোপলব্ধিতে ব্যষ্টিজীব যেমন একদিকে হইবে বিশ্বাত্মক তেমনি অন্যদিকে হইবে বিশ্বাতীত।

আবার পৃথিবী ছাড়া আরও যে লোক আছে ইহাও সত্য, আমরা যে শুধু জড়ের ভূমিতে বাস করি তাহা নয়, আমাদের চেতনার আরও সব ভূমি আছে যেখানে আমরা পৌঁছিতে পারি, সে সমস্ত ভূমির সহিত আমাদের গোপন যোগ-

সূত্র আছে, যে সমস্ত ভূমিতে আমাদের পৌঁছিবার অধিকার আছে; তথায় যদি পৌঁছিতে না চাই, তাহাদের অনুভূতি যদি লাভ না করি, তাহাদের বিধান যদি না জানি বা আমাদের মধ্যে ফুটাইয়া না তুলি তাহা হইলে আমাদের সত্তার উচ্চতা এবং পূর্ণতাকেই ব্যাহত করা হইবে। চেতনার উচ্চতর ভূমি-সকলই যে সিদ্ধপুরুষের একমাত্র অনুভব-যোগ্য জগৎ এবং বাসস্থান তাহা নয়, বিশ্বের মধ্যে আত্মার আত্মপ্রকাশের চরম এবং পূর্ণ অর্থ যে কোন অপরিণামী নিত্য-লোকেই শুধু দেখা দেয় তাহা নহে, এই জড় বিশ্ব এই পৃথিবী এই মানবজীবনও চিদ্‌বস্তুর আত্মপ্রকাশের অংশ বা অঙ্গ, ইহাদের মধ্যেও দিব্য সম্ভূতির সম্ভাবনা আছে; সে সম্ভাবনা পরিণামশীল, তাহার মধ্যে অন্য জগতের সম্ভাবনা-সকলও নিহিত আছে, তাহারা আজিও মূর্ত্ত হইয়া উঠে নাই, মূর্ত্ত হইবার প্রতীক্ষায় আছে। পার্থিব জীবন অসার দুঃখময় অদিব্য এক পঙ্কিলতায় পতন, কোন এক শক্তি এক দৃশ্য বস্তুরূপে নিজের অথবা দেহধারী জীবের কাছে এমনভাবে সে জীবনকে উপস্থাপিত করিয়াছে যে তথায় জীবকে দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে এবং অবশেষে নিজ সত্তা হইতে তাহাকে বাদ দিয়া ফেলিতে হইবে—এ সমস্তের কিছুই সত্য নয়। এ জীবন চিৎস্বরূপের আপনাকে ধীরে ধীরে উন্মীলিত ও প্রকাশিত করিবার রঙ্গভূমি, চিন্ময় এক মহা জ্যোতি শক্তি আনন্দ এবং একত্বের পরম প্রকাশের দিকে সে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু এ আত্মপ্রকাশের মধ্যে চিদ্‌বস্তুর বহু বিচিত্র রূপায়ণ অন্তর্ভুক্ত আছে। পার্থিব সৃষ্টির অন্তরে এক সর্ব্বদর্শী উদ্দেশ্য আছে; বাহিরের বহু বিরোধ এবং জটিলতার অন্তরালে এক দিব্য পরিকল্পনা আছে; এই সমস্ত জটিলতা ও বিরোধ হইল একটা চিহ্ন, যাহা নির্দ্দেশ করিতেছে যে আত্মার অভ্যুদয় ও পুষ্টি এবং প্রকৃতির প্রচেষ্টা আমাদিগকে এক বহুমুখী সিদ্ধির দিকে লইয়া যাইতেছে।

ইহা সত্য যে জীবাত্মা এই পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর চেতনার লোক-সমূহে আরূঢ় হইতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, সেই সমস্ত জগতের শক্তি এবং বৃহত্তর চেতনার বিপুল বীর্য্যকে এই জগতেই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; চিদ্‌বস্তুর তেমনভাবে এখানে রূপ পরিগ্রহের উপায়রূপে জীবাত্মার এই দেহধারণ। চেতনার উচ্চতর শক্তিসমূহ বর্ত্তমান আছে, কেননা তাহারা পরম সত্য বস্তুরই শক্তি। আমাদের পার্থিব সত্তার মধ্যে সেই একই সত্য আছে, ইহা সেই অখণ্ড সত্যস্বরূপেরই এক সম্ভূতি, এ সম্ভূতিতে এই সমস্ত শক্তি রূপায়িত করিয়া তুলিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমরা তাহার আবৃত এবং

খণ্ডিত রূপ শুধু দেখিতেছি, কিন্তু যদি প্রকাশের এই প্রথম পর্ব্বে নিবদ্ধ থাকি, অপূর্ণ মানবতার বর্ত্তমান বিধানের বাহিরে যদি না যাইতে পারি তবে আমাদের মধ্যে যে সমস্ত দিব্য সম্ভাবনা আছে তাহাদিগকে বর্জন করাই হইবে; মানব-জীবনের বৃহত্তর ও মহত্তর তাৎপর্য্য আমাদিগকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে এবং আমাদের মধ্যে যে বিপুল ঐশ্বর্য্য গোপনে আছে তাহা এই বাহিরের ক্ষেত্রে আনিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। আমাদের অমৃতত্বের আলোকই আমাদের মরণ-ধর্ম্মকে সমর্থিত ও সার্থক করে, আমাদের এই পৃথিবী নিজেকে স্বর্গলোকের দিকে উন্মীলিত করিয়াই দিব্য জ্ঞানের অধিকারী হয় এবং নিজে পূর্ণ হইয়া উঠে; ব্যষ্টিজীবও তখনই নিজেকে খাঁটিভাবে জানিতে এবং দিব্যভাবে তাহার জগৎকে দেখিতে এবং ব্যবহার করিতে পারিবে যখন সে বৃহত্তর ভূমি-সকলের মধ্যে বিচরণ করিবার শক্তি লাভ, পরম পুরুষের জ্যোতি অনুভব ও উপলব্ধি এবং সেই শাশ্বত দিব্যপুরুষের শক্তি ও সত্তার মধ্যে বাস করিবে।

যদি এই চিন্ময় ক্রমপরিণতি আমাদের জন্ম এবং পার্থিব সত্তার চরম তাৎপর্য্য না হইত তবে সত্তার সকল বিভাবের সমাহারে ও সমন্বয়ে এই পরি-পূর্ণতা সম্ভব হইত না; এই পরিপূর্ণতার চিহ্নরূপেই জড়ের মধ্যে প্রাণ, মন এবং চিৎসত্তার ক্রমিক আবির্ভাব দেখা গিয়াছে, অন্তরস্থ নিগূঢ় আত্মা একদিন পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে ইহাই তাহার তাৎপর্য্য। চিদ্‌বস্তুর পরিপূর্ণ আত্ম-সংবৃতি ঘটিয়াছে এবং ক্রমপরিণতির ধারা ধরিয়া তাহার আত্ম-উন্মীলন বা আত্ম-বিবৃতি চলিতেছে; আমাদের জড়সত্তায় এই দুই ধারার সম্মিলন ঘটিয়াছে। এই দুই ধারার মধ্যে না গিয়াও সদ্বস্তুর এক আত্মপ্রকাশ হইতে পারে, সে আত্মপ্রকাশ সর্ব্বদাই আত্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত, সেখানে কখনও কোন আবরণের ছায়া পড়ে নাই, তেমনি স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃপূর্ণভাবে তাহার নিত্য বিভূতিসমূহের বহুধা প্রকাশও নির্দ্ধারিত এক বিশেষভাবে হইতে পারে; উচ্চতর জগৎসমূহে সম্ভূতির ধারা এইরূপ; সেখানে প্রকাশ নিত্যসিদ্ধ, ক্রমপরিণতির ধারা ধরিয়া নহে; প্রত্যেক বিভূতি সেখানে স্বয়ংপূর্ণ, কিন্তু সে পূর্ণতা একই অবস্থায় স্থিত সে জগতের বিশিষ্ট সূত্র ও বিধান দ্বারা সীমিত। কিন্তু আত্মপ্রকাশের আর এক সম্ভাবনা আর এক ছন্দ আছে, এ ছন্দে আত্মাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাকে প্রকাশ করাই বিধি, নিজেকে আবৃত এবং সংবৃত করিয়া আবার নিজেকে খুঁজিয়া পাওয়ার তপস্যার এক গতিশীল প্রবাহের মধ্য দিয়া এ প্রকাশ, সম্ভূতির এই তত্ত্বের খেলা চলিতেছে আমাদের এই বিশ্বে,

এখানে চেতনা সংবৃতিতে ডুবিয়া এবং চিদ্‌বস্তু জড়ের মধ্যে লুকাইয়া গিয়াছে, ইহাই সে খেলার আদি পর্ব্ব।

নিশ্চেতনার মধ্যে চিদ্‌বস্তুর সংবৃতি এই জগতে সম্ভূতির আদি পর্ব্ব; দ্বিতীয় পর্ব্বে অবিদ্যার মধ্যে পরিণতির ধারা ধরিয়া জ্ঞানের এক আংশিক অভ্যুদয়ের বহু সম্ভাবনার খেলা দেখা দিয়াছে, ইহাই আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতিতে নানা বিশৃঙ্খলার কারণ, আমাদের মধ্যে অপূর্ণতা রহিয়াছে, আমাদের উন্নতি এবং পরিপুষ্টি এখনও পূর্ণতা লাভ করে নাই, পূর্ণতালাভের জন্য আমাদের তপস্যা চলিতেছে, এ সমস্তই আমরা যে এক মধ্যবর্ত্তী পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার মধ্যে আছি তাহারই চিহ্ন ও প্রমাণ; শেষ পর্ব্বে সম্ভূতির চরম লীলায় চিদ্বস্তুর দিব্যসত্তা ও চেতনার আত্মজ্ঞান ও আত্মশক্তির পূর্ণ প্রকাশ হইবে; বিশ্বপ্রাণের মধ্যে চিৎস্বরূপের ক্রমিক আত্মপ্রকাশের এই হইল তিনটি ধাপ বা তিনটি পর্ব্ব। প্রথম যে দুইটি পর্ব্বের ক্রিয়া চলিতেছে, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় তাহারা চরম ও পরম পর্ব্বের বুঝি বিরোধী তাহাকে অস্বীকার করিতেই চায়; কিন্তু যুক্তি যেন বলে যে সে পর্ব্বও আসিবে; কেননা নিশ্চেতনা হইতে চেতনার উন্মেষ যখন সম্ভব হইয়াছে তখন যে অংশতঃ ব্যক্ত চেতনা দেখা দিয়াছে তাহাও নিশ্চয়ই পূর্ণ চেতনারূপে অভিব্যক্ত হইবে। পার্থিব প্রকৃতি এক পরিপূর্ণ এবং দিব্য-ভাবে বিভাবিত জীবনের প্রকাশ চাহিতেছে এবং প্রকৃতির মধ্যে যে এক দিব্য ইচ্ছাশক্তি আছে এই আকূতিই তাহার চিহ্ন। অন্য অভীপ্সাও আছে এবং তাহারাও আত্মসম্পূর্ত্তির উপায় লাভ করে, সাযুজ্য মুক্তি বা পরম শান্তি ও আনন্দের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ, অথবা সামীপ্য মুক্তি বা পরমানন্দ স্বরূপের নিত্য সাহচর্য্য লাভের জন্য দিব্য ধামে ফিরিয়া যাওয়া বিশ্বের মধ্যস্থিত জীবাত্মার পক্ষে সম্ভব; কেননা যিনি অনন্ত তাঁহার প্রকাশের সম্ভাবনাও অনন্ত, তিনি তাঁহার নিজের বহু রূপায়ণের মধ্যে সীমিত বা নিঃশেষিত হইয়া পড়েন না। কিন্তু এই দুই ভাবের মহাপ্রয়াণের কোনটিই এখানে যে সম্ভূতির খেলা চলিতেছে তাহার মূল উদ্দেশ্য নয়, কেননা তাহা হইলে ক্রমবিকাশের এই ধারা গৃহীত হইত না—এখানে আত্মসম্পূর্ণতা লাভ করাই এ ভাবের প্রগতির একমাত্র উদ্দেশ্য, এইভাবের ক্রমবিকাশের একমাত্র নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে এখানেই পূর্ণ সম্ভূতির মধ্যে স্বয়ম্ভূসত্তা পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

জ্ঞানের পথে অগ্রগতি—ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি

হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই (ব্রহ্ম)।

ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬।৮।৭

জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়, সমগ্র জগৎই ব্রহ্ম।

বিবেকচূড়ামণি ৪৭৯

আমার পরাপ্রকৃতিই জীব হইয়াছে এবং সেই প্রকৃতি জগৎ ধারণ করিয়া আছে।... সে-ই সর্ব্বভূতের উৎপত্তিস্থান।

গীতা ৭।৫, ৬

তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী— তুমিই কুমার এবং কুমারী; বৃদ্ধ এবং জরাগ্রস্ত হইয়া তুমিই লাঠিতে ভর দিয়া বাঁকা হইয়া চল, তুমিই নীলবর্ণের, সবুজবর্ণের এবং রক্তবর্ণের পাখী।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।৩, ৪

তাহার যাহারা অবয়ব এই সমগ্র জগৎ তাহাদের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।১০

দিব্য সৎস্বরূপ বা চিন্ময় দিব্যবস্তু জড়ের যে আপাত নিশ্চেতনার মধ্যে সংবৃত হইয়া পড়িয়াছেন তাহা হইতেই পরিণতি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সে সত্যবস্তু স্বরূপে শাশ্বত সৎ চিৎ এবং আনন্দ; অতএব পরিণতির ক্ষেত্রে এই সৎ চিৎ এবং আনন্দেরই উন্মেষ ও প্রকাশ হইবে, অবশ্য প্রথমেই ইহাদের স্বরূপসত্যের বা সমগ্র সত্যের প্রকাশ হইবে না কিন্তু পরিণতিতে প্রথম যে রূপ দেখা দিবে তাহা হইবে তাহার প্রকাশ রূপ অথবা তাহার ছদ্মবেশ। নিশ্চেতনা হইতে নিশ্চেতন শক্তির দ্বারা প্ররোচিত হইয়া ব্রহ্মের সদ্‌ভাব প্রথমে পরিণতির ক্ষেত্রে জড়রূপে দেখা দেয়। জড়ের মধ্যে যে চেতনা সংবৃত হইয়া ছিল বহিঃ-

প্রকাশ না থাকাতে যাহা নাই বলিয়াই মনে হইতেছিল তাহাই প্রাণকম্পনের ছদ্মবেশে প্রথমে উন্মিষিত হইয়াছে—সে জীবন্ত কিন্তু অবচেতন ; তারপর চেতনপ্রাণের অপূর্ণ রূপায়ণের মধ্যে থাকিয়া ঐ প্রাণের এক নিয়ত তপস্যা চলিতেছে জড়রূপপরম্পরার মধ্য দিয়া আপনাকে পাইবার জন্য, সে-পরম্পরার মধ্যে পরপর এমন রূপ দেখা দিতেছে যাহা ক্রমশঃ অধিকতররূপে তাহার আত্মপ্রকাশের পক্ষে উপযোগী। প্রাণময় চেতনা তাহাব নিষ্প্রাণ নিশ্চেতন জড়জীবনের আদিম অসাড়তাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে এবং আপনাকে অবিদ্যার মধ্যেই ক্রমশই অধিকতর রূপে পাইতে এবং প্রকাশ কবিতে চায়. এই অবিদ্যারূপেই চেতনাকে প্রথমে অপরিহার্য্যভাবে রূপায়িত হইতে হয় ; কিন্তু প্রথমে একটা আদিম মনোময় বোধ, আত্মা এবং বস্তুর একটা প্রাণময় চেতনা. প্রাণময় অনুভূতি শুধু দেখা যায় যাহা প্রথমে অন্য প্রাণ বা জড়েব সংস্পর্শেব সাড়ায় অন্তরে যে বোধ জাগে তাহারই উপরে নির্ভর করে। ইন্দ্রিযানুভূতির এই অপ্রাচুর্য্যের মধ্যে চেতনা যতটা পারে তাহার নিজের স্বাভাবিক আনন্দকে ফুটাইতে চায় ; কিন্তু সে কেবল এক খণ্ডিত সুখ এবং দুঃখকে মাত্র রূপ দিতে সমর্থ হয়। অবশেষে মানুষের মধ্যে পবম চেতনার সক্রিয় শক্তি মনরূপে প্রকাশিত হইতে সমর্থ হয়, যে মন নিজেকে এবং জগৎকে অধিকতর স্পষ্টরূপে জানিতে পারে ; কিন্তু এ মনও একটা খণ্ড এবং সীমিত বস্তু ; চেতনার পূর্ণশক্তি তাহার মধ্যে নাই ; কিন্তু এইবার একটা সম্ভাবনার ধারণা দেখা দেয় এবং তাহার অখণ্ড পূর্ণতার উন্মেষের প্রতিশ্রুতি আসিয়া পৌঁছে। পূর্ণতাব এই উন্মেষ এবং প্রকাশই প্রকৃতি-পরিণামের চরম লক্ষ্য।

মানুষকে বিশ্বের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ইহাই তাহার প্রথম কাজ ; কিন্তু তাহার নিজেকে ফুটাইয়া তুলিতে এবং অবশেষে নিজেকেও ছাড়াইয়া যাইতে হইবে ; তাহার খণ্ডিত সত্তাকে বিস্তার করিয়া পূর্ণসত্তায়, খণ্ড চেতনাকে প্রসারিত করিয়া অখণ্ড পূর্ণচেতনায় রূপান্তরিত করিতে হইবে ; তাহাকে একদিকে তাহার পরিবেশের উপর প্রভুত্বস্থাপন, অন্যদিকে সমগ্র বিশ্বকে সমন্বয়, সামঞ্জস্য এবং একত্বে গ্রথিত করিতে হইবে ; তাহার ব্যষ্টিসত্তার বিকাশ ঘটাইতে হইবে বটে কিন্তু ব্যক্তিত্বকে ব্যাপ্ত করিয়া তাহাকে বিশ্বাত্মার সহিত একাত্ম এবং বিশ্বপুরুষের চিন্ময় আনন্দে উদ্ভাসিত হইতে হইবে। মনে যাহা কিছু অস্পষ্ট, ভ্রমপূর্ণ এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন আছে তাহা পরিমার্জিত, পরিশুদ্ধ এবং রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে অবশেষে জ্ঞান, সঙ্কল্প, অনুভূতি,

কর্ম্ম এবং চরিত্রের স্বাধীন ও উদার সামঞ্জস্য এবং জ্যোতি-ধারার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হইবে—ইহাই তাহার প্রকৃতির স্পষ্ট লক্ষ্য ; বিশ্বস্রষ্ট্রী মহাশক্তি তাহার বুদ্ধিকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং তাহার মন ও প্রাণের উপাদানে এই এষণা প্রোথিত করিয়াছে। কিন্তু যখন সে বৃহত্তর এক সত্তা এবং বৃহত্তর এক চেতনার মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারিবে কেবল তখনই তাহার প্রকৃতির এই আকৃতি সিদ্ধিলাভ কবিবে ; তাহাব বর্ত্তমান আপাত প্রকৃতিতে সাময়িকভাবে যে খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতা দেখা দিয়াছে, তাহা হইতে আত্মপরিণামের ধারা ধরিয়া নিজেকে প্রসারিত এবং সার্থক করিয়া, সে তাহার গোপন চিন্ময় সত্তায় যাহা, সুতরাং বিসৃষ্টিতেও যাহা হইয়া উঠিতে পারে, পূর্ণরূপে তাহাই হইয়া উঠিবে—ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই আশার মধ্যে বিশ্বপ্রতিভাসের অন্তঃস্থ জীবের জীবন ধাবণের সমর্থন বহিয়াছে। স্থূল দেহের সঙ্কীর্ণ কারাগারে বদ্ধ, সীমিত মননের শৃঙ্খলে আবদ্ধ বহিঃক্ষেত্রে অবস্থিত ক্ষণস্থায়ী আপাত মানুষকে, যে নিজের ও জগতের প্রভু এবং নিজসত্তায় যে বিশ্বপুরুষের সহিত একীভূত অন্তরের সেই সত্য মানুষটিতে রূপান্তরিত হইতে হইবে। দার্শনিকের ভাষায় না বলিয়া আরও স্পষ্টভাবে বলিতে পারি প্রাকৃত মানুষকে দিব্য মানুষে পরিণত হইতে হইবে, মৃত্যুব পুত্রগণকে নিজেদের জানিতে হইবে অমৃতের সন্তান বলিয়া। এই জন্যই পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে মানুষের জন্মে পরিণতি-ক্ষেত্রে এক নবতর অবস্থার প্রাপ্তির, একটা নূতন দিকে মোড় ফিরিবার সময় আসিয়াছে —এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, যে জ্ঞান আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে তাহা শুধু মননের সত্য নহে ; ইহা শুধু নিজের অথবা বিশ্বের সম্বন্ধে যথার্থ বিশ্বাস, যথাযথ মতবাদ এবং যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ করা নহে—অবশ্য বহিশ্চর মন জ্ঞান বলিতে ইহাই বুঝে। ঈশ্বর জীব ও জগৎ সম্পর্কে একটা মনোময় স্পষ্ট ধারণা গড়িয়া তোলা বুদ্ধির পক্ষে উত্তম বস্তু হইতে পারে কিন্তু সে জ্ঞান যাহাতে আত্মার পিপাসা মিটাইতে পারে এরূপ বৃহৎ এবং উদার নয় ; এ জ্ঞানে আমবা যে অনন্তের পুত্র এই অপরোক্ষ সচেতন অনুভূতি দিতে পারে না। প্রাচীন ভারত জ্ঞান বলিতে আত্মানুভূতিতে সাক্ষাৎভাবে লব্ধ উচ্চতম সত্য যাহাতে আছে এমন এক চেতনা বুঝিত ; যাহা পরাৎপর বলিয়া জানি তাহা যদি হইতে পারি তবেই খাঁটিভাবে বলিতে পারি যে আমরা জ্ঞানলাভ করিয়াছি। এই জন্যই আমাদের ব্যবহারিক জীবন এবং কর্ম্মকে সত্য ও

ঋত সম্বন্ধে আমাদের মানসিক ধারণা অনুযায়ী যতটা পারা যায় ততটা গঠিত অথবা সার্থক সাংসারিক বুদ্ধির দ্বারা তাহাদিগকে পরিচালিত করা অর্থাৎ নৈতিক জীবন যাপন এবং প্রাণবাসনার পরিতৃপ্তি সাধন করা আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয় বা হইতে পারে না ; আমাদের লক্ষ্য হইবে আমাদের খাঁটি চিন্ময় সত্তায়, পরম চেতনায় ও আনন্দে, শাশ্বত সচ্চিদানন্দস্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়া।

আমাদের সমগ্র সত্তা সেই পরম সত্তার উপর নির্ভর করে, আমাদের মধ্যে তাঁহারই উন্মেষ চলিতেছে ; তাঁহার সত্তায় আমাদের সত্তা, তাঁহার চেতনায় আমাদের চেতনা, তাঁহার চিন্ময়ী শক্তিতে আমাদের শক্তি, তাঁহার আনন্দ হইতে আমাদের সত্তার আনন্দ, চেতনার আনন্দ, শক্তির আনন্দ জাত হইয়াছে ; ইহাই আমাদের সত্তার মূল তত্ত্ব। কিন্তু এই সমস্তের যে রূপায়ণ আমাদের বহিঃসত্তায় দেখা দিয়াছে তাহা অবিদ্যার ভাষায় তাহাদের ভুল অনুবাদ, মূল বস্তু নহে। দিব্যপুরুষের দিকে তাকাইয়া যে বলিতে পারে—'*সোঽহমস্মি*' '*আমিই সেই পুরুষ*' আমাদের অহং সেই চিন্ময় পুরুষ নহে ; আমাদের মননশক্তি সেই চিন্ময় চেতনা নহে ; আমাদের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প চেতনার সে শক্তি নহে ; আমাদের সুখ এবং দুঃখ এমন কি আমাদের উচ্চতম হর্ষ ও উল্লাস সে পরমানন্দ নয়। আমাদের প্রাকৃত জীবনে আমাদের অহং এখনও আত্মার স্থান অধিকার করিয়া আছে ; আমাদের অজ্ঞান ক্রমশঃ জ্ঞানে পরিণত হইতেছে, আমাদের সঙ্কল্প সত্যশক্তি লাভের সাধনায় রত আছে, আমাদের বাসনা সদানন্দকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। একজন অর্দ্ধ-অন্ধ দ্রষ্টা আত্মাকে না জানিয়াও আত্মার কথা বলিতে গিয়া অনুপ্রেরণার যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা ঘুরাইয়া লইয়া বলিতে পারি 'নিজেকে অতিক্রম করিয়া নিজেকে পাইতে হইবে', ইহার জন্যই আমাদিগকে জীবনের বিঘ্ন-বিপদ-সমাকুল কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হয় ; উপরে অদৃশ্য রাজমুকুট পরাইয়া আত্মাহুতির এক কঠিন দায়, এক ক্রুশ মানুষের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়োছে একদিকে আমাদের সত্তার অধস্তলে অবস্থিত নিশ্চেতনা আমাদিগের নিকট সত্তার খাঁটি প্রকৃতি কি এই প্রহেলিকা উপস্থিত করিয়া তাহার উত্তর চাহিতেছে, অন্যদিকে আমাদের উর্দ্ধে এবং অন্তরে শাশ্বত প্রজ্ঞারূপিণী জ্যোতির্ম্ময়ী অবগুণ্ঠনবতী এক অনন্তচেতনা এক দুর্জ্ঞেয় দৈবী মায়ারূপে তাহার সম্মুখীন হইয়া সেই একই প্রহেলিকার উত্তর চাহিতেছে ; এই উভয়ের রহস্যকে ভেদ করিয়া আত্মস্বরূপের সত্য পরিচয় নেওয়াই আমাদের একমাত্র সাধনা।

আমাদের অহংকে অতিক্রম করিয়া আমাদের সত্যস্বরূপকে ফিরিয়া পাওয়া, আমাদের প্রকৃতসত্তাকে জানা এবং লাভ করা, সত্তার খাঁটি পরমানন্দে উদ্ভাসিত হওয়া আমাদের এই জীবনের চরম তাৎপর্য্য; আমাদের ব্যষ্টিগত পার্থিব সত্তার গোপন অর্থ।

মানস জ্ঞান এবং ব্যবহারিক কর্ম্ম প্রকৃতির দেওয়া এই দুই উপায়ের দ্বারা আমাদের সত্তা, চেতনা, বীর্য্য ও ভোগশক্তির যতটুকু আমাদের অপরা প্রকৃতিতে রূপায়িত হইয়াছে, মাত্র ততটুকুই আমরা বাহিরে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি, আবার তাহাদেবই সাহায্যে আমরা আরও জানিতে আরও আত্মপ্রকাশ করিতে, এখনও আমাদিগকে নিজেদের মধ্যে আরও যাহা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে তাহার দিকে নিজেরা গড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করি। কিন্তু এই প্রাকৃতবুদ্ধি এবং মনোময় জ্ঞান কিংবা কর্ম্মের ইচ্ছাই আমাদের চেতনা এবং শক্তির কেবলমাত্র যন্ত্র বা সাধনোপায় নহে; আমাদের সত্তার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ খেলায় এবং বীর্য্যে যে শক্তিকে আমরা প্রকৃতি বলি তাহা তাহার চেতনার ব্যবস্থায় এবং শক্তির প্রযোজনায় সর্ব্বত্র জটিলতা এবং বৈচিত্র্যে ভরা। এই জটিলতার মধ্য হইতে যাহাকে কাজের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারি এরূপ কোন বস্তু বা ঘটনা আমরা আবিষ্কার করি বা আবিষ্কার-যোগ্য মনে করি, আমাদিগকে তাহারই অন্তর্নিহিত মহত্তম এবং সূক্ষ্মতম সম্ভাবনাকে রূপ দিতে হইবে এবং তাহার উদারতম এবং সমৃদ্ধতম শক্তিকে আমাদের জীবনের যে এক পবম লক্ষ্য আছে তাহার সাধনায় নিয়োজিত করিতে হইবে। সে লক্ষ্য এই যে আত্মসম্ভূতিব প্রবেগে আমরা পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিব, আমাদের সিদ্ধ সত্তার এবং আত্মা ও জগৎ-জ্ঞানের দিকে অবিরাম আমরা বাড়িয়া উঠিতে থাকিব, শক্তি ও আনন্দের পরমৈশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়া উঠিব যাহাতে সার্ব-জনীনতা এবং অনন্তের বিপুলতম প্রসারতা এবং উচ্চতম চূড়ার দিকে নিজ-দিগকে এবং জগৎকে ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতররূপে বিস্তৃত ও প্রসারিত করিয়া দিতে পারি, তজ্জন্য নিজের এবং বিশ্বের উপর সেইভাবের কর্ম্মের প্রবল প্লাবন প্রবাহিত করিব। মানুষের যুগযুগান্তব্যাপী তপস্যায় তাহার ধর্ম্মে কর্ম্মে সমাজে, শিল্পে বিজ্ঞানে, নৈতিক বিধি পালনে, এককথায় তাহার জীবনের সকল কর্ম্ম ও সাধনায়, তাহার অন্নময় প্রাণময় মনোময় ও চিন্ময় সত্তার প্রকাশ ও পুষ্টির যে বিপুল আয়োজন চলিতেছে তাহা যেন বিশ্ব-প্রকৃতির তপস্যাময় বৃহৎ নাটকের নানা অঙ্ক; আমাদের বাহ্য দৃষ্টি তাহার

যে কোন সীমিত বা সঙ্কুচিত উদ্দেশ্য দেখুক না কেন, এই মহাতপস্যা ছাড়া তাহার অন্য কোন খাঁটি তাৎপর্য্য বা ভিত্তি নাই। ব্যষ্টিসত্তার পক্ষে দিব্য সার্ব্বজনীনতা এবং পরম অনন্তে পৌঁছা, তাহাকে লাভ করা, তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকা, তাহা হওয়া, তাহাকে জানা, তাহাকে অনুভব করা, এবং নিজের সত্তা, চেতনা, শক্তি ও আনন্দে কেবলমাত্র তাহাকে প্রকাশ করাকেই বৈদিক ঋষিরা জ্ঞান বা বিদ্যা নামে অভিহিত করিতেন ; এই অমৃতত্বলাভ করাকেই মানুষের দিব্যভাবনার চরম আদর্শ বলিয়া মানুষের কাছে তাহারা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

প্রাকৃত মানুষের মনের প্রকৃতি, তাহার নিজের উপব অন্তর্দৃষ্টি এবং জগতের উপর বহির্দৃষ্টির ধরণ অন্যরকম ; তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আদিম সীমা ও সঙ্কোচের জন্য যাহা কিছু ব্যক্ত, যাহা কিছু আপেক্ষিক এবং যাহা কিছু আপাত-প্রতীয়মান তাহাতেই সে বদ্ধ, তাই প্রকৃতি-পরিণামের বিশাল গতির মধ্যে মানুষকে প্রথমতঃ অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারের মধ্যে অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতে হয়। একত্বে ধৃত সত্তার পূর্ণরূপটি প্রথমে সে দেখিতে পায় না ; সে তাহার মধ্যে দেখে বহুত্ব যাহাব সব কিছু তাহার জ্ঞানান্বেষণের পথে তিনটি প্রধান বিভাব বা তত্ত্বে পর্য্যবসিত হয় ;—প্রথম পদার্থটি ব্যষ্টি আত্মা বা সে নিজে, অপর দুইটি প্রকৃতি এবং ঈশ্বর। তাহার অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাকৃত সত্তায় সে সাক্ষাৎভাবে শুধু প্রথমটিকে বা নিজেকে জানে ; সে নিজেকে ব্যষ্টিরূপে আপাতদৃষ্টিতে অন্য সব কিছু হইতে বিযুক্ত পৃথক সত্তা মনে করে কিন্তু বস্তুতঃ সত্তার অন্য অংশ হইতে তাহাকে পৃথক করা যায়না ; সে আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত হইতে চাহিলেও নিজের কাছে নিজে অপর্য্যাপ্ত থাকিয়াই যায়, কেননা সত্তার অন্য অংশকে ছাড়িয়া কখনও সে একা জগতে আসে নাই, একা বাস করে না অথবা একা তাহার চরম সিদ্ধিতে পৌঁছিতে পারে না— ইহাই ত দেখিতে পাই ; তাহাদের সাহায্য এবং বিশ্বপুরুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে তাহার অস্তিত্ব বা সিদ্ধিলাভ কল্পনাই করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এমন কিছু আছে যাহা সে মন ও স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এবং তাহাদের উপর তাহার ক্রিয়ার ফলে পরোক্ষভাবে শুধু জানে, এবং ক্রমশঃ আরও পূর্ণভাবে জানিবার জন্য কঠোর সাধনা তাহাকে করিতেই হয় ; কেননা সত্তার এই বাকী অংশকে সে এড়াইয়া যাইতে পারে না, অথচ তাহার সহিত সে এত অন্তরঙ্গ-ভাবে একীভূত থাকিয়াও তাহা হইতে এত বিবিক্ত ; এই পরিশিষ্ট সত্তাকে বিশ্ব

বা জগৎ, প্রকৃতি বা অন্য জীবসত্তারূপে তাহার দৃষ্টিতে সর্ব্বদা আত্মসদৃশ অথচ সর্ব্বদা বিসদৃশ মনে হয় ; বৃক্ষ এবং জন্তুর সহিত পর্য্যন্ত তাহার এমনি প্রকৃতিগত সাম্য ও বৈষম্যের সম্পর্ক। মনে হয় প্রত্যেকেই যেন স্বতন্ত্র সত্তা, প্রত্যেকেই যেন নিজ পথে চলে অথচ একই গতিপথে সকলকে চলিতে হয়, নিজের বিশেষ ধাপ হইতে সকলেই প্রকৃতি-পরিণামের একই বিশাল ধারার অনুবর্ত্তন করে। অবশেষে সে আভাসে অথবা বরং অনুমানে দেখিতে পায় যে আরও কিছু আছে যাহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরোক্ষভাবে ছাড়া সে কিছুই জানেনা ; নিজেব সত্তার এবং তাহার লক্ষ্য ও আকৃতির মধ্য দিয়া অথবা জগতের এবং তাহা যেদিকে নির্দ্দেশ কবে তাহার মধ্য দিয়া শুধু সে ইহার কিছু আভাষ পায় ; দেখিতে পায় এ জগতে যেন কাহার কাছে পৌঁছিবার জন্য অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া সে তপস্যা করিতেছে, এবং কাহাকে যেন প্রকাশ করিবার জন্যই নানা অপূর্ণ মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতেছে ; অন্ততঃপক্ষে এই সমস্ত মূর্ত্তির সঙ্গে সেই অদৃশ্য সত্যবস্তু এবং গোপনভাবে অবস্থিত অনন্তের সম্বন্ধ না জানিয়াও সেই গোপন অজানিত সম্বন্ধের উপর যেন তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

এই যে অজানা বস্তুটি এই তৃতীয় যে একটা কিছু, ইহাকে মানুষ ঈশ্বর নামে অভিহিত কবিয়াছে ; ঈশ্বর বলিতে সে এমন কিছু বা এমন একজনকে বুঝে, যিনি পরাৎপর ভগবান, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বময় ; সে কখনও ইহাদের কোন একটি বিভূতিতে তাহার প্রকাশ দেখে, কখনও একসঙ্গে তাহার মধ্যে সর্ব্ব-বিভূতির সমন্বয় দেখিতে পায় ; দেখে যে এখানে যাহা কিছু অপূর্ণ বা খণ্ডিত তাহার সমগ্রতার মধ্যে তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে ; এই বিশ্বের অগণিত বিশেষের চরম সেই পরম নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব ; তিনি সেই অজানা যাহার কথা যত অধিক পরিমাণে জানিতে থাকি ততই সকল জানার খাঁটি রহস্য আমাদের কাছে অধিকতররূপে বোধগম্য হইতে থাকে। জীবাত্মা বিশ্ব ও ঈশ্বর এই তিন বিভাবের প্রত্যেককে মানুষ অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে ; কখনও সে তাহার নিজের, কখনও জগতের, কখনও ঈশ্বরের খাঁটি অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত অস্বীকৃতির অন্তরালে তাহার এক দুর্নিবার জ্ঞান-পিপাসা সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাই ; কেননা সে এই তিনের এক একত্বে পৌঁছিবার প্রয়োজন সর্ব্বদাই বোধ করিয়া আসিয়াছে, এইজন্য ইহাদের যে কোন দুইটিকে যদি বর্জন করিতে হয় অথবা দুইটিকে তৃতীয়টির মধ্যে ডুবাইয়া

দিতে হয় তবে তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই। ইহা করিতে গিয়া কখনও সে বলিয়াছে যে 'একমাত্র আমিই আছি কারণরূপে এবং বাকীসকল শুধু আমার মনের সৃষ্টি', কখনও বলিয়াছে প্রকৃতিই একমাত্র সত্যবস্তু আর বাকী যাহা কিছু আছে তাহা প্রকৃতি-শক্তিরই খেলা ; আবার কখনও বলিয়াছে ঈশ্বরই এক পরম সত্যবস্তু আর বাকী সমস্ত তাহার নিজের বা আমাদের উপর কোন এক অনির্ব্বচনীয় মায়ার প্রভাবে আরোপিত ভ্রম মাত্র। এই ভাবের অস্বীকৃতির কোনটাই আমাদের পূর্ণ তৃপ্তি দিতে, সমস্যার পূর্ণ সমাধান করিতে অথবা অবিসংবাদী বা নিশ্চিতরূপে গৃহীত হইতে পারেনা ; যে সিদ্ধান্তের প্রতি ইন্দ্রিয়শাসিত বুদ্ধির পক্ষপাত আছে তাহার সম্বন্ধে একথা আরও বিশেষভাবে খাটে ; কিন্তু সে সিদ্ধান্ত বেশীদিন টিকিতে পারেনা, কেননা ঈশ্বরকে বাদ দিলে মানুষের সত্যকে খুঁজিবার আকূতি এবং নিজের চরম ও পরম সত্যকেই অস্বীকার করা হয়। নিরীশ্বর জড়বাদ জগতে কখনও বেশীদিন বাঁচিয়া থাকে নাই, কেননা মানুষের মধ্যে গোপন এক জ্ঞান আছে যাহা এ মতে কিছুতেই তৃপ্তি পাইতে পারেনা ; ইহা চরম বেদ হইতে পারেনা কেননা সকল মনোময় জ্ঞান অন্তরস্থিত যে বেদের প্রকাশের জন্য তপস্যারত আছে তাহার সহিত ইহার মিল নাই ; যখনই এই গরমিল অনুভূত হইয়াছে তখন এই মত দ্বারা সমস্যার সমাধানে তর্কবুদ্ধি যতই নিপুণ বা তাহার বিচার যতই নিখুঁত হউক না কেন মানুষের মধ্যে অবস্থিত শাশ্বত সাক্ষী-পুরুষের বিচারে সে মত টিকিয়া থাকিতে পারে নাই ; ইহা জ্ঞানের শেষ কথা হইতে পারে না।

মানুষ নিজের কাছে নিজে পর্য্যাপ্ত নয়, জগৎ হইতে বিবিক্ত নয়, সে সর্ব্ব ও শাশ্বতও নয় ; তাহার মন প্রাণ এবং দেহ স্পষ্টতঃ যে বিশ্বের অতিক্ষুদ্র অণুপ্রমাণ এক অংশ মানুষকে দিয়া সে বিশ্বের ব্যাখ্যা চলিতে পারেনা। আবার দেখা যায় পরিদৃশ্যমান জগৎও আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে এবং নিজে নিজের ব্যাখ্যা করিতে পারেনা, এমন কি তাহার অদৃশ্য জড়শক্তি দ্বারাও সুসঙ্গত কোন সমাধান হয়না, কেননা তাহার নিজের এবং বিশ্বের মধ্যে এমন অনেক-কিছু আছে যাহা মানুষ এবং জড়ের অধিকারের বাহিরের বস্তু ; মনে হয় ইহারা সেই বস্তুর একটা দিক, একটা বহিরাবরণ এমন কি একটা মুখোস মাত্র। মানুষের বুদ্ধি বোধি অথবা অনুভূতির মধ্যে কাহারও, একজন অদ্বয় পুরুষ বা এক অদ্বয় তত্ত্ব না হইলে চলেনা, যাহার সঙ্গে জীবশক্তি ও বিশ্বশক্তি একটা সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে, যাহা তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে পারে অথবা

যাহা তাহাদিগকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। সে অনুভব করে যে এই সমস্ত সান্তকে ধারণ করিয়া এক অনন্ত নিশ্চয়ই থাকিবে, যাহা পরিদৃশ্যমান বিশ্বের অন্তরে বাহিরে এবং সকলদিকে অবস্থিত থাকিয়া তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, যাহা বিশ্বের বহুধা-বৈচিত্র্যকে পরস্পরের সহিত যুক্ত; তাহাদিগকে সুষমা ও সামঞ্জস্যে সমন্বিত এবং স্বরূপগত এক একত্বে গ্রথিত করিতেছে। তাহার চিন্তাশীল মনের পক্ষেও এক নির্ব্বিশেষ পরমতত্ত্ব না হইলে চলে না, এই অগণিত সান্ত সবিশেষ যাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিত থাকিতে পারে, যিনি এক চরম সত্যবস্তু, সৃষ্টিশীল এক শক্তি বা এক পুরুষ, যিনি বিশ্বের এই অসংখ্য বস্তুকে সৃষ্টি ও ধারণ করিয়া আছেন। এক পরাৎপর বস্তু, একটা দিব্য সত্য, একটা কারণ-তত্ত্ব, এক নিত্য শাশ্বত অনন্ত, একটা অখণ্ড পূর্ণতা যাহার দিকে সকলের হৃদয় উন্মুখ হইয়া আছে, যিনি সকলের পরম আস্পৃহার বস্তু, যে সর্ব্বময়ের মধ্যে সর্ব্বভূত অব্যক্তভাবে নিত্য বর্ত্তমান আছে এবং যাহা ছাড়া কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারিত না, সেই বস্তু বা পুরুষকে যে নামেই সে অভিহিত করুক না কেন তাহা বা তিনি না থাকিলে তাহার চলে না।

অথচ মানুষ জীব এবং জগৎকে বাদ দিয়া শুধু এই চরমতত্ত্বকে খাঁটিরূপে স্থাপিত করিতে পারে না ; কেননা তাহা হইলে এখানে যে সমস্যা তাহার সমাধান করিবার কথা তাহা হইতে তাহার পক্ষে দূরে সরিয়া পড়া হইবে ; সে নিজে অথবা জগৎ এক দুর্ব্বোধ প্রহেলিকা অথবা উদ্দেশ্যহীন একটা রহস্যই থাকিয়া যাইবে, তাহাদের কোন ব্যাখ্যা মিলিবে না। এরূপ সমাধানে তাহার বুদ্ধির এক অংশ এবং তাহার বিশ্রাম বাসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে যেমন তাহার স্থূলসেবী বুদ্ধি বিশ্বাতীত বস্তুকে অস্বীকার করিয়া জড়প্রকৃতিকে পরম দেবতার আসনে বসাইয়া সহজেই তৃপ্তিলাভ করে ; কিন্তু এ সমাধানে তাহার হৃদয় তাহার সঙ্কল্প তাহার চিত্তের সংবেগ তাহার সত্তার বীর্য্যবত্তম এবং গভীরতম অংশগুলির কোন অর্থ থাকে না, তাহাদের কোন উদ্দেশ্য বা সমর্থন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অথবা মনে হয় তাহারা যেন শুদ্ধ সৎস্বরূপের শাশ্বত প্রশান্তির উপর আরোপিত অথবা বিশ্বের শাশ্বত নিশ্চেতনার মধ্যে অবস্থিত উদ্দেশ্যহীন, আকস্মিক মূর্খতার এক অসার এবং চঞ্চল ছায়ানৃত্য মাত্র। এ সিদ্ধান্তে বিশ্ব অনন্তের সযত্নরচিত অনুপম এক মিথ্যা মাত্র হইয়া পড়ে ; এই দাঁড়ায় যে বিরাটরূপে মানুষকে আক্রমণ করিলেও বিশ্ব বস্তুতঃ স্বতঃবিরোধ-কণ্টকিত একটা আকাশ-কুসুম—একটা বস্তু যাহার কোন অস্তিত্ব নাই ;

আসলে ইহা দুঃখজনক এবং যন্ত্রণাগ্রস্ত এক প্রহেলিকা অথচ বিস্ময়, সৌন্দর্য্য ও আনন্দের মিথ্যা মোহিনীমূর্ত্তিতে দেখা দিতেছে। অথবা বিশ্ব হয়তো শৃঙ্খলাবদ্ধ অন্ধশক্তির এক অর্থহীন বিরাট খেলা এবং মানুষের নিজের সত্তা সেই অচেতন বিশালতার বক্ষে ক্ষণিক এবং ক্ষুদ্র এক প্রহেলিকা, কেন সে আবির্ভূত হইয়াছে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু এই পথে বা এই মতে যে চেতনা, যে শক্তি জগৎ এবং মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ কবিতেছে তাহার কোন সার্থক পরিণাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; মানুষের মন চায় এমন একটা যোগসূত্র যাহাতে সকলকে একসঙ্গে গ্রথিত করা যায়, এমন একটা কিছু যাহাকে ধরিয়া জগৎ মানুষের মধ্যে এবং মানুষ জগতের মধ্যে সার্থক হইতে পারে এবং ইহারা উভয়ে ঈশ্বরের মধ্যে নিজেদের পরম সার্থকতা দেখিতে পায়, কেননা চরম-দৃষ্টিতে দেখা যায় ব্রহ্মই জীব এবং জগৎ এ উভয়ের মধ্য দিয়া নিজেকেই অভিব্যক্ত করিতেছেন।

জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম এই তিনেব একত্ব স্বীকাব ও অনুভব করা পূর্ণ জ্ঞান-লাভের পক্ষে অপরিহার্য্য ; ব্যষ্টিসত্তার ক্রমবর্দ্ধমান আত্মজ্ঞান এই একত্ব এবং অখণ্ডতার দিকেই উন্মিষিত হইতেছে এবং যদি পরম তৃপ্তি ও পরিপূর্ণতা লাভ করিতে হয় তবে তাহাকে সেই অখণ্ড তত্ত্বে পৌঁছিতেই হইবে। কেননা এই একত্বের উপলব্ধি ছাড়া এ তিনের কোন জ্ঞানই পূর্ণতা পাইতে পারে না ; এই একত্বের উপরেই প্রত্যেকের অখণ্ড পূর্ণতার প্রতিষ্ঠা। আবার প্রত্যেককে পূর্ণভাবে জানিলেই আমাদের চেতনায় এ তিন আসিয়া পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া এক হইতে পারে ; এক পূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানের মধ্যে সকল জানা এক এবং অবিভাজ্য হইয়া উঠে। নতুবা তিনকে বিভক্ত করিয়া একটিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া অপর দুইটিকে বাদ দিয়া আমরা একপ্রকারের পঙ্গু একত্বের ধারণা শুধু পাইতে পারি। তাই মানুষকে আত্মজ্ঞান বিশ্বজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান, এই ত্রিধারার বিস্তার সাধন করিয়া এক পূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানে পৌঁছিতে হইবে, যেখানে সে দেখিতে পাইবে যে এই তিন এক এবং পরস্পরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ত্তমান আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ ইহাদিগকে অংশত মাত্র জানিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অপূর্ণ জ্ঞান হইতে ভেদের সৃষ্টি হইবে ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্ব-সমন্বয়কারী একত্বের মধ্যে তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে না পারিবে ততক্ষণ প্রর্য্যন্ত সত্যের সমগ্র রূপ এবং তাহাদের অস্তিত্বের মূল সার্থকতা সে দেখিতে পাইবে না।

অবশ্য একথার এমন অর্থ নয় যে ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ বা স্বয়ংপূর্ণ তত্ত্ব নহেন; ঈশ্বর আপনাতে আপনি বর্ত্তমান, জগৎ বা মানুষের উপর তাঁহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না; অথচ জীব এবং জগৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান, আপনাতে আপনি থাকিবার শক্তি তাহাদের নাই; ব্রহ্মসত্তার সহিত তাহাদের সত্তা এক—এই হিসাবে কেবল তাহাদের অস্তিত্ব বা স্বয়ম্ভাব আছে ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি তাহারা প্রত্যেকে ব্রহ্মশক্তির এক এক প্রকাশ; এমন কি ব্রহ্মের শাশ্বতসত্তায় তাহাদের চিন্ময় তত্ত্ব কোন না কোনভাবে বর্ত্তমান আছে অথবা নিহিত রহিয়াছে, কেননা তাহা না হইলে তাহাদের প্রকাশ সম্ভব হইত না অথবা প্রকাশ হইলেও তাহাদের কোন সার্থকতা থাকিতনা। এখানে মানুষরূপে যাহাকে দেখিতেছি তাহা বস্তুত ঈশ্বরের ব্যষ্টিবিগ্রহ; এক পরম-দেবতাই নিজে বহুর মধ্যে আত্মবিস্তার করিয়া সর্ব্বভূতান্তরাত্মা* হইয়াছেন। আবার নিজের আত্মাকে এবং জগৎকে জানিয়াই মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছিতে পারে, ইহা ছাড়া তাঁহাকে জানিবার অন্য উপায় তাহার নাই। ঈশ্বরের প্রকাশকে বর্জন করিয়া নয় পরন্তু তৎসম্বন্ধে তাহার নিজের অজ্ঞতা এবং অজ্ঞতার ফলকে নিরাকৃত করিয়াই সে উত্তমরূপে নিজের উন্নয়ন এবং তাহার সমগ্র সত্তা, চেতনা, শক্তি এবং আনন্দকে দিব্যপুরুষের নিকট পূজোপহার-রূপে নিবেদন করিতে পারে। সে নিজে ব্রহ্মের এক প্রকাশ বলিয়া নিজের মধ্য দিয়া অথবা জগৎ ব্রহ্মের আর এক প্রকাশ বলিয়া তাহার মধ্য দিয়া সে এই ভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে। তাহার নিজের মধ্য দিয়া যে পথ, শুধু সে পথে একাকী চলিয়া অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের মধ্যে তাহার ব্যষ্টিচেতনাকে ডুবাইয়া অথবা নির্ব্বাপণ করিয়া দিতে এবং বিশ্বকে হারাইয়া ফেলিতে পারে। আবার শুধু বিশ্বের মধ্য দিয়া যে পথ তাহার অনুসরণে সে তাহার ব্যক্তিসত্তাকে বিরাটসত্তার নৈর্ব্বক্তিকতার অথবা সক্রিয় চিৎশক্তিযুক্ত বিশ্বপুরুষের মধ্যে ডুবাইয়া দিতে পারে; এমনি ভাবেই সে হয় বিশ্বাত্মায় বিলীন অথবা বিশ্বশক্তি-প্রবাহের নৈর্ব্যক্তিক খাতে হয় পরিণত। কিন্তু উভয়পথকে সমগ্র ও সমভাবে গ্রহণ করিয়া উভয়পথের পূর্ণতার মধ্য দিয়া উভয়কে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলে দিব্যপুরুষকে সর্ব্বভাবে ধারণ করা যায়; এ অবস্থায় সে জীব ও জগৎ এ উভয়কে অতিক্রম করিয়া গিয়াই উভয়কে পূর্ণ করিয়া তোলে, নিজের সমগ্র

* একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—কঠোপনিষদ ৫।১২

সত্তায় সে যেমন দিব্যপুরুষকে লাভ করে তেমনি সে নিজে দিব্যপুরুষের সত্তা, চৈতন্য, আলোক, শক্তি, আনন্দ এবং জ্ঞান দ্বারা আবৃত, অনুবিদ্ধ, পরিব্যাপ্ত ও অধিকৃত হয়। এমনি করিয়া নিজের মধ্যে এবং জগতের মধ্যে সে ঈশ্বরকে লাভ করে। সেই সর্ব্বজ্ঞান তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিলে সে নিজে কেন ব্রহ্মদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং সৃষ্ট জগতে সে পূর্ণতা লাভ করিলে কিভাবে সে জগৎ সার্থক হইবে তাহা সে বুঝিতে পারে। অতিমানস পরা-প্রকৃতিতে উত্তরণ এবং তথা হইতে বিসৃষ্টির মধ্যে সেই শক্তির অবতরণের ফলে এ সমস্ত পূর্ণরূপে সত্য এবং সফল হইয়া উঠিবে। কিন্তু আজিও যখন সেই পূর্ণসিদ্ধি সুদূর এবং বহুকষ্টসাধ্য হইয়া রহিয়াছে তখনও আমাদের অন্ন-প্রাণ-মনোময়ী প্রকৃতিতে দিব্য চিন্ময় জ্যোতির প্রতিফলন বা গ্রহণের ফলে আমাদের অন্তশ্চেতনায় সে প্রকৃত জ্ঞানকে সত্য করিয়া তোলা যায়।

কিন্তু পরিণতির পথে অনেকদূর অগ্রসর না হইলে এই চিন্ময় সত্য এবং জীবনের খাঁটি আদর্শকে আমাদের মধ্যে ফুটিতে দেওয়া হয়না ; জীবনের প্রথম উদ্যোগপর্ব্বে প্রকৃতি-পরিণামের প্রথম ধাপে ব্যক্তিসত্তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ স্পষ্ট এবং সমৃদ্ধ করা, তাহাকে দৃঢ়, বীর্য্যময় এবং পূর্ণ করিয়া তোলা—এই সমস্তই চলিতে থাকে ; এইজন্য প্রথমে নিজের অহং লইয়াই তাহাকে প্রধানতঃ ব্যস্ত থাকিতে হয়। পরিণতির এই অহংসর্ব্বস্বতার যুগে তাহার নিজের মূল্যের নিকট জগৎ বা অন্যজীবসকলের মূল্য অনেক কম ; তাহারা তাহার সহায় হয় এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয় কেবল এই জন্যই তাহাদের কিছু মূল্য স্বীকৃত হয়। এই যুগে মানুষ নিজের মূল্যের কাছে ঈশ্বরের মূল্যও অনেক কম মনে করে ; তাই প্রাথমিক ধর্ম্মমতসমূহে, ধর্ম্মবোধের নিম্নতম স্তরে দেখি ঈশ্বর বা দেবতাগণকে মানুষ নিজের বাসনা-পরিতৃপ্তির পরমযন্ত্র বা পরম সাধনরূপে কল্পনা করিয়াছে ; মানুষের জন্যই তাঁহারা আছেন ; তাহার অভাব, প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য যে জগতে সে বাস করে তাহাকে ব্যবহার করিবার পক্ষে মানুষের সহায়তা করাই তাঁহাদের কাজ। তাহার মধ্যস্থ সকল পাপ, অত্যাচার এবং স্থূলতার সহিত এই প্রাথমিক আত্মসর্ব্বস্ব ভাবে পরিপুষ্টি যথাস্থানে যে একটা অনর্থ বা প্রকৃতির একটা ভ্রম একথা কোন-মতেই বলা চলেনা ; মানুষের পরিণতির প্রথম পর্ব্বে তাহার নিজের ব্যক্তিত্বকে খুঁজিয়া পাইবার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে ; নিম্নতর অবচেতনার মধ্যে পৃথিবীর সংহত চেতনার (Mass Consciousness) দ্বারা অভিভূত

হইয়া প্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিয়ার হাতে সম্পূর্ণরূপে খেলার বস্তুরূপে যে ব্যক্তি-চেতনা ছিল তাহাকে পূর্ণরূপে মুক্ত করিবার জন্য এই অহং সর্ব্বস্বতার প্রয়োজন রহিয়াছে। ব্যষ্টি-মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে তাহার ব্যক্তিত্বকে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত করিয়া লইতে হইবে, বীর্য্যের সহিত নিজেকে স্থাপনা করিতে হইবে, তাহার শক্তি জ্ঞান ও ভোগের সামর্থ্যকে এমনভাবে উন্মিষিত করিতে হইবে যাহাতে সে সমস্ত জগতের এবং প্রকৃতির উপর প্রবলভাবে তাহাদিগকে প্রয়োগ করিয়া জগৎকে অধিক হইতে অধিকতররূপে আপন বশে আনিতে পারিবে; প্রকৃতি-পরিণামের এই প্রাথমিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য, যাহা সূক্ষ্মভাবে আপনাকে অপর সব কিছু হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিতে পারে, সেই অহং বস্তুটি মানুষকে দেওয়া হইয়াছে। যতদিন সে তাহার ব্যষ্টি-সত্তা, ব্যক্তিত্ব ও বিবিক্ত সামর্থ্যকে পুষ্ট করিয়া তুলিতে না পারিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহার সম্মুখে যে বৃহত্তর কর্ম্ম আছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য উপযুক্ত হইতে অথবা উচ্চতর বৃহত্তর এবং দিব্যতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহার সকল বৃত্তি সফলভাবে প্রয়োগ করিতে পারিবে না। জ্ঞানের মধ্যে নিজেকে পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে অবিদ্যার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

কারণ নিশ্চেতনা হইতে প্রবাহিত পরিণামের ধারাতে প্রথম হইতে দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে,—এক গোপন বিশ্বচেতনা এবং বহিস্তরে ব্যক্ত এক ব্যষ্টিচেতনা। এই নিগূঢ় বিশ্বচেতনা বহিস্তরে স্থিত ব্যষ্টি চেতনার কাছে গোপন এবং অধিচেতন হইয়া রহিয়াছে; বিশ্বচেতনাই নিজেকে ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া বহিস্তলে বিবিক্ত বস্তু এবং সত্তাসকলকে সৃষ্টি করে বা তত্তৎরূপে প্রকাশিত হয়। এ চেতনা একদিকে যেমন বিবিক্ত বস্তু সকল এবং বিবিক্ত ব্যষ্টিসত্তার দেহ এবং মন গড়িয়া তোলে তেমনি তাহা নানা গোষ্ঠী বা সংঘ চেতনাও গড়িয়া তোলে যাহারা বিশ্বপ্রকৃতির ভাবময় বৃহত্তর রূপায়ণ, কিন্তু সে চেতনা ভাবরূপী এ সমস্ত রূপায়ণকে সুগঠিত কোন বিশিষ্ট মন বা দেহ দান করেনা; ইহা ব্যষ্টি জীবের এক সমষ্টি বা গোষ্ঠীকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে তাহাদের জন্য এক সংঘ-মন এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল অথচ নিরবচ্ছিন্ন এক সংঘ-দেহ গড়িয়া তোলে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সংঘমধ্যস্থিত ব্যষ্টি ব্যক্তিরা যত সচেতন হয় সংঘসত্তা বা সংঘপুরুষও তত সচেতন হইতে পারে; সংঘপুরুষের বাহিরের শক্তি বা বিস্তারের দিকে না দেখিয়া ভিতরের দিকে দেখিলে বলিতে হয় যে তন্মধ্যস্থ ব্যষ্টিপুরুষগণের পুষ্টি ও বৃদ্ধি তাহার অন্তরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির

অপরিহার্য্য সাধন বা উপায়। এইখানে ব্যক্তিচেতনার দুইভাবের উপযোগিতা দেখিতে পাই, বিশ্বচিৎ বা বিশ্বপুরুষ ব্যষ্টিচেতনার মধ্য দিয়াই সংঘচেতনা-সমূহকে গঠিত, আত্মপ্রকাশশীল এবং উন্নতিশীল করিয়া তোলেন; আবার ব্যষ্টি-চেতনার মধ্য দিয়াই বিশ্বপুরুষ প্রকৃতিকে নিশ্চেতনা হইতে অতিচেতনাতে লইয়া যান এবং তাহাকে উন্নীত করিয়া বিশ্বাতীত সত্তায় পৌঁছাইয়া দেন। সাধারণতঃ গণচেতনা নিশ্চেতনারই প্রতিবেশী; গণচেতনা অবচেতন, অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে সে বিচরণ করে; ব্যক্তিচেতনার সাহায্যেই তাহাকে গঠিত আলোকের মধ্যে প্রকাশিত বিধিবদ্ধ এবং কার্য্যক্ষম করিয়া তোলা যায়। গণচেতনা যখন নিজে চলে তখন সাধারণতঃ সে অধিচেতনার অস্পষ্ট অর্দ্ধগঠিত বা অগঠিত উত্তেজনার সঙ্গে বিজড়িত অবচেতনার যে প্রবেগ বহি-স্তরে ভাসিয়া ওঠে তাহার দ্বারাই চালিত হয়; যাহা, কিছু দেখিতে জানে না অথবা যাহার দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ এমন এক ঐক্যমতের দিকেই থাকে গণ-চেতনার প্রবল ঝোঁক, এজন্য সাধারণ কাজে সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খর্ব্ব করে; যখন সে চিন্তা করে, তখন কোন আদর্শ বাক্য, কোন দলের জিগির, কোন হুজুগের মন্ত্র, সাধারণ স্থূল কোন ধারণা, বাজার-চলিত কোন সংস্কার, সাধারণের স্বীকৃত কোন মতবাদ অনুসারেই তাহার চিন্তাধারা চলে; আর তাহার কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, হয় তাহার সহজাত সংস্কার বা আবেগ নয়তো দলের বিধান, দলগত মনোবৃত্তি বা দলগত চিত্তের সংস্কার দ্বারা। সংঘগত চেতনা, প্রাণ এবং ক্রিয়া অসাধারণভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে যদি তাহাকে রূপায়িত, গঠিত, প্রকাশিত এবং পরিচালিত করিবার জন্য এক বা একাধিক শক্তিশালী ব্যক্তি-পুরুষ পাওয়া যায়; হঠাৎ কখনও কখনও সমষ্টিগত ক্রিয়া ও গতি, পর্ব্বতগাত্র হইতে স্খলিত বিরাট বরফ স্তূপ বা প্রবল ঝড়ের মত দুর্ব্বার হইয়াও পড়িতে পারে। ব্যষ্টিচেতনাকে দমিত বা পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া গণচেতনা কোন জাতি বা সম্প্রদায়কে কার্য্যক্ষেত্রে অতিপ্রবল করিয়া তুলিতে পারে যদি তন্মধ্যস্থ অধিচেতন সমষ্টিগত পুরুষ যাহার মধ্যে তাহার ভাব ও নির্দ্দেশ রূপায়িত হইয়া উঠিতে পারে এমন একটা অবশ্যপালনীয় সংস্কার গড়িয়া তুলিতে অথবা তদ্-ভাবে ভাবিত কোন দল, শ্রেণী বা নেতা সৃষ্টি করিতে পারে; নিজের মধ্যস্থিত ব্যক্তিগণের উপর কোন বিশেষ সংস্কৃতি অতি কঠোর ও দৃঢ়ভাবে চাপাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে এমন কোন সম্প্রদায়ের অথবা ক্ষাত্রবীর্য্যশাসিত রাজ্যের মধ্যে যে অনেকসময় প্রবল শক্তি দেখা দিয়াছে তাহার অথবা জগজ্জয়ী অনেক বীরের

সফলতার মূলে ছিল প্রকৃতির এই গোপন রহস্য। কিন্তু ইহা বাহিরের জীবনেরই কার্য্যদক্ষতা বা সফলতা ; এবং এই বহির্জীবনই আমাদের সত্তার উচ্চতম জীবন বা চরম কথা নহে। আমাদের মধ্যে আছে মন, আছে আত্মা, আছে চিৎ-সত্তা ; এবং আমাদের জীবনের কোন খাঁটি মূল্য থাকে না যদি তাহার মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু এক চেতনা, ক্রমবিকাশশীল এক মন না থাকে ; যদি প্রাণ এবং মন আত্মার বা অন্তর্ব্বাসী চিৎসত্তার প্রকাশ-ক্ষেত্র এবং যন্ত্র, তাহার মুক্তি এবং পূর্ণতালাভের উপায় না হয়।

কিন্তু মনের উন্নতি এবং আত্মার পুষ্টি এমন কি সংঘমন এবং আত্মার উন্নতি ও পুষ্টি নির্ভর করে ব্যষ্টি-ব্যক্তির বা সংঘের যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপর ; নির্ভর করে গণচিত্তে এখনও যাহা অস্ফুট ও অপ্রকাশিত আছে, যাহা এখনও অবচেতনা হইতে গঠিত হইয়া উঠে নাই অথবা ভিতর হইতে বা অতিচেতনা হইতে যাহা এখনও নামাইয়া আনা হয় নাই তাহা ফুটাইয়া তুলিতে, নামাইয়া আনিতে বা প্রকাশ করিতে সমর্থ ব্যষ্টি-ব্যক্তির বিবিক্ত শক্তির উপর। সংঘ একটা স্তূপ বা পিণ্ড, রূপায়ণের এক ক্ষেত্র ; ব্যষ্টিব্যক্তিই তাহার মধ্যে সত্য-দ্রষ্টা রূপকার বা স্রষ্টা। সমষ্টির ভিড়ের মধ্যে ব্যষ্টি তাহার অন্তরের নির্দ্দেশ হারাইয়া ফেলে—গণদেহের এক কোষাণুরূপে সে সংঘগত সঙ্কল্প বা ভাবনা বা আবেগ দ্বারা চালিত হয়। ব্যষ্টি-ব্যক্তিকে সরিয়া দাঁড়াইতে এবং সমগ্রের মধ্যে তাহার বিবিক্ত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ; যেমন তাহার দেহের একটা স্বকীয় কিছু আছে এবং যাহা সাধারণ দেহের মধ্যে তাহার বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ করে তেমনি তাহার মনকে সাধারণ মনন হইতে উত্থিত হইয়া উঠিতে তাহার প্রাণকে সাধারণ প্রাণের সমরূপতা হইতে নিজের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথক করিয়া তুলিতে হইবে। এমন কি অবশেষে নিজেকে পাইবার জন্য নিজেকে গুটাইয়া আনিয়া নিজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে এবং যখন সে নিজেকে পাইবে, কেবল তখনি সে চিন্ময়রূপে সকলের সহিত এক হইতে পারিবে। যখন যথাযথ পরিমাণে তাহার ব্যক্তিত্ব গঠিত হইয়া উঠে নাই, তখন যদি দেহ, মন ও প্রাণেই সে সকলের সহিত একত্ব খুঁজিতে যায়, তাহা হইলে গণচেতনার দ্বারা সে অভিভূত হইয়া পড়িবে, তাহার আত্মা, মন বা প্রাণের সম্যক স্ফূর্ত্তি ব্যাহত হইবে এবং সে নিজে গণদেহের একটা সাধারণ কোষাণুমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িবে। তাহাতে সংঘগত সত্তা শক্তিশালী এবং তাহার প্রভাব অপ্রতিহত হইতে পারে কিন্তু সম্ভবতঃ সে সাবলীলতা

হারাইয়া ফেলিবে এবং পরিণতির পথে তাহার গতি ব্যাহত হইবে। সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিণতির প্রবল গতির যুগ দেখা দিয়াছে যেখানে ব্যষ্টিসত্তা মনে প্রাণে বা অধ্যাত্মসত্তায় সজীব ও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের মধ্যে অহংকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে যাহাতে ব্যষ্টি-ব্যক্তি নিজেকে সংঘজীবনের অচেতনা বা অবচেতনা হইতে মুক্ত করিয়া সজীব মন, প্রাণশক্তি, হৃদয় ও আত্মাতে নিজে স্বতন্ত্র হইতে পারে এবং যাহাতে নিজেকে তাহার চারিদিকে অবস্থিত জগতের সহিত সমন্বিত করিতে পারে অথচ নিজের বিবিক্ত সত্তা বা শক্তি হারাইয়া তাহাব মধ্যে ডুবিয়া না যায়, নিজের ব্যষ্টিসত্তা এবং কার্য্যকারিতা হারাইয়া না বসে। কাবণ ব্যষ্টিসত্তা বস্তুতঃ বিশ্বসত্তার অংশ বটে কিন্তু সে আরও বেশী কিছু, সে এক আত্মা যাহা বিশ্বাতীত সত্তা হইতে এখানে অবতবণ করিয়াছে। ইহাকে সে এখনই প্রকাশ কবিতে পারিতেছে না, কেননা সে এখনও বিশ্বগত নিশ্চেতনার অতি নিকটে এবং নিজের উৎসরূপী অতিচেতনা হইতে দূবে আছে ; নিজেকে আত্মা বা চিদ্‌বস্তুরূপে পাইবার পূর্ব্বে তাই তাহাকে মনোময় এবং প্রাণময় অহংএর মধ্যে নিজেকে পাইতে হইবে।

তথাপি বলিতে হইবে ব্যক্তিগত অহংএর প্রতিষ্ঠা হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না ; খাঁটি চিন্ময় ব্যষ্টিসত্তা মনোময় অহং, প্রাণময় অহং বা দেহময় অহং নহে ; পরিণতিধারার প্রথমে প্রধানতঃ সঙ্কল্পের, শক্তির বা অহংএর প্রতিষ্ঠার কাজ চলে, জ্ঞানের স্থান তখন তাহার মধ্যে শুধু গৌণ। তাই এমন সময় একদিন আসিবেই যেদিন মানুষ তাহার অহংগত সত্তার অন্ধকারময় বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজেকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; তাহাকে খাঁটি মানুষটি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যাত্রা করিতে হইবে ; তাহা না হইলে প্রকৃতির প্রাথমিক পাঠশালায় তাহাকে প্রথম পাঠ লইয়াই থাকিতে হইবে এবং উচচ বিদ্যালয়ের বৃহত্তর এবং গভীরতর পাঠ কখনও গ্রহণ করিতে পারিবে না ; সে ক্ষেত্রে তাহার ব্যবহারিক জ্ঞান এবং কর্ম্মকুশলতা যতই বেশী হউক না কেন তাহাকে একটু উচচতর পশু ছাড়া আর কিছু বলা চলিবে না। তাই তাহাকে প্রথমতঃ তাহার নিজের মনস্তত্ত্ব জানিতে হইবে এবং তাহার স্বাভাবিক উপাদানসমূহকে,—অহং, মন এবং তাহার যন্ত্রসমূহ, প্রাণ ও দেহকে—পৃথকভাবে ভালরূপে চিনিতে হইবে, অবশেষে সে আবিষ্কার করিবে যে এইসমস্ত নৈসর্গিক উপাদানের ক্রিয়াদ্বারা তাহার অস্তিত্বের সমগ্রতাকে বুঝা যায় না,

ইহাও বুঝিবে অহংএর প্রতিষ্ঠা এবং তর্পণ ছাড়াও তাহার ক্রিয়াধারার অন্য এক লক্ষ্য আছে। জীবনের পরিপূর্ণ অর্থ ও লক্ষ্য সে প্রকৃতি এবং মানবজাতির মধ্যে খুঁজিতে পারে ; তাহা হইবে জগতের বাকী অংশের সহিত তাহার একত্ব আবিষ্কারের প্রথম সূচনা ; সে-অর্থ ও লক্ষ্য সে পরাপ্রকৃতির বা ঈশ্বরের মধ্যেও খুঁজিতে পারে, তাহা হইবে ব্রহ্মের সহিত তাহার একত্বজ্ঞানের প্রথম সোপান। কার্য্যক্ষেত্রে সে উভয় পথই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে, সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ করিতে করিতে এই দ্বৈতমার্গের অনুসন্ধানের ফলে খণ্ড খণ্ড সত্যের যে বহু-সিদ্ধান্ত সে পরপর আবিষ্কার করে তাহাদের প্রত্যেকটি নিজের উপযোগী বলিয়া একের পর অন্যটি গ্রহণ করিতে থাকে কিন্তু কোনটাতেই তাহার চিত্ত নিশ্চিত অবলম্বন পায় না।

কিন্তু তথাপি তাহার এই স্তরে এই সমস্তের মধ্য দিয়া সর্ব্বদাই সে নিজেকে আবিষ্কার করিতে, জানিতে এবং পূর্ণ করিতে চাহিতেছে ; তাহার বিশ্বজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান তাহার আত্মজ্ঞান লাভের, তাহার সত্তার পূর্ণতার, তাহার ব্যক্তিসত্তার পরমপুরুষার্থকে চরিতার্থ করিবার সহায় ও উপায় মাত্র। সাধনার লক্ষ্য প্রকৃতি এবং বিশ্বের উপর পড়িলে তাহা হইতে মন ও প্রাণভূমির সিদ্ধি, আত্ম-জ্ঞান আত্মজয় এবং জগতের উপর আধিপত্যস্থাপনের আকারে দেখা দিতে পারে ; আর লক্ষ্য যদি হয় ঈশ্বর তাহা হইলেও ঐ সমস্ত আসিতে পারে কিন্তু তখন জগৎ এবং আত্মার উচ্চতর চিন্ময় অর্থ পরিস্ফুট হইবে ; অথবা ধার্ম্মিক সাধকের সেই সুপরিচিত এবং সুনিশ্চিত ব্যষ্টি মুক্তিসাধনের আকৃতি ও চেষ্টা দেখা দিবে, যে মুক্তির ফলে সাধক জগদতীত কোন পরমধামে প্রয়াণ, অথবা ব্যক্তিগত-ভাবে এক পরমাত্মা বা এক পরম অসতের মধ্যে আত্মনিমজ্জন করিয়া এক আনন্দঘন অবস্থা বা নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে। কিন্তু যে পথ ধরুক না কেন ইহাতে ব্যষ্টিসত্তাই বিবিক্তভাবে নিজের আত্মজ্ঞান, নিজের পুরুষার্থসিদ্ধি চাহিতেছে, বাকি সব কিছু, এমন কি বিশ্বহিতৈষণা, বিশ্বমৈত্রী, মানবসেবা, আত্মবিসর্জন বা আত্মবিলোপের উন্মাদনা প্রভৃতিকেও—তা যে কোন সূক্ষ্ম ছদ্ম-বেশে আসুক না কেন—তাহার ব্যক্তিগত সিদ্ধির যে মহৎ লক্ষ্য সে পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া লইয়াছে তাহার সহায় এবং উপায় স্বরূপে আনিয়া হাজির করিয়াছে। মনে হইতে পারে যে এ সমস্ত তাহার অহমিকারই সম্প্রসারণ এবং বিবিক্ত অহংই মানুষের সত্তার মর্ম্মসত্য ; এ অহং শেষপর্য্যন্ত অথবা ততদিন পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইবে যতদিন সে সকল বৈশিষ্ট্যপরিশূন্য শাশ্বত অনন্তের মধ্যে নিজের আত্ম-

বিলয় ঘটাইয়া ইহার হাত হইতে মুক্ত না হইবে। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিসত্তার পশ্চাতে এক গভীরতর রহস্য আছে, আছে গোপন এক চিন্ময় নিত্য ব্যষ্টি-সত্তা বা পুরুষ, যাহা তাহার ব্যষ্টিসত্তা এবং তাহার দাবীকে সমর্থন ও সার্থক করে।

জীবের হৃদয়ে এই দিব্য চিন্ময়পুরুষ আছেন বলিয়া ব্যষ্টিজীবেরই পূর্ণতা বা মুক্তিলাভ *হয়, জীবসমষ্টির নহে ; কেননা সমষ্টির মধ্যে যে পূর্ণতা আনিতে চাওয়া যায় তাহার অঙ্গীভূত ব্যষ্টিসমূহের মধ্যে পূর্ণতা আনিতে পারিলেই তাহা সাধিত হয়। জীব তৎস্বরূপ বা স্বরূপতঃ সেই ব্রহ্ম বলিয়াই নিজেকে পাওয়া তাহার পরম প্রয়োজন। ব্যষ্টিসত্তাই পরমদেবতার কাছে পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জন এবং আত্মনিবেদন করিয়া নিজেকে পূর্ণরূপে দেওয়ার মধ্যে নিজেকে পূর্ণরূপে পাই-বার পরমানন্দ লাভ করে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় এমন কি চিন্ময় অহংএর বিলোপসাধন করিয়া অরূপ অসীম ব্যষ্টিসত্তাই অনুভব করে নিজের অনন্তত্বের মধ্যে ডুবিবার শান্তি এবং আনন্দ। ঈশ্বর নিজে কোন বস্তু বা সত্তা নহেন, অথবা তিনি সর্ব্ববস্তু বা সর্ব্বসত্তা অথবা তিনিই সকলের পরপারস্থিত পরম অদ্বৈত তত্ত্ব ; জীবাত্মার এই সমস্ত অনুভবের মধ্য দিয়া জীবহৃদিস্থিত ব্রহ্মই সেই উচ্চতম পরম অবস্থার মধ্যে নিম্নের অবস্থাকে বিস্ময়করভাবে ডুবাইয়া দেন, এই পরমাশ্চর্য্য যোগ সাধন করেন,—ইহা তাহার শাশ্বত ব্যক্তিসত্তার সহিত তাহার বিরাট্ বিশ্বাত্মসত্তার অথবা তাহার বিশ্বাতীত শাশ্বত চরম এবং পরম-সত্তার যোগ। অহংকে ছাড়াইয়া যাইতেই হইবে কিন্তু আত্মাকে তো ছাড়াইয়া যাওয়া যায় না, ছাড়াইতে গেলেই তাহাকে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বময়রূপে পাইতে হয়। কারণ আত্মা ত অহং নয়, আত্মা সর্ব্ব এবং এক ; তাই আত্মাকে পাইতে গেলে আমাদের মধ্যেই সর্ব্বকে এবং সেই পরম এককে পাই ; তখন ভেদ এবং বিরোধের বিলয় হয় ; কিন্তু মুক্তিদায়ক সেই বিলয়ের ফলে সর্ব্ব এবং পরম একের সহিত যুক্ত এবং একীভূত জীবাত্মা বা চিন্ময় সত্তা থাকিয়া যায়।

আজ প্রকৃতি এবং ভগবানকে মানুষ তাহার বহিশ্চর সত্তাব, তাহার আপাত-প্রতীয়মান আত্মার সহিত যুক্ত না করিয়া দেখিতে পাইতেছে না, এই অভি-নিবেশ দূর করিতে পারিলে তাহার উচ্চতর আত্মজ্ঞানের সূচনা দেখা দিবে।

* পাশ্চাত্য জগতে এই মুক্তিকে salvation বলে।

এই উচ্চতর জ্ঞানের এক ধাপে তাহাকে জানিতে হইবে এই বর্ত্তমান জীবনই তাহার সর্ব্বস্ব নয়, জানিতে হইবে যে কালের মধ্যে সে এক নিত্যবস্তু, আত্মার অমরত্বের যে বোধ তাহার অন্তরে অস্পষ্টভাবে সদা বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই অস্পষ্টতা ঘুচাইয়া প্রত্যক্ষভাবে বাস্তব অনুভব দিয়া এ অমরত্বকে তাহার উপলব্ধি করিতে হইবে। যখন সে জানিবে যে এই ভূলোকের পরপারে আরও অনেক লোক বা ভূমি আছে, এই জন্মের পূর্ব্বে ও পরে তাহার আরও অনেক জন্ম ছিল ও থাকিবে, অন্ততপক্ষে জানিবে যে এ জীবনের পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল এবং পরেও থাকিবে তখন বর্ত্তমান কালের মধ্যস্থিত ব্যক্তি-সত্তার বিস্তারসাধন এবং নিজের শাশ্বত সত্তাকে লাভ করিয়া কালগত অবিদ্যাকে দূর করিবার পথে সে আসিয়া পড়িয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। অন্য এক ধাপে তাহাকে জানিতে হইবে যে তাহার বহিশ্চর জাগ্রত চেতনা তাহার সত্তার এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ; তাহাকে নিশ্চেতনা অবচেতনা ও অধিচেতনার গভীরতা পরিমাপ এবং অতিচেতনার উত্তুঙ্গ শিখরসমূহে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে ; এইভাবে তাহার চিত্তগত অবিদ্যা দূর হইতে থাকিবে। সাধনার তৃতীয় ধাপে সে আবিষ্কার করিবে যে তাহার মধ্যে তাহার যন্ত্ররূপী মন প্রাণ দেহ ছাড়া আরও কিছু বা আরও কেহ আছে, তাহার প্রকৃতির আশ্রয়স্বরূপ নিত্য-বৃদ্ধিশীল অমর এক ব্যষ্টি-আত্মা যে কেবল আছে তাহাও নহে, আছে শাশ্বত অপরি-বর্ত্তনীয় এক চিন্ময় আত্মা ; তাহাকে জানিতে হইবে তাহার চিন্ময় সত্তায় কি কি বিভাব বা উপাদান আছে, অবশেষে সে বুঝিতে পারিবে যে তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই সেই চিন্ময় বস্তুর প্রকাশ, তখন সে তাহার নিম্নতর ও উচ্চতর সত্তার যোগসূত্রও দেখিতে পাইবে, এইভাবে তাহার গঠন বা উপাদান-গত অবিদ্যা দূর হইতে থাকিবে। চিদাত্মার আবিষ্কারে সে ঈশ্বর বা ব্রহ্মকেও আবিষ্কার করে ; সে দেখিতে পায় যে কালের অতীত এক কূটস্থ আত্মা আছেন ; আবার বিশ্বচেতনাতে বিশ্বপ্রকৃতি এবং সর্ব্বভূতের পশ্চাতে সেই আত্মাই দিব্যসত্যরূপে বর্ত্তমান আছেন ; তাহার চিত্তে ক্রমে চরম এবং পরম ব্রহ্মের অনুভূতি জাগিয়া উঠে তখন সে দেখে যে আত্মা, জীব এবং জগৎ তাহার বিভিন্ন মুখ বা বিভূতি ; তখন অহংগত বা বিশ্বগত এবং মূল অবিদ্যার কঠিন বন্ধনও ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতে থাকে। এই প্রসারিত আত্মজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিতে গিয়া তাহার জীবন, ভাবনা ও ক্রিয়ার সকল মত, সকল উদ্দেশ্য ক্রমবর্দ্ধমানভাবে পরিবর্ত্তিত এবং রূপান্তরিত হইয়া যায় ; যে ব্যবহারিক

অবিদ্যা তাহাকে, তাহার প্রকৃতিকে ও তাহার পুরুষার্থকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা অপনীত হইতে থাকে, এমনি করিয়া যে পথে চলিলে সে সীমিত ও খণ্ডিত সত্তার মিথ্যা এবং দুঃখজ্বালা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তাহার খাঁটি ও অখণ্ড সত্তাকে পূর্ণভাবে লাভ এবং ভোগ করিতে পারিবে সেই পথে তাহার যাত্রারম্ভ হয়।

এই প্রগতির পথে ব্রহ্ম, জগৎ ও আত্মা এই যে তিন বিভাবের কথা লইয়া সে যাত্রারম্ভ করিয়াছিল তাহাদের একত্বও তাহার কাছে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কেননা প্রথমে সে দেখিতে পায় তাহার ব্যক্ত সত্তায় সে বিশ্ব এবং প্রকৃতির সহিত এক; মন প্রাণ এবং দেহ, কালের ক্ষণপরম্পরার মধ্যস্থিত আত্মা, সচেতন অবচেতন এবং অতিচেতন এ তিন অবস্থা—এই সমস্ত, ইহাদের বিচিত্র সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধের পরিণামের সমষ্টিই বিশ্ব এবং প্রকৃতি। কিন্তু সে ইহাও দেখিতে পায় যে ইহাদের পশ্চাতে বা ইহাদের ভিত্তিরূপে যাহা আছে তাহার সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া সেও বর্ত্তমান আছে; কেননা দেশকালাতীত পরম ব্রহ্ম বা চিৎপুরুষই বিশ্বের মধ্যে প্রকাশিত আত্মা, তিনিই প্রকৃতির অধীশ্বর—আমরা ঈশ্বর বলিতে এ সমস্তই বুঝি—এ সমস্তের মধ্যে জীবসত্তা ব্রহ্মভূত এবং ব্রহ্ম হইতে জাত, তাই সে দেখে যে সে নিজেই সেই নিরুপাধিক চিদাত্মা, আত্ম-অভিক্ষেপ (Self-projection) দ্বারা তাহাই বিশ্বে বহুরূপে দেখা দিয়াছে এবং প্রকৃতির আবরণে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই উভয়ভাবের উপলব্ধিতে নিজের আত্মাকে সে সর্ব্বভূতের আত্মা বলিয়া অনুভব করে; প্রকৃতিতে বিশ্বাত্মভাবে তাহার অনুভব হয় আপেক্ষিকভাবে বা সম্বন্ধের মধ্য দিয়া, কেননা সেখানে সে সর্ব্বভূতের সহিত এক হয় মনে, প্রাণে, জড়ে, আত্মায়, প্রত্যেক বিশ্বতত্ত্বে এবং তাহার পরিণামে; শক্তি এবং শক্তির ক্রিয়াবৈচিত্র্যে অথবা তত্ত্বসমূহ বা তাহাদের পরিণামের বিন্যাসে সে একত্বের কোন ইতর বিশেষ হয় না, কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে বা ব্রহ্মাত্মভাবে সে অনুভব হয় চরম বা অন্যনিরপেক্ষভাবে, কেননা এক পরম ব্রহ্ম, এক আত্মা, এক চিৎসত্তাই তো সকলের শাশ্বত আত্মা, এবং তাহাদের বহুবৈচিত্র্যের উৎস ভোক্তা এবং প্রভু। এ অবস্থায় ঈশ্বর এবং প্রকৃতির একত্বও তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ না করিয়া পারে না; কেননা সে অবশেষে অনুভব করে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সকল সবিশেষভাবে পরিণত হইয়াছেন, সে দেখিতে পায় যে সকল তত্ত্ব চিদ্বস্তুরই আত্মপ্রকাশ; সে আবিষ্কার করে যে

আত্মাই এই সকল সম্ভূতি হইয়াছেন, সে অনুভব করে যে সৎস্বরূপের শক্তি এবং সর্ব্বভূতমহেশ্বরের চেতনাই প্রকৃতিরূপে বিশ্বে সকল ক্রিয়া পরিচালনা করে। এইভাবে আমাদের আত্মজ্ঞানের প্রগতির পথে আমরা এমন কিছু আবিষ্কার করি যাহাকে জানিলে আমাদের আত্মার সহিত এক বলিয়া সকলকেই জানা হইয়া যায়, যাহাকে পাইলে আমাদের আত্মভাবের মধ্যে সকলকে পাওয়া এবং সেই পাওয়ার আনন্দে বিভোর হইয়া যাওয়া যায়।

তেমনি সমভাবেই এই একত্বের জন্য বিশ্বজ্ঞানও মানুষের মনকে সেই বৃহৎ উপলব্ধিতে লইয়া যাইবে। কারণ প্রকৃতিকে কেবল জড়, শক্তি এবং প্রাণরূপে জানিতে গেলেও তাহাদের সঙ্গে মনশ্চেতনার কি সম্বন্ধ তাহা তাহাকে গভীর রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিতেই হইবে; আর একবার যদি সে মনের খাঁটি প্রকৃতি বুঝিতে পারে তবে তাহাকে বাহিরে যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতেই হইবে। সে তখন জড় ও প্রাণের সকল প্রতিভাস সকল খেলার মধ্যে শক্তির সকল ক্রিয়াতে এক গোপন ইচ্ছা বা বুদ্ধিকে আবিষ্কার না করিয়া পারিবে না; সে তখন বুঝিবে যে এই একই জ্ঞানময়ী শক্তি সমভাবে জাগ্রত চেতনা, অবচেতনা এবং অতিচেতনাতে বর্ত্তমান আছে; জড়বিশ্বের দেহের মধ্যে তাহার আত্মাকেও সে আবিষ্কার করিবে। এই যে সমস্ত বিভাবের মধ্যে মানুষ বিশ্বের অন্য সবকিছুর সহিত একত্ব স্বীকার করে তাহাদিগের মধ্য দিয়া অপরা প্রকৃতিকে অনুসরণ করিলে সে দেখিতে পাইবে যে যাহাকিছু সে আপাততঃ দেখিতে পাইতেছে তাহার পশ্চাতে এক পরাপ্রকৃতি আছে; সে প্রকৃতি দেশ এবং কালের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াও দেশকালাতীত এক চিৎস্বরূপের পরমা শক্তি; এই সচেতন শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই আত্মা সর্ব্বভূত হইয়াছেন; নির্ব্বিশেষ আপনাকে অশেষ বিশেষ-রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; অর্থাৎ তখন সে প্রকৃতিকে জড়শক্তি, প্রাণশক্তি, মনঃশক্তি বা বহুধা-বিভক্ত বাহ্যমূর্ত্তিরূপে শুধু দেখিবেনা, পরন্তু সর্ব্বভূতমহেশ্বর দিব্যপুরুষের জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি, স্বয়ম্ভূ শাশ্বত অনন্তের চিৎশক্তি রূপেই দেখিবে।

যাহা পরিণামে তাহার সকল অন্বেষণ ছাড়াইয়া উদ্দীপনাপূর্ণ এক পরম অন্বেষণে পরিণত হয়, মানুষের সেই ভগবদন্বেষণ বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সূচনা হয় যখন প্রকৃতির কাছে সে অস্পষ্টভাবে প্রশ্ন করিতে থাকে, যখন তাহার নিজের এবং প্রকৃতির ভিতর অদৃশ্য কিছু আছে এ বোধ দেখা দেয়। আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে অসভ্য অবস্থায় মানুষ ভূত প্রেত, দৈত্যদানব প্রভৃতির যে উপাসনা

কল্পিত, শিলাবৃক্ষাদিতে যে চৈতন্যের, অথবা প্রাকৃতিক শক্তিতে যে দেবত্বের আরোপ করিত তাহা হইতে ধর্ম্মবোধের অঙ্কুর জাত হইয়াছে। একথা সত্য হইলেও বলিতে হইবে এ সমস্ত অবচেতনাতে গোপনে অবস্থিত বোধিরই প্রাথমিক এবং অপূর্ণ রূপায়ণ ইহাদের পশ্চাতে গোপন প্রভাব এবং অচিন্ত্য শক্তি সকলের অস্তিত্বের একটা আকারপ্রকারহীন এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন বোধ আছে, অথবা আমাদের কাছে যাহা অচেতন তাহার অন্তরালে সত্তা সঙ্কল্প এবং বুদ্ধি, আমরা যাহা দেখিতেছি তাহার পশ্চাতে এক অদৃশ্য বস্তু, শক্তির প্রত্যেক ক্রিয়ার অন্তরালে থাকিয়া নিজেকে ছড়াইয়া দিতেছে এমন এক চিদ্বস্তু আছে, এই সমস্তের একটা অতি অস্পষ্ট বোধ হইতেই প্রাথমিক ধর্ম্মের এই সমস্ত আকার এবং আচরণ দেখা দিয়াছে। এই সমস্ত প্রাথমিক অনুভূতি অস্পষ্ট এবং অপ্রচুর হইলেও তাহার মধ্যে মানুষের হৃদয় ও মনের যে মহা আকূতি ও অন্বেষণের সাক্ষাৎ পাই তাহার মূল্য বা সত্য কিছু কমিয়া যায় না। কেননা আমাদের সকল অন্বেষণ এমন কি বৈজ্ঞানিক অন্বেষণও গোপন সত্যের অস্পষ্ট এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন একটা অনুভূতি হইতেই আরম্ভ হয়; এবং আমরা প্রথমে দেখি অবিদ্যার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন সত্যের এক ছদ্ম এবং আবৃত রূপ, তারপর ধীরে ধীরে তাহার জ্যোতির্ম্ময়রূপ ফুটিতে থাকে। যে মতবাদে মানুষ ভগবানকে বা নারায়ণকে নররূপে দেখিয়াছে (anthropomorphism) সেখানেও এই সত্যই প্রতিফলিত ও স্বীকৃত হইয়াছে যে, ঈশ্বর যাহা আছেন তিনি তাহাই বলিয়া, মানুষ আজ যাহা আছে তাহাই হইতে পারিয়াছে (অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ তত্ত্বের উপর মানুষের স্বরূপ নির্ভর করিতেছে) সর্ব্ববস্তুর মধ্যে একই আত্মা আছে, বিশ্বই তাহার অখণ্ড বিগ্রহ; নিজের অপূর্ণতা সত্ত্বেও মানবই, এখানে আজ পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মধ্যের পূর্ণতম প্রকাশ, এবং মানুষের মধ্যে যাহা অপূর্ণ রহিয়াছে ঈশ্বরেই আছে তাহার পূর্ণতা। মানুষ যে সর্ব্বত্রই নিজেকে দেখে এবং নিজেকেই নারায়ণরূপে উপাসনা করে তাহা সত্য; কিন্তু এখানেও দেখি যে তাহার অজ্ঞান হাতড়াইতে হাতড়াইতে অবশেষে এক সত্যের অস্পষ্ট স্পর্শলাভ করিয়াছে, সে সত্য এই যে তাহার সত্তা এবং ব্রহ্ম সত্তা এক, এখানে যাহা দেখিতেছি তাহা সেখানকারই খণ্ডিত এক প্রতিরূপ; এবং নিজের বৃহত্তর আত্মাকে সর্ব্বত্র দেখার অর্থ হইল ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দর্শন করা, বস্তুর সত্য এবং নিখিলের স্বরূপ-সত্যের নিকটে আসা।

সমস্ত বৈচিত্র্য এবং বিরোধের অন্তরালে এক একত্ব আছে ইহাই মানুষের

ধর্ম্ম ও দর্শনের বৈচিত্র্যের মূল রহস্য; ধর্ম্ম বা দর্শনের প্রত্যেকে সত্যের একদিকের ছবি দেখিয়াছে তাহার একাঙ্গের স্পর্শলাভ এবং তাহার অনন্ত বিভাবের এক বিশেষ বিভাবের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াছে, তাই মানুষ কত বিচিত্ররূপে সেই একের পরিচয় পাইয়াছে। কখনও অস্পষ্টভাবে তাহারা জড়জগৎকে দিব্যপুরুষের দেহরূপে দেখিয়াছে অথবা প্রাণকে দিব্যসত্তার বৃহৎ প্রাণস্পন্দনরূপে অনুভব করিয়াছে অথবা বিশ্বের সবকিছুকে বিশ্বমনের ভাবনারূপে বোধ করিয়াছে, অথবা এ সমস্ত হইতে বৃহত্তর এক চিদ্বস্তুকে সমস্তের সূক্ষ্ম অথচ পরমাশ্চর্য্য উৎস এবং স্রষ্টারূপে উপলব্ধি করিয়াছে; কখনও মানুষ ঈশ্বরকে শুধু নিশ্চেতনার মধ্যে অথবা কখনও নিশ্চেতনার মধ্যে একমাত্র চেতন বস্তু বলিয়া দেখিয়াছে; অথবা কখনও মনে করিয়াছে যে তিনি এক অনির্ব্বচনীয় অতিচেতন সত্তা, যাহাতে পৌঁছিতে হইলে আমাদিগকে পার্থিব সত্তাকে ত্যাগ এবং দেহ মন ও প্রাণকে বিলয় করিতে হইবে; অথবা কখনও সমস্ত ভেদকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মকে সে যুগপৎ নিশ্চেতনা, চেতনা ও অতিচেতনাতে দেখিয়াছে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে এই দৃষ্টির সকল পরিণামকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে; কখনও মানুষ বিশ্ববিগ্রহকে বিরাটপুরুষ বলিয়া উপাসনা করিয়াছে; কখনও প্রত্যক্ষবাদীর (positivist) মত নিজদিগকে এবং ঈশ্বরকে বিশ্বমানবের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া দেখিয়াছে; আবার কখনও দেশকালাতীত অক্ষর সত্তার সর্ব্বনাশা অনুভবের উন্মাদনায় প্রকৃতির এবং বিশ্বের মধ্যে তিনি নাই ইহা বলিয়াছে; কখনও মানুষ, মানুষের অহমিকার নানা আশ্চর্য্য সুন্দর বা অতিবর্দ্ধিত রূপের মধ্যে ভগবানকে ভজনা করিয়াছে অথবা যে সমস্ত গুণ তাহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু ঈশ্বরের মধ্যে তাহার পূর্ণতা আছে এবং তাহার ভগবত্তা তাহার কাছে পরমশক্তি, প্রেম, সৌন্দর্য্য, সত্য, ঋত ও প্রজ্ঞারূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সে ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে; মানুষ কখনও তাঁহাকে প্রকৃতির প্রভু, জগৎপিতা, জগৎস্রষ্টারূপে আবার কখনও তাঁহাকে প্রকৃতিরূপিণী জগন্মাতারূপে দেখিয়াছে, কখনও তাঁহাকে পরম প্রেমাস্পদ এবং সকল আত্মার পরম আকর্ষকরূপে দেখিয়া তাহারই অনুসরণে সারাজীবন কাটাইয়াছে, আবার কখনও সকল কর্ম্মের গোপন প্রভু মনে করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে; অদ্বিতীয় একেশ্বরের চরণে সে প্রণত হইয়াছে অথবা বহুরূপী দেবতার বেদীমূলে লুটাইয়া পড়িয়াছে, এক দেবমানব বা অবতারের পায়ে সে ভক্তির অর্ঘ্য দিয়াছে অথবা সকল মানুষের মধ্যে যে পরম দেবতা আছে

তাঁহারই পূজায় রত হইয়াছে অথবা বৃহত্তর এক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সেই অদ্বয় তত্ত্বকে আবিষ্কার করিয়াছে যাহার অস্তিত্ব বা আবির্ভাবের জন্য আমাদের চেতনায় বা কর্ম্মে বা জীবনে আমরা সর্ব্বভূতের সহিত একত্ব অনুভব করিতে এবং দেশ কালের মধ্যস্থ সকল বস্তুর সহিত, প্রকৃতি এবং তাহার প্রভাব এমন কি তাহার অচেতন শক্তির সহিত যুক্ত হইতে পারি ; এমনি করিয়া যে-যে ভাবেই মানুষ তাঁহাকে পাইতে চাহিয়াছে তাহাদের সকলের পশ্চাতে একই পরম সত্য রহিয়াছে কেননা এ সমস্তই আমরা সকলে যাঁহাকে খুঁজিতেছি সেই অনন্ত চিন্ময় দিব্যবস্তু। বিশ্বের সবই যখন সেই পরম অদ্বয় তত্ত্ব তখন তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য মানুষ তাহার দিকে নানা বিচিত্র পথে অগ্রসর হইবে ইহাই তো স্বাভাবিক ; মানুষ তাঁহাকে পূর্ণরূপে জানিতে পারিবে বলিয়াই মানুষ নানারূপে তাঁহাকে দেখিবে, এ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু জ্ঞান যখন তুঙ্গতম শৃঙ্গে আরোহণ করে তখন সকল বিভাবের পূর্ণতম একত্ব সে দেখিতে পায়। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃতভাবে দেখাই হইল চরম প্রজ্ঞাদৃষ্টি ; কেননা তখন এক সর্ব্বগ্রাহী এবং পরিপূর্ণ তাৎপর্য্যের মধ্যে সকল জ্ঞান আসিয়া মিলিত হয়। তখন দেখা যায় যে সকল ধর্ম্ম এক পরম সত্যের দিকে অভিযান, সকল দর্শন একই সত্যবস্তুকে বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্নভাবে দেখিবার ফলে মতবৈচিত্র্যের সমাহার ; এক পরমবিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ; কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞান মনের জ্ঞান এবং অতীন্দ্রিয় দিব্যদর্শনের মধ্য দিয়া আমরা যাহা যাহা খুঁজিতেছি তাহার সকলকে পরিপূর্ণরূপে পাই যখন ব্রহ্ম, জীব, জগৎ এবং জগতের সব-কিছুকে এক বলিয়া উপলব্ধি করি।

ব্রহ্মই চিন্ময় পরতত্ত্ব, তিনি কালাতীত আত্মা, তাঁহার মধ্যেই কাল রহিয়াছে, তিনি প্রকৃতির প্রভু, বিশ্বের স্রষ্টা ও আধার, তিনিই সর্ব্বভূতে অনুস্যূত হইয়া আছেন, তিনি পরমাত্মা, যাহা হইতে সকল আত্মা জাত হইয়াছে বা প্রকাশের ক্ষেত্রে আসিয়াছে আবার তাহারা তাহাতেই ফিরিয়া যাইবে—ব্রহ্ম সম্বন্ধে মানুষের উচ্চতম ধারণায় ইহাই সত্যের পরিচয়। সেই নির্ব্বিশেষ পরমতত্ত্ব সকল বিশেষের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন ; সেই চিদ্বস্তু নিজে বিশ্বমন, বিশ্বপ্রাণ এবং বিশ্বজড়রূপে দেহ ধারণ করিয়াছেন ; মহাপ্রকৃতি তাঁহার আত্মশক্তি বলিয়া প্রকৃতি যাহা সৃষ্টি করে বলিয়া মনে হয় তাহা তাঁহার নিজের সত্তার মধ্যে নিজের চিৎশক্তির কাছে বহুবিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ, পরমানন্দে উল্লসিত নিজের চিন্ময় আত্মার বহুধা আত্মরূপায়ণ ছাড়া অন্য কিছু

নহে—মানুষের প্রকৃতি এবং বিশ্বের জ্ঞান এই সত্যের দিকে তাহাকে লইয়া চলিয়াছে, যখন তাহার জগৎজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত যুক্ত হইবে তখন সে এই জ্ঞানে পূর্ণভাবে পৌঁছিবে। পরমতত্ত্বের এই সত্যে বিশ্বচক্রাবর্ত্তনের সমর্থন পাই, যে সত্য বিশ্বকে অস্বীকার বা নিরাকৃত করে না। তাঁহার স্বয়ম্ভূসত্তাই সম্ভূতির এ সমস্ত রূপ ধারণ করিয়াছে; সমস্ত সত্তার শাশ্বত একত্ব এই পরমাত্মার মধ্যেই রহিয়াছে; এই অনুভবের মন্ত্র 'সোঽহম্'—তিনিই আমি। বিশ্বশক্তি স্বয়ম্ভূসত্তার চিৎশক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়; এই শক্তি-সহযোগে তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে নিজে অসংখ্যরূপ পরিগ্রহ করেন; আবার তাঁহার দিব্য-প্রকৃতির মধ্য দিয়া বিশ্বপ্রকৃতিকে আলিঙ্গন অথচ তাহাকে অতিক্রম করিয়া নিজের পূর্ণ সত্তা ব্যষ্টিব্যক্তির মধ্যে ঢালিয়া দিতে পারেন, তখন একের মধ্যে, সর্ব্বের মধ্যে, একের সহিত সর্ব্বের সম্বন্ধের মধ্যে তাহার স্থিতি এবং শক্তি অনুভূত হয়,—ইহাই হইল সত্তার স্বরূপ সত্য, মানুষের সমগ্র আত্মজ্ঞান উন্নীত ও বিস্তৃত হইয়া ঈশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে এইভাবে গিয়া পৌঁছিলে সে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়; পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, পূর্ণ আত্মজ্ঞান, পূর্ণ প্রকৃতি বা বিশ্বজ্ঞান এই ত্রিপুটিত জ্ঞানের সঙ্গম-তীর্থে পৌঁছানই মানুষের পরম পুরুষার্থ; ইহার মধ্যেই বিশ্বমানবের অক্লান্ত সাধনার বৃহৎ ও পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য খুঁজিয়া পাই; মানুষের আত্মচেতনায় যখন ঈশ্বর, তাহার আত্মা এবং জগতের একত্ব সে সচেতনভাবে উপলব্ধি করিবে তখন তাহার পূর্ণতার নিশ্চিত ভিত্তি এবং সকলের সহিত সর্ব্বপ্রকারে সুষমা ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে; এই দিব্যচেতনা এবং দিব্য-জীবনে স্থিতি হইবে তাহার সত্তার উচ্চতম এবং বৃহত্তম ভূমি, ইহার সূচনা হইবে তাহার আত্মজ্ঞান, জগৎ-জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ-পরিণতির যাত্রাপথের আদিবিন্দু।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পরিণতির ধারা—আরোহণ এবং সমাহরণ

যখন শিখর হইতে শিখরে সে আরোহণ করে...তখন ইন্দ্র তাহাকে তাহার গতির সেই লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন করেন।

ঋগ্বেদ ১।১০।২

তিনি দুই মাতার এক পুত্র, জ্ঞানের আবিষ্কারেব দ্বারা তিনি রাজত্ব লাভ করেন, তিনি শিখরের উপর বিচরণ করেন, বাস করেন তাঁহার উর্দ্ধ-মূলে।

ঋগ্বেদ ৩।৫৫।৭

পৃথিবী হইতে উত্থিত হইয়া আমি অন্তরিক্ষ বা মধ্যজগতে আরোহণ করিয়াছি; অন্তরিক্ষ হইতে দ্যুলোকে বা স্বর্গে উঠিয়াছি, স্বর্গেব পৃষ্ঠ হইতে আমি জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যলোকে গিয়াছি।*

যজুর্ব্বেদ ১৭।৬৭

পার্থিব প্রকৃতিতে অভিব্যক্তির পরিণামধারার তাৎপর্য্য কি, এবং এই ধারার মোড় শেষে কোন্ দিকে ফিরিবে অথবা ফিরিবে বলিয়া নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অনেকটা স্পষ্ট ধারণা আমরা পাইয়াছি; এইবার পরিণামের কোন্ সূত্র ধরিয়া কোন্ পদ্ধতিতে প্রকৃতি আসিয়া বর্ত্তমান স্তরে পৌঁছিয়াছে, আরও গভীরভাবে বুঝিবার জন্য সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব ও প্রয়োজন হইয়াছে; ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে এই সমস্ত সূত্র এবং পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হইয়া অথবা তাহার কিছু কিছু অদলবদল করিয়া পরিণতির গতিধারা অবশেষে, আজিও যাহা আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে সেই মনোময়ী অবিদ্যার মধ্য দিয়া গিয়া অতিমানস-চেতনায় এবং পূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানে পৌঁছিবে। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে বিশ্বপ্রকৃতিতে ক্রিয়ার

* এখানে জড়, প্রাণ, শুদ্ধ মন এবং অতিমানস—এই চারিটী ভূমির কথা আছে।

সাধারণ বিধান একই থাকে, কেননা সে বিধানের মূলে বস্তুর যে সত্য থাকে তাহার তত্ত্বভাবের কোন বিপর্য্যয় ঘটে না, যদিও বিশেষ বিশেষ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবান্তর বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। গোড়াতেই আমরা স্পষ্টভাবে একটা কথা দেখিতে পাই, যখন পরিণামের ধারা নিশ্চেতনা হইতে আরম্ভ হইয়া চিন্ময় চেতনায় আসিয়া শেষ হইতেছে, জড়কে ভিত্তি করিয়া চিন্তত্বই যখন পরিণতির পথে আপনাকে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে, তখন এ ধারার মধ্যে তিন প্রকার লক্ষণ বা অবস্থা দেখা দিবে। পরিণতির ক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধমান যে চেতনা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে, ক্রমশঃ অধিকতররূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সমর্থ হইয়া উঠিতেছে, সেই চেতনার ক্রিয়াধারা স্বচ্ছন্দে বহন করিতে পারে এই জন্য জড়রূপেরও ক্রমশঃ অধিকতর সূক্ষ্ম ও জটিল রূপায়ণ হইতেছে—এই হইল পরিণতি-ধারার অপরিহার্য্য অন্নময় ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর পরিণতির প্রগতিতে চেতনার একটা উর্দ্ধ্বগতি ক্রমিক উন্মেষের স্তরে স্তরে সর্পিল রেখায় (spiral line) স্পষ্টতঃ চলিতে থাকে। অবশেষে প্রতিবার উচ্চতর পর্ব্বে পৌঁছিলে যাহা পূর্ব্বে উন্মিষিত হইয়াছে তাহাকে সেই উচ্চতর ভাবের মধ্যে গ্রহণ এবং অল্প বা পূর্ণরূপে তাহাদের রূপান্তর সাধন করিয়া সমগ্র সত্তা এবং প্রকৃতির পরিবর্ত্তিত পূর্ণ কার্য্যধারার মধ্যে তাহাদিগকে জুড়িয়া একটা পূর্ণাঙ্গতা-সম্পাদনও পরিণতির ক্রিয়াধারার একটা অঙ্গ, ইহা না হইলে পরিণতি সার্থক হইতে পারে না।

এই ত্রিধারাযুক্ত পরিণামের শেষে অবিদ্যার ক্রিয়া আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া জ্ঞানের ক্রিয়াতে পর্য্যবসিত হইবে, আমাদের নিশ্চেতনার বর্ত্তমান ভিত্তির স্থলে পূর্ণ চেতনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে—যে পূর্ণতা এখন আমাদের পক্ষে শুধু অতিচেতনায় বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক উন্নয়নে নবজাগরিত মূল তত্ত্ব পূর্ব্বপ্রকৃতিকে বশে আনিয়া তাহার আংশিক পরিবর্ত্তন সাধন করে, নিশ্চেতনা এক অর্দ্ধচেতনায় বা অবিদ্যার আলো-আঁধারীতে পরিণত হয়, যাহা আরও জ্ঞান ও শক্তিলাভের আকৃতিতে ভরা থাকে ; কিন্তু ইহার মধ্যে উন্নয়ন বা আরোহণের কোন বিশেষ পর্ব্বে অচেতনা এবং অবিদ্যার স্থলে জ্ঞানের এবং মূল সত্য চেতনার বা চিৎস্বরূপের চেতনার এক তত্ত্ব পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। নিশ্চেতনা হইতে পরিণাম আরম্ভ হইয়াছে, মধ্যপর্ব্বে অবিদ্যার ভিতর দিয়া পরিণতি চলিয়াছে কিন্তু শেষ পর্ব্বে জীবচেতনা নিজের সত্য চেতনার মধ্যে মুক্তিলাভ

করিবে এবং জ্ঞানের মধ্য দিয়া পরিণাম চলিবে। পরিণতির এই বিধান এই ধারাই প্রকৃতি আজ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে এবং চারিদিকের সকল চিহ্ন দেখিয়া মনে হয় ভবিষ্যতেও প্রকৃতি-পরিণামের এই একই ধারা চলিবে। প্রথমে দেখিতে পাই যে এক অচেতন ভিত্তি আছে যাহার মধ্যে সঙ্কল্প বা ইচ্ছা যেন নাই, সেই নিশ্চেতনার মধ্যে যাহা কিছু উন্মিষিত হইবে তাহা প্রথমে বীজরূপে দেখা দেয়, তাহার পর সেই ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া তাহার উপর সংবৃত শক্তি ক্রমোর্দ্ধ ধারায় উন্মিষিত এবং ক্রিয়াশীল হইতে থাকে, অবশেষে চরম পর্ব্বে এক পরম প্রকাশের প্রতিনিধিরূপে এক পরমা শক্তি উন্মিষিত হইবে—এই সমস্ত হইল প্রকৃতি-পরিণামের অভিযানের আবশ্যকীয় বিভিন্ন স্তর।

যে সমস্যা সমাধান করিতে হইবে তাহার প্রকৃতি অনুসারেই পরিণতি-ধারাকে পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত সত্তা বা উপাদানের ভিত্তিরূপে অবস্থিত কোন তত্ত্বের মধ্যে সেই তত্ত্বেরই অন্তর্নিহিত সংবৃত কোন কিছুকে স্ফুরিত এবং পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে, অথবা এই যাহা ফুটিতেছে তাহা ভিত্তিস্থানীয় তত্ত্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত না থাকিলেও ঐ তত্ত্বের দ্বারা স্বীকৃত এবং কিছুটা পরিবর্ত্তিত হইবে, কেননা এ তত্ত্ব যাহা কিছু পূর্ব্বে ইহার অংশীভূত ছিল না বাহির হইতে ইহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে আপন প্রকৃতির বিধানদ্বারা কতকটা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবেই। এমন কি সৃষ্টিশীল পরিণামের যদি এই অর্থ হয় যে আদি তত্ত্বের অংশরূপে যাহা ছিল না পরে তাহাতে গৃহীত হইয়া তাহার অংশীভূত হইয়া পড়িয়াছে, পরিণতিতে যদি সর্ব্বদা এইরূপ নূতন তত্ত্বেরই প্রকাশ হয় তবে সেখানেও এই বিধান খাটিবে। পক্ষান্তরে যে নূতন তত্ত্বকে উন্মিষিত ও প্রকাশিত হইতে হইবে, তাহা যদি পূর্ব্ব হইতে সংবৃত হইয়া আদিতত্ত্বের মধ্যে অব্যক্ত এবং অসংহত অবস্থায় থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেও যখন তাহার প্রকাশ হয় তখন তাহা সেই আদিতত্ত্বের প্রকৃতি ও বিধানের দ্বারা কিছু অনুরঞ্জিত হইয়া-ই পড়িবে; কিন্তু সেই সঙ্গে এই নব উন্মিষিত তত্ত্ব তাহার নিজের শক্তি ও প্রকৃতির বিধান দ্বারা আদিভূত তত্ত্বকেও কিছু পরিবর্ত্তিত করিবে। তদুপরি পরিণতি-ক্ষেত্রের উর্দ্ধে উন্মিষন্ত তত্ত্ব যেখানে পূর্ণশক্তি ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার তেমন এক স্বক্ষেত্র থাকিতে পারে, এবং নিম্নতর ক্ষেত্রে উন্মেষের সাহায্যের জন্য সেই ক্ষেত্র হইতে শক্তি অবতরণ করিয়া পরিণতির ক্ষেত্রকে এমনভাবে অধিকার করিতে পারে যে নবোন্মিষিত শক্তি আধারের

মুখ্য উপাদান বা নিয়ন্তা হইয়া উঠিবে এবং যে জগতে তাহার উন্মেষ ঘটিতেছে অথবা যাহার মধ্যে সে প্রবিষ্ট হইতেছে সেই জগতের চেতনা এবং ক্রিয়াতে পর্য্যাপ্ত বা আমূল রূপান্তর আনয়ন করিতে পারে। কিন্তু আত্মপরিণামের মাতৃকা (evolutionary matrix) রূপে যে তত্ত্বকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে সেই আদিবস্তুর বিধান ও ক্রিয়াধারার মধ্যে তাহা কতটা পরিবর্ত্তন বা বিপ্লব আনিতে পারিবে তাহা তাহার নিজের মৌলিক শক্তি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিবে। ইহা সংস্বরূপের অনাদি স্বরূপ বা আদ্যাশক্তি না হইয়া যান্ত্রিক বা অন্য কিছু হইতে জাত শক্তি যদি হয় তবে তাহাতে আমূল রূপান্তরের সামর্থ্য না থাকিবারই কথা।

এখানে এক জড় বিশ্বের মধ্যেই প্রকৃতি-পরিণাম চলিতেছে, জড়ই এখানকার ভিত্তি, জড়ই আদি উপাদান, বস্তুর সকল অবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী জড়ই এখানে প্রতিষ্ঠিত আদি তত্ত্ব। জড়ের মধ্যে মন এবং প্রাণ উন্মিষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহাদের ক্রিয়ার জন্য যন্ত্র বা সাধনরূপে জড়কে ব্যবহার এবং জড় প্রকৃতির বিধানের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, এই জন্য তাহাদের ক্রিয়াশক্তি সীমিত ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, যদিও তাহারা যাহার বশ্যতা স্বীকার বা যাহাকে ব্যবহার করিতেছে তাহারও কতকটা রূপান্তর ঘটাইয়াছে। কেননা তাহারা মূল জড় উপাদানকে প্রথমে জীবন্ত এবং পরে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে; জড়ের অসাড়তা, নিষ্ক্রিয়তা এবং অচেতনাকে তাহারা চেতনার ক্রিয়া, বেদনা বা অনুভূতি এবং প্রাণনের স্পন্দনে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু জড়কে আমূল রূপান্তরিত করিতে তাহারা সক্ষম হয় নাই, জড়কে পূর্ণরূপে প্রাণময় বা সচেতন করিতে পারে নাই; তাই উন্মিষিত প্রাণপ্রকৃতি আজিও মৃত্যুর হাতে বাঁধা আছে, উন্মিষিত মনও জড়ধর্ম্মী এবং প্রাণধর্ম্মী হইয়া পড়িতেছে, মন দেখিতে পায় যে তাহার মূলে আছে নিশ্চেতনা, অবিদ্যার দ্বারা সে সীমিত; অনিয়ন্ত্রিত প্রাণশক্তি মনকে চালায় এবং নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে, নিজের আত্মপ্রকাশের জন্য যে জড়শক্তির উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয় সেই শক্তি তাহাকে জড়ধর্ম্মী যন্ত্র করিয়া তোলে; মন বা প্রাণ যে আদ্যা সৃষ্টিশক্তি নহে ইহা তাহারই চিহ্ন বা প্রমাণ, জড়ের মত তাহারাও পরিণতির ধারার মধ্যে মধ্যবর্ত্তী অবস্থা, পরম্পরা-গত এবং শ্রেণীবদ্ধ সাধনযন্ত্র। জড়শক্তি যদি আদ্যা শক্তি না হয় তখন মন এবং প্রাণের অতীত কোন ক্ষেত্রেই তাহাকে খুঁজিতে হইবে; একটা গভীরতর

গোপন সত্য আছে, যাহাকে এই অপরা প্রকৃতির মধ্যে একদিন আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে।

মূলে এক আদ্যাশক্তি না থাকিলে সৃষ্টি বা পরিণাম-ধারা যে চলিতে পারে না ইহা নিশ্চিত; জড়, বিশ্বের প্রাথমিক উপাদান হইলেও নিশ্চেতন জড়-শক্তি সেই আদি এবং চরম শক্তি হইতে পারে না, তাহা হইতে প্রাণ বা মনের উদ্ভব অসম্ভব; কেননা নিশ্চেতনা হইতে চেতনা অথবা নিষ্প্রাণ শক্তি হইতে প্রাণ জাত হইতে পারে না। মন এবং প্রাণ যখন সেই আদ্যাশক্তি নহে তখন এমন কিছু নিশ্চয়ই গোপনে রহিয়াছে যাহার চেতনা মনশ্চেতনা এবং প্রাণ-চেতনা হইতে বৃহত্তর, যাহার শক্তি জড়শক্তি হইতে অধিকতর মৌলিক। মন হইতে বৃহত্তর বলিয়া তাহাকে অতিমানসী চিৎ-শক্তি বলা যায়, আবার তাহা জড় হইতেও অধিকতর মৌলিক কোন বস্তুর শক্তি বলিয়া তাহা হইবে সর্ব্ববস্তুর যাহা পরমমূল স্বরূপ সেই চিৎস্বরূপেরই শক্তি। মন এবং প্রাণের মধ্যেও সৃষ্টিশক্তি আছে, তবে তাহা যান্ত্রিক এবং আংশিক, আদি বা চরম শক্তি নয়; বস্তুতঃ মন এবং প্রাণ যে জড়ের মধ্যে বাস করে, কেবল যে তাহার দ্বারা নিজেরা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা নহে, পরন্তু তাহারা জড় এবং তাহার শক্তিকে পরিবর্ত্তিত এবং পরিণামের পথেও চালিত করে কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্ত্তন আবার অন্তর্য্যামী সর্ব্বাধার চিৎপুরুষের দ্বারা নিরূপিত, পবিমিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়; তিনি তাঁহার অতিমানস বা অলৌকিক বিজ্ঞানশক্তির গোপন অন্তর্জ্যোতি ও বীর্য্যের, তাঁহার অদৃশ্য আত্মজ্ঞান এবং সর্ব্বজ্ঞানেব মধ্য দিয়াই ইহা সাধিত করেন। অতএব পূর্ণরূপান্তর চিৎপুরুষের বিধান ও স্বধর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তিতেই সম্ভব হইতে পারে; সেজন্য তাহার যে বিজ্ঞান (gnosis)* বা অতিমানস-শক্তিকে জড়ে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইয়াছে তাহাকেই জড়ের মধ্য দিয়া উন্মিষিত হইতে হইবে। তজ্জন্য ইহা দ্বারা আমাদের মনোময় সত্তাকে অতিমানস সত্তায় রূপান্তরিত এবং আমাদের মধ্যে যাহা কিছু অচেতন আছে তাহাকে সচেতন করিতে হইবে, আমাদেব মৃন্ময় উপাদানকে চিন্ময় বস্তুতে পরিণত এবং আমাদের সমগ্র পবিবর্ত্তনশীল সত্তা এবং প্রকৃতিতে বিজ্ঞানঘন চেতনার বিধান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহাই হইবে চিৎপ্রকাশের চরম

* gnosis শব্দ এখানে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে আমাদের প্রাচীন পরিভাষায় তাহা বিজ্ঞান শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হইত। Science অর্থে বিজ্ঞান শব্দের ব্যবহার আধুনিক। এই প্রাচীন অর্থে বিজ্ঞান শব্দটি আমাদিগকে বহুবার ব্যবহার করিতে হইবে। অনুবাদক।

পর্ব্ব ; অথবা অন্ততপক্ষে উন্মেষের পথে ইহা সেই সোপান যেখানে পৌঁছিলে পরিণামধারার প্রকৃতি প্রথমে নিশ্চিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া অবিদ্যার ক্রিয়াধারাকে এবং নিশ্চেতনার ভিত্তিকে দিব্য ভাবে রূপান্তরিত করিবে।

জড় বিশ্বে চিৎ-সত্তার ক্রমিক আত্মপ্রকাশ বা পরিণামের ধারাকে প্রতিপদে এই তথ্যের হিসাব রাখিয়া চলিতে হয় যে, জড়রূপ এবং তাহার ক্রিয়ার মধ্যে চেতনা এবং শক্তি সংবৃত হইয়া আছে। কারণ সংবৃত গুপ্ত চেতনা এবং শক্তিকে জাগাইয়া পরিণামধারার উর্দ্ধারোহণ চলে তত্ত্ব হইতে তত্ত্বান্তরে, এক স্তর হইতে অন্যস্তরে, গোপন চিদ্বস্তর এক শক্তি হইতে অন্য শক্তিতে ; কিন্তু এক অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থান্তর-প্রাপ্তি স্বাধীনভাবে হয় না। প্রত্যেক স্তরে, শক্তির প্রত্যেক প্রকাশক্ষেত্রে, যাহা উন্মিষিত হইতেছে তাহার ক্রিয়ার শক্তি ও বিধান তাহার নিজস্ব প্রকৃতির স্বতন্ত্র পূর্ণ ও শুদ্ধ বিধান বা শক্তির বীর্য্য দ্বারা শুধু নিয়ন্ত্রিত হয় না, তাহারা কতকটা নিয়ন্ত্রিত ও নিরূপিত হয় জড়ের যে আধারে তাহাকে প্রকাশ পাইতে হইবে তাহার দ্বারা, আর কতকটা যে অবস্থায় সে পৌঁছিয়াছে বা সে নিজে যে শক্তি বা সামর্থ্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে চেতনার যেটুকু লব্ধ সিদ্ধি জড়ের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে তাহার দ্বারা। একভাবে ইহার কার্য্যকারিতা দুই দিকের দুইটি প্রভাবের মধ্যে একটা সাম্যের দ্বারা নির্ণীত হয় ; তাহার এক দিকে আছে উর্দ্ধ্ব পরিণামের বশে এই যাহা উন্মিষিত বা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান একটা পরিমাণ, অপর দিকে আছে সেই উন্মিষিত তত্ত্বের উপর নিশ্চেতনার প্রভাবের পরিমাণ, কেননা নিশ্চেতনার অধিকার এবং বন্ধন এখনও দূর হয় নাই, তাহা সেই তত্ত্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বশীভূত, আবৃত ও খর্ব্ব করিতে চায়। তাই দেখি, যে মনের আমরা সাক্ষাৎ পাই তাহা শুদ্ধ ও স্বাধীন মন নয় ; আবরণকারী নিশ্চেতনার কুয়াশার জন্য তাহা ম্লান এবং তাহার শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে, তবু মন নিশ্চেতনার কবল হইতে জ্ঞানকে মুক্ত করিবার জন্য তপস্যারত আছে এবং নিয়ত সংগ্রাম করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সব কিছু নির্ভর করে চেতনার কতখানি সংবৃত ও অব্যক্ত রহিয়াছে এবং কতখানি বিবৃত ও প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে তাহার উপর ; অচেতন জড়ে চেতনা পূর্ণ সংবৃত ও অব্যক্ত ; তাহার পর জড়ের মধ্যে যাহাতে প্রাণক্রিয়া দেখা দিয়াছে অথচ মননের স্ফুরণ হয় নাই সেই প্রাথমিক অপশু-প্রাণনের মধ্যে চেতনা যেন অচেতন সংবৃতি এবং সচেতন বিবৃতির মধ্যদেশে দোলায়মান অবস্থায় রহিয়াছে, তাহার পরে সজীব

পরিণতির ধারা—আরোহণ এবং সমাহরণ

দেহের অধিবাসী মনে দেখি চেতনা জাগিয়াছে কিন্তু তাহা বহুল পরিমাণে সীমিত এবং কুণ্ঠিত; অবশেষে দেহধারী মনোময় সত্তা ও প্রকৃতির মধ্যে একদিন অতিমানসের জাগরণে চেতনা পূর্ণরূপে উন্মিষিত ও প্রকাশিত হইবে, ইহাই নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

পরিণামশীল চেতনার গতি যখন এক এক পর্ব্বে আসিয়া পৌঁছে তখন সেই সেই পর্ব্বের উপযোগী এক এক প্রকার সত্তা দেখা দেয়, একের পর এক আসিয়া আবির্ভূত হয়—শুদ্ধ জড়ের নানা রূপ ও শক্তি, উদ্ভিদ-জীবন, পশু এবং অর্দ্ধ-পশু-মানব, পুষ্ট এবং উন্নত মানুষ, অপূর্ণরূপে উন্মিষিত এবং পূর্ণতররূপে পরিণত অধ্যাত্মসত্তা; কিন্তু পরিণামের ধারা নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া তাহাদের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান কোথাও নাই; প্রত্যেক অগ্রগতি বা নূতন রূপায়ণ পুরাতনকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। পশু সজীব ও অজীব জড়কে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, মানুষও নিজের মধ্যে এই দুই এবং তৎসঙ্গে পশুত্বকেও গ্রহণ করে। পর্ব্ব হইতে পর্ব্বান্তরে পৌঁছিবার সময় লাঙ্গল-রেখার (furrow) মত ভেদের একটী রেখা প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট ও বিশিষ্ট অভ্যাসের ফলে থাকিয়া যায়, কিন্তু এই ভেদ-রেখা এক পর্ব্বকে অন্য পর্ব্ব হইতে পৃথক করিয়া দেখায়, হয়ত বা যাহা উন্মিষিত হইয়াছে তাহা যাহাতে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা করে কিন্তু পরিণাম-ধারার নিরবচ্ছিন্নতা নষ্ট বা ভঙ্গ করিয়া দেয় না। উন্মিষন্ত চেতনার এক পর্ব্ব হইতে পর্ব্বান্তর সংক্রমণ অথবা এক সোপানমালা হইতে অন্য সোপানমালায় অধিরোহণ চলে, কখনও বা ধীরভাবে এবং অজ্ঞাতসারে কখনও বা লম্ফ প্রদান করিয়া বা সঙ্কটের মধ্য দিয়া; অথবা হয়ত উপর হইতে কোন শক্তি আসিয়া পড়িবার ফলে, প্রকৃতির ঊর্দ্ধ্বভূমি হইতে কোন কিছুর অবতরণ এবং প্রাণে প্রবিষ্ট হইয়া শক্তিসঞ্চার বা প্রভাব বিস্তারের জন্যই এ পর্ব্বান্তর-প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু যে উপায়েই হউক না কেন জড়ের মধ্যে গোপনে গৃহস্বামীরূপে যে চেতনা বাস করিতেছে সে এইভাবে নিম্নতর হইতে উচ্চতর স্তরে পৌঁছিতে পারে; সে সময় পূর্ব্বে যাহা সে ছিল তাহা সে যাহা হইয়াছে তাহার মধ্যে লইয়া আসে এবং সে যাহা হইবে তাহার মধ্যে এ উভয়কে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। এইভাবে জড়-সত্তা, জড়-রূপ, জড়-শক্তি ও জড়-উপাদান দিয়া সে বিসৃষ্টির ভিত্তিস্থাপন করে; প্রথমে মনে হয় ইহার মধ্যে সে নিজে ঘুমে অচেতন হইয়া আছে, যদিও আমরা এখন জানি যে এ অবস্থায়ও সে বস্তুতঃ অবচেতনভাবে সক্রিয় রহিয়াছে;

তাই সে ক্রমে জড়-জগতের মধ্যে প্রাণ এবং প্রাণময় সত্তা, তাহার পর মন ও মনোময় সত্তাকে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে; অতএব ইহা নিশ্চিত যে এখানেই একদিন সে অতিমানস এবং অতিমানস-সত্তার আবির্ভাব সম্ভব করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে। এইভাবে পরিণাম-ধারা আসিয়া আজ যেখানে পৌঁছিয়াছে, মানুষই মনে হয় তাহার চরম ফল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উচ্চতম শিখরে এখনও সে পৌঁছে নাই, কেননা মানুষ নিজেই পর্ব্বান্তর-প্রাপ্তির বা পর্ব্বসন্ধি সময়ের এক সত্তা; সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেখান হইতে পরিণামের সমগ্রগতি এক নূতন দিকে ফিরিবে। পরিণাম-ধারা নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া যে কোন সময় যদি তাহাকে দেখি তবে দেখা যাইবে যে তাহার মধ্যে অতীত তাহার প্রধান প্রধান বা মৌলিক ফল বা পরিণামসমূহকে লইয়া স্পষ্টভাবে বর্ত্তমান আছে; তাহার এক বর্ত্তমান আছে যেখানে সম্ভূতির ধারার মধ্য দিয়া নূতন ফললাভ করিবার জন্য সাধনা চলিতেছে; আবার তাহার মধ্যে সত্তার যে সমস্ত অনুন্মিষিত শক্তি ও রূপকে উন্মিষিত এবং অবশেষে পূর্ণৈশ্বর্য্য লইয়া পূর্ণরূপে অবশ্য প্রকাশিত হইতে হইবে তাহাদিগকে লইয়া ভবিষ্যৎও রহিয়াছে। পরিণামের অতীত ইতিহাসে দেখি অতি ধীরে নানা বাধার মধ্য দিয়া অবচেতন ক্রিয়া-ধারা চলিতেছে তাহার ফল বহিস্তরে দেখা দিয়াছে, ইহা পরিণাম-ধারার অবচেতন আদি পর্ব্ব; বর্ত্তমানে চলিতেছে তাহার মধ্যপর্ব্ব, এ পর্ব্বে সত্তার পরিণামবিধায়িনী গোপন শক্তি পরিণামের ধারাকে অনিশ্চিত এক সর্পিল গতিতে প্রবাহিত করিতেছে। যে গতির মধ্যে সে মানুষের বুদ্ধিকেও সাধনযন্ত্র রূপে ব্যবহার করিতেছে কিন্তু মানুষের বুদ্ধি তাহার কার্য্যে অংশগ্রহণ করিলেও পূর্ণ-বিশ্বাসের পাত্র এখনও হইতে পারে নাই, তাই সে শক্তির মনে কি আছে তাহা সে জানে না — এ পর্ব্বে পরিণাম-ধারা ক্রমশঃ আত্মসচেতন হইয়া উঠিতেছে, ভবিষ্যতে চিন্ময় সত্তার উত্তরোত্তর সচেতন পরিণাম চলিতে থাকিবে, অবশেষে বিজ্ঞানঘন তত্ত্বের উন্মেষ ও প্রকাশে পরিণাম-ধারা সকল সঙ্কোচ ও বাধা হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ আত্মসচেতন ক্রিয়াতে পরিণত হইবে।

এই পরিণাম এবং উন্মেষের প্রথম ভিত্তি হইল জড়রূপের সৃষ্টি; প্রথমে অচেতন এবং অজীব জড়বস্তুর বিন্যাস, তাহার পর প্রাণময় এবং মননশীল জড়রূপের সৃষ্টি; চেতনাকে ক্রমশঃ বেশী করিয়া প্রকাশ করিতে পারে এরূপ অধিকতর শক্তিশালী অধিকতর সুশৃঙ্খল দেহ গঠন, এই সমস্ত বিষয় জড়-বিজ্ঞান জড়ের এবং দেহগঠনের দিক হইতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করি-

য়াছে, কিন্তু সে আলোচনায় অন্তরের দিকে চেতনাব উপর বেশী আলোক পড়ে নাই, এ সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা হইয়াছে তাহাতে চেতনাব স্বকীয় প্রকৃতির অগ্রগতির ধারাকে অনুসরণ করা হয় নাই, হইয়াছে প্রধানতঃ চেতনার জড়ীয় ভিত্তি এবং যান্ত্রিক সাধনার দিক। পরিণতির ধাবাকে যতটা পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা আছে, কেননা দেখা যায় জড়কে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণেব এবং অবমানস প্রাণকে আত্মসাৎ করিয়া মনের প্রকাশ হয় ; বুদ্ধিময় মন ইন্দ্রিয়ময় এবং প্রাণময় মনকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে ; তবুও চেতনাব পবিণামেব কোন এক পর্ব্ব এবং তাহার পরবর্ত্তী পর্ব্বের মধ্যে এক দুস্তব ব্যবধান দেখা যায় এবং লম্ফ দিয়া বা সেতু-বন্ধন করিয়া ব্যবধানের এ সাগর লঙ্ঘন কবা অসম্ভব মনে হয় ; অতীতে প্রকৃতি যে এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিল অথবা কবিয়া থাকিলে কি উপায়ে করিয়াছিল তাহার কোন প্রত্যক্ষ বা সন্তোষজনক প্রমাণ আমবা খুঁজিয়া পাই না। দিকের পরিণামে যেখানে শুধু জড়রূপের উন্মেষ ও পুষ্টির কথা করা হইয়াছে তথায় সুস্পষ্ট তথ্যের প্রচুব সঙ্কলন হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও পরিণতির এই বিরাট শৃঙ্খলেব অনেক কড়া (link) বা পবিণতির অনেক স্তর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং লুপ্তই থাকিয়া যাইতেছে ; কিন্তু চেতনার পরিণতির পথ আরও দুরূহ, তথায় বিচ্ছেদ আরও বেশী, তাহা ব্যাখ্যা করা আবো কঠিন। মনে হয় যেন সে ক্ষেত্রে এক পর্ব্ব হইতে পর্ব্বান্তরে সংক্রমণ হয় নাই, হইয়াছে একটা রূপান্তর। অবশ্য ইহা হইতে পাবে যে অবচেতনের মধ্যে প্রবেশ অথবা অবমানসেব গভীরতা পরিমাপ করিবাব শক্তি আমাদের নাই। অথবা আমাদের চিত্তভূমির নীচে আমাদের চেতন বা মনন হইতে বিভিন্ন যে নিম্নতর মননের ভূমি আছে তাহাকে আমরা যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারিনা, এই সমস্ত কারণে পরিণামের প্রতি পর্ব্বে বা প্রতি পর্ব্বের প্রান্তদেশে যে সকল সূক্ষ্ম স্তর বর্ত্তমান আছে আমরা তাহা দেখিতে পাই না, এই সমস্ত জড় তথ্য বিস্তৃত ও সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়া এই সকল ফাঁক বা লুপ্ত কড়া বা স্তর সত্ত্বেও জড় বিজ্ঞানী পরিণাম-ধারার নিবরবচ্ছিন্নতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরাও যদি ভিতরের পরিণাম-ধাবাকে তেমনি ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান ও বিচার কবিয়া দেখিতে পাবিতাম তবে এই সমস্ত বিশাল পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা ও ক্রিয়াধারা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতাম। কিন্তু তবুও পর্ব্বে পর্ব্বে একটা বাস্তব এবং মৌলিক ভেদ আছে। সে ভেদ এত

অধিক যে এক পর্ব্ব হইতে অন্য পর্ব্বে পৌঁছিলে মনে হয় যেন একটা নূতন সৃষ্টি দেখা দিল—একটা অলৌকিক রূপান্তর সাধিত হইল ; যাহাতে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা অনুমান করা যায় এমন কোন স্বাভাবিক ভাবে এ পরিণতি চলিতেছে অথবা সুবিন্যস্তভাবে স্থাপিত সোপানাবলির সহজ পরম্পরার মধ্য দিয়া সরল ভাবে এক পর্ব্ব হইতে পর্ব্বান্তরে পরিণতি হইতেছে ইহা মনে করা খুবই দুরূহ তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রকৃতি-পরিণামের ঊর্দ্ধ্বস্তরের দিকে অগ্রসর হইলে দেখা যায় স্তরগুলির পরস্পরের ব্যবধান সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে বটে কিন্তু তাহার গভীরতা বাড়ে। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে ধাতুতে প্রাথমিক ভাবে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, মূলতঃ সে সাড়া উদ্ভিদের মধ্যস্থিত প্রাণের সাড়ার সহিত এক কিন্তু যাহাকে প্রাণময় জড় সত্তা বলা যায় তাহার দিক হইতে দেখিতে গেলে ধাতু এবং উদ্ভিদের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত বেশী বলিয়া বোধ হয় ; একটি আমাদের কাছে নিষ্প্রাণ মনে হয়, অপরটি আপাত সচেতন না হইলেও তাহাকে প্রাণবান সত্তা বলিতে পারি। উচ্চতম উদ্ভিদ এবং নিম্নতম পশুর জীবনে ব্যবধান স্পষ্টতঃ গভীরতর, কেননা এখানে পশুতে মন বলিয়া এক নূতন বস্তু জাগিয়াছে কিন্তু উদ্ভিদে মনের প্রাথমিক কোন ক্রিয়া বা বিন্দুমাত্র আভাসও বাহিরে ফুটে নাই, মন থাকা এবং মন না থাকা এ উভয় অবস্থার মধ্যে ব্যবধান খুবই গভীর ; একদিকে উদ্ভিদে মনশ্চেতনা জাগ্রত হয় নাই কিন্তু তাহার মধ্যে প্রাণের সাড়া খুবই স্পষ্ট, হয়ত তাহার মধ্যে দমিত বা অবচেতন অথবা হয়ত কেবল অবমানস ভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতিময় স্পন্দন আছে, এবং বোধ হয় যেন তাহা খুব সক্রিয় ভাবেই আছে ; অন্যদিকে নিম্নতম পশুতে যদিও প্রথমতঃ দেখা যায় যে তাহার প্রাণ উদ্ভিদের অবচেতন জীবন-ধারায় যতটা স্বয়ংক্রিয় এবং নিরুদ্বিগ্ন ছিল ততটা আর নাই, তাহার নব প্রকাশিত ব্যক্ত চেতনা যদিও তাহাকে অপূর্ণভাবেই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তথাপি মন জাগিয়াছে, সচেতন জীবন দেখা দিয়াছে, একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে দৈহিক গঠনে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন উভয়ের প্রাণলীলার সাধারণ বিধান উভয়ের মধ্যস্থিত ব্যবধানের বিস্তারকে সঙ্কুচিত করিয়াছে যদিও তাহার গভীরতাকে পূরণ করিতে পারে নাই। আবার উচ্চতম পশু এবং নিম্নতম মানুষের মধ্যে ব্যবধান ইন্দ্রিয় মানস এবং বুদ্ধিরই ব্যবধান, এখানেও দেখি ব্যবধানের বিস্তার যেমন কমিয়াছে গভীরতা তেমন বাড়িয়াছে ; কেননা অসভ্য মানবের

পরিণতির ধারা—আরোহণ এবং সমাহরণ

আদিম প্রকৃতির কথা যতই বলি না কেন, আদিমতম মানুষ ইন্দ্রিয়মানসে, আবেগময় প্রাণধর্ম্মে এবং প্রাথমিক ভাবের ব্যবহারিক বুদ্ধিতে পশুর মত হইলেও তদুপরি তাহার মধ্যে মানুষী বুদ্ধি আছে; পরিমাণে যতই অল্প হউক না কেন বিচার, ধারণা, সচেতনভাবে আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা, নীতি এবং ধর্ম্মের ভাবনা ও অনুভূতি যে তাহার আছে, এক কথায় মানুষজাতি যে কোন এক মৌলিক শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে এ তথ্য উড়াইয়া দেওয়া যায় না; সভ্য এবং অসভ্য মানুষের বুদ্ধি একই ছাঁচে ঢালা, অসভ্য চরিত্র গঠনের জন্য উপযুক্ত উপদেশ বা শিক্ষাদীক্ষা অতীতে পায় নাই, ইহাদের বুদ্ধির মধ্যে ইহাই কিছু ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে তাই তাহার বুদ্ধির সামর্থ্য, তীক্ষ্ণতা এবং কর্ম্মশক্তি তেমন ভাবে পরিণত হইতে পারে নাই। তথাপি এ সমস্ত ভেদরেখা থাকা সত্ত্বেও আমরা এখন আর বিশ্বাস করিতে পারি না যে ঈশ্বর বা কোন বিশ্বস্রষ্টা প্রত্যেক জাতি এবং উপজাতিকে পরিণামের অপেক্ষা না রাখিয়া দেহে এবং চেতনায় সুনির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি দিয়া পৃথক পৃথক রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ভাবেই সকলে আছে, এবং নিজের সৃষ্টি দেখিয়া তিনি মনে করিতেছেন যে সৃষ্টি উত্তমই হইয়াছে। একথা এখন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে কোন গোপন চেতন বা অচেতন সৃষ্টিশক্তি ক্ষিপ্র বা মন্থর গতিতে প্রাণময় অন্নময় বা মনোময় বিচিত্র যান্ত্রিক কৌশল বা উপায় প্রয়োগের ফলে এই পরিবর্ত্তন আনিয়াছে এবং হয়ত এইরূপে কোন বিশেষ পর্ব্ব গড়িয়া তুলিবার পরে যে সমস্ত বিশিষ্ট রূপায়ণ পর্ব্বসংক্রমণের সোপানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল অথচ যাহা প্রকৃতিপরিণামের আর কোন কাজে লাগিবে না তাহাদিগকে পৃথকরূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা আর হয় নাই, তাই সে সমস্ত রূপায়ণ ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফাঁক বা নষ্ট স্তর সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত এখনও একটা অনুমান বা প্রকল্প (hypothesis) মাত্র, ইহাকে এখনও আমরা যথাযথরূপে প্রমাণ করিতে পারি না। সে যাহাই হউক না কেন ইহা সম্ভব যে এই সমস্ত মৌলিক বিভেদের কারণ পরিণামের ক্ষেত্রে যে অন্তর্গূঢ় শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহার মধ্যেই নিহিত আছে, বাহ্যিক পরিবর্ত্তন পদ্ধতিতে নয়; যদি আমরা ভিতরের দিকে আরও গভীরভাবে খুঁজি তাহা হইলে বুঝিবার বাধা দূর হয় এবং এই সমস্ত পর্ব্বসংক্রমণ বা জাত্যন্তরে পরিণতির রহস্য সহজে বুঝা যায়; তখন মনে হয় পরিণামের ধারা এবং প্রকৃতি অনুসারে বস্তুতঃ এরূপ হওয়াই অনিবার্য্য।

স্থূল জড়ের বা জড় বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়া না দেখিয়া যদি আমরা সমস্যাটিকে মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখি, এবং প্রকৃতিপরিণামের এক পর্ব্বের সঙ্গে আর এক পর্ব্বের ভেদ বা পার্থক্য কিসের উপর নির্ভর করে তাহা যদি স্পষ্টভাবে বুঝিতে চাই তবে আমরা দেখিতে পাইব যে চেতনার এক ভূমি হইতে অন্য ভূমিতে আরোহণের ফলেই ভেদ উপস্থিত হয়। ধাতু, অচেতন এবং নিষ্প্রাণ জড় তত্ত্বের মধ্যে দৃঢ়রূপে স্থাপিত, এমন কি যদি আমরা তাহার মধ্যে এমন কোন সাড়া দেখিতে পাই যাহা ইঙ্গিত করে যে তাহার মধ্যে প্রাণ আছে অথবা অন্ততঃপক্ষে যদি তাহাতে এমন প্রাথমিক কম্পনের সন্ধান পাই যাহা উদ্ভিদে আসিয়া প্রাণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তবু তাহার বিশিষ্টরূপে ধাতু প্রাণনের রূপায়ণ নহে, তাহার বিশেষ প্রকৃতিতে তাহা জড়েরই এক রূপ। তেমনি উদ্ভিদ প্রাণতত্ত্বের অবচেতন ক্রিয়ার মধ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, তাহার অর্থ ইহা নহে যে তাহা জড়ের অধীন নয় অথবা শুধু মননের মধ্যেই যাহার পূর্ণ অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় এমন প্রতিক্রিয়া তাহার মধ্যে নাই, কেননা তাহার মধ্যে এমন অবমানস সাড়ার যেন সন্ধান পাওয়া যায়, মানুষের মধ্যে যাহার ভিত্তিতে সুখ বা দুঃখ, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ দেখা দিয়াছে; তবু উদ্ভিদ প্রাণেরই এক রূপায়ণ, অবিমিশ্র জড়ের নহে, অথবা আমরা যতদূর জানি তাহা সচেতন মনোময় সত্তা একেবারেই নয়। মানুষ ও পশু এ উভয়ই সচেতন মনোময় জীব, কিন্তু পশু প্রাণময় মন এবং ইন্দ্রিয় মানসের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহার সীমালঙ্ঘনের সাধ্য তাহার নাই, কিন্তু মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়মানসের মধ্যে বুদ্ধি নামক অন্য এক তত্ত্বের আলোক পাইয়াছে; বস্তুতঃ অতিমানস নিম্নতরক্ষেত্রে অধঃপতিত এবং প্রতিবিম্বিত হইয়া এই বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়াছে, ইহা বিজ্ঞানলোকের এক রশ্মি কিন্তু ইন্দ্রিয়মানস তাহাকে ধারণ করিয়া তাহার নিজ মূল হইতে ভিন্ন একরূপে রূপান্তরিত করিয়াছে; কেন না ইন্দ্রিয়মানসের মত যাহার মধ্যে এবং যাহার জন্য সে ক্রিয়া করিতেছে তাহাকে সে জানে না, সে জ্ঞান খোঁজে, কেননা জ্ঞান তাহার নাই, অতিমানসের মত স্বাভাবিক ভাবে এবং নিজের বিশেষ অধিকারবলে জ্ঞান তাহার মধ্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত নাই। এই কথা অন্য ভাষায় এইভাবে বলা চলে যে, প্রকৃতি-পরিণামের প্রত্যেক পর্ব্বে বিশ্বপুরুষ তাহার চেতনার ক্রিয়া এক একটি পৃথক তত্ত্বের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অথবা একই তত্ত্বের উচ্চতর এবং নিম্নতর ক্ষেত্রে দুইটি পর্ব্ব সন্নিবেশিত করিয়াছেন—যেমন পশু ও মানুষের

বেলায়, যদিও সেখানে উচ্চতর ক্ষেত্র এখনও ব্যবহৃত হয় নাই। এক তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ অন্য তত্ত্বে এই দীর্ঘ পদক্ষেপের ফলেই পর্ব্বভেদ, ভেদরেখা এবং দুস্তর ব্যবধান দেখা দিয়াছে; সকল প্রকার ভেদের কারণ না হইলেও, প্রকৃতি-পরিণামের এক পর্ব্বস্থিত সত্তার সহিত অন্য পর্ব্বস্থিত সত্তার একটা মৌলিক বিশিষ্ট ভেদের ইহাই কারণ।

কিন্তু আমাদিগকে ইহা বুঝিতে হইবে, যে এই আরোহণে, উচ্চ হইতে উচ্চতর তত্ত্বের পরম্পরা প্রতিষ্ঠায়, নিম্নতর পর্ব্ব পরিত্যক্ত হয় না, যেমন নিম্নতর পর্ব্বে অবস্থানের সময় তাহার মধ্যে উচ্চতর তত্ত্বের একান্ত অভাবও কখনও থাকে না। পর্ব্বসমূহের মধ্যে গভীর ভেদরেখার জন্য পরিণামবাদের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উঠিয়াছিল এই দিক দিয়া দেখিলে তাহা খণ্ডিত হয়; কেননা নিম্নতর পর্ব্বে যদি উচ্চতর পর্ব্বের অঙ্কুর থাকে, উচ্চতর পর্ব্বের পরিণত সত্তার মধ্যে যদি নিম্নতর পর্ব্বের ধর্ম্মসকলও বজায় থাকে, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে পরিণামের ক্রিয়াধারা চলিতেছে। এমন একটা ক্রিয়াধারা প্রয়োজন যাহার ফলে নিম্নতর পর্ব্বস্থিত সত্তা এমন এক অবস্থায় উন্নীত হইবে যেখানে তাহার মধ্যে উচ্চতরের প্রকাশ ঘটিতে পারে; সেই অবস্থায় যেখানে এই নূতন শক্তি প্রভাবশালী রূপে প্রতিষ্ঠিত সেই উচ্চতর ভূমি হইতে শক্তিপাত বা শক্তির একটা চাপ অল্পাধিক ক্ষিপ্র এবং সুনিশ্চিত-ভাবে রূপান্তর ঘটিবার সহায়তা করিতে পারে, তখন রূপান্তর সিদ্ধি এক লম্ফে বা লম্ফ পরম্পরার মধ্য দিয়া হয়—প্রথমে অতিমন্থর দুর্নিরীক্ষ্য এমন কি অব্যক্ত গতিতে যে প্রকৃতি-পরিণাম আরম্ভ হইয়াছিল তাহার শেষ ভাগে তাহা দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলে এবং যেন ক্রমভঙ্গ করিয়া বা নিজের কোন কোন স্তর লোপ করিয়া দিয়া সীমালঙ্ঘন করে। মনে হয় এমনই এক রীতিতে প্রকৃতির মধ্যে চেতনা নিম্নতর হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরূঢ় হইয়া আসিতেছে।

বস্তুতঃ জড় পরমাণুর মধ্যে প্রাণ মন এবং অতিমানস আছে, এবং ক্রিয়াশীল হইয়াই আছে; কিন্তু তাহারা অদৃশ্য এবং অতীন্দ্রিয় ভাবে অন্তর্গূঢ় হইয়া আছে, তাহাদের শক্তির ক্রিয়া অবচেতন বা আপাত অচেতনভাবে চলিতেছে; তথায় অণুপ্রাণনকারী এক চিৎসত্তা আছে, কিন্তু তাহার যে বাহ্য আকার এবং শক্তি যাহাকে তাহার রূপময় সত্তা বলিতে পারি এবং যাহাকে তাহার অন্তর্গূঢ় গোপন নিয়ামক চেতনা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি তাহা জড়ক্রিয়ার মধ্যে যেন নিজের অন্তরসত্তাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং তাহাতে এমন ভাবে

অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যেন এক অচলপ্রতিষ্ঠ আত্মবিস্মৃতির জন্য সে কি এবং কি করিতেছে তাহা আর জানিতে পারিতেছে না। এইভাবে দেখিলে পরমাণু এবং অতিপরমাণুগণ (atoms and electrons) যেন চিরন্তন নিদ্রাচর বা স্বপ্নসঞ্চরণকারী (somnambulist) মনে হয়; প্রত্যেক জড় বস্তুর মধ্যে একটা বাহ্য বা রূপচেতনা আছে কিন্তু সে চেতনা সংবৃত, রূপে একান্ত অভিনিবিষ্ট ও সুপ্ত হইয়া আপাতদৃষ্টিতে অচেতনারূপে অবস্থিত আছে এবং এক অজ্ঞাত অননুভূত আন্তরসত্তার দ্বারা সে চালিত হইতেছে; এই আন্তর সত্তাকেই উপনিষদ প্রভৃতি সুষুপ্তের মধ্যে নিত্য জাগ্রত সর্ব্বভূতাধিবাস পুরুষ বলিয়াছে; স্বপ্নসঞ্চরণশীল মানুষ এক সময়ে জাগিয়া উঠে, কিন্তু পরমাণুতে অভিনিবিষ্ট অবস্থায় রূপচেতনায় যে স্বপ্নসঞ্চরণ চলিতেছে তাহা হইতে সে-চেতনা কখন জাগে নাই, কখনও জাগরণোন্মুখও হয় নাই। উদ্ভিদে এই বাহ্য রূপচেতনা এখনও নিদ্রামগ্ন আছে কিন্তু সে নিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখা দিয়াছে, সে জাগিতে ইচ্ছুক বা জাগরনোন্মুখ হইয়াছে, কিন্তু জাগিতে পারিতেছে না। তাহার মধ্যে প্রাণ আসিয়াছে, অর্থাৎ উদ্ভিদে অন্তর্গূঢ় চেতন সত্তার শক্তি এতটা ঘনীভূত এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য হইয়াছে যে ক্রিয়াশক্তির একটা নূতন ধারা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে যাহাকে আমরা প্রাণশক্তিরূপে দেখি। বাহিরের অভিঘাতে উদ্ভিদে প্রাণের সাড়া জাগে কিন্তু সে সাড়াতে মনশ্চেতনার স্থান নাই; বিশুদ্ধ জড়ের ক্রিয়ার মধ্যে যাহার স্থান নাই এমন ভাবের উচ্চতর এবং সূক্ষ্মতর এক নূতন বা নবজাতীয় ক্রিয়াশক্তি উদ্ভিদকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে উদ্ভিদে এক সামর্থ্য দেখা দিয়াছে যাহার বলে আপন হইতে ভিন্ন অন্য সত্তা বা বিশ্বপ্রকৃতির দেওয়া জড় ও প্রাণের অভিঘাত গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে এই নবজাগরিত প্রাণের ভাষায় ও মূল্যে, প্রাণস্পন্দনের গতি ও ঘটনায় রূপান্তরিত করিতে পারে। শুদ্ধ জড়রূপ ইহা করিতে সমর্থ হয় না; জড়রূপ অভিঘাতকে প্রাণবৃত্তি বা কোন বৃত্তিতে রূপান্তরিত করিতে পারে না; তাহার আংশিক কারণ জড় অচেতনভাবে অভিঘাত গ্রহণ করে এবং তাহাতে অজ্ঞাতভাবে সাড়া দিলেও সে গ্রহণশক্তি এমন জাগ্রত নয় যাহাতে অভিঘাতকে প্রাণবৃত্তিতে রূপান্তরিত করিতে পারে, তাহা কেবল মূকরূপে গ্রহণ করিতে এবং অচেতনে সাড়া দিতে পারে—অবশ্য যদি অতীন্দ্রিয় দর্শনকে বিশ্বাস করি তবে জড়ের মধ্যে সে-গ্রহণশক্তি গুপ্তভাবে আছে তাহা স্বীকার করিতে হয়, আর এক আংশিক কারণ এই যে অভিঘাতের মধ্য দিয়া যে শক্তি প্রবাহিত

হয় তাহা এত সূক্ষ্ম যে জড়বিগ্রহের নিষ্প্রাণ ঘন স্থূলত্ব তাহাকে কোন কাজে লাগাইতে পারে না। উদ্ভিদের প্রাণ তাহার জড়দেহ দিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় বটে কিন্তু প্রাণশক্তি জড়সত্তাকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নূতন এক প্রাণময় মূল্য, প্রাণময় মর্য্যাদা দান করে।

পরিণতির ধারা যখন পশুতে আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহার মধ্যে ইন্দ্রিয় এবং মন ফুটিল, যাহাকে আমরা চেতন জীবন বলি তাহা দেখা দিল ; এখানেও প্রকাশের সেই একই রীতি দেখা যায়। সত্তার শক্তি আবার আরও ঘনীভূত এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য হইয়া এত উচ্চস্তরে উঠিল যে, এক নূতন তত্ত্ব স্বীকৃত এবং গঠিত হইল অর্থাৎ মননের তত্ত্ব স্ফুরিত হইল, এ তত্ত্ব নূতন—অন্ততঃ জড়ের জগতে। পশু মনোময় ভাবে নিজের এবং অপরের সত্তা জানে, তাহার ক্রিয়া-ধারাও উদ্ভিদ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর এবং উচ্চতর ; আপন হইতে ভিন্ন যে সত্তা তাহা হইতে মনোময়, প্রাণময় এবং জড়ময় অভিঘাত সকলকে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য এবং অধিকার তাহার ব্যাপকতর ; অন্নময় ও প্রাণময় সত্তাকে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের মধ্য হইতে যাহা পায় তাহা সে ইন্দ্রিয়চেতনা এবং প্রাণময়ী মনশ্চেতনার মূল্যে রূপান্তরিত করে। পশুর শরীরের ও প্রাণের এমন কি মনেরও বোধ আছে ; কেননা তাহার মধ্যে অন্ধ স্নায়বিক-সাড়া যে শুধু জাগে তাহা নহে, তাহার মধ্যে আছে সচেতন ইন্দ্রিয়বোধ, স্মৃতি, বাসনা, আবেগ, সংস্কার ও সংকল্প ; আছে অনুভূতি এবং ভাবনা ও ইচ্ছার নানা উপাদান। এমন কি তাহার একটা ব্যবহারিক বুদ্ধি আছে, যাহার ভিত্তি হইল স্মৃতি, সংস্কার, অভাবের বা প্রয়োজনের তাড়না, পর্য্যবেক্ষণ এবং খানিকটা কুশলী প্রতিভা ; চাতুরী, উপায়কুশলতা এবং পরিকল্পনার শক্তিও তাহার আছে ; সে কিছু পরিমাণে আবিষ্কার করিতে এবং সে আবিষ্কার কিছু কাজে লাগাইতে, অথবা নূতন পরিস্থিতির দাবিতে কিছু কিছু অদল বদল করিতে পারে। তাহার সমস্তটাই অর্দ্ধচেতন সহজ সংস্কার নয়। পশুমন মানববুদ্ধির প্রস্তুতির ক্ষেত্র।

কিন্তু যখন আমরা মানুষে পৌঁছি তখন দেখি সমস্ত ব্যাপার সচেতন হইতেছে। মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ, তাহার মধ্য দিয়া বিশ্বের নিজ পরিচয় নিজের কাছে ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়। নিম্নতর শ্রেণীর পশু এখনও প্রধানত অথবা প্রায় সকলেই নিদ্রাচর (somnambulist) বা অবচেতন ভাবে কার্য্যশীল হইলেও উচ্চতর পশুকে তাহা বলা চলে না, কিন্তু তাহার মন জাগ্রত হইলেও তাহা অতি সঙ্কীর্ণ, তাহার প্রাণসত্তার জন্য যাহা প্রয়োজন

তত্ত্বিক, মননই তাহাতে ফুটিয়াছে, মানুষের মধ্যে সচেতন মন আরও সজাগ হইয়াছে এবং যদিও প্রথমেই পূর্ণ আত্মসচেতন হয় নাই, যদিও তাহার সচেতনতা শুধু বাহিরের ক্ষেত্রে রহিয়াছে তবু তাহার অন্তরের পূর্ণ অখণ্ড সত্তার দিকে তাহার চেতনা ক্রমশঃ অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে। পরিণামের আদিম দুই পর্ব্বের মত সচেতন সত্তার শক্তি উন্নীত ও ঘনীভূত হইয়া ইহার মধ্যে নূতন শক্তির প্রকাশ করিয়াছে এবং সূক্ষ্মতর ক্রিয়াবলির নূতন বিস্তৃততর ক্ষেত্র গঠিত করিয়াছে; প্রাণময় মন এখানে বিচার ও ভাবনাময় মনে রূপান্তরিত হইয়াছে, পর্য্যবেক্ষণ এবং আবিষ্কার করিবার উচ্চতর শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে, তথ্যের সমাহার ও ধারণা সাধন এবং কার্য্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয়ের শক্তি বাড়িয়াছে, কল্পনার ও রসস্থিতির শক্তি, উচ্চতর ও অধিকতর সাবলীল অনুভূতি, বুদ্ধির সমন্বয় এবং অন্যবিধ ধারণের সামর্থ্য প্রভৃতি চেতনার নানা বিভূতির প্রকাশ হইয়াছে, বুদ্ধির ধর্ম্ম এখন আর শুধু প্রতিক্ষিপ্ত বা প্রতিবর্ত্তী (reflex) এবং প্রতিক্রিয়াশীল (rcactive) নয়, তাহার মধ্যে এমন এক মেধা দেখা দিয়াছে যাহা সব কিছুকে আপন বশে আনিতে, বিচার করিয়া দেখিতে এবং নিজেকে পৃথক করিয়া দেখিতে ও বুঝিতে সমর্থ। নিম্নতর পর্ব্বের মত এবারও চেতনার ক্ষেত্র বহু প্রসারিত হইয়াছে, মানুষ আরও বেশী করিয়া নিজের এবং বিশ্বের খবর জানিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এই জ্ঞানের মধ্যে সচেতন অনুভূতির উচ্চতর ও পূর্ণতর রূপের দেখা পাওয়া যাইতেছে। এ পর্ব্বেও চেতনার আরোহণের তৃতীয় সূত্রের নিত্য ক্রিয়া দেখিতে পাই; মন নিম্নতর শক্তিসমূহকে আপন ভূমিতে তুলিয়া লইয়া তাহাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে বুদ্ধির ধর্ম্মে অভিষিক্ত করিয়াছে, মানুষ তাহার প্রাণ সম্বন্ধে যে শুধু পশুর মত সচেতন তাহা নহে, কিন্তু তাহার প্রাণের বোধ ও ধারণা বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, তাহার দেহের বোধও সচেতনতা এবং পর্য্যবেক্ষণের ফলে সমৃদ্ধ হইয়াছে। মানুষ পশুর মনোময় এবং স্থূল অন্নময় জীবন নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে, পশুর মানুষে পরিণত হওয়ার ধারাতে মানুষে আসিয়া পশুর কোন কোন শক্তির কিছু ন্যূনতা দেখা দিয়াছে বটে কিন্তু যাহা সে রক্ষা করিতে পারিয়াছে তাহার উৎকর্ষ সাধন দ্বারা তাহা উচ্চতর মূল্যে পরিণত করিয়াছে; তাহার ইন্দ্রিয়বোধ, সংস্কার, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, আবেগ, মনের নানা বৃত্তির সমাহার, সমস্তেরই বুদ্ধিদীপ্ত বোধ ও ধারণা তাহার আছে; যাহা শুধু ভাবনা, বেদনা, কামনা বা সঙ্কল্পের স্থূল উপাদান ছিল এবং যাহা কেবল স্থূলভাবেই নিয়ন্ত্রিত

হইত, মানুষ সে সমস্তকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বস্তুরূপে পরিণত করিয়া চমৎকার শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে। কেননা পশুও ভাবনা করে কিন্তু প্রধানতঃ স্মৃতি ও সংস্কারের যান্ত্রিক পরম্পরার মধ্য দিয়া তাহার ভাবনা কতকটা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই ফুটিয়া উঠে, প্রকৃতির ইসারা সে ক্ষিপ্র অথবা মন্থর ভাবে গ্রহণ করিয়াই চলে ; বিশেষ কোন কারণে যেখানে পর্য্যবেক্ষণ এবং পরিকল্পনা-শক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন হইয়া পড়ে শুধু সেইখানে অধিকতর সচেতন ব্যক্তিগত ক্রিয়ার মধ্যে সে সাময়িকভাবে জাগ্রত হয়. পশুর মধ্যে ব্যবহারিক বুদ্ধির স্থূল উপাদান কিছু আছে কিন্তু ভাবনা এবং বিচার-বুদ্ধি সুগঠিত হইয়া উঠে নাই। পশুর উন্মিষন্ত চেতনায় আমরা অশিক্ষিত অনিপুণ কারিগরের দেখা পাই, মানুষের মধ্যে সেই চেতনা সুনিপুণ শিল্পী হইয়া দেখা দেয় এবং কেবল সুনিপুণ শিল্পী নয় সে শিল্পাচার্য্য বা শিল্পীরাজ হইয়া উঠিতে পারে,—যদিও আপনাকে সফল করিবার চেষ্টা তাহার মধ্যে আজিও তেমন ভাবে জাগে নাই।

আজ পর্য্যন্ত মানুষের মধ্যেই চেতনার উচ্চতম প্রকাশ হইয়াছে, মানুষের এই চেতনার দুইটি বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করিলে আমরা পরিণতিধারার মর্ম্ম-স্থলে প্রবেশ করিতে পারিব। উচ্চতর চেতনার দ্বারা জীবনের নিম্নস্থিত অংশসকলকে গ্রহণের অর্থ বুঝিতে গেলে প্রথমে দেখি ব্যষ্টি রূপের মধ্যস্থিত উন্মিষন্ত গোপন এক চিৎসত্তা বা এক বিশ্বসত্তা যে উচ্চশিখরে পৌঁছিয়াছে তথা হইতে তখন যাহা তাহার নিম্নে অবস্থিত আছে তাহার উপর কর্তৃত্বশক্তি-পূর্ণ দৃষ্টি দেয়, এই নিম্নাভিমুখী দৃষ্টির সঙ্গে সত্তার চিৎশক্তির যুগল বীর্য্যধারা যুক্ত থাকে, একটি ইচ্ছাশক্তি অপরটি জ্ঞানশক্তি ; এ দৃষ্টির উদ্দেশ্য নিম্নতর হইতে ভিন্ন, নবোন্মিষিত বিশালতর এই চেতনা অনুভূতির ও প্রকৃতির ক্ষেত্র হইতে, নিম্নতর জীবন এবং তন্মধ্যস্থ সম্ভাবনাসকলকে যেমন জানা, তদ্রূপ সে জীবনকে গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধ্বভূমিতে তুলিয়া তাহার মধ্যে উচ্চতর মূল্য ও তাৎপর্য্য সঞ্চার করা এবং তাহার মধ্যস্থিত উচ্চতর প্রচ্ছন্নশক্তি-সকলকে ফুটাইয়া তোলা। তিনি ইহা করেন তাহার স্পষ্ট কারণ এই যে তিনি নিম্নতর জীবনকে নষ্ট করিতে চাহেন না, সত্তার আনন্দের প্রকাশ তাহার নিত্য কাজ, নানা সুরের সুর-সঙ্গতির মধ্য দিয়া যে প্রকাশ চাহেন, কোন একটা সুর যতই মধুর হউক না কেন তাহাই একটানা বাজিয়া যাইতে থাকিবে তাহা তিনি ইচ্ছা করেন না ; তাই তাহার মহাসুর-সঙ্গতির মধ্যে নিম্নতর গ্রামের সকল সুর রক্ষা করা তাহার অভিপ্রেত বটে, কিন্তু যাহাতে তাহাদের স্থূলভাবের রূপায়ণ হইতে যে আনন্দ

পাওয়া সম্ভব ছিল তাহা হইতে বৃহত্তর ও মহত্তর আনন্দলাভ হইতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে গভীরতর ও সূক্ষ্মতর তাৎপর্য্যে পরিপূরিত করিয়া তবে রাখিতে চান। তথাপি তাহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা এবং চিরতরে গ্রহণ করিয়া নেওয়ার জন্য অবশেষে একটা সর্ত্ত তিনি তাহাদের উপর আরোপ করিয়াছেন; সে সর্ত্ত হইল এই যে তাহারা স্বেচ্ছায় উচ্চতর তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবে; কিন্তু যখন তিনি পূর্ণতালাভের জন্য উৎসুক তখন যদি স্বেচ্ছায় তাহারা সম্মতি না দেয় বা বিদ্রোহাচরণ করে, তখন তাহাদিগকে পীড়া দিতে, এমন কি পদদলিত করিতে তিনি দ্বিধা করেন না। বস্তুতঃ নৈতিক জীবন, সংযম এবং তপস্যার ইহাই অন্তরতম খাঁটি উদ্দেশ্য এবং অর্থ; অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য এই যে অন্নময় প্রাণময় এবং নিম্নতর মনোময় জীবনকে বশে আনিয়া শিক্ষা দিয়া পরিশুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত সাধন যন্ত্রে পরিণত করিতে চাহেন, যাহাতে তাহারা প্রথমে ঊর্দ্ধমনের পরে অতিমানসের সুর-সঙ্গতির মধ্যস্থিত সুরে রূপান্তরিত হইতে পারে; তাহাদিগকে বিকলাঙ্গ বা হত্যা করা উদ্দেশ্য নহে। ঊর্দ্ধে আরোহণ প্রথম প্রয়োজন বটে কিন্তু সকল অংশকে জুড়িয়া এক অখণ্ড পূর্ণতা স্থাপনের ইচ্ছাও সেই সঙ্গে প্রকৃতিস্থ চিৎসত্তার মধ্যে রহিয়াছে।

সব দিক দিয়া বিসৃষ্টিকে ঊর্দ্ধে তুলিবার, তাহার মধ্যে গভীরতা ও সূক্ষ্মতা আনয়ন এবং সুন্দরতর ও সমৃদ্ধতর শক্তিতে তাহাকে বিভূষিত করিবার জন্য, জ্ঞান ও ইচ্ছার এই যুগল দৃষ্টি নিম্নের দিকে প্রসারিত করা প্রথম হইতেই প্রকৃতিস্থ গোপন পুরুষের কর্ম্মের ধারা। বলিতে গেলে উদ্ভিদস্থিত আত্মা বা পুরুষ তাহার সমগ্র জড়ময় সত্তাকে যেন এক স্নায়বীয় জড় দৃষ্টিতে দেখিতে চায় এবং তাহা হইতে অন্নপ্রাণময় একটা প্রগাঢ় রস যতটা সম্ভব পাইতে চায়; কেননা, বোধহয় যেন নিঃশব্দ প্রাণকম্পনের এমন একটা তীব্র উত্তেজনা তাহার মধ্যে আছে যাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সহজ নয়; উদ্ভিদ হইতে যাহার মন এবং দেহ উন্নততর এবং সমর্থতর সেই পশুর আধারও হয়ত উদ্ভিদের অপরিণত জীবনধারাতে প্রকাশিত এই উত্তেজনার তীব্রতা সহ্য বা বহন করিতে পারে না। পশু নিজের অন্নময় এবং প্রাণময় জগৎকে মনোময় ইন্দ্রিয়দৃষ্টি দিয়া দেখে, যাহাতে তাহা হইতে যতটা সম্ভব ইন্দ্রিয়লভ্য রস আহরণ করিতে পারে; বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়বোধ, ইন্দ্রিয়বোধযুক্ত আবেগ বা প্রাণের বাসনা ও সুখের পরিতৃপ্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে পশু যে রস অনুভব করে তাহার তীব্রতা অনেক দিক দিয়া মানুষের অপেক্ষা অনেক বেশী।

মানুষ সংকল্প এবং বুদ্ধির ভূমি হইতে দৃষ্টি করিয়া নিম্নতর ভূমির এই সমস্ত তীব্র মাদকতার আকর্ষণকে উপেক্ষা করে, কিন্তু সে চায় মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়-বোধের অন্য উচ্চতর তাৎপর্য্যের গভীরতা, চায় বুদ্ধির, রসবোধের, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জীবনের পরিতর্পণ, চায় কর্ম্মক্ষেত্রে মন সবল ও ক্রিয়াশাল হউক; এই সমস্ত উচ্চতর উপাদানের পরিশীলন দ্বারা জীবনের সাধনাকে উন্নত, উদার এবং স্থূলতাবর্জিত করাই তাহার লক্ষ্য। পশুজীবনের প্রতিক্রিয়া বা ভোগকে সে বর্জন করে না, কিন্তু তাহাদিগকে মননের রসে মিশাইয়া আরও স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল করিয়া তোলে। মানুষ যখন সাধারণ অথবা নিম্নতর ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকে তখনও এই সাধনা করিতে থাকে, কিন্তু যতই সে পুষ্টিলাভ করে ততই নিম্নতর সত্তাকে সে কঠোরতর পরীক্ষার মধ্যে ফেলিতে থাকে এবং তাহাকে বর্জন করিবে এই ভয় দেখাইয়া তাহার কাছে এক ভাবের রূপান্তর দাবি করে, নিজের উর্দ্ধ্বস্থিত ক্ষেত্রে অধ্যাত্মজীবনে পৌঁছিবার জন্য এই উপায়ে মন আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া নিতে চায়।

কিন্তু উচ্চতর ভূমিতে পৌঁছিলে মানুষ যে কেবল তাহার চারিদিকে এবং নিম্নদিকে চাহিয়া থাকে তাহা নহে, তাহার উর্দ্ধ্বে যাহা আছে এবং তাহার অন্তরে গোপন ও অব্যক্তভাবে যাহা আছে তাহার দিকেও সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। মানুষের চেতনায় পরিণাম-ধারার মধ্যে বিশ্বপুরুষের নিম্নগামী দৃষ্টি যে কেবল সচেতন হইয়াছে তাহা নহে তাহার উর্দ্ধ্ব এবং অন্তরদৃষ্টিও জাগ্রত হইতেছে। প্রকৃতি তাহার জন্য যাহা করিয়াছে তাহাতে তৃপ্ত হইয়াই পশু বাস করে, পশুর সত্তার মধ্যে যদি গোপন চিৎপুরুষের কোন উর্দ্ধ্বদৃষ্টি থাকে তাহার সহিত পশুর সচেতন ভাবে কোন যোগ নাই, তাহা এখনও প্রকৃতিরই কাজ; একমাত্র মানুষই প্রথমতঃ এই উর্দ্ধ্বদৃষ্টিপাত সচেতনভাবে নিজের কাজ বলিয়া মনে করে। কেননা মানুষ বুদ্ধিময় ইচ্ছাশক্তি লাভ করিয়াছে, এই শক্তি বিকৃত হইলেও বিজ্ঞান বা পরাবিদ্যারই একটা রশ্মি, তাহার অন্তরে সচ্চিদানন্দের যুগল প্রকৃতি ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে; সে আর পশুর মত প্রকৃতির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত অপরিণত সচেতন সত্তা নহে অথবা তাহার কার্য্যকরী শক্তির দাস বা তাহার যান্ত্রিক শক্তির খেলার পুতুল মাত্র নহে, কিন্তু তাহার মধ্যে চিদাত্মা বা চৈতন্যময় পুরুষ জাগরিত হইয়া উঠিতেছে, এত দিন যাহা প্রকৃতির একার কাজ ছিল, যাহাতে তাহার কোন কথা বলিবার অধিকার ছিলনা, তাহাতে সে হস্তক্ষেপ করিতে, তাহাতে নিজে কিছু বলিতে এবং অবশেষে

প্রকৃতির প্রভু হইতে চাহিতেছে। ইহা করিবার শক্তি এখনও তাহার লাভ হয় নাই, এখনও সে প্রকৃতির জালে জড়িত রহিয়াছে, তাহার চিরাগত যান্ত্রিক শাসনে পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু সে অনুভব করে—যদিও এখনও অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিতভাবে—যে তাহার মধ্যস্থ চিৎসত্তা আরও উচচতর শিখরে আরোহণ করিতে, তাহার সীমা ভাঙিয়া বিস্তাব লাভ করিতে চায় ; তাহার ভিতরের রহস্যালোকে গোপন কিছু আছে যাহা জানে যে তাহার অন্তরের গভীরে অবস্থিত সচেতন পুরুষ-প্রকৃতিব ইচছা ও উদ্দেশ্য নয় যে সে তাহার বর্ত্তমান নিম্নতর অবস্থা ও সীমার মধ্যে তৃপ্ত থাকিবে। যখনই মানুষ অন্নময় ও প্রাণময় জগতে নিজের জন্য স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিবার কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়াছে তখনই তাহার মধ্যে এক স্বাভাবিক আকূতি ও আবেগ জাগিয়াছে যে সে উচচতর শিখর-সমূহে আরোহণ, তাহার চেতনা ও কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারণ এবং তাহার নিম্নতর প্রকৃতির রূপান্তর সাধন করিবে। তাহার অন্তরে অবস্থিত সকরুণ কল্পনার এক ভ্রান্তি তাহাকে মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ করিয়া এই আকূতি ও আবেগ তাহার মনে জাগাইতে বাধ্য করিয়াছে তাহা নহে ; ইহার প্রথম কারণ সে অপূর্ণ কিন্তু পূর্ণতার পথযাত্রী মনোময়-পুরুষ এবং পুষ্টি ও পূর্ণতার জন্য তাহার আকূতি ও প্রচেষ্টা স্বাভাবিক ; তাহা ছাড়া আরও বড় কারণ এই যে পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যে একমাত্র সে-ই মনোময় সত্তার অন্তরালে লুক্কায়িত গভীর রহস্যের কথা জানিতে সমর্থ হইতে পারে, তাহার অন্তরাত্মার, তাহার মনের উপরেব বস্তুব, অতিমানসের, চিদাত্মার আভাস তাহার মধ্যেই প্রথম জাগে, শুধু আভাস যে জাগে তাহাও নহে, সেই জ্যোতিস্বরূপের দিকে নিজেকে খুলিয়া ধরিবাব, তাহাকে নিজের মধ্যে বরণ করিয়া লইবার, নিজে উন্নীত হইয়া তাহাতে পৌঁছিবার এবং তাহাকে লাভ করিবার সামর্থ্যও তাহার আছে। মানুষের—সকল মানুষেরই—প্রকৃতির ধর্ম্ম এই যে সচেতন পরিণামের ধারা ধরিয়া সে নিজেকে অতিক্রম করিবে, এখন সে যেখানে আছে তথা হইতে উর্দ্ধ্বভূমিতে পৌঁছিবে। শুধু ব্যষ্টিব্যক্তি নয়, জাতিরূপেও মানুষ তাহার সত্তার সাধারণ বিধানে এবং জীবনে এ আশা পোষণ করিতে পারে—যদিও জাতির মধ্যস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে একথা প্রযুক্ত না হইতে পারে—যদি মানবজাতির মধ্যে তাহার বর্ত্তমান অদিব্য প্রকৃতির অপূর্ণতা হইতে উর্দ্ধ্বে উঠিবার জন্য এক ইচছা ও সঙ্কল্প উপযুক্ত পরিমাণে জাগ্রত হয় ; অন্ততঃপক্ষে মানবজাতি উচচতর স্তরে আরূঢ় হইতে এবং দিব্য মানবতা বা অতিমানবতা

পূর্ণরূপে লাভ করিতে না পারিলেও তাহার নিকটে যে পৌঁছিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাই হউক না কেন ইহা সত্য যে তাহার মধ্যস্থিত পরিণামশীল প্রকৃতি উর্দ্ধ ভূমিতে আরোহণের জন্য এই আদর্শকে তাহার সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছে এবং তজ্জন্য চেষ্টা করিতে তাহাকে বাধ্য করিতেছে।

নিজেকে অতিক্রম কবিয়া পবিণতিশীল সত্তাকে যে আত্মসম্ভূতি লাভ করিতে হয় তাহার শেষ পরিণতি কোথায়? মনের মধ্যে পরিণামের নানা স্তরের একটা ক্রমোর্দ্ধ পরম্পরা আছে, আবাব প্রত্যেক স্তবের মধ্যে আছে নানা ধারার একটা পর্য্যায়, মনোময় জগতে পবপব সজ্জিত ক্রমোর্দ্ধ শিখরমালা আছে, তাহাদিগকে আমাদের সুবিধার জন্য মনোময় সত্তা ও চেতনার বিভিন্ন ভূমি এবং উপভূমি নামে অভিহিত কবিতে পাবি, প্রধানতঃ এই সমস্ত স্তর বা সোপানাবলির মধ্য দিয়া উপবে উঠিবাব ফলেই আমাদের মনোময় সত্তার পুষ্টি হয়; আমরা ইহার যে কোন স্তবে অবস্থিত হইতে পারি অথচ নিম্নতর স্তরের উপর নির্ভরতার সম্বন্ধ একেবাবে হারাই না, সেখানে থাকিয়া আবার মাঝে মাঝে তাহা হইতে উচচতর স্তরে আরূঢ় অথবা সেই স্তরে অবস্থিত থাকিয়াও উর্দ্ধ হইতে আগত শক্তিপাতে সাড়া দিতে পারি। বর্ত্তমানে আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় বুদ্ধির নিম্নতম যে স্তরে বা উপভূমিতে আমরা প্রথমে দৃঢ়রূপে অবস্থিত থাকিতে পারি, তাহাকে আমরা জড় মনোময় স্তব বলি, কেননা এখনও তথ্যের সাক্ষ্য এবং তত্ত্বের বোধের জন্য স্থূল মস্তিক, স্থূল ইন্দ্রিয় এবং স্থূল ইন্দ্রিয়-মানসের উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়; এখানে আমবা সেই অন্নময় মানুষ যাহার কাছে বাহিরের বস্তু এবং বাহিবের জীবনেব মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, ভিতরের অন্তর্ম্মুখী বৃত্তি বা অন্তরেব সত্তার অনুভূতি অতি অল্প; বাহিরের সত্তা ও বৃত্তির বৃহত্তর দাবির তুলনায় অন্তরের যেটুকু অনুভূতি তাহার আছে তাহা গৌণ ও অকিঞ্চিৎকর। অন্নময় মানুষেব একটা প্রাণময় অংশ আছে যাহার প্রধান উপাদান অবচেতনা হইতে উত্থিত প্রাণ-চেতনার সহজাত সংস্কার এবং আবেগের কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপায়ণ এবং তাহার সঙ্গে আছে গতানুগতিক ভাবের গতি ও শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়বোধ, বাসনা, আশা, আবেগ, অনুভূতি ও তৃপ্তি প্রভৃতি অনেক কিছু—যাহাদের অস্তিত্ব বাহ্যবস্তু বা বাহ্য সংস্পর্শের উপর নির্ভর করে; যাহা কিছু ব্যবহারিক, সদ্য যাহা পাওয়া বা সাধিত হওয়া সম্ভব, যাহা অভ্যাসগত যাহা সাধারণ এবং মাঝারি গোছের তাহা লইয়া তাহাদের কারবার। তাহার মধ্যে একটা মনোময় অংশও আছে, কিন্তু তাহারও দৃষ্টি

বাহিরের দিকে ফিরানো, বাহ্য বিষয়ের উপর নিবদ্ধ, যাহা কিছু চলিয়া আসিতেছে, যাহাতে সে অভ্যস্ত, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাহা কাজে লাগে তেমন কিছু মাত্র সে অংশে আছে ; প্রধানতঃ জড়ময় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতিময় সত্তার ভোগ ও তর্পণ, ব্যবহার ও আরাম, আশ্রয় ও প্রয়োজনের জন্যই মনের রাজ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সে মর্য্যাদা দেয় বা মূল্য স্বীকার করে। কেন না অন্নময় মন জড় ও জড়জগৎ, দেহ এবং দেহগত জীবন, ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং সাধারণ ব্যবহারিক মনন ও তাহার অনুভবের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে। এই জাতীয় নয় এমন যাহা কিছু তাহার মধ্যে আছে, অন্নময় মন তাহাদিগকে লইয়া বাহ্য ইন্দ্রিয়মানসের ভিত্তির উপর এক ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করে। তৎসত্ত্বেও জীবনের এই সমস্ত উচ্চতর উপাদানকে সে সহায়কারী অপ্রধান বস্তু বা কল্পনার অপ্রয়োজনীয় কিন্তু মনোরম বিলাস অথবা হৃদয় বা মনের বস্তুনিরপেক্ষ উচ্ছ্বাস মাত্র মনে করে ; অন্তরের কোন সত্য বস্তু মনে করে না ; অথবা যখন সে এ সমস্তকে সত্যবস্তু বলিয়া গ্রহণ করে তখনও তাহাদিগকে বাহ্যবস্তুর মত বাস্তব এবং মূর্ত্ত বলিয়া অনুভব করিতে পারে না, কেননা তাহাদের স্বরূপগত উপাদান জড় পদার্থ হইতে সূক্ষ্মতর এবং তাহাদের বাস্তবতাও সূক্ষ্মতরভাবেই অনুভব করিতে হয়, তাই এ সমস্তকে স্থূলের চেয়ে যাহার বাস্তবতা কম, স্থূলের তেমনি একটা সূক্ষ্ম মনোময় বিস্তার মাত্র মনে করে। মানুষ যে এইভাবে জড়ের উপর প্রথমে দাঁড়াইবে এবং বাহ্যতত্ত্ব এবং বাহ্যসত্তাকে তাহার ন্যায্য মূল্য দিবে তাহা অপরিহার্য্য, কারণ প্রকৃতি আমাদের সত্তায় আমাদের জন্য প্রথমে ইহাই ব্যবস্থা করিয়াছে এবং যাহাতে আমরা ইহা গ্রহণ করি তাহার জন্য আছে তাহার প্রবল জেদ ; প্রকৃতি নিরাপদে রক্ষা করিবার শক্তিরূপে আমাদের মধ্যস্থ অন্নময় মানুষটিকে গুরুত্ব প্রদান করিয়া জগতে তাহাকে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে ; তাই যখন সে উচ্চতর মানুষের পুষ্টিসাধন-ক্রিয়াতে রত আছে তখন কতকটা অসাড় হইলেও এই অন্নময় মননকে নিজের দাঁড়াইবার ভিত্তি-রূপে গ্রহণ করিয়াছে ; কিন্তু মনের এই রূপায়ণের মধ্যে প্রগতির শক্তি নাই, কিম্বা থাকিলেও তাহা শুধু স্থূলের প্রগতি, ইহা মননের প্রথম স্তর কিন্তু মানুষের পরিণামের সোপানাবলির এই নিম্নতম ধাপে মানুষ চিরকাল থাকিতে পারে না।

জড়ময় মনের উপরে স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভবের আরও গভীরে এক বোধশক্তি আছে যাহাকে আমরা প্রাণময় মন বলিতে পারি। সে মন চঞ্চল, ক্রিয়াশীল, প্রাণধর্ম্মী, শক্তিশালী ও সংবেদনশীল ; চৈত্যপুরুষের দিকে অজ্ঞাতসারে হইলেও

নিজেকে অনেকটা সে খুলিয়া ধরে; ইহা জীব-চেতনার এক প্রাথমিক আত্ম-রূপায়ণ সাধনে সমর্থ যদিও তাহা প্রাণ-আত্মার একটা অন্ধকারময় রূপ মাত্র, এ চেতনাকে চৈত্যপুরুষ বলিতে পারি না, ইহা বহিঃক্ষেত্রে প্রাণময় পুরুষের একটা রূপায়ণ। এই প্রাণ-আত্মা প্রাণজগতের বস্তুর সংস্পর্শে আসে এবং তাহাদিগকে বাস্তব বলিয়া অনুভব করে এবং এখানে তাহাদিগকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে চায়; প্রাণসত্তা প্রাণশক্তি এবং প্রাণপ্রকৃতিকে পরিতৃপ্ত এবং পূর্ণ করিয়া তোলাই ইহার কাছে পরম পুরুষার্থ। প্রাণাবেগের, আত্মসম্পূরণের, উচ্চাভিলাষের, শক্তির, সবল চরিত্রের, প্রেমের ও বাসনার খেলার ক্ষেত্ররূপেই সে জড় জগৎকে দেখে; সে চায় এই জগতে ব্যক্তিগত সমাজগত এমন কি বিশ্বগত ভাবে বাসনার বস্তুকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, দুঃসাহসের পথে অভিযান চালাইবে, বিপদসঙ্কুল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, জীবনকে লইয়া নানা পরীক্ষা করিবে, জীবনে নব নব অভিজ্ঞতার রসাস্বাদন করিবে; এই সমস্ত সঞ্জীবনী উপাদান, এই বৃহত্তর শক্তি, লক্ষ্য, তাৎপর্য্য, রস যদি তাহার মধ্যে না থাকে তাহা হইলে এই প্রাণময় মনের কাছে জড় জীবনের কোন মূল্য থাকে না। অধিচেতনায় অধিষ্ঠিত আমাদের অন্তর্গূঢ় প্রাণময় পুরুষই এই প্রাণময় মনকে ধারণ করিয়া আছে; এ মন প্রচ্ছন্নভাবে প্রাণজগতের সহিত যুক্ত আছে এবং সেখানে সহজেই নিজেকে খুলিয়া ধরিতে এবং তাহার ফলে জড়জগতের পশ্চাতে অবস্থিত অদৃশ্য সক্রিয় শক্তি এবং সত্যের অনুভব লাভ করিতে পারে। অন্তরে এক সূক্ষ্ম-প্রাণময় মন আছে যাহাকে অনুভবের জন্য ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতে হয় না, ইন্দ্রিয়ানুভবের গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকিতে সে বাধ্য নহে; এই ভূমিতে পৌঁছিলে আমাদের জড়দেহ এবং জড়জগতের সকল প্রতীক হইতে স্বতন্ত্রভাবে আমাদের অন্তরের জীবন এবং জগতের অন্তর্জীবন আমাদের কাছে সত্য হইয়া উঠে; অথচ শুধু দেহ, জড়জগৎ এবং তাহাদের প্রতীক-গুলিকেই আমরা প্রাকৃতিক ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করি, যেন প্রকৃতির মধ্যে ইহাপেক্ষা বৃহত্তর কোন ব্যাপার নাই, যেন স্থূল জড় বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর কোন সত্য বস্তু নাই। প্রাণধর্ম্মী মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই সমস্ত প্রভাব দ্বারা গঠিত হইয়া উঠে। এই মানুষের বাসনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি, আবেগ ও উত্তে-জনা, শক্তি ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলই তীক্ষ্ণ ও প্রখর হয়—সে হয় প্রবল গতিশীল কর্ম্মীপুরুষ; প্রাণধর্ম্মী মানুষ জড়জীবনের উপর প্রবল ঝোঁক দিতে পারে বা দেয় কিন্তু যখন বর্ত্তমান জড় ঘটনার মধ্যে অতিব্যাপৃত থাকে তখনও জড়জীবনকে

সে প্রাণের অনুভব, প্রাণশক্তির উপলব্ধি, প্রাণের প্রসার, প্রাণধর্ম্ম ও প্রাণশক্তির ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠার দিকে ঠেলিতে থাকে, কেননা এ সমস্তই সত্তার বিবৃদ্ধির দিকে বেগসঞ্চার করিবার পক্ষে প্রকৃতির প্রাথমিক উপায়; এই প্রাণময় মনের আবেগ যখন প্রবলতম হইয়া উঠে তখন মানুষ তাহার বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলে, নূতনের অভিযানে নূতন নূতন দেশে যাত্রা করে, ভবিষ্যতের স্বার্থ ও মঙ্গলের জন্য অতীত ও বর্ত্তমানকে আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। তাহার যে মনোময় জীবন আছে প্রায়ই তাহা প্রাণশক্তি এবং প্রাণের কামনা বাসনার দাসরূপে ক্রিয়া করে, মনের ভিতর দিয়া সে এই সমস্তেরই তৃপ্তি খোঁজে; কিন্তু প্রাণধর্ম্মী মানুষের দৃষ্টি যখন প্রবলভাবে মনোময় বস্তুর উপর পড়ে সে তখন মনের রাজ্যে দুঃসাহসের পথে অভিযান চালায় এবং মনের নব নব রূপায়ণের পথ বাহির করে অথবা কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য একনিষ্ঠ যোদ্ধা, সুকুমার শিল্পের পূজারী, সক্রিয় ও সমৃদ্ধ জীবন-কবি, কোন বাণীর প্রচারক বা ব্রতের সাধক হইয়া উঠে। প্রাণময় মন প্রবল গতিশীল বলিয়া তাহা প্রকৃতি পরিণামের ক্রিয়াধারার একটা বড় শক্তি।

প্রাণময় মননের এই স্তরের উপরে এবং আরো গভীরে প্রসারিত হইয়া আছে শুদ্ধ চিন্তা এবং বুদ্ধির এক মনোময় ভূমি, এ মনের কাছে মনোজগতের বস্তুই মূল্যবান সত্য; এই মনোভূমির শক্তিতে যাহারা আবিষ্ট তাহারাই হয় দার্শনিক, ভাবুক, বৈজ্ঞানিক, মনোময় স্রষ্টা, আদর্শবাদী পুরুষ, লিখিত বা কথিত বাণীর সাধক, ভাববাদী বা ভবিষ্যতের স্বপ্নে পাগল; আজ পর্য্যন্ত মনোময় জীবের প্রগতি যতটা উন্নীত হইয়াছে, ইহারা তাহার শিখরদেশে অধিষ্ঠিত। এই মনোময় মানুষেরও প্রাণময় অংশ আছে, তাহার মধ্যে প্রাণের সকল প্রকার আবেগ, কামনাবাসনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আশা যেমন আছে তেমনই আছে তাহার ইন্দ্রিয়মানস এবং জড়সত্তার সংস্কার ও আবেশ; এই সমস্ত নিম্নতর অংশ মহত্তর মনোময় অংশের সমকক্ষ অথবা তদপেক্ষা প্রবলতর হইয়া উঠিতেও পারে; তখন মানুষের মধ্যে উচ্চতম অংশ হইয়াও মনের শাসন-ক্ষমতা থাকে না এবং সমগ্র প্রকৃতিকে গড়িয়া তুলিতে পারে না; কিন্তু মানুষী ভাবের চরমোৎকর্ষে শুদ্ধ মন অন্য মূর্ত্তি ধারণ করে, কেননা তখন ভাবনাময় ইচ্ছাশক্তি এবং বুদ্ধি অন্নময় ও প্রাণময় অংশকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে। মনোময় মানুষ নিজের প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাইতে পারেনা, কিন্তু সে প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলা এবং সৌষম্য স্থাপন করিতে এবং মনোময় আদর্শের বিধানে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে

পারে ; এমন ভাবের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে যাহাতে তাহার মধ্যে একটা সমতা স্থাপিত হয় অথবা তাহার প্রকৃতি শোধিত পরিমার্জিত ও ঊর্দ্ধমুখী হইয়া উঠে, আমাদের খণ্ডিত এবং অর্দ্ধগঠিত সত্তার মধ্যে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিভাবের যে বিরোধ এবং বিপ্লব অথবা সাময়িকভাবে কাজ চালাইবার জন্য যে জোড়া-তালি দেওয়া আছে তাহার মধ্যে একটা বৃহৎ সুসঙ্গতির ছন্দ আনিতে পারে। মানুষ তখন নিজের মন ও প্রাণের সাক্ষী ও নিয়ন্তা হইতে এবং সচেতনভাবে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে পাবে এবং সেই পরিমাণে সে নিজের স্রষ্টা বা বিধাতা হইয়া উঠে।

শুদ্ধবুদ্ধিময় মনেব পশ্চাতে আমাদের অন্তরে এক অধিচেতন (subliminal) মন আছে যাহা মনোভূমির সকল বস্তুব সহিত অপরোক্ষ সংস্পর্শে আসিতে পারে এবং মনোজগতের সকল শক্তিব ক্রিয়ার দিকে নিজেকে উন্মুক্ত রাখিতে পারে ; যে সমস্ত সূক্ষ্ম ভাবনা এবং অন্য যে সব অদৃশ্য প্রভাব জড়জগৎ এবং প্রাণময় ভূমির উপর ক্রিয়া করে কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা যাহা-দিগকে সাক্ষাৎভাবে অনুভব কবিতে পারি না যাহাদের অস্তিত্বেব কথা শুধু অনুমান দ্বারা জানিতে পারি, এই মন সে সমস্ত অনুভব করিতে পাবে ; এই সমস্ত অস্পর্শ্য অতিসূক্ষ্ম ভাবনা মনোময় মানুষেব অধিচেতনায় বাস্তব এবং স্পষ্ট হইয়া উঠে, সে তাহাদিগকে এমন সত্যরূপে দেখে আমাদের অথবা জগতের প্রকৃতিতে মূর্ত্ত হইবার জন্য যাহার দাবি অস্বীকাব কবা যায় না। আমাদের অন্তরের ভূমিতে মন এবং মনোময় পুরুষ দেহ হইতে স্বতন্ত্র সমগ্র সত্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইতে পারে ; দেহের মত তাহাদের মধ্যেও আমরা সচেতনভাবে বাস করিতে পারি। এইভাবে মন এবং মনোরাজ্যে বাস কবা অর্থাৎ দেহরূপ বা প্রাণরূপ না হইয়া বুদ্ধিরূপ হওয়াকে—আধ্যাত্মিক জীবন লাভকে বাদ দিলে—আমাদের প্রকৃতির চরম অবস্থা লাভ বলা চলে। যাহার মন এবং সংকল্প নিজেকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে, নিজেকে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ, যে নিজের সম্মুখে এক উচচ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে এবং তাহা সিদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য সাধনা করিতেছে সেইরূপ উচচ মনীষাসম্পন্ন মানুষ, ভাবুক, এবং জ্ঞানীকে মানবতার ভূমিতে ঊর্দ্ধমুখী প্রকৃতি-পরিণামের স্বাভাবিক চরম কোটি বলা যায় ; যে প্রবল কর্ম্মজীবনে অভ্যস্ত এবং বহির্জীবনে যে শীঘ্র নিজেকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে এমন প্রাণধর্ম্মী পুরুষের মত এইরূপ মনোময় মানুষ প্রবলভাবে সক্রিয় না হইতে পারে, হয়ত জীবনের ক্ষেত্রে তেমন ক্ষিপ্র-

ভাবে সিদ্ধিলাভেও সে সমর্থ নহে তবু প্রাণধর্ম্মী পুরুষের মতই সে মানুষ শক্তিশালী, পরিশেষে মানবজাতিকে নূতন পথ দেখাইবার পক্ষে বোধহয় অধিকতর শক্তিশালী। মনের এই তিনটি স্তরেব প্রত্যেক স্তর নিজের বৈশিষ্ট্যে অপর হইতে স্পষ্টতঃ পৃথক হইলেও আমাদের প্রকৃতিতে প্রায়ই একত্রে মিশিয়া থাকে, আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় তাহারা মনোভূমির তিনটি স্তর মাত্র, মানুষের জীবনে দৈবক্রমে ফুটিযা উঠিযাছে, সাধাবণতঃ ইহার চেয়ে বেশী কোন তাৎপর্য্য আমবা তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাই না ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা তাৎপর্য্যে পূণ, কেননা মনোময সত্তাব আপনাকে অতিক্রম করিয়া উচচতর ভূমিতে পৌঁছিবাব পথে ইহাবা প্রকৃতি-পরিণামেব তিনটি অপরিহার্য্য সোপান ; প্রকৃতি যতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে শুদ্ধ মনোময় মানুষ তাহার শেষ সীমায় অবস্থিত বলিয়া সাধারণ জীবজগতের মধ্যে উচচতম এইরূপ পূর্ণ মনোময় মানুষ আজ পর্য্যন্ত ক্বচিৎ দেখা যায়। মানুষকে আরও অগ্রসর হইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে চিন্ময় রাজ্যেব তত্ত্ব আনিতে হইবে এবং মন প্রাণ ও দেহের মধ্যে তাহা সক্রিয় কবিয়া তুলিতে হইবে।

আমাদের বহিশ্চব মননের ক্ষেত্রে প্রকৃতি, পরিণামের ধারার মধ্য দিয়া এই সমস্ত মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিযাছে ; আবও বেশী কিছু করিতে হইলে প্রকৃতিকে আমাদের বহিস্তবের পশচাতে অবস্থিত অদৃশ্য গোপন উপাদান প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার এবং সত্তার গভীবে ডুবিযা আমাদের গোপন আত্মা বা চৈত্যপুরুষকে পুরোভাগে আনিযা স্থাপন কবিতে হইবে ; অথবা সাধারণ মনোভমি অতিক্রম করিয়া চিন্ময় বিজ্ঞান হইতে জাত আলোকের ঘন দীপ্তি উদ্ভাসিত বোধিচেতনার রাজ্যে, শুদ্ধ চিন্ময়মনের ক্রমোর্দ্ধ্ব পরম্পরার মধ্যে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে এবং সেখানে অনন্তের, আত্মা এবং উচচতম সত্য বস্তুর বা সচিচদানন্দের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতে হইবে ; আমাদের মধ্যে আমাদের বহিশ্চর প্রাকৃত সত্তার পশ্চাতে এক অন্তবাত্মা, এক অন্তর্মন এবং এক অন্তঃপ্রাণ আছে যাহা এই সমস্ত উর্দ্ধ্বভূমির এবং আমাদের অন্তবস্থিত গোপন চিৎপুরুষের দিকে আপনাকে উন্মীষিত কবিতে পাবে ; এই উভয় দিকে উন্মীলন আমাদের মধ্যে এক নূতন পরিণামধারার মর্ম্মরহস্য ; এইভাবে সকল আবরণ উন্মোচন করিয়া সকল বাঁধন কাটিয়া সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া আমাদের চেতনা আরো উপরে উঠিয়া যেখানে সকল আসিয়া মিশিয়াছে সব কিছু সমাহৃত হইয়াছে তেমন এক বৃহত্তর অখণ্ড তত্ত্বে পৌঁছিতে পারে, তাহার ফলে যেমন মনের পরিণতিতে

আমাদের প্রকৃতি মনোময় হইয়াছে তেমনি একদিন এই পরিণামধারা আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে চিন্ময় করিয়া তুলিবে। কেননা মনোময় মানুষ সৃষ্টিকরা প্রকৃতির চরম তপস্যা অথবা পরম সিদ্ধি নহে—যদিও মোটের উপর মনোময় মানুষ তাহার নিজ প্রকৃতিতে যত পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার নিম্নস্থ কোন লৌকিক সিদ্ধিতে অথবা উপরস্থ সত্ত্বের কোন অলৌকিক অভীপ্সাতে, আর কোথাও কেহই ততটা সফলতা লাভ করে নাই। এইবার প্রকৃতি আরও উচ্চতর এবং আরো দুর্গম এক ভূমির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং আধ্যাত্মিক এক জীবনের আদর্শে তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে এক চিন্ময় সত্তাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য এক নূতন পরিণামধারার ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতি এবার তাহার অসাধারণ তপস্যার চরম ফলে মানুষের মধ্যে চিন্ময় মানুষ গড়িতে চায়; কারণ মনোময় স্রষ্টা, মনীষী, জ্ঞানী, নূতন আদর্শের প্রচারক, আত্মনিয়ন্ত্রিত, সংযতেন্দ্রিয় সুসমঞ্জস মনোময় সত্তাকে ফুটাইয়া তুলিবার পর সে আরো উপরে উঠিবার, আরো গভীরে প্রবেশ করিবার তপস্যায় রত হইয়াছে; অন্তরাত্মা, অন্তর্ম্মন এবং অন্তর্হৃদয়কে জাগাইয়া তুলিয়া এবং সম্মুখে স্থাপিত করিয়া চিন্ময় মন, উর্দ্ধ্বমানস এবং অধিমানসের শক্তি নামাইয়া আনিতে এবং তাহাদের আলোক ও প্রভাবের সাহায্যে যোগী, ঋষি, ভগবদ্বাণী-প্রচারক, ভগবদপ্রেমিক, সুফী, মরমী, অধ্যাত্মজ্ঞানী গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে।

মানুষের পক্ষে খাঁটিভাবে নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইবার ইহাই একমাত্র পথ, কেননা যতক্ষণ আমরা আমাদের বহিশ্চর চেতনার মধ্যে বাস করি অথবা জড়ের উপর নিজেদিগকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আরো উপরে উঠা অসম্ভব এবং আমাদের পরিণামশীল সত্তার প্রকৃতির কোন নূতন মৌলিক পরিবর্ত্তন আশা করা বৃথা। প্রাণময় এবং মনোময় মানুষ পার্থিব জীবনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, মানবজাতিকে কেবল পশুর পর্য্যায় হইতে মানুষের বর্ত্তমান ভূমিতে আনিয়া স্থাপিত করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান মানুষের মধ্যে প্রকৃতি-পরিণামের যে ধারা ও বিধান প্রতিষ্ঠিত আছে তাহারা শুধু তাহার সীমার মধ্যেই ক্রিয়া করিতে সমর্থ; তাহারা মনুষ্যত্বের পরিধি বিস্তার করিতে পারে কিন্তু চেতনা বা তাহার বিশিষ্ট ক্রিয়াধারার মৌলিক রূপান্তর সাধন করিতে পারে না। মনোময় মানুষকে অতি উচ্চে তুলিবার বা প্রাণময় মানুষের আয়তন অস্বাভাবিক এবং অতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি করিবার

সাধনা করিলে মানুষের এক অতিবর্দ্ধিত এবং অতিস্ফীত সংস্করণ হয়ত সৃষ্ট হইতে, দার্শনিক নীট্‌শে যাহাকে অতিমানব বলিয়াছেন সে জাত হইতে পারে, কিন্তু সে চেষ্টার ফলে মানুষের দিব্য রূপান্তর ঘটিবে না, মানুষ ভগবত্তা লাভ করিবে না। কিন্তু যদি আমরা আমাদের অন্তরে অন্তরপুরুষের মধ্যে বাস এবং তাঁহাকেই আমাদের জীবনের সাক্ষাৎ চালকরূপে বরণ করি অথবা যদি আধ্যাত্মিক জগতে এবং বোধির ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথা হইতে এবং তাহার সাহায্যে আমাদের প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর সাধন করিতে চাই, তবে প্রকৃতি-পরিণামের আর এক দিব্য নূতন ধারা খুলিয়া যাইতে পারে।

এই নূতন পরিণামধারার, প্রকৃতির উচ্চতর এই নূতন তপস্যার ফল চিন্ময় মানুষ। কিন্তু শক্তি-পরিণামের অতীত ধারা হইতে এই নব পরিণাম-ধারা দুই বিষয়ে পৃথক ; প্রথমতঃ মানব-মনের সচেতন চেষ্টা ও তপস্যার ফলে এ নূতন ধারা চলে ; দ্বিতীয়তঃ বহিঃপ্রকৃতির সচেতন প্রগতিতেই ইহা সীমা-বদ্ধ নহে, তাহার সঙ্গে অবিদ্যার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আত্মপ্রসারণ দ্বারা অন্তরে আমাদের সত্তার গোপন তত্ত্বে এবং বাহিরে বিশ্বসত্তায় ও উপরে এক উচ্চতর তত্ত্বে পৌঁছিবার সাধনাও চলিতে থাকে। এতকাল প্রকৃতি আমাদের বহিশ্চর সত্তায় জ্ঞান ও অজ্ঞানের যুগল গণ্ডিরই প্রসারতা সাধন করিয়া আসিয়াছে ; আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্য হইল অবিদ্যাকে একেবারে নষ্ট করা, অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আত্মাকে আবিষ্কার করা এবং ঈশ্বর ও সর্ব্বসত্তার সঙ্গে চেতনায় এক হইয়া যাওয়া। মানুষের প্রকৃতি-পরিণামের মনোময় স্তরের ইহাই চরম লক্ষ্য ; অথচ অজ্ঞানকে মৌলিক রূপান্তর দ্বারা জ্ঞানে পরিবর্ত্তনের ইহা হইল শুধু উদ্যোগ পর্ব্ব। অন্তর সত্তা এবং উচ্চতর চিন্ময় মনের প্রভাবেই আধ্যাত্মিক পরিণাম আরম্ভ হয়, বাহিরের ক্ষেত্রেও তাহার ক্রিয়া অনুভূত ও স্বীকৃত হয় ; কিন্তু কেবল মাত্র ইহা দ্বারা মনে এক উজ্জ্বল ভাববাদ জাগিতে, ধর্ম্মময় এক মন গঠিত হইতে, স্বভাবে একটা ধর্ম্মভাব ফুটিতে, হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হইতে এবং আচারে পুণ্যশীলতা দেখা দিতে পারে ; ইহা চিৎপুরুষের দিকে চিত্তের প্রথম অভিসার বটে কিন্তু ইহা দিব্য রূপান্তর সাধন করিতে পারে না ; তাহার জন্য আরো সাধনার প্রয়োজন, আমাদিগকে আরো গভীরে বাস এবং আমাদের বর্ত্তমান চেতনা ও আমাদের প্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থা অতিক্রম করিতে হইবে।

পরিণতির ধারা—আরোহণ এবং সমাহরণ

ইহা স্পষ্ট যে যদি আমরা এইভাবে আমাদের গভীরে বাস করিতে পারি এবং তথা হইতে অন্তঃশক্তির ধারা বাহিরের সাধনযন্ত্রে অবিচ্ছেদে প্রবাহিত করিতে পারি অথবা যদি আমরা নিজদিগকে উন্নীত করিয়া উচ্চতর ও উদারতর ভূমি সকলে বাস করিতে এবং সেই সমস্ত ভূমির শক্তি আমাদের মর্ত্ত্যজীবনে নামাইয়া আনিতে পারি—সেই সমস্ত লোক হইতে অবতীর্ণ প্রভাব আমরা বর্ত্তমানেও গ্রহণ করিতেছি কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে—তাহা হইলে আমাদের সচেতন সত্তার শক্তি এমনভাবে উন্নত হইতে ও বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিতে পারে যাহার ফলে আমাদের চেতনায় এক নূতন তত্ত্বের সৃষ্টি, এক নূতন ক্রিয়া-ধারার প্রবর্তনা হইতে এবং সর্ব্ববস্তুর মধ্যে এক নূতন মূল্য নূতন সার্থকতা দেখা দিতে, আমাদের চেতনা এবং জীবন আরো প্রশস্ত ও উদার হইতে পারে, তখন আমাদের সত্তার নিম্নতর স্তরসমূহকে সেই শক্তিই আত্মসাৎ করিতে এবং তাহাদের রূপান্তর ঘটাইতে সমর্থ হইতে পারে—সংক্ষেপতঃ এমনি করিয়াই প্রকৃতিস্থ চিৎপুরুষ সমগ্র এক পরিণামের দ্বারা উচ্চতর জাতি বা দেব-মানব সৃষ্টি করেন। লক্ষ্য হইতে যতই দূরে থাকি, এইদিকে প্রতি পদক্ষেপ সার্থক, প্রতিপদক্ষেপেই আমরা সত্তা, শক্তি এবং চেতনা জ্ঞান ও সংকল্পের বৃহত্তর ও দিব্যতর অভিব্যক্তির অভিমুখে, সৎস্বরূপের এবং স্বরূপানন্দের অনুভূতির দিকে অগ্রসর হইতে পারি; এইভাবেই দিব্য জীবনের দিকে প্রাথমিক উন্মীলন হইতে পারে। সকল ধর্ম্ম, সকল রহস্যবিদ্যা, মনের সমস্ত অতিপ্রাকৃত (যাহা অসুস্থ অস্বাভাবিকতার বিরোধী) অনুভূতি, সকল যোগ, সকল চৈত্য অভিজ্ঞতা এবং সাধনা, গোপন এবং আত্ম-উন্মীলনশীল চিৎসত্তার দিকে অগ্রসর হইবার পথ দেখাইয়া দেয়।

কিন্তু মানবজাতি এখনও জড়ের মাধ্যাকর্ষণের জন্য ভারগ্রস্ত হইয়া আছে, আজিও অপরাজিত জড়বস্তুর টান ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই, আজিও সে মস্তিষ্কগত মন এবং জড়াসক্ত বুদ্ধি দ্বারা শাসিত হইতেছে, এইভাবে বহু পাশে বদ্ধ আছে বলিয়া উপরের দিকে যাইবার যে ইসারা তাহার কাছে উপস্থিত হয় তাহাতে তাহার দ্বিধা কাটে না, অথবা অধ্যাত্মসাধনার অতি-কঠোর দাবি দেখিয়া সে পিছাইয়া পড়ে। এখনও তাহার মধ্যে নির্ব্বোধসুলভ সন্দেহ, বিপুল আলস্য ও কর্ম্মবিমুখতা, বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সুবিশাল ভীরুতা এবং গোঁড়ামি ও গতানুগতিকতা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, যাহা অভ্যাসের বাঁধা পথ ছাড়িতে গেলে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে; এমন কি জীবনের ক্ষেত্রে

যেখানেই সে চায় এবং সাধনা করে সেইখানেই সে জয়শ্রীমণ্ডিত হয়—জড়বিজ্ঞানের মত নিম্নতর শক্তির সাধনায়ও মানুষের সাফল্য কি অদ্ভুত!—ইহা দেখিয়াও তাহার সংশয়ের অভ্যাস যায় না, তাই কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া নূতনের আহ্বানে মানুষ জাতিগত হিসাবে সাড়া দিতে পারে না। কিন্তু সমস্ত মানবজাতির এক উচচতর স্তরে পৌঁছিবার পক্ষে এরূপ কয়েকজনের সাধনা যথেষ্ট নয়, কেননা যদি জাতিগত হিসাবে সে অগ্রসর হয় তবেই তাহার পক্ষে আত্মার বিজয় সুনিশ্চিত হইবে। কেননা ইহার পর প্রকৃতির যদি পতন হয়, যদি তাহার সাধনায় শৈথিল্য আসে, তাহা হইলেও তাহার অন্তরের চিৎপুরুষ গোপনে সঞ্চিত স্মৃতির সাহায্যে পুনরায় জাতিকে উপরে আহ্বান করিয়া নিতে পারিবে এবং তাহার অতীত তপস্যার বীর্য্যে পরবর্ত্তী উর্দ্ধ সোপানে পৌঁছা সহজ হইবে এবং পৌঁছিয়া দীর্ঘকাল তথায় সে অবস্থান করিতে পারিবে; কেননা অতীত তপস্যা, তাহার বীর্য্য ও ফল মানবজাতির অবমানসে সঞ্চিত থাকিয়াই যায়; এই গোপন স্মৃতির পরিচয় কখন কখন আমরা অন্যভাবে পাই, যখন মনে হয় মানুষ নীচের টানে দূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষে স্থিত কোন এক শক্তির বশে যেন নামিয়া যাইতেছে, তাহার পরিণামধারায় নিম্নতর কোন ক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইতেছে, সেখানে প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চিত স্মৃতির শক্তি তাহাকে টানিয়া নিতেছে, স্মৃতির এই শক্তি যেমন নীচের দিকে তেমনি উপরের দিকেও টানিতে পারে। কে জানে অতীতের কত যুগের সাধনার ফলে কি কি বিজয়লাভ হইয়া কোন্ সিদ্ধি অর্জিত ও সঞ্চিত হইয়া আছে এবং আমাদের উর্দ্ধপথের পরবর্ত্তী স্তরে পৌঁছিবার কত নিকটে আসিয়া আমরা পৌঁছিয়াছি? অবশ্য সমগ্র মানবজাতি মনোময় জীব হইতে চিন্ময় জীবে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে ইহা সম্ভব নয়, আবশ্যকও নয়; আবশ্যক এই যে এ আদর্শ সর্ব্বজনীনভাবে স্বীকৃত হইবে, এজন্য সুদূর বিস্তৃত একটা সাধনা চলিবে, এই গতি যাহাতে বিশিষ্টভাবে ফলপ্রসূ হয় তজ্জন্য সচেতন এবং ব্যাপকভাবে মানুষ মনঃসংযোগ করিবে। তাহা না হইলে অতি অল্প কয়েক জন হয়ত মানুষের এক নূতন পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে সমর্থ হইবে কিন্তু জাতিগত হিসাবে মানুষ যে অনুপযুক্ত তাহাই প্রমাণিত হইবে এবং হয় মানবজাতি পরিণামের ক্ষেত্রে নীচের দিকে নামিয়া যাইবে অথবা যে অবস্থায় সে পৌঁছিয়াছে তথায় অবরুদ্ধ থাকিয়া যাইবে, কেননা একটা উর্দ্ধমুখী অবিচ্ছিন্ন সাধনার ধারাই মানবজাতিকে সজীব এবং সৃষ্টজগতের পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে।

পরিণতির ধারা—আরোহণ এবং সমাহরণ

তাহা হইলে দেখিতেছি প্রকৃতি-পরিণামের ধারা এই :—প্রথমে চাই একটা ভিত্তি, সেই ভিত্তি হইতে উর্দ্ধারোহণ এবং তাহার ফলে চেতনার একটা রূপান্তর ; তাহার পর সেই উচচ ও উদার ভূমি হইতে নিম্নতর ভূমির রূপান্তর সাধন এবং সমগ্র প্রকৃতিকে এই নূতন ভাবে গ্রথিত করিয়া একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ গঠন। ইহার প্রথম ভিত্তি হইল জড়, জড়ের ভিত্তি হইতে প্রকৃতির উর্দ্ধারোহণ, প্রথমে সচেতন বা অর্দ্ধচেতন ভাবে প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে সমস্ত খণ্ড রূপান্তর ঘটিতেছে প্রকৃতির দ্বারাই তাহাদিগকে একত্রে সমাহরণের এবং সমন্বয়ের তপস্যা চলে। কিন্তু যখন সত্তা বা পুরুষ আরো পূর্ণরূপে সচেতনভাবে প্রকৃতির এই কার্য্যধারায় যোগদান করিতে আরম্ভ করে তখন পরিণামের ধারাতেও একটা অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। জড়ের স্থূল ভিত্তি থাকিয়া যায়, কিন্তু এখন জড় আর চেতনার ভিত্তি হইতে পারে না ; চেতনার উৎপত্তি এখন আর নিশ্চেতনা হইতে উৎসারণ অথবা বিশ্বশক্তির অভিঘাত বা চাপের ফলে অন্তর্গূঢ় অধিচেতনার উৎস হইতে ফল্গুধারার মত গোপন প্রবাহ নয়। এই নব পরিণামের উৎস হইবে উর্দ্ধলোকের চিন্ময় এক অভিনব স্থিতি বা আমাদের অন্তরের অনাবৃত আত্ম-স্থিতি (soul status) ; উপর হইতে আলোক, জ্ঞান এবং ইচছাশক্তির এক প্রবাহ নামিয়া আসিবে এবং আমাদের অন্তর হইতে তাহাদিগকে স্বীকার ও গ্রহণ করিব ; আমাদের সত্তা বিশ্বানুভবে কি ভাবে সাড়া দিবে তাহা এই দুইএর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। আমাদের সত্তার সমগ্র অভিনিবেশ নিম্ন হইতে উর্দ্ধের, বাহির হইতে ভিতরের ক্ষেত্রে সরিয়া যাইবে ; আমাদের যে উচচতর এবং অন্তরতর আত্মা আমাদের কাছে এখন অজ্ঞাত আছে তখন আমরা সেই আত্মাই হইয়া যাইব ; আজ যাহাকে শুধু আমার স্বরূপ জানিতেছি সেই বাহিরের সত্তা আমাদের পূর্ণসত্তার উন্মুক্ত সম্মুখভাগ বা বহির্বাটিকা হইয়া দাঁড়াইবে, তাহার মধ্য দিয়া আমাদের খাঁটি আত্মা বিশ্বের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তখন অধ্যাত্মচেতনার জ্ঞানে ও বোধে বহির্জগৎও রূপান্তরিত হইয়া অন্তর্জগতের সেই চেতনার অংশরূপেই পরিণত হইবে ; আমাদের প্রকৃত আত্মা জগৎকে এক অখণ্ড একত্ববোধে ও অনুভবে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিবে, চিন্ময় মনের বোধিদীপ্ত দৃষ্টি তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইবে, চেতনার সহিত চেতনার সাক্ষাৎ সংস্পর্শের সাড়া জাগিবে, এক কথায় এক অখণ্ড একত্বের মধ্যে সব কিছু সমাহৃত হইবে। উর্দ্ধ হইতে জ্যোতি ও চেতনার প্রবাহ নামিয়া আসিয়া নিশ্চেতনার প্রাচীন ভিত্তিকেও চিন্ময়

বস্তুতে রূপান্তরিত করিবে, তাহার অন্ধকারময় গভীর গহন চিৎসত্তার দীপ্ত তুঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। এইভাবে এক অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ চেতনার ভিত্তিতে প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর, অদ্বৈতসিদ্ধির মধ্য দিয়া সমগ্র সত্তা এবং প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গতা বা সম্যক্ সমাহরণের ফলে, সমগ্র জীবনকে এক দিব্য সুষমা ও সামঞ্জস্যে পূর্ণ করিয়া তুলিবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

সপ্তধা অবিদ্যা হইতে সপ্তধা জ্ঞানের দিকে।

অজ্ঞানের ভূমি সপ্তপদা, তেমনি জ্ঞানের ভূমিও সপ্তপদা।

মহোপনিষদ ৫।১

সত্য হইতে জাত সপ্ত মস্তক বিশিষ্ট বৃহৎ ধীকে তিনি লাভ করিলেন, কোন এক তুরীয় বা চতুর্থ ভূমিকে সৃষ্টি করিয়া তিনি সার্ব্বজনীন হইলেন।......যাহারা দ্যুলোকের পুত্র, সর্ব্ব-শক্তিমানের বীরযোদ্ধা, তাহারা ঋজুভাবে চিন্তা করিয়া সত্যকে বাঙ্ময় করিয়া বোধিদীপ্তির ভূমি প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং যজ্ঞের প্রথম ধাম মনে উপলব্ধি কবিলেন।......জ্ঞানের প্রভু (বৃহস্পতি) শিলাময় বাধাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া গোযুথ বা আলোকের রশ্মিসকলকে আবাহন করিলেন,......যে গোসকল গোপনে মিথ্যার সেতুর উপরে, নীচের দুইটি লোক এবং উপরের একটি লোকের মাঝখানে অবস্থিত ছিল ; অন্ধকাবের মধ্যে আলোকেব প্রতিষ্ঠা কামনায় গোযথ বা কিরণযুথকে উপরে তুলিলেন এবং তিন জগতের আববণ উন্মোচন করিলেন ; আড়ালে লুক্কায়িত পুরকে বিদীর্ণ করিয়া সমুদ্র হইতে তিনকেই তিনি কাটিয়া বাহির করিলেন এবং উষা ও সূর্য্যকে, আলোক ও আলোকের জগৎকে আবিষ্কার করিলেন।

ঋগ্বেদ ১০।৬৭।১-৫

যিনি বহুবার জন্মিয়াছেন, বাক্‌রূপ যাঁহার সাতটি মুখ, যিনি সপ্তরশ্মি সেই বৃহস্পতি বা জ্ঞানের প্রভু প্রথম যখন মহাজ্যোতির পরম ব্যোমে জন্মিলেন, তখন রব দ্বারা অন্ধকার উড়াইয়া দিলেন।

ঋগ্বেদ ৪।৫০।৪

ব্যক্তজীব, যাহা এখনও তাহার মধ্যে অব্যক্ত আছে তাহার সেই বৃহত্তর শক্তির মধ্যে যাহাতে উন্নীত হইয়া উঠিতে পারে তাহার জন্য চেতনার শক্তিকে উদ্বোধিত এবং বিবৃদ্ধ করাই সকল পরিণামের মূল তাৎপর্য্য ; তাই সে ক্রমে জড় হইতে প্রাণের, প্রাণ হইতে মনের, মন হইতে চিদ্বস্তুর দিকে অগ্রসর হয়। মনোময় প্রকাশ হইতে চিন্ময় ও অতিমানস প্রকাশে, অর্দ্ধ-পাশব

মানবতা হইতে দিব্যসত্তা এবং দিব্য জীবনের পথে আমাদের পরিণতির ধারাও এইরূপ হইবে। আমাদিগকে আধ্যাত্মিকতার এক নূতন শিখরে আরূঢ় হইতে হইবে এবং আমাদের চেতনা, তাহার উপাদান বীর্য্য এবং সংবেদন-শক্তিকে আরও উদার সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ এবং গভীর করিতে হইবে; আমাদের সত্তাকে আরও উন্নীত, প্রসারিত, সাবলীল এবং পূর্ণরূপে সমর্থ করিয়া তুলিতে হইবে; সেই সঙ্গে আমাদের মনকে এবং মনের নীচে যাহা কিছু আছে তাহার সকলকে সেই বৃহত্তর সত্তার মধ্যে তুলিয়া লইতে হইবে। ভবিষ্যতে যে রূপান্তর সাধিত হইবে তাহাতে পরিণামের প্রকৃতি বা ধারা যদিও কিছু ভিন্নরূপ ধারণ করিবে তথাপি মৌলিক পরিবর্ত্তন কিছু দেখা দিবে না কিন্তু তাহার গতির সমারোহ হইবে প্রবল ও প্রসারিত, মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ। কেবল চেতনা এবং সত্তার ঊর্দ্ধ্বস্থিতিতে পৌঁছান যে ধর্ম্ম, যোগ এবং সকল মহৎ তপশ্চর্য্যার একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য তাহা নহে, আমাদের জীবনধারাও চলিয়াছে ঐ একই আদর্শের অভিমুখে, জীবনের সকল সাধনার মূলে আছে ঐ একই গোপন উদ্দেশ্যের প্রেরণা। আমরা যে মন প্রাণ দেহ লাভ করিয়াছি, আমাদের প্রাণতত্ত্ব সর্ব্বদাই তাহাদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত এবং পূর্ণ করিয়া তুলিতে যে শুধু চায় তাহা নহে, পরন্তু সে আত্ম-পরিচালিত হইয়া এ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া যাইবে এবং এই সমস্ত লাভকে এমনভাবে রূপান্তরিত করিবে যাহাতে তাহারা প্রকৃতির মধ্যে চিন্ময় দিব্য পুরুষের আত্মপ্রকাশের উপায় বা যন্ত্র হইয়া উঠিতে পারে। আমাদের বুদ্ধি, হৃদয়, সংকল্প বা প্রাণবাসনাময় আত্মা অর্থাৎ আমাদের সমগ্র সত্তার কোন অংশ যদি নিজের অপূর্ণতা এবং জগতের উপর বিরক্ত হইয়া এখান হইতে চলিয়া গিয়া সত্তার কোন উচ্চতর ভূমিতে পৌঁছিতে চায়, নিজের প্রকৃতির অন্য অংশের বিনাশে অথবা যাহা কিছু ঘটুক তাহাতে যদি দৃক্‌পাত না করে তাহা হইলে এরূপ পরিপূর্ণ রূপান্তর সাধিত হইতে পারে না, অন্ততঃপক্ষে এ জগতে তাহা সম্ভব হয় না। কিন্তু আমাদের জীবনের পূর্ণাঙ্গ গতিধারা তাহা নহে; এখানে আজিও যাহা উন্মিষিত হয় নাই সত্তার তেমন এক উচ্চতর তত্ত্বে আমাদের সমগ্র সত্তাকে উত্তীর্ণ করিবার জন্য আমাদের মধ্যে প্রকৃতির এক তপস্যা চলিতেছে; কিন্তু এই ঊর্দ্ধ্বভূমিতে আরূঢ় হইয়া সেই উচ্চতর তত্ত্বের একান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য সে নিম্নতর প্রকৃতিকে একেবারে বর্জন বা নিজের বিলয় সাধন করিবে ইহা কখনই তাহার পূর্ণ-সংকল্প হইতে পারে না। চিৎ-শক্তির উদ্দীপনা এবং বিবৃদ্ধির ফলে দেহ প্রাণ মনের যান্ত্রিক ভাব ছাড়াইয়া

চিদ্বস্তুর স্বরূপ সত্য ও শক্তিতে পৌঁছিবার সাধনা তাহাকে অবশ্যই করিতে হইবে কিন্তু তাহাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য বা একমাত্র সাধনা নহে।

আমাদের সত্তার সবখানিকে চেতনার এক নূতন উচচ শিখরে উন্নীত করিবার আহ্বানই আমাদের নিকট আসিয়াছে, তাহাই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু তাহার জন্য আমাদের সচল ক্রিয়াশীল অংশকে প্রকৃতির অস্পষ্ট ও অনিয়মিত উপাদানসমূহের মধ্যে বিসর্জন করিব এবং ভারমুক্ত হইয়া চিৎস্বরূপের আনন্দ-ঘন অক্ষর সত্তাতে নিত্যবাস করিবার সাধনায় নিযুক্ত হইব এমন কথা নাই ; অবশ্য এ সাধনা সব সময়েই করা যাইতে পারে, তাহাতে পরমশান্তি ও স্বাধীনতাও আসিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি আমাদের কাছে যাহা চায় তাহা এই যে আমাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই চিন্ময় ঊর্দ্ধ্বচেতনায় উন্নীত এবং চিৎসত্তার বিচিত্র ব্যক্ত শক্তিতে পরিণত হউক। সমগ্র সত্তার অখণ্ড এবং সম্পূর্ণ রূপান্তরসাধনই প্রকৃতিস্থ পুরুষের পূর্ণ উদ্দেশ্য ; প্রকৃতির মধ্যে যে আত্ম উত্তরণের সার্ব্বজনীন আকৃতি দেখা যায় ইহাই তাহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। এই জন্য নিজেকে শুধু এক নূতন তত্ত্বে উত্তীর্ণ করিবার সাধনার মধ্যেই প্রকৃতির ক্রিয়াধারা সীমাবদ্ধ নহে ; তাহার সিদ্ধির এই নূতন স্তর এক সংকীণ উচচ শিখরের চূড়া মাত্র নহে ; সে সিদ্ধির সঙ্গে জীবনের এক বৃহত্তর ক্ষেত্র এক উদারতর পবিবেশ দেখা দেয় যাহার মধ্যে নূতন তত্ত্বের শক্তি স্বচছন্দে এবং অকুণ্ঠিত ভাবে রূপায়িত এবং লীলায়িত হইতে পারে। এই উন্নয়ন ও প্রসারণ কেবল নূতন তত্ত্বের স্বরূপশক্তিব স্বকীয় বৃহত্তম লীলা-বিস্তারের মধ্যে যে নিবদ্ধ হইবে তাহা নহে, তাহার মধ্যে নিম্নতর তত্ত্বকে উচচতর তত্ত্বের মধ্যে গ্রহণ করাও থাকিবে ; দিব্য বা চিন্ময় জীবন যে শুধু মনোময় প্রাণময় এবং অন্নময় জীবনকে রূপান্তরিত এবং চিন্ময়ভাবে বিভাবিত করিয়া আত্মসাৎ করিবে তাহা নহে ; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা নিজের ভূমিতে অধিষ্ঠিত ছিল ততদিন পর্য্যন্ত যাহা সম্ভব ছিল না, তাহাদের মধ্যে তেমন ভাবের বৃহত্তর ও পূর্ণতর শক্তির খেলাও ফুটাইয়া তুলিবে। আমাদের নিজেকে ছাড়াইয়া যাইবার ফলে যে আমাদের মনোময় প্রাণময় এবং অন্নময় জীবন ধ্বংস হইবে, অথবা চিন্ময় ভাবে বিভাবিত হইলে তাহারা যে খর্ব্ব এবং হীনবীর্য্য হইবে তাহা নহে ; বরং তাহারা আরও সমৃদ্ধ, আরও বৃহৎ, আরও শক্তিশালী এবং অধিকতর পূর্ণ হইতে পারিবে, শুধু পারিবে নয় নিশ্চয়ই হইবে ; এই দিব্য রূপান্তরের ফলে তাহাদের মধ্যে এমন সম্ভাবনা, এমন নববিভূতিসকল দেখা

দিবে, প্রাকৃত বাস্তব জীবনে যাহা আমাদের লাভ করিবার শক্তি নাই এমন কি যাহা কল্পনা করিতেও আমরাও সক্ষম নহি।

এইভাবে ঊর্দ্ধারোহণ, প্রসারণ এবং সত্তার সকল অংশকে উচ্চাবস্থায় সমাহরণ করিয়া প্রকৃতির যে পরিণামধারা চলিয়াছে তাহার প্রকৃতি হইল সপ্তধা অবিদ্যাব মধ্য হইতে এক অখণ্ড পূর্ণজ্ঞানের উন্মেষ ও প্রকাশ। সপ্তধা অবিদ্যার মধ্যে গঠন বা আধারগত অবিদ্যার ধাঁধাই সব চেয়ে প্রবল, এই অবিদ্যাই আমাদের সম্ভূতির খাঁটি প্রকৃতিকে বহু ভ্রান্তির আবরণে আবৃত করে, আমাদের সমগ্র আত্মার জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে; বর্ত্তমানে যে ভূমিতে আমরা বাস করিতেছি, এবং আমাদের প্রকৃতির যে তত্ত্ব এখন প্রবল, শুধু তাহাদের দ্বারা আমাদের সত্তা ও চেতনাকে সীমিত করাই এ অবিদ্যার মূল কথা; সম্প্রতি আমরা জড়ের ভূমিতে বাস করিতেছি, মনোময় বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-মানসই আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতির প্রবল তত্ত্ব, আবার এ মনের আশ্রয় ও পাদপীঠও হইল জড়। তাহার ফলে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া জড় যে রূপে প্রতিভাত হয় তাহার দ্বারা এবং প্রাণ ও মনের আপোষের ফলে জীবনের যে রূপ ফুটিয়াছে সেই রূপের দ্বারা আমাদের মনোময় বুদ্ধি ও তাহার শক্তি পূর্ব্ব হইতেই অধিকৃত হইয়া আছে—ইহাই হইল গঠনগত অবিদ্যার বিশেষ চিহ্ন। এই প্রাকৃতিক জড়বাদ অথবা জড়ময় প্রাণবাদের অর্থ আমাদিগকে পরিণতির প্রথম অবস্থায় বাঁধিয়া রাখা, আত্মসঙ্কোচের দ্বারা আমাদের প্রসারতাকে খর্ব্ব করা—আবার মানুষের জীবনে ইহার প্রবল প্রতাপ। আমাদের জড় সত্তায় ইহার প্রাথমিক প্রয়োজন খুবই ছিল, কিন্তু তাহার পর মূলা অবিদ্যা ইহাকে তাহার শিকলে পরিণত করিয়াছে, যাহা ঊর্দ্ধগমনের পথে প্রতি পদক্ষেপে আজ মানুষকে বাধা দিতেছে। অতএব এই জড়াশ্রিত মনোময় বুদ্ধি আমাদের চিৎসত্তার সমগ্রতা, শক্তি এবং সত্যের উপর যে সঙ্কোচ আনিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদের উদ্ধার করিবার চেষ্টা এবং জড়প্রকৃতির অধীনতা হইতে মানবাত্মাকে মুক্ত করিবার সাধনা আমাদের মানব-জাতির প্রকৃত প্রগতিপথের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। কেননা আমাদের অজ্ঞান পূর্ণ অবিদ্যা নয়; তাহা চেতনারই এক সঙ্কোচ; জড় যেখানকার ভূমি এবং জড়ই যেখানকার প্রবল এবং প্রধান তত্ত্ব সেই অবিমিশ্র জড় সত্তায় এই অবিদ্যার চিহ্ন নিশ্চেতনা, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে অবিদ্যা পূর্ণ-নিশ্চেতনা নহে। আমাদের মধ্যে অবিদ্যা জ্ঞানের খণ্ডিত এক রূপ, তাহার প্রকৃতি হইল সত্তাকে সঙ্কুচিত ও বিভক্ত করা এবং প্রধানতঃ সত্যকে মিথ্যার

রূপ দেওয়া, এই সঙ্কোচ এবং মিথ্যা হইতে মুক্ত হইয়া চিন্ময় পুরুষের সত্য-লোকে উত্তীর্ণ হওয়াই আমাদের পুরুষার্থ।

প্রথমদিকে প্রাণ এবং জড়ে অভিনিবিষ্ট থাকা সঙ্গত ও প্রয়োজন; কেননা ইন্দ্রিয়মানস দ্বারা যে সকল অনুভূতি লাভ মানুষের পক্ষে সম্ভব, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে তাহাদের পরিশীলন করিয়া জগৎকে যথাসম্ভব জানা এবং আয়ত্তে আনা তাহার প্রথম কাজ; কিন্তু ইহা তাহার সাধনার প্রথম ধাপ মাত্র, এইখানে থামিয়া গেলে আমাদের খাঁটি প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া হইবে না; আমরা যেখানে আছি সেইখানেই থাকিয়া যাইব, কেবল বাহ্য জগতে হাত পা মেলিবার একটু স্থান করিয়া লইতে পারিব এবং জড় জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞান কিছু বাড়াইবার শক্তি মন লাভ করিতে এবং তাহার উপর একটা অপ্রচুর ও অনিশ্চিত আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে; এবং জড়সত্তা ও জড়শক্তিসকলের ভিড়ের মধ্যে প্রাণবাসনা শুধু এটাকে ঠেলা ওটাকে ধাক্কা দিয়া ঠোকাঠুকি করিয়া ফিরিতে পারিবে। জড়জগতের বাহ্য বৈষয়িক জ্ঞান যতই বাড়ুক না কেন এমন কি সুদূরতম সৌরজগৎ, পৃথিবী এবং সমুদ্রের গভীরতম স্তর বা তলদেশ, জড়বস্তু ও জড়শক্তির সূক্ষ্মতম অংশ ও বিভূতি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেও আমাদের সত্যকার লাভ কিছু হইবে না, যাহা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন সে বস্তুটিকে পাওয়া হইবে না। এইজন্য জড়বিজ্ঞানের চোখ-ধাঁধানো বিজয়সমূহের বিপুল সমারোহ সত্ত্বেও, জড়বাদের শুভবার্ত্তা অবশেষে ব্যর্থ এবং অসহায় মতবাদ হইয়া দাঁড়ায়; এই জন্যই জড় বিজ্ঞান বিপুল জ্ঞান ও শক্তি লাভ করিয়া মানবজাতিকে আরাম দিয়াছে, কিন্তু সুখশান্তি ও পূর্ণতা দিতে পারে নাই, পারিবার শক্তি তাহার নাই। প্রকৃত সুখ লাভ করা তখনই সম্ভব হইবে যখন আমরা আমাদের সমগ্র সত্তাকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিব, জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে বিজয়লাভে সমর্থ হইব, অন্তরে এবং বাহিরে—বাহির হইতে অধিকতর ভাবে অন্তরে—আমাদের ব্যক্ত ও গোপন প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিব; যে ভূমিতে আমরা কার্য্যারম্ভ করিয়াছি সেইখানেই থাকিয়া শুধু বিষয়জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া আমরা পূর্ণতা লাভ করিতে পারি না, খাঁটি পূর্ণতা পাইতে হইলে এ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এইজন্যই প্রাণ এবং জড়ের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ভিত্তির উপর প্রয়োজনানুরূপভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর, আমাদের চেতনার শক্তিকে উন্নীত ও বিবৃদ্ধ করিবার, তাহার গভীরতা

বিস্তৃতি এবং সূক্ষ্মতা আরও বাড়াইয়া তুলিবার ব্রত আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে; এজন্য প্রথমে আমাদের মনোময় সত্তাকেই মুক্ত করিতে হইবে; মনোময় জীবনের খেলাকে স্বাধীন, সুকুমার এবং মহান করিয়া তুলিতে হইবে; কেননা আমাদের খাঁটি জীবন যতটা জড়ময় তদপেক্ষা অনেক বেশী মনোময়; আমাদের প্রকৃতি যেখানে কিছুকে প্রকাশ কবিতে চায়, অথবা যেখানে সে কোন তত্ত্বের যন্ত্ররূপে ক্রিয়া করে সেখানেও সে প্রধানতঃ মনোময়, জড়ময় নহে, আমরা জড়ময় অপেক্ষা অনেক অধিক মনোময় সত্তা। পূর্ণতা ও স্বাধীনতা লাভের জন্য পূর্ণরূপে মনোময় হইয়া উঠাই মানুষের পরিণতিপথে এক স্তর হইতে অন্যস্তরে পৌঁছিবার প্রথম সাধনা; অবশ্য ইহার ফলেই সে পূর্ণতা লাভ করে না, আত্মার মুক্তি সাধিত হয় না, কিন্তু ইহা জড় ও প্রাণের অভিনিবেশ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া লক্ষ্যের দিকে এক ধাপ অগ্রসর করিয়া দেয় এবং অবিদ্যার বন্ধন শিথিল করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে।

পূর্ণতর রূপে মনোময় সত্তা হইয়া উঠিবার সার্থকতা এই যে তাহার ফলে আমাদের সূক্ষ্মতর উচ্চতর উদারতর জীবন, চেতনা, শক্তি, সুখ এবং আনন্দ লাভের সম্ভাবনা দেখা দিবে; আমাদের মনন যতই উচ্চতর স্তরে পৌঁছিবে ততই এই সমস্ত শক্তি আমরা বেশী করিয়া লাভ করিব, সেই সঙ্গে মনশ্চেতনার নিজের দৃষ্টি ও শক্তি প্রখর, আরও সূক্ষ্ম ও সাবলীল হইবে; ফলে আমরা প্রাণময় এবং জড়ময় জীবনকে আরও গভীরভাবে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইব; জীবনকে আরও ভালভাবে জানিতে ও ব্যবহার করিতে, তাহার তাৎপর্য্য মহত্তর এবং প্রসারতা বৃহত্তর করিতে পারিব, তাহার ক্রিয়া আরও ঊর্দ্ধমুখী হইবে, তাহার দৃষ্টি উচ্চতর এবং বিশালতর ক্ষেত্রের দিকে ফিরিবে; তাহার বিশিষ্ট শক্তিতে মানুষের প্রকৃতি মনোময়, কিন্তু তাহার উন্মেষের প্রথমদিকে মানুষ মননশক্তিযুক্ত পশুমাত্র, পাশব মন দৈহিক জীবন লইয়াই ব্যস্ত, তাহাতেই অভিনিবিষ্ট; মননকে সে তখন দেহ ও প্রাণের প্রয়োজনে, স্বার্থ বা বাসনার সফলতা সাধনের জন্যই ব্যবহার করে; মন তখন তাহাদের পরিচারক ও ভৃত্য অথবা মন্ত্রী, রাজা ও প্রভু নহে। কিন্তু যে পরিমাণে তাহার মন বাড়িতে থাকে এবং প্রাণ ও জড়ের অত্যাচারের উপর মন নিজেকে এবং নিজের স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে সেই পরিমাণে তাহার মনুষ্যত্ব বাড়ে। একদিকে মন মুক্ত হইয়া প্রাণ এবং জড় ভাবকে আলোকিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, অন্যদিকে তাহার নিজের শুদ্ধ মনোময় উদ্দেশ্য বা আকূতি, প্রবৃত্তি

এবং জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা একটা নিজস্ব মর্য্যাদা লাভ করিতে থাকে। মন তখন নিম্নতর বৃত্তির শাসন ও অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া জীবনে একটা সুশাসন, একটা ভাবসংশুদ্ধি, একটা ঊর্দ্ধমুখী গতি আনয়ন করে, জীবনকে এক সুকুমার সাম্যে ও সুষমায় প্রতিষ্ঠিত করে; সত্তার অন্নময় ও প্রাণময় অংশের গতিও সুনিয়ন্ত্রিত এবং নিজের শক্তির পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা রূপান্তরিত করে; তাহারা আলোকিত ইচ্ছাশক্তির, নীতি ও ধর্ম্মের, ধারণার ও রসভাবিত বুদ্ধির অধীন হইয়া যুক্তিবিচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতে শিক্ষা করে; এই ভাবের সিদ্ধি যতটা আসিবে ততই মানবজাতি খাঁটি মানুষ হইবে এবং যথার্থ মনোময় জীবের পর্য্যায়ে স্থান পাইবে।

গ্রীক মনস্বীগণ জীবনের এই আদর্শই নিজেদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলেন, এই আদর্শের সূর্য্যালোকে গ্রীক-জীবন এবং গ্রীক-সভ্যতা যেরূপ গৌরবময় ভাবে ফুটিয়াছিল তাহাতে বিশ্ববাসী মুগ্ধ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে এ আদর্শ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর এ বোধ যখন আবার ফিরিয়া আসিল তখন তাহা খর্ব্ব হইয়া এবং অনেক পঙ্কিলতা সঙ্গে লইয়া আসিল; বুদ্ধি যাহাকে অতি অপূর্ণ ভাবে ধরিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাহাকে একেবারেই ফুটাইয়া তোলা হয নাই, এমন এক ধর্ম্মের আদর্শ তাহার অনুকূল এবং প্রতিকূল মানসিক ও নৈতিক প্রভাবের সহিত আসিয়া পড়িল। আবার এ আদর্শের বিরোধীরূপে যাহা স্বতন্ত্র এবং স্বচছন্দভাবে নিজের গতিপথ খুঁজিয়া পায় নাই প্রাণের তেমন এক বিপুল এবং প্রবলশক্তিশালী আবেগ ও বাসনা জাগিয়া উঠিল, ফলে জীবনের মধ্যে একটা বিক্ষোভ দেখা দিল; এই দুইটি ভাবই মনের প্রভুত্ব লাভে বা জীবনে সুষমা, সামঞ্জস্য, সৌন্দর্য্য ও সাম্য স্থাপনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। অনেক উন্নত আদর্শ তাহার সম্মুখে স্থাপিত হইল, সে তাহাদের দিকে উন্মুখ হইয়াও উঠিল, জীবনের প্রসারতা বাড়িয়া গেল, কিন্তু এই নূতন আদর্শবাদেব উপাদানগুলি তাহার কর্ম্মের ক্ষেত্রে শুধু প্রভাবরূপে দেখা দিল জীবনে নিয়ামক বা শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিল না অথবা জীবনের রূপান্তরসাধনে সমর্থ হইল না; অবশেষে যাহার মর্ম্ম স্পষ্টরূপে গ্রহণ করা এবং যাহা জীবনে ফুটাইয়া তোলা হয় নাই সে ধর্ম্মের সাধনাও পরিত্যক্ত হইল; নৈতিক চরিত্রের উপর ধর্ম্মের প্রভাব কিছু থাকিয়া গেল কিন্তু আধ্যাত্মিকতার পুষ্টিকর উপাদানের অভাববশতঃ তাহাও ক্ষয় পাইয়া হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল, তখন প্রাণের আবেগ ও বাসনা জড়গত বুদ্ধির বিপুল

স্ফুরণের সাহায্য পাইয়া জাতির চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিল। ইহার প্রাথমিক ফলরূপে এক প্রকার প্রাকৃত জ্ঞান এবং কর্ম্মকুশলতার বিপুল সমারোহ দেখা দিল; ইহার অতি আধুনিক ফলে জাতির জীবনে এক সঙ্কটজনক আধ্যাত্মিক অস্বাস্থ্য এবং বিপুল বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে।

কারণ মনই আমাদের সত্তার পরিচালনের পক্ষে সুপ্রচুর নহে, বুদ্ধির বৃহত্তম প্রসারতার খেলাতেও আমরা সীমিত এক অর্দ্ধ আলোকের মাত্র সন্ধান পাই। বহিশ্চর মনের দ্বারা লব্ধ জড় বিশ্বের জ্ঞান আরও অপূর্ণ পরিচালক, মানুষ যদি শুধু মননশীল পশু হইত তাহা হইলে ঐ জ্ঞানই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইত, কিন্তু চিন্ময়-পরিণামের পথে অগ্রসর হইবার জন্য যাহাকে ভিতর হইতে পীড়া দিতেছে সেই মনোময় মানবজাতির পক্ষে ইহা কখনই প্রচুর নয়। এমন কি শুধু জড়বিজ্ঞান এবং বহির্ম্মুখী জ্ঞান দ্বারা অথবা তাহার জড়ীয় ও যান্ত্রিক ক্রিয়াধারার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া জড়বস্তুর সত্যকেও পূর্ণরূপে জানা যায় না অথবা আমাদের জড়সত্তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করিবার উপায় আবিষ্কার করা সম্ভব হয় না; জড়শক্তির জ্ঞান এবং তাহার ব্যবহার-পদ্ধতি যথার্থভাবে জানিতে হইলেও আমাদিগকে জড়ের প্রতিভাস এবং ক্রিয়াধারার সত্যকে অতিক্রম করিয়া তাহার অন্তরে এবং অন্তরালে যাহা আছে তাহাতে পৌঁছিতে হইবে। কেননা আমরা শুধু শরীরধারী মন নই, আমাদের এক চিন্ময় সত্তা, চিন্ময় তত্ত্ব, প্রকৃতির এক চিন্ময় ভূমি আছে। তাহার মধ্যে আমাদের চিৎ-শক্তিকে উদ্দীপিত করিয়া, এবং তৎসাহায্যে আমাদের সত্তা ও কর্ম্মক্ষেত্রের আরও বিপুল প্রসারতা সম্পাদন করিয়া আমাদিগকে সেই চিন্ময় ভূমিতে এমন কি বিরাটে এবং অনন্তে পৌঁছিতে হইবে; এই শক্তির দ্বারা আবিষ্ট করিয়া চিন্ময় সত্যের আলোকে আমাদের এই নিম্নতর জীবনকেও মহত্তর উদ্দেশ্য এবং বৃহত্তর পরিকল্পনা সফল করিয়া তুলিবার ব্রতে নিয়োজিত করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত নিম্নতর প্রকৃতির আবেশ ও পরিচালনার হাত হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের প্রাকৃত সত্তাকে চিন্ময়পুরুষের সত্তা ও চেতনার সহিত সংযুক্ত করিতে এবং তাহারি শক্তিতে তাহারি আনন্দলাভের জন্য আমাদের প্রাকৃত সত্তাকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে না শিখিব ততদিন পর্য্যন্ত মনের সাধনা এবং প্রাণের সংগ্রাম শেষ হইতে পারে না, যাহা আমাদের সত্তার উপাদান ও গঠনপ্রণালী জানিতে দেয় নাই আমাদের সেই গঠনগত বর্ত্তমান অবিদ্যা তত দিন আমাদের সত্তা ও সম্ভূতির প্রকৃত এবং কার্য্যকরী জ্ঞানে পরিণত হইবেনা। কারণ

স্বরূপতঃ আমরা চিদ্বস্তু, বর্ত্তমানে আমরা মনকে মুখ্যরূপে এবং প্রাণ ও দেহকে গৌণরূপে ব্যবহার করিতেছি; আবার যে জড়জগৎকে আদি ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি তাহাই আমাদের অনুভবের একমাত্র ক্ষেত্র নহে, এ ব্যবস্থা শুধু বর্ত্তমানের জন্য। আমাদের অপূর্ণ মনের খেলাই যে আমাদের সকল সম্ভাবনার শেষ কথা—ইহাও সত্য নহে; কেননা আমাদেরই মধ্যে চিন্ময় প্রকৃতির অতি সন্নিকটে মনের অতীত অনেক তত্ত্ব সুপ্ত বা অদৃশ্য এবং অপূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল হইয়া বর্ত্তমান আছে; আমাদের বর্ত্তমান ব্যক্ত দেহ প্রাণ এবং মনোময় জীবনে যাহাদের স্থান নাই এমন অনেক অপরোক্ষ শক্তি এবং জ্যোতির্ম্ময় সাধন যন্ত্র, প্রবল ক্রিয়ার বহু বৃহত্তর ক্ষেত্র, এক বৃহত্তর স্থিতির ভূমি আছে। আমরা এই ভূমিতে পৌঁছিতে পারি; এই সমস্ত আমাদের সত্তার অংশে পরিণত হইতে, আমাদের নিজেদের বৃহত্তর প্রকৃতির শক্তি, বৃত্তি এবং সাধন-যন্ত্র হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু তাহার জন্য চিৎপুরুষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এক অস্পষ্ট আনন্দ-রসে বিগলিত হওয়া অথবা অনন্তের সংস্পর্শে আকার-প্রকারহীন এক দিব্যভাবে উন্নীত হইয়া পরিতুষ্ট থাকাই সাধকের পক্ষে যথেষ্ট নহে, যেরূপভাবে আমাদের মধ্যে প্রাণ ও মনের উন্মেষ ও পুষ্টি ঘটিয়াছে এই সমস্তের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকেও তেমনিভাবে আমাদের জীবনে উন্মিষিত ও পুষ্ট এবং তাহার নিজের আনন্দ ও পরিতৃপ্তির জন্য তাহার নিজের সাধনযন্ত্র আমাদের মধ্যে তাহাকেই গড়িয়া তুলিতে হইবে। তখন আমরা আমাদের সত্তার উপাদান ও গঠনের প্রকৃত পরিচয় পাইব এবং এই অবিদ্যাকে জয় করিতে পারিব।

কিন্তু আমাদের মনোগত অবিদ্যাকে জয় করিতে না পারিলে গঠনগত অবিদ্যাকে জয় করা পূর্ণরূপে এবং সর্ব্বতোভাবে ফলপ্রসূ হইতে পারে না; কেননা এ দুইটি আমাদের মধ্যে একত্রে গ্রথিত আছে। মনোগত অবিদ্যার জন্যই আমরা আমাদের আত্মজ্ঞান সঙ্কুচিত করিয়া আমাদের সত্তার ক্ষুদ্র এক তরঙ্গে অথবা এক বহিঃপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে নিবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি এবং তাহাকেই আমাদের সচেতন জাগ্রত সত্তারূপে দেখিতে পাইতেছি। অরূপ বা অর্দ্ধরূপায়িত নিজ হইতে জাত গতির বা অনুভবের একটা আদিম প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ও স্বতঃক্রিয়ভাবে চলিতেছে এবং এক বহিশ্চর সক্রিয় স্মৃতি ও এক নিষ্ক্রিয় অন্তর্নিহিত চেতনা, ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে প্রবহমান এই ধারাকে ধারণ এবং একত্রে গ্রথিত করিতেছে; আমাদের বিচারশক্তি

এবং এই প্রবাহের অংশগ্রহণকারী ও সাক্ষীরূপী বুদ্ধি তাহাদিগকে গঠিত, সমন্বিত এবং ব্যাখ্যাত করিতেছে, ইহাই আমাদের সত্তার এই অংশের, এই জাগ্রত চেতনার পরিচয়। কিন্তু ইহার পশ্চাতে আমাদের অন্তর্গূঢ় সত্তা ও শক্তির এক গোপন আবেশ বা অধিষ্ঠান আছে, তাহা না থাকিলে বহিশ্চর এই চেতনার অস্তিত্ব এবং ক্রিয়াশীলতা থাকিতে পারিত না। জড়ের মধ্যে একটা ক্রিয়াশীলতা শুধু ব্যক্ত হইয়াছে, বস্তুর যে বাহ্যরূপকে কেবল আমরা জানি,তাহার মধ্যে শক্তির ক্রিয়াকে আমরা অচেতন মনে করি; কেননা জড়ের অন্তরে অধিষ্ঠিত চেতনা অন্তর্গূঢ় এবং অধিচেতন, অচেতন রূপ এবং অভিনিবিষ্ট শক্তিতে তাহার প্রকাশ নাই; কিন্তু আমাদের মধ্যে চেতনা আংশিকভাবে ব্যক্ত আংশিকভাবে জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের এই চেতনা অপূর্ণ, তাহার চারিদিকে রহিয়াছে সীমার দেওয়াল, অভ্যস্ত আত্মসীমার মধ্যে অবরুদ্ধ এক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সে বাস করে, কেবল মাঝে মাঝে আমাদের অন্তরের গহন হইতে কিসের একটা বিদ্যুৎচমক, কি যেন এক বার্ত্তা জাগিয়া উঠে, আমাদের মধ্যে এক আকৃতি জাগায় এবং তাহা চেতনার সীমার দেওয়াল কিছুটা ভাঙ্গিয়া দেয় যাহাতে চেতনা সীমার বাহিরে গিয়া বৃহত্তর পরিধির মধ্যে প্রসারতা লাভ করে। কিন্তু ইহাদের এই সাময়িক আবির্ভাব আমাদের বর্ত্তমান সামর্থ্যের সীমা হইতে আমাদিগকে অধিক দূরে লইয়া যাইতে বা আমাদের অবস্থার বিপ্লব ঘটাইতে পারে না। তাহা কেবল তখনই সম্ভব হইবে যখন আমরা আমাদের সত্তাতে অন্তর্নিবিষ্ট উচ্চতর যে আলোক এবং শক্তি আছে, যাহা এখনও বহিঃক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় নাই তাহাকে সচেতন ও স্বাভাবিকভাবে আমাদের জীবনে লীলায়িত করিয়া তুলিতে পারিব; এজন্য আজ পর্য্যন্ত যাহা আমাদের কাছে অবচেতন বা বরং গোপনভাবে অন্তশ্চেতন বা অধিচেতন বা পরিচেতন (circumconscient) অথবা অতিচেতন হইয়া আছে সেই শক্তি ও আলোকের স্বধাম হইতে স্বচ্ছন্দে শক্তি ও আলোক সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি, এরূপ সামর্থ্য অর্জন করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষাও বড় সম্ভাবনা আছে—সাধনার শক্তি দ্বারা অন্তরে ডুবিয়া আমাদেরই এই অন্তর্গূঢ় ও উচ্চতর অংশে অনুপ্রবিষ্ট হইতে এবং তথা হইতে তাহাদের গোপন রহস্যরাজি বহিঃক্ষেত্রে নামাইয়া আনিতে পারি; অথবা তাহারও পরে আমাদের চেতনার আরও মৌলিক ও দিব্যরূপান্তর সাধন করিয়া বাহিরে বাস না করিয়া অন্তরে বাস করিতে এবং অন্তঃস্থ ও আত্মস্থ হইয়া আমাদের যে অন্তরাত্মা সমগ্র প্রকৃতির অধীশ্বর হইয়া

উঠিয়াছে সেই আত্মার অন্তরের গভীরতা হইতে ক্রিয়াশীলতাকে উৎসারিত করিতে পারি।

মন এবং সচেতন প্রাণ-স্তরের নীচে অবস্থিত আমাদের সত্তার যে অংশ আছে, নিম্ন এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া যাহাকে যথার্থভাবে অবচেতন নামে অভিহিত করিতে পারি, তাহার মধ্যে আমাদের দৈহিক সত্তার বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্র অন্নময় ও প্রাণময় সেই সকল উপাদান পড়ে, যাহারা এখনও মনোময় হইয়া উঠে নাই, মন যাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে না, যাহাদের ক্রিয়া মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ক্রিয়াশীল অথচ আমরা যাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না এমন গোপন মূক যে চেতনা জীবকোষে স্নায়ুমণ্ডলে এবং দেহের সর্ব্বপ্রকার উপাদানের মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়া ক্রিয়া এবং জীবনের সকল ক্রিয়া-ধারার মধ্যে গোপনে শৃঙ্খলা স্থাপন করে, বাহিরের অভিঘাতে শরীরের স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত সাড়া জাগায় তাহাও অবচেতনার অন্তর্ভুক্ত, ইহা বলিতে পারি। মানুষের মধ্যে ইন্দ্রিয়-মানসের এমন কতকগুলি নিম্নতম ক্রিয়াশক্তি আছে, এখনও পশু এবং উদ্ভিদ জীবনে যাহারা অধিক ক্রিয়াশীল, কিন্তু বৃহত্তর ও ব্যক্তভাবে এ সমস্ত ক্রিয়ার ব্যবস্থা ও পরিচালনার প্রয়োজন আমরা অতিক্রম করিয়া গিয়াছি, কিন্তু আমাদের সচেতন প্রকৃতির নীচে প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া অবচেতনায় ডুবিয়া তাহারা বর্ত্তমান আছে। এইভাবে অব্যক্ত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্রিয়া মনের গোপন এবং অবগুণ্ঠিত অধঃস্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে, যাহার মধ্যে আমাদের অতীতের যত সংস্কার এবং বহিশ্চর মন হইতে যাহা বর্জিত হইয়াছে তাহার সব কিছু ডুবিয়া গিয়া নিষ্ক্রিয় এবং অব্যক্ত হইয়া অবস্থান করে; এই সমস্ত কখনও কখনও নিদ্রা বা মনের নিষ্ক্রিয় অবস্থার সুযোগ লইয়া স্বপ্নের, মনের যান্ত্রিক ক্রিয়া বা ব্যঞ্জনার, প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিক্রিয়া বা প্রবেগের আকাবে উপরে ভাসিয়া উঠে, কখনও বা দেহের কোন অনৈসর্গিক বিকার অথবা স্নায়ুমণ্ডলের বিক্ষোভ, রোগ, পীড়া বা চিত্তবিকৃতি রূপে আসিয়া প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ আমাদের জাগ্রত ইন্দ্রিয়মানস এবং বুদ্ধির নিকট যতটা প্রয়োজন বোধ হয়, আমাদের অবচেতনার ভাণ্ডার হইতে ততটাই আমরা বাহির করিয়া আনি, কিন্তু এইভাবে বাহির করিবার সময়ও আমরা তাহাদের প্রকৃতি, উৎপত্তিস্থান বা ক্রিয়াপদ্ধতির সম্বন্ধে কিছু জানি না অথবা তাহাদের নিজস্ব মূল্য বা তাৎপর্য্য বুঝি না এবং বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা আমাদের জাগ্রত মানুষী বোধ ও বুদ্ধির মূল্যে ও ভাষায় তাহাদিগকে শুধু তর্জমা করিয়া

নই। অবচেতনার উদ্বেলন, মন ও দেহের উপর তাহাদের আলোড়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত, অনাহূত এবং অনীপ্সিত বা স্বত-উৎসারিত ব্যাপার; কারণ অবচেতনাকে আমরা জানি না, সুতরাং তাহার উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব নাই। যাহা আমাদের কাছে অনৈসর্গিক এমন কোন কোন অনুভবে, বিশেষত অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় অথবা আমাদের স্বাভাবিক সাম্য যখন বিচলিত হয় তখন আমাদের অন্নপ্রাণময় সত্তার অব্যক্ত অথচ অতিক্রিয় এই জগতের কিছু অংশের সাক্ষাৎ পবিচয় আমরা লাভ করি, অথবা আমাদের বহিশ্চেতনার অন্তরালে অবস্থিত যান্ত্রিক এবং অবমানুষী অন্নপ্রাণময় মনের গোপন ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু অবগত হই—এই গোপন অবমানসচেতনা আমাদের চেতনা হইয়াও আমাদেব চেতনা বলিয়া বোধ হয় না, কেননা যে মননকে আমরা জানি ইহা তাহার অংশ নহে। এ সমস্ত এবং এ সমস্ত অপেক্ষা আরও অনেক বেশী কিছু অবচেতনার মধ্যে গোপনে বাস করিতেছে।

অনুসন্ধানের জন্য অবচেতনায় নামিয়া গেলে বিশেষ লাভ হইবে না, কেননা তাহাতে আমরা এক অসঙ্গতি এবং অসামঞ্জস্যের রাজ্যে পৌঁছিব, অথবা নিদ্রিত বা মূর্চ্ছিত হইয়া যাইব কিম্বা আমাদের চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। আমাদের মনের গবেষণা বা অন্তর্দ্দৃষ্টি এই সমস্ত গোপন ক্রিয়াশীলতার একটা পরোক্ষ এবং মনগড়া বা আনুমানিক জ্ঞান দিতে পারে; কেবলমাত্র অধিচেতনায় আমাদের মনকে গুটাইয়া আনিয়া অথবা অতিচেতনায় আরূঢ় হইয়া এবং তথা হইতে নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অথবা অন্ধকারময় এই গভীর গহনে নিজেকে প্রসারিত করিয়া অবচেতনায় অবস্থিত আমাদের মনপ্রাণদেহময় প্রকৃতির গোপন রহস্য আমরা সাক্ষাৎভাবে ও পূর্ণরূপে জানিতে এবং তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারি। এই জ্ঞান এবং শাসন-সামর্থ্য লাভ করা আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়—কেননা নিশ্চেতনাই সচেতন হওয়ার পথে অবচেতনারূপে দেখা দেয়, অবচেতনাই আমাদের নিম্নতর অংশসকল এবং তাহাদের গতি ও ক্রিয়ার আশ্রয়, এমন কি তাহাকে তাহাদের এক প্রকার মূল বলাও চলে। নিম্নপ্রকৃতির যাহা কিছু কিছুতেই আমাদিগকে ছাড়িতে বা রূপান্তরিত হইতে চায় না, বুদ্ধির দীপ্তিহীন যান্ত্রিক যে চেতনা পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসিতে থাকে, আমাদের অনুভূতি, ইন্দ্রিয়বোধ, আসক্তি এবং আবেগের পুনরাবর্ত্তিত হওয়ার যে অদম্য অধ্যবসায়, স্বভাবের অপরাজিত দৃঢ়মূল যে সমস্ত সংস্কার, তাহারা অবচেতনারই আশ্রিত এবং তাহারি রসে পুষ্ট।

আমাদের মধ্যে যাহা কিছু পাশবিক বা পৈশাচিক অবচেতনার গভীর বনের মধ্যেই তাহাদের আশ্রয় নেওয়ার গুহা আছে। কোন উচ্চতর জীবনের পূর্ণতা সম্পাদন এবং প্রকৃতির কোন পূর্ণ রূপান্তর সাধনের জন্য অবচেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হওয়া তাহাকে আলোকিত এবং বশীভূত করা সাধক-জীবনের অপরিহার্য্য কর্ম্ম।

আমাদেরই যে সকল অংশ আমরা অন্তশ্চেতনা (intraconscient) এবং পরিচেতনা (circumconscient) নামে অভিহিত করিয়াছি তাহারা আরও শক্তিশালী এবং আমাদের সত্তার আরও মূল্যবান উপাদান। এই সকল অংশের মধ্যে প্রবল ক্রিয়াশক্তিযুক্ত এক আন্তর বুদ্ধি, এক আন্তর ইন্দ্রিয়মানস, এক আন্তর প্রাণ এমন কি সূক্ষ্মভূতময় এক আন্তর সত্তা আছে যাহা আমাদের জাগ্রত চেতনাকে আশ্রয় দিতেছে এবং আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছে এবং যাহা সাধারণতঃ বহিশ্চেতনায় আসিয়া আত্মপ্রকাশ করে না; বর্ত্তমান ভাষায় ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে অধিচেতনা (subliminal consciousness)। কিন্তু এই গোপন আত্মসত্তায় প্রবিষ্ট হইয়া অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের জাগ্রত বোধ ও বুদ্ধি, বেশীর ভাগ আমাদের গোপন সত্তায় আমরা যাহা আছি অথবা হইতে পারি তথ হইতে কিছু কিছু চয়ন করিয়া গঠিত হইয়াছে; এই জাগ্রত চেতনা বাহিরে· ক্ষেত্রে আমাদের গোপন খাঁটি সত্তার বিকলাঙ্গ এবং বহির্ম্মুখী ইতর সংস্কর অথবা সত্তার গভীরতা হইতে উৎক্ষিপ্ত অংশমাত্র। অধিচেতনার এই প্রভাবে এবং সাহায্যে পরিণামের ধারা ধরিয়া নিশ্চেতনা হইতে আমাদের বহিশ্চর সত্তা গড়িয়া উঠিয়াছে; তাহার লক্ষ্য আমাদের বর্ত্তমান পার্থিব মনোময় এবং অন্নময় জীবন সার্থক করা; চিদ্বস্তুর আত্মপ্রকৃতির নিম্নাভিমুখী সংবৃতির ধারায় প্রাণ ও মনের বৃহত্তর ভূমিসকল সৃষ্ট হইয়াছে; এবং সেই সমস্ত ভূমির চাপই জড় হইতে প্রাণ ও মনকে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে, আমাদের বহিশ্চর সত্তার অন্তরালে অবস্থিত অধিচেতনা এক দিকে এই সমস্ত ভূমি অন্যদিকে নিশ্চেতনা এই উভয়ের মধ্যে যোগস্থাপনের জন্য মধ্যবর্ত্তী স্তররূপে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বহির্জগতের অভিঘাতে বহিশ্চেতনায় যে সমস্ত সাড়া জাগে তাহাদের পশ্চাতে এই সমস্ত গোপন সূক্ষ্ম অংশসকলের ক্রিয়ার সহায়তা থাকে; অনেক সময় তাহারা এই সূক্ষ্ম অংশেরই সাড়া তবে তাহা বহির্ম্মনের অনুবাদে কতকটা পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত হইয়াই প্রকাশ পায়। যাহা বাহ্য জগতের

অভিঘাতের সাড়া নয় আমাদের প্রাণ ও মনের তেমন আর এক বৃহৎ অংশও আছে, সে অংশ নিজের জন্যই বাস করে অথবা বাহ্য জগৎকে ব্যবহার করিবার বা বশে আনিবার জন্য নিজেকে বাহিরে নিক্ষিপ্ত করে ; আমাদের ব্যক্তিসত্তা (personality) শক্তিশালী এই বীর্য্যবন্ত অন্তর্ব্যাপ্ত চেতনার শক্তি, প্রভাব, আকৃতি বা প্রেরণা হইতে জাত একটা বিমিশ্র রূপায়ণ।

অধিচেতনা আত্মবিস্তার করিয়া আমাদিগকে চারিদিকে যে চেতনা দ্বারা ঘিরিয়া রাখিয়াছে তাহার মধ্য দিয়াই বিশ্বমন বিশ্বপ্রাণ এবং বিশ্বময় সূক্ষ্মভূতের শক্তিতরঙ্গ ও বিদ্যুৎপ্রবাহের অভিঘাত সে গ্রহণ করে। এই সমস্ত অভিঘাত আমাদেব বহিশ্চর চেতনাদ্বারা অনুভূত হয় না, আমাদের অধিচেতন আত্মা এ সকলকে অনুভব ও গ্রহণ করে এবং তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিয়া আমাদের অজ্ঞাতসাবে প্রবলরূপে আমাদিগকে প্রভাবিত করে। আমাদের বহিশ্চর সত্তাকে এই অন্তরতর চেতনা হইতে যে প্রাচীর পৃথক করিয়া রাখিয়াছে তাহা ভেদ করিয়া ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারিলে আমাদের মননশক্তি এবং প্রাণক্রিয়াব বর্ত্তমান উৎস সকল জানিতে ও ব্যবহার করিতে পারি এবং তাহাদের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া তাহাদের নিয়ন্তা হইতে সক্ষম হই। অনুপ্রবেশ অন্তর্দৃষ্টি এবং অন্তরের সহিত স্বাধীনভাবে যোগাযোগ স্থাপন দ্বারা ভিতরের খবর আমবা অনেক জানিতে পারি বটে, কিন্তু পূর্ণ আত্মপরিচয় পাওয়া কেবল তখনই সম্ভব হইবে যখন বহিশ্চর মনের আবরণ ঘুচাইয়া দিয়া আমরা অন্তরের অন্তঃপুবে প্রবেশ করিতে, অন্তরমন অন্তরপ্রাণ আমাদের অন্তরতম সত্তাতে বাস করিতে পারি, এইভাবে মনের যে ভূমিতে আমাদের জাগ্রত চেতনা বাস করে তাহা হইতে ঊর্দ্ধ্বতর ভূমিতে উঠিবার সামর্থ্য লাভ করি। আমাদের পরিণাম-ধারা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তথায় তাহার সম্মুখে রহিয়াছে বহু বাধা, তাহা ঊর্দ্ধ্বস্তরে আজিও অধিগত হয় নাই তাই তাহা মস্তকশূন্য কবন্ধের মত হইয়া আছে, আমরা যদি এইরূপে অন্তরে বাস করিতে পারি তবে এই পরিণতি প্রসারিত এবং তাহার বর্ত্তমান ধারা পূর্ণ হইতে পারে ; কিন্তু যদি আরও ঊর্দ্ধ্বতর পরিণতি চাই তাহা কেবল তখনই সম্ভব হইবে যখন যাহা আমাদের কাছে বর্ত্তমানে অতিচেতন রহিয়াছে চিৎস্বরূপের সেই স্বাভাবিক উচ্চতায় আরূঢ় হইয়া তাহার সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারিব।

আমাদের বর্ত্তমান প্রাকৃত জ্ঞান-ভূমির ঊর্দ্ধ্বে যে অতিচেতন ভূমি রহিয়াছে তাহার মধ্যে আমাদের মনোময় সত্তার উচ্চতর স্তর সকল এবং অতিমানস

ও শুদ্ধ চিন্ময় সত্তার সুউচ্চ স্বাধিষ্ঠান ক্ষেত্রসমূহ আছে। উর্দ্ধ পরিণামের অপরিহার্য্য প্রথম সোপান হইল মনের এই সকল উচ্চস্তরে আমাদের চেতনাকে উন্নীত করা ; এই স্তর হইতে এখনও আমাদের অধিকাংশ বৃহত্তর মনোময় ক্রিয়ার —বিশেষতঃ যাহাদের মধ্যে বিপুলতর শক্তি এবং আলোক, শ্রুতি বোধি ও প্রেরণার দীপ্তি আছে—শক্তি ও প্রবৃত্তি লাভ করি ; কিন্তু এ শক্তি ও প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিতেছে তাহা আমরা জানিনা। আমাদের চেতনা যদি মনের এই সমস্ত উচ্চস্তরের বিপুলতার মধ্যে পৌঁছিতে এবং স্থিত ও কেন্দ্রীভূত হইতে সমর্থ হয় তাহা হইলে চিদ্বস্তুর আবির্ভাব এবং শক্তির একটা অপরোক্ষ আভাস পায় এমন কি অতিমানসের একটা প্রাথমিক অভিব্যক্তির—যতই গোণ এবং অপরোক্ষ ভাবে হউক না কেন—পরিচয় লাভ করে এবং এই দিব্য-প্রকাশ আমাদের নিম্নতর সত্তার পরিচালনার অংশ গ্রহণ করিয়া নূতন ছাঁচে তাহাকে ঢালিবার পক্ষে সহায়তা করে। তাহার পরে সেই নূতন ছাঁচে ঢালা চেতনার শক্তিবলে পরিণামধারা মনোময় ভূমি অতিক্রম করিয়া আরও মহান আরও উচ্চ স্তরে উন্নীত হইতে, অতিমানস এবং চিন্ময়ী পরাপ্রকৃতিতে পৌঁছিতে পারে। বর্ত্তমানে অতিচেতন মনের সেই সমস্ত উর্দ্ধস্তরে বাস্তব পক্ষে না উঠিয়া অথবা তথায় সর্ব্বদা বা স্থায়ীভাবে বাস না করিয়াও যদি আমাদের সত্তাকে তাহাদের দিকে উন্মীলিত করিয়া রাখিতে এবং তথা হইতে আগত জ্ঞান ও প্রভাবকে গ্রহণ করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের গঠনগত এবং চিত্তগত অবিদ্যাকে কতকটা দূর করিতে সমর্থ হইব ; তাহাতে আমরা চিন্ময় সত্তা বলিয়া নিজ-দিগকে—অপূর্ণভাবে হইলেও—জানিতে এবং আমাদের সাধারণ মানুষী জীবন ও চেতনাকে কতকটা চিন্ময় করিতে সক্ষম হইব। সে ক্ষেত্রে সচেতন ভাবে এই উচ্চতর এবং অধিকতর জ্যোতির্ম্ময় মননশক্তির সহিত আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হইবে, সেই শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতে শিখিব এবং তথা হইতে আলোকিত এবং রূপান্তরিত করিতে সমর্থ বীর্য্যধারা গ্রহণ করিতে পারিব। উচ্চ স্তরে আরূঢ় বা চিন্ময় ভাবে জাগ্রত সাধকের পক্ষে এই অবস্থা লাভ করা অসাধ্য নয়, কিন্তু ইহা প্রাথমিক অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। অখণ্ড এবং পূর্ণ আত্মজ্ঞানে, সত্তার চেতনা ও শক্তির পরিপূর্ণতায় পৌঁছিতে হইলে প্রাকৃত মনের ভূমি অতিক্রম করিয়া আরও উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। আমরা এখন অতিচেতনায় অভিনিবিষ্ট বা সমাহিত হইয়া এই উচ্চভূমিতে পৌঁছিতে পারি কিন্তু তাহাতে আমরা এই লোকোত্তর ভূমিতে উত্তীর্ণ হই, নিশ্চল এবং

আনন্দময় এক সমাধিতে অধিগত হইয়া। সেই উচ্চতম চিন্ময় পুরুষের প্রশাসন যদি আমাদের জাগ্রত জীবনেও আনিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের চেতনাকে সচেতনভাবে এক নূতন সত্তা নূতন চেতনা নূতন ক্রিয়াশক্তির বিপুল উদারতার মধ্যে উন্নীত এবং প্রসারিত করিয়া আমাদের বর্ত্তমান সত্তা চৈতন্য ও ক্রিয়াধারাকে যতটা সম্ভব পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে এবং তাহাদিগকে দৈবী-সম্পদে রূপান্তরিত করিতে হইবে, তাহার ফলে আমাদের মানুষী জীবনও রূপান্তরিত হইয়া যাইবে; কারণ যেখানেই কোন রূপের মৌলিক পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর সাধিত হইয়াছে সেখানেই প্রকৃতির আত্মাতিক্রম-সাধিকা ক্রিয়ার মধ্যে তিনটি ধারা দেখিতে পাই, একটি উর্দ্ধারোহণ, দ্বিতীয়টি ক্ষেত্র এবং ভিত্তি বা আধারের সম্প্রসারণ, তৃতীয়টি নিম্নতর এবং উচ্চতর উভয়কে লইয়া একটা সমাহরণ ও একীকরণ (integration)।

পরিণতির পথে এরূপ ভাবের রূপান্তর ঘটাইতে হইলে আমাদের কালগত অবিদ্যার সঙ্কোচকে পরিহার করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কারণ আমরা বর্ত্তমানে কালের ক্ষেত্রে ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরের মধ্যেই যে শুধু বাস করি তাহা নহে, আমাদের সমগ্র প্রাকৃত দৃষ্টি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত একটা দেহের জীবনের মধ্যেই আবদ্ধ। যেমন একদিকে জন্মের পূর্ব্বেকার অবস্থা আমরা দেখিতে পাইনা তেমনি মৃত্যুর পর ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও জানিবার উপায় আমাদের নাই, তাই দেখিতে পাই স্থূল স্মৃতির এবং নশ্বর দেহগত বর্ত্তমান জীবনের জ্ঞানের দ্বারা আমরা সীমিত। কিন্তু আমাদের মনন বর্ত্তমানে যাহাদের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে সেই প্রাণ ও জড় ভূমির মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে অভিনিবিষ্ট এবং নিবদ্ধ হইয়া পড়িবার ফলে আমাদের কালগত চেতনার এই সঙ্কোচ আসিয়া পড়িয়াছে; এইরূপে সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকা চিৎসত্তার কোন স্থায়ী বিধান নহে, ইহা আমাদের ব্যক্ত প্রকৃতির প্রাথমিক ক্রিয়া সাধনের উদ্দেশ্যে কৃত একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র। যদি এই অভিনিবেশ শিথিল বা বর্জন করা যায় তাহা হইলে মন প্রসারতা লাভ করিতে পারে, অধিচেতনা ও অতিচেতনা এবং আমাদের অন্তরতর এবং উচ্চতর সত্তার অভিমুখে আমরা উন্মীলিত ও উন্মিষিত হইয়া উঠিতে পারি; কালের মধ্যে এবং কালাতীত ক্ষেত্রে আমরা যে নিত্য বা শাশ্বতভাবে বর্ত্তমান আছি এ অনুভূতি লাভ হইতে পারে। আমাদের আত্মজ্ঞানকে যথাযথভাবে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য এ অনুভূতি লাভ অপরিহার্য্য কেননা আধ্যাত্মিক পরিপ্রেক্ষিতের (perspective) ভ্রান্তিবশতঃ বর্ত্তমানে

আমাদের সমগ্র চেতনা ও ক্রিয়াধারা কলুষিত এবং বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার জন্য আমাদের সত্তার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং নিমিত্ত বা পরিবেশকে যথাযথ ভাবে দেখিতে পাইতেছিনা। প্রায় সকল ধর্ম্মেই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসকে খুব উচচস্থান দেওয়া হইয়াছে, কেন না দেহাত্মবোধ এবং স্থূলের প্রতি আসক্তি ও অভিনিবেশ হইতে বাঁচিতে গেলে এ-বিশ্বাসকে ধরিয়া থাকা স্পষ্টতই একান্ত আবশ্যক। কিন্তু শুধু বিশ্বাসের জোরে পরিপ্রেক্ষিতের ভ্রান্তি কাটেনা; কালের ক্ষেত্রে আমাদের খাঁটি আত্মজ্ঞান কেবল তখনই আসিবে যখন আমরা অমরত্বের চেতনার মধ্যে বাস করিতে সক্ষম হইব; কালের ক্ষেত্রে আমাদের সত্তা যে নিত্য বর্ত্তমান আছে এবং আমাদের কালাতীত একটি সত্তাও যে আছে এ উভয় অনুভূতিতে বাস্তবভাবে আমাদিগকে জাগ্রত হইতে হইবে।

কারণ, আত্মার অমরত্বের খাঁটি অর্থ এই নয় যে দেহের মৃত্যুর পর শুধু আমাদের ব্যক্তিসত্তা কোন প্রকারে টিকিয়া থাকিবে; আমরা স্থূল জন্ম মৃত্যুর পরম্পরার মধ্য দিয়া যতই চলিনা কেন, এই জগতে বা অন্য জগতে আমাদের যতই পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর ঘটুক না কেন সে সমস্তকে অতিক্রম করিয়া যাহা বর্ত্তমান, যাহার আদি নাই অন্ত নাই সেই আত্ম-সত্তার নিত্যত্বের জন্যই আমরা অমর; চিৎ-বস্তুর কালাতীত সত্তাই খাঁটি অমরত্ব। অবশ্য এ শব্দের এক গৌণ অর্থও আছে, তাহাতেও সত্য আছে, কারণ এই খাঁটি অমরত্বের অনুসিদ্ধান্ত (corollary) এই যে আমাদের দেহাবসানের পরেও জন্ম হইতে জন্মান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে কালের ক্ষেত্রে আমাদের সত্তা এবং অনুভবের একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারা সর্ব্বদাই চলিতে থাকে; আমরা যে কালাতীত ইহা তাহার স্বাভাবিক পরিণাম, যাহা কালাতীত তাহাই কালের চিরস্থায়িত্বের মধ্যে নিত্য আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আমাদের মধ্যে যে অপরিণামী চিৎ-বস্তু আছে যাহার কখনও জন্ম হয়না যাহার সম্ভূতি নাই তাহাকে জানিলে কালাতীত অমরত্বের অনুভূতি আমরা পাই; আবার যে আত্মা জন্ম এবং সম্ভূতির মধ্যে রহিয়াছেন, যিনি আছেন বলিয়া মন প্রাণ এবং দেহের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও একই নিত্য অন্তরাত্মা সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে এ বোধ আমরা পাই, সেই আত্মার জ্ঞান হইলে কালগত অমরত্বের অনুভূতি আমরা লাভ করি; ইহাও শুধু উদ্বর্তন বা বাঁচিয়া থাকা মাত্র নহে, ইহাতে যাহা কালাতীত, কালের প্রকাশের ক্ষেত্রে তাহারই অনুবাদ করা হইয়াছে। প্রথম উপলব্ধিতে জন্ম মৃত্যুর যে শৃঙ্খল আমাদিগকে অন্ধকারাবৃত করে তাহার বন্ধন ও অধীনতা হইতে আমরা

মুক্তি লাভ করি, ভারতবর্ষেব বহু সাধনপন্থার ইহাই চরম লক্ষ্য ; দ্বিতীয় উপলব্ধি প্রথম উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত হইলে শাশ্বত কালের ক্ষণপরম্পরার মধ্যেই সেই চিৎস্বরূপ নিত্য বস্তুর অনুভব আমরা স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে লাভ করি, তখন আমাদের অবিদ্যা দূর হয় প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, আমাদের কর্ম্মের মধ্যে আর কোন বন্ধন থাকেনা। কেবলমাত্র কালাতীত সত্তার অনুভবে শাশ্বত কালেন মধ্যে নিত্য বর্ত্তমান আত্মার অনুভবের সত্য আমরা না পাইতে পারি ; আবার মৃত্যুর পর আত্মা বর্ত্তমান থাকে কেবলমাত্র এ অনুভূতি লাভ হইলেও আমাদের অস্তিত্বের আদি বা অন্ত যে নাই ইহা পূর্ণ প্রমাণিত হয়না। কিন্তু এই দুইটি অনুভূতি একই সত্যবস্তুর দুই দিকের অনুভূতি ইহা যখন বুঝা যায় তখন এই দুই-এর যে কোন অনুভূতি যদি খাঁটিভাবে লাভ হয় তাহার ফলে আমরা নিত্য সচেতনভাবে শাশ্বত বস্তুতে বাস করিতে পারি ; তখন আর ক্ষণ-পরম্পরার তাড়নে তাড়িত বা কালের বন্ধনে বদ্ধ থাকিনা ; এইভাবে বাস করা দিব্য চেতনা এবং দিব্য জীবন লাভের প্রথম সর্ত্ত বা সাধ্য (condition)। অন্তর সত্তার এই নিত্য স্থিতিতে অবস্থিত থাকিয়া সম্ভূতির নিত্যধারাকে অধিকার ও প্রশাসন করা হইল ক্রিয়া শক্তিতে বীর্য্যবন্ত দ্বিতীয় সাধ্য বা সাধনাঙ্গ, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাহাব ফলে আমরা চিন্ময় আত্মস্থিতি এবং আত্ম-স্বারাজ্য লাভ করি। এই সকল পরিবর্ত্তন কেবল তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন স্থূলের প্রতি একান্ত অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া মন এবং চিৎসত্তার অন্তরতর এবং উর্দ্ধতর ভূমিসকলেব মধ্যে নিত্য বাস করিতে পারি,—তাহার জন্য দেহগত জীবনকে যে বর্জন বা অবজ্ঞা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কারণ আমাদের চেতনাকে অধ্যাত্মতত্ত্বে উন্নীত করিবার দুইটি উপায় আছে—এবং এই দুই উপায়েরই সাধনা মূলতঃ প্রয়োজনীয়—এক উর্দ্ধারোহণ, দ্বিতীয় ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে আবর্ত্তিত ক্ষণস্থায়ী জীবন হইতে অন্তরে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের অমর চেতনার নিত্য জীবনে প্রবেশ ; সেই সঙ্গে কালের মধ্যে আমাদের চেতনার ও কর্ম্মক্ষেত্রের বিপুল প্রসারতা এবং ব্যাপ্তি আসিয়া পড়ে এবং মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় সত্তাকে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে উর্দ্ধস্রোতা এবং উচচতর কার্য্যে নিযুক্ত করিবার কৌশল অধিগত হয়। আমাদের মধ্যে তখন আত্মসত্তার জ্ঞানের উদয় হয় সে জ্ঞান তখন আর দেহাশ্রিত চেতনা নয়, সে জ্ঞানে আমরা জানি যে আমরা স্বরূপতঃ শাশ্বত চিৎপুরুষ, যিনি সকল জগৎ সকল প্রাণকে নিজের বিচিত্র আত্মানুভবের জন্যই ব্যবহার করিতেছেন ;

তখন অনুভব করি যে আমাদের অন্তরাত্মা এক চিন্ময় সত্তা, স্থূল দেহ-পরম্পরার মধ্য দিয়া সেই সত্তারই এক আত্মজীবন নিত্য নূতন ক্রিয়াধারা সৃষ্টি করিয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; সেই সত্তা নিজের সম্ভূতি নিজেই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই জ্ঞান যখন শুধু ভাবনায় বা কল্পনায় নহে কিন্তু আমাদের সত্তার মর্ম্মমূলে প্রতিষ্ঠিত এবং অনুভূত হয় তখন আমরা আর কর্ম্মের অন্ধ আবেগের দাস থাকিনা পরন্তু আমাদের সত্তার এবং প্রকৃতির প্রভুরূপে শুধু আমাদের অন্তরস্থ ভগবানের অনুগত হইয়া বাস করিতে পারি।

সেই সঙ্গে আমাদের অহংগত অবিদ্যাও খসিয়া পড়ে; কেন না যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদ্বারা কোন এক বিন্দুতে বদ্ধ আছি ততক্ষণ দিব্যজীবন লাভ, হয় অসম্ভব নাহয় তাহার আত্মপ্রকাশ থাকিয়া যায় অপূর্ণ। কেন না এই প্রাকৃত দেহ মন প্রাণের সঙ্গে নিজেকে একীভূত এবং তাহাদের মধ্যে নিজেকে সীমিত করিয়া দেখে বলিয়া অহং আমাদের খাঁটি ব্যষ্টি সত্তার মিথ্যা এবং বিকৃত রূপ মাত্র; অহং আমাদিগকে আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে আবদ্ধ করে, অন্য সমস্ত জীব ইহতে আমাদিগকে পৃথক করিয়া রাখে এবং আমাদের ব্যষ্টি সত্তাকে বিশ্বসত্তারূপে বাস করিতে দেয়না; সকল অস্তিত্বেব যিনি একমাত্র আত্মা, আমাদের সকলের অন্তরের মধ্যে যাঁহার নিত্য বাস সেই ঈশ্বর সেই আমাদের পরম আত্মা হইতেও ইহা আমাদিগকে পৃথক রাখে। যখন আমাদের চেতনা পরিবর্ত্তিত হইয়া চিৎস্বরূপের উচ্চতা গভীরতা এবং উদার ব্যাপ্তি লাভ করে তখন অহং আর বাঁচিতে পারে না; সে বিশালতার পক্ষে অহং অতি ক্ষুদ্র অতি দুর্ব্বল তাই সে গলিয়া তাহাতে লয় হইয়া যায়; কেন না সীমার দ্বারাই ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিতে পারে এবং সীমার বাঁধন টুটিয়া গেলে ইহার মৃত্যু হয়; তখন আমাদের মধ্যস্থ জীবপুরুষ বিবিক্ত ব্যষ্টি ভাবের কারাগার ভাঙ্গিয়া বিশ্বাত্মতা ও বিশ্বচেতনা লাভ করে এবং সেই চেতনাতে সর্ব্বভূতের দেহ মন প্রাণ ও আত্মার সহিত সে এক হইয়া যায়। অথবা সীমার বন্ধন কাটিয়া ইহা বিশ্বভাব ও ব্যষ্টিভাবের পরপারস্থিত এক উচ্চতম শিখরে স্বয়ম্ভূ সৎস্বরূপের অনন্ত এবং শাশ্বত সত্তায় উৎক্ষিপ্ত হয়। বিবিক্ত ভাবের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে অহং সম্পূর্ণরূপে বিরাট বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে অথবা চিন্ময় পরম ব্যোমের উচ্চতম শৃঙ্গে নিশ্বাস নিতে না পারিয়া মহাশূন্যে লয় পায়। প্রাকৃত সংস্কার বা অভ্যাসের বশে যদি তাহার ক্রিয়ার একটু রেশ থাকিয়াও যায় তবে তাহাও দ্রুত লয় পায় এবং তাহার স্থানে নির্ব্যক্তিক-

ব্যক্তিত্বের এক নূতন দৃষ্টি নূতন অনুভূতি নূতন ক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু অহংকারের প্রলয়ে আমাদের খাঁটি ব্যষ্টিভাব বা খাঁটি চিন্ময় সত্তা লোপ পায় না, কারণ তাহা সর্ব্বদাই সর্ব্বগত এবং সর্ব্বাতীত সত্তার সহিত একীভূত; কিন্তু এক দিব্য রূপান্তর সাধিত হয়, বিবিক্ত অহংএর স্থানে এক পুরুষ প্রতিষ্ঠিত হন—সে-পুরুষ বিশ্বপুরুষের এক অভিব্যক্তি বা এক রূপ এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্বাতীত দিব্য পুরুষের এক শক্তি।

এই একই ক্রিয়া দ্বারা চিৎসত্তার জাগরণে বিশ্বগত অবিদ্যা লোপ পায়; কেন না তখন যিনি বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত এ উভয় অবস্থায়ই আত্মপ্রতিষ্ঠ আমরা নিজদিগকে আমাদের সেই কালাতীত অক্ষর আত্মা বলিয়া জানিতে পারি; এই জ্ঞানই কালেব ক্ষেত্রে ভগবানের খেলার ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়, ইহাই এককে বহুর সঙ্গে, শাশ্বত একত্বকে শাশ্বত বহুত্বের সহিত সামঞ্জস্য এবং সুসঙ্গতিতে গ্রথিত করে, জীবাত্মা এবং ভগবানের পুনর্মিলন সাধন এবং জগতের মধ্যে ভগবানকে আবিষ্কার করে। এই উপলব্ধি দ্বারা যিনি সকল ঘটনা, সকল পরিবেশ, সকল সম্বন্ধের মূলাধার সেই পরম তত্ত্বে আমরা পৌঁছিতে পারি; তখন তাহারি চেতনাকে আশ্রয় করিয়া অমেয় বিপুল যে জগৎ রহিয়াছে তাহাকে আমাদের নিজেদের মধ্যেই লাভ করি; এবং এই চিন্ময় চেতনাতে বিশ্বকে সমুদ্ধৃত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া অনুভব করি সেই পরম বস্তুতে কেন্দ্রীভূত সকল বিভূতির চরম চমৎকার। সকল মৌলিক বিষয়ে এইভাবে যখন আমাদের আত্মজ্ঞান পূর্ণ হইয়া উঠিবে তখন ব্যবহারিক অবিদ্যা দূর হইবে; তখন এই অবিদ্যার চরম অবস্থায় যে দুষ্কৃতি, জ্বালা যন্ত্রণা, মিথ্যা, ভ্রান্তি দেখা দিয়াছিল যাহার ফলে জীবনের সকল সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাদের স্থানে আত্মজ্ঞানের ঋতময় সংকল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং খাঁটি চিৎশক্তি ও আনন্দের দিব্য প্রকাশ ও পরিপ্লাবনে অবিদ্যার মিথ্যা বা অপূর্ণ সকল তত্ত্ব ভাসিয়া যাইবে। আমাদের সত্তা চেতনা এবং কর্ম্মকে যদি পূর্ণ এবং সত্য ও ঋতময় করিতে হয়, আমাদের সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মবুদ্ধির অপূর্ণ মানুষী মূল্য ও বোধ দিয়া তাহাদিগকে পীড়িত না করিয়া দিব্য জীবনের উদার ও জ্যোতির্ম্ময় মহিমার মধ্যে যদি তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার অপরিহার্য্য সাধন হইবে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়া বা সর্ব্ব সত্তার সহিত এক হওয়া বা আমার আত্মাই সর্ব্বভূতের আত্মা এই জ্ঞানে ও উপলব্ধিতে উদ্বোধিত হওয়া; তখন ভিতর হইতে গঠিত ও প্রশাসিত যে জীবন বাহিরে ফুটিবে তাহার সকল ভাবনা সকল সঙ্কল্প সকল

ক্রিয়ার উৎস হইবে সত্য এবং দিব্য বিধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল চিৎপুরুষ—এ সত্য ও বিধান অবিদ্যাময় মনের দ্বারা স্বষ্ট এবং গঠিত বস্তু নয়, পরন্তু তাহারা স্বয়ম্ভূ বা আপনাতে আপনি বর্ত্তমান এবং স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে আপনাতে আপনি চরিতার্থ হইয়া উঠে—এমন কি এ বিধানকে বিধান না বলিয়া আত্মচেতনায় ক্রিয়াশীল এবং জ্ঞানের স্বতন্ত্র সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্যোতির্ম্ময় ক্রিয়াধারার মধ্যে অবস্থিত সত্য বলা অধিকতর সঙ্গত।

সচেতন অধ্যাত্ম পরিণামের ইহাই রীতি এবং ফল বলিয়া মনে হয়; ইহাতে অবিদ্যার জীবন ঋতচিন্ময় পুরুষের দিব্য জীবনে রূপান্তরিত এবং মনোময় জীবনধারা চিন্ময় ও অতিমানস-ধারায় পরিবর্ত্তিত হইবে, সপ্তধা অবিদ্যার স্থলে সপ্তধা জ্ঞানের উদয় হওয়ার ফলে সত্তার এক পরম আত্মবিস্তার ঘটিবে। এইভাবের দিব্যরূপান্তর প্রকৃতির ঊর্দ্ধমুখী ক্রিয়াধারার স্বাভাবিক পরিণতি ও সিদ্ধি; এই ক্রিয়াধারাতে চেতনার শক্তি ঊর্দ্ধমুখে তত্ত্ব হইতে তত্ত্বান্তরে উন্নীত হইয়া অবশেষে চরম ও পরম চিন্ময় তত্ত্বে পৌঁছিবে; তখন সেই তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া জীবনের শাস্তা ও নিয়ন্তা হইবে, নিম্নতর ভূমিস্থিত বিশ্বভাব এবং ব্যষ্টিভাব নিজের সত্যের মধ্যে গ্রহণ এবং স্থাপন করিয়া সকলকেই চিৎপুরুষের চিন্ময় প্রকাশে রূপান্তরিত করিবে। এই রূপান্তরে খাঁটি ব্যষ্টি-পুরুষ চিন্ময় পুরুষরূপে উন্মিষিত ও প্রকাশ হইবে, সে পুরুষ ব্যষ্টি হইয়াও বিশ্বপুরুষ এবং বিশ্বপুরুষ হইয়াও বিশ্বাতীত পুরুষ; তখন জীবন বিবিক্ত এবং বিভক্ত করিয়া দেখাই যাহার স্বভাব সেই অবিদ্যার দ্বারা স্বষ্ট এক রূপায়ণ বা ক্রিয়াধারা বলিয়া আর বোধ হইবে না।

বিংশ অধ্যায়

জন্মান্তর তত্ত্ব

শরীরীর এই সমস্ত দেহের অন্ত আছে, কিন্তু শরীরী বা আত্মা নিত্য।... এই আত্মা কখনও জন্মেন না বা মরেন না, একবার হইয়া (বা জন্মিয়া) আর সে হইবেন না তাহাও নহে। ইনি জন্ম রহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ; শরীর হত হইলেও ইনি হত হয়েন না।...যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী বা আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করেন। ...যে জন্মিয়াছে তাহার মরণ নিশ্চিত, যে মরিয়াছে তাহার জন্মও নিশ্চিত।

গীতা ২।১৮,২০,২২,২৭

আত্মার জন্ম আছে বৃদ্ধিও আছে। কর্ম্মানুসারে দেহী নানা স্থানে পর পর নানা রূপ গ্রহণ করে; নিজের স্বভাবের গুণে দেহী স্থূল সক্ষ্ম বহু রূপ ধারণ করে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৫।১১,১২

জড় বিশ্বের প্রথম আধ্যাত্মিক রহস্য হইল জন্ম; দ্বিতীয় রহস্য মৃত্যু যাহা জন্মের প্রথম রহস্যের সঙ্গে আর একটি রহস্য জুড়িয়া দিয়া দ্বিগুণ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে; কেননা জন্ম মৃত্যু না থাকিলে জীবনকে একটা স্বতঃসিদ্ধ তথ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইত, কিন্তু এই দুইএর জন্য জীবনের একটা আদি এবং একটা অন্ত আছে বলিয়া বোধ হওয়াতে তাহা একটা রহস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অথচ সহস্র প্রকারে আমরা জানিতেছি যে জন্মই জীবনের আদি এবং মৃত্যুই শেষ ইহা সত্য নহে, বরং বলা চলে যে জীবনের গোপন গতিধারার মধ্যে জন্ম এবং মৃত্যু মধ্যবর্ত্তী বা অবান্তর সোপান বা অবস্থা মাত্র। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় সর্ব্বত্র বিস্তৃত মৃত্যুর মধ্যে সর্ব্বদা প্রাণের যে একটা প্রকাশ ও উচ্ছ্বাস দেখা দিতেছে তাহাই জন্ম; বিশ্বব্যাপী নিষ্প্রাণ জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ যেন একটা নৈমিত্তিক অথচ নিত্যসংঘটনশীল ব্যাপার। আরও একটু বিশেষ আলোচনা করিলে মনে হয় যে প্রাণ জড়ের মধ্যেই সংবৃত আছে এমন কি যে শক্তি জড় সৃষ্টি করে প্রাণ সেই শক্তিতে নিত্য অনুস্যূত এক বীর্য্য;

কিন্তু নিজের বৈশিষ্ট্য ফুটাইবার বা আত্মরূপায়ণের উপযুক্ত পরিবেশ শুধু পাইলে তাহা স্ফুরিত হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু প্রাণের জন্মের মধ্যে যে প্রকাশ দেখা যায় তাহার মধ্যে আরও কিছু আছে যাহা এই উন্মেষের মধ্যে অংশ গ্রহণ করে, এমন কিছু যাহা জড় বস্তু নয়; আত্মার একটা সবল শিখা উর্দ্ধমুখী হইয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, চিৎস্বরূপের একটা প্রথম স্পষ্ট স্পন্দন দেখা দিয়াছে।

জন্মের যে সমস্ত ঘটনা বা পরিবেশ এবং পরিণাম আমরা জানিয়াছি তাহাতে মনে হয় ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়, জন্মের পূর্ব্বে আমাদের অজ্ঞাত কিছু ছিল, বর্ত্তমানে ইহার মধ্যে সার্ব্বভৌমতার একটা ইঙ্গিত এবং জীবনকে ধরিয়া রাখিবার একটা ইচ্ছা দেখিতে পাই, আবাব মৃত্যুতেও সব শেষ হইয়া গেল বলিয়া বোধ হয় না, মনে হয় যেন ইহার এক অজানা ভবিষ্যৎও আছে। জন্মের পূর্ব্বে কি ছিলাম এবং মৃত্যুর পর কি হইব, ইহাদের একের উত্তর অন্যের উপর নির্ভর করে—মানুষের বুদ্ধি আদিকাল হইতে এ দুই প্রশ্ন করিয়া আসিতেছে কিন্তু আজিও কোন শেষ উত্তর পাওয়া যায় নাই। বাস্তবিক পক্ষে শেষ উত্তর দিবার সামর্থ্য বুদ্ধির নাই; কেন না এ প্রশ্নের বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে যে সমস্ত তথ্য হইতে উত্তর মিলিবে তাহা স্পষ্টতঃ ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্থূল চেতনা এবং স্থূল স্মৃতির বাহিরে অবস্থিত; অথচ সমস্যা সমাধানের জন্য বুদ্ধি যেন কতকটা বিশ্বাসের সহিত এই সমস্ত তথ্য লইয়া আলোচনা করিতেই অভ্যস্ত। বিচারের জন্য আহৃত তথ্য বা উপাদান এইভাবে স্বল্প পরিমাণ এবং অনিশ্চিত হইবার জন্য বুদ্ধি এক অনুমান বা প্রকল্প (hypothesis) হইতে অন্য অনুমানে আবর্ত্তিত হয়, এবং পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেককে নিশ্চিত মীমাংসা বলিয়া গ্রহণ করিতে চায়। তাহা ছাড়া বিশ্ব-ক্রিয়ার প্রকৃতি উৎস ও লক্ষ্যের উপর এ সমস্যার সমাধান নির্ভর করে; আমরা এ সমস্ত সম্বন্ধে যে মত গড়িয়া তুলি ঠিক সেই ভাবে জন্ম, জীবন ও মৃত্যু এবং জন্মের পূর্ব্বে ও পরের অবস্থার সম্বন্ধে আমাদের বিচার এবং মতামত নির্ণীত হয়।

প্রথম প্রশ্ন হইল জীবের জন্মের পূর্ব্বের এবং মৃত্যুর পরের অবস্থা কি শুধু অন্ন ও প্রাণময় অথবা প্রধানতঃ মনোময় এবং চিন্ময় ব্যাপার? জড়বাদীর মতে জড় বিশ্বের মৌলিক তত্ত্ব, এদেশেও বরুণের পুত্র ভৃগু শাশ্বত ব্রহ্মের ধ্যানে যখন রত ছিলেন তখন প্রথমে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে "জড় বা

অন্নই শাশ্বত বস্তু, কেননা অন্ন হইতেই সর্ব্বভূত জাত হয়, অন্ন দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে এবং অন্নেই তাহারা ফিরিয়া যায়," ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আর কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। তাহা হইলে আমাদের দেহের জন্মের পূর্ব্বাবস্থা হইবে বীজ এবং খাদ্যবস্তুর মধ্য দিয়া হয়ত কোন গোপন কিন্তু শুদ্ধ জড়-শক্তির প্রভাবে নানা বস্তু হইতে আমাদের দেহের উপযোগী জড় উপাদান সকল সংগ্রহ করা ; আমাদের চেতন সত্তার পূর্ব্বাবস্থা হইতে বংশানুক্রমের সূত্র ধরিয়া অথবা বিশ্বজড়ের মধ্যে ক্রিয়াশীল জড়াশ্রয়ী প্রাণ বা জড়াশ্রয়ী মনের একটা বিশিষ্ট ক্রিয়া-ধারার বশে পিতামাতার দেহের মধ্য দিয়া তাহাদের দেহাশ্রিত বীজকোষ জীন এবং ক্রোমোসোমের* সাহায্যে ব্যষ্টি ব্যক্তিকে প্রস্তুত করা। মৃত্যুর পর দেহের অবস্থা হইবে জড় উপাদানে মিশিয়া যাওয়া এবং চেতন সত্তার অবস্থা মানব-জাতির সাধারণ জীবন ও মনে নিজের ক্রিয়ার কিছু ছাপ রাখিয়া জড়ের মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া যাওয়া ; সম্পূর্ণ কাল্পনিক এই ভাবের উদ্বর্ত্তন ছাড়া জীবের পক্ষে অমরত্ব লাভের কোন আশা নাই। কিন্তু যখন মনের উৎপত্তি এবং অস্তিত্বের কারণ শুধু জড় হইতে ভালভাবে পাওয়া যায় না,—এমন কি শুধু জড় দিয়া জড়ের ব্যাখ্যাও আজকাল যখন আর চলে না—কেননা জড় একটা স্বয়ম্ভূ তত্ত্ব নয়—তখন সহজ এবং স্পষ্ট বলিয়া মনে হইলেও এ মীমাংসায় মানুষের বুদ্ধি তৃপ্ত হয় না, তাহাকে অন্য মীমাংসা খুঁজিতে হয়।

কোন কোন প্রাচীন ধর্ম্মের পুরাণ-কথার মধ্যে আমরা একটা গোঁড়া মতবাদের দেখা পাই, তাহা এই যে—ঈশ্বর কোন এক রহস্যপূর্ণ উপায়ে নিজের সত্তা হইতে অমর জীবাত্মা সর্ব্বদা সৃষ্টি করিতেছেন অথবা ইহা মানিয়া লইতে হইবে যে জড়প্রকৃতিতে বা জড় হইতে তাহারি সৃষ্ট জীবের দেহে নিজের 'নিশ্বাস' বা প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহার অন্তরে এক চিন্ময় তত্ত্ব উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেছেন। রহস্যময় একটা বিশ্বাস রূপে যদি ইহাকে গ্রহণ করা হয় তবে তাহা লইয়া আলোচনার প্রয়োজন থাকে না, কেন না কোন প্রশ্ন না করিয়া, কোন প্রকার পরীক্ষা এবং যাচাই করিয়া না দেখিয়া গ্রহণ করিবার জন্য বিশ্বাসের রহস্যরাজি উপস্থাপিত করা হয় ; কিন্তু যুক্তি বা দার্শনিক বিচারের দিক হইতে দেখিলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য মনে হয় না,

* gene and chromosome এ উভয়ই জীবকোষের মধ্যস্থিত উপাদান।—অনুবাদক

আমরা বস্তুর যে সমস্ত ধারার সহিত পরিচিত তাহাদের সঙ্গে ইহা মিলে না। কারণ এ সিদ্ধান্তের মধ্যে এমন দুইটি দৃষ্টতঃ অসম্ভব উক্তি আছে যাহাদিগকে সমর্থন করা যায় না এবং আরও উপাদান না পাইলে তাহাদিগকে বিচার সভায় আনিয়া উপস্থিত করা যায় না ; তাহাদের প্রথম উক্তিটি এই,—ঈশ্বর প্রতিমুহূর্ত্তে যে জীব সৃষ্টি করিতেছেন কালের ক্ষেত্রে তাহাদের আদি আছে কিন্তু অন্ত নাই ; অধিকন্তু দেহের জন্মে তাহাদের জন্ম হইলেও দেহের মৃত্যুতে তাহাদের মৃত্যু হয় না ; দ্বিতীয় উক্তিটি এই জন্মের সঙ্গে দোষ বা গুণ, শক্তি বা অসামর্থ্য অথবা স্বভাবগত ঐশ্বর্য্য কি দৈন্যের একটা বোঝা জীবের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হয়, এ সমস্ত তাহার আত্মপরিণাম বা কৃতকর্ম্মের স্বাভাবিক ফল নয় ; বংশানুক্রমের বিধানে না হইলে খামখেয়ালি ইচ্ছা বা আদেশের ফল, অথচ ইহাদের জন্য এবং ইহাদের যথোচিত ব্যবহারেব জন্য জীবগণকে তাহাদের স্রষ্টার কাছে দায়ী থাকিতে হয়।

দার্শনিক বিচারে কতকগুলি বিষয় ন্যায্যভাবে আমরা—অন্ততঃ সাময়িক-রূপে—মানিয়া নিতে পারি ; তাহাদিগকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার ভার, যাহারা সে গুলিকে মানিতে চায় না তাহাদের উপর দিলে কিছু অন্যায় হয় না। এই সমস্ত স্বীকার্য্যের একটি এই যে যাহার অন্ত নাই, নিশ্চয় তাহার আদিও থাকিতে পারে না ; যাহার আদি আছে বা যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, যে ক্রিয়াধারায় তাহা সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই সৃষ্টবস্তুকে বজায় রাখিয়াছে তাহার নিবৃত্তিতে অথবা যে সমস্ত উপাদানে বস্তুটি গঠিত হইয়াছে তাহারা বিশ্লিষ্ট বা নষ্ট হইয়া গেলে অথবা উদ্দেশ্য সাধনের পরিসমাপ্তি ঘটিলে তাহার অন্তও অবশ্যম্ভাবী। এ বিধানের ব্যতিক্রম যদি থাকে তবে তাহা কেবল তখনই সম্ভব হইবে যখন চিৎসত্তা জড়ে অবতরণ করিয়া জড়কে দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন বা জড়ে নিজের অমরত্ব সংক্রামিত করেন ; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যিনি অবতরণ করেন সেই চিৎপুরুষ স্বয়ং অমর, কৃত্রিম বা সৃষ্ট বস্তু নহেন। যদি দেহকে জীবন্ত বা সচেতন করিবার জন্যই আত্মা সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার আবির্ভাব যদি দেহের উপরই নির্ভর করে তবে দেহের লয় হইবার পর তাহার অস্তিত্ব বজায় থাকিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ বা ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহা মনে করাই স্বাভাবিক যে, যে 'নিঃশ্বাস' বা প্রাণশক্তি দেহকে সচেতন করিবার জন্যই আসিয়াছিল দেহের ধ্বংসে তাহা স্রষ্টার কাছে ফিরিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে জীবাত্মা যদি কোনপ্রকার দেহধারী রূপেই অমরত্ব লাভ করে তবে মৃত্যুর

পরে তাহাকে সূক্ষ্ম বা চৈত্য দেহ ধারণ করিয়া বর্ত্তমান থাকিতে হইবে, যদি তাহাই হয় তবে একথা প্রায় নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে এই চৈত্যদেহ এবং তাহার দেহী জড় দেহের সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল; ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর জড় দেহের মধ্যে বাস করিবার জন্য চৈত্যদেহ এবং দেহী নূতন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে ইহা মনে করা অযৌক্তিক; এক অমর সত্তার উৎপত্তি জড়দেহ-সৃষ্টি-রূপ অতি ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারের পরিণাম হইতে পারে না। আবার মৃত্যুর পরে জীবাত্মা যদি বিদেহ অবস্থায় থাকিতে পারে তাহা হইলে তাহার অস্তিত্বের জন্য দেহের উপর নির্ভর কবিবার কোন আদি প্রয়োজন থাকিতে পারে না; মৃত্যুর পরে জীবের চিন্ময় সত্তারূপে বিদেহ স্থিতি যেমন স্বাভাবিক, জন্মের পূর্ব্বে বিদেহ অবস্থায় থাকাও তাহার পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক ও সম্ভব।

আবার কালের মধ্যে যেখানে একটা পরিণতি বা পরিপুষ্টি দেখিতে পাই তথায় সেই পুষ্টিব একটা অতীত ইতিহাস ছিল ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পরি। অতএব জীব যদি একটা পরিণত ব্যক্তিভাব লইয়া জীবন আরম্ভ করিয়া থাকে তবে এ জগতে অথবা অন্য কোন জগতে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে এ জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও ধবিয়া লওয়া যাইতে পারে। অথবা যদি ধরা যায় যে জীবাত্মা নিজে প্রস্তুত করিয়া না লইয়া পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত প্রাণ এবং ব্যক্তিভাব গ্রহণ করিয়াছে;—হয়ত তাহা অন্নপ্রাণমনময় বংশানুক্রমের শক্তিতে গঠিত হইয়াছে—তাহা হইলে সে নিজে এই জীবন এবং ব্যক্তিভাব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা কিছু যাহা কেবল আকস্মিক ভাবে দেহ ও মনের সহিত যুক্ত হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান দৈহিক বা মনোময় জীবনে যাহা কিছু ঘটিতেছে বা তাহাদের মধ্যে যে ক্রিয়া চলিতেছে বস্তুতঃ তাহা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জীব যদি কৃত্রিম সত্তা বা সত্তার রূপ মাত্র না হয় যদি সে সত্য বস্তু এবং অমর হয় তবে তাহা নিত্য হইবেই, তাহা হইলে অতীতে যেমন তাহার আদি ছিল না ভবিষ্যতেও তেমনি অন্ত থাকিবে না; কিন্তু জীব নিত্য হইলে সে হইবে পরিবর্ত্তনশূন্য নির্ব্বিকার আত্মা, জীবন বা তাহার খেলার দ্বারা অপরামৃষ্ট; অথবা সে হইবে কালাতীত শাশ্বত চিন্ময় পুরুষ যিনি কালের ক্ষেত্রে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ব্যক্তিত্বের এক প্রবাহ ফুটাইয়া তুলিতেছেন বা প্রকাশ করিতেছেন। এই পুরুষই যদি জীবের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে জন্ম মৃত্যুময় এ জগতে কেবল দেহ-পরম্পরাকে স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ প্রাকৃতিক রূপের মধ্যে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াই তাহার ব্যক্তিত্বের প্রবাহ রূপায়িত হইয়া উঠিতে পারে।

শাশ্বত জড়ই সর্ব্ববস্তুর মূল একথা অস্বীকার করিলেই যে আত্মার অমরত্ব ও নিত্যত্ব আসিয়াই পড়ে তাহা নহে। কেননা এ মতও আছে যে এক অনাদি অদ্বয় তত্ত্ব হইতে সর্ব্ববস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, সেই তত্ত্বের দ্বারা তাহারা বর্ত্তমান আছে এবং সেই তত্ত্বেই তাহারা লয় পাইবে, এই তত্ত্বের কোন শক্তিদ্বারা সাময়িক বা আপাত ব্যাপার রূপে জীবাত্মা সৃষ্ট হইয়াছে। একদিকে কতকগুলি আধুনিক আবিষ্কার ও ভাবনার ভিত্তিতে আমরা এক অদ্বয় বিশ্বনিশ্চেতনার মতবাদ খাড়া করিতে পারি, বলিতে পারি সেই নিশ্চেতনা সাময়িক এক এক জীবাত্মা এক এক চেতনা সৃষ্টি করিতেছে, যাহা কিছুক্ষণ খেলা করিবার পর আবার লয় পাইতেছে এবং নিশ্চেতনায় ফিরিয়া যাইতেছে। অথবা এক শাশ্বত সম্ভূতি আছে যাহা বিশ্বগত প্রাণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহার সেই প্রকাশ-ক্রিয়ার একপ্রান্তে বহির্ম্মুখী বিষয় বা জড় এবং অন্য প্রান্তে অন্তর্ম্মুখী বিষয়ী বা মন দেখা দিয়াছে, প্রাণশক্তির এই দুই ব্যাপার বা প্রতিভাসের পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের জীবন অভিব্যক্ত হইয়াছে। অন্য পক্ষে প্রাচীন এক মতবাদ আছে যে অতিচেতন একমাত্র এক শাশ্বত নির্ব্বিকার সদ্বস্তু বর্ত্তমান আছে, সেই তত্ত্ব মায়া দ্বারা মন এবং জড়ের এই প্রাতিভাসিক জগতে ব্যষ্টি জীবাত্মার এক ভ্রান্তি সৃষ্টি বা স্বীকার করিয়াছে; মন এবং জড় বস্তুতঃ অবাস্তব বা মিথ্যা—যদিও তাহাদের সাময়িক বা প্রাতিভাসিক বাস্তবতা থাকিতে পারে—কেন না শাশ্বত নির্ব্বিকার সেই ব্রহ্ম বা আত্মাই একমাত্র সত্যবস্তু। আবার বৌদ্ধমতে আমরা পাই এক নির্ব্বাণ বা পরম শূন্যের কথা, যে রূপেই হউক তাহার উপর আরোপিত হইয়াছে সম্ভূতির শক্তি বা ক্রিয়ার এক শাশ্বত অন্তহীন পরম্পরা যাহাকে আমরা কর্ম্ম বলি, এই কর্ম্মই ভাবনা বা ধারণা, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, কল্পনা বা প্রতিরূপ, সাহচর্য্য বা সহচরিত বৃত্তি (association) প্রভৃতির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ দ্বারা স্থায়ী জীবাত্মার এক ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এই তিনটি মতেই জীবন-সমস্যার সমাধান কার্য্যতঃ এক; কেননা বিশ্বক্রিয়ার পক্ষে অতিচেতন তত্ত্ব নিশ্চেতনারই সমান; এই অতিচেতন ব্রহ্মের মধ্যে নির্ব্বিকার আত্মসত্তার জ্ঞানমাত্র থাকিতে পারে; জীব-জগতের সৃষ্টি তাহার আত্ম সত্তার উপর মায়া কল্পিত এক আরোপমাত্র; ব্রহ্মে চৈতন্যের এক প্রকার আত্ম-সমাহিত বা সুষুপ্তির অবস্থায় হয়ত এই আরোপ হইতে পারে, তথাপি ঐ সুষুপ্তি*

* মাণ্ডুক্য উপনিষদের প্রজ্ঞা বা সুষুপ্তিতে সমাহিত আত্মা সকলের প্রভু এবং সর্ব্ব বস্তুর স্রষ্টা।

হইতেই ক্রিয়াশীল সকল চেতনা এবং প্রাতিভাসিক সম্ভূতির সকল বিপরিণাম উন্মিষিত হয় ; ঠিক তেমনিভাবে আধুনিক মতে আমাদের চেতনাকে নিশ্চেতনার এক ক্ষণস্থায়ী পরিণামমাত্র বলা হয়। এই তিন মতেই জীবের আপাত প্রতীয়মান আত্মা অথবা চিন্ময় ব্যষ্টি সত্তা শাশ্বতভাবে বর্ত্তমান থাকা অর্থে অমর নহে ; কালের মধ্যে তাহার আদি ও অন্ত আছে, তাহা নিশ্চেতন বা অতিচেতন হইতে মায়া বা প্রকৃতির শক্তি অথবা বিশ্বের ক্রিয়াশক্তির দ্বারা সৃষ্ট বস্তু অতএব তাহার অস্তিত্ব অচিরস্থায়ী। এই তিন মতেই জন্মান্তর হয় অনাবশ্যক, না হয় একটা বিভ্রম ; ইহা হয় পুনরাবৃত্তির ফলে বিভ্রমের কিছু দীর্ঘ জীবন লাভ না হয় সম্ভূতির জটিল যন্ত্রের বহু চক্রের মধ্যে এক অতিরিক্ত চক্রের আবর্ত্তন, অথবা সচেতন সত্তা যদি নিশ্চেতন সৃষ্টির অংশ রূপে আকস্মিক ভাবে জাত হইয়া থাকে তবে একবারের বেশী জন্মিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, সেক্ষেত্রে জন্মান্তরের প্রশ্নই আর উঠে না।

এই সমস্ত মতে শাশ্বত সত্তাকে আমরা এক প্রাণময় সম্ভূতি বা অক্ষর নির্ব্বিকার চিন্ময় বস্তু অথবা নামরূপহীন এক অসৎ যাহাই ভাবিনা কেন, যাহাকে আমরা জীবাত্মা বলি তাহা চিৎ প্রতিভাসের একটা নিত্য পরিণামী পিণ্ড বা একটা চিরচঞ্চল প্রবাহ ছাড়া আর কিছু নয় ; সম্ভূতি সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাহারি মধ্যে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় জীব একবার উঠিয়াছে আবার তাহাতে লয় পাইবে ; অথবা ইহা হইতে পারে যে জীব একটা সাময়িক চিন্ময় আধার, সেই অতিচেতন শাশ্বত বস্তুর একটা সচেতন প্রতিরূপ মাত্র যাহা প্রতি-ভাসের বাহ্য প্রকাশের বিপুলতা নিজের সত্তায় ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহা শাশ্বত বস্তু নহে ; সম্ভূতিতে যে দীর্ঘ বা স্বল্পকাল সে বাঁচিয়া থাকিবে তাহাই তাহার অমরত্ব। ইহা সত্য নহে যে জীবাত্মা সত্য এবং সর্ব্বদা বর্ত্তমান কোন ব্যক্তিরূপে থাকিয়া প্রতিভাসের বিপুলতা বা প্রবাহ বজায় রাখে বা অনুভব করে। এই সমস্তের আশ্রয়রূপে যাহা সত্যরূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে তাহা হয় এক শাশ্বত সম্ভূতি নয়ত এক শাশ্বত নৈর্ব্যক্তিক সত্তা অথবা তাহা ক্রিয়াশীল শক্তির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। কারণ সর্ব্বদা যাহা এক ও অভিন্ন এমন এক চৈত্যসত্তা বা অন্তরাত্মা বর্ত্তমান থাকিয়া দেহ হইতে দেহান্তর, রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে অবশেষে যে আদ্যাশক্তি বা প্রথম আবেগের বশে এই চক্র আবর্ত্তিত হইতেছে তাহা কোন বিশেষ নিমিত্ত বশতঃ শেষ হইয়া গেলে চৈত্যসত্তাও ধ্বংস হইয়া যাইবে—এইরূপ মনে করা এ-ধরণের সিদ্ধান্তের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে।

এ সমস্ত মতে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে যেমন কোন রূপ সৃষ্টি হয় তাহার সঙ্গে তাহার অনুরূপ এক চেতনাও উন্মিষিত হয় এবং আবার যখন সে রূপ বিলীন হইয়া যায় তখন তদনুরূপ চেতনাও লোপ পায় ; কেবল যে অদ্বয় তত্ত্ব সকল রূপ সৃষ্টি করে তাহাই মাত্র শাশ্বত ভাবে বর্ত্তমান থাকে। অথবা এমনও হইতে পারে যেমন জড়ের সাধারণ উপাদান হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহ গঠিত হয় এবং জন্মে তাহার আরম্ভ হয় ও মৃত্যুতে তাহার শেষ হয়, ঠিক তেমনি মনের সাধারণ উপাদান হইতে চেতনা গঠিত হইয়া জন্মে তাহার আরম্ভ এবং মৃত্যুতে তাহার শেষ হইতে পারে। এখানেও যে অদ্বয় তত্ত্ব মায়া বা অন্য শক্তি দ্বারা উপাদান-সকল সৃষ্টি করে তাহাই একমাত্র সত্য ও শাশ্বতবস্তু, ইহাদের কোন মত* অনুসারে জীবাত্মা যে জন্মান্তর গ্রহণ করে এ-মত স্বাভাবিক বা অপরিহার্য্য সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিবাব প্রয়োজন নাই।

কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা এই দর্শন সমূহের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাই কেননা দেখিতে পাই প্রাচীন মতবাদ দুইটি জন্মান্তরবাদকে বিশ্বক্রিয়াধারার অংশ রূপে স্বীকার করে কিন্তু আধুনিক মত তাহা করেনা। আধুনিক চিন্তা-ধারা আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপ জড়দেহ লইয়া বিচার আরম্ভ করে এবং এই জড়বিশ্ব ছাড়া অন্য কোন জগতেব বাস্তবতা স্বীকার কবেনা। এ মত দেখে যে এজগতে মনোময় চেতনা জীবন্ত দেহের সহিত সর্ব্বদা জড়ীভূত থাকে ; জন্মের পূর্ব্বে তাহার ব্যক্তিগত কোন সত্তা ছিল ইহা বুঝিতে পারা যায় এমন কোন চিহ্ন তাহার জন্মের সময় দেখা যায়না অথবা মৃত্যুর সময় এমন কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না যাহাতে বুঝা যাইবে সে মৃত্যর পরে তাহার ব্যক্তি-সত্তা থাকিবে। দেখা যায় যে জন্মের পূর্ব্বে প্রাণের বীজ সঙ্গে লইয়া জড়শক্তি অথবা বড় জোর প্রাণশক্তির এক বীর্য্য বর্ত্তমান ছিল ; পিতামাতার দেওয়া বীজের মধ্য দিয়া এই প্রাণশক্তি সন্তানে সঞ্চারিত হয়, কোন এক রহস্যময় উপায়ে এই প্রাণশক্তি সন্তানের সেই অতি ক্ষুদ্র আধারে অতীত কালে যাহা পরিস্ফুরিত হইয়াছে এমন কোন শক্তি বা ভাব সংক্রামিত করে এবং এইরূপ অদ্ভুতভাবে সৃষ্ট নতন ব্যক্তি-

* অবশ্য বৌদ্ধমতে জন্মান্তর অবশ্যম্ভাবী, কেননা কর্ম্মের তাহা অপরিহার্য্য পরিণাম, কিন্তু কর্ম্মই আপাত প্রবহমান চেতনার যোগসূত্র রক্ষা করিতেছে, আত্মা নয়, কেননা চেতনা ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তর গ্রহণ করে, চেতনার একটা আপাতিক নিরবচ্ছিন্নতা আছে কিন্তু সত্য কোন অমর আত্মা জন্ম গ্রহণ করে না অথবা দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়া অন্য কোন দেহে গিয়া পুনরায় জন্মে না।

সত্তার মনে এবং দেহে বিশিষ্ট মনোময় বা অন্নময় ছাপ দেয়। মৃত্যুর পরেও সেই একই জড়শক্তি বা প্রাণশক্তি বীজের মধ্যদিয়া সন্তানে সংক্রামিত হইয়া বর্ত্তমান থাকে এবং নূতন অন্নময় ও মনোময় জীবনে সে বীজের আরও স্ফূরণ ও পুষ্টি হয়। অপরের মধ্যে আমরা যাহা সংক্রামিত করিয়া যাইতে পারি তাহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা ; অথবা যে শক্তি জন্মের পূর্ব্বে এবং তখনকার পারিপার্শ্বিক ক্রিয়ার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া জন্ম এবং সেই সময়ের পরিবেশেব মধ্য দিয়া আমাদের ব্যষ্টি সত্তাকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, সেই শক্তি মৃত্যুব পর আমাদের জীবন এবং কর্ম্মের পরিণাম হইতে যেটুকু তাহার ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার জন্য গ্রহণ বা রক্ষা করে তাহাই শুধু থাকিয়া যায় ; ঘটনাক্রমে অথবা জড় জগতের বিধানানুসারে অন্য ব্যষ্টিসত্তার মন বা প্রাণময় উপাদান এবং পরিবেশ গঠনের জন্য যাহা ব্যবহৃত হইতে পারে আমাদের কেবল ততটুকুর থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। অন্ন ও মনোময় প্রতিভাসের পশ্চাতে হয়ত এক বিশ্বপ্রাণ আছে আমরা যাহার ব্যষ্টিভাবাপন্ন পরিণামশীল প্রাতিভাসিক সম্ভূতি। এই বিশ্বপ্রাণ একটা বাস্তব জগৎ এবং বাস্তব প্রাণীবৃন্দ সৃষ্টি করিতেছে কিন্তু এই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যে সচেতন ব্যক্তি ভাব তাহা এক নিত্যবস্তুর এমন কি নিত্যানুবৃত্ত জীবাত্মার বা জড়াতীত কোন পুরুষের রূপায়ণ অথবা চিহ্ন নয়, অন্ততঃপক্ষে সেইরূপ হইবার কোন প্রয়োজন নাই ; অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই সূত্র বা মতের মধ্যে এমন কিছু নাই যাহার জন্য মৃত্যুর পরেও বর্ত্তমান থাকিবে এমন কোন চৈত্যসত্তার কথা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতে হইবে। এমতে বিশ্বব্যাপারের পরিকল্পনার অংশরূপে জন্মান্তরবাদের বিশেষ কোন স্থান নাই, তাহার অনুকূলে কোন যুক্তিও নাই।

শুধু জড় সত্তা এবং জড় জগৎ লইয়া আলোচনা করিয়া আমরা প্রথমে স্বভাবতঃ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলাম যে আমাদের মনোময় বা চৈত্যসত্তা সম্পূর্ণরূপে দেহের উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে নানা গবেষণা এবং আবিষ্কার হইতে মনে হইতেছে যে মনোময় বা চৈত্যসত্তা প্রকৃতপক্ষে দেহের উপর ততটা নির্ভরশীল নয়। আবার মানুষের ব্যক্তিসত্তা দেহের মৃত্যুর পর বাঁচিয়া থাকে এবং এইলোক ও অন্যলোক-সমূহের মধ্যে যাতায়াত করে ইহা যদি দেখা যায় তাহা হইলে এই প্রথম সিদ্ধান্ত আর কি করিয়া টিকিয়া থাকে ? তখন সচেতন ব্যক্তিসত্তা অল্পকাল স্থায়ী এবং দেহাবচ্ছিন্ন, আধুনিক মনের এই সিদ্ধান্তকে উদারতর করিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে

যে জীবনের পক্ষে জড় জগৎ অপেক্ষা বিস্তৃততর ক্ষেত্র আছে, এবং জড় দেহের উপর নির্ভরশীল নয় এমন এক ব্যক্তিসত্তা আছে। সূক্ষ্মরূপ বা সূক্ষ্মদেহ-ধারী এক চৈত্যসত্তা আছে প্রাচীনগণের এই সিদ্ধান্তই হয়ত তখন কার্য্যতঃ আমাদিগকে পুনরায় স্বীকার করিতে হইবে। বলিতে হইবে যে মনোময় চেতনাকে সঙ্গে লইয়া এক চৈত্যসত্তা বা অন্তরাত্মা মৃত্যুর পরও সূক্ষ্ম এবং স্থায়ীভাবে বর্ত্তমান থাকিবে কিন্তু এতদূর পর্য্যন্ত মানিতে যদি না পারি, যদি সেরূপ কোন অনাদি জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে না-ও পারি, তবু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উন্মিষিত এবং স্থায়ী এক মনোময় ব্যষ্টিসত্তা এই সূক্ষ্ম দেহে মৃত্যুর পরে বর্ত্তমান থাকে, যে সূক্ষ্মদেহ জন্মের পূর্ব্বে বা জন্মের দ্বারা অথবা জীবদ্দশায় সৃষ্ট হইয়াছে। কারণ এ ক্ষেত্রে স্বীকার করিতে হইবে যে, হয় এক চৈত্য সত্তা জন্মের পূর্ব্বে অন্য কোন লোকে সূক্ষ্মরূপে বর্তমান থাকে এবং তথা হইতে এই জগতে কিছু দিনের জন্য বাস করিতে আসে, না হয় এই জড় জগতেই অন্তরাত্মা নিজেকে গড়িয়া তোলে এবং প্রাকৃতিক নিয়ম বশে তাহার সঙ্গে একটা চৈত্য দেহও সৃষ্ট হয় এবং সক্ষ্ম দেহধারী এই জীবাত্মা মৃত্যুর পরও অন্য লোকে বর্ত্তমান থাকে অথবা এই জগতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। তাহা হইলে এই দুই সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের কোন একটিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

আবার এমনও হইতে পারে যে মানুষী দেহে প্রবেশ করিবার পর্ব্বে হয়ত বর্দ্ধিষ্ণু এক ব্যক্তিভাব জগতের মধ্যেই পরিণামশীল এক বিশ্বপ্রাণ দ্বারা গঠিত হইয়াছিল ; আমাদের অন্তরাত্মা মানুষ সৃষ্টির পূর্ব্বে হয়ত নিম্নতর প্রাণীর মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত ও পরিণত হইয়া আসিয়াছে। সে ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তি-সত্তা পূর্ব্বে পশু দেহের অধিবাসী ছিল ; জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া যে যে বাহ্য জড় রূপকে সে গ্রহণ করিয়াছে তাহার সূক্ষ্ম দেহ তদনুরূপ পরিবর্ত্তন স্বীকার করিবার সাবলীলতা লইয়া সকল জন্মের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছে। অথবা পরিণামশীল প্রাণ যখন মানুষের দেহ গঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে কেবল তখনই হয়ত তাহার মধ্যেই মৃত্যুর পরেও বর্ত্তমান থাকিতে পারে এরূপ ব্যক্তিসত্তা গড়িতে পারিয়াছে। মানুষে আসিয়া মনশ্চেতনার হঠাৎ উপচয় বা বিবৃদ্ধির ফলে ইহা ঘটিতে পারে এবং সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম মনোময় উপাদানে রচিত একটা কোষ (sheath) গঠিত হইয়া উঠিতে পারে, যাহা এই মনশ্চেতনার মধ্যে একটা ব্যষ্টি ব্যক্তিভাব ফুটাইতে সাহায্য করে এবং তাহার অন্তরের ব্যক্তি-

সত্তার সূক্ষ্ম দেহরূপে কাজ করে ; ঠিক যেমন স্থূল জড় রূপ গঠিত হইয়া পশুর মন এবং প্রাণের আধার হইয়া উঠে এবং পশু চেতনায় একটা ব্যষ্টি ভাব বা বৈশিষ্ট্য দান করে। এই দুই সিদ্ধান্তের প্রথমটি মানিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, জড় দেহ ধ্বংস হইলেও পশু বর্ত্তমান থাকিতে পারে, মানুষের জীবাত্মার মত তাহার আত্মারও একপ্রকার রূপায়ণ আছে যাহা মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতেই অন্য জন্তু-দেহ অধিকার করে এবং অবশেষে পরিণতি বশে মানুষের দেহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। কেননা যতদিন পর্য্যন্ত সে মানুষজন্মের অধিকার না পায় ততদিন পশুর আত্মা যে পৃথিবী ছাড়াইয়া অন্য কোন লোকে অথবা জড়ভূমি অতিক্রম করিয়া অন্য কোন ভূমিতে যাইবে এবং তথা হইতে সর্ব্বদা এখনে ফিরিয়া আসিবে তাহার অতি অল্প সম্ভাবনাই আছে ; পশুর মধ্যে সেটুকু ব্যষ্টি-চেতনা ফুটিয়াছে তাহার পক্ষে এরূপ লোকান্তর গমনের ধাক্কা সহ্য অথবা অন্যলোকের জীবনে নিজেকে অভ্যস্ত করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে জড়দেহের মৃত্যুর পর অন্য অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিবার সামর্থ্য পরিণতি পথে মানুষের ধাপে পৌঁছলে শুধু লাভ হইতে পারে। যদি জীবাত্মা প্রাণপরিণামের ফলে গঠিত এক ব্যক্তিসত্তা না হয়, পার্থিব জীবন এবং দেহ যাহার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র এমন এক স্থায়ী অপরিণামী সত্যবস্তু যদি হয় তাহা হইলে জন্মান্তরবাদ পিথাগোরাসের (Pythagoras) দেহান্তর-সংক্রমণবাদের অনুরূপ হয়। কিন্তু জীবাত্মা যদি পার্থিব অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ পরিণতিশীল স্থায়ী সত্তা হয় তাহা হইলে জীবাত্মা মৃত্যুর পর অন্যলোকে গমন এবং পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া জন্মান্তর গ্রহণ করে এই ভারতীয় সিদ্ধান্ত সম্ভব এবং অনেকটা নিশ্চিত মনে হয় ; কিন্তু শুধু এই জন্য জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে না ; কেননা ইহাও মনে করা যাইতে পারি যে মানুষের ব্যক্তিসত্তা একবার লোকান্তর গমন করিতে পারিলে তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার আর কোন প্রয়োজন থাকে না ; বাধ্য করিয়া ফিরাইয়া আনিবার কোন প্রবল শক্তি না থাকাতে যে উচ্চতর ভূমিতে সে পৌঁছিয়াছে সেইখান হইতেই স্বাভাবিকভাবে তাহার প্রগতির পথে সে অগ্রসর হইতে পারে ; ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে পার্থিব প্রাণের পরিণতি তাহার পক্ষে শেষ হইযাছে। জীবাত্মা লোকান্তরে গিয়াও আবার ফিরিয়া আসিয়াছে ইহার যদি বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে এক বৃহত্তর ধারণাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হই, সেক্ষেত্রে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসা

এবং মানুষের রূপে জীবাত্মার পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ স্বীকার করাও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

জন্মান্তরবাদকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রাণপরিণামবাদ স্বীকার করিলেও সে সিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হইয়া উঠে না, তাহাতে জীবাত্মার বাস্তব অস্তিত্ব অথবা তাহার অমরত্ব বা নিত্যত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। তখনও ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্বপ্রাণের এক প্রাতিভাসিক সৃষ্টি বলা যাইতে পারে, প্রাণচেতনার সঙ্গে জড় রূপ এবং জড়শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতেই তাহা আবির্ভূত হইয়াছে; কেবল এ উভয়ের পরস্পরের উপর ক্রিয়াধারা আরও ব্যাপক আরও বিচিত্র এবং আরও সূক্ষ্ম এবং তাহার ইতিহাস আমরা পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি তাহা হইতে ভিন্ন। এমন কি ইহা হইতে এক ধরণের বৌদ্ধ প্রাণবাদে পৌঁছিতে পারি, তাহাতে কর্ম্ম স্বীকৃত হইবে কিন্তু কর্ম্ম বিশ্বপ্রাণশক্তির ক্রিয়া মাত্র বলিয়া ধরা হইবে; এই মতে ইহা স্বীকৃত হইবে যে কর্ম্মের ফলে ব্যক্তিসত্তার একটা প্রবাহ মনোময় ভাবধারার বলে জন্ম হইতে জন্মান্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে কিন্তু তথাপি সদা ক্রিয়াশীল প্রাণময় এই সম্ভূতি ছাড়া ব্যষ্টির কোন সত্য আত্মা বা শাশ্বত সত্তা আছে তাহা স্বীকৃত না হইতে পারে। পক্ষান্তরে যে নূতন চিন্তাধারা বর্ত্তমানে কতকটা শক্তি সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা অনুসরণ করিয়া স্বীকৃত হইতে পারে যে এক সর্ব্বগত বিশ্বপুরুষই মূল সত্য বস্তু এবং প্রাণ তাহার স্বরূপ-শক্তি বা প্রতিনিধি, এইভাবে আমরা এক আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন প্রাণাদ্বৈতবাদে পৌঁছিতে পারি। এই সিদ্ধান্ত অনুসারেও জন্মান্তর সম্ভব হইতে পারে কিন্তু অপরিহার্য্য নহে; এমতে জন্মান্তর একটা প্রাতিভাসিক তথ্য, জীবনের বাস্তব এক বিধান হইতে পারে কিন্তু সত্তা সম্বন্ধীয় মতবাদের যুক্তিযুক্ত ফল বা অপরিহার্য্য পরিণাম হইবে না।

বৌদ্ধধর্ম্মের মত মায়াবাদীর অদ্বৈতবাদও প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত প্রচলিত কতকগুলি বিশ্বাস মানিয়া লইয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছে, ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে জড়াতীত ভূমি এবং জগৎসকল বিদ্যমান আছে, আমাদের জগতের সঙ্গে তাহাদের কারবার চলে, তজ্জন্য পৃথিবী হইতে তথায় পৌঁছিবার পথও নির্ণীত হইয়াছিল এবং মানুষ মৃত্যুর পরে ঐ সমস্ত লোকে গিয়া আবার তথা হইতে ফিরিয়া আসে, এই ফিরিয়া আসিবার তথ্যটি হয়ত খুব প্রাচীন আবিষ্কার না হইতেও পারে। অন্ততঃপক্ষে মানুষের ব্যক্তিসত্তা জড়-জগতের অনুভূতির সীমার মধ্যে বদ্ধ নয়, জন্মের পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল

এবং মৃত্যুর পরও থাকিবে এমন একটা প্রাচীন ধারণা, এমন কি একটা অনুভূতি তাহাদের ভাবনার পশ্চাতে ছিল, অন্ততঃপক্ষে বহুযুগ হইতে এরূপ একটা ঐতিহ্য নিশ্চয়ই চলিয়া আসিতেছিল, কেননা জড়োত্তর চৈতন্যই মৌলিক তত্ত্ব, জড়সত্তা তাহার আশ্রিত একটা গৌণ ব্যাপার; পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া আত্মা এবং জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের মতবাদ গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। এই সব তথ্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদিগকে শাশ্বত সত্য বস্তুর প্রকৃতি এবং সম্ভূতির প্রতিভাসের মূল নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। সুতরাং ব্যক্তিসত্তার এ জগৎ হইতে অন্য জগতে গমন এবং তথা হইতে পার্থিব জগতে ফিরিয়া আসিয়া জন্মগ্রহণ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল; কিন্তু বৌদ্ধমতে পুনর্জন্ম স্বীকৃত হইলেও কোন চিন্ময় সত্য পুরুষ যে জড় জগতের রূপরাজির মধ্যে সত্যই জন্মগ্রহণ করেন ইহা তাঁহারা মানিতেন না। পরবর্ত্তী যুগের অদ্বৈতবাদ চিন্ময় সত্য বস্তুকে মানিয়াও তাহার ব্যষ্টি বা জীব ভাবকে প্রাতিভাসিক বলিয়াছে; সুতরাং সে মতে জন্ম এবং জন্মান্তর এ উভয়ই বিশ্বভ্রান্তির অংশ, বিশ্বমায়ার গড়া একটি ছলনা, যদিও তাহা কার্য্যকরী।

বৌদ্ধেরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে জন্মান্তরের অর্থ শুধু হইবে ভাবনা, সংবেদন এবং ক্রিয়ার একটা প্রবাহ মাত্র, এই প্রবাহ দ্বারা এক মিথ্যা ব্যক্তিসত্তার বোধ জাগে এবং আমরা মনে করি এই ব্যক্তিসত্তা লোক লোকান্তরে বিচরণ করে; আমরা বলিতে পারি যে লোক-সকলও ভাবনা এবং সংবেদনের বিভিন্ন শৃঙ্খলাবদ্ধ ভূমি ছাড়া আর কিছু নয়; কেন না বস্তুতঃ চেতনার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহই আত্মা এবং ব্যক্তিসত্তার একটা প্রতিভাস সৃষ্টি করে। মায়াবাদীরা ব্যষ্টিসত্তারূপী জীবাত্মাকে স্বীকার করেন, এমন কি ব্যষ্টি জীবের* একটা সত্য আত্মা আছে ইহাও মানেন, সাধারণের ভাব ও ভাষায় এই যেটুকু তাঁহারা স্বীকার করেন তাহাও কেবল বাহ্যতঃ স্বীকার। কেননা দেখা যায় তাঁহারা সত্য ও শাশ্বত কোন ব্যষ্টি সত্তা মানেন না; তাঁহাদের মতে 'আমি'ও নাই 'তুমি'ও নাই; সুতরাং ব্যষ্টিজীবের কোন সত্য আত্মা থাকিতে

* এই মতে আত্মা এক, বহু নহেন, এবং বহু হইতে বা নিজেকে বহুগুণিত করিতে পারেন না। সুতরাং কোন খাঁটি জীব-ব্যক্তি থাকিতে পারে না, বড় জোর কেবল বলা চলে যে এক সর্ব্বগত আত্মা আছেন যিনি প্রত্যেক মন এবং দেহকে এক 'অহং' দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন।

পারে না ; এমন কি সত্য কোন বিশ্বাত্মাও নাই কেবল বিশ্বাতীত এক আত্মা আছেন যিনি অজ নির্বিকার, প্রতিভাসের বিকার বা পরিবর্ত্তন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা, এমতে জন্ম জীবন ও মৃত্যু, ব্যক্তিগত এবং বিশ্বগত সমস্ত অনুভব শেষ পর্য্যন্ত ক্ষণিক প্রতিভাস বা ভ্রান্তি হইয়া দাঁড়ায় ; এমন কি বন্ধন এবং মুক্তিও কালের ক্ষেত্রে একটা অস্থায়ী প্রতিভাস এবং বিশ্বভ্রান্তির এক অংশ ; এক মহাভ্রান্তি হইতে জাত হইয়াছে যে অহং তাহার ভ্রান্তিপূর্ণ অনুভূতির ধারা যতদিন সচেতনভাবে চলিতে থাকে ততদিনই বন্ধন, এই ধারা ছিন্ন করিয়া অহং চেতনা যখন তৎস্বরূপের অতিচেতনায় লয় পায় তখন মুক্তি হয় ; বস্তুতঃ একমাত্র সেই তৎস্বরূপ ছাড়া আর কিছু নাই ; একমাত্র তাহাই ছিল, আছে এবং চিরকাল থাকিবে অথবা ইহা বলিতে গেলেও কালের একটা ধারণা আসিয়া পড়ে, কিন্তু কালের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা নিত্য কালাতীত, অজ এবং অনির্ব্বাচ্য।

প্রাণাদ্বৈতবাদে তবু একটা সত্য বিশ্ব আছে, ব্যষ্টিজীবের জীবন ক্ষণস্থায়ী সম্ভূতি হইলেও সত্য ; চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে এমন কোন পুরুষের অস্তিত্ব না মানিলেও সেমত ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা স্বীকার করে কেননা তাহারা সত্য এবং সম্ভূতিব মধ্যে সত্য ভাবেই কার্য্যকরী ; কিন্তু মায়াবাদের মধ্যে এ সমস্তের কোন সত্য প্রয়োজনীয়তা বা সত্য কার্য্যকারিতা নাই ; তাহারা স্বপ্নগত পরিণামের মত অবাস্তব কিছু। এমন কি মায়াকে চিনিতে পারিলে এবং ব্যষ্টি মন এবং দেহের বিলয় সাধন করিলে যে মুক্তি হয়, তাহাও ঘটে শুধু বিশ্বস্বপ্ন এবং বিশ্বভ্রান্তির মধ্যে, বস্তুতঃ কেহ বদ্ধ হয় নাই, কেহ মুক্ত হয়না, কেননা একমাত্র যাহা শুধু বর্ত্তমান আছে সেই ব্রহ্মকে অহং-কল্পিত এই সমস্ত ভ্রান্তি স্পর্শ করিতে পারেনা। এ মতের যুক্তিযুক্ত পরিণাম হইবে এক সর্ব্বধ্বংসকর বন্ধ্যাত্ব বা নিষ্ফলতা, তাহা হইতে পলায়নের জন্য বস্তুত যতই পরিণামে মিথ্যা হউক না কেন, জীব জগৎকে এই স্বপ্ন পরিণামকে ব্যবহারিকভাবে সত্য বলিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে এবং আমাদের ব্যষ্টিসত্তার বন্ধন ও মুক্তিকে খুব বড় করিয়া দেখিতে হইবে, যদিও জানি ব্যষ্টিসত্তার জীবন কেবল প্রাতিভাসিকভাবে সত্য, একমাত্র অদ্বয় সত্য আত্মাতে বন্ধন বা মুক্তি নাই, থাকিতে পারেনা। এইভাবে মায়ার ভ্রান্তিজাত যে অত্যাচার স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি তাহার মধ্য হইতে জীবনের লয় করিবার জন্য, ব্যষ্টিসত্তার বিলোপ সাধনের জন্য, বিশ্বভ্রান্তি দূর করিবার

জন্য জীবন এবং তাহার অভিজ্ঞতা দ্বারা যতটুকু প্রস্তুত হইতে পারি তাহাই হইবে জীবনের একমাত্র সত্য তাৎপর্য্য।

অবশ্য এই মায়াবাদ অদ্বৈতবাদের এক চরম কোটি, যে প্রাচীনতর অদ্বৈত-বাদ উপনিষদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা এতদূর পর্য্যন্ত যায় না। শাশ্বত বস্তুই যে কালের ক্ষেত্রে বাস্তব সম্ভূতিরূপে রূপায়িত হইতেছে সুতরাং জগৎ সত্য, উপনিষদ তাহা স্বীকার করে; এমতে ব্যষ্টিসত্তাও প্রচুর পরিমাণে সত্য, কেন না প্রত্যেক ব্যষ্টি ব্যক্তি নিজ স্বরূপে সেই শাশ্বত সত্য বস্তু, সেই শাশ্বত বস্তুই তাহার মধ্য দিয়া নামরূপ গ্রহণ করিয়াছে, এবং বিসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আবর্ত্তিত জন্ম বা ভবচক্রের উপরিস্থিত জীবনের সকল অনুভূতি ব্যষ্টি সত্তার মধ্য দিয়াই ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দুইটি বস্তু ভবচক্রকে আবর্ত্তিত রাখিয়াছে, প্রথমটি ব্যষ্টিজীবের কামনা যাহা জন্মান্তরের কার্য্যকরী কারণ, দ্বিতীয়টি শাশ্বত আত্মার জ্ঞান হইতে পরাঙ্‌মুখ হইয়া কালের ক্ষেত্রে সম্ভূতিতে চিত্তের নিমগ্ন ও অভিনিবিষ্ট হওয়া। এই কামনা এবং এই অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া ব্যষ্টির মধ্যে যে শাশ্বত সত্তা আছেন তিনি ব্যষ্টি ভাবনা এবং ব্যষ্টি অনুভবের নানা পরিবর্ত্তন হইতে আপনাকে প্রত্যাহৃত করিয়া নিজের কালাতীত, নৈর্ব-ক্তিক অক্ষর সত্তায় নিজেকে সমাহিত করেন।

কিন্তু ব্যষ্টি সত্তা শুধু সাময়িক ভাবে সত্য, তাহার কোন স্থায়ী ভিত্তি নাই, এমন কি কাল প্রবাহের মধ্যে তাহার নিত্য আবর্ত্তনও নাই। বিশ্বের এই পরিচয়ের মধ্যে জন্মান্তরকে একটা গুরুত্বপূণ বাস্তব ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে বটে কিন্তু ইহাতে ব্যষ্টি ভাব এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহাতে জন্মান্তর অপরিহার্য্য হইয়া উঠে নাই। কেন না এমতে শাশ্বত ব্রহ্মের ইচ্ছা ছাড়া জগৎ-সৃষ্টির আর কোন উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না, যেমন তাহার ইচ্ছায় সৃষ্টি তেমনি সে ইচ্ছা সংহৃত হইলে সৃষ্টিরও শেষ; জন্মান্তর বা ব্যষ্টি সত্তার পক্ষে জগৎকে বজায় রাখিবার বাসনা ছাড়াও বিশ্বপুরুষের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে; ব্যষ্টি সত্তার বাসনা জগৎ যন্ত্রের ক্রিয়াসাধক একটা অংশ হইতে পারে, বিশ্বের অস্তিত্বের কারণ বা অপরিহার্য্য নিমিত্ত (condition) হইতে পারে না, কেননা এমতে ব্যষ্টিব্যক্তি সৃষ্টিরই একটা পরিণাম, সম্ভূতির পূর্ব্বে তাহার কোন অস্তিত্বই ছিল না। প্রত্যেক নামরূপের মধ্যে ব্যক্তিত্বের একটা সাময়িক রূপায়ণ দ্বারা অথবা বহু অস্থায়ী ব্যষ্টি ব্যক্তির প্রত্যেককে একটি মাত্র জীবনের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়া ব্রহ্মের সৃষ্টি-সংকল্প সাধক হইতে

পারে। অবশ্য প্রত্যেক সৃষ্ট সত্তার অনুরূপভাবে অখণ্ড চৈতন্যের আত্মরূপায়ণ চলিবে কিন্তু সেই রূপায়ণ প্রতি ব্যষ্টি দেহে জড় রূপের আবির্ভাবে আরব্ধ হইতে এবং তাহার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়া যাইতে পারে। যেমন সমুদ্র সর্ব্বদা এক* থাকিলেও তাহাতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতে পারে, তদ্রূপ ব্যষ্টিসত্তা একের পর অন্যে আসিয়া পড়িতে পারে, সচেতন সত্তার এক রূপায়ণ বিশ্বচেতনার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত তরঙ্গের মত উঠা নামা করিয়া চলিতে থাকিবে তাহার পব সে আবার নৈঃশব্দ্যের মধ্যে পুনরায় ডুবিয়া যাইতে পারে। এমতে একই ব্যষ্টি চেতনা নামের পর নাম, রূপের পর রূপ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন লোকে যাইতেছে এবং আসিতেছে ইহা স্বীকার করিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না, সম্ভাবনারূপেও গ্রহণ করিবার কোন অপরিহার্য্য প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু প্রগতির পথে এক রূপ হইতে উর্দ্ধ্বতর রূপে পৌঁছান যদি জীবের অপরিহার্য্য নিয়তি হয় তাহা হইলে জন্মান্তরবাদের সত্যকার সার্থকতা আমরা খুঁজিয়া পাই, তখন জড়ের মধ্যে চিদ্বস্তুর সংবৃতি এবং বিবৃতিই হয় পার্থিব জীবলীলাব যথার্থ তাৎপর্য্য এবং জন্মান্তর দ্বারাই ইহা স্বাভাবিক ভাবে সাধিত হয়; কিন্তু পূর্ব্বের মতবাদে বিবৃতি বা পরিণতির সেরূপ কোন প্রয়োজন নাই, তাই তাহার পক্ষে জন্মান্তরবাদের অপরিহার্য্যতা আরও স্বল্প হইয়া পড়ে।

এরূপ ধারণা করা যাইতে পারে যে সেই নিত্য চিন্ময় পুরুষ জীবদেহের মধ্যে নিজেকে প্রকট করিতে অথবা বরং লুকাইতে চাহিয়াছেন; তিনি হয়ত ব্যষ্টিরূপ গ্রহণ করিয়া জন্ম হইতে মৃত্যু এবং মৃত্যু হইতে নূতন জন্মের মধ্য দিয়া মানুষ এবং পশুরূপে সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ জগতে আসিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যিনি অদ্বয় সদ্বস্তু তিনি নিজের খেয়াল খুশীতে ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করিয়া অথবা

* Dr. Schweitzer ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন যে ইহাই উপনিষদের শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য; জন্মান্তরবাদ পরের যুগের আবিষ্কার। কিন্তু প্রায় সকল উপনিষদের বহু গুরুত্বপূর্ণ উক্তির মধ্যে জন্মান্তরের কথা অতি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে দেখা যায়; অন্তত, উপনিষদ স্বীকার করিয়াছে যে মৃত্যুর পর ব্যষ্টি সত্তা বর্ত্তমান থাকে এবং অন্য জগতে গমন করে—এ উক্তির সহিত উপরিউক্ত ব্যাখ্যার মিল হয় না। এখানকার শরীরী জীবের পক্ষে লোকান্তরে যদি গতি ও স্থিতি সম্ভব হয় এবং ব্রহ্মের মধ্যে মুক্তি লাভ যদি দেহধারী আত্মার নিয়তি হয় তাহা হইলে জন্মান্তরবাদ আসিয়া পড়ে, সুতরাং তাহা পরবর্ত্তী যুগের আবিষ্কার একথা বলিবার কোন কারণ নাই। লেখক এখানে স্পষ্টই পাশ্চাত্য দর্শনের সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন তাই প্রাচীন বেদান্তের অধিকতর সূক্ষ্ম ও জটিল ভাবনার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মবাদের (pantheism) ছায়াই শুধু দেখিয়াছেন।

কর্ম্মফলের কোন বিধান মানিয়া সম্ভূতির নানা রূপ ধারণ করিয়া চলেন, অবশেষে চলার শেষে এক চিন্ময় আলোকে আলোকিত হইয়া ব্যষ্টিভাবের বিশিষ্ট রূপায়ণ হইতে তাহার এক এবং অদ্বিতীয় স্বরূপসত্তায় ফিরিয়া যান। কিন্তু এই চক্রাবর্ত্তনের আদিতে বা অন্তে এমন কোন উদ্দেশ্যমূলক সত্য দেখিতে পাই না যাহার জন্য ইহার সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারি। ইহার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তার কোন কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইনা ; কেবল বলিতে পারি ইহা শুধু তাহার খেলা তাহার লীলা। কিন্তু যদি একবার স্বীকার করা যায় যে চিদ্বস্তু নিজেকে নিশ্চেতনার মধ্যে সংবৃত করিয়াছেন এবং পরিণামের নানা স্তরের মধ্য দিয়া ব্যষ্টিরূপে নিজেকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন তাহা হইলে সমস্ত ক্রিয়াধারার একটা তাৎপর্য ও সঙ্গতি পাওয়া যায়। ব্যষ্টি জীবের ক্রমোর্দ্ধ আরোহণ তখন বিশ্বলীলার মূল সুর বলিয়া বুঝা যায় ; জীবাত্মার দেহান্তরের মধ্যে পুনর্জন্ম সম্ভূতির সত্যের স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য পরিণাম এবং নৈসর্গিক বিধান হইয়া দাঁড়ায়। চিন্ময় পরিণামকে সিদ্ধ করিতে হইলে জীবাত্মার জন্মান্তর হইবে তাহার অপরিহার্য্য সাধনযন্ত্র ; জড় বিশ্বে এইভাবের প্রকাশের জন্য একমাত্র ইহাই সম্ভাবনার সার্থক নিমিত্ত এবং স্পষ্ট ক্রিয়াধারা।

জড়ের মধ্যে যে পরিণাম চলিতেছে আমরা তাহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি যে বিশ্ব পরম সত্যবস্তুর আত্মবিস্সৃষ্টির এক ধারা, চিৎসত্তাই সর্ব্ববস্তুর উপাদান ; বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহা চিদ্বস্তুর শক্তি, তাহার আত্মবিস্সৃষ্টির উপায় ও রূপাবলি। বিশ্বের বিচিত্র প্রতিভাসের পশ্চাতে অন্তর্গূঢ় হইয়া এক পরম সত্য বস্তু আছে তাহা এক অনন্ত সত্তা, এক অনন্ত চেতনা এক অনন্ত শক্তি ও সঙ্কল্প, এক অনন্ত আনন্দ ; তাঁহারই দিব্য অতিমানস বা পরা প্রজ্ঞা এই বিশ্বছন্দ রচনা করিয়াছে কিন্তু সে রচনা আমরা এখানে যাহাকে মন প্রাণ এবং জড় বলিয়া জানি, নিজেরই সেই তিন গৌণ এবং সীমাবিধায়ক বিভূতির সাহায্যে করা হইয়াছে। সংবৃতিতে নিচের দিকে ডুবিয়া নিজেকে সঙ্কুচিত করিবার নিম্নতম অবস্থা হইতেছে জড়বিশ্ব, এখানে সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ অখণ্ড সত্যবস্তু নিজেকে সংবৃত করিয়া নিজেরই আপাত অচেতন এক রূপ ধারণ করিয়াছেন, যাহাকে আমরা নিশ্চেতন বলি ; কিন্তু এই নিশ্চেতনা হইতে সেই সৃষ্ট সত্তা পরিণামের ধারা ধরিয়া আবার তাহার আত্মজ্ঞান লাভ করিবে ইহা প্রথম হইতেই অপরিহার্য্য ছিল। অপরিহার্য্য এই জন্য যে যাহা সংবৃত হইয়াছে তাহার বিবৃতি অবশ্যম্ভাবী ; কেন না সেখানে তাহার যে কেবল

অস্তিত্ব আছে, এই আপাত বিরোধী বস্তুর মধ্যে তাহা যে শুধু এক গোপন শক্তি-রূপে আছে তাহা নহে, বস্তুত ঐ রূপ প্রত্যেক শক্তির অন্তরতম প্রকৃতি হইতেছে নিজেকে আবিষ্কার নিজের আত্মপ্রকাশ করা, খেলার বা লীলার মধ্যে প্রকাশ পাওয়া ; এমন কি যাহা তাহাকে গোপন করিতেছে ইহাই তাহারও মর্ম্ম সত্য, এই নিশ্চেতনা যাহা হারাইয়া বসিয়াছে তাহা তাহার নিজের আত্মা, তাই তাহাকে খোঁজা বা পুনরায় লাভ করাই নিশ্চেতনার সকল গূঢ় তাৎপর্য্য এবং তাহার সকল ক্রিয়াব এক নিত্য বর্ত্তমান লক্ষ্য। এই ফিরিয়া পাওয়া সচেতন ব্যষ্টি সত্তার মধ্য দিয়াই সম্ভব হয় ; তাহার মধ্যেই উন্মিষন্ত চেতনা গঠিত এবং ছন্দময় হইতে থাকে, ব্যষ্টি চেতনাই নিজের সত্যে পূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিতে সমথ হইয়া উঠে। বিশ্বে ব্যষ্টি চেতনার প্রকাশ অতি বড় প্রয়োজনীয় বস্তু, মানুষ যেমন পরিণতির পথে পর্ব্বে পর্ব্বে উর্দ্ধারোহণ করিতে থাকে এই প্রয়োজনীয়িতা তত বেশী বাড়িতে থাকে ; জড়বিশ্বে পবিণামধারা যখন প্রথম চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন তাহাতে চেতনা ছিল না, বৈশিষ্ট্যহীন নিশ্চেতনার মধ্যে কোন ব্যষ্টি সত্তা ছিল না, সেই বিশ্বে ব্যষ্টি সত্তার উদ্ভব এবং বিবৃদ্ধি এক অতি আশ্চর্য্য এবং গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাপার। জীবের এই গৌরব এই মর্য্যাদা সার্থক হয় বা সমর্থন করা যায় যদি ব্যষ্টিরূপে স্থিত আত্মা বিশ্বাত্মা বা বিশ্বপুরুষের মতই সত্যবস্তু হয় এবং এই উভয়েই যদি শাশ্বত পরম সত্য বস্তুর শক্তি বা বিভূতি হয়। কেবল যদি তাহাই হয় তাহা হইলে জীবের পুষ্টি এবং তাহার আত্মোপলব্ধি বিশ্বাত্মা ও বিশ্বচেতনা এবং বিশ্বাতীত পরম সত্যবস্তুর উপলব্ধির অপরিহার্য্য সাধন ও হেতু বলিয়া কেন বিবেচিত হয় তাহা বুঝিতে পারি। যদি আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাহা হইলে তাহার প্রথম ফল রূপে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে জীব সত্য এবং সনাতন বস্তু, এই সিদ্ধান্ত হইতে আবার জন্মান্তরবাদ স্বীকৃতিরূপ অন্য অনুসিদ্ধান্ত পাই ; তখন কোন না কোন প্রকারে জন্মান্তর আছে এ মত আমরা গ্রহণ করিতে পারি বা নাপারি এমন সন্দেহাকুল ভাব আর থাকেনা, আমাদের সত্তার মূল প্রকৃতির পক্ষে ইহা প্রয়োজন বা অপরিহার্য্য পরিণাম হইয়া দাঁড়ায়।

কারণ চেতনার খেলাতে প্রত্যেক দেহে এক মিথ্যা বা সাময়িক ব্যষ্টি সত্তা সৃষ্ট হয় ইহা স্বীকার করা আর যথেষ্ট হইতে পারে না, এরূপ ধারণা পোষণ করা আর চলেনা যে ব্যষ্টি ভাব দৈহিক রূপের মধ্যে চৈতন্যের খেলার এমন এক আনুষঙ্গিক ব্যাপার যাহা রূপের ধ্বংসে ধ্বংস হইতে পারে, না হইতেও পারে,

দেহ হইতে দেহান্তরে জন্ম হইতে জন্মান্তরে যাহার কাল্পনিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার নিজের পক্ষে নিশ্চয়ই এ সমস্ত কিছুর প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে এ জগতে এক ব্যষ্টি সত্তার স্থান অন্য ব্যষ্টি সত্তা অধিকার করে, যেখানে কোন ধারাবাহিকতা নাই, রূপের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা বা ক্ষণস্থায়ী ব্যষ্টিভাব ধ্বংস হইয়া যায়; কেবল এক বিশ্বশক্তি বা কোন বিশ্বসত্তা চিরকাল বর্ত্তমান থাকে; মনে হয় ইহাই বিশ্ব-বিসৃষ্টির সমগ্র তত্ব। কিন্তু জীবকে যদি চিরস্থায়ী বা নিত্যানুবৃত্ত সত্য বস্তু বলিয়া জানি, সে যদি শাশ্বত ব্রহ্মের সনাতন অংশ বা শক্তি হয়, তাহার মধ্যে চেতনার পুষ্টি ও বিবৃদ্ধি দ্বারা যিনি চিৎস্বরূপ তিনি যদি আত্মপ্রকাশ করেন, তাহা হইলে বিশ্বলীলার একটা গভীরতর তাৎপর্য্য বোঝা যায় তখন দেখি আত্মসত্তার মধ্যে যিনি শাশ্বত পরম এক, তাহার সহিত শাশ্বত বহুর যে লীলা বা খেলা চলিতেছে জগৎ তাহার এক বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। তখন বুঝি আমাদের ব্যক্তি সত্তার সকল পরিবর্ত্তনের পশ্চাতে পরিবর্ত্তনের সকল ধারাকে ধারণ করিয়া নিশ্চয় বর্ত্তমান আছে এক সত্যপুরুষ এক শাশ্বত চিন্ময় জীবসত্তা। এক অদ্বয় সত্য বস্তু বিশ্বভাবনায় নিজেকে প্রসারিত করিয়া প্রত্যেক জীবের মধ্যে বাস এবং নিজেরই এই ব্যষ্টি সত্তার মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আবার ব্যষ্টিজীবে বিশ্বের সকলের সহিত একত্বানুভবে তিনি তাহার সমগ্র সত্তাকে প্রকট করেন। তাহার পর যাহার মধ্যে সমগ্র বিশ্ব একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্য বর্ত্তমান আছে, নিজের সেই বিশ্বাতীত ভাবকেও ব্যষ্টি জীবের চেতনাতেই প্রকাশ করেন। এই যে তিন রূপে আত্মপ্রকাশ, একের বহুরূপে এই যে বিরাট লীলা, এই যে অনির্ব্বচনীয় মায়া, অনন্তপুরুষের চিন্ময় সত্যের বহুরূপী এই যে অলৌকিক ব্যাপার ইহারই জ্যোতির্ম্ময় অভিব্যক্তি অনাদি নিশ্চেতনা হইতে পরিণামের ধারায় ধীরে ধীরে উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে।

সচ্চিদানন্দের এই জাগতিক খেলার মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রবৃত্তি ও আকূতি না থাকিয়া শুধু শাশ্বত এক লীলা-রস সম্ভোগের ইচ্ছা যদি থাকিত তাহা হইলে পরিণামধারা এবং জন্মান্তরের কোন আবশ্যক থাকিতনা; অবশ্য ইহা ঠিক যে চেতন সত্তার পরম কোটিতে এমন কোন কোন ভূমি আছে যেখানে এই নিত্য রসোল্লাস সম্ভোগ স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু এই একত্ব বিভাজনশীল মনের মধ্যে সংবৃত হইয়া পড়িয়াছে আত্মবিস্মৃতির অতল গভীরে ডুবিবার ফলে তাহার সদাবর্ত্তমান পূর্ণ একত্বের বোধ হারাইয়া গিয়াছে এবং

বিবিক্ত ভেদ-ভাবনার খেলা সম্মুখভাগে উপস্থিত হইয়া প্রবল শক্তিশালী সত্যের রূপ ধারণ করিয়া জীবনের শাস্তা হইয়া উঠিয়াছে। যদিও এ ভেদভাব প্রাতিভাসিক, কেননা ভেদের মধ্যে অভেদের তত্ত্ব সত্যই পশ্চাতে অখণ্ডিত এবং অসঙ্কুচিত হইয়া বর্ত্তমান আছে। এই ভেদের খেলা চরমে উঠিয়াছে বিভাজনশীল মনের খণ্ডতা ও ভেদ-বোধে, যখন দেহকে আশ্রয় করিয়া বিবিক্ত অহং-রূপে সে আত্ম-সচেতন হইয়া উঠিযাছে। সচ্চিদানন্দের সক্রিয় আত্মচেতনা প্রাতিভাসিক নিশ্চেতনার মধ্যে সংবৃত হইয়া পড়াতে বিবিক্ত জড়রূপে ভরা জগতে ভেদের এই খেলার এক নিবিড় এবং নিরেট ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। নিশ্চেতনার মধ্যে স্থিত এই ভিত্তি ভেদকে নিরাপদ করিয়াছে কেননা অদ্বৈত চেতনায় ফিরিয়া আসিবার পথে ইহা প্রবল বাধার সৃষ্টি করে ; কিন্তু বাধা কার্য্যতঃ দুস্তর হইলেও তাহা প্রাতিভাসিক এবং অন্তবান, অনপনেয় নয, কেননা তাহার মধ্যে ও ঊর্দ্ধে তাহাকে ধারণ করিয়া সর্ব্ববিৎ চিৎস্বরূপের অধিষ্ঠান রহিয়াছে, আবার তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় যে নিশ্চেতনা চেতনার একটা ঐকান্তিক অভিনিবেশ, গঠনক্ষম এবং সৃষ্টিশীল জড-ক্রিয়াধারার মধ্যে একান্তভাবে সমাহিত হইয়া আত্ম-বিস্মৃতির অতলে চেতনা যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া চেতনাই নিশ্চেতনরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এইভাবে সৃষ্ট প্রাতিভাসিক জগতে বিবিক্ত রূপকে ভিত্তি করিয়া তথা হইতে প্রাণের সকল ক্রিয়া আরম্ভ হয় ; তাই বিশ্বের নানা সম্বন্ধের মধ্য দিয়া অদ্বয় বস্তুর সহিত যুক্ত হইবার জন্য ব্যষ্টি পুরুষকে এই জড় বিশ্বে একটি রূপকে আশ্রয় করিতে এবং শরীর গ্রহণ করিতে হয় ; এই জড় জগতে দেহকে ভিত্তি করিয়া তথা হইতে তাহাকে তাহার প্রাণ মন ও আত্মার প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে হয়। ব্যষ্টি পুরুষের এই শরীর গ্রহণকে আমরা জন্ম বলি, কেবল এই রূপেই তাহার আত্মার পুষ্টি ও বিবৃদ্ধির তপস্যা এবং নিজের সঙ্গে বিশ্বাত্মার ও অপর সকল ব্যষ্টি-সত্তার নানা সম্বন্ধের খেলা চলিতে পারে ; আমাদের চেতন সত্তার ক্রমবর্দ্ধমান পুষ্টি ও পরিণতির মধ্য দিয়া ব্রহ্মের পরম একত্বে ফিরিয়া যাওয়া এবং তাহার মধ্যে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ারূপ পরম সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হওয়া কেবল এই দেহের মধ্যে থাকিয়াই সম্ভব হইতে পারে ; এই জড় জগতে আমরা যাহাকে জীবন বলি তাহার সমগ্রটাই আত্মার প্রগতি, দেহের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবার ফলেই এই প্রগতি চলিতে পারে, দেহকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে নিমিত্ত করিয়াই সকল তপস্যা, ক্রমপরিণতির পথে সকল সাধনা চলিতে থাকে।

তাহা হইলে এই জড় ভূমিতে পুরুষের আত্মপ্রকাশের জন্য জন্মগ্রহণ একটা আবশ্যক ব্যাপার ; কিন্তু তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার পথে যাহার অতীত নাই বা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার জন্য যাহার ভবিষ্যৎ নাই এই বিশ্বলীলার মধ্যে মানুষ বা অন্য যে কোন রূপে হউক জন্ম তেমন ভাবের একটা বিচ্ছিন্ন আকস্মিক ব্যাপার বা আত্মার জড়ত্বের মধ্যে একবারের জন্য হঠাৎ একটা প্রমোদ-ভ্রমণ হইতে পারেনা। যে জগতে শুধু জড় রূপের নয় কিন্তু মন ও প্রাণের মধ্য দিয়া চেতন সত্তার সংবৃতি ও বিবৃতির খেলা চলিতেছে সেখানে এরূপ বিচ্ছিন্ন এবং আকস্মিকভাবে মানবদেহ ধারণ ব্যষ্টিজীবের আত্মসত্তার স্বাভাবিক নিয়ম বা বিধান হইতে পারেনা ; এরূপ অর্থশূন্য অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার এরূপ খেয়াল খুশীর স্থান বিশ্বপ্রকৃতিতে বা বস্তুস্বভাবের মধ্যে থাকিতে পারেনা, এরূপ বিরোধী দৌরাত্ম্য চিৎস্বরূপের আত্মপ্রকাশের ছন্দকে ভাঙ্গিয়া দেয়। চিৎপরিণামের প্রগতির পথে ব্যষ্টি ব্যক্তির আত্মজীবনের এরূপ অনাহুত আগমন হইলে কার্য্যকারণের শৃঙ্খল ভঙ্গ হয়, এরূপ আগমনকে কারণশূন্য কার্য্য বা কার্য্যশূন্য কারণ বলা যাইতে পারে ; ইহা হইবে বর্ত্তমানের একটা খণ্ড যাহার অতীত বা ভবিষ্যৎ কিছুই নাই। বিশ্বের জীবন স্পন্দনে যে সার্থক ছন্দ, প্রগতির যে বিধান আছে ব্যষ্টিব্যক্তির জীবনেও তাহাই থাকিবে, সে ছন্দের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন কিছু হঠাৎ আসিয়া পড়িবার স্থান নাই, বরং বিশ্বের বিরাট উদ্দেশ্যের স্থায়ী সাধন-যন্ত্র হওয়াই জীবলীলার সার্থকতা। এই জড় জগতে জীবাত্মা বিচ্ছিন্নভাবে হঠাৎ একবার মাত্র আসিয়া পড়ে, একবার মাত্র মানব দেহ ধারণ করে, এই ভাবের অনুভূতি তাহার এই জীবনেই প্রথম এবং এই জীবনেই শেষ ; এ জগতে নয় অন্য লোকে তাহার হয়ত অন্য জন্ম বা জীবন কাটিয়াছে এবং হয়ত বা অন্য কোন ভূমিতে অন্যপ্রকার অনুভূতির মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ জন্ম বা জীবন কাটিবে—এই মত প্রকৃতি-পরিণামের ধারা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায়না। একবার আসিয়া পড়ার কোন ব্যাখ্যাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। জীবাত্মা লোক হইতে লোকান্তরে উড়িয়া যাইবার পথে জড় জগতের এই পার্থিব জীবন উদ্দেশ্যহীনভাবে বসিবার একটা দাঁড় (perch) শুধু নয় বা হইতে পারেনা ; কেননা আমরা এখন জানি যে পরিণতির পথে যে বৃহৎ ও মহৎ সার্থকতার দিকে সে চলিয়াছে তাহার সাধনা অতি মন্থর, তাহার জন্য দীর্ঘ যুগ যুগান্তের প্রয়োজন। প্রকৃতি-পরিণামের পথে শ্রেণী-বদ্ধভাবে যে সমস্ত স্তর আছে মানব-জীবন তাহাদের অন্যতম, এই সমস্ত স্তরের

মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে অন্তর্গূঢ় চিৎপুরুষ বিশ্বের মধ্যে ধীরে ধীরে তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া তোলেন এবং দেহাশ্রয়ী ব্যক্তিগত আত্মচেতনাকে প্রসারিত এবং ঊর্দ্ধ্বে উন্নীত করিয়া পূর্ণসিদ্ধি আনয়ন করেন। এখানে এই ঊর্দ্ধ্বমুখী প্রগতি-ধারার মধ্যে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ দ্বারাই ঊর্দ্ধ্বায়ণ সম্ভব হইতে পারে; জীবের পক্ষে একবার শুধু এখানে আসিয়া যাওয়ার পরে অন্য কোন লোকে বা ভূমিতে প্রগতির অন্য কোন ধারা ধরিয়া অগ্রসর হওয়া এখানকার এই পরিণাম-ধারা*র* সঙ্গে খাপ খায় না।

মানব-আত্মা বা ব্যষ্টিমানব নিজের খেয়াল খুশিতে নিরঙ্কুশভাবে নিজের অবস্থা নির্ব্বাচন করিতে পারে অথবা স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিচিত্র কর্ম্মে বা তাহার ফলে অবাধে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে লোক হইতে লোকান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে পারে ইহাও ঠিক নহে। চরম মুক্তিতে বা ক্রম-পরিণতির পথে জড়াতীত কোন ভূমিতে পৌঁছিলে শুদ্ধ চিন্ময় স্বাধীনতার জ্যোতিরুদ্ভাসিত এ ভাবনা সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু জড় জগতের এই জাগতিক জীবনের প্রথম পর্ব্বে তাহা সত্য হইতে পাবে না। মানুষের পার্থিব জন্মে তাহার অধ্যাত্ম চেতনার মধ্যে দুইটি উপাদান মিশ্রিত হইয়া আছে, মানুষের মধ্যে একদিকে আছেন এক চিন্ময় পুরুষ যিনি তাহার শাশ্বত সত্তা, অন্য দিকে আছে তাহার ব্যষ্টিভাবেব আত্মা যিনি তাহার বিশ্বগত ক্ষর বা পরিবর্ত্তনশীল সত্তা। নৈর্ব্ব্যক্তিক চিন্ময় সত্তারূপে জীব তাহার সত্তায় এবং প্রকৃতিতে সচ্চিদানন্দের স্বাধীন সত্তার সহিত এক, যিনি নিজে জগতের মধ্যে সংবৃতি এবং বিবৃতির মধ্য দিয়া না গেলে যাহা লাভ হইতে পারেনা এমন কতকগুলি আত্ম-অনুভব লাভ করিবার জন্য নিশ্চেতনের মধ্যে সংবৃত হইয়া পড়িতে স্বীকার বা ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং গোপনে তথা হইতে বিবৃতি বা ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। আবার প্রকৃতির নানা রূপের মধ্য দিয়া আত্ম-অনুভবের দ্বারা আত্ম-ভাবের পুষ্টি ও বিবৃদ্ধির যে দীর্ঘ ধারা চলিতেছে ব্যক্তি-ভাবের আত্মা-রূপে জীব নিজেই তাহার অংশ; তাহার আত্মপরিণাম বিশ্বপরিণামের বিধান ও ধারা ধরিয়াই চলিতে পারে। যিনি বিশ্বাতীত অথচ বিশ্বগত এবং বিশ্ব-ব্যাপ্ত হইয়া আছেন জীবের চিন্ময় স্বরূপে সে তাঁহার সহিত এক; আবার জগৎ যাহার আত্মপ্রকাশ সেই বিশ্বরূপ সচ্চিদানন্দের সহিতও, অন্তরাত্মারূপে সে যুগপৎ এক এবং তাঁহার অংশ; বিশ্বরূপায়ণের যে সমস্ত পর্ব্ব বা স্তর আছে তাহার আত্মরূপায়ণের পথে তাহাকেও সে সমস্তের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে;

জগতে ব্রহ্মচক্রের আবর্ত্তনেব অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবে তাহার আত্ম-অনুভবের তপস্যা।

জড় বিশ্বের নিশ্চেতনার মধ্যে অন্তর্গূঢ় বিশ্বপুরুষ জড়বিগ্রহের পরম্পরায় জড় প্রাণ মন এবং চিৎসত্তাব উর্দ্ধগ সোপানাবলির মধ্য দিয়া তাহার প্রকৃতিস্থ আত্মভাবকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। প্রথমে তিনি জড় রূপের মধ্যস্থ গোপন আত্মারূপে উন্মিষিত হন, বাহিবে যাহা নিশ্চেতনার দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত; তাহার পর প্রাণবিগ্রহে স্ফুবণের সূচনা লইয়া এক দিকে নিশ্চেতনা অন্যদিকে চেতনাব যে আধাআলোক আমাদেব কাছে অজ্ঞানরূপে ফুটিয়াছে এই দুইয়ের সন্ধিভূমিতে প্রাণময় আত্মারূপে ফুটিয়া উঠেন কিন্তু তখনও তিনি গোপনই থাকেন; তাহার পব উপচীয়মান প্রস্ফুরণের ফলে তিনি পশুর মনে প্রথমে সচেতন আত্মারূপে দেখা দেন এবং মানুষে আসিয়া বাহিরে আরও সচেতন হন বটে কিন্তু মানুষের মধ্যেও পূর্ণ সচেতনতা ফুটেনা, এই সমস্ত স্ফুরণের মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, চেতনা আমাদের সত্তাব গোপন অংশে সর্ব্বদা অব্যক্ত ভাবে আছে, ক্রমপ্রকাশ বা ক্রমবিবৃদ্ধি শুধু প্রকাশমান প্রকৃতিতেই চলিতেছে। প্রকৃতি-পরিণামের বিশ্বগত এবং ব্যক্তিগত এই দুই ধারা আছে, বিশ্বগত ধারা নিজ সত্তার মধ্যে এক শ্রেণীবদ্ধ ক্রমোর্দ্ধ রূপায়ণ, বিশ্বভাবের ছন্দোময় এক বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তোলে, তাহাই সত্তাব ক্রমস্ফুরিত নানা রূপ-বিগ্রহের পরম্পরারূপে দেখা দেয়: ব্যষ্টি জীবাত্মা বিশ্বগত চিৎপুরুষের এই ক্রমায়ণের ধারা অনুসরণ করিয়া চলে এবং বিশ্বভাবের মধ্যে যাহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাকে প্রকাশ করে। মানবজাতির মধ্যে নিম্নতর ভূমিসকল হইতে যে শক্তি পুষ্ট হইয়া মানুষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বিশ্বমানব বা নিখিল মানব-বিগ্রহরূপী বিশ্বপুরুষ সেই শক্তিকে আরও ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তিনি এই শক্তিকে আরও প্রস্ফুটিত করিয়া একদিন অতিমানস এবং চিন্ময় শক্তিতে রূপান্তরিত করিবেন; তাহার ফলে মানুষের মধ্যে সেই শক্তি ঐশীচেতনায় পরিণত হইবে তখন সেই দিব্য মানুষেব চেতনা নিজের সত্য ও অখণ্ড সত্তাকে এবং তাহার বিশ্বগত দিব্য প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে জানিবে। ব্যষ্টিমানুষকেও পরিণতির এই ধারাকে অনুসরণ করিয়াই চলিতে হইয়াছে; মানুষের পর্য্যায়ে উন্নীত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে প্রাণের নিম্নতর বিগ্রহের মধ্যে বিচরণ করিয়া তাহার আত্মানুভবকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছে; অদ্বয় বস্তু যেমন বিশ্বগত-ভাবে উদ্ভিদ ও পশুর এই নিম্নতর রূপ গ্রহণ করিয়াছেন তেমনি এখন যে ব্যষ্টি

মানুষ হইয়াছে তাহাকে প্রাক্তন পর্বে এই সমস্ত দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে; সে এখন মানব-আত্মারূপে প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে চিদ্‌বস্তু ভিতরে এবং বাহিরে মানুষ রূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু যেমন পূর্বে সে যে উদ্ভিদ ও পশু রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহাতে সীমাবদ্ধ ছিল না তদ্রূপ সে এখন যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহাতেও সীমাবদ্ধ নহে; প্রকৃতির উচ্চতর এক পর্যায়ের মধ্যে যেখানে তাহার বৃহত্তর আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র আছে সেখানেও সে পৌঁছিতে পারে।

একথা স্বীকার না করিলে বলিতে হয় যে মানুষেব আত্মঅনুভবকে যে চিৎ-সত্তা এখন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা মূলতঃ মানুষের মনন এবং মানুষের দেহ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং মন ও দেহেব আশ্রয়েই বর্ত্তমান আছে তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, মানুষ-ভাবের নীচেও সে নামিতে পারে না উপরেও উঠিতে পারে না। বস্তুতঃ তাহা হইলে এই আত্মাকে আর অমর বলা যুক্তি-সঙ্গত নয়, পরিণতির পথে মানুষের মন ও দেহের আবির্ভাবে যেমন সে আবি-র্ভূত হইয়াছে তেমনি দেহ-মনের বিলুপ্তিতে তাহারও বিলোপ ঘটিবে। কিন্তু দেহ এবং মন চিদ্‌বস্তুর স্রষ্টা নয়, চিৎসত্তাই মন এবং দেহ সৃষ্টি করিয়াছে, নিজ সত্তা হইতে ইহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, ইহারা নিজেদের মধ্য হইতে চিদ্‌বস্তুকে ফুটাইয়া তোলে নাই, এই চিদ্বস্তু ইহাদের উপাদানের দ্বারা প্রস্তুত কোন যৌগিক বস্তু অথবা ইহাদের সংযোগ বা সমবায়োৎপন্ন কোন কিছু নয়। মন এবং দেহ হইতে যে ইহা উদ্ভূত হইতেছে ইহা যে মনে হয়, তাহার কারণ ইহা নয় যে তাহারা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছে অথবা তাহাদের আশ্রয়েই সে রহি-য়াছে, প্রকৃত কারণ এই যে চিৎসত্তাই তাহাদের মধ্যে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করি-তেছে; এই আত্মপ্রকাশ পূর্ণতর হইলে দেখা যায় যে দেহ ও মন চিদ্‌বস্তুর আত্ম-সত্তার গৌণ বিভূতি মাত্র এবং অবশেষে এমন দিন আসিবে যখন চিৎশক্তি তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বর্ত্তমান অপূর্ণ অবস্থা হইতে চিৎস্বরূপের সাক্ষাৎ বিগ্রহ এবং সাধন-যন্ত্ররূপে তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিবে। চিদ্-বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে ইহা এমন কিছু যাহা নামরূপের উপাদানে সৃষ্ট বস্তু নয়, বস্তুতঃ এই বস্তুই জীবচেতনার বহু বিচিত্র প্রকাশে নানা দেহ এবং মন রূপ ধারণ করে। পরিণাম-পরম্পরার মধ্য দিয়া চিতের এই সমস্ত রূপায়ণ চলে; চিদ্বস্তুই এক সঙ্গে একদিকে রূপের পরম্পরা অন্যদিকে চেতনার বিভিন্ন স্তরপরম্পরা ফুটাইয়া তোলে; তাহার সম্ভাবনীয় প্রকাশে একটিমাত্র রূপে

অথবা তাহার অন্তর্ম্মুখী অভিব্যক্তিতে একপ্রকার মননে সে সর্ব্বদা বন্দী থাকিতে বাধ্য নয়। তাই শুধু মননধর্ম্মী মানবতার সূত্রে অন্তরাত্মাকে বাঁধা যায় না; ইহা লইয়া যেমন তাহার যাত্রারম্ভ হয় নাই তেমনি ইহা লইয়া তাহার যাত্রা শেষ হইবে না; যেমন তাহার প্রাঙ্মানবীয় অতীত ছিল তেমনি তাহার অতিমানবীয় ভবিষ্যৎ আছে।

আমরা যদি বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করি, তবে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাইতে পারি যে, রূপ হইতে রূপান্তরে জন্মগ্রহণ করিতে করিতে অবশেষে ব্যষ্টিআত্মা ব্যক্ত চেতন মানুষের স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আবার মানুষ হইতেছে সেই সাধনযন্ত্র যে আরও উচ্চভূমিতে পৌঁছিবে। আমরা দেখিতে পাই প্রকৃতি-পরিণাম স্তরের পর স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, প্রত্যেক স্তরে তাহার অতীত সম্পদ গ্রহণ করিয়া নূতন স্তরের উপাদানে রূপান্তরিত করে। আমরা আরও দেখিতে পাই যে মানুষের প্রকৃতিও সেই একই বিধানেই গড়িয়া উঠিতেছে; পার্থিব জীবনের সমস্ত অতীতই তাহার মধ্যে আছে। তাহার মধ্যে জড়ের উপাদান আছে প্রাণ যাহা গ্রহণ করিয়াছে, প্রাণের উপাদান আছে মন যাহা গ্রহণ করিয়াছে, মনের উপাদান আছে চিৎ-সত্তা যাহা গ্রহণ করিতেছে; মানুষের মধ্যে পশু এখনও রহিয়া গিয়াছে; তাহার সমগ্র বিশিষ্ট প্রকৃতি দেখিয়া ইহাই মনে হয় মানব-সত্তার একটা অন্নময় ও প্রাণময় অবস্থা ছিল যাহা তাহার মধ্যে মনকে উন্মিষিত করিবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত করিয়াছে এবং পশুর মধ্যে তাহার অতীত জীবন তাহার জটিল মনুষ্যত্বের প্রাথমিক উপাদান গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহাতে আবার যেন ইহা মনে না করি যে ইহার হেতু এই যে জড়প্রকৃতি পরিণাম-ধারার মধ্য দিয়া তাহার মধ্যে দেহ প্রাণ এবং পশুমন সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই ভাবে প্রস্তুত রূপের মধ্যে আত্মা ঊর্দ্ধ্ব হইতে পরে নামিয়া আসিয়াছে; এধারণার পশ্চাতে কিছু সত্য আছে কিন্তু এই সূত্রের ব্যঞ্জনায় যাহা বুঝায় তাহা সত্য নহে। কেননা তাহা হইলে দেহ প্রাণ এবং মনের সঙ্গে জীবাত্মার এক দুরতিক্রমণীয় বিরোধ বা ব্যব-ধান আছে মনে করিতে হয় কিন্তু বস্তুতঃ তেমন কিছু নাই; কেননা আত্মাকে ছাড়িয়া দেহ থাকিতে পারে না, এমন কোন দেহ নাই যাহা আত্মার রূপ বা বিগ্রহ নহে; জড় চিদ্বস্তুর উপাদানে প্রস্তুত, চিদ্বস্তুই শক্তি; যদি অন্য কিছু হইত তবে তাহার অস্তিত্ব সম্ভব হইত না কেননা ব্রহ্মই যাহার উপাদান নহেন অথবা যাহা ব্রহ্মের শক্তি নয় তেমন কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; জড়ই যদি

ব্রহ্মবস্তু এবং ব্রহ্মশক্তি হয় তবে প্রাণ এবং মনও যে তাহাই হইবে ইহা আরও স্পষ্ট এবং নিশ্চিত। জড় এবং প্রাণ পূর্ব্ব হইতে যদি চিদ্বস্তুর দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইত তাহা হইলে মানুষের আবির্ভাব সম্ভব হইত না অথবা তাহার আবির্ভাব পরিণামধারার-অঙ্গরূপে দেখা দিত না। একটা আকস্মিক অথবা অনাবশ্যক ঘটনা মাত্র থাকিয়া যাইত।

সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য যে জন্মান্তরের এক দীর্ঘ পরম্পরার মধ্য দিয়া জীব মানুষজন্ম লাভ করিযাছে, এই পৃথিবীতে নিম্নতর জীবযোনির দীর্ঘ পরম্পরার মধ্য দিয়া প্রস্তুত হইয়া তবে মানুষে আসিয়া সে পৌঁছিতে পারিয়াছে। জড় তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া জীবনের সূত্রে জড়বিগ্রহের যে মালা গাথা হইয়াছে মানুষকে তাব প্রত্যেকটি বিগ্রহের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহা হইলে আবার এই প্রশ্ন উঠে, মানবজন্ম একবার লাভ করিবার পর জন্মান্তর পরম্পরা কি পুনরায় চলিতে থাকিবে? যদি চলে তবে কি রূপে কোন ধারায় রূপান্তরের কোন ছন্দে চলিবে? প্রথমেই আমাদের মীমাংসা করিতে হইবে জীবাত্মা একবাব মানুষজন্ম লাভ করিলে আবার সে পশুর দেহে ও প্রাণে ফিরিয়া যাইতে অর্থাৎ পশুরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে পারে কিনা? দেহান্তর সংক্রমণের সম্বন্ধে প্রচলিত প্রাচীন মতে এই ভাবে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া যাওয়া, মানুষের পশুজন্ম লাভ করা সাধারণ ব্যাপার বলিয়াই গণ্য করা হয়। পুরাপুরি মানুষটা যে আবার পশু জন্ম লাভ করিবে তাহা অসম্ভব মনে হয় কেননা প্রাণময় উদ্ভিদ-চেতনা মনোময় পশুচেতনাতে পরিবর্ত্তিত হইবার সময়কার মত, পশুজন্ম হইতে মানুষ জন্ম লাভ করিবার সময় জীবের চেতনার এক চূড়ান্ত রূপান্তর হয়। প্রকৃতি যদি এরূপ একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনিয়া থাকে তাহা হইলে জীবাত্মা যে তাহা উল্টাইয়া দিয়া প্রকৃতিস্থ পুরুষের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দিবে ইহা হইতে পারে না। কিন্তু যদি এমন হয় যে কোন জীবাত্মাতে জাত্যন্তর পরিণাম তেমন দৃঢ়মূল হয় নাই, কেবল সে এতটা অগ্রসর হইয়াছে যে মানবদেহ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে কিন্তু এতটা শক্তি লাভ হয় নাই যাহাতে মানুষী চেতনাতে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারে, এরূপ কোন জীবাত্মা আছে ধরিয়া লইলে তাহার পক্ষে পুনরায় পশুজন্ম লাভ সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এরূপ অদৃঢ়মূল মানবাত্মার অস্তিত্ব বিরল। অথবা বড় জোর এমন হইতে পারে যে কোন মানুষের মধ্যে কোনও একটা পশু-প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে তাহার তৃপ্তির জন্য তদনুরূপ দেহের প্রয়োজন;

তখন পশুদেহে একপ্রকার একটা আংশিক জন্মান্তর হইতে পারে ; মানবাত্মা সে ক্ষেত্রে কতকটা শিথিলভাবে পশুদেহ ধারণ করিবে, আবার সে দেহ ত্যাগের পরই তাহার স্বাভাবিক প্রগতির জন্য মানবদেহে ফিরিয়া আসিবে। প্রকৃতির গতি এতই জটিল যে জোর করিয়া এমন হঠোক্তি করা যায়না যে মানবাত্মার পশু জন্ম গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব ; ইহাও বলি যে ক্বচিৎ কোন ক্ষেত্রে মানুষের পশু জন্ম যদি সম্ভবও হয়, তবু সাধারণের মধ্যে যে অতিরঞ্জিত বিশ্বাস আছে যে মানবজন্ম লাভের পরও পশুজন্ম লাভ মানুষরূপে জন্মান্তর লাভের মতই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সম্ভবপর ব্যাপার, তাহার মধ্যে এই যৎসামান্য সত্যই আছে। মানুষের পশুজন্মলাভ সম্ভব হউক বা না হউক যে জীবাত্মা একবার মানবজন্ম লাভে সমর্থ হইয়াছে তাহার পক্ষে মানুষরূপেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণই স্বাভাবিক বিধান।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে মানবরূপে জন্মপরম্পরা গ্রহণের প্রয়োজন কি? একবার মানবদেহ ধারণ করাই কি যথেষ্ট নয়? ইহার উত্তরে বলিব, যে কারণে পশুজীবনের উর্দ্ধমুখী গতিতে নানা পশু-যোনির মধ্য দিয়া জীবাত্মা মানুষী দেহ ধারণ করিয়াছে সেই কারণেই, চিৎপরিণামের সেই একই প্রয়োজনেই মানুষরূপে তাহাকে পুনঃপুনঃ জন্মিতে হইবে। কেননা প্রগতির পথে মানুষ হইতে সমর্থ হইতে পারিলেই যাহা তাহার সাধনার বিষয় তাহা সিদ্ধ হইয়া গেল ইহা ত বলা চলেনা ; যে মনুষ্যত্ব সে লাভ করিয়াছে তাহার মধ্যেও উচ্চতর বিকাশের যে নানা সম্ভাবনা আছে তাহাতেও তাহাকে পৌঁছিতে হইবে। ইহা স্পষ্ট যে অসভ্য অশিক্ষিত নাগা কুকি কিম্বা তদ্রূপ কোন আদিম বর্বর জাতির অথবা সভ্য সমাজে উচ্ছৃঙ্খল গুণ্ডাপ্রকৃতির মানুষের মধ্যে যে জীবাত্মা বাস করিতেছে তাহার পক্ষে মানবজন্মের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় নাই ; মানুষ-রূপের মধ্যে যাহা স্ফুরিত হইবার কথা তাহার সম্পূর্ণ স্ফুরণ হইয়াছে অথবা মানবতার তাৎপর্য্যের পূর্ণ উপলব্ধি হইয়া গিয়াছে ইহাও ত সত্য নহে ; বিশ্বমানবের মধ্যে সচ্চিদানন্দ যাহা ফুটাইতে চান তাহার সকলই ত তাহার জীবনে ফুটে নাই ; প্রাণোচ্ছল যে ইউরোপীয় তাহার উত্তাল কর্ম্মজীবন বা প্রমত্ত ভোগজীবন লইয়া আত্মহারা হইয়া আছে, অথবা এসিয়ার যে মূর্খ চাষা তাহার দৈনন্দিন জীবন ও অর্থ সমস্যার মধ্যে ডুবিয়া আছে তাহার পক্ষে মানব-জীবন হইতে যাহা শিখিবার এবং লাভ করিবার আছে তাহা শিক্ষা বা লাভ করা হয় নাই ইহা বুঝিতে কষ্ট হয়না। এমনকি আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবেই

প্লেটো বা শঙ্করের মত মানুষের জীবন চিৎতত্ত্বের প্রকাশ ও অভিব্যক্তির চরম শিখরে পৌঁছিয়াছে কিনা তাহাতে সন্দেহ করিতে পারি। আমরা হয়ত ভাবি তাহারা বা তাহাদের মত মহামানব মানুষের সিদ্ধির চরমে, মানুষের মন ও আত্মা যত উর্দ্ধে উঠিতে পারে তাহার শেষ সীমায় পৌছিয়াছেন কিন্তু এমন হইতে পারে যে আমাদের বর্ত্তমান সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা ভবিষ্যতের প্রগতি সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছি। ভগবান হয়ত এক মহত্তর, অন্ততঃ এক বৃহত্তর সম্ভাবনা এখনও মানুষের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে চান; যদি তাই হয় তবে এই সমস্ত মহামানব যে সমস্ত সোপান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্য দিয়া তিনিই মানুষকে সেই পরম সিদ্ধির তোরণের দিকে লইয়া চলিয়াছেন এবং মানুষের জন্য সে দ্বার একদিন খোলা হইবে। অন্ততঃপক্ষে মানুষের বর্ত্তমান সিদ্ধির এইরূপ চরম শিখরে যতদিন সে না পৌছিবে ততদিন জীবাত্মার মানবজন্ম-গ্রহণ ব্যাপারে 'ইতি শেষ' কথা লিখিয়া দিতে পারি না। মানুষ পৃথিবীতে আসিয়াছে অবিদ্যার মধ্য হইতে এবং তাহার মনে ও দেহে যে ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যে সে আজ বাস করিতেছে, তাহা হইতে জ্ঞানের এবং চিদ্‌বস্তুর স্ফুরণে ও প্রকাশে উদ্ভাসিত বৃহত্তর দিব্য জীবনে উত্তীর্ণ হইবার জন্য। তাহার মধ্যে চিৎস্বরূপ ফুটিয়া উঠিবে, নিজের সত্য আত্মজ্ঞান তাহার লাভ হইবে এবং সে চিন্ময় জীবন যাপন করিতে শিখিবে, অন্ততঃপক্ষে এটুকু না হইলে সে নিশ্চিতভাবে লোকান্তরে নিত্যকালের জন্য গমন করিতে পারেনা। হয়ত এখানে মানুষের এই মর্ত্ত জীবনেই চিন্ময় ভাবের এক মহত্তর ও বৃহত্তর স্ফুরণ হইবে যাহা তাহার বর্ত্তমান সিদ্ধির চরম অবস্থাকেও ছাড়াইয়া যাইবে, যাহার সম্বন্ধে আমরা কেবল একটা প্রাথমিক খবর পাইতেছি; মানুষের অপূর্ণতা প্রকৃতি-পরিণামের চরম নিয়তি যেমন বলিতে পারিনা তেমনি তাহার পূর্ণতাকেও বলিতে পারিনা চিৎপরিণামের সর্ব্বোচচ শিখর।

মানুষের মধ্যে মনের যে প্রধান তত্ত্ব, যে বুদ্ধি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই যদি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব না হয় তাহা হইলে মানুষের মধ্যে এই সম্ভাবনা একরূপ নিশ্চিত মনে হয়। মনের যদি এমন অন্য শক্তি থাকে যাহা বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যেও কেবল অতি অপূর্ণ ভাবেই প্রকাশ হইয়াছে, তাহা হইলে পরিণামধারা দীর্ঘতর হওয়া এবং সেই সমস্ত শক্তিকে পূর্ণ রূপায়িত করিবার জন্য মানবরূপেই জন্ম-পরম্পরার উর্দ্ধমুখী ধারার প্রবাহ চলিতে থাকা অপরি-হার্য্য হইয়া উঠে। অতিমানসও যদি চেতনার এক শক্তি হয় যাহা চিৎ-

পরিণামের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে অন্তর্গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান আছে, তাহা হইলে মনের সকল শক্তি বিকাশেও জন্মান্তর গ্রহণের ধারা শেষ হইতে পারে না; যতদিন উর্দ্ধগতির ফলে মনোময়ী প্রকৃতি অতিমানসী প্রকৃতিতে রূপান্তরিত না হইতেছে এবং দেহধারী অতিমানস সত্তা পার্থিব লোকের নায়ক ও চালক-রূপে আবির্ভূত না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত জন্মান্তর ধারা শেষ হইতে পারেনা।

তাহা হইলে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের যৌক্তিক এবং দার্শনিক ভিত্তি এই; পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে যদি পরিণামের এক তত্ত্ব থাকে এবং সেই সঙ্গে পরিণামশীল প্রকৃতির মধ্যে জাত জীবাত্মা যদি সত্য বস্তু হয় তবে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত এবং অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। জীবাত্মা বলিয়া কিছু যদি না থাকে তবে প্রকৃতি-পরিণাম যান্ত্রিক হইয়া পড়ে তাহার কোন আবশ্যকতা বা তাৎপর্য্য দেখা যায়না, এবং সেই অদ্ভুত অর্থহীন যান্ত্রিক গতির মধ্যে জন্ম অর্থশূন্য আকস্মিক ব্যাপার মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। আবার ব্যষ্টিসত্তার রূপায়ণ যদি একটা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার হয়, দেহের আরম্ভে তাহার আরম্ভ এবং দেহের শেষে যদি শেষ হয়, তাহা হইলে পরিণাম-ধারা হইবে সর্ব্বাত্মা বা বিশ্বসত্তার একটা খেলা বা লীলা যাহাতে জগতে উচচ হইতে উচচতর জাতি স্থষ্টি হইতে হইতে অবশেষে পরিণতির ধারা সম্ভূতির চরম কোটিতে অথবা চিৎতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশে পৌছিবে; সে ক্ষেত্রে জন্মান্তর নাই, পরিণাম-ধারাতেও তাহার কোন প্রয়োজন নাই। অথবা যদি বলি যিনি সর্ব্বসৎ তিনিই নিজেকে স্থায়ী কিন্তু অবাস্তব ব্যষ্টিসত্তারূপে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে জন্মান্তর সম্ভব হয় অথচ তাহা হয় একটা অবাস্তব তথ্য, কিন্তু পরিণতি ক্ষেত্রে যেমন তাহার আবশ্যকতা নাই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই; জন্মান্তর সে ক্ষেত্রে ভ্রান্তিকে দৃঢ় এবং যথাসম্ভব দীর্ঘকালস্থায়ী করিবার উপায় মাত্র হইয়া পড়ে। যদি জীবাত্মা বা পুরুষ থাকেন কিন্তু তিনি দেহের অধীন নহেন, নিজের প্রয়োজনে শুধু দেহকে ব্যবহার করেন তাহা হইলে জন্মান্তর সম্ভব হয়, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে জীবাত্মার কোন পরিণাম যদি না থাকে তবে জন্মান্তরের কোন প্রয়োজন থাকে না; ব্যষ্টি-দেহে তখন জীবাত্মার আবির্ভাব হইবে একটা আকস্মিক ঘটনা একটা অনুভূতি, এজগতে যাহার ভূত কি ভবিষ্যৎ নাই—অন্য কোন লোকে তাহার অতীত কিম্বা ভবিষ্যৎ যদি বা থাকিতে পারে। কিন্তু যদি পরিণামশীল দেহের মধ্যে চেতনার এক ক্রম-পরিণাম চলে যদি কোন সত্য এবং সচেতন জীবাত্মা ব্যষ্টিরূপে দেহের মধ্যে বাস করেন, তাহা হইলে

স্পষ্ট বুঝা যায় প্রকৃতির মধ্যে সেই জীবাত্মার ক্রমবর্দ্ধমান অনুভূতি চিৎপরিণামের আকার গ্রহণ করিবে ; স্পষ্টতঃ জন্মান্তর সেরূপ পরিণাম-ধারার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ, জন্মান্তর হইল একমাত্র উপায় যাহা দ্বারা চিৎপরিণাম সম্ভব হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে জন্মের মত জন্মান্তরও একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে ; কারণ জন্মান্তর না হইলে একটি মাত্র জন্ম হইবে প্রথম পদক্ষেপ করা—আর অগ্রসর না হওয়া ; জন্ম হইবে যাত্রারম্ভ কিন্তু সম্মুখে আর পদক্ষেপ করা বা লক্ষ্যে পৌঁছান নহে ; জন্মান্তরই দেহধারী অপূর্ণ মানবজীবনের নিকট পূর্ণতা ও চিন্ময় সার্থকতা-লাভের অঙ্গীকার বহন করে।

একবিংশ অধ্যায়

লোকসংস্থান

এই সেই সপ্তলোক, যাহাব মধ্যে প্রাণশক্তিসমূহ সাত সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া গোপন গুহাশায়ী হইয়া বিচবণ করে।

মুণ্ডকোপনিষদ ২।১।৮

যাঁহাবা আলোক হইতে জাত ও পূজনীয় এবং যাঁহারা পঞ্চধা জন্মলাভ করিয়াছেন তাহারা মদ্দত্ত আহুতি গ্রহণ করুন; পৃথিবী আমাদিগকে পার্থিব অশিব হইতে এবং অন্তবিক্ষ আমাদিগকে দ্যুলোকের অনর্থ হইতে রক্ষা করুন; অন্তরিক্ষে বিস্তৃত প্রভাময় তন্তুকে অনুসবণ কর; ধ্যান দ্বারা নির্ম্মিত জ্যোতির্ম্ময় পথসকলকে রক্ষা কর; পবিত্র সূক্ষ্ম কর্ম্ম বয়ন কব; মানুষ হও দিব্য জাতিকে জন্ম দাও।......তোমরা সত্য দ্রষ্টা, তোমাদেব জ্যোতিষ্মান সেই বর্শাকে শানিত কর, যাহা দ্বাবা অমৃতের পথকে তোমবা কাটিয়া বাহিব কবিবে; যে সমস্ত গোপন লোক বা ভূমি আছে তাহা তোমরা জান; তাহাদিগকে গঠিত করিয়া তোলো যাহাদিগকে সোপানস্বরূপ অবলম্বন করিয়া দেবতারা অমৃতেব অধিকার পাইয়াছেন।

ঋগ্বেদ ১০।৫৩।৫,৬,১০

এই সেই সনাতন অশ্বত্থবৃক্ষ, যাহার মূল ঊর্দ্ধে এবং শাখা নিম্নেব দিকে বিস্তৃত, এই তো সেই ব্রহ্ম সেই অমৃত; ইহাতেই সকল লোক আশ্রিত হইয়া আছে, ইহাকে পার হইয়া কেহ যাইতে পাবে না, এই এবং সেই হইল এক।

কঠোপনিষদ ৬।১

এই জড়জগতে চেতনাব একটা চিন্ময় পবিণাম চলিতেছে এবং ব্যষ্টিসত্তা অবিচ্ছেদে বা পুনঃপুনঃ জড়দেহে জন্মগ্রহণ করিতেছে, একথা স্বীকার করিলে প্রশ্ন উঠে যে এই পরিণতিধারা কি বিবিক্ত এবং অন্যনিরপেক্ষভাবে নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ হইয়া চলিতেছে অথবা তাহা কি জড় জগৎ যাহার একটি প্রদেশমাত্র এমন এক সমগ্র বিশ্বব্যাপারের একটা অঙ্গ বা অংশ? আমরা

দেখিয়াছি যে উর্দ্ধ পরিণতির পূর্ব্বে একটা সংবৃতির পরম্পরা চলিয়াছিল যাহার জন্য পরিণাম সম্ভব হইয়াছে ; এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই আমাদের বর্ত্তমান প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে, কেননা বিবৃতির পূর্ব্বে সংবৃতির ধারা ছিল যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে অন্যলোক সকলের—অন্ততঃপক্ষে উচ্চতর লোক বা ভূমিসমূহের—অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং ইহাও মানিতে হয় যে এই পরিণামের সঙ্গে সে সমস্ত লোকের কিছু সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে, যাহাদের অস্তিত্বের জন্য পরিণাম সম্ভব হইয়াছে। মনে করিতে পারি যে তাহারা শুধু তাহাদের কার্য্যকরী সান্নিধ্যের অথবা পার্থিব চেতনার উপর তাহাদের চাপের দ্বারা আমাদের মধ্যে সংবৃত প্রাণ মন ও চিৎসত্তাকে মুক্ত ও আত্মপ্রকাশক্ষম এবং জড়প্রকৃতির উপরে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ করিতে পারে। কিন্তু এইটুকু করিবার পর ইহাদের হস্তক্ষেপ এবং ইহাদের সহিত সম্বন্ধ যে শেষ হইয়া যায় ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কাবণ নাই, বরং ইহাই সম্ভব মনে হয় যে জড়ভূমির জীবনের সঙ্গে এই সমস্ত জড়োত্তর ভূমির জীবনের একটা গোপন অথচ অবিচ্ছিন্ন আদান প্রদান চলে। আমাদিগকে এখন এই বিষয়টিকে আরও ভাল ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এ সমস্ত লোকের সম্বন্ধ ও আদান-প্রদানের প্রকৃতি কিরূপ এবং কতদূরব্যাপী হইবে ও তাহা কতদূর পর্য্যন্ত পরিণামধারা ও জাগতিক প্রকৃতির মধ্যস্থ জন্মান্তরবাদকে প্রভাবিত করে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

ইহা মনে করা যাইতে পারে যে শুদ্ধ চিৎস্বভাব জীবাত্মা অতিচেতনার চিন্ময় সত্য হইতে অনাদি নিশ্চেতনার মধ্যে হঠাৎ স্খলিত বা পতিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার পর জড়প্রকৃতির মধ্যে তাহার ব্যবহারিক জীবনের উর্দ্ধ পরিণাম চলিতেছে। যদি ইহাই সত্য হইত তবে উর্দ্ধে এক পরম সদ্বস্তু এবং নিম্নে এক নিশ্চেতনা এবং তাহা হইতে জাত জড় জগৎ মাত্র বর্ত্তমান থাকিত, এবং জীবের আবার নিজ স্বরূপে ফিরিয়া যাওয়া হইত দেহধারী পার্থিব সত্তা হইতে অতিচেতনার নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ঠিক তেমনি একটা আকস্মিক উৎক্ষেপ। সে ক্ষেত্রে চিৎ ও জড়ের মধ্যে অন্য কোন শক্তি বা সত্যবস্তু থাকিত না, জড় ছাড়া কোন ভূমি বা জড়জগৎ ছাড়া কোন লোকান্তরের অস্তিত্বের প্রয়োজন হইত না। কিন্তু জগতের জটিল প্রকৃতির দিকে বিস্তৃতভাবে দৃষ্টিপাত করিলে জগৎ-ব্যাপারের কাট্‌ছাঁট্ দেওয়া এই অতি সরল ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না।

অবশ্য বিশ্ববিসৃষ্টির নানা প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া চলে যাহার ফলে এইরূপ

চরম এবং অনড এক জগৎ-সাম্যের (world balancement) উৎপত্তির ধারণা করা যাইতে পারে। যিনি সর্ব্বসংকল্পময় পুরুষ তিনি হয়ত এই ভাবের একটা ধারণা করিয়াছিলেন বা একটা আদেশ দিয়াছিলেন যাহার ফলে অবিদ্যার মধ্যে অহংসর্ব্বস্ব জড়াশ্রয়ী জীবনযাপনের জন্য জীবাত্মার মধ্যে একটা আকূতি বা আবেগ দেখা দিয়াছিল। শাশ্বত ব্যষ্টি জীবাত্মা হয়ত নিজের অন্তরস্থ কোন দুর্ব্বোধ্য বাসনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্ধকারময় বিপদসঙ্কুল পথের যাত্রী হইতে চাহিয়াছে এবং সেই জন্য নিজের জ্যোতির্ম্ময় স্বধাম হইতে নিশ্চেতনার গভীর গহনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে—যে নিশ্চেতনা হইতে অবিদ্যার এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে ; অথবা একটি জীবাত্মা নয় বহুর মধ্যে, জীবাত্মার এক সমষ্টিতে এই আকূতি জাগিয়াছিল ; কেননা একটি জীবাত্মা দিয়া বিশ্ব গড়া চলে না ; বিশ্ব হয় নৈর্ব্যক্তিক হইবে অথবা তাহাতে থাকিবে বহু পুরুষের সমবায় অথবা তাহা এক বিশ্বপুরুষের বা অনন্ত সদ্বস্তুর বিসৃষ্টি বা আত্মাভিব্যক্তি। হয়ত এই বাসনাই সর্ব্বাত্মাকে আকর্ষণ করিয়া নিম্নে নামাইয়া আনিয়া নিশ্চেতনার শক্তিকে ভিত্তি করিয়া এক জগৎ গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। তাহা যদি না হয় তবে হয়ত শাশ্বত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাত্মাই নিজের মধ্যস্থিত ব্যষ্টি-জীবাত্মাসমূহকে সঙ্গে লইয়া অকস্মাৎ নিশ্চেতনার এই অন্ধকারময় সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং এইভাবে নিজের আত্মজ্ঞান ডুবাইয়া দিয়া প্রাণ এবং চেতনার এক ক্রমোর্দ্ধ্বধারার মধ্য দিয়া জীবাত্মাগণকে পরিণতিপথে চলিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। অথবা যদি বলি যে জীবাত্মার কোন অস্তিত্ব পূর্ব্বে ছিল না, আমরা সকলে এক বিশ্বচেতনার বিসৃষ্টি মাত্র অথবা অবিদ্যার একটা প্রাতিভাসিক মিথ্যা বোধ মাত্র, বিশ্বচেতনা বা অবিদ্যা হইতে জাত সৃষ্টি-শক্তি এক আদি নির্ব্বিশেষ মূলপ্রকৃতি হইতে নাম ও রূপের ক্রমপরিণামে এই অগণিত জীবাত্মাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা হইলে বলিতে হয় নিশ্চেতন শক্তিময় উপাদানের নির্ব্বিশেষ ভাব হইতে এক ক্ষণস্থায়ী বস্তুরূপেই জড়জগতে জীবাত্মার প্রথম প্রতিভাস দেখা দিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত যে কোন মত অনুসারে সত্তার কেবল দুইটি অধিষ্ঠান-ভূমি থাকিতে পারে ; সে দুই ভূমির একটি হইল এই জড়বিশ্ব যাহা নিশ্চেতনা হইতে অন্ধ ও অচেতন শক্তি বা প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, হয়ত বা তাহার মধ্যে এক আত্মা গোপন ও অপ্রত্যক্ষভাবে থাকিয়া প্রকৃতির এই স্বপ্নসঞ্চরণবৎ ক্রিয়া ও প্রবৃত্তি পরিচালনা করিতেছে ; অন্য দিকে আছে অতিচেতন অদ্বয়তত্ত্ব,

নিশ্চেতনা ও অবিদ্যার কবল হইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে আমরা একদিন ফিরিয়া যাইব। অথবা আমরা মনে করিতে পারি এই জড়বিশ্বরূপ একটি ভূমিই শুধু আছে, জড়বিশ্বের আত্মা ছাড়া কোন অতিচেতন সত্তা নাই। যদি আমরা দেখিতে পাই আমাদের এ জগৎ ছাড়া সচেতন সত্তার বাসের অন্য ভূমি, এই জড়বিশ্ব ছাড়া অন্য লোক পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান আছে তাহা হইলে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তকে বজায় রাখা কঠিন হয়; সিদ্ধান্তকে বাঁচাইবার জন্য তখন অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে যে এই সমস্ত লোক নিশ্চেতন হইতে পরিণামশীল আত্মার দ্বারা নিজের প্রয়োজনে উর্দ্ধ্বগমনের পথে পরে সৃষ্ট হইয়াছে। এ সমস্ত মতের প্রত্যেকেই বলে বিশ্ব নিশ্চেতনার এক পরিণাম; হয় শুধু জড়বিশ্বই সে পরিণামের একমাত্র এবং পর্য্যাপ্ত ক্ষেত্র বা রঙ্গভূমি অথবা পরিণতিধারায় ইহাদের এক হইতে অন্য জগৎ সৃষ্ট হইতেছে এবং এইভাবে জগতের এক ক্রমোর্দ্ধ্বপরম্পরা গঠিত হইয়া আমাদের আদি সত্যে ফিরিবার পথে সোপানমালা-রূপে বর্ত্তমান আছে। আমাদের মতে অতিচেতন সচ্চিদানন্দ ক্রমবিন্যস্ত জগৎরূপে যে আত্মবিস্তার করিয়াছেন তাহাই হইল এই বিশ্ব; কিন্তু উপরোক্ত মতে ইহা শুধু নিশ্চেতনার এক ধরণের একটা জ্ঞানের দিকে পরিণতি, যাহার ফলে একদিন আদিম অবিদ্যা ভাঙ্গিয়া যাইবে বা যে বাসনার বশে বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে তাহা ধ্বংস হইবে, সুতরাং ভুল করিয়া সৃষ্ট আত্মা লোপ পাইবে বা ভুল করিয়া জগতে তাহার যে বিপদসঙ্কুল অভিযান চলিয়াছিল তাহার হাত হইতে সে নিস্তার পাইবে।

কিন্তু এই সমস্ত মতবাদ হয় মনের সৃজনশক্তি স্বীকার করিয়া তাহার উপর অথবা ব্যষ্টিসত্তার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব অর্পণ করে; অবশ্য ইহারা দুইটি প্রধান তত্ত্ব তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু একমাত্র অদ্বয় চিৎবস্তুই আদি সত্তা এবং আদ্যা-শক্তি। যে ভাবনা বা জ্ঞান, কল্পনা বা ধারণার দ্বারা সৃষ্টি করে তাহা মনেরই ব্যাপার বা ক্রিয়া, তাহা অতিমানস বা সম্ভূত বিজ্ঞানের ক্রিয়া নয়—যে সত্য-জ্ঞানে সত্তা নিজের মধ্যে কি আছে তাহা জানেন এবং যে জ্ঞানের শক্তিদ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে আত্মবিসৃষ্টি সাধন করেন তাহাই অতিমানস বা সম্ভূত বিজ্ঞান; জীবের বাসনাও মনোগত প্রাণের ক্রিয়া; তাহা হইলে প্রাণ ও মন, পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান শক্তি এবং জড়বিশ্ব বিসৃষ্টির নিয়ামক, নিজেদের জড়োত্তর প্রকৃতির জগৎসৃষ্টিও তাহাদের পক্ষে ঠিক একইরূপে সম্ভব, অথবা যদি তাহা না হয় তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে যাহা

ক্রিয়াশীল হইয়া বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব করিয়াছে তাহা ব্যষ্টি-সত্তার বাসনা নয় এমন কি বিশ্বপ্রাণ বা বিশ্বমনের আকৃতিও নয়, তাহা চিৎ-স্বরূপের সংকল্প বা ইচ্ছাশক্তি, এই ইচ্ছাই সৃষ্টির মূল শক্তি, ইহাই নিজের বা নিজ চেতনার মধ্যস্থিত কোন কিছুর বিস্তারসাধন করে, সৃষ্টিসমর্থ ভাব অথবা এক আত্মজ্ঞানের প্রকাশ ঘটায় বা তাহার স্বয়ংক্রিয় শক্তির আবেগ বা আকৃতি অথবা তাহার আত্মানন্দের একটা বিশিষ্ট রূপায়ণ অভিব্যক্ত করে। কিন্তু বিশ্ব যদি সৎস্বরূপের সর্ব্বগত আনন্দ হইতে জাত না হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যষ্টিসত্তার বাসনার বশে অবিদ্যাচ্ছন্ন অহংগত খেয়ালখুশিতে ভোগ ও পরিতর্পণের জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকে তবে বলিতে হয় বিশ্বপুরুষ বা বিশ্বোত্তব দিব্য পুরুষ বিশ্বের স্রষ্টা বা সাক্ষী নহেন, মনোময় ব্যষ্টিজীবই বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বদ্রষ্টা। অতীত যুগে মানুষের চিন্তাধারার পুরোভাগে ব্যক্তিসত্তাই এইরূপ এক অতিকায় বিগ্রহরূপে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে এবং তাহার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব অর্পণ করা হইযাছে ; আজিও যদি এই অতিপ্রাধান্য বজায় রাখা যায় তবে হয়ত তাহার একপ্রকার সৃষ্টিক্ষমতা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে ; কেননা চিৎবস্তু জড় প্রকৃতিতে নামিয়া আসিয়া সংস্কৃতির মধ্যে নিজেকে লুকাইবার ফলে চেতনার যে ক্রিযাধারা প্রকাশ পাইতেছে সেই ক্রিয়ার অংশরূপে ব্যষ্টিপুরুষের একটা সায় একটা সম্মতি আছে, অথবা অবিদ্যার জীবন গ্রহণ করিবার দিকে তাহার একটা সংকল্প রহিয়াছে। কিন্তু তবুও জগৎ ব্যষ্টিমনের বিসৃষ্টি অথবা ব্যষ্টিচেতনার অভিনয়ের জন্য তাহারি দ্বারা সৃষ্ট রঙ্গালয় বলিতে পারি না ; অথবা কেবল অহংএর খেলা তাহার তৃপ্তি তাহার সিদ্ধি বা অসিদ্ধির ক্ষেত্ররূপেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ইহাও স্বীকার করিতে পারি না। ব্যষ্টির চেয়ে বিশ্ব যে অনেক বড়, ব্যষ্টি যে বিশ্বেরই আশ্রিত বস্তু এই বোধ জাগিলে আমাদের বুদ্ধির পক্ষে আর এরূপ মতবাদে সায় দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশ্ব এত বিশাল যে তাহার ক্রিয়াধারার এরূপ বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করা যায় না ; একমাত্র বিশ্বশক্তি বা বিশ্বপুরুষ বিশ্বের স্রষ্টা ও আশ্রয়স্থল হইতে পারেন ; ইহার মধ্যে যে শুধু ব্যষ্টিগত সত্য, তাৎপর্য্য বা লক্ষ্য আছে তাহা নহে, তাহার বিশ্বগত সত্য, তাৎপর্য্য এবং লক্ষ্যও নিশ্চয়ই আছে।

এই মত অনুসারে, যখন আদৌ জগৎসৃষ্টি হয় নাই তখন জগৎস্রষ্টারূপে বা সৃজনকার্য্যে অংশগ্রহণকারী এই ব্যষ্টিসত্তা বর্ত্তমান ছিল এবং অবিদ্যার মধ্যে নামিয়া আসিবার বাসনা বা সম্মতি তাহাতে জাগিয়াছিল ; যে বিশ্বা-

তীত অতিচেতনা হইতে সে আসিয়াছে এবং অহংগত জীবনযাপনের পরে আবার যাহাতে ফিরিয়া যাইবে, তাহারই মধ্যে কোন উপাদানরূপে ইহা বর্ত্তমান ছিল ; একের মধ্যে বহুর নিত্যবর্ত্তমানতা বিশ্বের একটা মৌলিক তত্ত্ব বলিয়াই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ধারণা করা যাইতে পারে যে একটা সংকল্প বা একটা আবেগ বা একটা চিন্ময় প্রযোজনের আলোড়ন বিশ্বাতীত অনন্তের মধ্যস্থিত বহুর কতকগুলিকে নিম্নে আক্ষিপ্ত করিয়া অবিদ্যার এই জগৎ সৃষ্টি করিতে বাধ্য করিযাছে। কিন্তু একত্ব অস্তিত্বের প্রধান তথ্য, বহু একের আশ্রিত, একই বহুর আত্মা, বহু একেরই সত্তায় সত্তাবান একেরই আত্মবিভূতি বলিয়া এই সত্যই বিশ্বসত্তার মূলতত্ত্বও নিয়ন্ত্রণ করিবে। তথায় আমরা দেখি বিশ্বভাব ব্যষ্টিভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী, বিশ্বই ব্যষ্টির আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র, বিশ্বাতীত সত্য হইতে জাত হইলেও বিশ্বের মধ্যে বিশ্বগত ভাবেই ব্যষ্টি অবস্থিত। জীবাত্মা বিশ্বাত্মার দ্বারা এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়াই এখানে বর্ত্তমান থাকে। ইহা অতি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে ব্যষ্টি-সত্তার দ্বারা এবং তাহার উপর নির্ভর করিযা বিশ্বাত্মাকে বর্ত্তমান থাকিতে হয না। বিশ্বাত্মা ব্যষ্টিসত্তা সমূহের যোগফল বা সচেতন ব্যষ্টিজীবনের দ্বারা সৃষ্ট বহুর একটা সমষ্টি মাত্র নহে, বিশ্বাত্মা বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহা এক অদ্বয় বিশ্বগত চিদ্‌বস্তু হইবে, একই বিশ্বশক্তিকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করিবে, এবং বহু যে একেরই আশ্রিত উভয়ের এই মূল সম্বন্ধই এখানে বিশ্বসত্তার ভাবে ও ছন্দে পুনরাবৃত্তি হইবে। ইহা কল্পনাও করিতে পারা যায়না যে, বহু স্বাধীন ভাবে অথবা অদ্বয় বস্তুর ইচ্ছা বা সংকল্প হইতে দূরে গিয়া বিশ্বভাবের অস্তিত্বলাভের বাসনা পোষণ করিবে এবং সেই বাসনার জোরে পরম সচ্চিদা-নন্দকে অগত্যা বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিশ্চেতনার মধ্যে নামাইয়া আনিবে ; তাহা হইলে সত্য আশ্রয়-আশ্রিতের সম্বন্ধ একেবারে উল্টাইয়া দেওয়া হইবে। বহুর ইচ্ছা বা চিন্ময় আবেগেই সাক্ষাৎভাবে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে ইহা হইতে পারে, এমন কি এক অর্থে তাহাই সম্ভব, কিন্তু সে জন্য তাহারও মূলে সচ্চিদানন্দের এক আদি সংকল্প থাকা চাই ; অন্যথায় কোথাও কোন আবেগ দেখা দিতে পারে না, সচ্চিদানন্দের ইচ্ছা বা সংকল্প বিশ্বসংকল্পরূপে প্রথমে জাগে, তাহাই বাসনারূপে রূপান্তরিত হয় কেননা চিদ্‌বস্তুর মধ্যে যাহা ইচ্ছা অহংএর মধ্যে তাহাই কামনারূপে দেখা দেয়। জড় জগতে ব্যষ্টিচেতনার পক্ষে অবিদ্যার আবরণ গ্রহণ সম্ভব হয় যদি তৎপূর্ব্বে একমাত্র যাহার দ্বারা ব্যষ্টিচেতনা

নিয়ন্ত্রিত হয় সেই অদ্বয় অখিলাত্মা নিশ্চেতন প্রকৃতির আবরণ স্বীকার করিয়া লয়েন।

কিন্তু একবার পরাৎপর বিরাট পুরুষের এই সঙ্কল্পই জড় জগৎ সৃষ্টির অপরিহার্য্য নিমিত্ত বা কারণ বলিয়া যদি স্বীকার করি তাহা হইলে আর কামনাকে সৃজনশক্তি বলিতে পারিনা, কেননা পরমপুরুষ বা বিশ্বাত্মায় কামনার কোন স্থান নাই। তাঁহার কোন কামনা থাকিতে পারেনা এই জন্য যে অসম্পূর্ণতা বা অপ্রাচুর্য্যের জন্যই কামনা দেখা দেয়, যাহার উপর অধিকার লাভ হয় নাই যাহা অভুক্ত আছে তাহাকে অধিকার করিবাব বা ভোগ করিবার আকাঙক্ষাই কামনা। পবম এবং সর্ব্বগত পুরুষের মধ্যে নিজেব সর্ব্ব সত্তার পরমানন্দ আছে, কিন্তু সে আনন্দ কামনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথকবস্তু; যাহা নিজে বিশ্বক্রিয়া হইতে জাত বস্তু, কামনা সেই অপূর্ণ এবং পরিণামশীল অহংএর মধ্যে শুধু দেখা দিতে পারে। তাহাছাড়া যিনি সর্ব্বচেতনা বা চিদ্‌বস্তু তিনি যদি জড়ের নিশ্চেতনার মধ্যে ডুবিতে চাহিয়া থাকেন তবে তাহার কারণ তাহাতে সেইভাবে আত্মবিসৃষ্টি বা আত্মপ্রকাশের এক সম্ভাবনা ছিল। আবাব একমাত্র জড় জগৎ সৃষ্টি এবং তথায় নিশ্চেতনা হইতে চিন্ময় চেতনাকে ফুটাইয়া তোলাই সর্ব্বসত্তের আত্মপ্রকাশের একমাত্র সীমিত সম্ভাবনা একথাও স্বীকার করিতে পারিনা। জড়ই যদি প্রকাশিত সত্তার আদ্যাশক্তি এবং একমাত্র রূপ হইত, চিদ্বস্তুর আত্মপ্রকাশেব জন্য অচেতনার মধ্য দিয়া জড়কে ভিত্তি করা ছাড়া অন্য কোন উপায় যদি না থাকিত তবে শুধু একথা মানিতে পাবিতাম। ইহার ফলে আমরা পবিণামশীল জড়ময় বিশ্বব্রহ্মবাদে (materialistic evolutionary pantheism) পৌঁছিতাম। এ-মতে আমরা দেখিতাম যে, জগতে যে সমস্ত সত্তা বাস করে তাহারা অদ্বয় বস্তুর বিভিন্ন আত্মা বটে, কিন্তু তাহারা এই জগতেই জাত হয় এবং উর্দ্ধ পবিণতির পথে অজৈব, জৈব এবং মনোময় বিগ্রহরূপে ফুটিয়া উঠিতে থাকে এবং অবশেষে তাহাদের পরিণতির শেষ ও চরম ধাপে এক অতিচেতন সর্ব্বাত্মা বা বিশ্বগত অদ্বয় তত্ত্বের মধ্যে পূর্ণ ও অখণ্ড জীবন লাভ করে। সে ক্ষেত্রে স্বীকার করিতে হইবে যে এই মর্ত্ত্যভূমিতেই সব কিছুর উন্মেষ হইয়াছে, জড়বিশ্বের মধ্যস্থিত অদ্বয় তত্ত্ব হইতে তাহারই গোপন সত্তার শক্তিবশে, প্রাণ মন ও জীবাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে এবং এই জড় বিশ্বেই তাহাদেব প্রত্যেকের পরিপূর্ণ সার্থক পরিণাম ঘটিবে। এমতে এই জড়লোক ভিন্ন অতিচেতনার অন্য কোন ভূমি থাকিতে পারেনা, কারণ

যাহা অতিচেতন তাহাও বিশ্বগত, বিশ্বের বাহিরে কিছু নাই ; জড়াতীত কোন লোক নাই ; জড়ের বাহিরে জড়াতীত কোন তত্ত্বের কোন ক্রিয়া নাই যাহা জড় ভূমির উপর কোন প্রকার চাপ দিতে পারে, পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান প্রাণ বা মন বলিয়া তেমন কিছু জড় জগতের বাহিরে থাকিতে পারে না।

এক্ষেত্রে যখন প্রশ্ন হয় প্রাণ এবং মন কি, তখন উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে তাহারা জড় বা জড়শক্তি হইতে জাতবস্তু। অথবা বলা হয় যে নিশ্চেতনা হইতে অতিচেতনার দিকে যে পরিণামধারা চলিতেছে তাহার মধ্যে চেতনার রূপেই প্রাণ ও মন ফুটিয়াছে ; চেতনা যেন নিশ্চেতনা ও অতিচেতনার মধ্যে সেতুস্বরূপ ; জ্যোতির্ম্ময় অতিচেতনায় স্বাভাবিক ভাবে পূর্ণ সমাহিত হইবার পূর্ব্বে চিদ্‌বস্তু চেতনার মধ্য দিয়া অপূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিতেছে। বৃহত্তর প্রাণভূমি এবং মনোভূমির অস্তিত্ব যদি প্রমাণিত হয় তবে বলা হইবে চরম অতিচেতনার দিকে অভিযাত্রার পথে শুধু মনোময় বা বিষয়ীগতভাবে বা প্রত্যক্ চেতনায় (subjectively) এ সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাদের কোন বস্তুগত অস্তিত্ব নাই। কিন্তু মুস্‌কিল এই যে প্রাণ এবং মন জড় হইতে এমন বিভিন্ন বস্তু যে তাহাদিগকে জড় হইতে সৃষ্ট বস্তু মনে করা যায় না ; জড় নিজেই শক্তি হইতে জাত বস্তু, প্রাণ ও মনকেও সেই শক্তির উৎকৃষ্টতর পরিণাম বলিতে হয়। বিশ্বগত এক চিতের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করি তাহা হইলে এই শক্তিকেও চিন্ময়ী না বলিয়া পারা যায় না ; তাহা হইলে প্রাণ এবং মনও চিৎশক্তিরই স্বতন্ত্র পরিণাম, চিদ্‌বস্তুরই আত্মপ্রকাশের শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। তাহা হইলে কেবলমাত্র চিৎ এবং জড়ের অস্তিত্ব আছে, মাত্র এই দুইটি সত্য পরস্পরের সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছে এবং জড়ই চিতের আত্মপ্রকাশের একমাত্র ভিত্তি এ সমস্ত কথা অযৌক্তিক হইয়া পড়ে, তখন একমাত্র জড়-বিশ্ব আছে, জড়াতীত কিছু নাই এমতে আর আস্থা স্থাপন করা যায় না। চিৎ যে শুধু জড়কে ভিত্তি করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ইহা আর তখন স্বীকার করা যায় না, বলিতে হয় প্রাণতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বকেও ভিত্তি করিয়া তাহার আত্মপ্রকাশ চলিতে পারে ; মনোময় ও প্রাণময় লোকের অস্তিত্ব তখন অযৌক্তিক থাকে না বরং তাহারা যে আছে তাহাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় ; এমন কি স্থূল জড়তত্ত্বের চেয়ে সাবলীল ও সচেতন সূক্ষ্মভূতময় জগতের অস্তিত্বও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না

এই প্রসঙ্গে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল

তিনটি প্রশ্নের উদয় হয় ; প্রথমপ্রশ্ন :—এইরূপ অন্যলোকের অস্তিত্বের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ বা কোন খাঁটি খবর কি পাওয়া গিয়াছে ? দ্বিতীয় প্রশ্ন, জড়োত্তর লোক সকল যদি থাকে তবে তাহাদের স্বরূপ আমরা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছি ঠিক কি তেমন অর্থাৎ তাহারা জড় ও চিতের মধ্যে আরোহ এবং অবরোহক্রমে স্থাপিত বা বিন্যস্ত সোপানমালার মত কি একটা পরম্পরা ? তৃতীয় প্রশ্ন, যদি লোকসমূহ এইরূপ ক্রমানুগ হয় তাহা হইলে তাহারা কি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধশূন্য এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া আছে অথবা জড়লোকের সহিত কি এই সমস্ত উদ্ধ্বলোকের কোনও সম্পর্ক এবং যোগাযোগ আছে ? ইহা একটি তথ্য যে মানবসৃষ্টির আদিম যুগ হইতে অথবা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের খবর অতীতে যতদূর পর্য্যন্ত আমরা পাই তাহা হইতে দেখা যায় মানুষ অন্য জগতের অস্তিত্ব এবং তাহাদের শক্তি ও সত্তার সঙ্গে মানবজাতির যোগাযোগের সম্ভাবনা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। মানুষের চিন্তাজগতে অতি আধুনিক কালে যে যুক্তির যুগ আসিয়াছে—যাহার প্রভাব হইতে আমরা মুক্ত হইতে চলিয়াছি—তাহাতে দীর্ঘকালব্যাপী কুসংস্কার বলিয়া এই বিশ্বাসকে বর্জন করা হইয়াছে ; কোন প্রকার বিচার না করিয়া এ বিষয়ের সমস্ত সাক্ষ্য এবং খবর মূলতঃ মিথ্যা এবং গবেষণার অযোগ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে, কেননা এ যুগে কেবল জড়, জড়জগৎ এবং তাহার অনুভূতিই একমাত্র স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং জড়বাদের সহিত যাহার গরমিল তাহা মিথ্যা হইতে বাধ্য, জড়ের এলাকায় পড়ে না এমন যাহা কিছু অনুভূতি তাহা অমূলক ভ্রান্তি বা প্রবঞ্চনা অথবা অতি-বিশ্বাসী চিত্তের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোময় কল্পনামাত্র ; তাহার মধ্যে যদি কোনটা তথ্য বা নিশ্চিত সত্য হইয়া দাঁড়ায় তবে বলা হয় যে তাহা যাহা বোধ-হয় তাহা নহে অথাৎ তাহা জড়াতীত কিছু নহে, কোন জড়কারণ দ্বারাই তাহাকে ব্যাখ্যা করা যাইবে ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়গত প্রমাণের আমলে না আসিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে তথ্যের স্বপক্ষীয় কোন প্রমাণ গ্রহণ করাই হইবে না ; ব্যাপার যদি স্পষ্টতঃ জড়াতীত বলিয়াও বোধহয়, তথাপি যতক্ষণ সম্ভাবিত সকল প্রকার প্রকল্প (hypothesis) অনুমান বা জল্পনার সাহায্যে জড় দিয়া তাহার ব্যাখ্যার চেষ্টা পূর্ণরূপে পরাস্ত না হয় ততক্ষণ কোন-মতেই তাহাকে মানিয়া লওয়া হইবে না—এই হইল এ যুগের মনোভাব।

কিন্তু জড়াতীত ব্যাপারের খাঁটি জড়গত প্রমাণ দাবি করা স্পষ্টতই অযৌক্তিক,

ইহা সেই জড়ময় মনেরই এক ধরণের কুসংস্কার যে মন মনে করে যে শুধু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড়বস্তু মাত্র মূলতঃ সত্য এবং তাহা ছাড়া আর যাহা তাহা মনের মিথ্যা কল্পনামাত্র। জড়াতীত তথ্য আসিয়া জড় জগৎ স্পর্শ বা তাহাকে আঘাত করিতে জড়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন বা পরিণাম আনিতে এমনকি স্থূল ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাববিস্তার করিতে বা তাহার কাছে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার ক্রিয়ার অপরিহার্য্য পরিণাম যে তাহাই হইবে এমন কোন কথা নাই—এরূপভাবে স্থূলে প্রকাশ পাওয়া তাহার প্রধান স্বাভাবিক প্রকৃতি বা ক্রিয়াধারাও নহে। এরূপ তথ্য সকল সাধারণতঃ আমাদের মনে এবং প্রাণসত্তায় সাক্ষাৎ পরিণাম ঘটাইতে পারে বা তাহাদের উপর সুস্পষ্ট ছাপ ফেলিতে পারে, কেননা প্রাণ ও মন আমাদের মধ্যে সেই অংশ যাহারা মূলত তাহাদের সহিত সগোত্র বা একজাতীয়; তাহারা যদি জড়জগৎ ও জড়জীবনের উপর কখনও কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সমথ হয় তবে শুধু প্রাণ ও মনের মধ্য দিয়া আসিয়া পরোক্ষভাবে তাহা সম্ভব হয়। এ সমস্ত যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে দেখা দেয় তখন তাহা আমাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়েরই গোচরীভূত হয়, স্থূল বহিরিন্দ্রিয়ের নিকট তাহাদের গোচবতা হয় গৌণমাত্র। এই গৌণ গোচরতা অবশ্য সম্ভব, যদি সূক্ষ্ম দেহের এবং সেই দেহস্থিত সূক্ষ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সহিত জড়দেহ এবং জড়-ইন্দ্রিয়ের একটা যোগ থাকে তাহা হইলে জড়াতীত তথ্যও আমাদের বাহিরের ক্ষেত্রে অনুভব যোগ্য হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি আমরা যাহাকে প্রাতিভ বা দ্বিতীয় দৃষ্টি (second sight) বলি তাহার বেলায় এইরূপই ঘটে, এরূপ ক্ষেত্রে জড়াতীত বা অলৌকিক ঘটনা মনে হয় বহিরিন্দ্রিয় দিয়াই দেখিতেছি বা শুনিতেছি, মনে হয় না যে ভিতরে অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা তাহাদের প্রতিরূপ, প্রতীক বা ছায়া দেখিতেছি; স্পষ্টত মনে হয় না যে তাহারা আন্তর অনুভবের নিদর্শন অথবা তাহারা সূক্ষ্মবস্তুর রূপায়ণ। সত্তার অন্যভূমি বা অন্যলোক এবং তাহাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে এ বিষয়ের নানা ভাবের প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে; কখনও তাহারা বহিরিন্দ্রিয়গোচর হইয়া দেখা দেয়; কখনও বা সূক্ষ্মেন্দ্রিয়, মন বা প্রাণের সংস্পর্শে আসিয়া ধরা দেয়; কখনও বা চেতনার বিশেষ অবস্থায় আমাদের সাধারণ চেতনার অতীত ক্ষেত্রে অতিচেতনার সংস্পর্শে তাহাদের অস্তিত্বের কথা জানিতে পারি। আমাদের স্থূল জড়গত মনই আমাদের সবখানি নয়; এই মন আমাদের বহিশ্চেতনার প্রায় সবখানির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইলেও

"ইহা আমাদের সত্তার বৃহত্তম এবং অত্যুত্তম অংশও নয় ; সত্যবস্তুকে এই মনের একমাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে এবং ইহার দৃঢ় প্রাকারের মধ্যস্থিত ভাব ও বস্তুতে নিবদ্ধ করা যায় না।

যদি ইহা বলা যায় যে অন্তরমানসের অনুভব ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূত প্রতিরূপ গুলি ভ্রান্তিপূর্ণ হইতে পারে, কেননা ইহাদিগকে বিচার করিয়া বুঝিবার পক্ষে কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্রচলিত কোন মাপকাঠি নাই, তাহা ছাড়া অসাধারণ অলৌকিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপারকে নির্বিচারে, বাহিরে যেরূপ দেখা যায় তেমনি ভাবে মানিয়া লইবার একটা প্রবল ঝোঁক মানুষের মধ্যে আছে সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু ভুল করা আমাদের অন্তর্মানস বা অধিচেতন অংশেরই যে একটা বিশেষ অধিকার ইহাত বলিতে পারি না, আমাদের জড়গত মন এবং তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের আদর্শ এবং পদ্ধতির মধ্যেও ভুল হইবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে ; এইরূপ ভাবের ভুলের সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমাদের অনুভূতির এক বৃহৎ এবং মূল্যবান অংশকে আমরা বাদ দিতে চাহিব একথা যুক্তিযুক্ত নহে ; বরং এইজন্যই আরও বিশদভাবে পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়া তাহার তত্ত্বনির্দ্ধারণের উপযোগী নিজস্ব প্রামাণিক পদ্ধতি এবং খাটি মাপকাঠি আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিত চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের অন্তর্মুখী বিষয়ীরূপে অবস্থিত প্রত্যক্ চেতনাই আমাদের বাহ্য বিষয়ানুভবের ভিত্তি, এই চেতনাতে যাহা স্থূল বিষয়রূপে অনুভূত হয় তাহাই কেবল সত্য বাকি সমস্ত অবিশ্বাস্য বা মিথ্যা ইহা বলা ঠিক নহে। অধিচেতনাকে ঠিক ভাবে প্রশ্ন করিতে পারিলে সে সত্য সাক্ষ্যই দেয় এবং বাহ্য জড়ের ক্ষেত্রে সে সাক্ষ্য যে সত্য তাহার প্রমাণ পুনঃপুনঃ পাওয়া যায় ; সেই অধিচেতনাই যখন আমাদের আন্তর রাজ্যের এবং জড়োত্তর লোক বা ভূমির সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তথাকার অভিজ্ঞতার কথা বলে বা সাক্ষ্য দেয় তখন তাহাকে তো অগ্রাহ্য করা যায় না। এই সঙ্গে একথাও স্বীকার করি যে কেবল মাত্র বিশ্বাসই সত্যের সাক্ষ্য বা প্রমাণ হইতে পারে না, আরও প্রামাণিক কোন কিছুর উপর দাঁড়াইতে না পারিলে বিশ্বাসকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। ইহা স্পষ্ট যে কেবল অতীতের বিশ্বাসই জ্ঞানের উপযুক্ত ভিত্তি হইতে পারে না, যদিও তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করাও ঠিক নহে ; কেননা বিশ্বাস মন দিয়া গড়া একটা বস্তু এবং সে গঠনের মধ্যে ভুল থাকিতে পারে ; বিশ্বাস অনেক সময় অন্তর্জগতের খবর বহন করিতে পারে এবং তখন তাহার একটা মূল্য

একটা সার্থকতা আছে; আরও অনেক বেশী ক্ষেত্রে তাহা খবর বিকৃত করিয়া দেয় কেননা তাহাদিগকে সাধারণতঃ আমাদের বাহ্য জড়গত পরিচিত অনুভূতির ভাষায় তর্জমা করে; উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে জড়াতীত লোক-সমূহের বিন্যাস ও সংস্থান আমরা প্রাকৃত ভৌগলিক দেশে বিন্যাস ও সংস্থান বলিয়া দেখি; সূক্ষ্মবস্তুর অসাধারণ উচ্চতা বা স্তব বুঝিতে গিয়া আমরা জড়ীয় উচ্চতাই বুঝি; জড় পর্ব্বতের শিখরদেশে দেবতাদের বাসস্থান স্থাপন করি। জড়ের সত্যই হউক অথবা জড়োত্তর সত্যই হউক কোন সত্যই শুধু আমাদেব মনের বিশ্বাসের উপর স্থাপনা কবা উচিত নহে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা চাই; কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে সত্যেব প্রকার ভেদে তাহার অনুভূতির প্রকার ভেদ ঘটিবে--বিষয়বস্তু জড়, অধিচেতন বা চিন্ময় যে রূপে আমরা গ্রহণ করিতে সমর্থ হই অনুভবকেও তদনুরূপ ভাবেই দেখা দিতে হইবে; প্রত্যেক ভূমির প্রামাণিকতা এবং তাৎপর্য্য গভীররূপে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে বটে কিন্তু সে বিচারে বিচার্য্য ভূমিরই বিধান গ্রহণ করিতে হইবে, যে চেতনা সে ভূমিতে প্রবেশ করিতে সমর্থ সেই চেতনার দ্বারাই বিচার করিতে হইবে, অন্য ভূমিব বিধান লইলে, অথবা যে চেতনা কেবল অন্যভূমির সত্যে নিবদ্ধ সে চেতনার দ্বাবা বিচার করিলে চলিবে না; যদি এইভাবে চলিতে পারি তবেই আমাদের পদক্ষেপ নিশ্চিত হইবে এবং আমরা আমাদের জ্ঞানের পরিধি নিশ্চিতরূপে বাড়াইতে পারিব।

আমাদের অন্তরের অনুভূতিতে জড়াতীত জগৎতথ্যের যে সমস্ত খবর পাই তাহাদিগকে যদি গভীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখি, মানবের জ্ঞানসাধনার আদিযুগ হইতে এইরূপ খবরের যে সমস্ত বিবরণ আছে তাহাদের সহিত নিজে-দের এই সমস্ত অনুভূতি যদি মিলাইয়া ও তুলনা করিয়া বুঝি এবং এ সমস্তের একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা ও তাহাদের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ যদি সংগ্রহ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে এই সমস্ত আন্তর অনুভূতি সত্তা ও চেতনার বৃহত্তর ভূমিসকলের অস্তিত্ব এবং আমাদের উপর তাহাদের ক্রিয়ার ও তজ্জনিত প্রভাবের পরিচয় আমাদের নিকট অতি অন্তরঙ্গভাবে উপস্থিত করে; সংকীর্ণ পার্থিবসূত্রে বাঁধা যে শুদ্ধ জড়ভূমিব কথা আমরা জানি, এই সমস্ত লোক তাহার সঙ্কীর্ণ সত্তা ও ক্রিয়ার বাহিরে অবস্থিত। বৃহত্তর সত্তার এই সমস্ত ভূমি যে আমাদের সত্তা ও চেতনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া দূরে অবস্থিত আছে ইহা সত্য নহে; কেননা যদিও তাহারা নিজেদের মধ্যে নিজেরা অবস্থিত এবং

তাহাদের সত্তা ও অভিজ্ঞতার স্বকীয় বিশিষ্ট রূপায়ণ, নিজস্ব ভাবের প্রকাশ ও ক্রিয়াধারা আছে তথাপি তাহারা তাহাদের অদৃশ্য আবেশ ও প্রভাব লইয়া আমাদের জড়ভূমির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এবং সে ভূমিকে ঘিরিয়া বর্ত্তমান আছে এবং মনে হয় এখানে জড়-জগতের ক্রিয়া ও বস্তুরাজির পশ্চাতে তাহাদের শক্তি রহিয়াছে। এই সমস্ত ভূমির সংস্পর্শে প্রধানতঃ আমাদের মধ্যে দুই ভাবের অনুভূতি জাগে; একটি সম্পূর্ণ অন্তর্ম্মুখী অন্তর-চেতনাতে অনুভূতি, যদিও তাহা বলিয়া তাহা অস্পষ্ট বা অনুজ্জ্বল নয়; অপরটি প্রধানতঃ বহির্ম্মুখী চেতনাতে বাহিরে বিষয়রূপে অনুভূতি। অন্তর্ম্মুখী অনুভবে আমরা দেখিতে পাই যে যাহা এখানে প্রাণময় আকৃতি, প্রাণময় সংবেগ বা প্রাণময় রূপায়ণরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা প্রাণলোকে আরও বৃহৎ ও সূক্ষ্মরূপে আরও সাবলীল-ভাবে সম্ভাবনাসমূহের বৃহত্তর পবিধির মধ্যে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান আছে, এবং এই সমস্ত স্থায়ী শক্তি ও রূপায়ণসমূহ পার্থিব জগতে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য আমাদিগকে চাপ দিতেছে; কিন্তু এখানকার বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার এক অংশ মাত্র প্রকাশ হইতে সমর্থ হইতেছে এবং অংশতঃ যেটুকু উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে তাহাকেও জড়জগতের পরিবেশে জড়ের বিধান মানিয়া জড়জগতের উপযোগীরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হইতেছে। সাধারণতঃ আমাদের উপর এই সমস্ত উচ্চভূমির ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারেই চলে; তাহাদের শক্তি ও প্রভাব যে আমাদের উপরে ক্রিয়া করিতেছে তাহা আমরা জানি না; তাহাদের প্রভাব ও আবেশকে আমাদের প্রাণমনের বিসৃষ্টি বলিয়া ভুল করি, এমন কি যখন আমাদের বিচার-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি তাহাদিগকে উড়াইয়া দিতে চায় এবং তাহাদিগের দ্বারা যাহাতে প্রভাবিত না হয় তজ্জন্য চেষ্টারত থাকে তখনও তাহাদিগকে আমাদের প্রাণ ও মনের সৃষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করি; কিন্তু যখন আমরা সংকীর্ণ বহিশ্চেতনা হইতে সরিয়া গিয়া অন্তরের গভীরে প্রবেশ করি ও সূক্ষ্মদৃষ্টিশক্তি লাভ করি এবং গভীরতর চেতনাকে জাগাইয়া তুলি তখন এই সমস্ত ক্রিয়ার মূল উৎসের খবর পাই এবং তাহাদের ক্রিয়া ও ক্রিয়াধারা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি তখন তাহাদিগকে গ্রহণ, বর্জন অথবা তাহাদের রূপান্তর-সাধন করিতে সক্ষম হই, আমাদের মন ইচ্ছা প্রাণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে এবং এসমস্ত তাহাদিগকে ব্যবহার করিবার অধিকার দিতে অথবা না দিতে পারি। ঠিক তেমনিভাবে আমরা বৃহত্তর মনোলোকের সম্বন্ধেও সচেতন হইতে পারি, সেখানে দেখিতে পাই মনের কত খেলা, কত

অনুভূতি, নানাপ্রকার মনোময় রূপায়ণের কত অজস্র প্রাচুর্য্য এবং বৃহত্তর সাবলীলতার কত বৈচিত্র্য রহিয়াছে, তখন অনুভব করি যে আমাদের সহিত তাহাদের সংস্পর্শ ঘটিতেছে, অনুভব করি যে যেমন অব্যক্তভাবে প্রাণময় লোক হইতে প্রাণের উপর প্রভাব ও শক্তির বিস্তার হয় ঠিক তেমনিভাবে মনোময় লোক হইতেও মনের উপর শক্তি ও প্রভাব আসিয়া পড়ে। এই জাতীয় অনুভূতি প্রধানতঃ অন্তর্মুখী চেতনায় দেখা দেয়, তথায় ভাব বা ভাবনার, ব্যঞ্জনার, অবেগময় রূপায়ণের, ইন্দ্রিয়ানুভূতির, প্রবৃত্তির, ক্রিয়ার সক্রিয়ভাবে অনুভূতিলাভের একটা চাপ আসিয়া পড়ে। খুঁজিলে হয়ত দেখিতে পাওয়া যায় যে এ চাপের অনেক অংশ আমাদের নিজেরই অধিচেতন সত্তা অথবা আমাদের এই জগতেরই বিশ্বগত প্রাণ শক্তি ও মনঃশক্তির ভাণ্ডার হইতে আসে, তথাপি তাহার মধ্যে এমন উপাদান থাকে যাহা স্থায়ী অতিপ্রাকৃত জগৎ হইতে যে আগত তাহার ছাপ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত দেখা যায়।

ঊর্দ্ধলোকের সঙ্গে সংস্পর্শ এখানেই শেষ হয় না; কেননা আমাদের প্রাণ ও মনোময় অংশের কাছে অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে বিষয়রূপে অনুভব করা যায় (subjective-objective experience) তেমন একটা বিপুল বাজ্য খুলিয়া যাইতে পারে সে অনুভবে এই সমস্ত ভূমি শুধু সত্তা ও চেতনার অন্তর্মুখী বিস্তার বলিয়া আর মনে হয় না, তাহারা স্বতন্ত্র লোক বা জগৎরূপে দেখা দেয়; কেননা তখন দেখি আমাদের এই জগতে অনুভূতি যে ভাবে সংহত ও বিন্যস্ত হইয়া উঠে সেখানেও তদ্রূপ কিন্তু সেখানকার সংস্থানের বা বিন্যাসের পরিকল্পনা, ক্রিয়ার ধারা ও বিধান স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন এবং যে উপাদানের মধ্যে তাহা রূপায়িত হইয়া উঠে তাহাও জড়াতীত প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর মত সে সব লোকেও সত্তা সকলের অস্তিত্ব আছে, তাহাদের রূপ আছে বা তাহারা রূপ গ্রহণ করে অথবা দৈহিক উপাদানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে বা স্বভাবতই প্রকাশিত হয় কিন্তু সে উপাদান এখানকার মত স্থূল জড়বস্তু নয়; তাহা অনেক সূক্ষ্ম, শুধু সূক্ষ্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এক অজড় রূপময় বস্তু। সাধারণতঃ এই সমস্ত লোক এবং এই সমস্ত সত্তার সঙ্গে আমাদের এবং আমাদের জীবনের কোন যোগ নাই, তাহারা আমাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না; কিন্তু আবার অনেকসময় তাহারা গোপনে ভূলোক অর্থাৎ আমাদের এই পার্থিব জগতের সহিত যুক্ত হয়, তখন আমাদের অন্তর্মুখী চেতনায় যাহাদের অনুভূতি লাভ করিতে পারি এমন বিশ্বশক্তি ও প্রভাবসকলের আদেশ তাহারা পালন করে অথবা তাহাদের

বাহন ও যন্ত্ররূপে ক্রিয়া করে, তাই তাহাদের মধ্য দিয়া সেই সমস্ত শক্তি ও প্রভাব আমাদের উপর আসিয়া পড়ে ; অথবা কখন কখন তাহারা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া পার্থিব জীবনের, তাহার কাজকর্ম্মের, তাহার লক্ষ্যের বা তাহার ঘটনাস্রোতের মধ্যে আসিয়া ক্রিয়া করে। এই সমস্ত সত্তার নিকট আমরা উপকার বা অপকার লাভ করিতে পারি, ইহারা আমাদিগকে সুপথে বা কুপথে চালাইতে পারে ; এমন কি আমরা তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইতে, তাহাদের আক্রমণে বা আধিপত্যে এমনভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িতে পারি যে তাহাদের নিজেদের সু অথবা কু উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে আমাদের বাধে না। মধ্যে মধ্যে এক এক সময়ে পার্থিব জীবনের প্রগতি যেন জড়াতীত দুই জাতীয় শক্তির এক বিরাট যুদ্ধ-ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়, সে যুদ্ধের এক পক্ষে থাকে সেই সমস্ত শুভ শক্তি যাহারা জড়জগতে আত্মার আত্মপ্রকাশ এবং আমাদের ক্রমপরিণতির ঊর্দ্ধাভিমুখী সাধনাকে জয়যুক্ত ও প্রভাময় করিয়া তুলিতে চায়, অপর পক্ষে দেখা দেয় সেই সমস্ত অশুভ শক্তি যাহারা সেই সাধনাকে পথভ্রষ্ট খর্ব্ব ব্যাহত এমন কি বিধ্বস্ত করিতে চায়। এই সমস্ত সত্তা বা শক্তির কোন কোনটি আমাদের কাছে দিব্য, কোন কোনটি আসুর রাক্ষস বা পৈশাচিক ; দিব্য হইল তাহারা যাহারা জ্যোতির্ম্ময়, মানুষের পরমহিতৈষী এবং মহাবীর্য্যশালী সহায়, আসুর বা রাক্ষস জাতীয় হইল তাহারা যাহারা অমিত কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত বলশালী, যাহারা প্রায়ই মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করে বা তাহার অন্তর্জগতে এমন একটা বিরাট ও ভীষণ বিপ্লব অথবা এমন ক্রিয়াধারা আনয়ন করে যাহার প্রচণ্ড সংবেগ মানুষের সাধ্যের অতীত। তাহা ছাড়া আর এক ধরনের প্রভাব সান্নিধ্য বা সত্তার অনুভব আমরা লাভ করিতে পারি যাহা জড়োত্তর জগতের বস্তু বলিয়া মনে হয় না কিন্তু বোধ হয় তাহা এই ভূলোকের অন্তস্তলে যাহা গোপনে লুক্কায়িত আছে তেমন পার্থিব উপাদানে গঠিত কোন বস্তু। যেমন জড়াতীত বিষয়ের সংস্পর্শে আসা সম্ভব তেমনি যাহারা এক সময়ে দেহধারী সত্তারূপে এ জগতে বর্ত্তমান ছিল এবং যাহারা এই সমস্ত ভূমিতে জড়াতীত অবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাদের চেতনার সহিত আমাদের চেতনার সংস্পর্শ ঘটিতে পারে, এই সংস্পর্শ শুধু অন্তর্ম্মুখী চেতনায় বা অনুভূতির বিষয়-বস্তুরূপে—অন্ততঃপক্ষে চেতনায় বিষয়রূপে পরিণত হইলে—এই উভয়ভাবে হইতে পারে। চেতনার অন্তর্ম্মুখী অনুভূতি অথবা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বোধের মধ্য দিয়া এই সমস্ত লোকের সংস্পর্শ আমরা লাভ করিতে পারি, কিন্তু শুধু তাহাই

নহে, আমাদের অধিচেতনার কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বস্তুতঃ এই সমস্ত অপ্রাকৃত লোকে প্রবেশলাভ করিতে এবং সাক্ষাৎ-ভাবে তাহাদের কোন কোন গোপনরহস্য অবগত হইতে পারি। এই সমস্ত অপ্রাকৃত অনুভূতির মধ্যে যাহা অধিকতর বস্তুভাবাপন্ন তাহা প্রাচীনযুগে মানুষের কল্পনাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিযাছিল। কিন্তু সাধারণ লোকের মূঢ় সংস্কার ইহাদিগকে স্থূল বস্তুরূপে বিবৃত করিয়াছে, আমাদের পরিচিত পার্থিব জগতের সঙ্গে অযথাভাবে যুক্ত এবং ইহাদের স্বরূপ বিকৃত করিয়া দেখিয়াছে; কেননা সব কিছুকে আমাদের নিজস্ব অনুভবের উপযোগী ভাষায় ও প্রতীকে তর্জ্জমা করিয়া দেখাই আমাদের মনের সাধারণ ধর্ম্ম।

মোটের উপর অতীত সকল যুগেই জড়োত্তর জগতের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও অনুভূতির পরিধি এবং প্রকৃতি এই একরূপই ছিল বলিয়া মনে হয়; হয়ত তাহাদের নাম ও রূপ পৃথক হইয়াছে কিন্তু তাহাদেব অনুভবের সাধারণ আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে সকল দেশে এবং সকল কালে অতি বিস্ময়কর এক সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে। অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এই অটল বিশ্বাস ও স্তূপাকার অনুভূতির ঠিক কি মূল্য দিব? শুধু আকস্মিকভাবে বিচ্ছিন্নভাবে অবগত অনৈসর্গিক ব্যাপার রূপে নয় পরন্তু কতকটা অন্তরঙ্গভাবে যে এই সমস্ত লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহার পক্ষে এ সমস্ত কেবল কুসংস্কার বা ভ্রান্তি বলা সম্ভব নহে; কেননা এ সমস্ত অনুভূতি এরূপ দৃঢ়তার সহিত আসে, তাহারা এমন বাস্তব ও কার্য্যকরী, তাহাদের প্রভাব এমন সংহত, ক্রিয়ায় ও তাহার পরিণামে তাহারা পুনঃপুনঃ এমনভাবে সমর্থিত হয় যে তাহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না; আমাদের অনুভবের এদিকের শক্তিকে মনন দ্বারা সংহত ও সুবিন্যস্ত করা ইহার একটা প্রকৃত মূল্যাবধারণ এবং সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

এই একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে যে মৃত্যুর পরে জড়াতীত যে সকল লোকে মানুষ বাস করে অথবা বাস করে বলিয়া মনে করে সে সমস্ত লোক সে নিজেই সৃষ্টি করিয়াছে; প্রাচীন ভাষায় বলা হয় যে সে নিজেই দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছে, এমন কি এতদূর পর্য্যন্ত দাবি করা হয় যে ঈশ্বরও মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন, ঈশ্বর তাহার চেতনার একটা কল্পনা একটা বিভ্রম, আজ মানুষ তাহাকে উড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে! চেতনার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষই কল্পনার জাল বুনিয়া এই সম মিথ্যাবস্তু সৃষ্টি করিয়াছে এবং নিজ

রচিত সেই মিথ্যার জালে নিজে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে; এক ধরণের ক্রিয়া ও গতির ফলে তাহার কল্পনার এই অবাস্তব রূপ বজায় রহিয়াছে। কিন্তু এসমস্ত শুদ্ধ কল্পনা নয়, তাহাদিগকে কেবল ততক্ষণই কল্পনা বলিয়া মনে করিতে পারি যতক্ষণ যে বস্তুকে তাহারা নির্দ্দেশ করে, তাহা যতই আশ্চর্য্য-ভাবে হউক না কেন, আমাদের অনুভূতির মধ্যে আসিয়া না পড়ে। তথাপি শেষ পর্য্যন্ত তাহারা কল্পনা বা মিথ্যাবস্তু হইতে পারে, সৃষ্টিশীলা চিৎশক্তি আপনার ভাবসংবেগকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য হয়ত এ কল্পনা ব্যবহার করিতেছে; কল্পনার বীর্য্যশালী এই সমস্ত মূর্ত্ত বিগ্রহ রূপায়িত হইয়া সূক্ষ্ম-ভৌতিক চিন্তালোকে হয়ত স্থায়ী হয় এবং তথা হইতে তাহারা তাহাদের স্রষ্টার উপর প্রভাব বিস্তার করে, যদি তাহাই হয় তবে আমরা মনে করিতে পারি যে জড়াতীত লোক সকলও এমনিভাবে কল্পনারচিত বস্তু। কিন্তু অন্তর্ম্মুখী চেতনার কল্পনার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ও সত্তার সৃষ্টি যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে স্থূল বস্তুজগৎও চেতনার এমন কি আমাদের ব্যষ্টিচেতনার কল্পনা হইতে পারে; চেতনার পক্ষে নিজেই অনাদি নিশ্চেতনার একটা অলীক কল্পনা হইতেই বা বাধা কি? এমনভাবের যুক্তিধারা অনুসরণ করিতে গেলে আমরা বিশ্ব-সম্বন্ধে সেই মতবাদে ফিরিয়া যাই যাহাতে সর্ব্বপ্রসবিনী এক নিশ্চেতনা যাহা হইতে সর্ব্ববস্তু জাত হয়, এবং এক অবিদ্যা যাহা সর্ব্ববস্তু সৃষ্টি করে তাহারাই হয় শুধু সত্য বস্তু, অন্য সব কিছুর উপর পড়ে মিথ্যার একপ্রকার করালছায়া; এবং ইহা হইতে পারে যে এক অতিচেতন বা অচেতন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা আছে যাহার উদাসীনতার মধ্যে অবশেষে সকল বস্তুই ফিরিয়া বা ডুবিয়া যায় অথবা বিলয়প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে মানুষের মন যে শুধু শূন্যের মধ্যে শূন্যের উপর ভিত্তি করিয়া কোন উপাদান না লইয়া যেখানে কোন জগৎ ছিল না তথায় এইভাবে একটা জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন প্রমাণ নাই, তাহার কোন সম্ভাবনাও নাই, যদিও একথা মানিতে পারি যে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান কোন জগতে কিছু যোগ করিয়া দিবার বা কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিবার শক্তি মনের আছে। বস্তুতঃ মনের অসাধারণ শক্তি আছে, এত শক্তি আছে যে আমরা তাহা সহজে কল্পনাও করিতে পারি না; ইহা এমন সকল রূপায়ণ গড়িয়া তুলিতে পারে যাহা আমাদের নিজের এবং অপরের চেতনা ও জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এমন কি অচেতন জড়কেও প্রভাবিত

করিতে পারে ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও মহাশূন্যে সম্পূর্ণ নূতন কিছু সৃষ্টি করা তাহার সাধ্যাতীত। শুধু এইটুকু আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে মানবমনের যেমন পরিণতি হইতে থাকে তেমনি সে তাহার কাছে যাহা নূতন, সত্তা ও চেতনার সেই সমস্ত ভূমিতে প্রবেশ করিতে এবং তাহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে কিন্তু তাহার কাছে তাহারা নূতন হইলেও তাহার নিজের দ্বারা তাহারা সৃষ্ট নহে, সর্ব্ব সতের মধ্যে তাহাদের অস্তিত্ব পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। অন্তরের অনুভূতির বিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাহার নিজের সত্তার মধ্যে নূতন নূতন স্তর বা ভূমির সন্ধান পায়, তাহার অন্তশ্চেতনার বিভিন্ন কেন্দ্রের গোপনগ্রন্থি-সকল যেমন ছিন্ন হইতে থাকে সে তাহাদের মধ্য দিয়া এই সমস্ত বৃহত্তর রাজ্যের ধারণা করিতে, সাক্ষাৎভাবে তাহাদের নিকট হইতে শক্তি ও প্রভাব লাভ করিতে, তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে, তাহার প্রাকৃত মন ও অন্তরিন্দ্রিয়ে তাহাদের প্রতিচ্ছবি ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হয়। মানুষ এই সমস্ত জড়াতীত লোকের প্রতিচ্ছবি, প্রতীকরূপ বা ভাববিগ্রহ সৃষ্টি করে এবং মনেব সাহায্যে তাহাদের লইয়া কারবার করিতে পারে ; কেবল এই অর্থে বলিতে পারি যে ভগবানের যে মূর্ত্তির উপাসনা করে তাহা সে নিজেই গড়িয়া লয়, এই অর্থেই সে দেবতা-গণের রূপ, নিজের মধ্যে নূতন ভূমি ও নূতন জগৎ সৃষ্টি করে ; এই সমস্ত রূপ ও প্রতিচ্ছবির মধ্য দিয়া আমাদের অস্তিত্বের শীর্ষদেশে অবস্থিত সত্য জগৎ এবং সত্য শক্তিসকল জড়জগতের মধ্যস্থিত চেতনাকে অধিকার করিতে পারে ; সেই চেতনাতে তাহাদের শক্তিপ্রপাত নামিয়া আসিতে তাহাদের উচচতর সত্তার আলোকে সে চেতনার রূপান্তর সাধিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার অর্থ সত্তার উচচতর লোক সকল সৃষ্টি করা নহে ; জড়জগতে অবস্থিত আত্মার চেতনা যেমন নিশ্চেতনা হইতে বিকশিত ও বিবৃদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে তেমনি তাহার কাছে এই সমস্ত লোক আত্মপ্রকাশ করে। উচচতর জগতের শক্তিপ্রপাত গ্রহণ করিয়াই এখানে তাহাদের রূপসৃষ্টি সাধিত হয় ; আমাদেরই সত্তার উচচতর ভূমির সহিত আমাদের যে সত্যসম্বন্ধ নিশ্চেতন জড়ের আবরণে আবৃত ছিল বলিয়া দেখা যাইতেছিল না তাহাকে আবিষ্কার করিয়া এই জড়ভূমিতে আমাদের অন্তর্জীবনের এই রূপ সম্প্রসারণ ঘটে। এই আবরণ রহিয়াছে, কেননা দেহস্থিত আত্মা এই আবরণের পশ্চাতে তাহার বৃহত্তর সম্ভাবনাসকল লুকাইয়া রাখিয়াছে, যাহাতে জড়জগতে তাহার যে প্রাথমিক কার্য্য আছে তাহাতে তাহার চেতনা ও শক্তিকে ঐকান্তিকভাবে অভিনিবিষ্ট করিতে পারিবে,

কিন্তু আদিকাণ্ডের এই আয়োজনের পরবর্ত্তী কাণ্ডকে আসিতে হইলে এই আবরণকে অন্ততঃ আংশিকভাবে সরাইয়া ফেলিতে হইবে অথবা তাহাকে এমন ভাবে দীণ বা ছিন্ন করিতে হইবে যাহাতে মন প্রাণ ও চিদ্‌বস্তুর উচচতর ভূমিসকল মর্ত্ত্যজীবনের উপর তাহাদের তাৎপর্য্যের ধারা ঢালিয়া দিতে পারে।

এমনও কল্পনা করা যাইতে পারে যে, জড়বিশ্ব সৃষ্টির পরে তাহার পরিণামধারার সহায় অথবা এক অর্থে তাহার স্বাভাবিক ফলরূপে এই সমস্ত উর্দ্ধ্বভূমি এবং লোকসকল সৃষ্ট হইয়াছে। একমাত্র যাহাকে সে জানে, যাহাকে সে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছে এবং যাহার উপর সে আধিপত্যবিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং যাহাকে লইয়া কারবার করিতে সে অভ্যস্ত হইয়াছে, জড়ময় মন সেই জড় বিশ্বকেই তাহার সকল ভাব ও ভাবনার আদি বিন্দু মনে করিয়া যাত্রারম্ভ করিয়াছে বলিয়া সে এই মতবাদ পোষণ করে; তাই সেই জড়ময় মন জড়াতীত লোকসকল স্বীকার করিতে যদি বাধ্য হয় তবে জড়বিশ্বের পরে তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে এ ধারণা সে বেশ সহজেই মানিয়া লইতে পারে; নিশ্চিতরূপে নিশ্চেতনা এবং জড়বিশ্ব হইতে যেমন আমাদের পরিণামধারা উদ্ভূত হইয়া জড় বিশ্বের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে এক্ষেত্রে তেমনি নিশ্চেতনা ও জড়কে সকল সত্তাব উৎপত্তিব আদিবিন্দু এবং আশ্রয় বা আধার মনে করিয়া সে মন তৃপ্ত হইতে পারে। আমরা জড়কেই প্রথম জানিতে পারিয়াছি, মনে হয় জড়ই একমাত্র বস্তু যাহা নিশ্চিয়রূপে বর্ত্তমান আছে, তাহাকেই কেবল আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি এই জন্য জড় বা জড়শক্তিকে আদি সদ্‌বস্তু বলিয়া যখন মানিয়া লইয়াছি, তখন আমরা চিন্ময় ও জড়াতীত বস্তু সকল জড়তত্ত্বের* সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে এই সমস্ত লোক কোন্ শক্তির বশে, কাহাকে নিমিত্ত করিয়া কিরূপে সৃষ্ট হইল? উত্তরে বলা হইতে পাবে যে নিশ্চেতনা হইতে যখন প্রাণ ও মনের উন্মেষ ও পরিণতি হইল তখন সেই সঙ্গে তাহারাই জগদ্‌বাসী নিখিল প্রাণীব অধিচেতনায় এই সমস্ত অন্যজগৎ ও ভূমি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অধিচেতন পুরুষেব কাছে জীবনে এবং মৃত্যুর পরেও—কেননা এই অন্তরপুরুষ মৃত্যুর পরও বাঁচিয়া থাকে—এ সমস্ত জগৎ সত্য বলিয়াই মনে হইতে পারে,

* মনে হয় যেন ঋগ্বেদের কোন কোন বাক্যে এ মতের সায় আছে। পৃথিবীকে বা পৃথ্বী-তত্ত্বকে সেখানে সকল লোকের প্রতিষ্ঠা অথবা সপ্তলোককে পৃথিবীর সাতটি ভূমি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

কেননা তাহার বিপুলতর চেতনায় এ সমস্ত বোধগম্যরূপেই বর্ত্তমান থাকে ; অধিচেতন পুরুষ এই সমস্ত জগৎ অন্য বস্তু হইতে উৎপন্ন মনে করিলেও তাহারা যে সত্য এই নিশ্চিত বোধ লইয়া এ সমস্ত জগতে বিচরণ করিবে এবং তাহার অনুভূতি বহিশ্চেতন সত্তার মধ্যে বিশ্বাস বা কল্পনাব আকারে সঞ্চারিত করিবে। চেতনাকেই যদি স্থষ্টির প্রকৃতশক্তি বলিয়া গ্রহণ করি সর্ব্ববস্তুই যদি চেতনার রূপায়ণ হয় তবে এ বিবরণ অসম্ভব নাও হইতে পাবে কিন্তু জড়ময় মন জড়াতীত ভূমিসকলকে যেমন অবাস্তব বা অনতিবাস্তব বলিতে চায় তেমন বলা আর চলে না ; তখন স্বীকার করিতে হয় জড় জগৎ অথবা প্রাকৃত অনুভবের ভূমি যতখানি সত্য এ সমস্ত লোকও ঠিক ততখানিই সত্য।

যদি এই ভাবে অথবা অন্য কোন ভাবে নিশ্চেতনা হইতে কোন বৃহত্তর গোপন পরিণামের বশে উচচতর লোক সকল, আদিতে জড় জগৎ স্থষ্টির পরে স্থষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলেও মানিতে হইবে যে তাহা অখিলাত্মার আত্মস্ফুরণের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে, অবশ্য কোন্ ধারা বা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সে স্ফুরণ সম্ভব হইয়াছে তাহা আমরা জানি না, তবে বলিতে হয় যে তাহা এখানকার পরিণতির একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার অথবা বৃহত্তর পরিণাম রূপে তিনি ইহা ঘটাইয়াছেন যাহাতে মন প্রাণ এবং চেতনা এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বাধীনতর ভাবে বিচরণ করিতে এবং এই সমস্ত বৃহত্তর শক্তি ও অনুভূতির প্রতিধ্বনি জড়ের মধ্যে তাহার আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আসিয়া এই তথ্য দাঁড়ায় যে আমরা আমাদের অনুভূতিতে এবং অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে দেখিতে পাই যে এ সমস্ত উচচতর লোক কোন প্রকারেই জড় বিশ্বের ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়, কোনরূপেই তাহাদিগকে জড় বিশ্বের পরিণাম বলা চলে না, বরং দেখা যায় তাহারাই বৃহত্তর বস্তু, তাহাদের মধ্যে চেতনার বৃহত্তর ও স্বাধীনতর প্রসারতা আছে এবং জড়ভূমির ক্রিয়াবলি এই সমস্ত বৃহত্তর ভূমির উৎপত্তিস্থান নয় বরং পরিণাম বলিয়াই যেন মনে হয়, মনে হয় যেন জড়ভূমির সকল ক্রিয়ার মূল উৎস জড়োত্তর এই সকল ভূমিতেই রহিয়াছে, এমন কি জড়-জগতের পরিণাম প্রচেষ্টাও অংশত তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। অধি-মানস এবং প্রাণ ও মনের উর্দ্ধ লোক বা স্তর হইতে অমিত শক্তির প্রভাব ও ঘটনার স্রোত প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের উপর নামিয়া আসে কিন্তু এই সমস্তের মধ্যে একটা অংশ বা নির্ব্বাচিত অতি অল্পসংখ্যক মাত্র এখানে প্রকাশ্যে অভিনয় করিতে বা জড় জগতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ; বাকি সকল

জড়ের রূপে রূপায়িত হইবার জড়ের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায়, যে পার্থিব * পরিণামে চিৎসত্তার সমস্ত শক্তিই প্রস্ফুরিত ও পরিণত হইয়া উঠিবে, তাহার মধ্যে তাহাদের যথাযোগ্য ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে।

অন্য জগৎ সকলের এই প্রকৃতি, এই প্রাকৃত ভূমিকে এবং আমাদের জীবন-নাট্যের অভিনয়কে মুখ্যস্থান দেওয়ার দিকে আমাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দেয়। ঈশ্বরকে আমাদের চেতনার দ্বারা সৃষ্ট একটি মিথ্যাবস্তু বলিতে পারি না, বরং আমরাই জড় সত্তার মধ্যে ঈশ্বরের ক্রমিক আত্মপ্রকাশের বাহন বা যন্ত্রমাত্র। আমরা দেবতাগণকে সৃষ্টি করি না, তাহারা ঈশ্বরের শক্তি বা বিভূতি; বরং বলিতে পারি যে দিব্যভাবের প্রকাশ আমাদের মধ্যে ঘটে তাহা অমর ও নিত্য দেবতাগণেরই আংশিক প্রতিফলন বা খণ্ড রূপায়ণ। উচ্চতর ভূমি বা লোক সকলও আমাদের সৃষ্টবস্তু নহে বরং আমাদিগকে মধ্যবর্ত্তী বা বাহনরূপে গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত লোকই তাহাদের আলোক, শক্তি ও সৌন্দর্য্য এখানে ফুটাইয়া তুলিতেছে—প্রাকৃতিকশক্তি জড় জগতে তাহা-দিগকে রূপ দিতে তাহাদিগের যেটুকু প্রসারতা ঘটাইতে পারে তদনুরূপভাবে। আমরা আজ পর্য্যন্ত প্রাণের যে রূপের সঙ্গে পরিচিত তাহা প্রাণময় জগতের চাপেই এখানে এই জগতে উন্মিষিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; সেই প্রাণ-লোকের ক্রমবর্দ্ধমান চাপ প্রাণের আরও বৃহত্তর আত্মপ্রকাশের আস্পৃহা আমাদের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতেছে এবং একদিন আসিবে যেদিন সেই চাপে জড়ত্বের যে সঙ্কোচ তাহাকে আজ অশক্ত ও সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা হইতে মর্ত্ত্যজীব মুক্ত হইবে। মনোময় লোকের চাপেই এখানে এই জগতে মনের উন্মেষ ও পুষ্টি হইয়াছে, সেই চাপই আমাদের মনোময় জীবনকে উপরে তুলিবার ও প্রসারিত করিবার শক্তি দিয়াছে, তাই আমরা আশা করিতে পারি ইহা আমাদের বুদ্ধিময় সত্তাকে ক্রমশঃ বৃহত্তর ও মহত্তর করিয়া তুলিবে; এমন কি একদিন জড়ে আবদ্ধ আমাদের স্থূল মনের চারিদিকে যে কারাপ্রাচির আছে তাহাও ভাঙিয়া দিবে। আবার অতিমানস ও চিন্ময় লোক-সমূহের চাপই এখানে এই জগতে আমাদিগকে চিন্ময় শক্তিপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে

---

* এখানে পার্থিব শব্দে আমরা এই একমাত্র পৃথিবী এবং তাহার আয়ুষ্কাল লক্ষ্য করিতেছি না, বৈদান্তিকের' ধাতুগত বা মৌলিক এবং উদারতর যে অর্থে পৃথিবী বা পৃথ্বীতত্ত্ব শব্দ ব্যবহার করেন যাহা জীবাত্মার জড়রূপের আবাসভূমি সৃষ্টি করে—সেই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি।

গঠিত এবং অতিচেতন দিব্যপুরুষের পরমস্বাতন্ত্র্য ও আনন্ত্যের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য এই জড়ভূমিতে অবস্থিত আমাদের সত্তাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে ; কেবল এই চাপ এই সংস্পর্শ ই আমাদের মধ্যে সর্ব্বচেতন পরম-পুরুষ যেখানে গুপ্ত ও সুপ্ত হইয়া আছেন এবং যেখান হইতে আমাদের পরিণতি-পথের যাত্রারম্ভ হইয়াছে সেই আপাতপ্রতীয়মান নিশ্চেতনা হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে। এইভাবে পর পর ক্রমোর্দ্ধ শক্তির যে অবতরণ ও প্রকাশ হইতেছে মানুষের চেতনা হইল তাহার বাহন ও মাধ্যম ; মানবচেতনাই সেই বিন্দু যেখানে নিশ্চেতনা হইতে মুক্তি পাইয়া আলোক ও শক্তির উন্মেষ ও পুষ্টি ঘটিতে পারে ; মানুষের চেতনার ইহাপেক্ষা বৃহত্তর কোন সার্থকতা নাই, কিন্তু এ সার্থকতা অতি বিশাল অতি বিপুল, কেননা পরিণামশীল প্রকৃতির পরম ও চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহাই মানুষকে অতি প্রয়োজনীয় বস্তু করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু অধিচেতন ভূমির কোন কোন অনুভব হইতে যেন মনে হয় যে অন্য লোক সকলের সৃষ্টি সর্ব্বতোভাবে জড় সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী নয়। এইরূপ একটা ইঙ্গিত বা নিদর্শন পাই যখন আমরা দেখি যে মরণোত্তর অনুভূতির সম্বন্ধে আবহমান কাল হইতে একটা জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে মৃত্যুর পর জড়োত্তর ভূমিতে পৌঁছিয়া যে অস্তিত্বের ধারা চলিতে থাকে, যেন তাহাতে পার্থিব পরিবেশ, পার্থিব প্রকৃতি ও পার্থিব অনুভবের অনুবৃত্তি চলিতে থাকে। আর একটা ইঙ্গিত পাই যখন বিশেষভাবে প্রাণলোকে এমন কতকগুলি রূপায়ণের সন্ধান পাই, যাহাদের প্রকৃতি ভূলোকের নিম্নতর গতি ও প্রবৃত্তিরই অনুরূপ ; যে সমস্ত অন্ধকারময় তত্ত্ব, অসত্য, শক্তিহীনতা এবং অনর্থকে আমরা নিশ্চেতন জড় হইতে যে পরিণতিধারা উদ্ভূত হইয়াছে তাহার ফল বলিয়া মানিয়া লইয়াছি, তাহাদিগকে এখানে পূর্ব্ব হইতে রূপায়িত ও সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। এমন কি ইহাই যেন সত্য বলিয়া মনে হয় যে, যে-সমস্ত শক্তি মানুষের জীবনে সর্ব্বা-পেক্ষা বৃহৎ বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এই সমস্ত প্রাণলোকই তাহাদের স্বাভাবিক নিবাসভূমি ; বস্তুতঃ ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, কেননা আমাদের প্রাণময় সত্তার মধ্য দিয়াই আমাদের উপর তাহারা প্রভুত্ব বিস্তার করে, সুতরাং বৃহত্তর ও বীর্য্য-বত্তর কোনও প্রাণসত্তার শক্তি হওয়াই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। পরিণামধারার মধ্যে প্রাণ ও মনের অবতরণের ফলে এই অবাঞ্ছনীয় পরিণতি এবং সত্তা ও চেতনার এরূপ সঙ্কোচ আসিবার কোন কারণ নাই ; কেননা এরূপ অবতরণের

প্রকৃতি শুধু জ্ঞানের সঙ্কোচ। তাহাতে তাহার প্রকৃতিতে সৎ চিৎ ও আনন্দের প্রকাশ, সত্য শিব ও সুন্দরের এক সংকীর্ণ পরিসরের ভিতরে এক নিম্নতর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের মধ্যে এক ক্ষুদ্রতর আলোকের ক্ষেত্রে ও বিধানে ঘটিবে; কিন্তু তাহাতে অন্ধকার জ্বালাযন্ত্রণা ও অনর্থকে আসিতেই হইবে এমন কোন বাধ্যতামূলক বিধান বা ব্যবস্থা নাই। মন ও প্রাণের এই সমস্ত লোকান্তরে অতি ব্যাপকভাবে না হইলেও অন্ততঃ কোন কোন পৃথক অংশকে অধিকার করিয়া যদি এই সমস্ত অশুভকে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়, তবে তাহার কারণ দু-এর অন্যতম হইবে; হয় প্রকৃতির নিম্নতর পরিণামধারার এক অংশ নিম্ন হইতে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইবার ফলে নিম্নে সৃষ্ট কোন অনর্থ আমাদের অধিচেতন প্রকৃতির মধ্যে উত্থিত হইয়া প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত ও স্ফুরিত হইয়া পড়িয়াছে; না হয় চিৎস্বরূপের অবরোহ বা সংবৃতির ধারা জড় পর্য্যন্ত নামিবার পূর্ব্বেই সংবৃতি ধারার অবরোহণের এক ধাপের সঙ্গে তাহার পাশাপাশিভাবে বিবৃতির বা চিতের দিকে আরোহের এক অঙ্গ একটা সোপান বা স্তররূপে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। শেষোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে এইরূপভাবে আরোহের স্তরসৃষ্টি দুইটি উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। কারণ প্রকৃতির মধ্যস্থিত আত্মার পরিণতির পথে পুষ্টির জন্য অপরিহার্য্য সংঘর্ষ ও সংগ্রামের জন্য পৃথিবীর বুকে যে শুভ ও অশুভ শক্তিকে উন্মিষিত হইয়া উঠিতে হইবে তাহাদের প্রাক্ রূপায়ণ বা প্রাক্তন প্রকাশ এই স্তরের মধ্যে থাকিবে; তাহাদের নিজের, তাহাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র তৃপ্তির জন্য এই সমস্ত রূপায়ণ বর্ত্তমান থাকিবে, যে রূপায়ণে প্রত্যেকের পৃথক প্রকৃতি অনুসারে আত্মপ্রকাশের একটা পূর্ণ জাতিরূপ (full type) দেখা দিবে, সেই সঙ্গে তাহারা পরিণামশীল সত্তাসমূহের উপর তাহাদের বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করিবে।

তাহা হইলে বৃহত্তর জীবনের এই সমস্ত লোকের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে আমাদের পার্থিবজীবনেরই আরও জ্যোতির্ম্ময় এবং আরও অন্ধকারময় রূপায়ণ-সমূহ; সেখানকার ক্ষেত্রে এ সমস্ত সত্তার স্বতন্ত্র প্রকাশ অব্যাহতভাবে চলিতে এবং সু অথবা কু যাহাই হউক তাহাদের নিজস্ব জাতিধর্ম্ম স্বাধীন ও স্বাভাবিক-ভাবে পূর্ণতা পাইতে, একটা সামঞ্জস্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—অবশ্য সু এবং কু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সেখানে প্রযোজ্য হইতে পারে কিনা সন্দেহ; ইহা-দের এরূপ স্বতন্ত্র এবং পূর্ণ প্রকাশ আমাদের এই প্রাকৃত জগতে সম্ভব নয়, যেখানে পরিণামের যে নানামুখী ধারাসমূহ চরমে এক পরমসমন্বয়ের দিকে

আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে তাহার প্রয়োজনবশে সব আসিয়া এক জটিল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় মিশ্রিত হইয়া পড়ে। কারণ আমরা যাহাকে মিথ্যা, অন্ধকার বা অশিব বলি, মনে হয় যেন তথায় তাহাদের একটা নিজস্ব সত্য আছে, সেখানে যেন তাহারা নিজেদের জাতিধর্ম্ম লইয়া পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট, কেননা তথায় তাহার পূর্ণ প্রকাশ অব্যাহত বলিয়া আত্মশক্তিতে একটা স্বাভাবিক তৃপ্তি পরিবেশের সহিত নিজ সত্তার একটা পূর্ণমিলন ও সামঞ্জস্য দেখা দেয়; তাহারা তাহাদের আত্মচেতনার একটা ছন্দ, আত্মশক্তির একটা মহিমা, আত্মস্বরূপের একটা আনন্দ উপলব্ধি করে এবং আমাদের কাছে হেয় বোধ হইলেও তাহাদের বাসনার পরিপূরণ তাহাদিগকে তৃপ্তি দেয় এবং তাই তাহাদের নিজেদের কাছে তাহা হর্ষোল্লাসময় উপাদেয় বলিয়াই মনে হয়। পার্থিব প্রকৃতির কাছে যাহা অপরিমেয় ছন্নছাড়া তথায় যাহা বিকৃত ও অস্বাভাবিক মনে হয় সেই প্রাণ সংবেগ এখানে নিজসত্তাব উপযোগী ক্ষেত্র পায়, স্বতন্ত্রভাবে এখানে পূর্ণ হইয়া উঠিবার অথবা নিজ জাতিধর্ম্মের নিরঙ্কুশ খেলার সুযোগ পায়। আমরা যাহা দিব্য আসুরিক রাক্ষস বা পৈশাচিক মনে করি তাহারা আমাদের কাছে অতিপ্রাকৃত বা অস্বাভাবিক মনে হইলেও আপন স্বধামে নিজের কাছে তাহারা স্বাভাবিক; এই সব ভাব যাহাদের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়াছে তাহারা তথায় অনুভব করে যে ইহাই তাহাদের আত্মপ্রকৃতি তাহাদের নিজস্বতত্ত্বের একটা সামঞ্জস্য। বৈষম্য সংঘাত শক্তিহীনতা ও জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে প্রাণের একপ্রকার তৃপ্তি আছে, এ সমস্ত হইতে বঞ্চিত হইলে অচরিতার্থতার এবং অপূর্ণতার বেদনা তাহারা অনুভব করে। যেখানে তাহাদের অবাধ অধিকার সেই সমস্ত গোপন লোকে তাহারা স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিয়া তাহাদের জীবনসৌধ গড়িয়া তুলিতেছে ইহা যখন দেখা যায় তখন তাহাদের উৎপত্তিস্থল কোথায়, তাহাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা কি, কোন্ কারণে তাহারা মানুষের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে তাহা যেমন আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যায় তেমনি বুঝা যায় মানুষ তাহার নিজের অপূর্ণতায়, তাহার জীবননাট্যের জয় পরাজয়ে, সুখদুঃখে, হাসি অশ্রুতে পাপ পুণ্যে কি রস পায় এবং কেন আসক্ত থাকে। এখানে এই পৃথিবীতে এই সমস্ত শক্তি বা সত্তা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, তাই এখানে তাহারা সংঘাত ও সংমিশ্রণের অবাঞ্ছিত অবস্থায় নিষ্প্রভ ভাবে অবস্থিত থাকে; কিন্তু তাহাদের নিজের জগতের নিজের ঐকান্তিক পরিবেশের মধ্যে যখন তাহারা নিজের স্বাভাবিক শক্তিতে তাহাদের প্রকৃতির পূর্ণস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন তাহা-

দের প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব, তাহাদের প্রয়োজনের সকল রহস্য প্রকাশ পায়। এই সমস্ত শক্তি নিজস্বরূপে যখন অবস্থান করে এবং যখন তাহাদের অমর্ত্ত্য-জীবন হইতে মানুষের জীবনে তাহাদের শক্তিধারা প্রবাহিত করিয়া তাহার পরিণতিধারায় উপাদান যোগাইয়া দেয় তখন তাহাদের অনুভূতির ভিত্তি হইতেই মানুষের স্বর্গ এবং নরক অথবা জ্যোতি-লোক এবং অন্ধকার-জগতের ধারণা জন্মে—তাহার মধ্যে যতই কল্পনার স্থান থাকুক না কেন।

প্রাণের শক্তিসকল যেমন জড়জগতের অতীত বৃহত্তর প্রাণলোকে পূর্ণ মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া আছে তেমনি মনের যে-সমস্ত শক্তি, ভাবনা ও তত্ত্ব আমাদের পার্থিব সত্তার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহারা তাহাদের নিজক্ষেত্রে বৃহত্তর মানসলোকে তাহাদের আত্মপ্রকৃতির পূর্ণ মহিমা লইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; তথা হইতে তাহারা আমাদের পার্থিব সত্তাতে কেবল আংশিক রূপায়ণ ফুটাইয়া তোলে, কেননা এখানে অন্য শক্তি এবং তত্ত্বের সহিত সংঘাত ও সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে বহু বাধা আসিয়া পড়ে, এই সংঘাত ও সংমিশ্রণ তাহাদের পণতাকে ব্যাহত, তাহাদের বিশুদ্ধতাকে খাদ মিশ্রিত, তাহাদের প্রভাবকে কুণ্ঠিত ও পরাভূত করিয়া দেয়। সুতরাং এই সমস্ত লোক পরিণামশীল নয়, পরিণতিবিহীন ধর্ম্ম বা প্রকৃতি লইয়া তাহারা বর্ত্তমান আছে; তাহাদের অস্তিত্বের একমাত্র না হইলেও একটা কারণ এই যে সংবৃতি-পরিণামে যে সমস্ত বস্তুর অবশ্যপ্রকাশ হয় এবং বিবৃতি-পরিণামে যে সব কিছু উৎক্ষিপ্ত হয়, সেই উভয়বিধ বিসৃষ্টি যেখানে নিজেদের অধিকারে নিজেরা বর্ত্তমান থাকিতে পারে, নিজেদের তাৎপর্য্য সফল করিতে পারে, এসমস্ত জগৎ তাহাদের আত্মচরিতার্থতার তেমন ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারে এবং প্রতিষ্ঠিত এই অবস্থার ভিত্তি হইতে প্রকৃতি পরিণামের জটিল বৈচিত্র্যের মধ্যে উপাদানরূপে তাহাদের নিজেদের প্রবৃত্তি প্রভাব ও কর্ম্মধারা নিক্ষেপ করিতে পারে।

অন্যলোকের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে তাহা যদি এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখি তবে দেখিব যে তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ পার্থিব প্রাণের সঙ্কোচ ও অপূর্ণতা হইতে মুক্ত বৃহত্তর এক প্রাণলোকের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিবরণে স্পষ্টতঃ কল্পনার ভাগ প্রচুর আছে বটে কিন্তু বোধি ও অনুপ্রেরণাজাত জ্ঞানের উপাদানও কিছু আছে, ইহার কোন্ ভূমিতে প্রাণের কি রূপ হইতে পারে অর্থাৎ তাহার সাধ্যরূপ কি হইবে অথবা সে লোকে প্রকাশের মধ্যে বস্তুতঃ প্রাণ কি রূপ ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছে

তাহার একটা বোধ বা পরিচয় ইহাতে পাই, তাহাতে অধিচেতন সংস্পর্শ ও অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ কোন কোন উপাদানের সাক্ষাৎও পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির অন্যভূমিতে মানুষ যাহা দেখে বা তথা হইতে যাহা কিছু স্পর্শ লাভ করে তাহা তাহার নিজের উপযুক্ত চেতনার ভাষায় রূপান্তরিত করে, জড়োত্তর তত্ত্বাবলির এইরূপে সার্থকভাবে পার্থিবরূপ ও বিগ্রহে অনুবাদ করিয়া সেই সমস্ত রূপের মধ্য দিয়া তত্ত্বসকলের সহিত সে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং এইভাবে তাহাদিগকে কতকটা মূর্ত্ত ও কার্য্যকরী করিয়া তোলে। মৃত্যুর পরে প্রকারান্তরে পার্থিবজীবনের যে অনুবৃত্তি চলিবার কথা শুনা যায় এইভাবের অনুবাদ হইতে তাহার একটা ব্যাখ্যা মিলিতে পারে; মৃত্যুর পর পার্থিবজীবনের এই অনুবৃত্তিকে বিদেহী জীবের কতকটা মানসসৃষ্টিও বলা যাইতে পারে যাহার মধ্যে অন্য লোকে যাইবার পথে কিন্তু তথায় প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে অভ্যস্ত অনুভবের সংস্কারকে সে আঁক্‌ড়িয়া ধরিয়া কিছুকাল বাস করে, অংশত এই সমস্ত প্রাণলোকের মধ্য দিয়া যাইবার পথে সেই সমস্ত সিদ্ধরূপ প্রকাশিত আছে দেখিতে পায়, যাহারা পার্থিব দেহে যাহাদের প্রতি সে অনুরক্ত হইয়াছিল তাহাদের সমধর্ম্মী ও উৎসস্বরূপ; সুতরাং প্রাণময় সত্তা দেহান্তের পর স্বাভাবিকভাবে এ লোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রাণময় এ সমস্ত সূক্ষ্মভূমি ছাড়া জনশ্রুতিতে উচ্চতর এক ভূমি বা লোকের বর্ণনা পাওয়া যায় যাহার প্রকৃতি স্পষ্টত প্রাণময় নয়, মনোময়; তাহা ছাড়া আরও উচ্চতর লোকসকলের বর্ণনা পাই যাহারা চিন্ময় মনস্তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত; যদিও সাধারণ মানুষের এ সমস্ত লোক সম্বন্ধে যে ধারণা বস্তুত তাহারা তাহা হইতে সূক্ষ্ম ও উন্নত স্তরে অবস্থিত; এই সমস্ত উচ্চতর তত্ত্ব যেখানে রূপায়িত হইয়াছে আমাদের আন্তর অনুভূতি উন্নীত হইয়া তথায় পৌঁছিতে বা আমাদের অন্তরাত্মা তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে। অতএব আমরা যে লোকপরম্পরার কথা স্বীকার করিয়াছি তাহার সমর্থন ইহাতে পাই; অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ইহা আমাদের অনুভূতির এক প্রকার বিন্যাস ও ব্যবস্থা; দৃষ্টিভঙ্গীর ভেদ অনুসারে এই বিন্যাস ও ব্যবস্থা অন্য ভাবেও হইতে পারে। কেননা এক বিশেষ ভূমি হইতে বিশিষ্ট কোন পদ্ধতিতে এ সমস্তের একপ্রকার শ্রেণীবিভাগ যেমন প্রামাণিক হইবে, অন্য কোন ভূমি হইতে অন্য প্রকার পদ্ধতিতে কৃত সেই একই বস্তুরাজির শ্রেণীবিভাগ তেমনি প্রামাণিক হইতে পারে। আমাদের দিক দিয়া যে ভাবে বিন্যাস ও ব্যবস্থা বা যে ভাবের শ্রেণীবিভাগ আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার প্রধান সাথকতা

এই যে তাহা মৌলিক এবং তাহাতে সত্যের একটা প্রকাশ নির্দ্দেশ করে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যাহা অতি প্রয়োজনীয় ; ইহাতে আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের মূল উপাদান কি এবং প্রকৃতির সংবৃতি ও বিবৃতি ধারার গতি ও প্রবৃত্তি কিরূপ তাহা বুঝিতে সহায়তা করে। সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারি যে এই সমস্ত জগৎ আমাদের জড়বিশ্ব এবং পার্থিব প্রকৃতি হইতে একেবারে পৃথক বস্তু নয়, বরং তাহারা জড়বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এবং তাহাকে তাহাদের প্রভাবের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ঘিরিয়া বর্ত্তমাণ আছে এবং যাহা অলক্ষ্যে মর্ত্ত্য পরিণাম নিয়ন্ত্রিত ও রূপায়িত করিতেছে, যদিও আমরা সহজে সে প্রভাবের পরিচয় পাই না। অন্য জগতের জ্ঞান ও অনুভবকে এইভাবে বিন্যাস ও ব্যবস্থা কবিলে এই অন্তর্গূঢ় প্রভাবের স্বরূপ এবং ক্রিয়াধারা বুঝিবার সূত্র আমরা ধরিতে পারি।

আমাদের পার্থিব প্রকৃতির পরিণামধারার মধ্যে যে সমস্ত সম্ভাবনা আছে তাহাদিগকে সার্থক ও সুদূরপ্রসারী কবিবার জন্য অন্য জগৎসমূহের অস্তিত্ব এবং প্রভাব একটা মুখ্য প্রয়োজনীয় তথ্য। কেননা এই জড় জগৎই যদি অনন্ত সত্য বস্তুর একমাত্র প্রকাশ ক্ষেত্র হইত এবং সেই সঙ্গে একমাত্র তাহাই যদি পূর্ণ প্রকাশেরও ক্ষেত্র হইত, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইত যে এই বিশ্বে ক্রিয়ার প্রথম ভিত্তিরূপে যে আপাতনিশ্চেতন জড়শক্তি আছে তাহার মধ্যে যখন জড় হইতে চিৎ পর্য্যন্ত সকল তত্ত্ব পরিপূর্ণরূপে সংবৃত হইয়া অবস্থিত আছে তখন তাহারা পরিণামবশে এখানে এবং একমাত্র এখানেই পূর্ণরূপে বিবৃত ও প্রকাশিত হইবে বা ফুটিয়া উঠিবে এবং তাহাব জন্য একমাত্র অন্তর্গূঢ় অতিচেতনা ভিন্ন অন্য কোন আনুকূল্য বা অন্য কোন চাপ থাকিবে না। তাহা হইলে বিশ্বব্যাপারে জড়ই হইবে প্রথমতত্ত্ব, বিশ্ববিস্ষ্টির আদি ও মূল উপাদান এবং নিয়ামক নিমিত্ত। পরিণামের শেষ পর্ব্বে বস্তুতঃ চিৎসত্তা কতকটা সীমিতভাবে আপনার স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রভুত্ব ফিরিয়া পাইবে, হয়তঃ জড়ের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চিৎ সে জড়কে আরও অনেক বেশী সাবলীল ও নমনীয় সাধনযন্ত্রে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম হইবে, এখন যেমন জড় চিতের উচচতর বিধান ও প্রকৃতি অথবা তাহার ক্রিয়াধারার পূর্ণ প্রতিষেধক রূপে বর্ত্তমান আছে অথবা নিজের আড়ষ্ট বাধার দ্বারা তাহাদিগের প্রতিকূলতা করিতেছে তখন হয়তো তেমন করিবে না। কিন্তু তবু অন্য কোন ভূমি নাই বলিয়া আত্মপ্রকাশের জন্য

চিৎসত্তাকে জড়ের উপর সর্ব্বদা নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে ; তাহার পক্ষে অন্য কোন প্রকাশক্ষেত্র থাকিবে না, তাই অন্য কোন প্রকার প্রকাশের জন্য সে জড়কে ছাড়িয়া তাহার বাহিরে কোথাও যাইতে পারিবে না ; আবার জড়ের মধ্যে থাকিয়া জড়ের ভিত্তির উপর নিজ সত্তার অন্য কোন তত্ত্বকে মুক্ত করিয়া তাহাকে স্বরাট করিয়া যে তুলিবে তাহাও সম্ভব হইবে না ; জড়ই চিরকাল ধরিয়া চিৎসত্তার আত্মপ্রকাশের নিয়ামক থাকিয়া যাইবে। প্রাণ শাস্তা ও নিয়ন্তা অথবা মন স্রষ্টা এবং কর্ত্তা হইতে পারিবে না ; জড়ের সামর্থ্য দ্বারাই তাহাদের সামর্থ্য সীমিত হইবে, জড়ের সামর্থ্যকে তাহারা বাড়াইতে বা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলেও তাহার মৌলিক রূপান্তর সাধন করিতে বা তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবে না। সত্তার কোন শক্তির স্বতন্ত্র ও পূর্ণপ্রকাশ কখন সম্ভব হইবে না, জড়রূপের অন্ধকারময় বিধানে সকলই চিরকাল সীমিত হইয়া থাকিবে। চিৎ, মন ও প্রাণের কোন স্বক্ষেত্র বা তাহাদের বিশেষ শক্তি ও তত্ত্বের পূর্ণ প্রসারতার সুযোগ থাকিবে না। যদি চিৎসত্তাই বাস্তবিক স্রষ্টা হয় এবং এই সমস্ত তত্ত্বের যদি স্বাধীন বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, যদি তাহারা জড় শক্তি হইতে জাত, তাহার পরিণাম বা প্রতিভাস না হয় তবে চিতের এই আত্ম-সঙ্কোচ যে অপরিহার্য্য ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না।

ইহা যদি সত্য হয় যে যিনি অনন্ত সত্যবস্তু তিনি তাহার নিজের চেতনার খেলায় পূর্ণ স্বাধীন, তাহা হইলে কোন প্রকার প্রকাশের আদিতে জড়ের নিশ্চেতনার মধ্যে তিনি যে সংবৃত হইয়া পড়িতে বাধ্য, এমন হইতে পারে না। তাহার পক্ষে জড় ভাবের বিরোধী বা বিপরীত বস্তু প্রকাশ করাও সম্ভব, তিনি এমন এক জগৎ অবশ্যই সৃষ্টি করিতে পারেন যেখানে চিন্ময়সতের অদ্বয় ভাবই সব কিছুর উৎপত্তিস্থল, সকল রূপায়ণ এবং সকল ক্রিয়ার আদি বিধান, সেখানে গতি ও ক্রিয়ার মধ্যে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা আত্মজ্ঞানযুক্ত এবং চিন্ময় সত্তা বা সদ্বস্তু হইতে অভিন্ন, তথায় সকল নাম ও রূপ সেই মূল তত্ত্বের, সেই অদ্বয় চিন্ময় সতের আত্মসচেতন খেলা। অথবা তিনি এমন লোক সৃষ্টি করিতে পারেন যেখানে পরমতত্ত্বের স্বাভাবিক সচেতন শক্তি বা সংকল্প আপনার মধ্যে স্বাধীন ও সাক্ষাৎভাবে আত্মরূপায়ণ ফুটাইয়া তুলিবে, এখানকার মত জড়ের মধ্যস্থিত প্রাণশক্তির মধ্য দিয়া কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিতভাবে আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন হইবে না ; এ ক্ষেত্রে এই ভাবের আত্মরূপায়ণ হইবে যেমন তাহার আত্মপ্রকাশের প্রথম বা মূলতত্ত্ব তেমনি তাহাই হইবে তাহার সকল স্বাধীন ও আনন্দময় ক্রিয়ার

উদ্দেশ্য। আবার এমন এক জগৎ সৃষ্টিও হইতে পারে যেখানে লক্ষ্য হইবে বহুর মধ্যে অন্তহীন স্বাধীন স্বরূপানন্দের নিরঙ্কুশ অন্যোন্যসম্ভোগ, সে লোকে চিন্ময় বা আত্মসচেতন যে বহুর প্রকাশ হইবে, তাহারা একদিকে সব কিছুর ভিত্তিরূপে অবস্থিত অন্তর্গূঢ় একত্বের সম্পর্কে যেমন সচেতন থাকিবে তেমনি তাহাদের বর্ত্তমান বা প্রকাশিত জীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে অদ্বৈত চেতনার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া থাকা হইবে তাহাদের উদ্দেশ্য; সে লোকে স্বয়ম্ভূ আনন্দের ক্রিয়া হইবে আদি বা মূল তত্ত্ব এবং সকল লীলার সার্ব্বভৌম বিধান বা নিমিত্ত। আবার তাহা এমন এক লোক হইতে পারে যেখানে প্রথম হইতেই অতিমানস হইবে প্রধান বা মূলতত্ত্ব; সেখানে প্রকাশের প্রকৃতি এইরূপ হইবে যে বহু সত্তা তাহাদের দিব্য ব্যক্তিত্বের স্বাধীন ও জ্যোতির্ম্ময় খেলার মধ্য দিয়া ভেদের মধ্যে অভেদের বহু বিচিত্র সকল আনন্দই সম্ভোগ করিতে পারে।

এই লোকপরম্পরা এখানে আসিয়াই যে শেষ হইয়া যাইবে তাহা নহে, কেননা আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের মধ্যে মন জড়াশ্রিত প্রাণ দ্বারা বাধা-গ্রস্ত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, জড় ও প্রাণ এই দুই বিভিন্ন শক্তির নানামুখী বাধা অতিক্রম করা মনের পক্ষে বড়ই দুরূহ, আবার ঠিক তেমনিভাবে জড়ের পরিণামরূপী মৃত্যু, অসাড়তা এবং অস্থায়িত্ব দ্বারা প্রাণ নিজেও কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়াই থাকে; কিন্তু নিশ্চয়ই এমন লোক থাকিতে পারে যেখানে অস্তিত্বের প্রথম নিমিত্তরূপে এই দুই প্রকারের অসামর্থ্যের কোনটি থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। এমন লোক থাকিতে পারে যেখানে মন প্রথম হইতেই সর্ব্বনিয়ন্তা; যেখানে মনোময় ও জড়ময় উপাদানসমূহ স্বাধীন এবং পূর্ণ সাবলীলভাবে ব্যবহার করিতে মনের পক্ষে কোন বাধাই নাই, অথবা যেখানে জড় স্পষ্টত বিশ্বমনঃশক্তির প্রাণক্ষেত্রে ক্রিয়াশীলতার ফল। বস্তুত এই পার্থিব জগতেও তাহাই সত্য; কিন্তু এখানে মনঃশক্তি প্রথম হইতেই সংবৃত, বহুকাল পর্য্যন্ত সে অবচেতন ছিল এমন কি যখন উন্মিষিত হইয়া উঠিয়াছে তখনও স্বাধীনভাবে নিজের উপর অধিকার স্থাপন করিতে পারে নাই, নিজের চারি-পাশে অবস্থিত উপাদানের সে অধীন হইয়া আছে; অথচ মনোময় লোকে তাহার আত্মঅধিকার থাকিবে অক্ষুণ্ন, সেখানে উপাদানের সে প্রভু—অবশ্য সে উপাদান যে জগৎ প্রধানতঃ জড়ধর্ম্মী তাহার উপাদান সকল হইতে আরও সূক্ষ্ম এবং নমনীয় বা সাবলীল। ঠিক তেমনি প্রাণেরও নিজস্ব লোক থাকিতে পারে যেখানে সে স্বরাট, যেখানে তাহার অধিকতর স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল বিচিত্র বাসনা

ও প্রবৃত্তির অকুণ্ঠিত প্রকাশের কোন বাধা নাই, এখানে বিরুদ্ধ শক্তির আঘাতে তাহার ভাঙিয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে এইজন্য সতত তাহার আত্মরক্ষার চেষ্টাতেই তাহাকে প্রধানতঃ ব্যাপৃত থাকিতে হয় কিন্তু তথায় সেরূপ কোন কিছু নাই ; সেখানে অনিশ্চিত টানা হেঁচড়ার মধ্যে পড়িয়া তাহার স্বাধীন আত্মরূপায়ণ, স্বাধীন আত্মতৃপ্তি এবং স্বাধীনভাবে নূতন অভিযানের সহজাত সংস্কার ও প্রবৃত্তিকে বা খেলার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিয়া চলিতে হয় না। এমনিভাবে সত্তার প্রত্যেক তত্ত্বই স্বতন্ত্রভাবে প্রধান বা মূলতত্ত্বরূপে দাঁড়াইয়া এক এক লোকের প্রকাশক বা প্রবর্ত্তক হওয়ার শক্তি সত্তার আত্মপ্রকাশের শাশ্বত সম্ভাবনারূপে বর্ত্তমান আছে, এখানে শুধু স্বীকার করিতে হইবে যে স্বরূপতঃ এক হইলেও প্রত্যেক তত্ত্ব তাহার সক্রিয় শক্তি ও ক্রিয়াধারাতে বিশিষ্টভাবে পৃথকরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

যদি এ সমস্ত দার্শনিক মনের একটা যুক্তিযুক্ত কল্পনামাত্র হইত অথবা যদি তাহারা সচ্চিদানন্দ সত্তার মধ্যে শুধু সম্ভাবনারূপেই থাকিয়া যাইত, বস্তুত কোন দিন অথবা আজিও রূপায়িত না হইত, অথবা রূপায়িত হইলেও পৃথিবীবাসী কোন জীবচেতনার বিষয়ীভূত না হইত, তবে বলিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু আমাদের সকল চিন্ময় চৈত্য অনুভূতি ইহাদের অনুকূলে সাক্ষ্য দেয় এবং প্রধান প্রধান তত্ত্বের দিক হইতে এই সমস্ত উচ্চতর লোক, স্বাধীনতর ভূমি সকলের অস্তিত্বের সম্বন্ধে প্রমাণ আমাদিগের নিকট সততই আনিয়া উপস্থিত করে। আধুনিক যুগে মানুষের মধ্যে অনেকে এই মতবাদের সঙ্গে নিজেকে বাঁধিয়া রাখে যে জড়ের অথবা জড়-ইন্দ্রিয়ের ভিত্তিতে যে অনুভূতি লাভ হয় কেবল তাহাই সত্য, জড়ের অনুভূতিকে বুদ্ধিদ্বারা বিশ্লেষণ করাই কোন কিছুকে প্রমাণ বা সমর্থন করিবার একমাত্র উপায়, এবং বাকি সব কিছু কেবল জড়ের অস্তিত্ব এবং জড়ের অনুভূতিরই ফল, ইহাদের বাহিরে যদি কিছু থাকে তবে তাহা ভ্রম, আত্মবঞ্চনা বা প্রমাদ ; কিন্তু আমরা যখন আধুনিক এই মতবাদের শৃঙ্খলে নিজেদিগকে বাঁধিতে বাধ্য নই, তখন অতীন্দ্রিয় অনুভবের সাক্ষ্যকে মানিয়া লইয়া এই সমস্ত জড়োত্তর লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে আমাদের কোন বাধা নাই। আমরা কার্য্যতঃ দেখিতে পাই যে পার্থিব লোকের ছন্দ ও সুরসঙ্গতি এ সমস্ত লোকের ছন্দ ও সুরসঙ্গতি হইতে পৃথক, ইহাদের সম্বন্ধে ভূমি (plane) শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহাতেই বুঝা যায় যে তাহারা সত্তার এক একটি পৃথক পৃথক স্তর এবং প্রত্যেক স্তরে তত্ত্বের

পদ্ধতি ও বিন্যাসের রীতি স্বতন্ত্র। আমাদের এই জগতের দেশ ও কালের সঙ্গে সে সমস্ত ভূমির সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আছে কি না অথবা তাহারা ভিন্ন ধরণের দেশের এবং ভিন্ন প্রকৃতির কালপ্রবাহের মধ্যে ক্রিয়া করে কি না, এ প্রশ্নের আলোচনার আপাততঃ আমাদের প্রয়োজন নাই—শুধু এইটুকু বলা উচিত যে উভয় ক্ষেত্রে সে সমস্ত লোকের উপাদান আরও সূক্ষ্ম এবং তাহাদের ক্রিয়ার ছন্দ পৃথক। সাক্ষাৎভাবে আমরা যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা হইতেছে এই প্রশ্ন- যাহাদের মধ্যে কোন সাহচর্য্য বা মিলমিশ নাই এবং যাহারা উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না, এই সমস্ত ভূমির প্রত্যেকটি কি একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ? অথবা যাহারা পরস্পরের মধ্যে বিন্যস্ত সুতরাং যাহারা এক বিচিত্র জটিল বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহারা কি একই অখণ্ড সত্তার সেইরূপ স্তর-পরম্পরা? তাহারা যে আমাদের মনশ্চেতনার ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে এই তথ্য হইতে স্বাভাবিকভাবে মনে হয় যে দ্বিতীয় অনুকল্পই সত্য; কিন্তু শুধু ইহাতেই তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ হয় না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে এই সমস্ত উচ্চতর ভূমি বস্তুতই প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের পার্থিব লোকের উপর ক্রিয়া করিতেছে, তাহার সঙ্গে যোগা-যোগ রক্ষা করিতেছে, যদিও স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জাগ্রত বা বহিশ্চেতনায় তাহার কোন সন্ধান আমরা পাই না, কেননা জাগ্রত চেতনা প্রধানতঃ কেবল জড়-জগতের সংস্পর্শলাভ এবং তথা হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ব্যবহার করাতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমরা আমাদের অধিচেতনায় ফিরিয়া যাই অথবা আমাদের জাগ্রত চেতনাকে প্রসারিত করিয়া জড়ের সংস্পর্শের সীমা ছাড়াইয়া যাই তখনই আমরা জড়োত্তর ভূমির ক্রিয়ার কিছু পরিচয় পাই। এমন কি দেখিতে পাওয়া যায় যে মানুষ যখন দেহের মধ্যে বাস করিতেছে তখনও কোন কোন বিশেষ অবস্থায় এই সমস্ত উচ্চতর ভূমিতে নিজেকে অংশতঃ উৎক্ষিপ্ত করিতে পারে; সুতরাং ইহা বলাই বাহুল্য যে বিদেহ অবস্থায় এই উৎক্ষেপ আরও পূর্ণাঙ্গ হইবে, কেননা স্থূল শরীরের সহিত মর্ত্ত্যপ্রাণের দৃঢ়বন্ধনের বাধা আর তখন থাকিবে না। এই যোগাযোগ এবং উৎক্ষেপের একটা বিপুল সার্থকতা আছে। একদিকে দেহত্যাগের পর মানবাত্মা অন্ততঃ সাময়িকভাবে যে অন্য লোকে গমন এবং বাস করে এই যে চিরাগত বিশ্বাস ও জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে, ইহা হইতে তাহার অনুকূলে তৎক্ষণাৎ সমর্থন পাওয়া যায়; অন্ততঃপক্ষে তাহা যে কার্য্যতঃ সম্ভব তাহা বুঝা যায়; অন্যদিকে

ইহা আমাদের পার্থিব জীবনের উপর উচ্চতর ভূমির ক্রিয়াধারা নামিয়া আসার সম্ভাবনা খুলিয়া দেয় এবং এই অবতরণের বা জড়প্রকৃতির মধ্যে তাহাদের রূপগ্রহণের ফলে প্রকৃতি-পরিণামের অন্তর্নিহিত গুপ্ত উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য মন প্রাণ ও চিৎসত্তায় যে লোকোত্তর শক্তি সকল উর্দ্ধলোকে নিরুদ্ধ বা নিগূঢ় হইয়া আছে তাহারা মুক্ত হইতে পারে।

মূলতঃ এই সমস্ত লোক-স্থষ্টি জড়জগৎ-স্থষ্টির পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, পরে নহে ; সে পূর্ব্ববর্ত্তিতা কালের দিক হইতে যদি সত্য নাও হয় তবু অন্ততঃ শক্তি-সংক্রমণের বা পরিণামভূত পরম্পরার দিক হইতে সত্য।* কারণ আরোহ এবং অবরোহের দুইটি ক্রম পাশাপাশি বর্ত্তমান থাকিলেও, আরোহক্রমের প্রথম বিশিষ্ট প্রকৃতি হইবে জড়ের মধ্যে উর্দ্ধ পরিণাম উন্মিষিত করিয়া তোলা, এই চেষ্টার সহায়তার জন্য জড়ের মধ্যে একটা গঠনক্ষম শক্তি থাকিবে, এবং সেই জন্য অনুকূল বা প্রতিকূল সর্ব্বপ্রকার উপকরণ যোগানই হইবে তাহার কাজ। আরোহক্রমকে শুধু পার্থিব পরিণামের ফল মনে করিলে ভুল করা হইবে ; কেননা তাহা যুক্তি দিয়া যেমন সম্ভব মনে হয় না, তেমনি চিন্ময় ভাবনা অথবা ক্রিয়াশীলতা বা ব্যবহারিকতার দিক দিয়াও অসার্থক হইয়া দাঁড়ায়। এই কথা অন্য ভাষায় বলা যায় যে এই সমস্ত উর্দ্ধতর লোক নিম্নতর জড় বিশ্বের চাপে উদ্ভূত হয় নাই ; আমরা বলিব যে জড়ের নিশ্চেতনার মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত সচ্চিদানন্দ হইতে সাক্ষাৎভাবে তাহারা দেখা দেয় নাই, অথবা একথাও যুক্তিযুক্ত নহে যে নিশ্চেতনা হইতে তাহার সত্তা যখন প্রাণ মন ও চিৎরূপে উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছিল তখন যে সমস্ত লোক বা ভূমিতে এই সমস্ত তত্ত্বের খেলা স্বাধীনতরভাবে চলিতে পারে এবং যাহাদের মধ্যে মানবাত্মা তাহার প্রাণ মন এবং চেতনার পরিপুষ্টি-সাধনার অবকাশ পাইবে তেমন লোকসকল স্থষ্টি করিবার প্রয়োজন তিনি কেবল তখনই অনুভব করিয়াছিলেন এবং এইজন্য তাহার সত্তাতে যে আবেশ জাগিয়াছিল তাহা হইতেই এ সমস্ত জগৎ পরে স্থষ্ট হইয়াছে। এসমস্ত জগৎ মানবাত্মার নিজেরই বিস্থষ্টি, তাহার আদর্শের স্বপ্নদ্বারা অথবা মানবজাতি তাহার সক্রিয় ও স্থষ্টিশীল সত্তায় পার্থিবচেতনার উপরের ক্ষেত্রে যে নিজেকে সর্ব্বদা উৎক্ষিপ্ত করিতেছে তাহারই ফলে এ সব স্থষ্টি সম্ভব হইয়াছে একথা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আরও অনেক কম। এ বিষয়ে মানুষের শুধু এই স্থষ্টিশক্তির পরিচয় আমরা স্পষ্টভাবে পাই যে, সে তাহার দেহগত চেতনায় এই সমস্ত লোকের একটা প্রতিচ্ছবি মাত্র গড়িতে এবং তাহার নিজের

থাকিবে ততদিন সে তাহার সাধারণ জীবনের সংকীর্ণ ভিত্তির উপর শুধু কল্পনা ও ভাবনা দিয়া তাহার আদর্শের ভাবময় এক প্রকার কাঠামো মাত্র গড়িয়া তুলিত পারিবে ; কিন্তু তাহার উচচতম দিব্যদৃষ্টি যাহা তাহার কাছে তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রয়োজন বলিয়া উপস্থাপিত করিয়াছে তাহার নির্দ্দেশ মানিয়া যদি অন্তর-রাজ্যে অগ্রসর হইতে থাকে তবে তথায় তাহার আন্তর-সত্তার মধ্যে এক বৃহত্তর চেতনা এক বৃহত্তর জীবনের সন্ধান পাইবে। ভিতর হইতে অনুপ্রেরিত কর্ম্ম ও গতির সঙ্গে উপর হইতে আগত গতি ও ক্রিয়া মিশিয়া তখন জড়ময় সংস্কারের প্রাধান্য দূর করিবে, নিশ্চেতনার শক্তিকে প্রথমে খর্ব্ব পরে নিশ্চিহ্ন করিয়া চেতনার ধারা উল্টাইয়া দিবে, সত্তার সচেতন ভিত্তিরূপে জড়ের স্থানে চিৎকে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত দেহধারী আত্মার জীবনে চিন্ময় সত্তার উচচতর শক্তির পরিপূর্ণ এবং বিশিষ্ট প্রকাশ বা রূপায়ণকে মুক্ত করিয়া তুলিবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জন্মান্তর এবং অন্য লোক ; কর্ম্ম, জীবাত্মা ও অমরত্ব

এই লোক হইতে প্রয়াণ করিয়া তিনি (পর পর) অন্নময় আত্মাতে, প্রাণময় আত্মাতে, মনোময় আত্মাতে, বিজ্ঞানময় আত্মাতে, আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন ; এই সব লোকে তিনি কামরূপী হইয়া বা যথেচ্ছভাবে সঞ্চরণ করেন।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ ৩।১০।৫

প্রত্যুত বলা হয় পুরুষ বা সচেতন সত্তা কামময়। যেমন তাহার কামনা তেমনি হয় তাহার ক্রতু বা সংকল্প, যেমন তাহার সংকল্প তিনি তেমনি কর্ম্ম করেন, এবং যেমন তাঁহার কর্ম্ম তেমনি ফল পান।......কর্ম্মে* সংসক্ত হইয়া মন যাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে সূক্ষ্মদেহে জীব তথায় গমন করে, তাহার পর কর্ম্মের অর্থাৎ এখানে যাহা কিছু করিয়াছে তাহার যখন শেষ হয় তখন সেই লোক হইতে কর্ম্মের জন্য এই জগতে পুনরায় আগমন করে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪।৪।৫,৬

গুণান্বিত, কর্ম্মের কর্ত্তা এবং কর্ম্মফলের স্রষ্টা হইয়া তিনি নিজ কর্ম্মের ফল উপভোগ করেন ; তিনি প্রাণের অধিপতি এবং নিজ কর্ম্ম অনুসারে বিচরণ করেন। তিনি ভাবনা সংকল্প ও অহংকারযুক্ত, বুদ্ধির এবং আত্মার গুণদ্বারা তাহাকে জানা যায়। কেশাগ্রের শতভাগের একভাগ হইতেও ক্ষুদ্রতর যে জীবাত্মা তিনি অনন্তের যোগ্য হন। তিনি স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, নপুংসকও নহেন, যে যে শরীরকে আপন বলিয়া তিনি গ্রহণ করেন, তাহারি সঙ্গে যুক্ত হন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৫।৭—১০

* উপনিষদের এই শ্লোক অনুসারে ইহজীবনের কর্ম্ম লোকান্তরের জীবনে ক্ষয় হয়, তাহার কর্ম্মের ফল পূর্ণ হয় এবং তাহার পর জীব আবার নূতন কর্ম্মের জন্য পৃথিবীতে আসে। এই পৃথিবীতে জীবের জন্ম, কর্ম্ম, লোকান্তরে গমন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন—এ সমস্তের কারণ হইতেছে জীবের নিজের চেতনা, সংকল্প ও কামনা।

দিব্য জীবন বার্ত্তা

মর্ত্ত্য হইয়াও তাহারা অমৃতত্ব লাভ করিলেন।

ঋগ্বেদ ১।১১০।৪

জন্মান্তর সম্বন্ধে আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত তাহা হইলে এই যে পার্থিব প্রকৃতিতে বিসৃষ্টির যে মূল উদ্দেশ্য, আকৃতি ও ক্রিয়াধারা নিহিত রহিয়াছে তাহারই অপরিহার্য্য পরিণামরূপে জীব পৃথিবীতে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত হইতে কতকগুলি সমস্যা এবং কতকগুলি অনুসিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে যাহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা প্রয়োজন। প্রথম প্রশ্ন হইতেছে জন্মান্তরের ধারা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে; সে ধারা যদি দ্রুত একটা পরম্পরা না হয়, অর্থাৎ একই ব্যক্তির জীবনের একটা অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা বজায় রাখিবার জন্য মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যদি জন্মান্তর না হয়, মৃত্যু ও তাহার পরে পুনরায় জন্মগ্রহণের মধ্যে যদি কালের একটা ব্যবধান থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠে যে, যে লোকান্তরে সেই অবকাশ সময়ে জীব অবস্থান করে তথায় প্রবেশের এবং তথা হইতে পুনরায় পার্থিব জীবনে ফিরিয়া আসিবার তত্ত্ব এবং ধারা কি? তৃতীয় প্রশ্ন, চিন্ময়-পরিণাম কিরূপে ঘটে এবং জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া জীবাত্মার এই বিপদসঙ্কুল অভিযানের নানা স্তরে যে পরিবর্ত্তনসমূহ ঘটে তাহার রীতি ও পদ্ধতি কি?

জড়বিশ্বই যদি একমাত্র সৃষ্ট জগৎ হইত অথবা পার্থিব জগৎ যদি অন্য সকল লোক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক স্বয়ংতন্ত্র হইত, তাহা হইলে প্রকৃতি-পরিণামের অঙ্গীভূত জন্মান্তরের একমাত্র ধারা হইত সাক্ষাৎভাবে এক দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তির একটা অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা, অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নূতন জন্মগ্রহণ হইত এবং এ উভয়ের মধ্যে কালের কোন অবকাশ থাকিত না— অপরিহার্য্য গতানুগতিক জড়গত রীতিপদ্ধতির নিরবচ্ছিন্ন একটা পরম্পরার মধ্য দিয়া জীবাত্মার অভিযান হইত একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার। জড়ের কবল হইতে জীবাত্মার মুক্তি কখনই সম্ভব হইত না; তাহার নিজেরই সাধনযন্ত্র দেহের সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগ হইত চিরন্তন এবং নিজের অবিচ্ছিন্ন আত্মাভিব্যক্তির জন্য দেহের উপরই তাহাকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি মৃত্যুর পরে এবং পুনরায় জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে অন্যলোকে জীবনধারা প্রবাহিত হয় যাহা পূর্ব্বজীবনের ফলস্বরূপ এবং যাহাতে পার্থিবজগতের নূতন এক অবস্থার মধ্যে পুনরায় দেহধারণের জন্য এক প্রস্তুতি চলে। একটা

জটিল ধারার অঙ্গরূপে আমাদের পার্থিবলোকের সঙ্গে অন্য লোকসকলের একটা পরম্পরা জড়ীভূত হইয়া আছে, এবং সেই সমস্ত লোক তাহাদের এই সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং নিম্নতম ভূমির উপর সর্ব্বদা ক্রিয়া করে এবং তথা হইতে প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে, তাহার সহিত নিগূঢ় যোগাযোগ এবং আদানপ্রদানের সম্পর্ক রক্ষা করে। মানুষ সচেতনভাবে এই সমস্ত ভূমির অনুভব লাভ করিতে পারে, অবস্থাবিশেষে তাহার সচেতন সত্তাকে তাহাদের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত করিতে পারে—জীবিতাবস্থায় আংশিকভাবে এবং সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে মৃত্যুর পরে বিদেহ অবস্থায় আরও পূর্ণভাবে। মানুষের মধ্যে প্রথম হইতেই যদি নিজেকে অন্য লোকে উপসংক্রান্ত করিবাব শক্তি থাকে, তবে পার্থিব জীবনের অব্যবহিত পরে হয়ত অপরিহার্য্যরূপে জীবাত্মাব অন্য লোকে উৎক্ষিপ্ত হইবার সে সম্ভাবনা কার্য্যতঃ যথেষ্ট পরিমাণে সফলতা লাভ করিবে, আর যদি উৎক্ষেপের শক্তি একটা ক্রমপরিণতির ফলে লাভ হয় তবে তাহার সফলতা অবশেষে দেখা দিবে। কেননা ইহা সম্ভব যে জীব হয়ত প্রথমেই এতটা উন্নত ও পুষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই, যাহার ফলে সে তাহার প্রাণ বা মনকে উচ্চতর প্রাণলোকে বা মনোলোকে লইয়া যাইতে পারে; সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে এক পার্থিব দেহ হইতে সাক্ষাৎভাবে অন্য পার্থিব দেহে যাইতে বাধ্য হইতে হয়, ইহাই বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্ম-সত্তা বজায় রাখিবার একমাত্র উপায়।

জীবের এক জীবন এবং জন্মান্তরে দ্বিতীয় জীবনের মধ্যস্থিত অবকাশের এবং সে সময় অন্য জগতের মধ্যে অনুপ্রবেশের দুইটি কারণ থাকিতে পারে; প্রথমতঃ মানুষের জটিল প্রকৃতির মধ্যে প্রাণময় ও মনোময় অংশের সহিত এই সমস্ত উচ্চতর ভূমির জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রাণ ও মনের পক্ষে তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, দ্বিতীয়ত সদ্য বিগত জীবনের অনুভূতিসকলকে পরিপাক করিয়া নিজ সত্তার অংশ করিয়া নেওয়া, যাহা অনাবশ্যক তাহাকে বর্জ্জন করা, নূতন দেহধারণ এবং নূতনভাবে পার্থিব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রস্তুত হওয়া, এ সমস্তের জন্য মৃত্যুর পর অবকাশের একটা কাল থাকার সার্থকতা এমন কি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু পরিপাকের জন্য এইরূপ অবকাশ এবং আমাদের মধ্যস্থিত স্বজাতীয় অংশসকলের উপর অন্য লোকসকলের এই আকর্ষণ কেবল তখনই কার্য্যকরী হইতে পারে যখন অর্দ্ধপশুভাবাপন্ন জড়াসক্ত মানুষের প্রাণ এবং মনোময় ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্ট হইয়া উঠে;

যতদিন পর্য্যন্ত তেমন পুষ্টি না হয় ততদিন পর্য্যন্ত সেরূপ অবকাশ অথবা লোকান্তরগতি না থাকিতে পারে অথবা থাকিলেও তথায় সক্রিয়তা না থাকিতে পারে ; তখন জীবনের অনুভূতিসকল এত সরল ও প্রাথমিক যে তাহাদের পরিপাকের কোন প্রয়োজন নাই এবং প্রাকৃতসত্তাও এমন অপরিপক্ক ও স্থূল-ভাবাপন্ন যে পরিপাকের জটিল পদ্ধতির মধ্যে প্রবেশ করিবার সামর্থ্যও তাহার নাই, তখন হয়ত সত্তার উচ্চতর অংশসকল এমন পরিণতি লাভ করে নাই যাহাতে তাহারা নিজেদিগকে উচ্চতর ভূমিতে উত্তোলিত করিতে পারে। এরূপক্ষেত্রে অন্য লোকের সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকে না বলিয়া এক মতে জন্মান্তর-বাদের অর্থ দাঁড়ায় দেহান্তর-গ্রহণেব একটা অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা ; তখন অন্য লোকের অস্তিত্ব এবং অন্য ভূমিতে আত্মার কিছুদিনের জন্য এইরূপ বাস কার্য্যতঃ সত্য হয় না, অথবা এক্ষেত্রেব কোন স্তরে তাহার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। জন্মান্তর সম্বন্ধে আব এক মতবাদ এই হইতে পারে যে লোকান্তরে গমন সকল জীবাত্মার পক্ষে অপবিহার্য্য বিধান, সুতরাং মৃত্যুব অব্যবহিত পরে পুনর্জন্ম ঘটে না ; নূতন জন্ম গ্রহণ করিয়া নূতন অভিজ্ঞতালাভের পূর্ব্বে তজজন্য প্রস্তুত হইবাব জন্য জীবাত্মাব পক্ষে এইরূপ কালের একটা অবকাশ প্রয়োজন। এই দুই মতের মধ্যে একটা আপোষও হইতে পারে, যতদিন পর্য্যন্ত উচ্চতরলোকে বাস করিবার মত পুষ্টি না হয় ততদিন অবধি অবিচ্ছিন্নভাবে জন্মপরম্পরা গ্রহণ করা হয় প্রাথমিক বিধান ; আর যখন জীবাত্মা পুষ্ট হইয়া উঠে তখন মৃত্যুব পর লোকান্তরে গমন পরবর্ত্তী বিধান হইয়া দাঁড়ায়। তৃতীয় আর একটা অবস্থাও হইতে পারে, তাই বলা হইয়াছে যে কোন কোন জীবাত্মা এত শক্তিশালীরূপে উন্নত এবং তাহাব প্রাকৃত সত্তা চিন্ময়ভাবে এমন সজীব হইয়া উঠিতে পারে যে লোকান্তরে এইরূপ অবকাশ-কাল-যাপনের প্রয়োজনীয়তা আর তাহাদের থাকে না, এইরূপে কালক্ষেপ দ্বারা বিলম্ব না করিয়া দ্রুত পরিণতি পথে অগ্রসর হইবার জন্য তাহারা অবিলম্বে জন্মগ্রহণ করে।

যে সকল ধর্ম্ম জন্মান্তব স্বীকার করে তাহাতে বিশ্বাসী জনসাধারণ অনেক সময় পরস্পরবিরোধী ধারণাসকল পোষণ করে, তাহারা প্রাকৃত মনের স্বাভাবিক সংস্কারমূঢ়তাবশতঃ তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টাও করে না। একদিকে একটা অস্পষ্ট অথচ বেশ ব্যাপক বিশ্বাস রহিয়াছে যে মৃত্যুর অব্যবহিত বা প্রায় অব্যবহিত পরেই জীবাত্মা অন্য দেহ ধারণ করে। অপর পক্ষে

ধর্ম্মের প্রাচীন এক মত দেখিতে পাওয়া যায় যে পার্থিব জীবনের পুণ্য ও পাপের ফলে মৃত্যুর পর স্বর্গ বা নরক অথবা সত্তার অন্য কোন লোকে বা অন্য কোন অবস্থায় জীবাত্মাকে কিছুকাল বাস করিতে হয় ; সেই সমস্ত লোকে যখন ভোগ দ্বারা পাপ ও পুণ্য ক্ষয় হইয়া যায় এবং জীবাত্মা নূতন পার্থিব জীবনের জন্য প্রস্তুত হয় কেবল তখন আবার সে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। এই দুই মতের বিরোধ ঘুচিয়া যায় যদি আমরা স্বীকার করি যে পরিণামের যে ক্রমোর্দ্ধ গতি রহিয়াছে তাহার মধ্যে আত্মা বা প্রকৃতিস্থ পুরুষ যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহার দ্বারা তাহার গতিপথের এই বিভিন্নতা নিরূপিত হইবে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরে সে তৎক্ষণাৎ নূতন দেহ ধারণ করিবে অথবা এক দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তির মধ্যে অবকাশ-কালে লোকান্তরে গমন করিবে তাহা স্থির হইবে ; পার্থিব জীবন অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা কতখানি লাভ হইয়াছে তাহার উপর ইহা নির্ভর করিবে। কিন্তু প্রচলিত জন্মান্তরবাদে চিন্ময়-পরিণামের কথা স্পষ্টভাবে বলা নাই, আত্মাকে এমন এক অবস্থায় পৌঁছিতে হইবে যথায় সে জন্মগ্রহণ বা দেহধারণের প্রয়োজন অতিক্রম করিবার এবং নিজের নিত্য-ধামে পৌঁছিবার সামর্থ্য লাভ করিবে, এই যে মত রহিয়াছে ইহার মধ্যে পরি-ণাম ধারার কথা কেবল প্রকারান্তরে উক্ত আছে ; কিন্তু যদি ক্রমোর্দ্ধ গতির একটা সোপানাবলি বা ক্রমপরম্পরা না থাকে তাহা হইলে যেখানে পৌঁছিলে জন্মগ্রহণের প্রয়োজন শেষ হয় তথায় আঁকাবাঁকা পথে এলোমেলোভাবে অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু তাহার বিধান সহজে নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। অবশ্য সমস্যার নিশ্চিত সমাধান কেবলমাত্র চৈত্য-গবেষণা (psychic enquiry) এবং অনুভূতি দিয়াই হইতে পারে ; এখানে বিচার-বুদ্ধি দিয়া আমরা শুধু পরিণামধারা লইয়া এই বিচার করিতে পারি, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অন্য দেহ ধারণ করা কিম্বা দেহত্যাগ ও দেহান্তর-প্রাপ্তির মধ্যে অবকাশ থাকা এই দুইএর মধ্যে বস্তু-স্বভাব অনুসারে দেহধারী চৈত্যসত্তার আপাতদৃষ্ট বা স্বাভাবিক কোন প্রয়োজন আছে কিনা।

বিভিন্ন জগতের তত্ত্ব পরস্পরের উপর এক প্রকারে নির্ভরশীল এবং তাহারা পরস্পরের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে এবং আমাদের চিন্ময়-পরিণাম-ধারার উপর এ তথ্যের প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া মৃত্যুর পর জীবাত্মার কিছুকাল লোকান্তরে অবস্থান কতকটা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, সে প্রয়োজন যতটা মৌলিক তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে সক্রিয় ও ব্যবহারিক। কিন্তু পৃথিবীর তীব্র আকর্ষণ

অথবা পরিণামশীল প্রকৃতির অতিরিক্ত স্থূলতার জন্য এ ব্যবস্থায় সাময়িক ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। ঊর্দ্ধ্বপরিণতির পথে কোন জীব একবার মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার পর পুনঃপুনঃ মানবদেহ ধারণ না করিলে মানুষ-রূপে তাহার যে পরিণতি তাহা পূর্ণ হয় না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস; বুদ্ধি-বিচারের দিক হইতে এ বিশ্বাসের ভিত্তি এই যে জীবাত্মাকে এই পৃথিবীতে এক স্তব হইতে তাহার উচ্চতর স্তরে, তাহার পরে আরো উচ্চতর স্তরে, এই ভাবে অবিরামগতিতে অগ্রসর হইতে হয়; এই ভাবে মনুষ্যযোনিতে পৌঁছিয়া পুনঃপুনঃ মনুষ্য জন্মগ্রহণ করা তাহার প্রকৃতির পরিণতি ও পুষ্টির পক্ষে একান্ত আবশ্যক; পৃথিবীতে অতি অল্পকালের জন্য একবার মাত্র মানুষ হইয়া আসা প্রকৃতি-পরিণামের প্রয়োজনের জন্য স্পষ্টতই প্রচুর হইতে পারে না। মানুষরূপে জন্মপরম্পরার প্রথম স্তরসকলের মধ্যে যখন জীবাত্মা মানবতার প্রাথমিক অবস্থায় রহিয়াছে তখন প্রথম দৃষ্টিতে মানবের জন্মপরম্পরার মধ্যে মৃত্যুর অব্যবহিত পবে দেহান্তব-গ্রহণ নিশ্চয় সম্ভব বলিয়া মনে হয়; হয়ত তখন প্রাণশক্তি যে মুহূর্ত্তে বূ্যহবদ্ধ ভৌতিকদেহ হইতে বহির্গত বা বিতাড়িত হয় এবং পূর্ব্বেব দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে যাহাকে আমরা মৃত্যু বলি, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই জীবাত্মা নূতন এক মানবদেহ ধাবণ করে এবং এইভাবে দেহধারণের পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকে। কিন্তু পরিণামধারার কোন্ প্রয়োজন এইভাবে জন্ম-পরম্পরা গ্রহণ করিতে জীবাত্মাকে বাধ্য কবে? স্পষ্টতঃ এ ব্যবস্থা কেবল ততদিন পর্য্যন্ত প্রবল থাকিতে পারে যতদিন ব্যষ্টিচৈত্যসত্তা—অন্তর্গূঢ় খাঁটি আত্মা বা জীব-সত্তা নিজে নহে, কিন্তু প্রাকৃত সত্তাতে যে আত্মরূপায়ণ দেখা দিয়াছে—শুধু অল্পপরিমাণে উন্মিষিত হইয়াছে বা এমন প্রচুর পবিমাণে পুষ্ট বা রূপায়িত হইয়া উঠে নাই যাহাতে এই জন্মের ব্যষ্টি প্রাণ মন ও দেহের অভ্যস্ত সংস্কারের অনুবৃত্তি বা অবিচ্ছিন্নতার উপর নির্ভর না করিয়া আত্মভাবকে বজায় রাখিতে পারে; তখন শুধু নিজের মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকিবার শক্তি লাভ হয় নাই বলিয়া এবং অতীতে প্রাণ ও মনের যে রূপায়ণ তাহাব মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বর্জন করিয়া অন্য লোকে প্রয়োজনীয় অবকাশ-যাপনের দ্বারা প্রাণ ও মনের নূতন রূপায়ণ-গ্রহণের শক্তি নাই বলিয়া তাহার প্রাথমিক স্থূল অপরিপক্ক ব্যষ্টি-সত্তাকে রক্ষা করিবার জন্য মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নূতন দেহে তাহাকে সংক্রামিত করা ছাড়া তাহার আর অন্য উপায় নাই। অবশ্য যে জীব এতটা দৃঢ়রূপে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার মধ্যে মানুষী চেতনার উন্মেষ

হওয়া সম্ভব হইয়াছে তাহার চৈত্তসত্তা এরূপ অতি অপরিপুষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করা যায় কিনা সন্দেহ। সাধারণ জীবনে যতই নিম্নস্তরে অবস্থিত থাকুক না কেন, তাহার মন যতই পঙ্গু, অপরিণত, সঙ্কুচিত, অন্নময় ও প্রাণময় চেতনার দ্বারা যতই আবৃত এবং তাহার মধ্যে যতই ডুবিয়া থাকুক না কেন নিজের নিম্নতর রূপায়ণ হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়াইতে সে যতই অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হউক না কেন তথাপি ব্যষ্টিমানুষ তাহার বিশিষ্ট মনোময় সত্তার মধ্য দিয়া ক্রিয়াশীল যে এক আত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু হয়ত মনে করা যাইতে পারে যে নিম্নের পার্থিব বস্তুর প্রতি বিদেহী জীবের এত প্রবল আসক্তি থাকিতে পারে যে বাধ্য হইয়া তাহাকে সদ্য সদ্যই অন্নময় জীবনে ফিরিয়া আসিতে হয়, কেননা প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রাকৃত আধার তখনও অন্য কিছুর জন্য উপযুক্ত হয় নাই, অথবা পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন উচ্চতর ভূমিতে বাসের যোগ্যতা অর্জন করে নাই। অথবা আবার কখনও জীবের জীবনের অভিজ্ঞতা এত অল্পকাল স্থায়ী এবং এমন অপূর্ণ হইয়াছে যে অনুভূতি আরও বেশী করিয়া লাভ করিবার জন্য তাহাকে বাধ্য হইয়া অবিলম্বে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রকৃতির জটিল ক্রিয়াধারার মধ্যে অন্য কোন প্রয়োজন প্রভাব বা কারণও—যেমন পার্থিব কোন ভোগ বাসনা পূর্ণ করিবার অতি তীব্র ইচ্ছা—ব্যক্তিসত্তার একই রূপায়ণকে দেহান্তের পর বিশ্রাম না দিয়া নূতন জড় দেহে অবিলম্বে জোর করিয়া টানিয়া আনিতে পারে। কিন্তু তথাপি পরিণামের পথে একবার মানুষী স্তরে পৌঁছিলে চৈত্যসত্তার পক্ষে অন্য রীতিতে জন্মগ্রহণ, শুধু নূতন দেহ ধারণ নহে কিন্তু ব্যক্তিসত্তার নবরূপায়ণ লইয়া নূতন দেহে প্রবেশই হইবে স্বাভাবিক বিধান।

কারণ চৈত্যব্যক্তিত্বের (soul personality) পরিপুষ্টির সঙ্গে তাহার আত্মপ্রকৃতির রূপায়ণসমূহেব উপব যেমন প্রচুর প্রভুত্ব সে লাভ করিবে তেমনি তাহার প্রাণময় ও মনোময় ব্যক্তিসত্তাকে এমন স্বপ্রতিষ্ঠ ও আত্মপ্রকাশশীল করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে যে জড়দেহের আশ্রয় ব্যতীতও তাহারা টিকিয়া থাকিতে এবং জড়জগৎ ও জড়ময় জীবনের প্রতি তাহাদের যে অত্যাসক্তি আছে, যাহা জড়ের দিকে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে চায়, তাহা বর্জন করিতে পারিবে ; চৈত্যব্যক্তিত্ব এমনভাবে পুষ্ট হইয়া উঠিবে যে সে লিঙ্গদেহে বা সূক্ষ্মশরীরে অবস্থিত থাকিতে পারিবে, যে সূক্ষ্মদেহকে আমরা অন্তঃপুরুষের বিশিষ্ট কোষ বা আধার বলিয়া জানি। এই চৈত্যসত্তা বা আত্মাপুরুষ

দেহের মৃত্যুর পর বাঁচিয়া থাকে এবং মন ও প্রাণকে সঙ্গে লইয়া সূক্ষ্মদেহে তাহার স্থূল বাসভূমি হইতে প্রয়াণ করে, কিন্তু এইভাবের প্রয়াণের জন্য চৈত্যসত্তা ও সূক্ষ্মদেহ এ উভয়েরই প্রচুর পুষ্ট হওয়া চাই। কিন্তু মনোলোকে ও প্রাণলোকে গিয়া যাহাতে বিশ্লিষ্ট বা বিচূর্ণ না হইয়া পড়ে এবং কিছুকালের জন্য টিকিয়া থাকিতে পারে, সেজন্য মন ও প্রাণকেও যথাযথভাবে সংহত ও পুষ্ট হইতে হইবে। এই সমস্ত নিমিত্ত বা সর্ত্ত যদি পূর্ণ হয়, চৈত্যসত্তার সূক্ষ্মদেহের যথাযথ মনোময় ও প্রাণময় ব্যষ্টিসত্তার যদি যথাযথ পরিপুষ্টি হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নূতন দেহে জন্মগ্রহণ না করিয়া জীবাত্মার ঊর্দ্ধলোকে অবস্থিতি সম্ভব হইবে এবং তখন এই সমস্ত ঊর্দ্ধলোকের আকর্ষণ তাহার পক্ষে হইবে। কিন্তু শুধু এইটুকু ব্যবস্থা থাকিলে একই প্রাণ ও মনোময় ব্যক্তিত্ব লইয়া জীবকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং নূতন জন্মে স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীনভাবে তাহাব পরিণাম ঘটিবে না। চৈত্যসত্তার নিজেরও ব্যক্তিত্বকে এমন বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে যাহাতে অতীত দেহের মত প্রাণ ও মনের অতীত রূপায়ণের উপরেও তাহাকে নির্ভর করিয়া থাকিতে না হয় এবং সময়মত তাহাদিগকে বর্জন করিয়া নূতন অভিজ্ঞতার জন্য নূতন ভাবে আবার প্রাণ ও মনের নূতন রূপ গড়িয়া তুলিতে পারে। এমনি ভাবে পুরাতনের বর্জন এবং নূতন রূপেব প্রস্তুতির প্রয়োজনে মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের মধ্যবর্ত্তী কিছুকালের জন্য যেখানে আমরা এখন বাস করিতেছি সেই জড়ভূমিকে ছাড়িয়া লোকান্তরে বাস করিতে হইবে; কেননা এই জড়জগতে বিদেহী জীবাত্মার কোন স্থায়ী বাসভূমি হইতে পারে না। যদি সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত একটা আবরণ পার্থিবসত্তার উপর থাকে যাহা পৃথিবীর অন্তঃপাতী কিন্তু যাহার প্রকৃতি প্রাণ ও মনোময়, তাহা হইলে বিদেহজীব তথায় অতি অল্প কিছুকালের জন্য বাস করিতে পাবে বটে, কিন্তু পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তি তখনও অতিপ্রবল না হইলে সেখানেও জীবের দীর্ঘকাল অবস্থিতির কোন কারণ নাই। জড়দেহ ছাড়িবার পরেও জীবাত্মাকে যদি টিকিয়া থাকিতে হয় তবে তাহা জড়োত্তর লোকেই সম্ভব হইবে, সে-লোক চেতনার পরিণতিধারার মধ্যস্থিত কোন উপযুক্ত সূক্ষ্মস্তর বা ভূমিই কেবল হইতে পারে অথবা যদি পরিণামধারা না থাকে তাহা হইলে সে লোক হইবে এক জীবন ও পরবর্ত্তী জীবনের মধ্যবর্ত্তী অল্পকালের জন্য বিশ্রামের একটা ভূমি, কিম্বা সে হইবে সেই অনাদি পরমধাম যেখান হইতে আর জীবকে জড়প্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

তাহা হইলে জড়োত্তর ভূমির কোন্ স্তরে জীবের অস্থায়ী এবং কোথায়ই বা তাহার অন্যতর স্থায়ী বাসভূমি হইবে? মনে হয় মনোময় জগৎ-সমূহের কোন মনোময় স্তরই হইবে সে বাসভূমি, কেননা মৃত্যুর পর দেহের প্রতি আসক্তির বাধা যখন দূর হইয়াছে তখন মানুষ মনোময় জীব বলিয়া মনোময় জগতের যে আকর্ষণ পূর্ব্বেই তাহার জীবনে সক্রিয় হইয়াছে তাহার শক্তিই প্রবল হইবে, তাহা ছাড়া স্পষ্টতঃ মনোময় লোকই মনোময় জীবের স্বাভাবিক ও উপযুক্ত বাসস্থান হওয়া উচিত। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ইহাই যে হইবে তাহা নহে, কেননা মানুষের সত্তা বিচিত্র উপাদানে গড়া এবং জটিলতায় ভরা ; তাহার মনোময় জীবনের সঙ্গে প্রাণময় জীবন বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে—এমন কি অনেক সময় মনের চেয়ে প্রাণের প্রভাবই তাহার কাছে বেশী স্পষ্ট ও অধিকতর শক্তিশালী ; তাহা ছাড়া মনের পশ্চাতে আছে তাহার অন্তরাত্মা, মনোময় সত্তা যাহার প্রতিনিধি মাত্র। আবার সূক্ষ্মলোকের বহুভূমি বা স্তর আছে এবং জীবাত্মাকে তাহার স্বধামে পৌঁছিতে হইলে তাহাদিগের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে পার হইয়া যাইতে হয়। জড়জগতের মধ্যেই অথবা তাহার সন্নিকটে ক্রমসূক্ষ্ম কতকগুলি স্তর আছে বলিয়া জানা যায়, যাহাদিগকে জড়জগতেরই প্রাণ ও মনোময় প্রকৃতিবিশিষ্ট উপভূমি বলা যাইতে পারে ; এ সমস্ত স্তর জড়-জগৎ ঘিরিয়া পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জড়োত্তর ও জড়লোকের মধ্যে সেতুস্বরূপ বর্ত্তমান আছে এবং ইহাদের মধ্যে দিয়া জড় ও জড়োত্তরের সঙ্গে আদানপ্রদান চলে। যতদিন মননশক্তি যথাযথভাবে পুষ্ট হয় নাই, যতক্ষণ জীব মন ও প্রাণের জড়গত রূপ বা ক্রিয়াতেই শুধু অভ্যস্ত ততদিন এই সমস্ত মধ্যবর্ত্তী স্তরে আটকপড়া এবং স্বধামে ফিরিতে বিলম্ব হইয়া যাওয়া সম্ভব হইতে পারে। এমন কি এমনও হইতে পারে যে মৃত্যুর পরও জন্মের পূর্ব্বের অবকাশের সমস্তটাই এখানে কাটাইতে জীব বাধ্য হইতে পারে ; সাধারণতঃ অবশ্য এরূপ ঘটিবার কথা নয়, ইহা কেবল তখনই ঘটিতে পারে যখন তাহার ক্রিয়ার পার্থিবরূপের প্রতি এত প্রবল আসক্তি থাকে, যাহা তাহার স্বাভাবিক ঊর্দ্ধগতিকে প্রতিরুদ্ধ বা ব্যাহত করে। মৃত্যুর পর জীবাত্মার যে অবস্থা প্রাপ্তি হয় তাহার সঙ্গে তাহার পার্থিব জীবনের অবস্থা ও পরিণতির কোন না কোন প্রকার মিল আছে, কেননা তাহার মৃত্যুর পরের জীবন নিম্নের মর্ত্ত্যস্থিতিতে কিছুকাল অবস্থানের পর অবারিত ভাবে ঊর্দ্ধগতিতে স্বধামের দিকে ফিরিয়া যাওয়া নহে ; তাহা এই পার্থিব জীবনে যে অতিদুরূহ আধ্যাত্মিক পরিণামধারা

চলিতেছে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত একটা সাধারণ ঘটনা বা অবস্থা। পৃথিবীতে মানুষের পরিণামের সঙ্গে সঙ্গেই উর্দ্ধলোক-সকলের সঙ্গে তাহার একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যাহা মৃত্যুর পর এই সমস্ত লোকে তাহার স্থিতির মুখ্য নিয়ন্তা হইয়া উঠে, মৃত্যুর পর কোন্ দিকে কোথায় তাহার গতি হইবে, কতকাল তথায় তাহার স্থিতি হইবে এবং সেখানে তাহার আত্ম-অনুভবের প্রকৃতি কি হইবে এ সম্বন্ধই হয় তাহার নিয়ামক।

ইহাও হইতে পারে যে জড়দেহে অবস্থান কালের অভ্যস্ত সংস্কার এবং বিশিষ্ট অভীপ্সাসকল দ্বারা সৃষ্ট অন্য জগতের উপান্তভূমিতে (annexes) জীব কিছুকাল বাস করিতে পারে। আমরা জানি যে মানুষ এই সমস্ত উচ্চতর লোকের প্রতিরূপ গড়িয়া তোলে, যাহা অধিকাংশ স্থলে এই সমস্ত লোকের কোন অংশের মনোময় অনুবাদ, এই সকল প্রতিরূপ একত্র করিয়া সে তাহার মনোময় জগৎসকল, তাহাদের একপ্রকার বাস্তব রূপ সৃষ্টি করে; আবার বাসনা দিয়া সে নানাপ্রকার কামলোকও গড়িয়া তোলে এবং তাহা তাহার অন্তরচেতনায় অতিবাস্তব মনে হয়। এই ভাবে গড়া লোকসকল তাহার কাছে এমন প্রবলভাবে সত্য বলিয়া অনুভূত হইতে পারে যে তাহারা মৃত্যুর পর একটা কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং জীব কিছুকালের জন্য তথায় অবস্থান করিতে পারে। কারণ যাহা তাহার প্রাকৃত জীবনে জ্ঞানার্জন এবং জীবন-শিল্প-সাধনার এক অপরি-হার্য্য সহায় মাত্র মানুষের সেই কল্পনা বা প্রতিরূপ গড়িয়া তুলিবার এই শক্তি উর্দ্ধলোকে এক সৃষ্টিশক্তিরূপে পরিণত হয় যাহা মনোময় জীবকে নিজসৃষ্ট এই প্রতিরূপের জগতে কিছুকাল বাস করিতে সমর্থ করে অবশেষে তাহা অন্তরাত্মার চাপে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট এই সমস্ত জগতের প্রকৃতি বৃহত্তর জীবনের গড়া বস্তুর অনুরূপ; মন বৃহত্তর মনোময় ও প্রাণময় জগতের কোন সত্য অবস্থাকে পার্থিব অনুভূতির ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া ইহাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং তাহা বর্দ্ধিত, দীর্ঘায়িত ও দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া পার্থিব ভূমির অতীত অবস্থাতে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে; এই ভাবের অনুবাদের দ্বারা জীব তাহার অন্নময় সত্তার প্রাণিক সুখদুঃখকে জড়োত্তর অবস্থায় লইয়া যায়, সেখানে তাহারা আরও পূর্ণতা ও বিস্তার লাভ করে এবং দীর্ঘতর কাল স্থায়ী হয়। এই ভাবে গঠিত পরিবেশের মধ্যে জড়োত্তর ভাবে বাসের যে স্থান আছে তাহা প্রাণময় ও নিম্নতর মনোময় জগতের উপান্তভূমি মনে করিতে হইবে।

কিন্তু ইহা ছাড়া শুদ্ধ বা প্রকৃত প্রাণলোক আছে, যাহা কৃত্রিম সৃষ্টি নয়, আদিম কালেই যাহা সুসংবদ্ধ হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা বিশ্বগত প্রাণতত্ত্বের স্বাভাবিক বাসভূমি যেখানে বিশ্বগত প্রাণপুরুষ নিজের ক্ষেত্রে এবং স্বপ্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহা প্রধানতঃ প্রাণময় এমন যে সকল প্রভাব পার্থিব জীবনে জীবকে নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত করিয়াছে সেই শক্তিবশে মৃত্যুর পরে এবং পুনর্জ্জন্মের মধ্যবর্ত্তীকালে সে এখানে কিছুকাল অবস্থান করিতে বাধ্য হইতে পারে ; কেননা প্রাণলোকই এই সমস্ত প্রভাবের স্বাভাবিক আবাস-ভূমি এবং তাহার উপর সেই প্রভাবের আধিপত্য কিছুকালের জন্য তাহাকে তাহাদের নিজস্ব ভূমিতে আবদ্ধ রাখিবে ; ইহলোকেও সে যাহাদের মুষ্টির মধ্যে ছিল এখানে তাহারাই তাহাকে নিজমুষ্টির মধ্যে রাখিতে পারে। জড় হইতে জড়োত্তর জগতে যাওয়ার পথে উপান্ত-ভূমিতে বা নিজের গড়া জগতে জীবের অবস্থিতি তাহার চেতনার একটা পরিবর্ত্তনশীল মধ্যবর্ত্তী অবস্থামাত্র ; এই কৃত্রিমজগৎ হইতে সত্যকার স্বাভাবিক জড়োত্তর জগতে তাহাকে যাইতেই হইবে। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এই ঊর্দ্ধ্বলোকে তাহার গতি হইতে পারে অথবা পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার মধ্যে যেখানকার পরিবেশ পার্থিব জীবনের একটা ধারাবাহিকতা বা অনুবৃত্তি বলিয়া মনে হয় সূক্ষ্মভূতময় অনুভূতির তেমন কোন প্রদেশে সে প্রথমে অবস্থিত হইতে পারে ; কিন্তু এই সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রের উপযোগী অনেকটা স্বতন্ত্র অবস্থার মধ্যে সে অবস্থানে মনোময় প্রাণময় বা সূক্ষ্মভূতময় জীবন এক প্রকারভাবে আরও সুখকর ও পূর্ণতর হইবে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম ভূতময় ও প্রাণময় ভূমির পরপারে মনোময় ও চিন্ময়-মনোময় (spiritual mental) লোকের পরম্পরাও আছে, মনে হয় মৃত্যুর পর মানবাত্মার তথায়ও গতি বা স্থিতি হইতে পারে ; কিন্তু মন ও আত্মার যথেষ্ট পুষ্টিলাভের পূর্ব্বে এই জগতে আসিলে তাহার সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু সাধারণতঃ পরিণতিশীল সত্তা মৃত্যুর পর যেখানে যাইতে পারে এই হইবে তাহার উচ্চতমসীমা, কেননা পার্থিবজীবনে যে মানুষ মনোময় স্তরের উপরে উঠিতে পারে নাই সে অধিমানস বা অতিমানস ভূমিতে আরূঢ় হইতে পারেনা ; অথবা এমন হইতে পারে যে, সে সাধনার দ্বারা এমন পুষ্ট হইয়াছে বা এমন অবস্থা লাভ করিয়াছে যে লম্ফ দিয়া মনোময় স্তর পার হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত পরিণামধারা অগ্রসর হইয়া এই জগতে জড়ের মধ্যে অতিমানস বা অধিমানস প্রকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ না হইতেছে ততদিন

পর্য্যন্ত এ জগতে ফিরিয়া আসা তাহার পক্ষে আর সম্ভব নাও হইতে পারে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষের মরণোত্তর গতি স্বভাবতঃ যে মনোময় লোক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াই শেষ হইয়া যাইবে তাহা সত্য নহে ; কারণ মানুষ পূর্ণরূপে শুধু মনোময় নয় ; মানুষ স্বরূপে চৈত্যসত্তা বা আত্মা, মন নয়—এই চৈত্য-পুরুষই হইতেছে সেই পথিক যে বহু জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়া চলিতেছে, তাহার আত্মপ্রকাশে বা রূপায়ণে মনোময় সত্তা একটা প্রধান উপাদান মাত্র। সুতরাং বিশুদ্ধ চৈত্যসত্তার একটা ভূমি আছে, সর্ব্বশেষে জীব যেখানে উপনীত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিবে ; সেখানে সে অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা পরিপাক করিবে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইবে। সাধারণতঃ আশা করা যায় যে যে-মানুষ স্বাভাবিকভাবে পুষ্ট হইয়াছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে মনন-শক্তি লাভ করিয়াছে, সে মৃত্যুর পর একে একে সূক্ষ্মভূতময়, প্রাণময়, মনোময় ভূমিসকল পার হইয়া চৈত্যলোকের বাসভূমিতে আসিয়া পৌঁছিবে। জীবাত্মা প্রত্যেক ভূমিতে উপস্থিত হইযা তাহার অতীত জীবনের ব্যক্তিসত্তায় (personality) অস্থায়ী এবং শুধু বহিশ্চর ক্ষেত্রে বিচরণসমর্থ যে রূপ ছিল তাহার যে অংশ সেই ভূমির উপাদানে গঠিত তাহা নিঃশেষে ক্ষয় বা বর্জন করিয়া ফেলিবে ; সে যেমন পূর্ব্বেই তাহার অন্নময় কোষ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তেমনি তাহার প্রাণময় ও মনোময় কোষও ফেলিয়া দিবে ; কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্বের তাহার মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় অভিজ্ঞতার সারাংশ গোপন স্মৃতিতে থাকিয়া যাইবে অথবা সক্রিয় শক্তিরূপে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হইবে। কিন্তু যাহার মনের প্রচুর পরিণতি হয় নাই, সে সচেতনভাবে প্রাণ-লোক অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ নহে ; তখন হয় তাহাকে তথা হইতে আবার পতিত হইতে এবং প্রাণময় স্বর্গ বা নরকভোগের পর পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে অথবা আরো সুসঙ্গতভাবে প্রাণময় ভূমি পার হইয়াই চৈত্যক্ষেত্রে একভাবে নিদ্রিত অবস্থায় উপনীত হইতে হয়, তখনও অতীত অভিজ্ঞতার পরিপাক চলে এবং মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্মের মধ্যবর্ত্তী কালের বাকী অংশ সেই অবস্থায় কাটে ; অনেকটা পরিণত অবস্থা লাভ করা উচ্চতর লোকে জাগ্রত হইবার পক্ষে অপরিহার্য্য।

যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে এই সমস্তের খুব সম্ভাবনা থাকিলেও, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও এবং অধিচেতন অনুভূতির

কোন কোন তথ্যদ্বারা ইহারা সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও তার্কিক মন এ সমস্ত সিদ্ধান্ত পূর্ণরূপে স্থাপিত হইয়াছে এ কথা স্বীকার না করিতে পারে। আমাদিগকে খুঁজিয়া দেখিতে হইবে মৃত্যু ও জন্মের মধ্যবর্ত্তী কালে জীবাত্মার এই ভাবের অবস্থিতির পক্ষে আরো কোন মৌলিক প্রয়োজন আছে কিনা অথবা অন্ততঃ-পক্ষে এমন কোন সক্রিয় শক্তি আছে কিনা যাহাতে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য-রূপে গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে। এই ভাবের একটা প্রয়োজনের সাক্ষাৎ আমরা পাই যখন বুঝিতে পারি যে পার্থিব পরিণামে এই সমস্ত ভূমির প্রভাব নিশ্চিতভাবে কার্য্য করিতেছে এবং উন্মিষন্ত জীবচেতনার সঙ্গে এই সমস্ত লোকের একটা নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। পার্থিব ভূমিব উপর তাহাদের উচ্চতর কিন্তু গোপন ক্রিয়ার ফলেই আমাদের প্রগতি অনেকটা পরিমাণে সম্ভব হইয়াছে। নিশ্চেতনা অথবা অবচেতনার মধ্যে সব কিছুই আছে কিন্তু বীজ বা সম্ভাবনারূপে; উচ্চভূমি হইতে আগত ক্রিয়াধারা তাহাদিগকে উন্মিষিত হইয়া উঠিতে সাহায্য বা বাধ্য করে। জড় প্রকৃতির পরিণাম-ক্ষেত্রে যে সমস্ত মনোময় ও প্রাণময় রূপ দেখা দিতেছে, তাহাদিকে সুগঠিত ও প্রগতিপথে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে সেই ক্রিয়াধারার প্রবাহ চলিবার প্রয়োজন আছে; কেননা জড়োত্তর ঊর্দ্ধ্বভূমি হইতে তাহাদের নিজেদের প্রকৃতির অনুরূপ শক্তির প্রবাহ, গোপন হইলেও সর্ব্বদা না পাইলে, নিশ্চেতন বা অসাড় এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন জড়প্রকৃতির বাধার জন্য, এই সমস্ত প্রগতির ধারা পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করিতে বা তাহাদের নিগূঢ় ঐশ্বর্য্য-সকল যথাযথভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। এই আশ্রয়গ্রহণ এই গোপন সংযোগের ক্রিয়াধারা প্রধানতঃ আমাদের অধিচেতন সত্তাতেই চলে, বহিঃসত্তাতে নয়, তথা হইতেই আমাদের চেতনার সক্রিয় শক্তি উন্মিষিত হয় এবং বহিঃসত্তা যাহা কিছু লাভ করে যাহা কিছু উপলব্ধি করে, তাহা সঞ্চয় করিবার জন্য অধিচেতন সত্তার ভাণ্ডারে সর্ব্বদা পাঠাইয়া দেয়, তথায় তাহারা পুষ্ট হয় এবং পরে বৃহত্তর আকার ও শক্তি লইয়া পুনরায় আসিয়া বহিঃসত্তায় স্ফুরিত হয়। আমাদের বৃহত্তর গোপন সত্তা এবং বহিশ্চর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে এইরূপ ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া চলে বলিয়াই জড়গ্রস্ত মনের নিম্নতর স্তরসকল যে মানুষ একবার পার হইয়াছে তাহার জীবনে চিন্ময় প্রগতি হয় অতি দ্রুতগামী।

মৃত্যু ও জন্মের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় এইভাবে লোক-লোকান্তরে পরিভ্রমণ চলিতে থাকিবে; কেননা গত জীবনে আমরা যেখানে শেষ করিয়াছি ঠিক সেই স্থান

হইতেই যে নুতন জন্ম ও নূতন জীবনের প্রগতি বা পুষ্টি আরম্ভ হইবে তাহা নহে ; নূতন জীবনে গত জীবনের বহিশ্চর ব্যক্তিসত্তা ও প্রকৃতির রূপায়ণ ঠিক তেমনি ভাবে বজায় থাকিবে বা তাহার পুনরাবৃত্তি চলিবে, ইহাও ঠিক নহে। পূর্ব্বজীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে পরিপাক করিয়া লইতে পুরাতন বিশিষ্ট প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য-সকলের কতক ত্যাগ করিতে, কতককে আরও শক্তিশালী করিতে, তাহাদিগকে নূতনভাবে সাজাইতে, অতীতে লব্ধ সম্পদকে নূতনভাবে বিন্যস্ত করিতে এবং ভবিষ্যতের জন্য উপাদানের একটা নূতন নির্ব্বাচন করিতে হইবে ; তাহা না হইলে নূতন যাত্রারম্ভ সফল হইবে না, পরিণামধারাকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া যাইবে না। কেননা প্রত্যেক জন্ম একটা নূতন যাত্রারম্ভ ; অতীত হইতে তাহা গড়িয়া উঠে বটে কিন্তু তাহা যান্ত্রিক বা গতানুগতিকভাবে পুরাতনের অনুবর্ত্তন নয় ; নূতন জন্ম পুরাতন জন্মের একটা অবিচ্ছিন্ন পুনরাবৃত্তি নয়, কিন্তু তাহা একটা প্রগতি, পরিণামধারাকে সার্থক করিবার একটা কৌশল বা সাধনযন্ত্র। এই নূতনভাবে সাজানোর একটা অংশ বিশেষত পুরাতন ব্যক্তিসত্তার শক্তিশালী স্পন্দনগুলিকে বর্জন কেবল তখনই সম্ভব হইবে যখন মৃত্যুর পর দেহ মন প্রাণের পূর্ব্বজন্মের প্রয়োজনগত সংবেগকে পূর্ণরূপে ক্ষয় করিয়া ফেলা যাইবে ; যাহাদিগকে বর্জন বা নূতনভাবে বিন্যাস করিতে হইবে তাহাদের উপযোগী এবং তাহাদের সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট ভূমি হইতেই ভিতরের এই মুক্তি বা ভারমোচনের সাধনা করিতে হইবে ; কেননা নূতন রূপায়ণ সম্ভব করিবার জন্য চেতনা হইতে এই সমস্ত বস্তু ক্ষয় বা বর্জন করিতে যে ক্রিয়াধারার প্রয়োজন তাহা জীবাত্মা কেবল এই ক্ষেত্রে বসিয়া তখনও চালাইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহাই সম্ভব যে যখন জীবাত্মা বা চৈত্য-পুরুষ নিজেই নূতন জন্মে যে নবজীবন লাভ হইবে তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করিবে এবং তাহার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ এবং প্রস্তুত করিয়া তুলিবে, তখন সে স্বধামে বা নিজ বিশ্রামভূমিতে বসিয়া সব কিছু নিজের মধ্যে সংহৃত করিয়া প্রগতির নূতন নাট্যের প্রতীক্ষায় থাকিবে। এই জন্য মৃত্যুর পর জীবাত্মা একে একে সূক্ষ্মভূতলোক, প্রাণলোক, মনোলোক পার হইয়া অবশেষে স্বধামে বা চৈত্যলোকে পৌঁছে, তথা হইতে আবার তাহার পার্থিব অভিযান আরম্ভ হয়। মৃত্যু ও জন্মের মধ্যবর্ত্তী কালে এই অবস্থিতির ফলে পৃথিবীতে নূতন জন্মের জন্য উপাদান সংগ্রহ এবং তাহাদিগকে লইয়া জীবন গঠন সম্ভব হইবে ; এই নব জন্ম হইবে শক্তিধারাসমূহের সমবায়োৎপন্ন এক

নূতন ক্রিয়াক্ষেত্র, দেহধারী চিৎপুরুষের ব্যক্তিগত পরিণামধারার এক ঊর্দ্ধ-কুণ্ডলিত রেখাচিত্র (spiral curve)।

কারণ যখন আমরা বলি যে জীবাত্মা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় এবং চিন্ময় সত্তাকে একে একে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তখন তাহার অর্থ এই নয় যে তাহাদের পূর্ব্বে কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং তাহারা জীবাত্মার নূতন সৃষ্টি। পক্ষান্তরে জড় প্রকৃতির দ্বারা আরোপিত নিমিত্ত বা পরিবেশের মধ্যে নিজের চিন্ময় সত্তার এই সমস্ত তত্তকে সে প্রকাশ করে ইহাই তাহার কৃতিত্ব; এই প্রকাশ ব্যক্তিসত্তার এক কৃত্রিম আকাররূপে পুরোভাগে মূর্ত্ত হয়, যাহা জড়-জীবনের ছন্দ ও ভাষায় এবং সম্ভাবনায় অন্তঃস্থিত আত্মারই একটা অনুবাদ। বস্তুতঃ আমাদিগকে প্রাচীন এই ধারণা স্বীকার করিতে হয় যে মানুষের মধ্যে কেবল এক অন্নময় পুরুষ তাহার বিশিষ্ট প্রকৃতি লইয়া যে বর্ত্তমাণ আছে তাহা নহে, তাহার মধ্যে এক প্রাণময় পুরুষ, এক মনোময় পুরুষ, এক চৈত্য পুরুষ, এক অতিমানস পুরুষ এবং এক পরমচিন্ময় পুরুষ* আছেন; এবং তাহাদের বৃহত্তর সত্তা ও শক্তির সমস্ত বা অধিকাংশ হয় তাহার অধিচেতনাতে গোপনভাবে অথবা তাহার অতিচেতনার মধ্যে গুপ্ত সুপ্ত এবং অগঠিতরূপে রহিয়াছে। মানুষকে তাহার সক্রিয় চেতনার মধ্যে তাহাদিগের শক্তিসমূহকে লইয়া আসিতে এবং সজ্ঞানে তাহাদের মধ্যে জাগরিত হইতে হইবে। কিন্তু তাহার সত্তার এই সমস্ত শক্তির প্রত্যেকটি তাহার উপযুক্ত নিজস্বলোকের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আছে এবং সকলের মূল তথায় আছে। ঐ সমস্ত শক্তির মধ্য দিয়াই সে অধিচেতনায় উন্নীত হয় এবং উপরের নিয়ামক প্রভাব গ্রহণ করে, আমাদের ক্রমপুষ্টি ও প্রগতির সঙ্গে আমরা সচেতন ভাবে তথায় গমন করিতে পারি। ইহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত যে, যে পরিমাণে আমাদের সচেতন পরিণামের মধ্যে অধিচেতনা এবং অতিচেতনার শক্তিসকল স্ফুরিত হইবে সেই পরিমাণেই মৃত্যুর পর জীব কোন্ লোকে যাইবে তাহা নির্ণীত হইবে; এখানে আমাদের জন্মের বিশিষ্ট প্রকৃতি এবং পরিণামের উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াধারা এইভাবে অভিগমন প্রয়োজনীয় করিয়া তোলে। এই অভিগমনের ক্রম ও পরিবেশ অত্যন্ত জটিল, প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাস সকল তাহা যেমন অতি সহজ মনে করে বা যেমন স্থূলভাবে দেখে আসল ব্যাপারটা তেমন নয়; তবে একথা স্বীকার

* তৈত্তিরীয় উপনিষদ

করা যাইতে পারে যে দেহের মধ্যে আত্মার জীবনের উৎপত্তি ও প্রকৃতির ইহা একটা অপরিহার্য্য পবিণাম। বস্তুতঃ সবকে লইয়া পরিণাম ও পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার এক জটিল জাল বোনা হইয়াছে, অনন্তের সান্ত প্রকাশের সক্রিয় ন্যায়ের বিধানানুসারে চিৎশক্তি তাহার নিজ প্রয়োজনের সত্যকে অনুসরণ করিয়া সে জালের গ্রন্থিযোজনা করিয়াছে।

মৃত্যুর পরে সাময়িকভাবে লোকান্তর গতি এবং পুনর্জন্ম সম্বন্ধে এই মতবাদ যদি সত্য হয় তবে পুনর্জন্ম এবং মৃত্যুর পর অন্যজগতে বাস সম্বন্ধে আবহমান কাল হইতে যে ধারণা চলিয়া আসিতেছে তাহা হইতে পৃথক একটি তাৎপর্য্য প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে জন্মান্তরের তাত্ত্বিক ও নৈতিক এই দুইটি দিক আছে, একটা আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের দিক, অপরটি বিশ্বজনীন ন্যায়বিধান এবং নৈতিক অনুশাসনের দিক। প্রচলিত এই মতে বা এই মতের প্রয়োজনে স্বীকাব করা হয় যে আত্মার একটা সত্য ব্যষ্টিসত্তা আছে, অবিদ্যা ও বাসনার ফলেই জীবাত্মাকে জগতে আসিতে হয়; বাসনার পীড়নে শ্রান্ত এবং নিজের অবিদ্যা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া যতদিন বিদ্যা বা খাঁটিজ্ঞানের উদয় না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত জীবকে এই পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে অথবা এইখানে পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসিতে হইবে। বাসনা তাহাকে বার বার ফিরিয়া আসিয়া নূতন দেহ ধারণ করিতে বাধ্য করে; যতদিন তাহার জ্ঞানোদয় না হয় এবং মুক্তি না ঘটে ততদিন পর্য্যন্ত জন্মের চক্রে তাহাকে নিরন্তর আবর্তিত হইতে হয়। কিন্তু সর্ব্বদা এই পৃথিবীতে সে থাকে না, ইহ এবং অন্য লোকের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে যাতায়াত করে, সে-অন্য লোক স্বর্গ বা নরক উভয়ই হইতে পারে, এখানে অনুষ্ঠিত পুণ্য ও পাপকার্য্যের ফলে সুকৃতি এবং দুষ্কৃতির যে ভাণ্ডার গড়িয়া তোলে পরলোকে স্বর্গ বা নরকে বাস করিয়া তাহা ক্ষয় করিয়া ফেলে, তাহার পর কোন প্রকার পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া কখনও মানুষ, কখনও পশু, এমন কি কখনও উদ্ভিদরূপে পৃথিবীতে আবার ফিরিয়া আসে। কোন্ যোনিতে কি ললাটলিখন লইয়া জন্ম হইবে তাহা জীবের অতীত কার্য্যদ্বারা যন্ত্রবৎ নিয়ন্ত্রিত হয়, অতীত কর্ম্মসমষ্টি যদি সৎ বা ভাল হয় তবে উচ্চযোনিতে জন্ম হয়, জীবন সুখ ও সফলতাময় হয়, অতর্কিতভাবে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি আসিয়া পড়ে; কর্ম্মসমষ্টি যদি অসৎ বা মন্দ হয় তবে জন্ম হইবে নীচ যোনিতে —অথবা যদি মনুষ্য-জন্ম লাভ হয় তবে জীবন হইবে অসুখী, অসফল, দুঃখ ও দুর্গতিপূর্ণ। আমাদের প্রকৃতি ও কর্ম্মে যদি ভাল মন্দের মিশ্রণ থাকে

তাহা হইলে প্রকৃতি পাকা হিসাবীর মত আমাদের পূর্ববর্ত্তী আচরণের মূল্য ও পরিমাণ অনুসারে আমাদের সুখের সঙ্গে দুঃখের, সফলতার সহিত বিফলতার, অতুল সৌভাগ্যের সহিত দারুণ দুর্ভাগ্যের একটা মিশ্রণের ব্যবস্থা করিবে। তাহা ছাড়া গত জীবনের প্রবল ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বাসনাও নূতন জন্মের নিয়ামক হইতে পারে। কর্ম্মফল দেওয়ার বেলায় প্রকৃতি গণিতজ্ঞের মত সর্ব্বদা সূক্ষ্ম হিসাব করিয়াই দেয়, যেমন কর্ম্ম ঠিক তেমনি ফলের ব্যবস্থা করে, আমাদের যেমন পাপ ঠিক তেমনিভাবে সাজা পাই, কর্ম্মের অলঙ্ঘ্য বিধান এই যে টিলটি মারিলে পাট্‌কেলটি খাইতে হইবে। মনে করা হয় যে কর্ম্মের বিধান একদিকে কর্ম্মফল সূক্ষ্মভাবে ঠিক করিবার জন্য হিসাবের যন্ত্র হাতে লইয়া গণিতজ্ঞের মত বসিয়া আছে, অন্যদিকে গত পাপ ও দুষ্কৃতির বিচারের জন্য দণ্ডবিধির ধারা লইয়া বিচারকের আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহাও দ্রষ্টব্য যে, এ বিধানে পাপের জন্য দুইবার শাস্তি এবং পুণ্যের জন্য দুইবার পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে; কেননা পাপীকে প্রথমে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে আবার এখানে আসিয়া অন্য জীবনে পাপের জন্য দুর্গতিভোগ করিতে হয়, তেমনি পুণ্যাত্মার পুরস্কার স্বরূপে প্রথমে তাহাকে স্বর্গসুখ দেওয়া আবার পুণ্যকর্ম্মের জন্য নূতন জন্মে তাহার জন্য অজস্র সুখের ব্যবস্থা করা হয়।

যাহার উপর দাঁড়াইয়া দার্শনিক বিচার চলিতে পারে, জনমতের এই সমস্ত দ্রুত সম্পাদিত ধারণা পদস্থাপনের তেমন কোন স্থান দেয় না এবং তাহাদের মধ্যে জীবনের খাঁটি তাৎপর্য্যও কিছু পাওয়া যায় না। শুধু আকস্মিকভাবে কোনরূপে একবার বাহিরে ছিট্‌কে পড়া ছাড়া যে চক্র হইতে বহির্গমনের আর কোন উপায় নাই, এমন এক অবিদ্যাচক্রে যে বিরাট বিশ্ব উদ্দেশ্যহীনভাবে অবিরাম আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে সেরূপ বিশ্বের অস্তিত্বের কোন খাঁটি প্রয়োজন থাকে না। যাহা শুধু পাপপুণ্যের একটা কারখানা এবং যাহার মধ্যে পুরস্কার দেওয়া অথবা বেত্রাঘাত করিবার ব্যবস্থা মাত্র আছে তেমন জগতের কথায় আমাদের বুদ্ধি তৃপ্ত হয় না। আমাদের আত্মাপুরুষ যদি চিন্ময় অমর বা দিব্যধামবাসী হন তবে কেবল এরকম স্থূল ও অসংস্কৃত নৈতিক শিক্ষার জন্য পৃথিবীরূপ বিদ্যাগারে তাহাকে পাঠাইবার কোন অর্থ হয় না; আত্মা যদি অবিদ্যাকে স্বীকার করিয়া লইয়া থাকে তবে অবিদ্যার মধ্য দিয়া কোন বৃহত্তর তত্ত্ব বা মহত্তর সম্ভাবনাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই তাহা করিয়াছে। পক্ষান্তরে

জীবাত্মা যদি জাগতিক কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনন্ত হইতে আসিয়া এখানে জড়ের অন্ধ-তমিস্রার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া থাকে এবং তাহার মধ্যে থাকিয়া আত্মজ্ঞানের দিকে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে এখানকার জীবন এবং জীবনের তাৎপর্য্যকে আদর ও বেত্রাঘাত দ্বারা শিশুকে সুপথে পরিচালনা করিবাব ব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর কিছু হইতেই হইবে ; সে জীবন হইবে স্বেচ্ছাগৃহীত অবিদ্যা হইতে নিজের পরিপূর্ণ চিন্ময় সত্তার দিকে অভিযান, যাহার শেষে জীব এক অমৃত চেতনা, জ্ঞান, শক্তি, সৌন্দর্য্য, দিব্য শুচিতা ও বীর্য্যের মধ্যে পৌঁছিবে, কিন্তু এই ভাবের চিন্ময় স্ফুরণের পক্ষে এই প্রকার কর্ম্মবাদ নিতান্তই ছেলেমানুষী ব্যাপার। এমন কি জীব যদি সৃষ্ট বস্তুও হয়, সে যদি এখন শিশুরূপে জন্মিয়া থাকে যাহাকে প্রকৃতির নিকট শিক্ষা পাইয়া অমৃতত্বে পৌঁছিতে হইবে তবে তাহাও প্রগতির কোন বৃহত্তর ও মহত্তর বিধান দ্বারাই সম্ভব হইবে, মান্ধাতার আমলের কোন বর্ব্বরোচিত বিধানের দ্বারা নহে। কর্ম্মবাদের এই ধারণা মানুষের প্রাণময় মনের ক্ষুদ্রতর অংশ হইতে গড়া হইয়াছে ; এই মন শুধু জীবন, তাহার বাসনা ও সুখ দুঃখের ক্ষুদ্র বিধান লইয়া ব্যস্ত থাকে, এবং এই সমস্ত ক্ষুদ্র ধারণা ও মাণকে বিশ্বের বিধান ও উদ্দেশ্য বলিয়া খাড়া করে। স্পষ্টতঃ এই সমস্ত ধারণার উপর এই ছাপ দেওয়া আছে যে তাহারা মানুষের অবিদ্যাজাত বস্তু ; চিন্তাশীল মন কোনমতে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারে না।

কিন্তু কর্ম্মবাদের এই একই সিদ্ধান্তকে উন্নীত করিয়া এমন এক উচ্চস্থানে স্থাপন করা যাইতে পারে যথা হইতে যুক্তিবিচার প্রয়োগ করা চলে, তখন তাহা অধিকতরভাবে যুক্তিযুক্ত মনে হয় এবং একটা বিশ্ববিধানের আকার ধারণ করে। কারণ প্রকৃতির সকল শক্তিরই যে নিজস্ব স্বাভাবিক ফল বা পরিণাম আছে এ সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিয়া পারা যায় না, প্রথমতঃ কর্ম্মবাদকে আমরা এই সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে পারি, শক্তির কোন পরিণাম যদি এই জীবনে দেখা না যায় তাহা হইলে তাহা বিলম্বিত হয় মাত্র, চিরকালের জন্য তাহাকে আটকাইয়া রাখা যায় না। জীবমাত্রই কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করে, তাহার প্রকৃতিতে নিহিত শক্তিকে যে ক্রিয়ারূপে প্রয়োগ করা হয় তাহা পরিণামরূপে তাহার কাছে ফিরিয়া আসে, যে ফল এজন্মে দেখা দিল না তাহা পরবর্ত্তী কোন জন্মের জন্য তোলা থাকিবেই। এ কথা সত্য যে কোন ব্যক্তির শক্তি ও ক্রিয়ার ফল তাহার মৃত্যুর পরে অন্যে ভোগ করিতে পারে ;

কেননা আমরা সর্ব্বদাই এরূপ ঘটিতে দেখি, কিন্তু মানুষের জীবদ্দশায় তাহার কৃত কর্ম্মের ফল অপরে লাভ করিল, এরূপও ত ঘটে। এরূপ ঘটিবার কারণ এই যে প্রকৃতির সকল জীবনের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা এবং ঐক্যভাব আছে এবং কোন ব্যষ্টিজীব ইচ্ছা করিলেও কেবল নিজের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু পুনর্জন্মে প্রাণের ধারাবাহিকতা কেবল সমষ্টি বা বিশ্ব-জীবনের বেলায় সত্য না হইয়া যদি ব্যষ্টিসত্তার নিজপ্রাণের বেলায়ও সত্য হয়, যদি তাহার সদা বর্দ্ধমান সত্তা, প্রকৃতি এবং অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থাকে তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় যে তাহার পক্ষে তাহার শক্তির ক্রিয়াধারা হঠাৎ কাটিয়া যাইবে না, তাহার নিরবচ্ছিন্ন ও প্রগতিশীল জীবনে কোন না কোন সময়ে সেফল সে ভোগ করিবেই। মানুষের সত্তা, প্রকৃতি, জীবনের পরিবেশ সমস্তই তাহার অন্তর ও বাহিরের ক্রিয়াব ফল. তাহার মধ্যে অতর্কিত বা অবোধ্য কিছু নাই ; সে নিজেই নিজের বিধাতা ; তাহার অতীতই তাহার বর্ত্তমানের জনক, এবং তাহার বর্ত্তমান হইতে আবাব তাহার ভবিষ্যৎ জন্মিবে। প্রত্যে-কেই যেমন কর্ম্ম করে তেমন ফল ভোগ করে, মানুষের কৃত কর্ম্মের জন্য তাহার মঙ্গল হয় আবার সে যাহা করে তাহার ফলে তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হয়। ইহাই কর্ম্মের ও প্রাকৃত শক্তিব বিধান ও শৃঙ্খল ; এই কর্ম্মবাদের মধ্যে আমরা আমাদের সত্তা প্রকৃতি চরিত্রও কর্ম্মের সমগ্র শক্তির এমন একটা তাৎপর্য্য দেখিতে পাই যাহা অন্যান্য জীবন-দর্শনের মধ্যে আমরা খুঁজিয়া পাই না। ইহা স্পষ্ট যে এই কর্ম্মবাদের মতে মানুষের অতীত ও বর্ত্তমান কর্ম্মই তাহার ভবিষ্যৎ জন্ম এবং সে জন্মের ঘটনা ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত করে ; কারণ এ উভয়ই তাহার শক্তির পরিণাম ; অতীতে যাহা সে ছিল এবং যাহা করিয়াছিল তাহাই বর্ত্ত-মানে সে যাহা হইয়াছে এবং অনুভব করিতেছে তাহার স্রষ্টা, আবার বর্ত্তমানে সে যাহা হইয়াছে এবং যাহা করিতেছে তাহাই ভবিষ্যতে সে যাহা হইবে এবং অনুভব করিবে তাহা গড়িয়া তুলিতেছে। মানুষ যেমন নিজের স্রষ্টা তেমনি সে তাহার ভাগ্যেরও বিধাতা। এই সমস্তই সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ ও স্বীকার্য্য এবং কর্ম্মবাদকে একটা তথ্য, বিশ্ববিধানের একটা অঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে, কেননা একবার জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিলে ইহা স্পষ্টতঃ এবং কার্য্যতঃ অবশ্যস্বীকার্য্য হইয়া পড়ে।

এই প্রথম সিদ্ধান্তের দুইটি অনুসিদ্ধান্ত আছে, যাহা তত ব্যাপক ও প্রামাণিক নয় এবং যাহাতে সন্দেহের একটু ছায়া আছে ; কেননা যদিও

তাহারা অংশতঃ সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহাদিগকে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাতে এক ভুল পরিপ্রেক্ষিতের (perspective) সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ তাহাদিগকেই কর্ম্মের সমগ্র তাৎপর্য্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। প্রথম অনুসিদ্ধান্তটি এই যে কর্ম্মশক্তির প্রকৃতি যেরূপ পরিণামের প্রকৃতি হইবে ঠিক তদ্রূপ, শুভ শক্তি শুভ ফল এবং অশুভ শক্তি অশুভ ফল প্রসব করিবে, দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম্মের বিধান মূলতঃ ন্যায়েরই বিধান, অতএব শুভ কর্ম্মের ফলে সুখ ও সৌভাগ্য, অশুভ কর্ম্মের ফলে দুঃখ দৈন্য ও দুর্গতি অনিবার্য্য। যেহেতু যে ভাবেই হউক বিশ্বজনীন ন্যায়ের বিধান যখন জীবনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির বর্ত্তমান ও পরিদৃশ্যমান সকল ক্রিয়াধারার দ্রষ্টা ও নিয়ন্তা, আমরা জীবনের তথ্যাবলি যেভাবে দেখিতেছি তাহাতে সে ন্যায়-বিধানের সাক্ষাৎকার লাভ না করিলেও প্রকৃতির সমগ্র ক্রিয়াধারার মধ্যে তাহা যে বর্ত্তমান আছে তাহাতে সংশয় নাই ; এই সূক্ষ্ম অদৃশ্যপ্রায় দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য অথচ গোপন সূত্রে প্রকৃতি নিশ্চয়ই নিজের মধ্যস্থ জীবের সহিত তাহার কারবারের এলোমেলো খুঁটিনাটি একত্রে গাঁথিয়া তুলিতেছে। যদি প্রশ্ন করা যায় যে কেবল শুভাশুভ কর্ম্মের ফল কেন ফলিবে, শুভাশুভ চিন্তা এবং ভাবের ফল কেন ফলিবে না তবে তাহার এই উত্তর হইতে পারে যে শুভাশুভ চিন্তা, সংবেদন, ক্রিয়া সকলেরই যথাযথ ফল আছে কিন্তু যে হেতু কর্ম্ম মানুষের জীবনের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে, কর্ম্মদ্বারা মানুষের সত্তার মূল্য পরীক্ষা এবং তাহার শক্তির রূপায়ণ হয় এবং যেহেতু তাহার চিন্তা ও সংবেদন অনেক সময় তাহার ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে বলিয়া সে তাহাদের জন্য সর্ব্বদা দায়ী নয়, তাই সে যাহা করে তাহার জন্য সে দায়ী, আর এভাবে দায়ী তাহাকে অবশ্যই করা যায়, কেন না কর্ম্ম করা না করা তাহার ইচ্ছাধীন, এবং প্রধানতঃ কর্ম্মই তাহার ভাগ্যের বিধাতা, কর্ম্মই তাহার সত্তা ও তাহার ভবিষ্যতের প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী নিয়ন্তা। ইহাই হইল কর্ম্মবাদের পূর্ণ বিধান।

কিন্তু আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যে কর্ম্মের বিধান বা শৃঙ্খল কেবল বাহ্যিক ও যান্ত্রিক ; বিশ্বের সমগ্র প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে যান্ত্রিক মনে না করিলে এই ভাবের কর্ম্মবাদকে বিশ্বজীবন পরিচালনার অন্যনিরপেক্ষ একমাত্র নিয়ন্তার উচ্চাসনে বসান যায় না। অবশ্য অনেকের ধারণা এই যে বিশ্বব্যাপার শুধু নিয়ম ও পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হয়, বিশ্বের অন্তরে বা অন্তরালে কোন চিন্ময় পুরুষ বা সচেতন কোন ইচ্ছা নাই ; যাহারা এই মত পোষণ করে এই ভাবের

কর্ম্মবাদে যে নিয়ম ও পদ্ধতি রহিয়াছে তাহাতে তাহাদের ন্যায়বোধের মানস আদর্শ ও বিচার-বুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়, মানুষ এই কর্ম্মবাদে সত্য ও সৌন্দর্য্যের পূর্ণ সুষমা ও সামঞ্জস্য এবং তাহার ক্রিয়াধারাকে গণিতের মত নিখুঁত ও নির্ভুল বলিয়া দেখিতে পায়। কিন্তু নিয়ম এবং পদ্ধতিই তো বিশ্বের সর্ব্বস্ব নয় ; তাহাতে পুরুষ ও চেতনার অস্তিত্বও আছে ; বিশ্বে কেবল যে যন্ত্র আছে তাহা নহে, তাহার মধ্যে এক চিৎপুরুষ আছেন ; যেমন আছে প্রকৃতি এবং বিশ্ব-বিধান তেমনি আছেন এক বিশ্বপুরুষ ; প্রাকৃত জীবের মধ্যে মন প্রাণ দেহের বিধান ও ক্রিয়াধারাই যে শুধু আছে তাহা নহে কিন্তু প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে এক অন্তরাত্মাও আছে। যদি তাহা না হইত তবে আত্মার জন্মান্তর সম্ভব হইত না, কর্ম্মবাদের কোন ক্ষেত্র থাকিত না। কিন্তু আমাদের সত্তার মৌলিক সত্য যদি যান্ত্রিক না হইয়া চিন্ময় হয়, তাহা হইলে আমাদের আত্মাই আমাদের পরিণামধারার মূল নিয়ন্তা হইবে, এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে যে নানা পদ্ধতি ও বিধানের প্রয়োগ করে কর্ম্মের বিধান হইবে তাহাদের একটি ; আমা-দের আত্মা তাহার কর্ম্মের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বড়। নিয়ম যেমন আছে তেমনি চিন্ময় স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতাও আছে ; আমাদেব জীবনের একদিকে আছে নিয়ম পদ্ধতির খেলা, আমাদের বাহ্য মন প্রাণ দেহের উপর তাহাদের রাজত্ব, কেননা প্রধানতঃ ইহারাই প্রকৃতির যন্ত্রলীলার অধীন। কিন্তু ইহাদেব মধ্যেও যান্ত্রিক শক্তির পূর্ণশাসন আছে শুধু দেহ এবং জড়ের উপর ; যখন প্রাণের প্রকাশ হয় তখন নিয়ম অধিকতর জটিল হয় কিন্তু তাহার দৃঢ়তা কমিয়া যায়, কর্ম্মপদ্ধতি আরও সাবলীল হয় কিন্তু তাহার যান্ত্রিকতা হ্রাস পায় ; জীবনের ক্ষেত্রে মন যখন তাহার সূক্ষ্মতা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয় তখন এ সমস্ত আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে ; অন্তরের একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটিতে আরম্ভ করে, এবং যতই আমরা অন্তরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হই ততই আত্মার বাছিয়া লইবার শক্তি বা স্বাধীনতা ক্রমশঃ অধিকতররূপে অনুভব করিতে থাকি ; কেননা প্রকৃতি নিয়ম এবং পদ্ধতিরই ক্ষেত্র, কিন্তু পুরুষ বা অন্তরাত্মা প্রকৃতির ক্রিয়ার অনুমন্তা ; সাধারণতঃ সাক্ষীরূপে অবস্থিত থাকিয়া সহজ বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ অনুমতি দেওয়ার পথ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেও যদি তাহার ইচ্ছা হয় তবে তিনি প্রকৃতির অধীশ্বর ও পরিচালক হইতে পারেন।

একথা স্বীকার করিতে পারি না যে আমাদের অন্তরস্থ চিৎপুরুষ কর্ম্মের হাতে ক্রীড়নক মাত্র, এজীবনে সে কেবল অতীত কর্ম্মের ক্রীতদাস ; বস্তুতঃ

এবিষয়ে সত্য এত কঠোরভাবে একমুখী নয়, তাহা আরও বেশী সাবলীল। অতীত কর্ম্মফলের কতকাংশ যদি বর্ত্তমান জীবনে রূপায়িত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই চৈত্যপুরুষের সম্মতিক্রমেই হইয়াছে, এই চৈত্যপুরুষের কর্ত্তৃত্ব এবং পরিচালনাতেই তাহার জাগতিক অনুভবের নবরূপায়ণ হয়, সে যে শুধু বাধ্যতামূলক বাহ্যপদ্ধতি বা কর্ম্মধারায় সম্মতি দেয় তাহা নহে কিন্তু অন্তরের যে এক গোপন সংকল্প ও পরিচালনা রহিয়াছে তাহাতেও তাহার সম্মতি থাকে। এই গূঢ় সংকল্পশক্তি চিন্ময়, জড়তন্ত্র বা যান্ত্রিক নয়; অন্তরের বুদ্ধি হইতেই সে পরিচালনা আসে, যান্ত্রিক ক্রিয়াধারাকে সে ব্যবহার করে বটে কিন্তু তাহার অধীন হইয়া পড়ে না। শরীর পরিগ্রহ করিয়া জীবাত্মা আত্ম-প্রকাশ ও আত্মানুভবের আনন্দ চায়; এই জীবনে আত্মার প্রকাশ এবং অনু-ভবের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন অতীত জীবন হইতে সহজ ও স্বতঃসিদ্ধভাবে আগত অথবা কর্ম্মের ভাণ্ডার হইতে স্বেচ্ছায় চয়ন করা কোন ফল বা ধারা-বাহিকতা অথবা একেবারে কোন নূতন কিছু, এ সমস্তের যাহাই তাহার ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার উপায়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাদের সকলকেই অন্তরাত্মা মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে চায়; কিন্তু এই আকূতির মূল কথা কোন যান্ত্রিক বিধানের অনুবর্ত্তন নয়, ইহাব মূলতত্ত্ব বিশ্বের অনুভূতির মধ্য দিয়া প্রকৃতিকে এমনভাবে ফুটাইয়া তোলা যাহাতে পরিশেষে অবিদ্যা হইতে সে মুক্ত হইতে পারিবে। অতএব ইহাতে দুইটি উপাদান থাকা চাই, একদিকে সাধনযন্ত্ররূপে যেমন কর্ম্ম চাই তেমনি অন্যদিকে যাহা গোপনভাবে মন প্রাণ ও দেহকে ব্যবহার এবং তাহাদের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছে সেই চেতনা ও সংকল্পও থাকা চাই। নিয়তি বিশুদ্ধরূপে যান্ত্রিক ভাবাপন্ন অথবা আমাদের হাতে গড়া শৃঙ্খল, যাহাই হউক না কেন, তাহা আমাদের সত্তার একদিক; কিন্তু তাহার চেয়ে বড় দিক হইল অন্তরপুরুষ নিজে, তাহার চেতনা ও ইচ্ছাশক্তি। ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষ মানুষের জীবনের সকল ঘটনাই কর্ম্মের ফল মনে করে; তাহার মতে তাহারা প্রধানতঃ পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে এবং রাশিচক্রে নক্ষত্রের স্থান হইতে তাহাদের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়; কিন্তু সেই জ্যোতিষও স্বীকার করে যে ঘটিবে বলিয়া যাহা স্থির হইয়া আছে সত্তার শক্তি ও সাধনার দ্বারা তাহার অনেকটা অথবা যাহা অত্যন্ত শক্তিশালী ও অলঙ্ঘনীয় এমন দু একটি ছাড়া সমস্তটাকেই প্রতিহত বা পরিবর্ত্তিত করা যায়। দু এর মধ্যে হিসাব মিটাইবার পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা বটে; কিন্তু এ হিসাবের সঙ্গে এ তথ্যও জুড়িয়া দিতে

হইবে যে নিয়তি মোটেই সরল নয়, একান্ত জটিল বস্তু; যে নিয়তি আমাদের জড়সত্তাকে বাঁধিয়া রাখে বা নিয়মিত করে তাহার অধিকার ততটুকু বা ততক্ষণ বজায় থাকে যতক্ষণ জীবনের বৃহত্তর বিধান দেখা না দেয়। কর্ম্মের স্থান আমাদের আধারের জড় অংশে, তাহা আমাদের সত্তার জড় পরিণাম, কিন্তু আমাদের সত্তার বহিস্তরের পশ্চাতে যে এক স্বাধীনতর প্রাণ এবং এক স্বাধীনতর মন আছে, তাহাদের অন্যবিধ শক্তি আছে, তাহারা পূর্ব্বস্থিরীকৃত প্রথম পরিকল্পনা পরিবর্ত্তিত করিয়া এক অভিনব নিয়তি সৃষ্টি করিতে পারে এবং যখন চৈত্যসত্তা ও আত্মার উন্মেষে আমরা সচেতনভাবে অধ্যাত্ম সত্তা হইয়া দাঁড়াই তখন আমরা আমাদের জড়নিয়তি পূর্ণভাবে রূপান্তরিত বা একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারি। অতএব কর্ম্মকে -অন্ততপক্ষে কর্ম্মের কোন যান্ত্রিক-বিধানকে—আমাদের জীবন পরিবেশের একমাত্র নিয়ন্তা অথবা আমাদের জন্মান্তর ও ভবিষ্যৎ প্রগতির একমাত্র সাধনযন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

কিন্তু শুধু তাহাই নহে; কেননা কর্ম্মের বিধানের বিবৃতিতে এই ভুল হইয়াছে যে তাহাতে একটি সীমিত তত্ত্ব খেয়ালখুশীমত বাছিয়া লইয়া তাহা দিয়া সব কিছু ব্যাখ্যা করিবার এবং যাহাকে সরল করা যায় না তাহাকে অত্যন্ত সরল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কর্ম্ম সত্তার শক্তির পরিণাম, কিন্তু শক্তি শুধু এক প্রকারের নয়; অন্তর পুরুষের চিৎশক্তি বহুপ্রকার শক্তিরূপে প্রকাশ হয়; এই সমস্ত শক্তির মধ্যে আছে মনের আন্তরক্রিয়া, প্রাণের এবং বাসনার ক্রিয়াবলি, সকল প্রকার আবেগ প্রবৃত্তি ও উত্তেজনা, চরিত্র, ইন্দ্রিয় ও দেহের ক্রিয়াসমূহ, সত্য এবং জ্ঞান লাভের প্রয়াস, সৌন্দর্য্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও নৈতিক শুভাশুভের অনুশীলন, শক্তি, প্রেম, সুখ, হর্ষ, আনন্দ, সৌভাগ্য, সফলতালাভের প্রচেষ্টা, প্রাণের সকল তর্পণ ও প্রসারণের সাধনা, ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সকল প্রকার উদ্দেশ্য সাধন প্রচেষ্টা, স্বাস্থ্য, শক্তি, সামর্থ্য, সকল প্রকার দৈহিক সুখের অন্বেষণ। জীবনে আত্মার নানা বিচিত্র অনুভূতি এবং বহুমুখী ক্রিয়াধারার এই যে অতি জটিল সমষ্টি রহিয়াছে তাহার সমস্ত বৈচিত্র্যকে কোন এক বিশেষ তত্ত্বের জন্য দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা অথবা জোর করিয়া একমাত্র শুভ ও অশুভ এই দ্বন্দ্বযুক্ত নৈতিক জ্ঞানের বিভিন্ন ধারা বলিয়া স্থির করা সমীচীন হইতে পারে না; সুতরাং মানুষের গড়া নৈতিক আদর্শকে বজায় রাখিবার ঐকান্তিক চেষ্টা বিশ্ববিধানের একমাত্র কার্য্য কখনও হইতে

পারে না ; অথবা নৈতিক অনুশাসনই কর্ম্মের একমাত্র নিয়ামক তত্ত্ব একথাও বলিতে পারি না। ইহা যদি সত্য হয় যে, যে ভাবের শক্তি প্রযুক্ত হয় সেই জাতীয় ফলই লাভ হয়, তাহা হইলে শক্তির প্রকৃতির এই নানা ভেদ ও বৈচিত্র্যের হিসাব আমাদিগকে করিতে হইবে এবং বুঝিতে হইবে প্রত্যেক শক্তির উপযোগী পরিণাম নিশ্চয়ই আছে। নিশ্চয়ই সত্য ও জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত শক্তির স্বাভাবিক ফল হইবে—যদি ইচ্ছা হয় তবে তাহাকে তাহার প্রতিদান বা পুরস্কার বলিতেও পার—সত্যের মধ্যে পুষ্টি এবং জ্ঞানের বিবৃদ্ধি ; তেমনি মিথ্যার সাধনায় নিযুক্ত শক্তির স্বাভাবিক পরিণামে মিথ্যার বিবৃদ্ধি এবং অবিদ্যাতে গভীরতব রূপে নিমজ্জনই তো হওয়া উচিত। সৌন্দর্য্যের অনুসরণে নিযুক্ত শক্তির ফলে সৌন্দর্য্যবোধ ও সৌন্দর্য্যসম্ভোগ নিবিড়তর এবং যদি সেই ভাবে প্রযুক্ত হয় তবে জীবনে ও চরিত্রে সৌন্দর্য্য এবং সুষমার প্রকাশ প্রবলতর হওয়াই স্বাভাবিক। স্বাস্থ্য, শক্তি ও সামর্থ্য লাভে প্রযুক্ত শক্তি সুস্থ সবল দেহ বা মল্লবীর সৃষ্টি করিবে। চরিত্র-গঠন ও ধর্ম্মসাধনায় নিযুক্ত শক্তির পরিণাম বা পুবস্কার বা প্রতিদান রূপে দেখিতে পাইব যে ধর্ম্ম-জীবন বিবৃদ্ধ হইতেছে, নৈতিক পুষ্টি জনিত সুখ, সরল ও স্বাভাবিক পুণ্য জীবনের শুচিসুন্দর শান্তি ও আনন্দচ্ছটা ফুটিয়া উঠিতেছে। আবার পাপবৃত্তির অনুশীলনে প্রযুক্ত শক্তির ফলে আমরা পাপে আরও ডুবিব, চরিত্র ও জীবনে বিরোধ ও বিকৃতি বৃদ্ধি পাইবে, এ শক্তির অতিবৃদ্ধিতে অধ্যাত্ম জীবনের ঘোর অধঃপতন বা মৃত্যু—সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে 'মহতী বিনষ্টিঃ' বলিয়াছে—ঘটিবে। শক্তিলাভ বা প্রাণের অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনার জন্য তপস্যা করিলেও ব্যর্থকাম হইতে হইবে না, তাহার ফলে এই সমস্ত পরিণামের দিকে জীবনকে পরিচালনার সামর্থ্য বৃদ্ধি পাইবে অথবা প্রাণের ভাণ্ডার শক্তি ও ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। শক্তির এই যথাযোগ্য পরিণামই প্রকৃতির সাধারণ এবং স্বাভাবিক রীতি ; প্রকৃতির কাছে যদি ন্যায্য বিধানের দাবি করা যায় তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে শক্তি ও সামথ্য যে ভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার যথাযোগ্য প্রতিদান ও পুরস্কার দান করিয়া প্রকৃতি নিশ্চয়ই ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে। প্রকৃতি দৌড়ের প্রতিযোগিতায় দ্রুতগামীকে পুরস্কার দেয়, সাহসী কুশলী বীরকেই যুদ্ধে জয়ী করে, উপযুক্ত বুদ্ধিযুক্ত অকপট জ্ঞানান্বেষীকেই জ্ঞানৈশ্বর্য্য দান করে ; যে নিতান্ত ভাল মানুষ, গতি যাহার মন্থর, যে দুর্ব্বল বা নৈপুণ্যহীন অথবা নির্ব্বোধ সে লোক মান্য ও সাধুপুরুষ বিবেচিত হইয়াছে বলিয়া শুধু তাহাকে

প্রকৃতি এ সমস্ত বস্তু অর্পণ করিবে না ; এই সমস্তের প্রতি যদি তাহার লোভ থাকে, তবে তাহাকে তজ্জন্য উপযুক্ত হইতে হইবে, তাহার জন্য যথাযোগ্য শক্তির প্রয়োগ বা যথোপযুক্ত সাধনা করিতে হইবে। প্রকৃতি যদি অন্য কিছু করিত তবেই তাহাকে অন্যায়কারী বলিয়া গালি দেওয়া যাইত ; এইভাবে পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে প্রকৃতিকে অন্যায়-কারী বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয় ; নিজের পুণ্যের স্বাভাবিক পুরস্কাররূপে ভাললোকের ভবিষ্যজীবনে উচ্চপদ লাভের বা ব্যাঙ্কে একটা মোটা তহবিল থাকার অথবা সুখ ও আরামে ভরা নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের দাবি, প্রকৃতি যদি পূরণ না করে তবে তাহাকে কোন দোষই দেওয়া যায় না। এরূপ পক্ষপাতযুক্ত ব্যবস্থা জন্মান্তরের তাৎপর্য্য অথবা বিশ্বজনীন কর্ম্মবিধানের উপযুক্ত ভিত্তি হইতে পারে না।

অবশ্য আমরা যাহাকে দৈব বা ভাগ্য বলি আমাদের জীবনে তাহার স্থানও কম নহে ; এই ভাগ্যের জন্য, সাধনা করিয়াও আমরা কখন কখন ফল পাই না, আবার কখনও বা সাধনা না করিয়া বা অতি অল্প সাধনা করিয়াই পুরস্কার লাভ করি ; নিয়তির এই খেয়ালখুশির কারণ অথবা কারণ সকলের খানিকটা —কেন না ভাগ্যের মূলে বহু কারণ থাকিতে পারে—গোপনভাবে আমাদের অজানা অতীতের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে ; কিন্তু এই অতি সরল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুব কঠিন যে গত জীবনের বিস্মৃত পুণ্যকর্ম্মের ফলেই শুধু এ জীবনে সৌভাগ্যলাভ হইয়াছে এবং গত জন্মের পাপের শাস্তির জন্যই এ জন্মে দুর্ভাগ্য আসিয়া দেখা দিয়াছে। যখন দেখিতে পাই যে এখানে কোন পুণ্যাত্মা গভীর দুঃখ ভোগ করিতেছেন তখন ইহা মনে করা কঠিন যে এই আদর্শ সাধু পুরুষটি পূর্ব্বজন্মে একজন অতি দুর্জন ছিলেন এবং নূতন জন্মে আদর্শস্থানীয় ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পরেও সেই জন্মে যে পাপ করিয়াছিলেন তাহার জন্য আজিও তাঁহাকে দুঃখভোগ করিতে হইতেছে ; আবার তেমনি কোন অতিদুর্ব্বৃত্তকে জীবনের ক্ষেত্রে জয়লাভ ও সুখভোগ করিতে দেখিলে ইহা মনে করা সহজ নয় যে, সে গত জন্মে পরম সাধু ছিল এবং হঠাৎ এবার দুর্জন হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু পূর্ব্ব-জন্মের পুণ্যকর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ নগদমূল্য হিসাবে অতুল সুখের অধিকারী হইয়াছে। এক জীবন হইতে অন্য জীবনে এইরূপ পরিপূর্ণ রূপান্তর-প্রাপ্তি কখনও ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহা সচারচর ঘটে না ; কিন্তু এই ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী ব্যক্তিসত্তার উপর অতীত জীবনের দণ্ড বা পুরস্কারের ভার চাপাইলে

কর্ম্মবাদ একটা অর্থহীন কেবল যান্ত্রিক বিধানে পরিণত হয়। কর্ম্মবাদের প্রচলিত ব্যাখ্যায় এই এবং অন্য অনেক বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং জন্মের সঙ্গে জন্মান্তরের সম্বন্ধের এই সরল যুক্তিধারা যত শক্তিশালিতার দাবি করে বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে ; কর্ম্মের প্রতিফলকে জীবন ও প্রকৃতির অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ বলিয়া গ্রহণ করিলে কর্ম্মবাদের ভিত্তিই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কেননা তাহাতে মানুষের একটা অগভীর ও উপরভাসা বোধ ও আদর্শকে বিশ্ববিধানের মাপকাঠি করা হয় এবং তাহাতে কর্ম্মবাদকে ভ্রমসঙ্কুল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয় ; কর্ম্মবিধানের অন্য কোন দৃঢ়তর ভিত্তি নিশ্চয়ই আছে।

প্রায়ই যেরূপ ঘটে এখানেও তদ্রূপ আমাদের মানব মনের মাপকাঠি ও আদর্শ জোর করিয়া বিশ্বপ্রজ্ঞার প্রমুক্ত উদার ও ব্যাপক ক্রিয়াধারার উপর চাপাইতে গিয়া আমরা ভুল করিয়া বসি। প্রচলিত কর্ম্মবাদে প্রকৃতির স্পষ্ট বহুবিচিত্র পরিণামের মধ্যে নৈতিক শুভাশুভ বা পাপপুণ্য এবং দেহ প্রাণের ভালমন্দ বা বাহ্যিক সুখদুঃখ বা বাহিরের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য এই দুইটি মাত্র নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং মনে করা হয় যে উভয়ের মধ্যে একটা সমীকরণ (equation) অবশ্যই আছে, এবং ইহাদের মধ্যে পুণ্যের ফল পুরস্কার আর পাপের ফল শাস্তি ও দুঃখ ইহাই প্রকৃতির নিগূঢ় ন্যায়ের বিধানের নিকট শেষ পর্য্যন্ত অনুমোদন লাভ করিয়াছে। স্পষ্টতঃ এই দুইএর এরূপ সংযোগ সাধারণ মানুষের প্রাণময় দৈহিক বাসনার দিক হইতেই করা হইয়াছে ; কেন না আমাদের প্রাণময় সত্তার নিম্নতর অংশ সুখ ও সৌভাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কামনা করে এবং দুঃখ ও দুর্ভাগ্যকে সব চেয়ে বেশী ভয় ও ঘৃণা করে ; প্রবৃত্তি দমন বা পাপকে বর্জন করিবার জন্য আত্মসংযম ও পুণ্য-কর্ম্ম করিবার প্রয়াস পাইবার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে যখন নীতি ও ধর্ম্মবুদ্ধি মানুষকে আহ্বান করে তখন তাহা স্বীকার করিবার সময়ে দরদস্তুর করিয়া এমন এক বিশ্ববিধান সে খাড়া করিতে চায় যাহা বাধ্যতামূলক এই তপস্যা ও কৃচ্ছসাধনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপে তাহাকে সুখ ও সৌভাগ্য দিয়া পুরস্কৃত করিবে এবং যাহা দণ্ডের ভয় দেখাইয়া তাহার আত্মত্যাগের দুরূহপথে তাহাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু খাঁটি ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে শুভ ও পুণ্য কর্ম্মের পথে চলিবার জন্য পুরস্কার এবং অশুভ ও পাপের পথ বর্জন করিবার জন্য দণ্ডের ব্যবস্থার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই ; তাহার কাছে পুণ্য নিজেই নিজের পুরস্কার, স্বভাব হইতে বিচ্যুতির দুঃখই তাহার নিকট পাপের দণ্ড ; ধর্ম্মের ইহাই সত্য এবং শাশ্বত

আদর্শ। অন্য পক্ষে, দণ্ড পুরস্কারের ব্যবস্থা নীতিধর্ম্মকেও বিকৃত ও দুষিত এবং পুণ্যাচরণকে স্বার্থপরতায় বণিকসুলভ স্বার্থবুদ্ধিজাত দরকসাকসিতে পরিণত করে, পাপ হইতে বিরত থাকিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে নিম্নতর বাসনার ক্ষেত্রে নামাইয়া আনে। সামাজিক প্রয়োজনে বুদ্ধিকে সমাজের অনিষ্টাচরণ হইতে বিরত রাখিয়া এবং তাহার হিতসাধনায় উৎসাহিত করিবার জন্য মানুষই দণ্ডপুরস্কারের বিধান খাড়া করিয়াছে ; কিন্তু মানুষের রচিত এই বিধানকে বিশ্বপ্রকৃতির সাধারণ বিধান বা পরমপুরুষের একটা বিধি অথবা সত্তা ও জীবনের চরম বিধানরূপে উপস্থাপিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। আমাদের অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের গড়া পঙ্গু ও সংকীর্ণ বিধিবিধানকে বিশ্বপ্রকৃতির জটিলতর ও বৃহত্তর ক্রিয়াধারা বা চিন্ময় পরমশিবের কর্ম্মের উপর আরোপ করা মনুষ্যসুলভ হইতে পারে কিন্তু তাহা যে নিতান্ত ছেলেমানুষী তাহাতে সন্দেহ নাই ; এই পরমশিব আমাদের অন্তরসত্তাব মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ক্রিয়া করিয়া স্বীয় চিন্ময় শক্তির সাহায্যে আমাদিগকে তাহার নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, আমাদের বাহ্য প্রাণপ্রকৃতির উপর প্রলোভন বা বাধ্যবাধকতার কোন বিধান প্রয়োগ দ্বারা নহে। জীবাত্মা যখন বহুমুখী ও জটিল অনুভূতির মধ্য দিয়া পরিণামের পথে অগ্রসর হইতেছে তখন কোন প্রকার কর্ম্মবাদ অথবা শক্তিপরিণামবাদকে যদি সে অনুভূতির সঙ্গে মিল রাখিয়া চলিতে হয় তবে তাহাকেও জটিল হইতে হইবে, তাহা অতিসরল বা অপ্রচুর বা তাহার প্রয়োগ আড়ষ্ট বা একদেশী হইলে চলিবে না।

এই সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে, মূল বা সাধারণ তত্ত্বের দিক হইতে না হইলেও তথ্যের দিক হইতে এই মতকে খানিকটা স্বীকাব করা যাইতে পারে, কেননা যদিও শক্তির ক্রিয়াধারাসমূহ পৃথক ও স্বতন্ত্র তথাপি তাহারা একত্রে এবং পরস্পরের উপরে ক্রিয়া করিতে পারে, যদিও তাহাদের পরস্পরের সঙ্গতির মধ্যে কোন পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট বিধান খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ইহা সম্ভব যে প্রকৃতির বহুব্যাপক পূর্ণক্রিয়াধারার মধ্যে নৈতিক শুভাশুভের সঙ্গে দেহপ্রাণগত শুভাশুভের সীমাবদ্ধ ভাবে একটা সম্পর্ক অথবা বরং একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আসিয়া পড়ে, এই দুই বিজাতীয় ভাবের মধ্যে সীমিত এক যোগাযোগ বা মিলনের স্থান আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু তাহাদেব মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সংগতি স্থাপিত হয় না। আমাদের নানা বিচিত্র শক্তি, বাসনা ও গতিবৃত্তি তাহাদের ক্রিয়াধারার মধ্যে একত্রে আসিয়া মিশ্রিত হইয়া পড়ে এবং এক মিশ্র ফল

উৎপাদন করিতে পারে; আমাদের সত্তার প্রাণময় অংশ ধর্ম্ম ও জ্ঞানের, বুদ্ধি রসবোধ নীতি বা দেহের ক্ষেত্রে প্রতি প্রয়াসের জন্য প্রচুর বাহ্য পুরস্কার দাবি করে; পাপের এমন কি অবিদ্যারও দণ্ড আছে ইহা সে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে। এই দাবি ও বিশ্বাসের জবাবে বিশ্বশক্তির ক্রিয়াতেও একটা অনুরূপ সাড়া জাগিতে বা অনুরূপ ক্রিয়া সৃষ্ট হইতে পারে; কেননা আমরা বর্ত্তমানে যেরূপ আছি তাহা মানিয়া লইয়া প্রকৃতি, আমাদের প্রয়োজন অথবা তাহার উপর আমাদের দাবি অনুসারে তাহার গতি ও ক্রিয়া কতকটা নিয়মিত করে। অদৃশ্য শক্তি আমাদের উপর ক্রিয়া করে ইহা যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে বিশ্বগত প্রাণময় প্রকৃতিতে এমন অদৃশ্য শক্তি থাকিতে পারে যাহা আমাদের এই প্রাণময় অংশের সঙ্গে চিৎশক্তির একই ভূমিতে অবস্থিত, এই সমস্ত শক্তি এবং আমাদের নিম্নতর প্রাণপ্রকৃতি একই পরিকল্পনায় বা একই উদ্দেশ্যে ক্রিয়া করিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একান্তভাবে সচেষ্ট কোন প্রাণময় অহংকার যখন কোন সংযম না মানিয়া দ্বিধাশূন্য ভাবে যাহা তাহার ইচ্ছা বা বাসনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহাকে পদদলিত করিয়া চলিতে থাকে, তখন সে তাহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া তোলে, যাহা মানুষের মনে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অস্বস্তি রূপে দেখা দেয়, যাহার ফল তখনই বা তাহার পরে দেখা দিতে পারে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিরোধীভাবের এই প্রতিক্রিয়া আরও ভীষণাকার ধারণ করে। তখন মনে হয় যেন প্রকৃতির ধৈর্য্যের সীমা পার হইয়া গিয়াছে, সেই অহমিকা যে তাহাকে নিজের ব্যবহারে লাগাইবে প্রকৃতি তাহা আর তখন চায় না; প্রাণধর্ম্মী মানুষের সবল অহংকার যে সমস্ত শক্তিকে ধরিয়া নিজ কাজে লাগাইয়াছিল তাহারা বিদ্রোহ করে এবং তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যাহাদিগকে সে পদদলিত করিয়াছিল তাহারা মাথা তুলিয়া উত্থিত হয় এবং তাহাকে ভূপাতিত করিবার শক্তি লাভ করে; মানুষের উদ্ধত প্রাণশক্তি নিয়তির সিংহাসনে আসিয়া আঘাত করিয়া নিজেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়ে অথবা যাহাকে পঙ্গু মনে হইয়াছিল প্রকৃতির সেই দণ্ডশক্তিও অবশেষে সিদ্ধকাম দুস্কৃতকারীর উপর আসিয়া আপতিত হয়। তাহার ঔদ্ধত্যের এই প্রতিক্রিয়া এখানেই না আসিয়া পরজন্মে আসিয়া তাহার উপর পড়িতে পারে; এই সমস্ত শক্তির ক্ষেত্রে যখন সে পুনরায় ফিরিয়া আসিবে তখন কর্ম্ম-ফলের এই বোঝা ঘাড়ে করিয়াই হয়ত তাহাকে আসিতে হইবে; বৃহৎ পরিসরের মধ্যে এইরূপ বৃহত্তর অহমিকার বেলায় যেমন ঘটে তেমনি ক্ষুদ্রতর প্রাণসত্তা

ও তাহার ক্ষুদ্রতর ভ্রান্তির বেলায় ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রেও সেরূপ ঘটিতে পারে। কেননা শক্তির অপপ্রয়োগের প্রতিক্রিয়া ও দণ্ডের বিধান সর্ব্বত্র এক; আমাদের মনোময় সত্তা যখন শক্তির অপব্যবহার দ্বারা নিজের সফলতা খোঁজে, তখন প্রকৃতি প্রথমে তাহা স্বীকার করিয়া নেয় কিন্তু অবশেষে তাহার মধ্যে বিরুদ্ধ ভাবের প্রতিক্রিয়া জাগে, ফলে পরাভব দুঃখ ও অসিদ্ধির বেশে সে যাহা চায় তাহার বিপরীতবস্তু আসিয়া হাজির হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কার্য্য ও কারণের এই গৌণ বিধানকে অপরিবর্ত্তনীয় আত্মনিরপেক্ষ বিধানের শ্রেণীতে উন্নীত করা বা পরমপুরুষের ক্রিয়াধারার সমগ্র সর্ব্বজনীন বিধান মনে করা যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না; এই ভাবের কার্য্যকারণ-ধারা একদিকে জড়প্রকৃতির পক্ষপাতশূন্যতা ও অন্যদিকে অন্তরতম বা পরম সত্য এ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিত।

যাহাই হউক প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া মূলতঃ পুরস্কার বা দণ্ড দেওয়া নহে, দণ্ড-পুরস্কার প্রকৃতির মূল অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্যও নহে, বরং তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বস্তুর স্বভাবধর্ম্মে পরস্পরের মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাহার স্ফুরণ, মানুষের অধ্যাত্ম-পরিণামের সঙ্গে তাহার এইটুকু সম্পর্ক যে তাহা বিশ্বশিক্ষালয়ে আত্মার অনুভববৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়, কিন্তু কার্য্যকারণের এই সম্বন্ধের মধ্যে দণ্ড দেওয়ার কোন বিধান নাই, ইহা হইতে আমরা একটা সম্বন্ধের বিষয় অবগত হই একটা অভিজ্ঞতা লাভ করি; এইভাবে প্রকৃতির সহিত আমাদের সকল কারবারের মধ্যে বস্তুর একটা সম্বন্ধ জ্ঞান এবং তাহার অনুরূপ একটা অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা আছে। বিশ্বশক্তির ক্রিয়াধারা জটিল, এখানে একই শক্তি বিভিন্ন পরিবেশে সত্তার প্রয়োজন এবং ক্রিয়াশীল বিশ্বশক্তির অভিপ্রায় ভেদে বিভিন্ন-রূপে ক্রিয়া করিতে পারে; আমাদের জীবন শুধু আমাদের নিজ শক্তি নহে পরন্তু অপরের এবং বিশ্বের শক্তিধারার দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়; এই বিরাট অন্যোন্যক্রিয়ার ফল কেবলমাত্র এক সর্ব্বনিয়ামক নৈতিক বিধানের দ্বারা কিম্বা মানুষের ব্যক্তিগত সুকৃতি দুষ্কৃতি অথবা পাপপুণ্যের উপর ঐকান্তিক দৃষ্টি দিয়া নিয়ন্ত্রিত হইতেছে ইহা মনে করা ভুল। সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য, সুখ এবং দুঃখ, হর্ষ এবং শোক, প্রাকৃত সত্তায় ভাল মন্দ নির্ব্বাচনে কেবল মাত্র প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক রূপে রহিয়াছে ইহাও সত্য নহে। অভিজ্ঞতালাভ এবং ব্যষ্টিসত্তার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যই আত্মা জন্মান্তর গ্রহণ করে; হর্ষ ও শোক,

দুঃখ ও যন্ত্রণা, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সেই অভিজ্ঞতার অংশ সেই পুষ্টির উপায়; এমন কি দ্রুতপুষ্টির অনুকূল ও প্রবর্ত্তক বলিয়া আত্মা নিজেই দারিদ্র্য দুরদৃষ্ট ও যন্ত্রণাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইতে অথবা তাহার অধ্যাত্ম সাধনার পথে বিপদ্‌জনক বা বিঘ্নকর মনে করিয়া অথবা তাহার তপস্যায় শৈথিল্য আসিবে ভাবিয়া বাহ্যসম্পদ ঐশ্বর্য্য ও সফলতাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। সুখ এবং সুখসিদ্ধির আকাঙক্ষা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি সন্দেহ নাই; অপ্রাকৃত আনন্দের একটা মলিন ছায়া বা একটা স্থূল প্রতিরূপ ধরিবার জন্য দেহ প্রাণের একটা প্রচেষ্টাই ইহাতে প্রকাশ পায়; বাহ্যসুখ বা স্থূল জগতের সফলতা আমাদের প্রাণপ্রকৃতির যতই কাম্য হউক না কেন, আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য বা প্রধান বস্তু নহে; তাহাই যদি হইত তাহা হইলে জগৎব্যবস্থা অন্য-প্রকারের হইত। আত্মার পুষ্টি ও প্রগতি তাহার অভিজ্ঞতালাভ আত্মার এই মুখ্য প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া জন্মান্তরের সকল ঘটনা পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় ইহাই তাহার গোপন রহস্য; এই প্রয়োজনই পরিণামের ধারা নিয়ন্ত্রিত করে, বাকি সমস্ত আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা মাত্র। ইহা সত্য নহে যে এই বিরাট বিশ্ব সর্ব্বজনীন ন্যায় বিধান ও বিচারের জন্য একটা ধর্ম্মাধিকরণরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে যে আইন বা বিধান আছে তাহা বিশ্বজোড়া দণ্ড পুরস্কারের অনুশাসনের জন্য রহিয়াছে এবং বিশ্বনাথ আইন-প্রণয়ন-কর্ত্তা অথবা বিচারক-রূপে সেই ধর্ম্মাধিকরণের কেন্দ্রস্থানে বসিয়া আছেন। বিশ্বপ্রকৃতিতে আমরা প্রথমে দেখিতে পাই শক্তির এক বিরাট স্বতঃস্ফুরণ, তাহার পর তাহার মধ্যে আত্মপরিণামী এক চেতনার উন্মেষ তাই প্রকৃতিতে শক্তির অভিব্যক্তি চিৎস্বরূপের আত্মরূপায়ণের এক লীলা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতির এই গতির মধ্যে জন্মের চক্র পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হয়, সেই চক্রের মধ্যে অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষ যাহা তাহার পরিণামের পথে পরবর্ত্তী সোপানরূপে প্রয়োজন তাহা গড়িয়া তোলে, অথবা দিব্যজ্ঞান বা বিশ্বগত চিৎশক্তি তাহার ক্রিয়ার মধ্য দিয়া তাহার জন্য এই গঠন ক্রিয়া সম্পাদন করে; এইভাবে অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যতের মধ্য দিয়া শক্তিধারাসকলের যে প্রবাহ নিয়ত চলিতেছে তাহা হইতে প্রত্যেক নূতন জন্মের জন্য শক্তি লইয়া আগন্তুক এবং আবশ্যক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার গ্রন্থিস্বরূপ পরবর্ত্তী ব্যক্তিসত্তা গঠিত হয়; কেননা আত্মার এই চলা কখনও সম্মুখে অগ্রসর হওয়া কখনও বা পশ্চাতে ফিরিয়া আসা কখনও বা চক্রাকারে আবর্ত্তন এইরূপ নানা আকার নিতে পারে কিন্তু প্রকৃতির

মধ্যে তাহার যে আত্ম-উন্মীলন নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে জীবের প্রতি নূতন পদক্ষেপই তাহাকে সেইদিকে লইয়া চলিয়াছে।

এইবার জন্মান্তর সম্বন্ধে সাধারণ মতবাদের মধ্যস্থিত গ্রহণের অযোগ্য আর একটি ধারণার কথা বলিব যাহা স্পষ্টতঃ জড়াসক্ত মনের একটা ভ্রান্তি ; সে ধারণাটি এই যে আমাদের অন্তরাত্মা এমন একটি সীমিত ব্যক্তিসত্তা যাহা জন্ম জন্মান্তরের মধ্যে অপরিবর্ত্তিত হইয়াই বাঁচিয়া থাকে। শুধু এই জন্মে আমাদের যে প্রাতিভাসিক আত্মরূপায়ণ হইয়াছে আমাদের জড়াসক্ত মন তাহার বাহিরে কিছু দেখিতে পায় না, দৃষ্টিশক্তির এই অসামর্থ্য হইতে আত্মা এবং ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে এই অতিসরল ও পল্লবগ্রাহী ধারণা জাত হইয়াছে। সাধারণের এই মতে একই চিন্ময় সত্তা বা একই চৈত্যপুরুষ জন্মান্তবে যে ফিরিয়া আসে শুধু তাহা নহে, গত জন্মে দেহের মধ্যে যে বাস করিত আমাদের প্রকৃতির সেই রূপায়ণ বা সেই ব্যক্তিসত্তাও পুনরায় আসিয়া জন্মগ্রহণ করে ; স্থূল দেহ নূতন হয়, পরিবেশ বিভিন্ন হয়, কিন্তু সত্তার প্রকৃতি, মন, স্বভাব, ধরণধারণ, মেজাজ এবং প্রবৃত্তি বা ঝোঁক পূর্ব্বজন্মে যেমন ছিল তেমনি একই থাকিয়া যায় ; গত জন্মের শ্যামলালই তাহার জড়দেহ মাত্র বদল করিয়া এজন্মের শ্যামলাল হইয়া আসে। কিন্তু একথা সত্য হইলে জন্মান্তরের কোন আধ্যাত্মিক উপযোগিতা বা তাৎপর্য্য থাকে না ; কেননা তাহাতে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত একই ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা, একই ক্ষুদ্র মনঃপ্রাণময় রূপায়ণের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব চলিতে থাকে। কারণ দেহীকে পুষ্টিলাভ করিয়া যদি তাহার স্বরূপ সত্যের পূর্ণমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য কেবল নূতন অভিজ্ঞতা লাভই যথেষ্ট নহে, নূতন ব্যক্তিসত্তালাভও তাহাকে অবশ্যই করিতে হইবে। একই ব্যক্তিসত্তার পুনরাবৃত্তির একটা সার্থকতা থাকিতে পারে যদি অভিজ্ঞতায় যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে এমন অপূর্ণতা থাকে যাহার পূর্ণতাসাধন জন্য একই কাঠামোর মধ্যে মনের একই রূপায়ণ এবং শক্তির একই প্রকার সামর্থ্যের প্রয়োজন থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে, শ্যামলাল চিরকাল শ্যামলাল থাকিয়া গেলে তাহার কোন লাভ নাই, এভাবে সে নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিবে না ; চিরকাল ধরিয়া একই স্বভাব, একই রুচি, একই প্রবৃত্তি, ভিতরে এবং বাহিরে একই ধরণের গতিবৃত্তির পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকিলে সে পুষ্টি বা পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না। এরূপক্ষেত্রে আমাদের জীবন ও জন্মান্তর চিরকাল

একই আবৃত্ত বা পৌনঃপুনিক দশমিক (recurring decimal) হইয়া থাকিবে, তাহা ক্রমপরিণতিব ধারা হইবে না, চিরকাল অর্থশূন্য এক পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকিবে। বর্ত্তমান ব্যক্তিসত্তার প্রতি আমাদের আসক্তি দাবি করে যে এই অবস্থা বজায় থাকুক, এই ভাবের আবৃত্তি চলুক, শ্যামলাল চিরকাল শ্যামলালই থাকিতে চায়; কিন্তু স্পষ্টতঃ এ দাবি অবিদ্যাপ্রসূত; এ দাবি পূর্ণ হইলে জীবন ব্যর্থ হইবে, পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে না। কেবল আমাদের বহিরাত্মার রূপান্তর সাধন, আমাদের প্রকৃতির নিরন্তর উর্দ্ধগতি এবং চিৎপুরুষের মধ্যে নিজেকে ফুটাইয়া তোলার দ্বারাতেই আমাদের জীবন সত্য সার্থকতালাভ করিবে।

ব্যক্তিসত্তা দেহ মন ও প্রাণের একটা সাময়িক রূপায়ণমাত্র, যাহাকে আমাদেব খাঁটি আত্মা বা চৈত্যপুরুষই সত্তার বহিস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; ইহা আমাদের নিত্যপ্রতিষ্ঠ খাঁটি আত্মা পুরুষ নহে। প্রতিজন্মে চৈত্য-পুরুষ নূতন অভিজ্ঞতালাভের এবং নিজ সত্তার নূতনভাবে পুষ্টির জন্য তদুপ-যোগীভাবে ব্যক্তিসত্তার এক নূতন ক্ষুদ্র রূপায়ণ গড়িয়া তোলে। চৈত্য-পুরুষ যখন দেহ হইতে বাহির হইয়া যায় তখন তাহার ব্যক্তিসত্তার মধ্যস্থিত একই প্রাণময় ও মনোময় রূপকে কিছুকালের জন্য রক্ষা করে, তাহার পর এই দুই রূপ বা এই দুই কোষও খসিয়া পড়ে, তখন পূর্ব্ব ব্যক্তিসত্তার মূল উপা-দান, সারাংশ বা সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, যাহার কতকটা পরবর্ত্তী জন্মে ব্যবহৃত হয়, বাকিটাকে সে-জন্মেও কাজে লাগানো না হইতে পারে। গত জন্মের ব্যক্তিসত্তার সারাংশ জীবাত্মার বহু উপাদানের মধ্যে একটি উপাদান বা একই জীবপুরুষের বহু ব্যক্তিসত্তার একটি ব্যক্তিসত্তারূপে বহিঃস্ফুট মন প্রাণ ও দেহের অন্তরালে অধিচেতনায় সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে; এবং তথা হইতে তাহার মধ্যে যাহা আছে তাহা হইতে যে উপাদান নবজন্মে নূতন-রূপের জন্য প্রয়োজন তাহা সরবরাহ করে; কিন্তু তাহা বলিয়া শুধু ইহা দ্বারাই নূতন রূপায়ণের সমস্তটা গঠিত করা অথবা পুরাতন প্রকৃতিকে অপরি-বর্ত্তিত আকাবে পুনরায় ফুটাইয়া তোলা হয় না। এমনও হইতে পারে যে নূতন জন্মে ব্যক্তিসত্তার যে নবরূপ গঠিত হইল তাহার স্বভাব ও মেজাজ পুরাতন হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহার সামর্থ্য অন্যপ্রকার, প্রবৃত্তি ও ঝোঁক সম্পূর্ণ পৃথক; তাহার কারণ হয়ত নূতন জন্মে কোন সুপ্ত ও গুপ্ত নতন সম্ভাব-নার উন্মেষের সময় হইয়াছে, অথবা বিগত জন্মে কোনও সম্ভাবনার ক্রিয়া

শুধু আরম্ভ হইয়াছিল এবং ফুটাইয়া তোলা আবশ্যক হইলেও পরবর্ত্তীকালে উপযুক্ততর পরিবেশের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য অবিকাশিত অবস্থায় সংযত রাখা হইয়াছিল, এইবার তাহা প্রকাশ হইবার সময় আসিয়াছে। বস্তুতঃ তাহার ক্রমবর্দ্ধমান আবেগ ও সম্ভাবনা লইয়া ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিবার জন্য সমগ্র অতীত বর্ত্তমানের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; কিন্তু তাহার সবখানি মূর্ত্ত ও সক্রিয় হইয়া উঠে নাই। অতীত রূপায়ণসকলের বৈচিত্র্য যত বেশী হইবে এবং তাহা যত বেশী কাজে লাগানো যাইবে, অনুভবের সমারোহ এবং সঞ্চয় যতই সমৃদ্ধ ও বিচিত্র হইবে, নূতন জন্মে জ্ঞান, বীর্য্য, কর্ম্মশক্তি, চরিত্র, বিশ্বের অভিঘাতে বহুরূপে সাড়া দেওয়ায় সামর্থ্যের অভিব্যক্তি যতই অকুণ্ঠ ও সঙ্গতিপূর্ণ হইবে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যতই সহজ হইবে, বহিস্তরে স্থিত নূতন ব্যক্তিসত্তাকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য গোপনভাবে মনোময় প্রাণময় সূক্ষ্মভূতময় ব্যক্তিসত্তা-সমূহের সারাংশের সমাহার ও সংযোগ যতই বেশী হইতে থাকিবে, নূতন ব্যক্তিসত্তা ততই মহৎ সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হইতে থাকিবে এবং পরিণামধারার মধ্যস্থিত মনোময় ধাপকে পরিপূর্ণ করিয়া মনের অতীত কিছুতে পৌঁছিবার সময় ততই তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিবে। একই জীবের মধ্যে যখন এই ভাবে বহু ব্যক্তিত্বের জটিল সমাবেশ হয় এবং সবল কেন্দ্রীয় সত্তা সে সকলকে একত্রে ধারণ করিয়া প্রকৃতির বহুমুখী সমগ্র গতি ও ক্রিয়াকে সুষমার ছন্দে একত্বের দিকে লইয়া যাইবার জন্য ক্রিয়া করে তখন সে জীবাত্মা পরিণতির অতি উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছে ইহাই সূচিত হয়। এইরূপে অতীত সমৃদ্ধির সমাহরণ একই ব্যক্তিসত্তার পুনরাবর্ত্তন নয়, ইহা হইবে এক নূতন রূপায়ণ এক বৃহত্তর পরিপূর্ণতা। জন্মান্তরের উদ্দেশ্য এক অপরিবর্ত্তিত ব্যক্তিসত্তার নবায়ন বা দীর্ঘজীবন দান নহে, তাহা প্রকৃতির মধ্যস্থ পরিণামধারার মধ্য দিয়া চিন্ময় সত্তার আত্ম-উন্মীলনের উপায় ও সাধন-যন্ত্র।

ইহা স্পষ্ট যে জন্মান্তরের এই পরিকল্পনায় গত জন্মের স্মৃতির উপর আমাদের মন যে গুরুত্ব আরোপ করে তাহা লোপ পায়। বস্তুতঃ পুরস্কার ও দণ্ডের ব্যবস্থার দ্বারা যদি পুনর্জন্ম নিয়ন্ত্রিত হয় এবং জীবনের সমগ্র উদ্দেশ্য যদি দেহধারী জীবকে সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়—যদি ধরা যায় যে তাহাই কর্ম্মবিধানের উদ্দেশ্য এবং সংশোধন ও সংস্কারের উদ্দেশ্য যাহাতে নাই দণ্ডপুরস্কারের সেরূপ যান্ত্রিক বিধানরূপে যাহা উপস্থিত করা হইয়াছে

বলিয়া মনে হইতেছে তাহা যদি ঠিক না হয় অর্থাৎ সংশোধন ও সংস্কারই যদি একমাত্র তাহাদের লক্ষ্য হয়—তাহা হইলে পূর্ব্বজন্ম এবং কর্ম্মের কোন স্মৃতি নূতন জন্মের মনে থাকিতে না দেওয়া স্পষ্টতঃ একটা বিষম অন্যায় ও দারুণ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কেননা স্মৃতির এই অভাবের জন্য এই জন্মে কেন বা পূর্ব্বজন্মের কোন্ পুণ্য বা পাপের ফলে সে পুরস্কার পাইতেছে অথবা দণ্ড-ভোগ করিতেছে তাহা, অথবা তাহার পুণ্য ও পাপের সঙ্গে তাহার লাভ ও লোক-সানের যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে তাহা বুঝিতে পারিবে না। এমন কি মনে হয় যে জীবনও অনেক সময় যেন বিপরীত শিক্ষা দেয়—কেননা সে অনেক সময়ই দেখিতে পায় যে পুণ্যাত্মা তাহার সুকৃতির জন্য দুঃখভোগ করিতেছে এবং পাপী তাহার দুষ্কৃতির ফলে সমৃদ্ধ হইতেছে, বরং এই বিপরীত ভাবের সিদ্ধান্ত করাই তাহার পক্ষে সম্ভব, কেননা তাহার এমন কোন স্মৃতি নাই বা তাহার অনুভবে সর্ব্বদা এমন কোন নিশ্চিত পরিণাম দেখিতে পায় নাই যাহাতে সে মনে করিতে পারে যে পুণ্যাত্মার বর্ত্তমান জীবনের দুর্ভোগ তাহার অতীত জীবনের দুষ্কৃতির অথবা পাপাত্মার বর্ত্তমান সমৃদ্ধি তাহার অতীত পুণ্য কর্ম্মের ফল, এমন কিছু দেখে নাই যাহাতে তাহার মনে হইবে যে প্রকৃতির এই ব্যবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে বিচারশীল ও বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে কর্ম্ম কুশলতার দিক হইতেও পুণ্যাচরণই শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র শ্রেষ্ঠ পন্থা হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা বলা যাইতে পারে যে সব কিছুর স্মৃতি আমাদের অন্তরস্থ চৈত্যপুরুষে রক্ষিত হয়, কিন্তু আমাদের বহিঃসত্তার পক্ষে এরূপ গোপন স্মৃতির কোন প্রভাব বা মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। আবার ইহা মনে করা যাইতে পারে যে দেহত্যাগের পর যখন চৈত্যপুরুষ তাহার অনুভূতি-সকলের পুনরায় পর্য্যালোচনা ও পরিপাক করে তখন কি ঘটিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে এবং তাহা হইতে যাহা কিছু শিখিবার তাহা শিখিতে পারে; কিন্তু বিদেহ অবস্থায় ক্ষণকালের জন্য এইরূপ স্মৃতির উদয়ে পরজন্মে খুব স্পষ্টতঃ বিশেষ কোন লাভ হয় না; কেননা তবুও আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই ভ্রান্তি ও পাপের পথে বিচরণ করার বিরাম ঘটে না এবং অতীত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা যে লাভবান হইয়াছি তাহার স্পষ্ট কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

ক্রমবর্দ্ধমান বিশ্ব-অভিজ্ঞতার সাহায্যে সত্তার ক্রমবিবৃদ্ধিই যদি তাৎপর্য্য এবং নূতন জন্মে নূতন ব্যক্তিসত্তা গঠনই যদি তাহার পদ্ধতি হয় তাহা হইলে গত জন্ম বা জন্মপরম্পরার অবিচ্ছিন্ন ও পূর্ণ-স্মৃতি প্রগতির পথে এক শৃঙ্খল

এবং গুরুতর বাধা হইয়া দাঁড়ায় ; তাহা অতীতের চরিত্র, সংস্কার, মেজাজ ও অভিনিবেশকে দীর্ঘতর করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি রূপে দেখা দিবে ; নূতন ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার এবং তাহার নূতন অভিজ্ঞতা লাভের পথে পূর্ব্বস্মৃতির এই গুরুভার বিপুল অন্তরায় হইয়া পড়িবে। অতীত জীবনের ঘৃণা ও বিদ্বেষ, আসক্তি ও যোগসূত্রগুলির স্পষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মৃতি জাতককে প্রবল অসুবিধায় ফেলিবে ; কেননা ইহা তাহার বহিশ্চর অতীতের নিরর্থক পুনরাবৃত্তি বা বাধ্যতামূলক অনুবৃত্তির সঙ্গে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে এবং চিৎসত্তার গভীরে ডুবিয়া অভিনব সম্ভাবনাকে বাহির করিয়া আনিবার পথে দুর্লঙঘ্য ব্যাঘাতরূপে উপস্থিত হইবে। বস্তুতঃ যদি মনোময় জ্ঞানলাভই প্রগতির মর্ম্মকথা হইত এবং তদনুসারেই পরিণামধারা নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে স্মৃতির মূল্য এবং গুরুত্ব খুবই বেশী হইত ; কিন্তু পরিণতিতে আমাদের অন্তরাত্মা বা চৈত্য ব্যক্তিত্বের (Soul personality) পুষ্টি সাধিত হয়, অতীত শক্তির সারভূত সৃষ্টিশীল ফলসকল সার্থকভাবে আমাদের সত্তার উপাদানে গ্রহণ ও পরিপাক করিয়া আমাদের আত্মপ্রকৃতিই পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় ; এই ক্রিয়াধারার মধ্যে সচেতন স্মৃতির কোন বিশেষ গুরুত্ব নাই। বৃক্ষ যেমন অচেতন এবং অবচেতনভাবে রৌদ্র বৃষ্টি ও বায়ুর ক্রিয়া গ্রহণ এবং পার্থিব উপাদানসমূহ পরিপাক করিয়া বর্দ্ধিত হয় তদ্রূপ আমাদের সত্তা অধিচেতনা ও অন্তশ্চেতনার মধ্য দিয়া অতীত শক্তি ও কর্ম্মপরিণাম সকল গ্রহণ ও পরিপাক করিয়া এবং অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে ভবিষ্যতের দিকে মেলিয়া দিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হয়। যে বিধান আমাদিগের অতীত জীবনের স্মৃতি মুছিয়া দেয় তাহা বিশ্বপ্রকৃতির সর্ব্বদর্শী জ্ঞানময় শক্তিরই নিদর্শন, তাহা পরিণামধারার আনুকূল্য করে তাহার পথে বাধা জন্মায় না।

পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি যখন নাই তখন পূর্ব্বজন্মই নাই এরূপ সিদ্ধান্ত করা ভুল ; এ ধারণায় আমাদের অজ্ঞান ও অযৌক্তিকতা সূচিত হয়, কেন না দেখা যায় এই জীবনেই সকল পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা করা যায় না, মনের পটভূমিকায় তাহারা অনেক সময় অস্পষ্ট হইয়া উঠে অথবা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, আমাদের শৈশবের কোন স্মৃতি থাকে না, তবুও স্মৃতির এই সমস্ত ফাঁক সত্ত্বেও আমরা বাঁচিয়া থাকি এবং বর্দ্ধিত হই ; এমনও হইতে পারে যে অতীত জীবনের সমস্ত স্মৃতি মুছিয়া গিয়া কাহারও আত্মবিস্মরণ ঘটিয়াছে, কিন্তু তখনও সেই একই ব্যক্তিসত্তা বর্ত্তমান আছে এবং পরে একদিন লুপ্ত স্মৃতি আবার ফিরিয়া

আসিয়াছে ; ইহজীবনেই যদি এ সমস্ত সম্ভব হয় তবে লোকান্তরে গমনজনিত এরূপ মৌলিক পরিবর্ত্তনের পর নূতন জন্মে নূতন দেহ ধারণের সময় অতীত জীবনের বহিশ্চর বা মনোময় স্মৃতির পূর্ণ লোপ পাওয়া খুবই স্বভাবিক ব্যাপার কিন্তু তৎসত্ত্বেও আত্মস্বরূপের বিপর্য্যয় ঘটিবে না অথবা প্রকৃতির পুষ্টি ও বি-বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যাইবে না। বরং জীবাত্মা এক থাকিয়াও নূতন ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করে এবং সাধনযন্ত্র হিসাবে পুরাতনের স্থানে নূতন মন, নূতন প্রাণ এবং নূতন দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এরূপ ক্ষেত্রে বহিশ্চর স্মৃতির লোপ পাওয়া আরও সুনিশ্চিত এবং অপরিহার্য্য বিধান হওয়ারই ত কথা ; নূতন জন্মে নবগঠিত মস্তিষ্কে গত জীবনের মস্তিষ্কের চিন্তার ছাপ বজায় থাকিবে অথবা নবজন্মে নূতন মন বা প্রাণ, পূর্ব্বজন্মের যে পুরাতন মন ও প্রাণ মুছিয়া গিয়াছে বা যাহাদের অস্তিত্ব নাই তাহাদের বাতিল সংস্কারসকল ধরিয়া আনিয়া হাজির করিবে ইহা আশা করা যাইতে পারে না। অবশ্য অধিচেতন সত্তাতে স্মৃতি থাকা সম্ভব কেননা তাহা বহিশ্চব ব্যক্তিসত্তার মত অসামর্থ্য-প্রপীড়িত নয় ; কিন্তু অধিচেতনায় গত জীবনের কোন সুস্পষ্ট স্মৃতি বা ছবি বর্ত্তমান থাকিলেও বহিশ্চর মনের সঙ্গে তাহার প্রকাশ্য কোন যোগসূত্র নাই বলিয়া তাহাতে সে স্মৃতির উদয় হওয়া স্বাভাবিক নহে। বহিশ্চেতনার সহিত অধিচেতনার এই বাহ্য নিঃসম্পর্কতা প্রকৃতির কার্য্যধারার পক্ষে প্রয়োজন, কেননা তাহাকে এমন এক ব্যক্তিসত্তা গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহা ভিতরে কি আছে তাহার সম্বন্ধে সচেতন নয় ; ইহা অবশ্য সত্য যে বহিশ্চর সত্তায় অন্য সকল বৃত্তির মত আমাদের বহিশ্চর ব্যক্তিসত্তাও অন্তরের ক্রিয়াধারা হইতেই গড়িয়া উঠে, কিন্তু তৎসত্বেও সে ক্রিয়াধারা সম্বন্ধে বহিঃসত্তা সচেতন নয়, সে মনে করে সে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে অথবা এইভাবে প্রস্তুত করিয়া তাহাকে এখানে পাঠান হইয়াছে অথবা বিশ্বপ্রকৃতির কোন অজ্ঞেয় বা দুর্বোধ্য ক্রিয়াধারা হইতে সে জাত হইয়াছে। এই সমস্ত দুরতিক্রম্য বাধা সত্ত্বেও পূর্ব্বজন্মের আংশিক স্মৃতি কখন কখন থাকিতে দেখা যায় ; এমন কি দুএকটি আশ্চর্য্যজনক কাহিনী শুনা যায় যেখানে শিশুমনে সঠিক ও পূর্ণ স্মৃতি বজায় আছে। অবশেষে সত্তার উন্নতির এক বিশেষ স্তরে পৌঁছিলে অন্তঃশ্চেতনা বহিশ্চেতনাকে অভিভূত করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন যেন অন্তরের কোন গভীর গহন হইতে গত জন্মের স্মৃতি কখন কখন বাহিরে আসিয়া প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে, কিন্তু অতীত জন্মের ব্যক্তিসত্তাসমূহের যে সমস্ত

উপাদান ও শক্তি তাহার বর্ত্তমান জীবনগঠনে কার্য্যকরী হইয়াছে এ স্মৃতি তাহাদের সূক্ষ্ম অনুভবরূপেই অধিকতর সহজে দেখা দিবে, তাহার মধ্যে অতীত জন্মের ঘটনা ও পরিবেশের খুঁটিনাটির খাঁটি পরিচয় সাধারণতঃ থাকিবে না ; যদিও এইরূপ উচ্চস্তরে স্থিত হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মৃতিও আংশিকভাবে কখন কখন জাগিতে পারে অথবা তখন ধ্যানস্থ বা ঐকান্তিকভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া অধিচেতন দৃষ্টি দ্বারা আমাদের সদা সচেতন অন্তর-সত্তার গোপন ভাণ্ডার হইতে তেমন স্মৃতিকে উদ্ধার করিয়া আনা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়াধারায় স্মৃতির এই সমস্ত খুঁটিনাটি জাগাইবার তেমন কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া প্রকৃতি তাহার কোন বিশেষ ব্যবস্থা রাখে নাই ; জীবের ভবিষ্য পরিণাম লইয়াই প্রকৃতি ব্যস্ত ; সেই জন্য সে অতীতকে আবরণের পশ্চাতে রাখিয়া দেয় এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের উপাদানের অদৃশ্য গোপন ভাণ্ডাররূপেই তাহা ব্যবহার করে।

ব্যষ্টিপুরুষ ও ব্যক্তিসত্তার এই ধারণা স্বীকার করিলে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে ; কেননা আমরা সাধারণতঃ যখন আত্মার অমরত্ব দাবি করি, তখন আমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় চিরকাল বর্ত্তমান ছিল এবং ভবিষ্যতেও তেমনি পরিবর্ত্তনশূন্য অবস্থায় অনন্তকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে ইহাই আমরা ভাবি। যাহাকে প্রকৃতি একটা ক্ষণস্থায়ী রূপায়ণ মাত্র মনে করে এবং যাহাকে চিরকাল রক্ষা করা সে উপযুক্ত মনে করে না সেই অতি অপূর্ণ বহিশ্চর 'আমি'কে বাঁচাইয়া রাখিবার এবং তাহাকে অমরত্বের আসনে বসাইবার এক বৃহৎ অধিকার আমরা প্রবলভাবে দাবি করি। কিন্তু এ সৃষ্টিছাড়া দাবি কখনও মঞ্জুর হইতে পারে না ; ক্ষণস্থায়ী এই অহং কেবল তখনই বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে যখন সে পরিবর্ত্তন লাভ করিয়া, সে যাহা হইয়াছে তদপেক্ষা বৃহত্তর ও মহত্তর অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হইতে সম্মত হয়, যখন সে জ্ঞানের দিব্য জ্যোতিতে ক্রমশঃ উদ্দীপিত হইয়া এবং অন্তরের শাশ্বত শ্রী ও সুষমায় ক্রমশঃ অধিকতর রূপে আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিতে থাকে এবং যখন অন্তবস্থিত দিব্য চিৎপুরুষের দিকে সে প্রবর্দ্ধমান বেগে অগ্রসর হইতে থাকে। সেই গোপন চিৎপুরুষ বা দিব্য আত্মাই কেবল অবিনশ্বর, কেননা তিনি অজ ও শাশ্বত। অন্তঃস্থ চৈত্যপুরুষই আমাদের মধ্যস্থ চিন্ময় ব্যক্তিপুরুষের প্রতিনিধি ; এই চৈত্যপুরুষই আমাদের অন্তরাত্মা বা খাঁটি আমি ; কিন্তু ক্ষণস্থায়ী শুধু বর্ত্তমান-

জীবনব্যাপী অহং এই অন্তরপুরুষের এক সাময়িক ব্যক্তিরূপ মাত্র; তাহাকে আমাদের পরিণামধারার পর পর অবস্থিত বহু সোপানের একটি সোপান বলিতে পারি; তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় যখন আমরা তাহাকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতর চেতনা ও সত্তার নিকটবর্ত্তী কোন সোপানে পৌঁছিয়া যাই। বস্তুতঃ অন্তঃপুরুষই মৃত্যুর পর বাঁচিয়া থাকে যেমন সে জন্মের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল; কেননা জন্মজন্মান্তরের মধ্যে অন্তরপুরুষের এই নিত্য বাঁচিয়া থাকা, কালের ক্ষেত্রে আমাদের কালাতীত পরমাত্মার নিত্যতারই একটা অনুবাদ।

চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক আকূতি আছে বলিয়া সে চায় তাহার মন, তাহার প্রাণ এমন কি তাহার দেহ চিরকাল বাঁচিয়া থাকুক; অন্তিম বিচারের দিবসে সমাধি হইতে মানবদেহের পুনরুত্থান হইবে বলিয়া যে মতবাদ আছে তাহার মধ্যে আমরা এই শেষ দাবির সাক্ষাৎ পাই, এই দাবির জন্য দেহের মৃত্যুকে জয় করিবার উদ্দেশ্যে অমরত্ববিধায়ক ঔষধ, ইন্দ্রজাল অথবা কিমিয়া বিদ্যা বা জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে অন্য কোন উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য মানুষ যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া তীব্র সাধনা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার এ অভীপ্সা কেবল তখনই সফল হইতে পারে যখন তাহার মন প্রাণ বা দেহ তাহার অন্তরবাসী চিৎপুরুষের অমরত্ব ও ভগবত্তার কিছুটা নিজের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হয়। অবশ্য এমন বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশ আসিতে পারে যখন অন্তরস্থ মনোময় পুরুষের প্রতিভূরূপে বহিশ্চর মনোময় ব্যক্তিসত্তাও মৃত্যুর পর বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যদি আমাদের মনোময় সত্তা বহিঃক্ষেত্রে নিজের ব্যষ্টিসত্তাকে এমন প্রবলভাবে গঠিত করিয়া তুলিতে পারে যাহাতে সে অন্তর্মন এবং অন্তরস্থ মনোময় পুরুষের সহিত এক হইয়া যায়, এবং সেই সঙ্গে যদি সে অন্তরপুরুষের অন্তহীন প্রগতির পথে সাবলীল ভাবে সাড়া দিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে অন্তরাত্মার পক্ষে নিজের উন্নতির পথে মনের পুরাতন রূপকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন রূপ গঠনের আর প্রয়োজন থাকে না। ঠিক তেমনি ভাবে নিজের ব্যষ্টিসত্তাকে পূর্ণভাবে গঠিত করিয়া তাহার সকল শক্তিকে সমাহরণ করিয়া যে অন্তরস্থ প্রাণময় পুরুষের সে প্রতিনিধি, তাহার দিকে নিজেকে যদি সে পূর্ণরূপে খুলিয়া ধরিতে পারে কেবল তাহা হইলে বহিশ্চর প্রাণময় ব্যক্তিসত্তা তদ্রূপভাবে মৃত্যুজয়ী হইবার আশা করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বাস্তবিক এই ঘটে যে অন্তর পুরুষ এবং বহিশ্চর মানুষের মধ্যে বর্ত্তমানে যে প্রাচীর আছে তাহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং অমর চৈত্য-

পুরুষের মন ও প্রাণময় প্রতিভূস্বরূপ নিত্য বর্ত্তমান মনোময় পুরুষ ও প্রাণময় পুরুষই জীবনের নিয়ামক ও শাস্তা হইয়া উঠে। তখন আমাদের প্রাণপ্রকৃতি এবং মনঃপ্রকৃতি অন্তরাত্মার ক্রমবর্দ্ধমান ও অবিচ্ছিন্ন আত্মপ্রকাশ হইয়া দাঁড়ায়; তাহাদের মূলভাব বজায় রাখিবার প্রয়াসে পুনঃ পুনঃ রূপ গ্রহণের প্রয়োজন তখন থাকে না। তখন আমাদের মনোময় ব্যক্তিসত্তা এবং প্রাণময় ব্যক্তিসত্তা ভাঙ্গিয়া না গিয়া জন্ম জন্মান্তরের মধ্যে নিজ নিজ সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। তাহারা এইরূপে স্থায়ীভাবে বাঁচিয়া থাকিবে, এই অর্থে অমর হইবে এবং এই ভাবে একরূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিবে। স্পষ্টতঃ ইহা হইবে নিশ্চেতনা ও জড় প্রকৃতির সকল সীমা ও বাধার উপর অন্তরাত্মা এবং মন প্রাণের এক মহৎ বিজয় লাভ।

কিন্তু শুধু সূক্ষ্ম দেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া এরূপ ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে; জীবকে তখনও স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন এবং এ জগতে ফিরিয়া আসিবার পথে নূতন দেহ গ্রহণ করিতে হয়। সাধারণতঃ মৃত্যুর পর জীবকে মনোময় কোষ এবং প্রাণময় কোষকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হয় কিন্তু যখন জাগ্রত মনোময় পুরুষ ও প্রাণময় পুরুষ পূর্ব্বজন্মের সূক্ষ্ম দেহের মনোকোষ ও প্রাণকোষ লইয়াই নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিবে তখন অতীতে যাহা গঠিত হইয়াছে কিন্তু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে যাহা স্থায়ী হইয়াছে বা হইবে সেই প্রাণময় ও মনোময় সত্তার অস্তিত্বের একটা সুস্পষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয় তাহাতে বর্ত্তমান থাকিবে; কিন্তু প্রাণ ও মনের এই উচ্চতর পরিণতি সত্ত্বেও যে স্থূল দেহ তাহার অন্নময় জীবনের আশ্রয় মৃত্যুর পর তাহাকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। অন্নময় সত্তা কেবল তখনই মৃত্যুজয়ী হইতে পারে যখন কোন উপায়ে দেহের ক্ষয় ও বিচূর্ণ হইয়া যাইবার কারণসকলকে দূর* করিতে মানুষ সমর্থ হইবে এবং সেই সঙ্গে দেহের গঠন ও ক্রিয়াধারাতে যখন

* যদি বিজ্ঞানের শক্তিবলে—জড় বিজ্ঞান বা গুপ্ত বিদ্যা যাহারই সাহায্যে হউক—স্থূল দেহকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়োজনীয় উপায় বা অবস্থা সকল আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু সে দেহ যদি অন্তরাত্মার অন্তর পরিণতির জন্য তাহার আত্মপ্রকাশের যোগ্য বাহন বা সাধন যন্ত্র হইয়া উঠিতে না পারে তাহা হইলে অন্তরাত্মাকে যে কোন উপায়ে তাহাকে ত্যাগ করিয়া নূতন জন্ম নিতেই হইবে। মৃত্যুর যে কারণ দেহের জড়ত্ব ও স্থূলতার সঙ্গে জড়িত তাহাই তাহার একমাত্র বা সত্য কারণ নয়; মৃত্যুর খাঁটি অন্তরতম কারণ জীবের অভিনব পরিণামের মধ্যে যে চিন্ময় পরিণাম আছে তাহারই মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

এমন সাবলীল প্রগতিশীলতা সঞ্চার করা যাইবে যাহাতে অন্তর পুরুষের প্রগতির জন্য তাহার নিকট যে কোন রূপান্তরের দাবি করা হউক না কেন তাহাতে সফলভাবে সে-দেহ সাড়া দিতে পারিবে; অন্তরাত্মা তাহার আত্মপ্রকাশক যে ব্যক্তিসত্তাকে রূপায়িত করিতে চায়, তাহার গোপন দিব্য চিন্ময় যে সত্তার উন্মেষ সাধনের জন্য তাহার দীর্ঘপ্রয়াস চলিতেছে, তাহার মনোময় সত্তাকে ধীরে ধীরে যে দিব্য মনোময় ও চিন্ময় সত্তায় রূপান্তর করা তাহার কাম্য তাহার সহিত পূর্ণরূপে তাল রক্ষা করিয়া চলিতে শিখিলেই মৃত্যুজয়ী হইবার আকূতি তাহার সফল হইতে পারে। চিৎস্বরূপ আত্মপুরুষের নিত্যসিদ্ধ অমরত্ব, চৈত্যপুরুষের মৃত্যুজয়ী অমরত্ব এবং এই দুইএর অনুপূরকরূপে প্রকৃতির অমরত্ব-লাভ—এই ত্রিপর্ব্বা অমরত্বের মহাসিদ্ধি মানুষের জন্মান্তর প্রবাহের পরম পরিণাম ও রাজমুকুট; এই অমৃতত্বের উন্মেষই জড়ের রাজত্বের ভিত্তিভূমিতেও জড়ের নিশ্চেতনা এবং অবিদ্যাকে পূর্ণরূপে পরাজিত করিবার নিশ্চিত সূচনা। কিন্তু তবুও চিৎপুরুষের নিত্যতাই খাঁটি অমৃতত্ব; জড়বিগ্রহের চিরঞ্জীবতা হইবে আপেক্ষিক, ইচ্ছানুসারে তাহার অবসান ঘটান যাইতে পারে; এ চিরঞ্জীবতা এই জগতে মৃত্যু ও জড়ের উপর চিৎপুরুষের বিজয়ের একটা কালাবচ্ছিন্ন নিদর্শন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মানুষ ও পরিণামধারা

এক পরম দেবতা সর্ব্বভূতের অন্তরে গোপনে অবস্থিত আছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, তিনি সকল কর্ম্মের অধ্যক্ষ, সাক্ষী, সচেতন জ্ঞাতা এবং চবমতত্ত্ব। ...তিনি এক, যাহারা প্রকৃতিতে নিষ্ক্রিয় এরূপ বহু তাহার বশে আছে, তিনি তাহাদের ঈশ্বর, একটি বীজকে তিনি বহুধা রূপায়িত কবেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬।১১, ১২

এই দেবতা বস্তুর এক একটি জালকে বহুরূপে রূপান্তরিত করিয়া এই ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করেন।.........এই এক সকল যোনিতে এবং সকল স্বভাবে অধ্যক্ষরূপে অধিষ্ঠিত আছেন; তিনি বিশ্বযোনি তিনি সত্তাব প্রকৃতিকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া তোলেন, যাহারা পরিপক্ক হইবার যোগ্য তাহাদিগকে সুপরিণত করিয়া তোলেন, তিনিই সকল গুণকে তাহাদের কার্য্যে বিনিয়োগ করেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৫।৩, ৫

একরূপকে তিনি বহুধা রূপায়িত করেন।

কঠোপনিষদ ৫। ১২

তাহার নিজ প্রকৃতির ক্রিয়াধারা সকলেব দ্বারা বৎসই মাতৃগণের জন্ম দিয়াছে —এই গোপন রহস্য কে জানিয়াছে? বহু অপ্-এর ক্রোড় হইতে বাহির হইয়াছে যে শিশু, সে আপনার প্রকৃতির সমগ্র বিধানকে অধিকার কবিয়া কবি বা দ্রষ্টা হইয়া বিচরণ করিতেছে। প্রকাশ বা আবির্ভূত হইয়া সে কুটিলাগণের কোলে বর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে এবং উপরের দিকে, সুন্দরের দিকে, আপন মহিমার দিকে সে অগ্রসর হইতেছে।

ঋগ্বেদ ১। ৯৫।৪, ৫

আমাকে অসৎ হইতে সতে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া চল।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১। ৩। ২৮

জড়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত চেতনা এক চিন্ময় পরিণামধারাবশে আত্মরূপায়ণের বিচিত্র পরম্পরার মধ্য দিয়া সর্ব্বদা পুষ্ট হইতে হইতে অবশেষে এমন অবস্থায় পৌঁছিবে যখন বাহ্যরূপ অন্তরবাসী চিৎপুরুষকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবে, ইহাই পার্থিব জীবনের মূল সুর ও মর্ম্মকথা, এবং খাঁটি উদ্দেশ্য ও সার্থকতা। চিৎপুরুষ বা দিব্যসত্যবস্তু জড়ের নিবিড় নিশ্চেতনার মধ্যে সংবৃত হইয়া আছেন বলিয়া গোড়ার দিকে মানবজীবনের এই অর্থ ও উদ্দেশ্য গোপন রহিয়া যায়, যে বিশ্বগত চিৎশক্তি ইহার ভিতরে থাকিয়া ক্রিয়া করিতেছে তাহা তখন নিশ্চেতনার, জড়ের বোধহীনতা এবং অসাড়তার আবরণে আবৃত থাকে, তাহাব ফলে সৃষ্টিবীর্য্য জড়বিশ্বে প্রথমে যে শক্তিরূপ গ্রহণ করে তাহা নিশ্চেতন মনে হয় অথচ দেখা যায় যে তাহা হইতে এক বিশাল বুদ্ধির ক্রিয়া গোপনভাবে চলিতেছে। অজানা চিররহস্যময়ী এই সৃষ্টিশক্তি তাহার গভীর অন্ধকারময় কারাগৃহ হইতে অবশেষে গোপন চেতনাকে মুক্তি দেয় বটে,—কিন্তু সে মুক্তি হয় মনপ্রাণের শক্তি এবং উপাদানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিস্পন্দনের মধ্য দিয়া অল্পে অল্পে অতি মন্থর গতিতে, অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধারায় চেতনার অতিপরমাণু প্রমাণ বিন্দু বিন্দু ক্ষরণে ; মনে হয় নিবিড় বাধার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া রূপান্তর গ্রহণে অনিচ্ছুক নিশ্চেতন জড়ীয় উপাদানের মাধ্যমে প্রকৃতি আর বেশী কিছু যেন করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যাহা একেবারে অচেতন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে সেই জড়রূপের মধ্যেই তাহার প্রথম বাস, তাহার পর সজীব জড়রূপের মধ্যে মানস অভিব্যক্তির কৃচ্ছ্রসাধনা চলিতে থাকে এবং চেতন পশুদেহে আসিয়া তাহার অপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। প্রথমে এই চেতনা অঙ্কুররূপে দেখা দেয়, যাহা প্রকাশ পায় তাহার অধিকাংশই অর্দ্ধঅবচেতন অথবা সহজাত সংস্কাররূপে কেবল চেতনার ধর্ম্ম লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; এই চেতনা অতি ধীরে ধীরে পুষ্ট হইতে থাকে, তাহার পর অধিকতর সুগঠিত সজীব জড়ের মধ্যে আসিয়া বুদ্ধিরূপে চেতনার এক শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে এবং শেষে চিন্তাশীল পশু বা মানুষের মধ্যে আসিয়া দেখা দেয় তাহার চরম চমৎকার ; কিন্তু মানুষ বিচারশীল মনোময় সত্তারূপে গড়িয়া উঠিলেও এমন কি মানবচেতনার সর্ব্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিলেও তাহার মধ্যে আদিম পশুত্বের ছাপ, দৈহিক অবচেতনার গুরুভার, আদি নিশ্চেতনা এবং তামসিকতার নিম্নাভিমুখী প্রবল আকর্ষণ সে বহন করিয়া লইয়া চলে ; তখনও তাহার সচেতন পরিণামের উপর অচেতন জড় প্রকৃতির শাসন তাহার চেতনাকে সীমিত করে, তাহার পুষ্টি

ও অভ্যুদয়কে কৃচ্ছ্রসাধ্য করিয়া তোলে, তাহার প্রগতিকে বিলম্বিত এবং ব্যাহত করিয়া দেয়। এই আদিম নিশ্চেতনা হইতে যে চেতনা উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে তাহার উপর সেই নিশ্চেতনার এই প্রশাসনের ফলে দেখা যায় যে মননশীলতা অতি কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতেছে কিন্তু তখনও মনে হয় যেন অবিদ্যাই তাহার স্বরূপ প্রকৃতি। এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত ভারগ্রস্ত মনোময় মানুষকে তাহার নিজের মধ্যে হইতে পূর্ণ-চেতন সত্তা, দিব্য মানবতা অথবা চিন্ময় অতিমানস প্রকৃতিবিশিষ্ট অতিমানবতাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, তাহাই হইবে তাহার চিৎপরিণামের পরবর্ত্তী ফল। মানবতা হইতে অতিমানবতার এই রূপান্তরের পথে অবিদ্যার মধ্যস্থিত পরিণামধারা জ্ঞানের মধ্যে বৃহত্তর পরিণামধারারূপে দেখা দিবে, তখন তাহা অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনার মধ্যে আর বাস করিবে না, তাহা হইবে অতিচেতনার আলোকে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা দ্বারা উদ্ভাসিত পথে গতিশীল।

যে পার্থিব ক্রমপরিণতি প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়া করিয়া জড় হইতে মন এবং তাহার পরবর্ত্তী অবস্থা ফুটাইয়া তুলিতেছে তাহার দুইটি ধারা আছে, একটি ধারা বহিঃক্ষেত্রে জড়পরিণামরূপে ব্যক্তভাবে ক্রিয়া করিতেছে, জীবের জন্ম বা শরীরধারণ তাহার সাধনযন্ত্র; দেহের একএকটি রূপায়ণের মধ্যে তাহার নিজস্ব ক্রমোন্মিষিত এক চেতনার শক্তি স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে এবং বংশানুক্রমের নিয়মকে আশ্রয় করিয়া সে-শক্তির ধারাকে বজায় রাখা হইতেছে; তৎসঙ্গে অন্য একটি ধারায় অদৃশ্যভাবে অন্তরাত্মার এক ক্রমপরিণতি চলিতেছে, জন্মান্তরের মধ্য দিয়া রূপ এবং চেতনার উচ্চতর স্তরে পৌঁছা তাহার সাধনোপায়। কেবল প্রথম ধারাটি বর্ত্তমান থাকিলে বিশ্বপরিণামই হইত বিসৃষ্টির একমাত্র তাৎপর্য্য; কেননা তখন ব্যষ্টি জীব হইত সেই পরিণামের একটা দ্রুত বিনাশশীল সাধনযন্ত্র, বিশ্বগত বিরাট পুরুষের ক্রমবর্দ্ধমান প্রকাশের পক্ষে জাতি বা ব্যক্তি সমষ্টির অধিকতর দীর্ঘকালস্থায়ী রূপায়ণই হইত প্রকৃত সোপান; কিন্তু এই মর্ত্ত্যভূমিতে ব্যষ্টিসত্তার পরিণতি এবং স্থায়িত্ব বিধানের জন্য জন্মান্তর অপরিহার্য্যরূপেই প্রয়োজন। বিশ্বপরিণামের প্রতি স্তরকে যাহা চিৎপুরুষের বাসস্থান হইতে পারে তেমন প্রতি জাতিরূপকে (type of form) আশ্রয় করিয়া জন্মান্তরের সহায়তায় ব্যষ্টি অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষ আপনার অন্তর্গূঢ় চেতনাকে ক্রমশঃ অধিকতররূপে ফুটাইয়া তোলে; জন্মপরম্পরার মধ্যস্থ প্রতি জীবন তাহার মধ্যস্থ চেতনার বৃহত্তর প্রগতির ফলে,

জড়ের উপর চেতনার বিজয়লাভের এক একটি সোপানে পরিণত হয়; এই প্রগতির ফলে অবশেষে একদিন জড়ই চেতনার পূর্ণ অভিব্যক্তির উপায় হইয়া দাঁড়াইবে।

কিন্তু মর্ত্ত্যবিসৃষ্টির এই ধারা এবং তাৎপর্য্যের বিবৃতিতে প্রতিপদে মানুষের নিজেরই সংশয় জাগিতে পারে, কেননা পরিণামের ধারা এখনও অভিযানের অর্দ্ধপথে মাত্র পৌঁছিয়াছে, আজিও সে ধারা অবিদ্যার মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইতেছে, আজিও তাহা অর্দ্ধোন্মিষিত মানবচিত্তের মধ্যেই নিজের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছে। পরিণামবাদের বিরুদ্ধে এই বলিয়া আপত্তি তোলা যায় যে ইহা এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং মর্ত্ত্য-জীবনের ক্রিয়াধাবার ব্যাখ্যারূপে ইহাকে উপস্থিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পরিণামবাদকে স্বীকার করিলেও কোন উচ্চতর পরিণামশীল সত্তায় পরিণত হওয়া মানুষের সাধ্যায়ত্ত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আসিতে পারে। পরিণতিধারা আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তথা হইতে আর তাহা অগ্রসর হইবে কিনা, পার্থিব প্রকৃতির স্বরূপগত অবিদ্যার ক্ষেত্রে অতিমানস পরিণাম আদৌ চলিবে কিনা একদিন সিদ্ধ ঋতচিৎ বা পূর্ণজ্ঞানময় সত্তার প্রকাশ হইতে পারে কিনা, এ সন্দেহও থাকিতে পারে। এই জগতে বিসৃষ্টির মধ্যে চিৎ-পুরুষের ক্রিয়াধারার ব্যাখ্যার জন্য অন্য এমন এক মতবাদ উপস্থিত করা যাইতে পারে যাহাতে বিসৃষ্টির যে কোন লক্ষ্য আছে অথবা কোনরূপ পরিণামধারা যে চলিতেছে তাহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই; আর অধিকদূর অগ্রসর হই-বার পূর্ব্বে যে চিন্তাধারা দ্বারা এরূপ মতবাদ স্থাপিত হয় তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

সৃষ্টি শাশ্বতকালের ক্ষেত্রে কালাতীত শাশ্বত বস্তুর আত্মপ্রকাশ; চেতনার সাতটি স্তর বা ভূমি আছে; জড়ের নিশ্চেতনা আমাদের চিৎসত্তার উত্তরায়ণের পথে ভিত্তিরূপে স্থাপিত হইয়াছে; জন্মান্তর সত্য এবং পার্থিব বিধানের একটা অংশ—এ সমস্ত স্বীকার করিলেও ব্যষ্টিসত্তার চিন্ময় পরিণাম ইহাদের কাহারও অথবা একত্রযোগে ইহাদের সকলের অপরিহার্য্য ফল ইহা বলা চলে না। পার্থিব জীবনের অন্তরের ক্রিয়া ও প্রবৃত্তির ধারা এবং তাহার আধ্যাত্মিক তাৎ-পর্য্য বুঝিবার জন্য অন্য মতবাদও উপস্থিত করা সম্ভব। যদি প্রতি সৃষ্ট বস্তু ব্যক্ত দিব্য সত্তারই এক এক রূপায়ণ হয় তাহা হইলে বাহ্যরূপে যাহাই মনে হউক না কেন বহিঃপ্রকৃতিতে তাহার আকৃতি বা স্বভাব যেরূপে ফুটুক

না কেন তাহার মধ্যে অন্তর্যামীর দিব্য অধিষ্ঠানবশতঃ প্রতি বস্তুই স্বরূপতঃ দিব্য চিন্ময়। প্রতি অভিব্যক্ত রূপ হইতেই দিব্য পুরুষ যখন তাহার আনন্দ রসাস্বাদন করেন তখন তাহার মধ্যে পরিবর্ত্তন পরিণাম বা প্রগতির কোন প্রয়োজন নাই। অনন্ত সত্তার স্বরূপের স্বভাবে পরম্পরার মধ্য দিয়া নিজের মধ্যের সম্ভাবনাসকলকে বাস্তবে ফুটাইয়া তুলিবার বা নিজের ঋতময় প্রকাশের যে প্রবৃত্তি আছে আপনা হইতেই তাহার সার্থকতা ঘটিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির অগণিত বৈচিত্র্যে, আমাদের চারিদিকে ছড়ানো সংখ্যাতীত রূপে, চেতনার অসংখ্য ধারায়। সৃষ্টির যে কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে তাহা সত্য নহে, লক্ষ্য থাকিতেই পারেনা কেননা অনন্তের মধ্যে সব কিছুই তো আছে, দিব্য পুরুষের কোন কিছু লাভ করিবার প্রয়োজন থাকিতে পারে না অথবা তাহার মধ্যে যাহা নাই এমন কিছুর অস্তিত্বও সম্ভব হইতে পারে না ; সৃষ্টি বা প্রকাশ করিতেই তাহার আনন্দ আছে, সেইজন্যই সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। অতএব কোন লক্ষ্যে পৌঁছিবার বা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অথবা চরম এক পূর্ণতায় পৌঁছিবার তাগিদে যে পরিণামধারা প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে সৃষ্টির সকল তত্ত্বই চিরন্তন এবং অপরিবর্ত্তনীয় ; প্রত্যেক জাতীয় প্রাণী যাহা তাহাই থাকে, আপন হইতে ভিন্ন কিছু হইতে চেষ্টা করে না, তাহাতে তাহার কোন প্রয়োজনও নাই ; এক এক জাতীয় প্রাণী জগৎ হইতে তিরোহিত হইয়া যায় এবং নূতন নূতন জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে একথা স্বীকার করিলেও তাহার কারণ এই যে যাহারা তিরোহিত হয় তাহাদের প্রাণে বিশ্বগত চিৎশক্তির যে আনন্দ ছিল তাহা তিনি প্রত্যাহার করিয়া নেন এবং আবার নিজের খুশির জন্যই অন্য নূতন জাতীয় প্রাণী সৃষ্টি করেন। কিন্তু প্রতি জাতীয় প্রাণী যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিন তাহাদের একটা সুস্পষ্ট স্বকীয় রূপাদর্শ রক্ষা করে এবং খুঁটিনাটিতে ইতর বিশেষ হইলেও নিজেদের মূল ধাঁচ বজায় থাকে ; প্রত্যেক জাতি তাহার আত্মচৈতন্যে বাঁধা থাকে এবং তাহা ত্যাগ করিয়া অপর চৈতন্যে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না ; আত্মপ্রকৃতির সীমাতে সে বদ্ধ কিন্তু সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্য প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। অনন্তের চিৎশক্তি যদি জড়ের পরে প্রাণ এবং প্রাণের পরে মনের অভিব্যক্তি করিয়া থাকে তবে তাহা হইতে ইহা প্রমাণ হয়না যে মনের পরবর্ত্তী সৃষ্টিরূপে সে অতিমানসের অভিব্যক্তি

ঘটাইতে অগ্রসর হইবে। কারণ মন এবং অতিমানস সম্পূর্ণ বিভিন্ন গোলার্দ্ধের বস্তু, মনের স্থান নিম্নতর গোলার্দ্ধে অবিদ্যার ক্ষেত্রে; অতিমানসের আবাস উচ্চতর গোলার্দ্ধে দিব্যজ্ঞানের রাজ্যে। এ জগৎ অবিদ্যার জগৎ, ইহা অবিদ্যার জগৎই থাকিবে ইহাই বিধির ইচ্ছা বা বিধান; পরার্দ্ধ হইতে শক্তি-সকলকে নিম্নতর গোলার্দ্ধে নামাইয়া আনিয়া তাহাদের গোপন বীর্য্য এখানে প্রকট করিবার কোন অভিপ্রায় বিশ্ববিধাতার নাই, সে সমস্ত শক্তি এখানে আদৌ যদি থাকে তবে তাহা অন্তর্গূঢ়ভাবেই আছে—নিম্নের শক্তির নিকট তাহাদের আত্মপ্রকাশ নাই, সে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য সৃষ্টি রক্ষা করা—সৃষ্টিকে পূর্ণতা দেওয়া নহে। মানুষ এই অবিদ্যাচ্ছন্ন সৃষ্টির উচ্চতম স্তরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার চেতনা এবং জ্ঞান তাহার সাধ্যের শেষ সীমানা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে; যদি আরও অগ্রসর হইতে চায় তবে সে তাহারই মননের বৃহত্তর চক্রের মধ্যে শুধু আবর্ত্তিত হইবে। মনের এই চক্রগতিই তাহার শেষ সীমা, এই চক্রগতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেখান হইতে সে যাত্রারম্ভ করিয়াছে পুনঃ পুনঃ সেখানেই তাহার ফিরিয়া আসিতে হইবে, নিজের এই কুণ্ডলীর বাহিরে যাইবার অধিকার মনের নাই; ঋজুগতিতে অনন্তের দিকে উর্দ্ধায়ণের অভিযান অথবা পার্শ্বের দিকে বিস্তার লাভ করিয়া অনন্তে পৌঁছান জাগতিক মানুষের পক্ষে দুরাশা মাত্র। মানবাত্মাকে যদি মানবতা অতিক্রম করিয়া অতিমানস বা আরও উচ্চতর ভূমিতে পৌঁছিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে এ জাগতিক জীবন ছাড়িয়া হয় আনন্দ এবং জ্ঞানের কোন নিত্যভূমি বা জগতে যাইতে, না হয় জগতের অতীত অব্যক্ত অনন্ত শাশ্বত সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে।

একথা সত্য যে আধুনিক বিজ্ঞান পার্থিব পরিণামবাদের সমর্থক, কিন্তু যে সমস্ত তথ্য লইয়া সে কারবার করে তাহা নির্ভরযোগ্য হইলেও, যে সমস্ত সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা সে সাহস করিয়া বলে তাহা প্রায়ই অচিরস্থায়ী হয়; বিজ্ঞান এক একটা সিদ্ধান্ত দশবিশ বৎসর বা কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত ধরিয়া থাকে; তাহার পর তাহাকে ত্যাগ করিয়া একটা নূতন সাধারণ সিদ্ধান্ত বা মতবাদ গ্রহণ করিতে তাহার দ্বিধা নাই। জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তথ্যগুলি পূর্ণভাবে জানা সম্ভব, পরীক্ষা এবং সমীক্ষা দ্বারা তাহাদের সত্যনির্ণয় করা চলে, কিন্তু সেই বিজ্ঞানের কোন সাধারণ সিদ্ধান্ত অচলপ্রতিষ্ঠ নহে; পরিণামবাদের [illegible]ারে মনোবিজ্ঞানেরও স্থান আছে, কেননা পরিণামবাদের মধ্যে চেতনার ক্রমাভি-ব্যক্তির কথা আছে, কিন্তু এই মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসকলের আয়ুষ্কাল

সাধারণতঃ আরও কম, সেখানে একটি সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়; বস্তুতঃ সেখানে একই কালে বহু পরস্পরবিরোধী মতবাদ দেখা দেয়। এই সমস্ত চোরাবালির উপর তত্ত্ববিদ্যার কোন দৃঢ় প্রাসাদ গড়িয়া তোলা যায় না। বিজ্ঞান বংশানুক্রমকে ভিত্তি করিয়া প্রাণ-পরিণামের ধারণা বা সিদ্ধান্তকে খাড়া করিতে চায়, বংশানুক্রম যে একটা প্রবল শক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা কোন জাতি বা উপজাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবারই সাধন বা যন্ত্র; বংশানুক্রমের মধ্যে পুনঃ পুনঃ এবং ক্রমবর্দ্ধমানভাবে বৈচিত্র্যও যে দেখা দেয় ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রচুর সন্দেহের অবকাশ আছে; বংশানুক্রম বরং পরিণাম অপেক্ষা রক্ষণশীলতারই বেশী অনুকূল, প্রাণশক্তি যে নূতন ধর্ম্ম বা স্বভাব তাহার উপর চাপাইতে চায় সে তাহা সহজে অঙ্গীকার করিয়া নিতে চায় না। সকল তথ্য হইতে শুধু এইটুকু প্রমাণ হয় যে একটা জাতির স্বকীয় বিশিষ্ট স্বভাবের মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য দেখা দিতে পারে, কিন্তু নিজের বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করিয়া কোন ধর্ম্ম যে তাহাতে ফুটিতে পারে এরূপ কোন প্রমাণ নাই। বানরজাতিই মানবজাতিতে পরিণত হইযাছে বস্তুতঃ এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বরং মনে হয় যে মানুষের পূর্ব্বপুরুষগণ বানর-সদৃশ হইলেও বানর জাতীয় নয়; তাহাদের নিজেদের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা বানরের বৈশিষ্ট্য হইতে পৃথক, সেই বৈশিষ্ট্য তাহাদের নিজ প্রকৃতির প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া বর্ত্তমান মানুষে পরিণত হইয়াছে। এমন কি মানুষের বেলায় নিম্নতর জাতির মানুষ নিজেদের উন্নতিসাধন দ্বারা উচ্চতর জাতীয় মানুষে পরিণত হইয়াছে তাহাও প্রমাণিত হয নাই; যে সমস্ত জাতির সামর্থ্য এবং সংগঠন নিকৃষ্ট ছিল তাহারা লোপ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারাই যে বর্ত্তমান কালের মানুষকে তাহাদের বংশধররূপে রাখিয়া গিয়াছে এ সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় নাই; কিন্তু তথাপি একই জাতির মধ্যে এরূপ উন্নতি ও পরি-বর্ত্তন সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রকৃতির প্রগতি জড় হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে মনের দিকে চলিয়াছে ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু জড়ই প্রাণে অথবা প্রাণশক্তিই মনঃশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে ইহা আজিও প্রমাণিত হয় নাই; জড়ের মধ্যে প্রাণের এবং সজীব জড়ের মধ্যে মনের আবির্ভাব হইয়াছে এইটুকু পর্য্যন্ত আমরা মানিতে পারি। কোন উদ্ভিদ্-জাতি যে পশুতে অথবা নিষ্প্রাণ জড়ের দ্বারা গঠিত কোন বস্তুই যে জীবন্ত

উদ্ভিদ জাতিতে পরিণত হইয়াছে এ সিদ্ধান্তের কোন প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ভবিষ্যতে যদি এমন হয় যে কতকগুলি রাসায়নিক উপাদান বা নিমিত্ত বিশেষের সংযোজনা হইতে প্রাণের প্রকাশ হয় তবে বলিব যে এ উভয় ব্যাপার একসঙ্গে ঘটিয়াছে, বলিব যে বিশেষ জড়পরিবেশেই প্রাণ প্রকাশ হয় কিন্তু স্বীকাব করিব না যে এই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থই প্রাণের উপাদান অথবা বিশেষ বাসায়নিক সংস্থানই প্রাণরূপে দেখা দিয়াছে অথবা এই পরিবেশই নিষ্প্রাণ জড়কে জীবন্ত বস্তুতে পবিণত করিবার প্রকৃত কারণ। অপর স্থানের মত এখানেও প্রত্যেক স্তব নিজের জন্যই নিজের মধ্যেই অবস্থিত, প্রত্যেক স্তর নিজেব বিশিষ্ট ধর্ম্ম অনুসাবে নিজের উপযুক্ত শক্তি বলেই প্রকাশিত হয়, তাহার উপরের বা নীচেব কোন স্তরই সে স্তরের নিমিত্ত কি পরিণাম নয়, তাহারা পার্থিব প্রকৃতিব ক্রমবিন্যস্ত স্বরগ্রামের এক একটা স্বতন্ত্র পর্দ্দা।

যদি প্রশ্ন হয় এই সমস্ত বহুবিচিত্র স্তব এবং জাতি কিরূপে দেখা দিল তাহা হইলে উত্তরে বলা যাইতে পারে জড়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত চিৎশক্তি মূলতঃ ইহাদিগকে অভিব্যক্ত কবিযাছে, জড়জগতে অন্তর্যামী চিৎপুরুষের জন্য বা তাহার ইচ্ছানুসারে সম্ভূত বিজ্ঞান বা অতিমানস শক্তি এইভাবে নিজের সার্থক রূপ ও জাতিসকল সৃষ্টি কবিয়াছে ; স্থূল সৃষ্টিব্যাপারে কার্য্যক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তর বা বিভিন্ন জাতি গঠনে প্রকৃতির ব্যবহৃত ধাবার মধ্যে বহু বৈচিত্র্য থাকিতে পারে যদিও তাহাদের মধ্যে একটা মূলগত সাদৃশ্যও দেখা যাইতে পারে ; সৃষ্টিশালা শক্তি এক রীতি অনুসরণ না করিয়া বহু রীতি বা পদ্ধতিতে এবং বহু শক্তি একত্রে মিলাইয়া কার্য্য করিতে পারে। জড়ের বেলায় সে পদ্ধতি এই মনে হয় প্রকৃতি প্রত্যেককে এক বিরাট শক্তির আধার করিয়া অগণিত পরমাণু বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা সৃষ্টি করে, তাহাদের সংখ্যা এবং বিন্যাসের বৈচিত্র্য দিয়া তাহাদের সংযোজন সাধন করিয়া সেই মৌলিক ভিত্তিতে বৃহত্তর কণা বা অণু গড়িয়া তোলে আবার এই অণুগুলি বিভিন্নভাবে সাজাইয়া এবং যুক্ত করিয়া সেই একই মৌলিক রীতিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, মৃত্তিকা, জল, খনিজ পদাথ, ধাতু বা সমস্ত জড় জগতের আকার দান করে। প্রাণের ক্ষেত্রেও দেখি চিৎশক্তি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুবীক্ষণ দৃশ্য উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষ লইয়া কার্য্য আরম্ভ করে ; সে এক আদি প্রাণপঙ্ক (plasm) সৃষ্টি করে এবং তাহাকে বহুগুণিত করে, অবয়বের একক (unit) রূপে জীব কোষ এবং বীজ অথবা জীন (gene) রূপে অন্যপ্রকার অতিসক্ষ্ম প্রাণধারার বাহন গড়িয়া

তোলে এবং সংযোজন করিবার সাজাইবার এবং গুছাইবার একই রীতি অবলম্বন করিয়া নানা বিচিত্র ক্রিয়া ও কৌশলে সে বহুবিধ জীবদেহ গঠন করে। দেখা যায় সর্ব্বদা নানা জাতি রূপ (type) সৃষ্টি হইতেছে কিন্তু তাহা পরিণামবাদের নিঃসংশয় প্রমাণ নহে। এই সমস্ত জাতিরূপ কখনও পরস্পর হইতে বহুদূরে অবস্থিত, কখনও তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়, কখনও বা বোধ হয় তাহাদের ভিত্তি এক কিন্তু খুঁটিনাটিতে শুধু বৈষম্য আছে; প্রত্যেক জাতিরূপের বিশিষ্ট ধাঁচ বা প্রকৃতি আছে, একটা প্রাথমিক ভিত্তিতে এক হইয়াও বৈশিষ্ট্যের এত বৈচিত্র্য, এক চিৎশক্তি নিজেরই ভাব লইয়া খেলা করিয়া এই বহু প্রকার বিসৃষ্টি যে ফুটাইয়া তুলিতেছে তাহারই নিদর্শন। পশু জাতি যখন আসিয়াছে তখন প্রাথমিক ভ্রূণ দশায় বা মৌলিক ধাঁচে তাহাদের সকল জাতি রূপের সৃষ্টির ধরণে হয়তো একটা সাদৃশ্য আছে; কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের ক্রমিক পুষ্টির ধারা কোন কোন বা সর্ব্বদিক হইতে একই রূপে হয়ত চলিতে থাকে, দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতিব জাতিরূপের মধ্যবর্ত্তী রূপে এমন জাতিরূপও থাকিতে পারে যাহারা দ্বৈত প্রকৃতিবিশিষ্ট, উভয় শ্রেণীর গুণই কতকটা তাহাতে বর্ত্তমান আছে; কিন্তু এ সমস্তের কিছু দ্বারা প্রমাণ হয় না এক জাতিরূপ পরিণামধারার বশে অন্য জাতিরূপ হইতে জাত হইয়াছে, অথবা বিভিন্ন জাতিরূপ পরিণামধারার বিভিন্ন স্তর। নূতন কোন জাতিধর্ম্ম দেখা দেওয়ার মূলে কেবল বংশানুক্রমিক বৈচিত্র্যই যে রহিয়াছে তাহাও নহে; অন্য অনেক শক্তির ক্রিয়ার ফল তাহার মধ্যে আছে; যেমন অনেক জড়শক্তি আছে যথা খাদ্য আলোকরশ্মি এবং অন্য অনেক শক্তি যাহা আমরা কেবল জানিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং নিশ্চয়ই এমন অনেক শক্তি আছে যাহার খবর আমরা আজিও রাখিনা; তাহা ছাড়া অদৃশ্য প্রাণশক্তি এবং দুর্জ্ঞেয় মনঃশক্তি সকলের প্রভাব ও ক্রিয়া চলিতেছে। কেননা জড়বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদেও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের (natural selection) ব্যাখ্যা দিতে হইলেও এ সমস্ত সূক্ষ্মশক্তিকে স্বীকার করিতে হয়; যদি দেখা যায় যে পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন কোন জাতিরূপের মধ্যে গোপন বা অবচেতন শক্তির সাড়া জাগায় এবং তাহারা পরিবেশের উপযোগীভাবে গড়িয়া ওঠে, আবার অন্য কোন জাতিরূপের শক্তি সেই পরিবেশে সাড়া না দেয় এবং তাহারা জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে না পারে তবে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে শক্তিসকল প্রকৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য আনিবার জন্য ক্রিয়া করিতেছে তাহা শুধু জড়শক্তি নয়, তাহার মধ্যে

পরিবর্ত্তনশীল এক প্রাণ ও মনঃশক্তি এক চেতনা এবং অজড় এক শক্তিও রহিয়াছে। বস্তুতঃ প্রকৃতির ক্রিয়াধারা আমাদের কাছে এখনও এত অস্পষ্ট এবং অজ্ঞাত উপাদানে ভরা যে সমস্যা সমাধান করিয়া কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার সময় আজিও আসে নাই।

এইভাবে প্রকৃতি যে বহু জাতিরূপ (type) গড়িয়া তুলিয়াছে মানুষ তাহাদের অন্যতম, জড় জগতে প্রকাশিত বহু রূপাদর্শের (pattern) মধ্যে মানুষ একটি। যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে তাহাব মধ্যে মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল, চেতনার সম্পদে সে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, তাহার গঠনে প্রকৃতি অদ্ভুত শিল্পনৈপুন্য দেখাইয়াছে; পার্থিব সৃষ্টিব সে শিরোমণি কিন্তু তাহা বলিয়া পার্থিব ভাবকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই। অন্য সকলের মত তাহারও নিজস্ব বিধান, সীমার বন্ধন এবং বিশেষ ধরনের জীবন, তাহার স্বভাব ও স্বধর্ম্ম আছে; এই সমস্ত বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া সে প্রসারতা ও পুষ্টি লাভ করিতে পারে কিন্তু এ সীমার বাহিরে যাইবার অধিকার তাহার নাই। যদি কোন পূর্ণতায় তাহাকে পৌঁছিতে হয় তবে সে পূর্ণতা হইবে তাহার নিজস্ব ধরণের, তাহার সত্তার বিধান বা ধর্ম্মের মধ্যে স্থিত—আপনার এ পূর্ণতা নিজের ধর্ম্মের বিধান এবং পরিমাণ স্বীকার করিয়া লইয়া সেই ধর্ম্মেরই পর্ণ প্রকাশ, তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কিছু নহে। মানুষের নিজেকে অতিক্রম করা অতিমানব রূপে গড়িয়া ওঠা, দেবতার প্রকৃতি ও শক্তি লাভ করা তাহার স্বধর্ম্মের বিরোধী সুতরাং তাহাব পক্ষে অসাধ্য এবং অসম্ভব। প্রত্যেক সত্তার রূপ ও রীতিতে তাহার নিজ প্রকৃতির অনুরূপ আনন্দের খেলাই ফুটিতে পারে; তাই মনন শক্তির মধ্যে দিয়া যতটা সম্ভব তাহার পরিবেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবার তাহাকে ব্যবহাব ও ভোগ করিবার চেষ্টা করাই মনোময় পুরুষের যথার্থ পুরুষার্থ; তাহার ওপারে দৃষ্টিকে প্রসারিত করা, জীবনেব একটা চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছুটিয়া চলা এবং তজ্জন্য মনের সীমার লঙঘনের আকৃতিকে স্বীকার করা জীবনের মধ্যে বিশ্ববিধানের একটা উদ্দেশ্য আছে ইহাই স্বীকার করা; কিন্তু বিশ্বজগতেব কোথাও সেরূপ উদ্দেশ্যের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। অতিমানস সত্তাকে যদি বিশ্ববিসৃষ্টির মধ্যে আবির্ভূত হইতে হয় তবে তাহা হইবে স্বতন্ত্র এবং নূতন একটা সৃষ্টি; জড়ের মধ্যে যেরূপে প্রাণ ও মনের বিকাশ হইয়াছে অতিমানসকেও ঠিক তেমনভাবে বিকশিত হইতে হইবে; তাহার শক্তির এই নূতন স্তব বা ভূমির উপযোগী কোন নূতন রূপাদর্শ বা ধাঁচ গোপন

চিৎশক্তিকেই গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতির ক্রিয়াধারার মধ্যে তেমন কোন আয়োজনের বা উদ্দেশ্যের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

কিন্তু যদি আরও উচ্চতর ধরণের একটা বিসৃষ্টি প্রকৃতির অভিপ্রেত হয় তবে তাহা হইলে সেই নূতন জাতিরূপ বা রূপাদর্শ মানুষের মধ্য হইতে নিশ্চয়ই গড়িয়া উঠিতে পারে না কেননা সে ক্ষেত্রে মানবজাতির কোনও না কোন শাখার কাহারও না কাহারও প্রকৃতিতে অতিমানবতাব উপাদান কিছু নিহিত আছে দেখা যাইত, যেমন যে পশু সত্তা হইতে মানুষ গঠিত হইয়াছে সে পশুর মধ্যে মানব-প্রকৃতির মৌলিক উপাদান পূর্ব্ব হইতে নিহিত বা অব্যক্ত সম্ভাবনারূপে বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু অতিমানবতার উপাদান যাহার মধ্যে নিহিত আছে মানুষের মধ্যে তেমন কোন উপজাতি তেমন কোন জাতিরূপ বা তেমন কোন প্রকৃতি আমরা দেখিতে পাইতেছি না; বড়জোর আমরা কেবল অধ্যাত্ম চেতনায় সমৃদ্ধ এরূপ মনোময় মানুষ দেখিতেছি যাহাবা মর্ত্ত্যসৃষ্টিব বাহিরে পলায়ন করিতে চাহিতেছে। নিজের কোন গোপন বিধানের বশে মানুষের মধ্যে অতি-মানব সত্তাকে ফুটাইয়া তোলার কোনো অভিপ্রায় যদি থাকিয়াই থাকে তবে যাহারা মানব জাতি হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়াইতে পারে এরূপ কতিপয় ব্যক্তিবিশেষ দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে, কেবল তাহারা এই নূতন ধরণের সত্তার প্রথম ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। সমস্ত মানবজাতি এই পূর্ণতার দিকে গড়িয়া উঠিতে পারে এরূপ মনে কবিবার কোন কারণ নাই, মানুষের সাধারণ প্রকৃতিতে এ সম্ভাবনা দেখা দিবে ইহা কখনও হইতে পারে না।

যদি প্রকৃতির রাজ্যে পশু হইতে মানুষ বস্তুতই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তথাপি বর্ত্তমানে আমরা অন্য কোন পশুতে পরিণাম পথে তাহার নিজের জাতিরূপ অতিক্রম করিয়া যাইবার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না, তখন পশুজগতে পরিণামের দিকে পূর্ব্বে কোন দিন প্রকৃতির এইরূপ উদ্যম বা প্রয়াস যদি থাকিয়াও থাকে তবে মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে যেমন সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে তেমনি তাহা লোপ পাইয়াছে, ঠিক তেমনি পরিণামধারার কোন নূতন স্তরে পৌঁছিবার জন্য নিজেকে অতিক্রম কবিয়া যাইবাব কোন উদ্যম প্রকৃতির মধ্যে যদি থাকে তবে তাহাও অতিমানস সত্তার আবির্ভাবে তাহাব উদ্দেশ্য পূর্ণ হইলে লোপ পাইয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতির মধ্যে তেমন কোন উদ্যম বা প্রয়াস নাই; মানুষ যে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে খুব সম্ভব এ ধারণাও ভ্রান্ত, কেননা, পশুর অবস্থা হইতে অতিক্রম করিয়া যাইবার

পর মানুষ যে মৌলিকভাবে আর অগ্রসর হইয়াছে মানবজাতির ইতিহাসে তেমন নিদর্শনও পাওয়া যায় না ; বড়জোর জড়জগতের জ্ঞান তাহার কিছু বাড়িয়াছে, বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার নিছক ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক হইতে প্রকৃতির গোপন বিধানসকল কিছুটা জানিয়া তাহার বাহ্য পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি কতকটা লাভ করিয়াছে। কিন্তু অন্য দিকে সভ্যতার আদি যুগে মানুষ যাহা ছিল আজিও তাহাই রহিয়া গিয়াছে ; আজিও তাহার মধ্যে সেই একইরূপ সামর্থ্য একইরূপ দোষ বা গুণের প্রকাশ হইতেছে, আজিও পূর্ব্বের মত সে সাধনা করে, পূর্ব্বের মতই ভুল করে, পূর্ব্বের মতই লাভ করে, পূর্ব্বের মতই বিফলপ্রযত্ন হয়। যদি সে কিছু অগ্রসর হইয়া থাকে তবে যেখান হইতে যাত্রা সুরু করিয়াছিল বৃত্তাকারে প্রায় সেখানেই ঘুরিয়া আসিতেছে, বড় জোর সে-বৃত্তের পরিধি কিছু বাড়িয়াছে। আজিকার মানুষ অতীতের দ্রষ্টা ঋষি বা মনীষীগণের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী হইতে পারে নাই, তাহার অধ্যাত্ম সাধনায় সে অতীতের মহাসাধকগণের বা সেই আদি যুগের প্রবল শক্তিশালী রহস্যবিদ্ বা সিদ্ধ পুরুষগণেব অপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই, এ যুগের শিল্প ও কারুকলা প্রাচীন যুগ অপেক্ষা উন্নত হয় নাই ; যে সমস্ত প্রাচীন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যেও দেখা গিয়াছে প্রভূত পবিমাণে মৌলিক প্রতিভা আবিষ্কার ও সৃষ্টিকৌশলের নৈপুণ্য, জীবনের ক্ষেত্রে চলিবাব সামর্থ্য, এবং বর্ত্তমানে মানুষ যদি এ সমস্ত বিষয়ে কিছু অধিকদূর অগ্রসর হইয়া থাকে তাহাও কোন মৌলিক প্রগতি নহে তাহাতে কেবল পুরাতন বিষয়সমূহের মাত্রা, বিস্তার ও প্রাচুর্য্য কিছু বাড়িয়াছে, তাহারও কারণ বর্ত্তমানের মানুষ তাহার পূর্ব্বগামীদেব বহুজ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়া তথা হইতে যাত্রারম্ভ কবিতে সমর্থ হইযাছে। এমন কিছু কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না যাহাতে মনে করিতে পারি যে, যে মানুষ অৰ্দ্ধজ্ঞান অৰ্দ্ধ-অজ্ঞান দ্বারা চিহ্নিত তাহার বর্ত্তমান জাতিধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া যাইতে কখনও সমর্থ হইবে, অথবা যদি সে উচ্চতব জ্ঞান লাভও করে তবু যে তাহার মনোময় রাজ্যের শেষ বৃত্তরেখা পার হইয়া যাইবে তেমন ভরসা করিবার মত কিছু চোখে পড়ে না।

জন্মান্তব আধ্যাত্মিক পরিণামের প্রচ্ছন্ন উপায়, জন্মান্তরই আমাদের পরিণতি সম্ভব কবিযা তোলে ইহা স্বীকার কবিতে আমরা প্রলুব্ধ হই এবং এসিদ্ধান্ত আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত বোধ হয়ও বটে কিন্তু জন্মান্তর যদি সত্যই

থাকে তবে ইহাই যে তাহার তাৎপর্য্য এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই। প্রাচীন কাল হইতে জন্মান্তর সম্বন্ধে যে ধারণা চলিয়া আসিতেছে তাহাতে বলা হইয়াছে জীবাত্মা পশুজগৎ হইতে মানুষে সর্ব্বদা জন্ম নিতেছে তেমনি আবার মানুষ হইতে প্রায়শ পশু-যোনিতে ফিরিয়া যাইতেছে; ভারতীয় ভাবধারা ইহার সহিত আবার কর্ম্মবাদকে জুড়িয়া দিয়াছে, কর্ম্মদ্বারা জন্মান্তর গ্রহণ ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছে, জন্মান্তরের মধ্য দিয়াই আমরা পাপ বা পুণ্য-কর্ম্মের দণ্ড বা পুরস্কার পাইব অতীত জীবনের সঙ্কল্প এবং সাধনার ফললাভ করিব ইহা বলিয়াছে; কিন্তু পরিণামধারার বশে এক জাতিরূপ (type) হইতে অন্য উচ্চতর জাতিরূপে জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করে এরূপ উক্তি বা ইঙ্গিত বড় তাহাতে দেখা যায় না, যাহা পূর্ব্বে কখনও ছিল না ভবিষ্যতে যাহাতে উন্মিষিত হইয়া উঠিতে হইবে এমন কোন জাতিরূপে জন্মের কথার কোন আভাস কোথাও নাই। প্রকৃতির পরিণাম হয় ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তবে মানুষই তাহার চরম পর্ব্ব, কেননা মানুষ-জন্মের মধ্য দিয়াই জীবাত্মা পার্থিব বা দেহগত জীবন ত্যাগ করিয়া কোন স্বর্গে বা নির্ব্বাণে পলাইয়া যাইতে পারে। প্রাচীন সকল মতবাদে ইহাই মানুষের শেষ আদর্শ বলিয়া দেখা হইয়াছে এবং যেহেতু এই জগৎ মৌলিক এবং অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে অবিদ্যারই জগৎ—সকল বিশ্ব জগৎ যদি তাহার প্রকৃতিতে অবিদ্যার এক অবস্থা নাও হয়—এই ভাবে পলায়নই ভবচক্রের যথার্থ লক্ষ্য হওয়াই তো সম্ভব।

এই ধরণের যুক্তিধারায় গুরুত্ব বা প্রতীতিজনকতা যে যথেষ্ট আছে তাহা ঠিক, সেইজন্য গুরুত্বের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হইলেও, খণ্ডন করিবার জন্য এখানে তাহার বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কেননা যদিও ইহার কোন কোন সিদ্ধান্ত প্রামাণিক তথাপি তাহাদের এই দৃষ্টিকে পূর্ণ অথবা বিচার ও যুক্তিধারাকে অকাট্য বলিতে পারি না। এক পূর্ব্ব-নিরূপিত লক্ষ্য বা ধারার অনুসরণ করিয়া নিশ্চেতনা হইতে অতিচেতনার দিকে পরিণামধারা অগ্রসর হইতেছে, সত্তা বা প্রাণীর একটা ক্রমোন্নত ধারা ধরিয়া জীবাত্মার একটা পুষ্টি ও বৃদ্ধি চলিতেছে, যাহার ফলে অবিদ্যার জীবন রূপান্তরিত হইয়া বিদ্যার জীবনের অত্যুচ্চ শিখরে পৌঁছিবে প্রকৃতি-পরিণামের এমনিভাবের একটা লক্ষ্যাভিসারী প্রগতির কথা বলা হইয়াছে; ইহার মধ্যে যে লক্ষ্যের কথা আছে তাহার বিরুদ্ধে যাহা বলা হইয়াছে প্রথমে তাহা খণ্ডন করা খুব দুরূহ না হইতে পারে। কোন লক্ষ্য লইয়া বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দুই বিভিন্ন দিক হইতে

আপত্তি তোলা যাইতে পারে, একটা বৈজ্ঞানিক অপরটা দার্শনিক ; বৈজ্ঞানিক ধরিয়া লইয়াছেন যে জগতের সমস্তই এক নিশ্চেতন শক্তির ক্রিয়া বা তাহার ফল, সে শক্তি যান্ত্রিক ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়া আপনা আপনিই ক্রিয়াশীল হয় তাহাতে লক্ষ্য বা অভিপ্রায়ের কোন কথাই উঠে না ; দার্শনিকের যুক্তিধারা এই যে যিনি অনন্ত ও বিশ্বপুরুষ তাহার মধ্যে সব কিছু নিত্য বর্ত্তমান আছে, নিষ্পন্ন করিতে হইবে এরূপ অনিষ্পন্ন কিছু নাই, তাহার নিজের সঙ্গে যোগ করিবার যেমন কিছু নাই তেমনি ফুটাইয়া তুলিবার বা লাভ করিবারও কিছু নাই ; সুতরাং তাহাতে প্রগতির কোন প্রয়োজন নাই, তাহার মধ্যে আদি বা প্রকাশমান কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না।

আপাত-প্রতীয়মান জড়শক্তির অন্তরে বা অন্তরালে এক গোপন চেতনা যদি থাকে তাহা হইলে উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টির বিরুদ্ধে জড়বিজ্ঞানীর আপত্তি টিকিতে পারে না। বোধ হয় যেন নিশ্চেতনের মধ্যে অন্ততপক্ষে স্বাভাবিক নিয়তির এক প্রবেগ রহিয়াছে, যাহা হইতে নানা রূপ এবং রূপের মধ্যে বৃদ্ধিশীল এক চেতনা ফুটিয়া উঠিতেছে ; স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে এই প্রবেগ এক গোপন চেতনসত্তার উন্মিষিত ও পরিণত হওয়ার ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের প্রেরণা ছাড়া আর কিছু নয় এবং ক্রমশঃ অধিকতররূপে অভিব্যক্ত হইবার তাহার এই যে প্রেরণা বা প্রয়াস রহিয়াছে তাহাই প্রকৃতি-পরিণামের যে একটা স্বভাবসিদ্ধ উদ্দেশ্য আছে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। সৃষ্টির পশ্চাতে লক্ষ্যাভিসারী এই আকূতি বা প্রেরণাকে স্বীকার করা অযৌক্তিক নয় ; কেননা প্রকৃতির মধ্যে সচেতন বা এমন কি অচেতন যে প্রচেষ্টা বা প্রবেগ দেখা যায় তাহা যিনি সক্রিয় হইয়া জড় প্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়া নিজেকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন এমন এক চিৎপুরুষের সত্য হইতেই জাত হইয়াছে ; এই প্রয়াসের মূলে যে অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য আছে তাহা সত্তার স্বয়ংকার্য্যকরী সত্যের, তাহারই স্বয়ংকার্য্যসাধক ইচ্ছা বা সংকল্পশক্তিতে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কিছু নহে ; চেতনা যদি থাকে তাহা হইলে এরূপ ইচ্ছাশক্তিও সেখানে নিশ্চয়ই আছে বা এইরূপ ইচ্ছাশক্তিরূপে তাহার প্রকাশ স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য। সত্তার সত্যের এইরূপ অপরিহার্য্যরূপে আত্মরূপায়ণ পরিণামবাদের মর্ম্মকথা, এই ক্রিয়াশীল তত্ত্বের সাধনযন্ত্ররূপে এইরূপ ইচ্ছা এবং তাহার অভিপ্রায় অবশ্যই থাকিবে।

দার্শনিকের আপত্তি আরও গুরুতর, কেননা নিত্য পরমসত্য-বস্তুর সৃষ্টি-

ক্রিয়ার মধ্যে বিস্সৃষ্টির আনন্দ ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নাই একথা যেন স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয় ; জড়ের মধ্যে পরিণাম শক্তির খেলা বিস্সৃষ্টির অংশরূপে এই সার্ব্বভৌম বিবৃতির মধ্যেই পড়ে ; নিজেকে উন্মীলিত করিবার, পর্ব্বে পর্ব্বে ক্রমশঃ অধিকতররূপে আত্মপ্রকাশের আনন্দের জন্যই কেবল পরিণামধারা থাকিতে পারে, অন্য কোন উদ্দেশ্য সেখানে নাই। বিশ্বগত সমষ্টি বা সমগ্রতাকে স্বয়ংপূর্ণ বস্তু মনে করা যাইতে পারে, এই সমগ্রতাতে যুক্ত করিবার কিছু নাই, তাহার পক্ষে অলব্ধও কিছু নাই। কিন্তু এখানে এই জড়জগৎ তো অভঙ্গ সমগ্রতা নহে, ইহা একটা সমগ্রতার অংশ, সোপানা-বলীর একটা সোপান ; কেবল যে ইহাই স্বীকার করা যায় যে সমগ্রতার অজড় তত্ত্ব বা শক্তিসকল এই খণ্ডের এই জড়জগতের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় অন্তর্নিহিত আছে তাহা নহে পরন্তু ইহাও স্বীকাব করা যায় যে জড়ের আড়ষ্ট বন্ধন হইতে সগোত্র বা স্বজাতীয় তত্ত্ব বা শক্তিকে মুক্তি দিবাব জন্য উচ্চতর ভূমি হইতেও সেই সমস্ত অজড় শক্তি এখানে এই জড়জগতে নামিয়া আসিতেও পারে। সত্তার বৃহত্তর শক্তি সকল ক্রমশ প্রকাশিত হইতে থাকিবে অবশেষে উচ্চতর এক চিন্ময় বিস্সৃষ্টির ভাবে বা ভাষায় সমগ্র সত্তার পূর্ণ বিকাশ হইবে, ইহাকেই প্রকৃতি-পরিণামের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় বলা যাইতে পারে। এ অভিপ্রায়ের মধ্যে সমগ্রতার বহির্ভূত কোন কিছুকে আনিবার চেষ্টা নাই ; তাহা অংশের মধ্যে অংশীকে বা সমগ্রতাকে ফুটাইয়া তুলিবে ইহাই কেবল চায়। বিশ্ব-সমগ্রতার কোন আংশিক গতি ও ক্রিয়ার মধ্যে উদ্দেশ্য আছে মনে করাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না—সে উদ্দেশ্য যদি সমগ্রের মধ্যে যে সকল সম্ভাবনা অনুস্যূত আছে তাহাদিগকে পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তোলা হয় ; অবশ্য এ উদ্দেশ্য মানুষের কামনা বাসনামূলক উদ্দেশ্য নয়, সত্যস্বরূপের দ্বারা নির্দ্ধারিত যে মূল নিয়তি বা প্রয়োজন অন্তর্য্যামী চিৎপুরুষের সচেতন ইচ্ছার মধ্যে রহিয়াছে ইহা তাহারই একটা প্রবেগ বা প্রেরণা। একথা নিশ্চিত সৎস্বরূপের আনন্দের জন্যই এখানে সব কিছুর অস্তিত্ব, সব কিছুই তাহার লীলা বা খেলা ; কিন্তু খেলার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধি আছে এবং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ না হইলে খেলা পূর্ণভাবে সার্থক হয় না। কোন রহস্যোদ্ঘাটন না করিয়া বা কোন চরম পরিণতিতে না পৌঁছাইয়া দিয়া নাটক রচনা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব, শিল্প হিসাবে তাহার মূল্যও কিছু থাকিতে পারে, সে নাটকে নানা চরিত্রের যে চিত্র শুধু ভাসিয়া উঠিতেছে তাহা এবং সমাধান না করিয়া শুধু যে সমস্যা

উপস্থিত করা হইতেছে তাহা দেখিয়া অথবা নাটক যেখানে পরিণত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে সেখানেও কোন উপসংহার না করিয়া মনকে সংশয়-দোলায় দোলায়িত রাখিয়া আনন্দলাভ হইতে পারে; পার্থিব পরিণামের নাট্যলীলা এই ধরণেই চলিতেছে মনে করা যাইতে পারে; কিন্তু সেইসঙ্গে নাটকখানি একটা পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত চরম পরিণামে পৌঁছিতেছে, তাহাতে কোন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে দেখিতে পাইলে যেন তাহা আরও সুসঙ্গত আরও প্রতীতিজনক হয়। আনন্দই সর্ব্বসত্তার মর্ম্মগত তত্ত্ব এবং তাহার সকল কর্ম্মের আশ্রয় ও আধার; কিন্তু সত্তাতে প্রকৃতিসিদ্ধভাবে যে সত্য রহিয়াছে, সত্তার শক্তি বা সঙ্কল্পে যাহা অনুস্যূত আছে চিৎশক্তির গোপন আত্মসচেতনতার মধ্যে যাহা গোপনে ধৃত হইয়া আছে তাহা ফুটাইয়া তুলিবার যে পরম উল্লাস, তাহাও সত্তার মর্ম্মগত আনন্দেরই এক প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু নয়; এই চিৎশক্তিই আমাদের সকল ক্রিয়ার সক্রিয় পরিচালক এবং তাহাদের সকল সার্থকতার জ্ঞাতা।

চিন্ময় পরিণামবাদ এবং যাহাতে শুধু বাহ্যরূপের এবং স্থূল প্রাণের বিবর্ত্তনের কথা আছে বৈজ্ঞানিকের সেই পরিণামবাদ ঠিক এক বস্তু নয়; চিন্ময় পরিণামবাদকে তাহার নিজের প্রকৃতিসিদ্ধ প্রমাণের উপর দাঁড়াইতে হইবে; জড়বিজ্ঞানীর জড়ময় পরিণামবাদকে সে সহায় বা নিজের এক অংশরূপে গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু সে সাহায্য তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য নয়। বৈজ্ঞানিকের পরিণামবাদ বাহ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্রিয়াধারা এবং সাধনযন্ত্রের মধ্যে নিবদ্ধ, বাহ্য প্রকৃতির নানা খুঁটিনাটি ব্যাপার কি করিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাই সে দেখে, জড়জগতের মধ্যস্থিত জড়বস্তুর পরিণাম এবং জড়ের মধ্যে অবস্থিত প্রাণ ও মনের পরিণতির বিধান লইয়াই তাহার কারবার; নূতন আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিকের পরিণামধারার বিবরণ অনেক পরিবর্ত্তিত হইতে অথবা একেবারে বিবর্জিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা চিন্ময় পরিণাম বা চেতনার ক্রমাভিব্যক্তির অথবা জড়জগতের মধ্যে আত্মার বর্দ্ধমান প্রকাশ রূপ স্বতঃসিদ্ধ তথ্যের মর্ম্মস্পর্শ বা তাহাকে বিচলিত করিবে না। বাহিরের দিক হইতে দেখিলে পরিণামবাদ এই দাঁড়ায় :—জড়জগতে রূপ এবং দেহের একটা ক্রমিক উৎকর্ষ হইতেছে; জড়বস্তু, জড়ের মধ্যস্থ প্রাণ এবং প্রাণবস্ত জড়ের মধ্যস্থ মন ক্রমেই অধিকতর জটিলতার সহিত অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করিয়া অধিকতরভাবে সুগঠিত এবং সুসংহত হইয়া উঠিতেছে; এই ক্রমপরম্পরার মধ্যে রূপ, দেহ বা আধার যতই সুগঠিত হইয়া উঠিতেছে ততই তাহা

অধিকতর সুসংহত, অধিকতর জটিল এবং সমর্থ, অধিকতর পষ্ট বা পরিণত, প্রাণ এবং চেতনাকে অধিকতর সুন্দর ও পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে বাস করাইতে সক্ষম হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পরিণামবাদের যথাযথ বিবৃতি এবং তাহার অনুকূল তথ্যরাজি ভালভাবে সাজাইয়া দিলে পাথিব সত্তার এদিকটা এত সুস্পষ্ট এবং বিস্ময়কর হইয়া উঠে যেন তাহা অবিসংবাদী মনে হয়। ঠিক কি উপায়ে কোন্ সাধনযন্ত্র দ্বারা ইহা সাধিত হয় অথবা বিভিন্ন জাতিরূপের সঠিক বংশলতা বা ধারাবাহিক ইতিহাস কি তাহা জানা বা জানিবার চেষ্টা খুব চিত্তাকর্ষক এবং গুরুত্বপূর্ণ হইলেও, এ মতবাদ স্থাপনে তাহা গৌণস্থানীয়; পূর্ব্বজ অপরিণত রূপ বা দেহ হইতে পরিণত দেহের ক্রমিক উন্মেষ, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, জীবন-সংগ্রাম, অর্জিত ধর্ম্মের বংশানুক্রমের মধ্য দিয়া সংক্রমণ প্রভৃতি নানাকথা স্বীকার করিতে পারি বা না পারি, সৃষ্টি ব্যাপারে ক্রমবদ্ধ প্রগতি বা ক্রমোর্দ্ধ পরিণাম-ধারার একটা পরিকল্পনা আছে বৈজ্ঞানিকের এই বিশেষ সিদ্ধান্তই আমাদের নিকট মুখ্যভাবে প্রয়োজনীয়। আর একটি স্বতঃস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে পরিণাম ধারার মধ্যে একটা অনিবার্য্য পরম্পরাকে অনুসরণ করিয়া চলা আছে,—প্রথমে জড়ের উন্মেষ হইয়াছে, তারপর সেই জড়ে হইয়াছে প্রাণের স্ফুরণ, তাহার পর জীবন্ত জড়ের মধ্যে হইয়াছে মনের বিকাশ, এবং এই শেষ স্তরে পশুর মধ্য হইতে পরিণামধারা ধরিয়া মানুষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ধারাবাহিক প্রথম তিনটি পর্ব্ব আমাদের কাছে এতই সুস্পষ্ট যে তাহাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই। পশু হইতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে অথবা পশু ও মানুষ একই সঙ্গে আবির্ভূত হইবার পর অবশেষে মনের উৎকর্ষে মানুষ পশুকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—ইহা লইয়া বিতর্ক চলিতে পারে। এমন একটা মত উপস্থাপিত করা হইয়াছে যাহা বলে যে মানুষ পশুর পরে আসে নাই পরন্তু মানুষ পশু-জগতের প্রথম সৃষ্টি এবং সকল পশুর মধ্যে বয়সে প্রাচীনতম। এই মতটি সুপ্রাচীন হইলেও সর্ব্ববাদী সম্মত নয়; মানুষ স্পষ্টতঃ পাথিব প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, তাহার আভিজাত্যের এই মহিমার জন্যই মানব-জাতির সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভাব হওয়ার একটা দাবী আছে এই বোধ হইতেই বোধ হয় এই মত আসিয়াছে, কিন্তু পরিণামের স্বাভাবিক রীতিতে উচচতরের আবির্ভাব পূর্ব্ববর্ত্তী নয় পরবর্ত্তী ব্যাপার; অপরিণত জাতি পরিণত জাতির পূর্ব্বে আসে এবং তাহার আবির্ভাবের ভূমি প্রস্তুত করে।

বস্তুতঃ প্রাণীর মধ্যে নিম্নতর জাতীয় প্রাণী উচচতরের পূর্ব্বে জগতে জাত

হইয়াছে এ ধারণা প্রাচীনকালের চিন্তাধারায় যে একেবারেই ছিল না তাহা নহে। স্বষ্টির পৌরাণিক বিবরণ ছাড়িয়া দিলেও ভারতের প্রাচীন এবং মধ্য-যুগের চিন্তাধারায় এমন সব উক্তি পাওয়া যায় যাহা আধুনিক পরিণামবাদের মত 'পশুজাতির উৎপত্তি মানুষ জাতির আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঘটিয়াছে' এ মতেরই সমর্থন করে। একখানি উপনিষদে আছে যে আত্মা বা চিৎসত্তা প্রাণ স্বষ্টি করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া প্রথমে গো অশ্ব প্রভৃতি পশুজাতি স্বষ্টি করিলেন, কিন্তু উপনিষদের চিন্তাধারায় যাহারা চেতনার এবং প্রকৃতির শক্তি সেই দেবতা-গণ দেখিলেন যে এ সমস্ত পশু-দেহ তাহাদের প্রকাশের অনুপযুক্ত বাহন, তাই বিশ্বপুরুষ অবশেষে মানব-দেহ স্বষ্টি করিলেন তখন দেবতারা তাহা সুনির্ম্মিত এবং উপযুক্ত আধার মনে করিয়া বিশ্বক্রিয়ার জন্য তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। এই রূপক কথাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় ক্রমোর্দ্ধ পরম্পরায় একটির পর একটি আধার স্বষ্ট হইতে হইতে অবশেষে এমন আধার দেখা দিল যাহার মধ্যে পরিণত চেতনার স্বচ্ছন্দে স্থান হইতে পারে। পুরাণেও বলা হইয়াছে যে তামসিক পশু স্বষ্টিই কালের ক্ষেত্রে প্রথমে হইয়াছিল। ভারতীয় তমস্ শব্দে চেতনা এবং শক্তির জড়তা এবং অসাড়তার তত্ত্বকেই বুঝায়, যে চেতনা নিষ্প্রভ মন্থর এবং প্রকাশে অসম্পূর্ণ বা অশক্ত তাহাকে তামসিক চেতনা, তেমনি যে শক্তি বা প্রাণের বীর্য্য অলসতাগ্রস্ত, যাহাব সামর্থ্য সীমিত, যাহা শুধু সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ, যাহাতে প্রগতির প্রবেগ নাই, যাহার মধ্যে অনুসন্ধিৎসা নাই, বৃহত্তর ভাবে সক্রিয় বা চিন্ময়ভাবে দীপ্তিমন্ত কোন কর্ম্মের দিকে যাহার আকূতি বা আবেগ নাই সেই কর্ম্মকে তামসিক আখ্যা দেওয়া হয়। যে পশুর মধ্যে চেতনার শক্তি এইরূপ অপরিণত সেই পশু স্বষ্ট হইয়াছে পূর্ব্বে, অধিকতর পুষ্ট ও পরিণত মানব-চেতনা যাহার মধ্যে মনঃশক্তির প্রকাশ বৃহত্তর এবং বোধের আলোক স্ফুটতর তাহা স্বষ্টির পরবর্ত্তী স্তর। তন্ত্রে আছে স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া জীবাত্মা উদ্ভিদ এবং পশু যোনিতে বহুলক্ষ জন্ম অতিবাহিত করিয়া অবশেষে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং মুক্তির জন্য প্রস্তুত হয়। এখানে ইঙ্গিত এই যে উদ্ভিদ্ এবং পশু জীবনসকল নিম্নতর ধাপ এবং মানব জীবন সর্ব্বোচ্চ ধাপ ; অধ্যাত্ম প্রগতি পথে যাইবার আকূতি ও শক্তি লাভ করিতে এবং দেহ মন ও প্রাণের গণ্ডি কাটাইয়া চিন্ময় ভূমিতে পৌঁছিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিতে হইলে জীবাত্মাকে তাহার সচেতন সত্তার সর্ব্বোচ্চ অবস্থার উপযোগী এই মানব-দেহেই বাস করিতে হইবে। ইহাই স্বাভাবিক

ধারণা এবং এ ধারণা বুদ্ধি ও বোধি উভয় দিক হইতে এত সুসঙ্গত যে ইহা লইয়া তর্ক প্রায় নিষ্প্রয়োজন—বলিতে গেলে এ সিদ্ধান্ত প্রায় নিঃসন্দেহ।

ক্রমপরিণতির এই ধারা সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে মানুষের দিকে তাকাইতে হইবে, তাহার উৎপত্তি ও প্রথম আবির্ভাবের কথা বুঝিতে হইবে, দেখিতে হইবে বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে কোথায় তাহার স্থান। দুইটি সম্ভাবনা লইয়া আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে, প্রথম সম্ভাবনা—পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে মানবদেহ এবং মানব-চেতনার আবির্ভাব এক আকস্মিক সৃষ্টি, অথবা কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা হইতেই হঠাৎ একদিন জড়জগতের প্রাণী সকলের মধ্যে বিচারবুদ্ধিশীল মননধর্ম্ম হয়ত জড়জগতে পূর্ব্বজাত পশুর উপরের স্তর রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল; ঠিক যেমন ভাবে একদিন নিষ্প্রাণ জড়ের মধ্যে অবচেতন এবং সচেতন পশুদেহের হয়ত আবির্ভাব হইয়াছিল; দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে ধীর ও মন্থর গতির নানাস্তরের মধ্য দিয়া প্রস্তুত হইয়া ক্রমোন্মেষের ধারা ধরিয়া পশুত্ব হইতেই মনুষ্যত্বের উদ্ভব হইয়াছে, কেবল বিশিষ্ট পর্ব্বসন্ধিতে গতির মধ্যে দীর্ঘ লম্ফ দেখা গিয়াছে বা তখন পরিবর্ত্তন অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। শেষোক্ত সিদ্ধান্ত মনে হয় সহজ ও যুক্তিযুক্ত; ইহা নিশ্চিত যে মৌলিক জাতীয় ধর্ম্মের রূপান্তর না হইলেও জাতি এবং উপজাতিতে অনেক বিশিষ্ট ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর ঘটে—বস্তুতঃ মানুষ নিজেই ইহা করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে বিজ্ঞানের অনেক পরীক্ষা এ বিষয়ে আশ্চর্য্য সাফল্যও লাভ করিয়াছে; তাই যদি হয় তাহা হইলে আমরা বেশ স্বীকার করিতে পারি যে প্রকৃতির মধ্যস্থিত গোপন চেতনশক্তি এইভাবের ব্যাপক ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়া নিজের সৃষ্টি শক্তির সুকৌশল প্রয়োগে ও প্রেরণায় একটা বিপুল ও অসন্দিগ্ধ রূপান্তর আনিতে পারে। তখন সাধারণ পশুজীবন হইতে মনুষ্যত্বে রূপান্তরিত হইবার জন্য প্রয়োজন হইবে জড়দেহের এমন উৎকর্ষসাধন, যাহাতে তাহা চেতনার দ্রুত ঊর্দ্ধ্বগতির বাহন হইতে পারে এবং তাহার ফলে চেতনার একটা রূপান্তর বা তাহার গতির দিক পরিবর্ত্তন ঘটিবে, উচচ এক ভূমিতে তাহা আরূঢ় এবং তথা হইতে নিম্নতর ধাপগুলির উপর দৃষ্টি রাখিবে, তাহার সামর্থ্যও এমনভাবে প্রসারিত এবং বর্দ্ধিত হইবে যাহাতে সত্তা নিজের মধ্যে পূর্ব্বগত পশুবৃত্তি-সকলকে তাহার বৃহত্তর এবং অধিকতর সাবলীল মনুষ্যোচিত বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ

করিতে পারিবে ; সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ বা কিছুকাল পরে সত্তার নূতন জাতি-রূপের উপযোগী বৃহত্তর এবং সূক্ষ্মতর শক্তিসকল—যুক্তি বিচার, ভাবনা, জটিল পর্য্যবেক্ষণের শক্তি, সুসংহতভাবে আবিষ্কার এবং নির্ম্মাণ-কৌশলের সামর্থ্য উদ্বোধিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে। উন্মিষন্ত এক চিৎশক্তি যদি থাকে তাহা হইলে যোগ্য আধার পাইলে চেতনার এই রূপান্তর তত কঠিন হইবে না ; তাহাকে জড়ের নিশ্চেতনতার বাধা ও প্রতিকূলতা শুধু অতিক্রম করিতে হইবে। মানুষেব মধ্যে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কতকগুলি গুণ ও ধর্ম্ম সংকীর্ণ ভাবে পশুর মধ্যে আছে, তাহাতে শুধু ক্রিয়ার দিকটা ফুটিয়াছে, জ্ঞানের দিক নয়, পশুতে এ সমস্ত গুণ স্থূল অপক্ক এবং অপরিণত অবস্থায় আছে, তাহাদের অধিকার যেমন সঙ্কুচিত, সাবলীলতাও তেমনি কুণ্ঠাগ্রস্ত, তাহাদের উপর সত্তার আধিপত্য অত্যন্ত ক্ষীণ ও অনিয়ত ; বিশেষতঃ তেমন সচেতনভাবে ইচ্ছা-পূর্ব্বক এই সমস্ত বৃত্তিব ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয় না অনেকটা যান্ত্রিকভাবেই হয়, প্রাকৃতিক শক্তি অপবিণত আদি চেতনার ক্রিয়াধারার দ্বারা পশুকে যেন কতকটা যন্ত্রের মতই চালায়, তাই মানুষের যেমন সচেতনভাবে সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তি আছে যে শক্তির দ্বারা সে নিজের ক্রিয়াধারাও অনেকটা পরিচালিত, পরিশাসিত এবং সচেতনভাবে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত করিতে পারে, পশুর সে শক্তি নাই। পশুচেতনার অন্যান্য বৃত্তির সঙ্গে মানুষের তেমন কোন মৌলিক ভেদ নাই ; মানুষকে শুধু পশুর বৃত্তিগুলিকে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পুষ্ট ও প্রসারিত করিযা মননের উচ্চস্তরে তুলিতে হইয়াছে এবং যেখানে সম্ভব তাহাদিগকে সূক্ষ্ম ও সংস্কৃত করিয়া মনোধর্ম্মী করিয়া তুলিয়াছে ; অন্য কথায় বলিতে গেলে, পশুর এই সমস্ত বৃত্তিকে মানুষ তাহার নবলব্ধ বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির আলোকে আলোকিত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে বিচার বুদ্ধি যোগে আয়ত্তে আনিয়াছে কিন্তু পশুর পক্ষে ইহা করা অসম্ভব ছিল। একবার এই পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর সাধিত হইলে মানুষের মনঃশক্তি নিজের এবং জাগতিক বস্তুরাজির উপর ক্রিয়া করিবে এবং পরিণতি পথে তাহার মধ্যে জানিবার, সৃষ্টি করিবার, চিন্তা ও আলোচনা করিবার শক্তি পুষ্ট করিয়া তুলিবে ; যদিও ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে গোড়ার দিকে এ সমস্ত শক্তি তাহার মধ্যে পশুর শক্তির বহু উচ্চে অবস্থিত ছিল না, অপেক্ষাকৃত অপবিণত স্থূল সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নিবদ্ধ ছিল। প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেক বারেই যখন পর্ব্বসংক্রমণকারী রূপান্তর সাধিত হইয়াছে তখন এরূপ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে ; উন্মিষন্ত

প্রাণশক্তি যখন জড়ের উপর ক্রিয়া করিয়াছে তখন জড়শক্তির ক্রিয়াধারার উপর প্রাণধর্ম্ম আরোপ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে নিজের বিশিষ্ট বৃত্তি ও ক্রিয়াও ফুটাইয়া তুলিয়াছে; তাহার পর প্রাণশক্তি ও জড়ের মধ্যে প্রাণগত মন (life-mind) উন্মিষিত হইয়া তাহার নিজস্ব চেতনার উপাদান তাহাদের কার্য্য ধারার উপর আরোপ করিয়াছে আবার সেই সঙ্গে তাহার নিজের ক্রিয়া এবং বৃত্তিসমূহকেও উন্মিষিত ও পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে; মনুষ্যত্বের এই নূতন ও বৃহত্তর উন্মেষ প্রকৃতির পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত বা নজির অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে; এক্ষেত্রে প্রকৃতি-লীলার সাধারণ সূত্রই নূতন করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে মাত্র।

অতএব এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ; ইহার কর্ম্মধারা আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য নহে। কিন্তু অন্য সিদ্ধান্তকে মানিবার পক্ষে প্রচুর বাধা বর্ত্তমান। চেতনার দিক হইতে মনুষ্য-চেতনার অভিনব আবির্ভাবকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সংবৃত গোপন চেতনার একটা উন্মেষ ও উৎক্ষেপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এই উন্মেষের জন্য একটা আধাররূপে জড়ের কোন রূপ পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল, উন্মেষের শক্তিই নূতন স্থষ্টির আন্তর প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া সে আধারকে গ্রহণ করিয়াছে; তাহা যদি না হয়, তবে হয়তো পুরাতন জাতিরূপসকল হইতে দ্রুতভাবে অত্যন্ত পৃথক হইয়া নূতন জীব বা জাতিরূপে মানুষ স্বষ্ট হইয়াছে। এই দুইটি সিদ্ধান্তের যে-কোনটিকে স্বীকার করিনা কেন তাহা পরিণামের একটি ক্রিয়াধারা হইয়া দাঁড়ায়—পার্থক্য বা রূপান্তরের রীতি এবং পদ্ধতিতে কেবল ভেদ দেখা যায়। পক্ষান্তরে ইহাও হইতে পারে, নিশ্চেতন জড়ের মধ্য হইতে চেতনা উৎক্ষিপ্ত হয় নাই বরং ঊর্দ্ধ্বতন মনোময় ভূমি হইতে মনশ্চেতনা হয়ত মনোময় সত্তা বা আত্মা, নিম্নে জড় প্রকৃতির ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছে। কিন্তু তখন প্রশ্ন উঠে যে এই চেতনার উপযোগী এত জটিল ও দুঃসাধ্য আধার এ মনুষ্য-দেহ হঠাৎ কি করিয়া স্বষ্ট হইল? এরূপ অলৌকিক ব্যাপার অতিপ্রাকৃত ভূমিতে এত দ্রুত সম্ভাবিত হইলেও জড়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এবং সুপরিচিত সম্ভাবনাসকলের মধ্যে এরূপ ঘটিতে ত দেখা যায় না। ইহা কেবল তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি বা বিধান অথবা জগৎস্রষ্টা বৃহত্তর এক মন তাহার পূর্ণ শক্তি লইয়া জড়ের উপর সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়াশীল হয়। জড়ের মধ্যে প্রত্যেক নূতন আবির্ভাবের মূলে অতি-প্রাকৃত শক্তির ক্রিয়া বা বিধাতার ইচ্ছা

মানিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই; মূলতঃ প্রত্যেক নূতন আবির্ভাব, প্রাণশক্তি এবং মনঃশক্তিকে অবলম্বন করিয়া এই গোপন পরাচেতনার অনির্ব্বচনীয় ক্রিয়াধারা হইতেই জাত হয়; কিন্তু এরূপ ক্রিয়াকে প্রচুর পরিমাণে সাক্ষাৎভাবে স্বতন্ত্র হইয়া বাহিরে প্রকাশিত হইতে কখনও ত দেখি না, সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান কোন জড়ভিত্তির উপর তাহা আরোপিত হয় এবং প্রকৃতির প্রচলিত ক্রিয়াধারার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়াই ক্রিয়া করে। বরং ইহা মনে করা যাইতে পারে যে পূর্ব হইতে বর্ত্তমান পার্থিব কোন দেহ বা আধার জড়োত্তর ভাবের দিকে খোলা ও উন্মুখ ছিল বলিয়া জড়াতীত শক্তিপ্রপাতের ফলে তাহা নূতন দেহে রূপান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু যেখানে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত কোন দেহ ছিল না সেরূপ ক্ষেত্রে জড়প্রকৃতির অতীত ইতিহাসে এরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা ত সহজে স্বীকার করা যায় না; ইহা ঘটিবার জন্য হয় কোন অদৃশ্য মনোময় পুরুষ নিজের বাসের উপযুক্ত স্থান গড়িয়া তুলিবার জন্য সচেতনভাবে প্রকৃতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া উপযুক্ত দেহ বা আধার গড়িয়া তুলিয়াছে ইহা মানিতে হয়, না হয় বলিতে হয় যে জড়েরই মধ্যে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান কোন মনোময় সত্তা গোপনে পুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল এবং জড়াতীত শক্তিপ্রবাহকে বরণ করিয়া লইয়া তাহার জড়ময় জীবনের সঙ্কীর্ণ এবং আড়ষ্ট বিধানের উপর সেই প্রবাহ আরোপ করিবার শক্তিও তাহার ছিল, তাহার ফলেই এরূপ দেহ গড়িয়া উঠিয়াছে। নইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে পূর্ব্ববর্ত্তী একটা দেহ পূর্ব্ব হইতে এমনভাবে পুষ্ট ও গঠিত হইয়াছিল যাহা প্রবল মনোময় শক্তিপ্রপাতের উপযুক্ত আধার হইতে বা মনোময় পুরুষের অবতরণে সাবলীলভাবে সাড়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে আবার মানিতে হয় যে সেই দেহে মনোধর্ম্ম পূর্ব্ব হইতে এরূপ পরিণত অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল যে অবস্থায় ঐরূপ শক্তিপ্রপাত ধারণের উপযুক্ত হইতে পারিয়াছিল। ইহা অবশ্য বেশ মনে করা যাইতে পারে যে নিম্ন হইতে এইভাবের একটা পরিণতি এবং উপর হইতে এরূপ একটা শক্তির অবতরণ এই দুইএর সহযোগিতায় পার্থিব প্রকৃতিতে মানবতার আবির্ভাব হইয়াছে। পশুর দেহে অন্তর্নিহিত গোপন চৈত্যসত্তা নিজে হয়তো জীবন্ত জড়ের ক্ষেত্রে যে প্রাণশক্তি পূর্ব্ব হইতে ক্রিয়াশীল ছিল তাহাকে মননের উচচস্তরে তুলিয়া লইবার জন্য মনোময় পুরুষকে আবাহন করিয়া নীচে নামাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু ইহাও পরিণামেরই ধারা হইবে, উর্দ্ধ্বভূমি হইতে যে শক্তির আবেশ দেখা দিয়াছে

তাহার কাজ হইল পার্থিব-প্রকৃতির মধ্যে তাহার নিজের তত্ত্বকে উন্মিষিত ও পুষ্ট করিতে সহায়তা করা মাত্র।

তাহার পর ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে একবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে দেহগত চেতনা ও সত্তার প্রত্যেক জাতিরূপকে তাহার জাতীয় ধর্ম্ম তাহার নিজস্ব বিশিষ্ট পরিকল্পনা তাহার প্রকৃতির বিধানকে মানিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু ইহাও তো হইতে পারে যে মানুষের জাতিরূপের ধর্ম্ম বা বিধানের অংশভূত হইয়া তাহার নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইবার আকৃতি ও আবেগ আছে, সচেতনভাবে রূপান্তরলাভের উপায় মানুষের অধ্যাত্ম শক্তির মধ্যে হয়ত নিহিত রহিয়াছে; বিশ্বস্রষ্ট্রী শক্তি যে পরিকল্পনা লইয়া মানুষকে গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহার মধ্যে তাহারই অংশরূপে মানুষের মধ্যে এই সামর্থ্যও হয়ত দেওয়া হইয়াছে। ইহাও হয়ত স্বীকৃত হইতে পারে যে আজ পর্য্যন্ত মানুষ তাহার প্রকৃতির সীমার মধ্যে থাকিয়াই প্রধানতঃ ক্রিয়া করিয়াছে, সে কুণ্ডলিত বা সর্পিল পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে কখনও সে উপরে উঠিয়াছে কখনও নীচে নামিয়াছে; কিন্তু প্রগতির পথ সরল রেখায় অগ্রসর হয় নাই, তাহার অতীত প্রকৃতিকে মৌলিক বা অবিসংবাদিতভাবে কোথাও অতিক্রম করে নাই; সে তাহার সামর্থ্যকে ক্রমশঃ অধিকতররূপে শাণিত সূক্ষ্ম বিচিত্র জটিল এবং সাবলীল করিয়া তুলিতে মাত্র সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু মানুষের আবির্ভাবের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হয় নাই একথা সত্য নহে, এমন কি আধুনিক ইতিহাসের যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতেও তাহা প্রমাণ হয় না; কেননা প্রাচীনেরা যত বড়ই হউন না কেন, তাহাদের অর্জ্জিত সম্পদ এবং সৃষ্টির মহিমা যতই বেশী হউক না কেন, তাহাদেব বুদ্ধি চরিত্র এবং আধ্যাত্মিকতার শক্তি যতই উজ্জ্বল বা চমকপ্রদ হউকনা কেন, পরবর্ত্তী-যুগে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সূক্ষ্মতা, বৈচিত্র্য, জটিলতা এবং নানা সম্পদ অর্জ্জনের সম্ভাবনা অনেক বেশী দেখা দিয়াছে, রাজনীতিতে সামাজিক ব্যবস্থায় জীবনযাত্রার নানাভূমিতে দর্শন ও বিজ্ঞানের রাজ্যে, শিল্পে ও সাহিত্যে এক কথায় জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে মানুষ উন্নতির পথে অনেক অগ্রসর হইয়াছে; এমন কি অধ্যাত্ম সাধনায় প্রাচীনদের মত বিস্ময়কর উচ্চতা এবং শক্তির বিশালতা লাভ করিতে না পারিলেও ক্রমবর্দ্ধমান সূক্ষ্মতা, সাবলীলতা, গভীর-তার উপলব্ধি, বহুমুখী এবং সুদূরপ্রসারী এষণা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাহারা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে। এ কথা হয়তো সত্য যে আজকালকার মানুষ সংস্কৃতির

উচচস্তর হইতে পতিত হইয়াছে, কিছুদিন হইতে কোন কোন বিষয়ে আলোক ও সংস্কারের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে, তাহার চিন্ময় অভীপ্সার শিখা নির্ব্বাপিত হইয়াছে, অসভ্যোচিত জড়বাদের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে কিন্তু তবু এ সমস্ত সাময়িক ব্যাপার মাত্র, বড়জোর আরোহ এবং অবরোহের পরম্পরার মধ্য দিয়া তাহার উন্নতির যে পথ পরিকল্পিত হইয়াছে ইহা সেই পথের মধ্যস্থিত কোন অবরোহ মাত্র। মানুষের প্রগতি মনুষ্যত্বের গণ্ডি অবশ্য আজিও ছাড়াইতে যাইতে পারে নাই বা মানুষ নিজেকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাহার মনোময় সত্তার রূপান্তর হয় নাই। কিন্তু সে আশা তো করা যায় না, কেননা কোন জাতিরূপের সত্তা এবং চেতনার মধ্যে পরিণতির ক্রিয়াধারা এইরূপ যে তাহা প্রথমে সূক্ষ্মতা এবং বৈচিত্র্য বা জটিলতা ক্রমশঃ বাড়াইয়া সেই জাতিরূপের সামথ্যের চরমে পৌঁছিবে, অবশেষে স্বভাবের চরম পরিপাকে সে উন্মিষিত, রূপান্তরিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইবে তখন চেতনার নিজের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইবার ফলে পরিণামধারার মধ্যে নূতন স্তর দেখা দিবার সময় উপস্থিত হইবে। চিন্ময় এবং অতিমানস সত্তাকে ফুটাইয়া তোলাই যদি প্রকৃতির পরবর্ত্তী ধাপ হয়, তাহা হইলে মানবজাতির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার যে চাপ বা সংবেগ দেখা যায় তাহাই প্রকৃতির উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত করে ইহা বুঝিতে হইবে ; আবার সেই সংবেগ হইতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষ সেই রূপান্তর সাধন করিতে সক্ষম হইবে অথবা সেই কার্য্যসম্পাদনার জন্য প্রকৃতিকে সহায়তা করিতে পারিবে। কোন কোন বিষয়ে বানরজাতির অনুরূপ অথচ প্রথম হইতেই মনুষ্যধর্ম্ম যাহার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল এমন কোন জাতিরূপের মধ্য হইতেই মানুষের একদিন আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহাই যদি পরিণতিধারার পদ্ধতি হইয়া থাকে তবে চিন্ময় এবং অতিমানস সত্তার আবির্ভাবের জন্য এবারও প্রকৃতি অনুরূপ এক রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করিবে ; মনোময় পশুধর্ম্মী মানুষের অনুরূপ অথচ চিন্ময় অভীপ্সার দ্বারা চিহ্নিত এক নূতন ধরণের মানুষ মানবজাতির মধ্যেই দেখা দিবে, তাহাদের মধ্য হইতে অতিমানব বা এক চিন্ময় সত্তা ফুটিয়া বাহির হইবে।

মনে হয় যেন সঙ্গত ভাবেই বলা হইয়াছে যে পরিণামধারার এরূপভাবে এক চরম অবস্থায় পৌঁছা যদি প্রকৃতি-পরিণামের শেষ উদ্দেশ্য হয় এবং মানুষের মাধ্যমেই যদি তাহা সাধিত হয় তাহা হইলে কয়েকজন এইরূপ বিশেষ, ভাবে উন্নত মানুষ সৃষ্টি হইলে তাহারা এই নূতন জীবনের দিকে অগ্রসর হইবে,

তাহাদের দ্বারাই নূতন জাতিরূপ গঠিত হইবে ও একবার ইহা হইয়া গেলেই প্রকৃতির নূতন জাতিরূপ গঠনের বাসনা চরিতার্থ হইবে; এবং প্রকৃতির উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আর প্রয়োজন নাই বলিয়া বাকী সকল মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক অভীপ্সার বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে ও তাহারা তাহাদের প্রাকৃত স্তরে স্থির হইয়া বাস করিতে থাকিবে। সমানভাবে এ যুক্তিও দেওয়া চলে যে জন্মান্তর গ্রহণের দ্বারা সত্যই জীবাত্মা যদি পরিণামধারায় ক্রমোন্নত স্তরের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিকতার শিখরের দিকে অগ্রসর হয় তবে মানবতার স্তরকেও বজায় রাখিতে হইবে, কেননা তাহা না হইলে পরিণামধারার মধ্য-স্থানীয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সোপান লোপ পাইবে। উত্তরে বলি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সমগ্র মানবজাতির একযোগে অতিমানস ভূমিতে পৌঁছিবার কোন সম্ভাবনাই নাই; এ ধরণের কোন বিপ্লবাত্মক এবং বিস্ময়কর কিছু ইঙ্গিত করাও হয় নাই। এখানে শুধু এইটুকু বলা হইয়াছে যে মানুষের বুদ্ধি ও ভাবনার সামর্থ্য এতদূর বাড়িবে বা তাহা এমন এক স্তরে পৌঁছিবে বা তাহার পরিণামধারায় এমন এক প্রবেগ দেখা দিবে যাহাতে তাহা চেতনার এক উচ্চতর ভূমির দিকে অগ্রসর হইবে এবং সেই চেতনাকে নিজ সত্তায় রূপায়িত করিবার আকূতি তাহার মধ্যে জাগিবে। যাহার মধ্যে এই চেতনা কায় পরিগ্রহ করিবে অবশ্যই তাহার স্বাভাবিক প্রাকৃত স্বভাবের একটা পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহার মনোময় অনুভূতিময়, ইন্দ্রিয়বোধময় গঠনের তো বটেই এমনকি তাহার দৈহিক চেতনায় এবং প্রাণ ও শক্তির দৈহিক ক্রিয়াধারারও একটা গুরু পরিবর্ত্তণ আসিয়া পড়িবে; কিন্তু চেতনারই হইবে সবচেয়ে বড় রূপান্তর সেদিকে থাকিবে প্রাথমিক গতি, দৈহিক পরিবর্ত্তন হইবে তাহার ফল এবং গৌণ ব্যাপার। চেতনার এই রূপান্তর-প্রাপ্তির সম্ভাবনা মানব সত্তার মধ্যে অন্তর্নিহিতভাবে সদা বিদ্যমান থাকিবে—যখন চৈত্যসত্তার বা অন্তরাত্মার বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিবে, যখন হৃদয় ও মন শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এবং প্রকৃতি প্রস্তুত হইবে। চিন্ময় অভীপ্সা মানুষের স্বভাবগত; পশুর সঙ্গে এই তাহার ভেদ যে সে তাহার অপূর্ণতার কথা জানে, সীমা ও সঙ্কোচ নিরন্তর তাহাকে পীড়া দেয় এবং সে এখন যাহা হইয়াছে তাহার গণ্ডি ছাড়াইয়া তাহাকে কোন কিছু হইয়া উঠিতে হইবে ইহা সে বোধ করে; নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইবার এই আকূতি মানবজাতির অন্তর হইতে কখনও নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। মনোময়ী প্রকৃতি মানুষের মধ্যে

চিরকালই থাকিবে কিন্তু তাহা জন্মান্তরের স্তর-পরম্পরার মধ্যস্থিত একটা প্রযোজক ভূমিরূপেই শুধু থাকিবে না, তাহা চিন্ময় এবং অতিমানস স্থিতির দিকে পৌঁছিবার একটা উন্মুক্ত সোপান হইবে।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পৃথিবীতে মানব-মন এবং মানবদেহের আবির্ভাবে পরিণামধারার মধ্যে একটা যুগান্তর দেখা দিয়াছে—একটা গুরুতর পরিবর্ত্তণ আসিয়া পড়িয়াছে ; ইহা কেবল পূরাতন ধারার অনুবর্ত্তণ নয়। চিন্তাশীল পরিপুষ্ট এই মানবমনের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিণামধারা সজীব সত্তার আত্ম-সচেতন অভীপ্সা, উদ্দেশ্য, সঙ্কল্প বা এষণা দ্বারা পরিচালিত হইয়া চলে নাই, চলিয়াছে অবচেতন বা অধিচেতন ভাবে প্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিয়াধারার বশে। তাহার কারণ এই যে, নিশ্চেতনা হইতে পরিণাম আরম্ভ হইয়াছে এবং মানবমন উন্মেষের পূর্ব্বে গোপন চেতনা সেই নিশ্চেতনা হইতে এমনভাবে উন্মিষিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে জীবন্ত প্রাণীর ব্যষ্টিগত সঙ্কল্পের মধ্য দিয়া তাহা সচেতনভাবে ক্রিয়া করিতে পারে। কিন্তু মানুষের মধ্যে ইহার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহার সত্তা জাগরিত এবং আত্ম-সচেতন হইয়াছে ; তাহাব মনের মধ্যে পুষ্ট হইবার জন্য জ্ঞানলাভ করিবার জন্য অন্তর্জীবনকে গভীরতর বহির্জীবনকে উদারতর এবং তাহার প্রকৃতির সামর্থ্য বৃদ্ধি কবিবার জন্য একটা সচেতন সঙ্কল্প জাগান হইয়াছে। মানুষ দেখিতে পাইয়াছে তাহার নিজের চেতনা হইতে উচচতর এক চেতনার ভূমি আছে, তাহার প্রাণ ও মন ঊর্দ্ধ্ব পরিণামের প্রবল উন্মাদনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইবার আকুল আস্পৃহা তাহার মধ্যে মুক্ত ও মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে ; অন্তরাত্মার সন্ধান সে পাইয়াছে, আত্মা এবং চিৎ-পুরুষকে আবিষ্কার করিয়াছে। অবচেতন পরিণামধারাকে তাহার মধ্যে সচেতন করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে বা তাহার ধারণার মধ্যে আসিয়াছে ; এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে এ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে তাহার মধ্যে যে অভীপ্সা, যে প্রবেগ এবং সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল যে প্রচেষ্টা জাগিয়াছে, তাহা প্রকৃতির মহত্তর এক সিদ্ধির সঙ্কল্প এবং তাহার সত্তার এক বৃহত্তর ভূমির উন্মেষের নিশ্চিত নিদর্শন।

পরিণামের ক্ষেত্রে মানুষের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী সোপানাবলিতে দৈহিক গঠনের পরিবর্ত্তনের দিকেই প্রকৃতিকে প্রধানতঃ চেষ্টা ও যত্ন করিতে হইয়াছে কেননা কেবল এইভাবেই চেতনার পরিবর্ত্তন সম্ভব ছিল ; যে চেতনা

তখন রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এত অপ্রচুর ছিল যে দেহের পরিবর্ত্তন-সাধন তাহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না, তাই প্রকৃতির পক্ষে ইহা করা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু মানুষের মধ্যে আসিয়া এ ব্যবস্থা উল্টাইয়া দেওয়া সম্ভব এবং বস্তুতঃ অপরিহার্য্য হইয়াছে; কেননা তাহার চেতনার মধ্য দিয়া সেই চেতনার রূপান্তর দ্বারাই উর্দ্ধ পরিণাম চলিতে পারে অথবা চালাইতেই হইবে, তাহার প্রাথমিক সাধনবস্তুরূপে নূতন দেহ গঠনের প্রয়োজন আর নাই। অন্তরস্থ সত্যের দিকে দৃষ্টি পড়িলে বুঝা যাইবে যে চেতনার পরিবর্ত্তন ও রূপান্তরসাধনই পরিণামধারার সর্ব্বপ্রধান তথ্য, পরিণতিব মধ্যে সর্ব্বদাই একটা চিন্ময় সার্থকতার দিকে লক্ষ্য ছিল এবং স্থূলের বা দেহের পরিবর্ত্তন একটা মধ্যবর্ত্তী সাধন যন্ত্র মাত্র; কিন্তু প্রথম দিকে এ দুয়ের মধ্যে যথাযথ সাম্য না থাকায় দেহের বাহ্য নিশ্চেতনা চিৎসত্তার চিন্ময় উপাদানকে খর্ব্ব এবং স্তিমিত করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া চেতনা এবং দেহের এই প্রকৃত সম্বন্ধ গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু একবার যখন প্রকৃত সাম্য স্থাপিত হইয়াছে তখন চেতনার রূপান্তরসাধনের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপার রূপে দেহের কোন পরিবর্ত্তনসাধন আর প্রয়োজন নাই; এবার চেতনা নিজেরই মধ্যের পবিবর্ত্তনের দ্বাবা দেহের যেটুকু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন তাহা উপস্থিত করিবে এবং অভীপ্সিত পরিবর্ত্তন সাধিত করিবে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে উদ্ভিদ এবং পশুব নূতন জাতি-রূপ গড়িয়া তোলার কার্য্যে প্রকৃতিকে সহায়তা করিবার সামর্থ্য যে মানবমনের আছে তাহা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হইয়াছে; তাহার পরিবেশকে মানুষ নানা দিক দিয়া নূতন রূপে গড়িয়া তুলিয়াছে, জ্ঞান এবং তপস্যার প্রভাবে তাহার মনন-শক্তির যথেষ্ট রূপান্তর সাধন করিয়াছে। মানুষ যে তাহার নিজের অধ্যাত্ম-চেতনা এবং দেহের পরিণাম ও রূপান্তরের জন্য প্রকৃতিকে সচেতন-ভাবে সহায়তা করিবে ইহা আর এখন অসম্ভব কিছু নয়। এমনিভাবের একটা আবেগ ও আকূতি তাহার মধ্যে ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে এবং আংশিকভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে যদিও বহিশ্চর মন এখনও পূর্ণরূপে ইহা বুঝিতে এবং স্বীকার করিতে পারে নাই; কিন্তু একদিন সে ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবে; সেদিন সে নিজের অন্তরের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হইবে এবং আমবা যাহাকে প্রকৃতি বলি, তাহার মধ্যে যাহা প্রকৃত গোপন সত্য সেই চিৎশক্তির প্রচ্ছন্ন বীর্য্য, তাহার অভিপ্রায়, সাধনোপায় ও কর্ম্মধারা আবিষ্কার করিবে।

প্রকৃতি-প্রগতির বাহ্য প্রতিভাস এবং স্থূল জগতের মধ্যে গৃহীত জন্মে

জড়দেহকে আশ্রয় করিয়া সত্তা ও চেতনার যে পরিণাম বাহিরে ফুটিয়া উঠিতেছে কেবল তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এ সমস্ত সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছিতে পারি। কিন্তু আর একটা ব্যাপার চলিতেছে আমাদের অগোচরে, সে ব্যাপার জন্মান্তরের মধ্য দিয়া জীবাত্মা এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উন্নীত হইতেছে এবং প্রত্যেক স্তরে তাহার দেহ ও মন সাধনযন্ত্ররূপে উচ্চতর ও সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই প্রগতির মধ্যে এমন কি সচেতন মনোময় সত্তারূপী মানুষের মধ্যেও চৈত্যসত্তা এখনও তাহার নিজের সাধনযন্ত্র মন, প্রাণ এবং দেহের আবরণে আবৃত হইয়া আছে; এখনও ইহা পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। এখনও প্রকৃতির প্রভু হইয়া সম্মুখে আসিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে দেওয়া হয় নাই, এখনও তাহাকে তাহার সাধনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ অনেকটা মানিয়া চলিতে বাধ্য হইতে হইতেছে, পুরুষ এখনও প্রকৃতির অধীন রহিয়াছে। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিসত্তার চৈত্য অংশ ইতর প্রাণী অপেক্ষা অনেক ক্ষিপ্রগতিতে প্রগতি-পথে অগ্রসর হইতে পারে, ক্রমে এক সময় আসে যখন তাহার অন্তরাত্মা তাহার নির্ম্মুক্ত প্রকাশের উপযোগী হইয়া আবরণের প্রান্তদেশে আসিয়া দাঁড়ায় এবং নিজের প্রাকৃতিক যন্ত্রসকলের প্রভু হইয়া উঠে। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে অন্তরবাসী ভগবদংশভূত চিন্ময় পুরুষের উন্মেষ আসন্ন হইয়াছে; যখন তাহার উন্মেষ হইবে তখন নিঃসন্দেহভাবে তাহা আমাদের মধ্যে দিব্যতর ও চিন্ময়তর এক জীবন বিকাশের প্রবল দাবী জানাইবে; এখনই মন যখন অন্তরস্থ চৈত্যসত্তার প্রভাবে আসিয়াছে তখন বস্তুতঃ তাহার উপর সে দাবী আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পার্থিবজীবনের প্রকৃতিতে মন যেখানে অবিদ্যার এক যন্ত্র, সেখানে এই দিব্যরূপান্তর—যাহার ফলে অজ্ঞানমূলক জীবন জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে—চৈতন্যের এক আমূল পরিবর্ত্তন দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে, তখনই ইহা সিদ্ধ হইবে যখন মনোময় চেতনা অতিমানসে রূপান্তরিত এবং প্রকৃতি অতিমানসের সাধনযন্ত্রে পরিণত হইবে।

এ জগৎ অবিদ্যাচ্ছন্ন বলিয়া এরূপ দিব্য রূপান্তর একেবারেই অসম্ভব, অথবা জগদতীত কোন দিব্যধামেই গিয়া কেবল সম্ভব হইতে পারে; চৈত্য-পুরুষের রূপান্তরের দাবী এবং আকূতি অজ্ঞানতাপ্রসূত; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের মধ্যে আত্মবিলোপই একমাত্র পুরুষার্থ—এ সমস্ত উক্তি অকাট্যভাবে প্রামাণিক নয়। এই সমস্ত সিদ্ধান্তকে একমাত্র প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত, যদি অবিদ্যাই জগৎসৃষ্টির একমাত্র তাৎপর্য্য এবং তাহার সমস্ত শক্তি এবং

উপাদান অবিদ্যা হইতে জাত হইত ; অথবা যে অবিদ্যাচ্ছন্ন মননশক্তি বর্ত্তমানে আমাদের উপর গুরুভার রূপে চাপিয়া বসিয়া আছে তাহাকে যাহার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তেমন কোন উপাদান আদৌ যদি না থাকিত। কিন্তু অবিদ্যা বিশ্বপ্রকৃতির একাংশ মাত্র, তাহার সবখানি নয়, অবিদ্যাই বিশ্বের মূল শক্তি নহে বা অবিদ্যা বিশ্বসৃষ্টি করে নাই ; উপরের দিক হইতে তাহার উৎপত্তির কথা বিচার করিলে দেখিব যে তাহা জ্ঞানের আত্মসঙ্কোচ হইতে জাত হইয়াছে ; এমন কি নীচের দিক হইতে দেখিলেও দেখা যাইবে জড়ের নিরেট নিশ্চেতনা হইতে যখন তাহা উন্মিষিত হইয়াছে তখন তাহা অবদমিত হইলেও চেতনারূপেই ফুটিয়াছে সে চেতনা নিজেকে জানিতে চায়, নিজেকে পাইতে সচেষ্ট জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে আকুল ; অস্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপে ইহাই তাহার স্বরূপ প্রকৃতি। বিশ্ব মনে আমাদের প্রাকৃত মননের উপরে এমন সব স্তর আছে যাহারা সত্য জ্ঞানেরই সাধন যন্ত্র, আমাদের মনোময় সত্তা এই সমস্ত স্তরে গিয়া পৌঁছিতে পারে ইহাও ঠিক ; কেননা এখনই অতিপ্রাকৃত অবস্থায় কখনও কখনও সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সে উঠিয়া যায়, আবার কখনও কখনও তথা হইতে বোধি, চিন্ময়জগতের খবর, যোগ-বিভূতি, অধ্যাত্ম আলোক বা শক্তির প্লাবন তাহার মধ্যে নামিয়া আসে অথচ তখনও সে সে-সমস্ত স্তরের খাঁটি পরিচয় জানে না অথবা সে-সমস্ত শক্তিকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। তাহাদের ঊর্দ্ধে যাহা আছে তাহার সম্বন্ধে এ সমস্ত স্তর সচেতন এবং তাহাদের ঊর্দ্ধতম স্তরটি সাক্ষাৎভাবে অতিমানসের দিকে উন্মীলিত ; যাহা ইহাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে সেই অতিমানস বা ঋতচিৎকে ইহা জানে। তাহা ছাড়া উন্মিষন্ত সত্তার মধ্যে চেতনার এই সমস্ত বৃহত্তর শক্তির আবেশ আছে, চিত্তবৃত্তির আড়ালে ভিত্তিরূপে অবস্থিত থাকিয়া তাহারাই মনোময় সত্যকে ধারণ করিয়া আছে ; অতিমানস এবং ঋতময় এই সমস্ত শক্তি তাহাদের গোপন আবেশে বিশ্বপ্রকৃতিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে ; এমন কি মনের সত্যও তাহাদেরই পরিণাম, সঙ্কুচিত ক্রিয়া বা বৃত্তি বা আংশিক রূপায়ণ মাত্র। অতএব মনঃশক্তি যেমন এখানে প্রাণ ও জড়ের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে তেমনভাবে সত্তার এ সমস্ত উচ্চতর শক্তিও মনের মধ্যে নামিয়া আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে—ইহা কেবল স্বাভাবিক নয়, মনে হয় যেন অপরিহার্য্য।

মানুষের অন্তরস্থ চিৎপুরুষের আত্মোন্মীলন এবং আত্মপ্রকাশের আকৃতিই

মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনের অভীপ্সারূপে দেখা দিয়াছে ; মানুষের আধারে নিহিত চিৎশক্তি এইভাবে পরের ধাপে প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজেকে রূপায়িত করিতে চায়। ইহা সত্য যে এই অভীপ্সা এ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ পরলোকের বা সত্তার পরার্দ্ধের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছে, এবং চরমে মনোময় ব্যষ্টিসত্তা আত্মবিলোপ ও আধ্যাত্মিক নেতিবাদের মধ্যেই নিজের পরম সার্থকতা খুঁজিয়াছে ; কিন্তু ইহা তাহার অভীপ্সার একটা দিক মাত্র, মৌলিক নিশ্চেতনার রাজ্য পার হইয়া দেহের বাধাকে অতিক্রম করিয়া তামসিকতাগ্রস্ত প্রাণ ও অবিদ্যাচ্ছন্ন মনকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অর্থাৎ ইহাদের সমস্ত বাধা বর্জন করিয়া প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ চিন্ময় সত্তার দিব্যভূমিতে আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীতেই মানুষের মধ্যে এই ইহবিমুখীনতা দেখা দিয়াছে। তাহার চিন্ময় অভীপ্সার অন্য ও ক্রিয়াশীল দিকটাও যে মানুষের নিকট হইতে মুছিয়া গিয়াছে তাহা নহে, প্রকৃতিকে চিন্ময়ভাবে বশীভূত ও রূপান্তরিত করিবার আকূতি, তাহার প্রাকৃত সত্তাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার ইচ্ছা, তাহার মন, হৃদয় এমন কি দেহকেও দিব্যভাবে বিভাবিত করিবার আস্পৃহাও মানুষের মধ্যে বর্ত্তমান আছে ; মানুষ স্বপ্ন দেখিয়াছে অথবা তাহার চৈত্যপুরুষ অনাগত ভবিষ্যৎকে দিব্যদৃষ্টি বলে জানিয়াছে যে মানুষেব ব্যষ্টিসত্তার রূপান্তরকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র পৃথিবীর এক দিব্য সার্থকতা দেখা দিবে, এই পৃথিবীতে ভাগবতশক্তি অবতীর্ণ হইবে, এক অভিনব স্বর্গ এক দিব্যধাম আসিয়া অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পৃথিবীকে নূতন রূপ দিবে ; এখানে শুধু মানুষের অন্তরেই নয়, তাহার বাহিরে সমষ্টিমানবের সংঘ-জীবনেও সিদ্ধপুরুষগণের আধিপত্য ও ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই আস্পৃহা মানুষের মধ্যে যতই অস্পষ্টভাবে রূপ নিক না কেন, তাহার মধ্যে পার্থিব প্রকৃতিতে গোপন চিন্ময় পুরুষ উন্মিষিত হইয়া উঠিবেন সেই আকূতি ও প্রবেগ যে রহিয়াছে ইহার নিদর্শনও তাহার মধ্যে যে আছে তাহা সুস্পষ্ট।

এই পৃথিবীতে এক চিৎপুরুষের আত্মোন্মীলনই যদি জড়জগতে আমাদের জন্মের গোপন অর্থ ও তাৎপর্য্য হয়, প্রকৃতির মধ্যে মূলতঃ চেতনার ক্রমাভি-ব্যক্তিই যদি চলিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমানে মানুষ যাহা হইয়াছে তাহাতে আসিয়া অভিব্যক্তি-ধারা শেষ হইয়া গিয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না ; নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে মানুষ চিৎসত্তার অতি অপূর্ণ অভিব্যক্তি ; মন নিজেই চেতনার একটা সঙ্কুচিত রূপায়ণ ও বাহন ; মন চেতনার এক মধ্যপর্ব্ব, মনোময়

সত্তা বৃহৎভাবের আর এক রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন সাধনের সময়কার প্রাণী। তাই মানুষ যদি তাহার মনন শক্তি পার হইয়া যাইতে অসমর্থ হয়, তবে তাহাকে অতিক্রম করিয়াই অতিমানস এবং অতিমানব আত্মপ্রকাশ করিবে এবং স্থষ্টির নায়ক ও চালক হইবে। কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাহা বর্ত্তমান আছে মন যদি তাহার দিকে নিজেকে খুলিয়া ধরিতে পারে তাহা হইলে এমন কোন কারণ নাই যাহাতে সে অতিমানস এবং অতিমানবতায় পৌঁছিতে পারিবে না, অন্ততঃপক্ষে এমন কিছু নাই যাহাতে প্রকৃতির মধ্যস্থ চিৎপুরুষের সেই উচ্চতর তত্ত্বের অভিব্যক্তির জন্য সে তাহার মন, প্রাণ এবং দেহকে উৎসর্গ করিতে পারিবে না।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ

যে যে ভাবে মানুষ আমার নিকট আসে আমি তাহাকে সেই সেই ভাবেই গ্রহণ করি। মানুষ সর্ব্বভাবে আমারই পথের অনুবর্ত্তন করে।......যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে যে রূপ বা যে যে তনু অর্চ্চনা করিতে চায় আমি তাহাতে সেই শ্রদ্ধাকে অচল করি; সে সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই সেই রূপের আরাধনা করে এবং তাহা হইতে আমার বিধানে কাম্যবস্তু লাভ করে। কিন্তু সে ফল সীমিত, যাহারা দেবতা বা ভূতগণের যজন করে তাহারা দেবতা বা ভূতগণকে প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা আমাকে ভজনা করে তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

গীতা ৪।১১, ৭।২১-২৩, ৯।২৫

ইহাদের মধ্যে বিস্ময় ও বীর্য্য দেখা দিল না, যাহা রহস্য বা গোপন সত্য তাহা অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের জন্য নহে।

ঋগ্বেদ ৭।৬১।৫

কবির মত সত্যের রহস্য এবং বিদ্যাকে আবিষ্কার করিয়া তিনি স্বর্গের সাতজন কারুর জন্ম দিলেন, তাহারা দিনের আলোকে কথা বলিল এবং তাহাদের জ্ঞানের বস্তু গড়িয়া তুলিল।

ঋগ্বেদ ৪।১৬।৩

কত রহস্যময় জ্ঞান কত গোপন বাণী কবির কাছে তাহাদের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করে।

ঋগ্বেদ ৪।৩।১৬

কেহ ইহাদের জন্মের কথা জানে না, তাহারা পরস্পরের জন্মধারা জানে; কিন্তু ধীর ব্যক্তিরা এসব রহস্য জানেন, যিনি মহাদেবী এবং বহুরূপা মাতা এই রহস্যরাজিই তাঁহার জ্ঞানস্তন্য।

ঋগ্বেদ ৭।৫৬।২, ৪

উচ্চতম অধ্যাত্ম বিদ্যার অর্থ সুনিশ্চিত তাহাদের কাছে—তাহারা শুদ্ধসত্ত্ব।

মুণ্ডক উপনিষদ ৩।২।৬

মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ

এই সমস্ত উপায়ে সাধন করিয়া যিনি বিদ্বান হন, তাঁহার মধ্যে এই আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন। জ্ঞানতৃপ্ত, কৃতাত্মা, ধীর ঋষিরা যুক্তাত্মা হইয়া সর্বগ ব্রহ্মকে সর্ব্বস্থানে প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বের মধ্যে প্রবিষ্ট হন।

মুণ্ডক উপনিষদ ৩।২।৪, ৫

প্রকৃতি-পরিণামের আদি কাণ্ডে আমরা তাহার নিশ্চেতনার নির্ব্বাক রহস্যের সম্মুখীন হই, তাহার কর্ম্মের মধ্যে কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য আছে মনে হয় না, যাহা লইয়া সে সাক্ষাৎভাবে অভিনিবিষ্ট, মনে হয় যাহা কেবল তাহার চিরদিনের একমাত্র কার্য্য, তাহার সেই আদি রূপায়ণ ছাড়া অন্য কোন তত্ত্বের কোন চিহ্ন বা আভাস তখন দেখা দেয় না, কেননা প্রকৃতির প্রথম কীর্ত্তিরূপে শুধু এক জড় প্রকাশ পায়, তাহাই একমাত্র নির্ব্বাক বিশ্বসত্য মনে হয়। এ বিসৃষ্টির একজন সচেতন অথচ ইহার মর্ম্ম রহস্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সাক্ষী যদি কেহ থাকিতেন তবে তিনি দেখিতেন যে আপাত অসতের বিপুল গহন হইতে জড়, এক জড়জগৎ এবং জড়বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিতে রত এক মহাশক্তি উত্থিত হইতেছে; সেই শক্তি নিশ্চেতনার অনন্তকে তাহার চতুর্দ্দিকের বিরাট দেশমধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া অসীম এক বিশ্ব বা অগণিত জগৎরাজি গড়িয়া তুলিতেছে অথচ সেই গড়িবার কোন সীমা বা নিশ্চিত উদ্দেশ্য তাহার চোখে পড়িতেছে না; এইভাবে অন্তহীন মহাকাশ জুড়িয়া যাহারা শুধু নিজের জন্য বর্ত্তমান আছে এবং যাহাদের কোন অর্থ নাই হেতু নাই লক্ষ্য নাই এমন কোটি কোটি নীহারিকা নক্ষত্রপুঞ্জ সূর্য্যসকল ও গ্রহগণের অবিশ্রান্ত সৃষ্টি বা উৎসারণ চলিতেছে। তাহার কাছে তখন মনে হইবে এক বিশাল মহাযন্ত্রের অর্থহীন প্রয়োজনশূন্য বিরাট আবর্ত্তন শুধু চলিতেছে, যুগ যুগান্তর ধরিয়া দর্শকহীন অবস্থায় কত বিচিত্র দৃশ্যের পর দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া চলিয়াছে কিন্তু এ বিরাট বিশ্ব ভুবনের কোন অধিকারী বা অধিবাসী নাই, কেননা মহা বিশাল বিশ্বের কোথাও কোন অন্তর্য্যামী পুরুষের বা যাহার আনন্দবিধানের জন্য প্রকৃতির এ অতি বিপুল আয়োজন এমন কোন সত্তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন তাহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইতেছে না। এই ধরণের সৃষ্টি শুধু এক নিশ্চেতন মহাশক্তি হইতে জাত অথবা উদাসীন অতিচেতন নির্ব্বিশেষ কোন চরম তত্ত্বের পটভূমিকায় প্রতিফলিত স্বরূপতঃ অলীক রূপরাজির একটা চলচ্চিত্র, একটা ছায়াবাজি বা পুতুলনাচ মাত্র। জড়ের এই অন্তহীন অমেয় প্রকাশক্ষেত্রে আত্মার কোন নিদর্শন, মন বা প্রাণের

কোন চিহ্নই তাহার সম্মুখে পড়িবে না। চিরকাল যাহা নিষ্প্রাণ ও সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া আছে বিশ্বের সেই মরুভূমির মধ্যে আদৌ প্রাণীজগতের বিপুল উচ্ছ্বাস যে দেখা দিবে, সজীব ও সচেতন অপ্রতর্ক্য রহস্যময় কোন কিছুর প্রথম স্পন্দন বা কোন অন্তর্গূঢ় চিন্ময় সত্তার বহিঃপ্রকাশের মন্থর অভিযান যে আরম্ভ হইবে—ইহা তখন তাহার নিকট অসম্ভব, এমন কি তাহার কল্পনারও অতীত বলিয়া বোধ হইবে।

সেই সাক্ষী বহুযুগ পরে আবার একদিন যদি এই অর্থশূন্য বিশ্বপটের উপর দৃষ্টি করেন—তবে হয়ত তিনি তখন দেখিতে পাইবেন যে ঐ জড়বিশ্বের অন্ততঃ এক কোণে যেখানে জড়শক্তি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার ক্রিয়ার ধারা যথাযথভাবে সংহত সুবিন্যস্ত ও দৃঢ়মূল হইয়াছে এবং অভিনব এক রূপায়ণের উপযুক্ত ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইখানে সজীব জড় দেখা যাইতেছে, জড়ের বুকে প্রাণের স্ফুরণ হইতেছে, প্রাণময় জগৎ দেখা দিতেছে; কিন্তু তিনি তখনও ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিবেন না; কেননা পরিণামশীল প্রকৃতি তখনও তাহার গোপন রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে নাই। তিনি দেখিতে পাইবেন যে প্রকৃতি তাহার এই নূতন সৃষ্টি এই প্রাণোচ্ছ্বাসকে শুধু সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত রহিয়াছে, সে-প্রাণ কেবল নিজের জন্যই বাঁচিয়া আছে, তাহার অন্য কোন অর্থ বা তাৎপর্য্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে না—তিনি দেখিবেন যে ক্রীড়াময়ী বিপুল সৃষ্টিশীলা প্রকৃতি তাহার নূতন শক্তির বীজ দিকে দিকে প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে, রূপবৈচিত্র্যের সুষমাময় অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য ও সমারোহ আপনার বুকে ফুটাইয়া তুলিতেছে অথবা শুধুমাত্র সৃষ্টির উল্লাসে অগণিত জাতি এবং উপজাতি (genus and species) ক্রমে গড়িয়া চলিয়াছে; তখন বিশাল বিশ্ব মরুর মাঝে জীবন এবং রং-এর ও গতির একটা স্পর্শ একটা ছোঁয়াচমাত্র চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহার চেয়ে বেশী আর কিছু তখনও দেখিবেন না। তখনও সে সাক্ষী কল্পনা করিতে পারিবেন না যে জীবনের এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে একদিন চিন্তাশীল মন আবির্ভূত হইবে, নিশ্চেতনার মধ্যে এক চেতনা জাগিয়া উঠিবে, এক নবতর বৃহত্তর এবং সূক্ষ্মতর স্পন্দন বহির্দ্দেশে ভাসিয়া উঠিবে এবং গভীর গহনে অবস্থিত আত্মার অস্তিত্বের পরিচয় আরো স্পষ্টভাবে উপস্থিত করিবে। তাহার কাছে প্রথমে মনে হইবে যে এইবার কেবল কোন উপায়ে প্রাণ নিজের সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারিয়াছে, ইহার বেশী আর কিছু নহে; কেননা মনে

হইবে যে নবজাত এই ক্ষুদ্র মন প্রাণেরই দাস, বাঁচিয়া থাকিবার, নিজের অবস্থা বজায় রাখিবার সহায়তার জন্য একটা কৌশল এবং যন্ত্র মাত্র ; এ যন্ত্রের কাজ অপরকে আঘাত করা এবং অপরের আঘাত হইতে নিজের আত্মরক্ষা, প্রাণের কোন তৃপ্তি এবং প্রয়োজন সাধন, প্রাণের সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের স্ফুরণ ও সার্থকতা সম্পাদন। তাহার কাছে ইহা কখনই সম্ভবপর বোধ হইবে না যে জড়ের মহাবিপুলতার মধ্যে অদৃশ্যপ্রায় এই ক্ষুদ্র প্রাণে, ক্ষুদ্র প্রাণের অগণ্য বাহিনীর একটিমাত্র উপজাতিতে এক মনোময় সত্তা উন্মিষিত হইয়া উঠিবে, এমন এক মন দেখা দিবে যে তখনও প্রাণের আজ্ঞাবহ হইয়াও পরে জড় ও প্রাণের প্রভু হইয়া দাঁড়াইবে ; নিজের ভাবনা ইচ্ছা ও সংকল্পের প্র পূরণ জন্য তাহাদিগকে ব্যবহার করিবে ; এই মনোময় সত্তা জড়ের উপাদানে কত প্রকার তৈজসপত্র, হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবে ও তাহাদের দ্বারা কতপ্রকার প্রয়োজন সাধন করিবে, রচনা করিবে কত নগর কত সৌধ কত মন্দির, প্রেক্ষাগৃহ, বীক্ষণাগার ও শিল্পশালা ; গড়িয়া তুলিবে পাথর কুঁদিয়া মূর্ত্তি, পাহাড় খুঁড়িয়া চৈত্যগুহা বা ধর্ম্মমন্দির ; স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, চিত্রে, শিল্পে, কারুকলায়, কাব্যে তাহার প্রতিভা ও সৃজনীশক্তির দিবে বিপুল পরিচয় ; পদার্থবিদ্যা ও গণিতের সাহায্যে বিশ্বরহস্য ও তাহার গোপন গঠনপ্রণালী করিবে প্রকাশ ; মনের উৎকর্ষসাধন এবং তাহার বহুবিচিত্র চিন্তাধারা, জ্ঞান ও ভাবনারাজির জন্য জীবনকে করিবে উৎসর্গ, মনস্বী ভাবুক বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের উচচ আসন করিবে অলঙ্কৃত, অবশেষে জড়ের প্রভুত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়া নিজের মধ্যে গোপনে অবস্থিত পরম দেবতাকে তুলিবে জাগাইয়া, ইন্দ্রিয়াতীত পরম রহস্যময় চিন্ময় তত্ত্বের তুঙ্গ শিখরে পৌঁছিবার জন্য পাগল হইয়া চলিবে ছুটিয়া।

আবার বহু যুগের পর সেই সাক্ষী যদি পুনরায় জগতের দিকে দৃষ্টি দেন তবে দেখিবেন একদিন তাঁহার কাছে যাহা অভাবনীয় ছিল মানুষের এই মনোময় ঐশ্বর্য্যের সেইরূপ এক বিকাশ হইলেও, জড়ই বিশ্বের একমাত্র সত্য বস্তু তাহার এই যে প্রথম অনুভূতি হইয়াছিল, হয়তো তখনও সেই ধারণা দ্বারা আচ্ছন্ন আছেন বলিয়া এ সমস্তের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে তিনি সমর্থ হইবেন না ; গোপন চিৎ-পুরুষ তাহার পূর্ণ প্রস্ফুট চেতনা লইয়া আত্মবিৎ এবং সর্ব্ববিৎরূপে প্রকৃতির প্রভু ও শাস্তা হইয়া এই জগতে আসিয়া দেখা দিবেন এবং বাস করিবেন—এ সম্ভাবনার কথা তখনও তাঁহার মনে জাগিবে

না। তিনি হয়তো বলিবেন, "এ সব অসম্ভব, জড় বিশ্বে তেমন আর বেশী কি ঘটিয়াছে? মস্তিষ্কে সংবেদনশীল একটু ধূসর উপাদান শুধু জলবিম্বের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে, নিষ্প্রাণ জড়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক বিন্দুতে প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল বা সখ জাগিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তিলমাত্র স্থানের মধ্যে বিচরণ করিতেছে।" পক্ষান্তরে এই সমস্ত ঘটিবার পর, সৃষ্টির আদিকাণ্ডের মায়াজালে যাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় নাই যদি তেমন একজন নূতন সাক্ষী এই কাহিনীর শেষভাগে আসিয়া পৌঁছেন এবং অতীত পরিণামধারা যদি অবগত হন তবে তিনি হয়তো বলিয়া উঠিবেন, "আহা, বহু চমৎকারের মধ্য দিয়া এই চরম চমৎকার ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যই প্রকৃতির মধ্যে ছিল— যে চিৎপুরুষ নিশ্চেতনার গহনে অন্তর্লীন হইয়াছিলেন তিনি নিশ্চেতনাকে বিদীর্ণ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন এবং রূপের আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া জগতে অভিব্যক্ত হইতেছেন এবং বাস করিতেছেন, এই রূপের জগৎকে তিনিই তো তাঁহার নিজের প্রকাশক্ষেত্র তাঁহার আত্মপ্রকাশের রঙ্গালয়রূপে গোপনে গড়িয়া তুলিয়াছেন।" কিন্তু বস্তুতঃ পূর্ব্বের সাক্ষীর দৃষ্টি আরও গভীর এবং স্বচ্ছ থাকিলে এই যে ক্রমবর্দ্ধমান প্রকাশ-লীলা চলিতেছে তাহার প্রথমদিকে এমন কি এই ধারাব প্রতি পর্ব্বে ইহার উদ্দেশ্য ও আকৃতি তাঁহার কাছে কতকটা ধরা পড়িত; কেননা প্রতি পর্ব্বে প্রকৃতির রহস্য গোপন থাকিলেও রহস্যের গাঢ় অন্ধকার কমিয়া আসিতে থাকে, প্রতি পদক্ষেপে পরবর্ত্তী পদক্ষেপের আভাস ও ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠে, যে পর্ব্ব আসিতেছে তাহার জন্য আয়োজন স্পষ্টতরভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাই যে প্রাণ অচেতন মনে হয় তাহার মধ্যেও ইন্দ্রিয়-সংবেদনের আসন্ন বহিঃপ্রকাশের লক্ষণ যেন দেখা যায়; যে প্রাণ গতিশীল হইয়াছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্য দিয়া যাহার ক্রিয়া চলিতেছে তাহার মধ্যে সংবেদনশীল মননের উন্মেষের প্রস্তুতি স্পষ্টতর হইয়াছে এবং চিন্তাশীল মননক্রিয়ার উপযোগী আয়োজন যে চলিতেছে তাহা আর পূর্ণরূপে গোপন নাই; আবার মননশীল মনের স্ফুরণ এবং পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অবস্থায়ই অধ্যাত্ম-চেতনার প্রাথমিক বা অপরিণত আকৃতি দেখা দেয় এবং তাহার পর ক্রমশঃ তাহা বাড়িয়া চলে। যেমন দেখা যায় উদ্ভিদ-জীবনেব মধ্যে সচেতন পশু-চেতনার অস্পষ্ট সূচনা রহিয়াছে, আবার পশুর মনে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে ইন্দ্রিয়-সংবিৎ এবং অনুভূতির স্পন্দন ও ধারণা বা সামান্য-ভাবনার আভাস, যাহা চিন্তা ও বিচারশীল মনের প্রাথমিক উপাদান; ঠিক তেমনিভাবে উদ্ধ্বপরিণামিনী প্রকৃতির তপস্যা ও

সাধনার বলে মননধর্ম্মী মানুষ উন্নত হইবে এবং তাহার মধ্য হইতে পূর্ণ সচেতন চিন্ময় মানুষ উদ্ভূত হইবে, যে মানুষ তাহার প্রাথমিক জড় আত্মাকে অতিক্রম করিয়া তাহার পরম আত্মা এবং পরমা প্রকৃতিকে আবিষ্কার করিবে।

ইহাই যদি প্রকৃতির লক্ষ্য ও আকৃতি হয় তাহা হইলে দুইটি প্রশ্ন উঠে, তাহাদের নিশ্চিত উত্তর পাওয়া প্রয়োজন, প্রথম প্রশ্ন মনোময় সত্তার চিন্ময় সত্তাতে বিবর্ত্তনের প্রকৃত স্বরূপ কি? এ প্রশ্নের উত্তর পাইলে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, এই বিবর্ত্তনের ধারা কিম্বা রীতি কি? প্রথম দৃষ্টিতেই ইহা স্পষ্ট মনে হয় যে প্রকৃতি-পরিণামের প্রতি পর্ব্ব শুধু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্ব হইতে নহে পরন্তু সেই পর্ব্বের মধ্যেই উদ্ভূত হয়; জড়ের মধ্যে যে প্রাণের স্ফুরণ হয় তাহার আত্মপ্রকাশ জড়দেহের নিমিত্ত বা অবস্থা দ্বারা বহুল পরিমাণে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, আবার যখন প্রাণময় জড়ের মধ্যে মন ফুটিয়া ওঠে তখন তাহারও প্রকাশ ঠিক একই ভাবে প্রাণ ও জড়ের পরিবেশ দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, একই রীতিতে যখন সজীব জড়দেহ মধ্যস্থ মনে চিৎসত্তার উন্মেষ হইবে তখন তাহার আত্মপ্রকাশ যে মনের মধ্যে তাহার মূল নিহিত আছে সেই মনের নিমিত্ত বা অবস্থা দ্বারা শুধু নয় পরন্তু এখানকার প্রাণ ও জড়ের পরিবেশ দ্বারাও বহুল পরিমাণে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। এমনও বলা যাইতে পারে যে আমাদের মধ্যে চিন্ময়-পরিণাম যদি কিছু ঘটে তাহা মনোময় পরিণামেরই অংশ, তাহা মানুষের মনন-ধর্ম্মেরই একটা বিশেষ ব্যাপার; মানুষের মধ্যস্থ চিন্ময় উপাদান একটা সুস্পষ্ট বা বিবিক্ত বস্তু নহে অতএব স্বতন্ত্রভাবে তাহার স্ফুরণ বা ভবিষ্যতে অতিমানসের অভিব্যক্তি সম্ভব নহে। মনোময় সত্তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরাগ এবং অভিনিবেশ দেখা দিতে পারে, তাহার ফলে চিন্ময় ও বুদ্ধিময় এক মনও হয়ত উন্মিষিত হইতে পারে কিন্তু তাহা মনোময় জীবনেই সুষমাময় আত্মারূপ ফুল (soul-flower) ফোটানো ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন কোন কোন মানুষের মধ্যে শিল্প বা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকিতে পারে তেমনি অপর কাহারও মধ্যে হয়ত আধ্যাত্মিকতার দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকিবে; কিন্তু তাহা বলিয়া কোন চিন্ময় পুরুষ মনোময় সত্তাকে অধিকার করিয়া তাহার মনোময় প্রকৃতিকে চিন্ময় প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করিবে ইহা সম্ভব মনে হয় না। পরিণামধারার মধ্যে খাঁটি চিন্ময় কোন সত্তার আবির্ভাব হইতে পারে না; কেবল তাহার মনোময় সত্তায় একটা নবতর এবং সম্ভবতঃ সূক্ষ্মতর ও দুর্লভতর এক ধর্ম্মের স্ফুরণ শুধু হইতে পারে। এই ভাবের

সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ করিয়া জানিতে ও বুঝিতে হইবে চিন্ময় এবং মনোময় প্রকৃতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য কি বা কোথায়, চিন্ময় পরিণামের স্বরূপ কি এবং তাহার মধ্যে কি কি উপাদান বা কারণ থাকাতে চিৎসত্তার নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকৃতি লইয়া আত্মপ্রকাশ করা শুধু সম্ভব নয় পরন্তু অপরিহার্য্য হইবে, বুঝিতে হইবে কেন চিৎসত্তা একটা নূতন শক্তিরূপে স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে বিশেষিত করিয়া আমাদের মনোময় সত্তার উপরে স্থানলাভ করিবে এবং আমাদের প্রাণ ও প্রকৃতির নিয়ন্তা হইয়া দাঁড়াইবে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের ধরণে বা উন্মেষের রীতিতে যেমন তাহা মননশক্তির এক গৌণ ধর্ম্ম বা প্রধান এক বৈশিষ্ট্যমাত্র মনে হইতেছে—কেন তাহা আর থাকিবে না।

ইহা খুবই সত্য যে বাহির হইতে দেখিলে প্রাণকে জড়ের এবং মনকে প্রাণের এক ক্রিয়াধারা মনে হয়, তাই মনে হইতে পারে যে যাহাকে আমরা অন্তরাত্মা বা চিৎসত্তা বলি তাহা শুধু মননেরই এক শক্তি, মনেরই এক সূক্ষ্ম বিগ্রহ, এবং আধ্যাত্মিকতা দেহধারী মনোময় সত্তার এক উচ্চ ক্রিয়াধারা মাত্র। কিন্তু এ ধারণা শুধু আমাদের বহির্ম্মুখী দৃষ্টির ফল, প্রতিভাস এবং ক্রিয়াধারাতে শুধু অভিনিবিষ্ট থাকাতে এবং যাহা তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে তাহার দিকে দৃষ্টি না দেওয়াতে এ ধারণা জন্মিয়াছে। মেঘ হইতে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয় দেখিয়া কেহ হয়তো মনে করিতে পারে যে বিদ্যুৎ জল এবং মেঘের একটা ক্রিয়াধারা এবং তাহা হইতে জাত বস্তু, কিন্তু পক্ষান্তরে গভীরতর গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে জল ও মেঘ এ উভয়েরই ভিত্তি বা মূলে রহিয়াছে বৈদ্যুতিক শক্তি, বিদ্যুৎই তাহাদের উপাদানীভূত শক্তি বা বস্তু-বীর্য্য; যাহাকে কার্য্য বা পরিণাম বোধ হইতেছে দৃশ্যতঃ না হইলেও বস্তুতঃ তাহাই মূল উৎপত্তিস্থান, আপাত দৃষ্টিতে যাহা কারণ বোধ হইতেছে মূলতঃ তাহারই মধ্যে আজ যাহা পরিণাম বোধ হইতেছে তাহা ছিল, ক্রিয়ার মধ্য দিয়া যে তত্ত্ব বর্ত্তমানে স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে তাহা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। পরিণামশীল প্রকৃতির সর্ব্বত্র এই বিধান খাটে, জড়ের মূল উপাদানরূপে যদি প্রাণতত্ত্ব না থাকিত তবে জড় সজীব হইয়া উঠিত না, জড়ের মধ্যে প্রাণের উন্মেষ দেখা দিত না। আবার জড়ের মধ্যস্থিত প্রাণে সংবেদনা অনুভূতি চিন্তা ও বিচারশক্তি প্রকাশ পাইত না যদি প্রাণ এবং জড়ের পশ্চাতে তাহাদিগকে নিজের ক্রিয়ার ক্ষেত্ররূপে স্বীকার করিয়া লইয়া অন্তর্গূঢ়ভাবে মনস্তত্ত্ব বর্ত্তমান না থাকিত

এবং সজীব দেহে মননরূপে ফুটিয়া না উঠিত ; তেমনি মনে যে আধ্যাত্মিকতা স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে তাহা এমন শক্তির নিদর্শন যাহা নিজেই প্রাণ মন এবং দেহের মূল উপাদানরূপে আছে এবং তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার পর এখন তাহাই মনোময় জীবন্ত দেহে চিন্ময় সত্তারূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। এই অভিব্যক্তি কতদূর প্রসারিত হইবে, এবং ইহাই আমাদের প্রকৃতির প্রভু হইয়া নিজের সাধনযন্ত্রকে রূপান্তরিত করিবে কি না তাহা পরের প্রশ্ন ; প্রথমে আমাদিগকে এই তথ্যটি মানিতে হইবে যে চিদ্বস্তু এমন কিছু যাহা মন হইতে ভিন্ন এবং তাহা হইতে বৃহত্তর, বুঝিতে হইবে আধ্যাত্মিকতা মনন ধর্ম্ম হইতে পৃথক কিছু, সুতরাং চিন্ময় সত্তাও মনোময় সত্তা হইতে বিভিন্ন কোন বস্তু ; চিৎসত্তা পরিণাম-ক্ষেত্রে সর্ববশেষে স্ফুরিত হয়, কেননা সংবৃতি (involution) ধারায় তাহাই ছিল আদি উপাদান বা প্রথম তত্ত্ব। পরিণামধারায় সংবৃতিধারার বিপরীত মুখে ক্রিয়া চলে, সংবৃতিব শেষ পর্ব্বে যাহা দেখা দেয় বিবৃতি বা পরিণামে তাহাই আদিপর্ব্ব রূপে উপস্থিত হয আবার যাহা সংবৃতির আদি ও প্রাথমিক বস্তু বিবৃতির ক্ষেত্রে তাহাই হইবে চরম ও পরম স্ফুরণ।

আবার ইহাও সত্য যে মানুষের মনের পক্ষে তাহাব মধ্যস্থিত অন্তরাত্মা বা কোনো চিন্ময় উপাদানকে, যাহাদেব মধ্যে তাহাদেব প্রথম প্রকাশ হয় সেই মনোময় ও প্রাণময় বৃত্তিসমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া দেখা অতি কঠিন ; অবশ্য চিদ্‌বস্তুর সম্পূর্ণ স্ফুরণ না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু একথা খাটে। পশুর মনের মাতৃরূপা প্রাণ এবং প্রাণময জড় হইতে তাহাব মন সম্পূর্ণ পৃথক-রূপে কখনও দেখা দেয় না, তাহাব প্রাণ-ক্রিয়ার সঙ্গে মনেব ক্রিযা এমন জড়িত হইয়া আছে যে পশু তাহাদিগের নিকট হইতে নিজেকে পৃথক কবিতে পৃথক রাখিতে অথবা পৃথকরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে না ; কিন্তু মানুষের বেলায় মন পৃথক হইয়াছে, তাহার মনের ক্রিযাসকলকে তাহার প্রাণের ক্রিয়াসকল হইতে পৃথক করিয়া সে দেখিতে পারে ; তাহার চিন্তা এবং সঙ্কল্প তাহার ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং আবেগ কামনা ও বেদনার প্রতিক্রিয়া হইতে নিজদিগকে পৃথক করিয়া, পৃথক থাকিয়া তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ এবং শাসন কবিতে পারে, তাহাদের ক্রিয়াধারা অনুমোদন ও প্রত্যাখ্যান কবিতে পারে ; অবশ্য নিজেকে দেহ ও প্রাণের মধ্যে অবস্থিত মনোময সত্তারূপে যাহাতে নিশ্চিত ও নিঃসংশয়রূপে বুঝিতে পারে, তাহার নিজের সত্তার সেই গোপন রহস্য

তেমনভাবে বা ততটা এখনও সে জানিতে পারে নাই ; কিন্তু এমনিভাবের একটা সংস্কার তাহার মধ্যে আছে এবং অন্তরের মধ্যে নিজেকে সেই অবস্থায় স্থাপিত করিতে পারে। একইভাবে মানুষের মধ্যে অন্তরাত্মাকে প্রথমে মন এবং মনবাসিত প্রাণ হইতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত কিছু বলিয়া বোধ হয় না ; তাহার গতিবৃত্তি মন ও প্রাণের গতিবৃত্তির সঙ্গে জড়ীভূত হইয়া থাকে, তাহার ক্রিয়াধারা মনোময় এবং আবেগময় ক্রিয়া বলিয়াই মনে হয় ; তাই মনোময় মানুষ ইহা জানে না যে তাহার মধ্যে মন প্রাণ এবং দেহের পশ্চাতে এক অন্তরাত্মা বা চৈত্য সত্তা অবস্থিত আছেন এবং তিনি নিজেকে মন প্রাণ দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহাদের ক্রিয়া ও রূপায়ণ পর্য্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ ও গঠন করিতেছেন ; কিন্তু অন্তরের দিকে মানুষ যতই পরিণত হইতে থাকে ততই এ জ্ঞান তাহার মধ্যে ফুটিতে পারে এবং ফুটিয়া থাকে—এ ফোটা অপরিহার্য্য ; আমাদের প্রকৃতি পরিণামের যে নিয়তি আছে তাহাতে বহুবিলম্বিত এই পরবর্ত্তী সোপান উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এমন একটা চূড়ান্ত স্ফুরণ হইতে পারে যখন আমাদের সত্তা আপনাকে চিন্তা বা ভাবনা হইতে পৃথক করিয়া অন্তরের এক নৈঃশব্দ্যের মধ্যে নিজেকে মনের অধিষ্ঠাতা চিৎসত্তা বলিয়া দেখিতে ও বুঝিতে পারে, অথবা প্রাণের গতি ও বৃত্তি, বাসনা, সংবেদন, সক্রিয় আবেগ হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া জানিতে পারে যে সে নিজেই চিৎসত্তারূপে প্রাণকে ধারণ করিয়া আছে অথবা দেহবোধ হইতে বিযুক্ত হইয়া অনুভব করিতে পারে সে নিজেই জড়ের অন্তরাত্মা রূপে অবস্থিত আছে ;—ইহা হইল আমাদের নিজদিগকে পুরুষরূপে জানা, জানা যে আমরা মনোময় পুরুষ প্রাণময় পুরুষ এবং দেহকে ধারণ করিয়া অবস্থিত অন্নময় পুরুষ। এই অবস্থা লাভ হইলে আমাদের খাঁটি আত্মাকে যথেষ্ট পরিমাণে জানা হইয়া গেল ইহা অনেকে মনে করিতে পারে, এক হিসাবে কথাটা ঠিক ; কেননা প্রকৃতির ক্রিয়া সম্বন্ধে চিৎপুরুষ নিজেকে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পুরুষের এই আবেশ বা আবির্ভাবের ফলে আমাদের চিন্ময় উপাদান মুক্ত ও প্রকাশিত হয় ; কিন্তু আত্মোপলব্ধি আরও অগ্রসর হইতে পারে, ইহা রূপের বা প্রকৃতির ক্রিয়াধারার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধবিবর্জিত হইতেও পারে। কেননা দেখা যায় যে এই মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় পুরুষ, দেহ মন প্রাণ যাহার রূপ এবং সাধনযন্ত্র এমন এক দিব্য সত্তারই বিভূতি ; এ দৃষ্টি লাভ হইলে অনুভব করিতে পারি যে আমাদের অন্তরাত্মাই প্রকৃতির দ্রষ্টা, আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে সমস্ত ক্রিয়াধারা চলিতেছে তিনি তাহার জ্ঞাতা,

তবে সে জানা মনের পর্য্যবেক্ষণ বা অনুভূতি দিয়া জানা নহে, তাহা স্বরূপগত এক চেতনার, তাহার অপরোক্ষ ও সাক্ষাৎ বোধ শক্তির এবং তাহার খাঁটি অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা জানা ; তাই এ চেতনার স্ফুরণের ফলে আমাদের অন্তরাত্মা আমাদের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত এবং রূপান্তরিত করিতে সক্ষম হয়। যখন আমাদের সত্তার মধ্যে এক পূর্ণ নৈঃশব্দ্য জাগিয়া ওঠে, যখন আমাদের সমগ্র সত্তা নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া যায় অথবা তাহা যখন বাহ্য গতি ও ক্রিয়ার পশ্চাতে এবং তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া এক পরম নীরবতায় সমাহিত থাকে, তখন আমরা এক চিন্ময় আত্মাকে বা আমাদের এমন এক আত্মস্বরূপকে জানিতে পারি যিনি ব্যষ্টি অন্তরাত্মাকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বাত্ম ভাবনায় পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, প্রকৃতির সকল রূপায়ণ ও ক্রিয়াধারার অধীনতা হইতে নির্মুক্ত হইয়া যাহার কোন শেষ দেখা যায় না উর্দ্ধস্থিত সেই বিশ্বাতীতের মধ্যে আত্মবিস্তার করিয়া বর্ত্তমান আছেন। আমাদের সত্তার এই চিন্ময় মুক্তি প্রকৃতির মধ্যে চিৎপরিণামের নিশ্চিত এবং অপরিহার্য্য ধারা।

এই সমস্ত চূড়ান্ত বিপ্লবাত্মক ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়াই শুধু পরিণামধারার খাঁটি প্রকৃতি স্পষ্ট হইয়া উঠে ; কেননা তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলে শুধু প্রস্তুত হওয়ার আয়োজন ; দেহ মন প্রাণে যাহাতে আত্মার খাঁটি ক্রিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে তজ্জন্য তাহাদের উপর পড়ে চৈত্যসত্তার একটা চাপ, অহন্তা এবং বহিশ্চর ক্ষেত্রের অবিদ্যার পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য অন্তরাত্মা বা চিৎসত্তা হইতে আসে একটা তাগিদ, কোন গোপন সত্যবস্তুর দিকে মন ও প্রাণ শুধু ফিরিয়া দাঁড়ায়, আসে কিছু কিছু প্রাথমিক অনুভূতি, দেখা দেয় চিন্ময় মন ও চিন্ময় প্রাণের একটা আংশিক রূপায়ণ, কিন্তু তখন পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন সাধন করা সম্ভব হয়না, অন্তরাত্মার উপরের আবরণ সম্পূর্ণ সরিয়া যাইবার অথবা প্রকৃতিকে আমূল রূপান্তরিত করিবার কোন সম্ভাবনা আসে না। চূড়ান্ত যে স্ফুরণে পূর্ণ মুক্তি দেখা দেয় তাহার একটি লক্ষণ এই হয় যে তখন আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রকৃতিসিদ্ধ এক স্বয়ম্ভূ-চেতনার স্থিতি বা ক্রিয়া অভিব্যক্ত হয় ; যে চেতনার মধ্যে আত্মজ্ঞান নিজ হইতেই সত্তার স্বাভাবিক তথ্যরূপে প্রকাশ পায়, এইভাবে একত্ববোধের দ্বারা নিজের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা জানিতে পারে, এমন কি যাহা আমাদের মনের কাছে বাহিরে স্থিত বলিয়া বোধ হয় তাহাকেও সেইভাবে একত্ববোধের বৃত্তি দিয়া দেখিতে ও জানিতে আরম্ভ করে, তখন স্বরূপগত এক সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ চেতনা, বস্তু বা বিষয়কে চারিদিক

হইতে ঘিরিয়া ধরিয়া এবং তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করিতে এবং তাহার মধ্যে যাহা মন বা প্রাণ বা দেহ নয় এমন অনির্ব্বচনীয় কিছুর সম্বন্ধে সচেতন হইতে থাকে। তাহা হইলে ইহা হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে মনোময় চেতনা হইতে পৃথক এক চিন্ময় চেতনা আছে এবং আমাদের বহিশ্চর মনোময় ব্যক্তিসত্তা ছাড়া আমাদের মধ্যে এক চিন্ময় সত্তার অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু প্রথমে এ চেতনা আমাদের অবিদ্যাচ্ছন্ন বহিশ্চর প্রকৃতির ক্রিয়া হইতে বিযুক্ত এবং পৃথক হইয়া একটা নিষ্ক্রিয় স্থিতিতে শুধু সীমিত থাকিতে পারে যেখান হইতে প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্যকে কেবল সে পর্য্যবেক্ষণ করিবে, তখন নিজেকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে, চিন্ময় বোধে অথবা সত্তার দিব্যদৃষ্টির মধ্যে শুধু নিবদ্ধ রাখিবে। ক্রিয়ার জন্য তখনও তাহাকে দেহ প্রাণ মন রূপী যন্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হইতে পারে, অথবা সে তাহাদিগকে নিজপ্রকৃতি অনুসারে ক্রিয়া করিতে দিয়া নিজে আত্মানুভবে এবং আত্মজ্ঞানে এক আন্তর মুক্তি এবং চরম স্বতন্ত্রতার মধ্যে তৃপ্ত থাকিতে পারে; কিন্তু অধ্যাত্ম-চেতনার ইহাই একমাত্র রূপ নহে, এ চেতনা আমাদের চিন্তা ভাবনা প্রাণের বৃত্তি, দেহের ক্রিয়ার উপরও কতকটা প্রভুত্ব কতকটা শাসন ও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং সাধারণতঃ করিয়াই থাকে; বলপূর্ব্বক এ সমস্তকে সংস্কৃত এবং ঊর্দ্ধমুখে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদের নিজেদেরই উচ্চতর ও শুদ্ধতর সত্যের মধ্যে তুলিয়া ধরিতে পারে, অথবা এ চেতনার অনুশাসনে প্রাণ মন তখন কোন দিব্যতর শক্তি প্রপাতের নিমিত্ত বা অনুবর্ত্তী হইবে, অথবা তাহা এক জ্যোতির্ম্ময় পরম বস্তুর দিকে তাহাদিগকে চালিত করিবে, যে চালনা মনোময় নয়, চিন্ময় এবং কোন এক দিব্য ধর্ম্ম দিয়াই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—সে চালনা আসিবে এক বৃহত্তর ও মহত্তর আত্মার অনুপ্রেরণা বা সকল সত্তার অধিপতি ঈশ্বরের আদেশ হইতে। অথবা প্রকৃতি চৈত্যসত্তার নির্দ্দেশ মানিয়া অন্তরের আলোকে অন্তর্য্যামীর পরিচালনা অনুসারে চলিতে পারে। এ অবস্থা আসিলে বুঝিতে হইবে যে পরিণামের পথে আমরা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি এবং চৈত্য ও চিন্ময় রূপান্তর অন্ততপক্ষে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আরও অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা আছে ; কেননা চিন্ময় সত্তা ভিতরে একবার মুক্ত হইলে যাহা তাহার স্বাভাবিক পরিবেশ এমন উচ্চতর স্তর মনের মধ্যেই গড়িয়া তুলিতে এবং ঋত-চিতের প্রকাশের উপযোগী অতিমানস শক্তি এবং ক্রিয়াধারা নামাইয়া আনিতে পারে ; এই শক্তিপ্রবাহের ফলে প্রাকৃত মন প্রাণ দেহ রূপী সাধন যন্ত্রের পূর্ণ

রূপান্তর সাধিত হইতে পারে, তখন দেহ মন প্রাণ অবিদ্যার—তাহা যতই জ্যোতিরুদ্ভাসিত হউক না কেন—অংশ আর থাকিবে না, তখন তাহারা অতিমানস সৃষ্টির অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইবে এবং চিন্ময় অতিমানস চেতনার সত্য ও জ্ঞানের খাঁটি ক্রিয়াধারায় পরিণত হইবে।

মানুষের মন প্রথমেই চিৎসত্তা এবং অধ্যাত্মচেতনার এই সত্য স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেনা ; তাহার মধ্যে একটা মানসপ্রত্যয় আসে, যাহাতে সে তাহার আত্মাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র, তাহাব সাধারণ মন এবং প্রাণ হইতে উচ্চতর কিছু বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহার কোন স্পষ্ট বোধ তাহার মধ্যে জাগে নাই, তাহার প্রকৃতির উপর আত্মার কিছু কিছু প্রভাব পড়িয়াছে এই অনুভূতিটুকু মাত্র তাহার আছে। তাহার কাছে এই সমস্ত প্রভাব মনোময় কিম্বা প্রাণময় বৃত্তির আকারে ফোটে, উভয়েব পার্থক্য গভীর ও তীক্ষ্ণরূপে দেখা দেয় না, আত্মার বোধ উজ্জ্বল এবং স্বতন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত হয়না। আমাদের খাঁটি আত্মাতে স্বরূপতঃ বিশ্বচেতনা এবং ব্যষ্টিচেতনা উভয়ই বর্ত্তমান থাকিলেও, আমাদের বিবিক্ত অহং-চেতনাকে যেমন আমরা আমাদের আত্মা বলিয়া ভুল করি তেমনি বস্তুতঃ প্রাণ ও মনের উপর চৈত্যসত্তার অপূর্ণ প্রভাব ও আবেশ পড়িবার ফলে মনের আস্পৃহা এবং প্রাণেব বাসনা মিশ্রিত একটা জটিল রূপায়ণকে আমরা আমাদের অন্তরাত্মা বলিয়া প্রায়ই ভ্রমে পতিত হই ; তেমনিভাবে অনেক সময় কোন প্রকার দৃঢ় ও গভীর শ্রদ্ধা কি বিশ্বাস দ্বারা উদ্দীপ্ত অথবা আত্মোৎসর্গ বা লোক হিতৈষণাব উন্মাদনার বশে জাগ্রত মনের আস্পৃহা এবং প্রাণের আবেগ ও উৎসাহের একটা মিশ্রিত ভাবকে ভুল করিয়া প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা বলিয়া মনে করি। কিন্তু প্রকৃতি পরিণামের পথে অস্থায়ী সোপান রূপে এই সমস্ত গোলযোগ এবং অস্পষ্টতা উপস্থিত হওয়া অপরিহার্য্য ; কেননা অবিদ্যা হইতেই এ অভিযান আরম্ভ হইয়াছে এবং যখন আমাদের প্রকৃতি প্রথম দিকে অবিদ্যার প্রায় সম্পূর্ণ বশে রহিয়াছে তখন সাধনালব্ধ অনুভূতি বা নির্ম্মল জ্ঞানের অভাবে আমাদের অগ্রগতি অপূর্ণ বোধিচেতনা এবং সহজাত প্রবৃত্তি বা এষণা দ্বারা যে পরিচালিত হইতে বাধ্য তাহা বুঝা কঠিন নহে। এমন কি চিন্ময় পরিণামের সূচনায়, চিন্ময় অনুভূতি ও আবেগের ফলে যে সমস্ত রূপায়ণ দেখা দেয় অথবা যাহাদের মধ্যে চিন্ময় পরিণামের প্রথম চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় তাহাদের মধ্যেও এইভাবের অপূর্ণতা এবং অনিশ্চয়তা থাকিয়া যাওয়াও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ভাবে যে সমস্ত ভুল

জাত হয় তাহারা সত্য জ্ঞান এবং বোধের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং এ-কথা জোর করিয়া বলিতে হইবে যে বুদ্ধির অত্যুৎকর্ষ, আদর্শবাদ (idealism) মনের নীতিপরায়ণতা বা নৈতিক পবিত্রতা ও তপশ্চর্য্যা, ধর্ম্মভাব বা উচ্ছ্বসিত উচচ ভাবোন্মাদ—এই সমস্ত সদ্‌বৃত্তির কোনটা বা এমন কি এতগুলি সদ্‌বৃত্তির একত্র সমাহার প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা নহে ; মনের কোন বিশ্বাসের, কোন বিশেষ মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা বা আস্থার, ভাবুকের উচ্চমুখী ব্যাকুলতার অথবা আচার, ধর্ম্ম বা নৈতিক বিধানের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুবর্ত্তনের অর্থও আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা সিদ্ধিলাভ নহে। প্রাণ ও মনের পক্ষে এ সমস্ত খুবই মূল্যবান বস্তু, চিন্ময় পরিণামে উদ্যোগ পর্ব্বের আয়োজনের জন্য গতি ও ক্রিয়া রূপে ইহাদের যথেষ্ট মূল্য আছে, শিক্ষা এবং সংযম, আধারের শোধন এবং মার্জন করিয়া এ সমস্ত প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের উপযোগী করিয়া তোলে ; তথাপি ইহারা মনোময় পরিণামেরই অন্তর্গত ; প্রকৃত আধ্যাত্মিক পরিণতি, অনুভূতি বা সিদ্ধির সূচনা এখনও ইহাদের মধ্যে দেখা দেয় নাই। যাহা আমাদের মন প্রাণ দেহ হইতে অন্য কিছু, আমাদের সত্তার অন্তরতম বস্তু তেমনি এক সত্যে, চিৎসত্তায় আত্মাতে অন্তরাত্মায় জাগরিত হওয়াই আধ্যাত্মিকতার মূল অর্থ, যে বৃহত্তর সত্যবস্তু, সকলকে অতিক্রম করিয়া অথচ বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আছেন এবং আমাদের সত্তার মধ্যেও অন্তর্য্যামীরূপে বাস করিতেছেন তাঁহাকে জানিবার, অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সংস্পর্শে আসিবার, তাঁহার সহিত আমাদের যোগাযোগ স্থাপন করিবার, তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইবার, তাঁহার সহিত এক হইয়া যাওয়ার জন্য আমাদের অন্তরের যে আস্পৃহা, আধ্যাত্মিকতাতে তাহাই চেতনায় দেখা দেয়, এই আস্পৃহার ফলে আমাদের সমগ্র সত্তা তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইবে, তাঁহার সংস্পর্শ লাভ করিবে, রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে এবং তাঁহার সহিত যুক্ত হইবে, অথবা আমাদের সত্তা তখন এক নূতন সম্ভূতির বা নূতন সত্তার, নূতন এক আত্মার বা নূতন এক প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিবে, তাঁহার সহিত যুক্ত হইবে, তাঁহার মধ্যে গড়িয়া বা জাগিয়া উঠিবে।

বস্তুতঃ সৃষ্টিশীলা চিৎশক্তি আমাদের এই পৃথিবীর বক্ষে প্রায়ই একই সময়ে পরিণামের দুইটি ধারা প্রবাহিত করিতে চায়, ইহার মধ্যস্থিত নিম্নতর ধারাটির উপর তাহার যেন বিশেষ পক্ষপাত এবং প্রবল ঝোঁক রহিয়াছে। পরিণামের একটা বহিরঙ্গ ধারা বহিতেছে যাহার ফলে আমাদের বহিঃপ্রকৃতির অর্থাৎ দেহ ও প্রাণের মধ্যস্থিত আমাদের মনোময় সত্তার প্রকৃতির উৎকর্ষসাধন

চলিতেছে, আবার তাহারি অন্তরালে একটি অন্তরঙ্গ ধারা আত্মপ্রকাশের জন্য ভিতর হইতে চাপ দিতেছে—কেননা মনের প্রস্ফুরণের সঙ্গে এই ধারার আত্মপ্রকাশ সম্ভব হইয়া উঠিতেছে—সে ধারাতে আমাদের অন্তরপুরুষকে এবং তাহার অব্যক্ত গোপন অধিচেতন এবং চিন্ময় প্রকৃতিকে ফুটাইয়া তুলিবার অন্ততঃপক্ষে একটা আয়োজন চলিতেছে, এমন কি তাহার একটা সূচনা দেখা দিয়াছে। কিন্তু এখনও বহুদিন ধরিয়া মানসিক পরিণামধারার মধ্য দিয়া মনের চরম প্রসার, উন্নতি এবং সূক্ষ্মতা বিধানের জন্যই অপরিহার্য্য রূপে প্রকৃতিকে প্রধানতঃ নিবিষ্ট থাকিতে হইতেছে; কেননা কেবল এই কার্য্যের দ্বারাই বোধিজাত বুদ্ধি, অধিমানস এবং অতিচেতনের অব্যাহত প্রকাশক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে, চিৎপুরুষের দিব্য আত্মপ্রকাশের দুষ্কর পথ উন্মুক্ত হইবে। শুধু চিন্ময় তত্ত্বের অভিব্যক্তি এবং তাহার শুদ্ধ সৎ ভাবের মধ্যে আমাদের আত্ম-বিলোপ ঘটানোই যদি প্রকৃতির লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে মানস পরিণামের জন্য তাহার প্রয়াস ও সাধনার প্রয়োজন থাকিত না, কেননা প্রকৃতি-পরিণামের যে কোন পর্ব্বে চিৎসত্তা স্ফুরিত হইতে এবং তাহার মধ্যে আমাদের সত্তা নিমজ্জিত বা বিলীন হইয়া যাইতে পারিত; শুধ হৃদয়ের তীব্র সংবেগ, চিত্তবৃত্তির অত্যন্ত নিরোধ, অথবা সঙ্কল্পের একান্ত তন্ময়তা সেই চরম সিদ্ধি-লাভের পক্ষে যথেষ্ট। ইহজগতের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া উচ্চতর ভূমিতে পলায়নই যদি প্রকৃতির চরম লক্ষ্য হইত তাহা হইলেও এই বিধানই প্রযোজ্য হইত, কারণ ইহবিমুখীনতার তীব্র সংবেগ যে-কোন ভূমিতে প্রকৃতি-পরিণামের যে-কোন পর্ব্বে যথেষ্ট পরিমাণে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর আকর্ষণকে কাটাইয়া দিয়া কোন দিব্য পারত্রিক চিন্ময় ভূমিতে জীবকে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সত্তার সর্ব্বাঙ্গীণ রূপান্তর সাধনই যদি প্রকৃতির নিগূঢ় অভিপ্রায় হয় তবে পরিণামের এ যুগলধারার সঙ্গতি ও তাৎপর্য্য আমরা দেখিতে পাই, কেননা সে উদ্দেশ্যের পক্ষে এ উভয় ধারারই প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

অথচ ইহার ফলে অধ্যাত্মপথে প্রগতি হয় দুরূহ ও মন্থর, কেননা প্রথমতঃ চিন্ময় স্ফুরণকে প্রতিপদে তাহার সাধনযন্ত্রসকল প্রস্তুত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ চিন্ময় অভিব্যক্তির উপক্রমেই তাহাকে অপরিণত দেহমন প্রাণের শক্তি ও সংস্কার, প্রবৃত্তি ও আবেগের সঙ্গে অলঙ্ঘ্য ভাবে জড়াইয়া পড়িতে হয়,—এই সমস্ত শক্তি সংস্কার আবেগ ও প্রবৃত্তিকে স্বীকার এবং তাহাদের সেবা ও পোষকতা করিবার জন্য নিম্ন হইতে তাহার পরে টান পড়ে,

তাই আতঙ্ককর একটা মিশ্রণ দেখা দেয়, পতন বা স্খলনের নিয়ত প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হয়, অন্ততপক্ষে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িতে কিম্বা গুরুভার বহন করিতে হয় এবং গতিবেগ কমিয়া যায় ; কখনও কখনও উপরের ধাপে উঠিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রকৃতির কোন অংশের দ্বিধা কাটে নাই, এবং নীচের ধাপের সঙ্গে এখনও সংলগ্ন রহিয়াছে এবং উচ্চতর ধাপে পৌঁছিতে বাধা দিতেছে, তখন সে অংশকে উপরে তুলিয়া লইবার জন্য আবার তাহাকে নীচে নামিবার প্রয়োজন হইতে পারে। সর্ব্বশেষ বাধা এই যে মনের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতে হয় বলিয়া মনের বিশিষ্ট ধর্ম্মের সীমা ও সঙ্কোচ উন্মিষন্ত চিন্ময় জ্যোতি এবং শক্তির উপরও আসিয়া পড়ে এবং বাধ্য হইয়া তাহাকে খণ্ডিতভাবে ক্রিয়া করিতে বা অংশে অংশে অগ্রসর হইতে হয় এবং কখনও এক ধারা কখনও বা অন্য ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়, কখনও বা কোন ধারাকে একেবারে ত্যাগ করিতে হয় অথবা পরবর্ত্তীকালে নিজের অখণ্ড সামগ্রিক সিদ্ধির মধ্যে সে ধারার সিদ্ধি লব্ধ হইবে বলিয়া তাহার সাধনা আপাততঃ রাখিয়া দিতে হয়। দেহ মন প্রাণের এই সমস্ত বাধা ও ব্যাঘাত,—দেহের গুরু জড়ত্ব বা অসাড়তা এবং একই অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে চলিবার প্রবৃত্তি, প্রাণের প্রবল পঙ্কিল আবেগ, মনের মূঢ়তা, সংশয়, অনিশ্চয়তা, সত্যকে অস্বীকার করিবার প্রবৃত্তি এবং অন্য নানা প্রকার রূপায়ণ—এত প্রবলাকার ধারণ করে, এতই অসহনীয় হইয়া উঠে যে অধ্যাত্ম সংবেগ অধীর ও ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং এই সমস্ত বিরোধীভাবকে কঠোরতার সহিত দমন করিতে চায় এবং প্রাণকে প্রত্যাখ্যান, দেহকে কর্ষণ, মনকে নিরোধ করিয়া নিজের বিবিক্ত মুক্তি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় আকুল হইয়া উঠে এবং অদিব্য অজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রকৃতিকে একেবারে বর্জন করিয়া চিৎসত্তা শুদ্ধ সৎস্বরূপের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চায়। উপর হইতে একটা আকুলকর আবাহন এবং আমাদের চিন্ময়ীবৃত্তির নিজের উচ্চতমসত্তা এবং ভূমির দিকে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছেই, তাহার উপর এখানে খাঁটি আধ্যাত্মিকতা লাভের পথে আমাদের অন্নময় এবং প্রাণমনময় প্রকৃতির এই যে দারুণ বাধা রহিয়াছে, তাহাই প্রবল কারণ হইয়া দাঁড়ায় যাহার জন্য সাধকের মধ্যে তপঃকৃচ্ছ্রতা, মায়াবাদ, ইহবিমুখীনতা, জীবনের ক্ষেত্র হইতে পলায়নের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, শুদ্ধ চরম তত্ত্বের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ ও আবেগ আসিতে বাধ্য হয়। শুদ্ধ চরম আধ্যাত্মিকতা মানবাত্মার নিজেরই পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হইবার আকৃতি এবং প্রবৃত্তি. কিন্তু ইহা প্রকৃতির উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষেও

অপরিহার্য্য ; কেননা ইহা না থাকিলে প্রকৃতির মধ্যে যে মিশ্রণ যে নিম্নাভি-মুখী প্রবল আকর্ষণ আছে তাহা কাটাইয়া চিন্ময় সত্তার উন্মেষ অসম্ভব হইয়া পড়ে। পরমতত্ত্বের দিকেই যে চরমপন্থী চলিয়াছে, বিবিক্তসেবী সেই তপস্বীই চিদাত্মার পতাকাবাহী, তাহার গৈরিক বসন সেই নিশান যাহা সকল প্রকার রফাকে অস্বীকার করিবার চিহ্ন বহন করিতেছে,—বস্তুতঃ চিদভিব্যক্তির জন্য যে তীব্র সংগ্রাম রহিয়াছে কোন প্রকার রফায় তাহা শেষ হইতে পারে না, তাহা কেবল তখনই শেষ হইবে যখন পূর্ণ চিন্ময় বিজয় সাধিত হইবে এবং নিম্ন প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে। এখানে যদি তাহা সিদ্ধ না হয় তবে বস্তুতঃ অন্য কোথাও গিয়া তাহা লাভ করিতে হইবে ; উন্মিষন্ত চিৎপুরুষের কাছে যদি প্রকৃতি বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকার করে তবে আত্মাকে প্রকৃতি হইতে সরিয়া যাইতেই হইবে। সুতরাং আধ্যাত্মিকতার উন্মেষের মধ্যে দুইটি প্রবেগ বা দুইটি প্রেরণা দেখা যাইতেছে, একদিকে রহি-য়াছে একটা আবেগ যাহা চায় যে কোন রূপে যে কোন মূল্য দিয়া সত্তার মধ্যে এক চিন্ময় চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে তাহার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে প্রকৃতিকেও বর্জন করিবে ; অন্যদিকে আরেকটা আবেগ চায় আমাদের প্রকৃতির সর্ব্বাংশে এই চিন্ময় ভাব বিস্তৃত ও প্রসারিত করিতে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রথম আবেগ তাহার পূর্ণ সিদ্ধিতে আসিয়া না পৌঁছিবে ততদিন দ্বিতীয় সাধনা হইবে অপূর্ণ ও পঙ্গু। অধ্যাত্ম পথযাত্রী পুরুষের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য শুদ্ধ চিন্ময় চেতনার প্রতিষ্ঠা ; এই চিৎপ্রতিষ্ঠার এবং সেই চেতনার পক্ষে সত্যবস্তুর সংস্পর্শে আসিবার, ব্রহ্ম আত্মা বা ভগবানের সহিত যুক্ত হই-বার আকূতি ও আবেগই এ পুরুষের জীবনে প্রথম ও প্রধান স্থান অধিকার করিবে এমন কি যতদিন পর্য্যন্ত পূর্ণ সিদ্ধি লাভ না হয় ততদিন তাহাই সে অধ্যাত্ম সাধকের একমাত্র অভিনিবেশের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু এবং প্রত্যেক সাধককে তাহার প্রকৃতির বিশেষ ধর্ম্ম অনুসারে যেদিকে তাহার সামর্থ্য আছে তাহার অনুসরণ করিয়া যে কোন উপায়ে ইহাই সিদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

চিন্ময় পুরুষের পরিণাম কতদূর অগ্রসর হইয়াছে একথা দুই দিক দিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে, প্রথম, প্রকৃতি কি উপায়ে কোন্ ধারা ধরিয়া এই বিবর্ত্তন সাধিত করিতেছে, দ্বিতীয়, মানুষের ব্যষ্টিসত্তায় বাস্তবিক পক্ষে তাহা কতটা সার্থক হইয়াছে। অন্তরের সত্তাকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রকৃতি

চারিটি প্রধান ধারা অনুসরণ করিয়াছে—ধর্ম্মসাধনা, রহস্যবিদ্যা বা বিভূতিযোগ, অধ্যাত্মবিচার, এবং অধ্যাত্মযোগ বা অন্তরে অধ্যাত্ম অনুভব ও তত্ত্বসাক্ষাৎকার ; ইহাদের প্রথম তিনটি মূল সত্যের দিকে আমাদিগকে শুধু অগ্রসর করিয়া দেয়, শেষেরটি তাহাতে প্রবিষ্ট হইবার অসন্দিগ্ধ তোরণ। সাধনার চারিটি ধারাই যুগপৎ ক্রিয়াশীল হইয়াছে, কখনও কম বেশী পরিমাণে যুক্ত এবং অল্পাধিকভাবে সহকর্ম্মী হইয়া, কখনও পরস্পরের সহিত ঝগড়া করিয়া, কখনও বা পৃথক এবং স্বতন্ত্র থাকিয়া। ধর্ম্মসাধনা তাহার সংস্কারে আচারে অনুষ্ঠানে রহস্যবিদ্যার অনেকটা গ্রহণ করিয়াছে ; অধ্যাত্মবিচারেও সে ঝোঁক দিয়াছে, কখন তাহা হইতে তাহার মত ও বিশ্বের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে কখনও বা নিজের সাধনার আশ্রয় স্বরূপ কোন অধ্যাত্মদর্শন গড়িয়া তুলিয়াছে—পূর্ব্বের পন্থাটি সাধারণত প্রতীচ্য আর পরেরটি প্রাচ্য ; কিন্তু অধ্যাত্ম উপলব্ধিই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য ও সাধ্য, তাহার আকাশ এবং শিখর। আবার ধর্ম্মসাধনা কখনও বা বিভূতিযোগকে একেবারে বাদ দিয়াছে। অথবা তাহার উপাদান যত অল্প মাত্রার মধ্যে আনা সম্ভব তাহা আনিয়াছে, কখনও বা শুষ্ক যুক্তি বিচারকে নিজের বিজাতীয় মনে করিয়া দার্শনিক মননকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে এবং অনুষ্ঠান, মত, সাত্ত্বিক ভাবোচ্ছ্বাস ও আবেগ এবং নৈতিক আচরণের দিকে ঐকান্তিক ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ; কখনও বা অধ্যাত্ম অনুভব এবং তত্ত্ব সাক্ষাৎকারকে বর্জন করিয়াছে অথবা তাহাদিগের জন্য যতটা সম্ভব সঙ্কীর্ণ স্থান রক্ষা করিয়াছে। বিভূতিযোগ বা গুপ্তবিদ্যা (occultism) কখনও কখনও নিজের সম্মুখে এক আধ্যাত্মিক লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছে এবং নানা প্রকার অলৌকিক অনুভব ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছে এবং একপ্রকার মরমিয়া দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা অধ্যাত্মদৃষ্টিশূন্য হইয়া গুহ্যবিদ্যা এবং গুহ্যঅনুষ্ঠানের মধ্যেই নিজেকে নিবদ্ধ করিয়াছে, এইভাবে সে সিদ্ধাই ইন্দ্রজাল বা কেবল যাদুবিদ্যার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন কি পথভ্রষ্ট হইয়া প্রেত বা পিশাচসিদ্ধি চাহিয়াছে ; অধ্যাত্মদর্শন প্রায়ই নিজের আশ্রয় অথবা অনুভবের উপায়রূপে ধর্ম্মের উপর ঝোঁক দিয়াছে ; অধ্যাত্ম অনুভব এবং তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইতে কখনও তাহা জাত হইয়াছে অথবা তাহাতে পৌঁছিবার উপায় রূপে নিজেকে গড়িয়া তুলিয়াছে ; কিন্তু কখনও কখনও বাধা মনে করিয়া ধর্ম্মের সকল সহায়তাকে বর্জন করিয়াছে এবং নিজের শক্তিতে চলিতে চাহিয়াছে, হয় সে মানসজ্ঞান

সঞ্চয়ে তুষ্ট আছে অথবা অনুভব লাভ বা সিদ্ধিতে পৌঁছিবার স্বকীয় পথ বা নিজস্ব সাধনার ধারা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া চলিয়াছে। অধ্যাত্মযোগ গোড়ার দিকে অপর তিনটি ধারা সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু আবার নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের সকলকে বর্জনও করিয়াছে; গুহ্য বিদ্যা ও সিদ্ধাইকে সর্ব্বনাশা প্রলোভন এবং বিষম বাধা মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছে এবং চিৎসত্তার শুদ্ধ সত্য মাত্র চাহিয়াছে; দার্শনিক বিচার ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস অথবা অন্তরের রহস্য-নিবিড় অধ্যাত্ম ভাবনার মধ্য দিয়া সে আপন লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছে; অথবা ধর্ম্মের সকল মতবাদ ও ব্যবস্থা, পূজা ও অর্চ্চনা, আচার ও অনুষ্ঠানকে নিম্নতর অবস্থার উপযোগী অথবা প্রাথমিক সাধনোপায় জ্ঞানে তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া তাহাদের সাহায্য উপেক্ষা করিয়া সকল আভরণ দূরে ফেলিয়া নিরাবরণ চিন্ময় সত্য বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াছে। সাধন পদ্ধতিব এই সমস্ত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন ছিল; নিজ পরিণতির সার্থকতা সাধন করিবার জন্য প্রকৃতি সকল ধারা লইয়াই পরীক্ষা করিয়াছে—যাহাতে পরাচেতনা এবং অখণ্ড জ্ঞানে পৌঁছিবার খাঁটি এবং সমগ্র পন্থাটি সে আবিষ্কার করিতে পারে।

কেননা এই সমস্ত উপায় বা সাধনধারার প্রত্যেকটির সঙ্গে আমাদের সমগ্র সত্তার কোন না কোন বিশিষ্ট অংশের যোগ আছে, সুতরাং আমাদের পরিণামের সমগ্রতার পক্ষে প্রত্যেকের প্রয়োজন রহিয়াছে। আজ মানুষ বাহিরের ক্ষেত্রে অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে থাকিয়া সত্যকে খুঁজিতেছে; সে জ্ঞানের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকে বা অংশ সকলকে সংগ্রহ এবং সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতেছে মাত্র, তাহার বর্ত্তমান প্রাতিভাসিক প্রকৃতিতে বিশ্বশক্তির মধ্যে সে অর্দ্ধকর্ম্ম-ক্ষম সীমিত ক্ষুদ্র প্রাণীমাত্র, তাহার এই বহিশ্চর অবিদ্যাচ্ছন্ন সত্তাকে দীনতা হইতে মুক্ত করিয়া বৃহৎ ও মহৎ করিবার জন্য চারিটি বস্তুই তাহার পক্ষে আবশ্যক। তাহার নিজেকে জানিতে হইবে এবং নিজের মধ্যস্থিত সকল সম্ভাবিত শক্তিকে আবিষ্কার করিতে এবং কাজে লাগাইতে হইবে; কিন্তু নিজেকে এবং জগৎকে পূর্ণরূপে জানিতে হইলে তাহাকে তাহার বহিঃসত্তা এবং বহিঃপ্রকৃতির পশ্চাতে গিয়া নিজের মনোময় বহিঃস্তর এবং বাহ্য বিশ্ব প্রকৃতির অভ্যন্তরে অতি গভীরে ডুবিতে হইবে। ইহা করিতে সে কেবল তখনই সমর্থ হইবে যখন সে তাহার নিজের অন্তরস্থ মনোময় প্রাণময় অন্নময় সত্তা এবং চৈত্যপুরুষ ও তাহার শক্তি এবং ক্রিয়াকে জানিতে এবং বিশ্বের জড়ময়

আবরণের পশ্চাতে যে গোপন প্রাণ ও মন রহিয়াছে তাহার সার্ব্বভৌম বিধান এবং ক্রিয়াধারার সহিত পরিচিত হইতে পারিবে; রহস্যবিদ্যাকে ব্যাপকতম অর্থে গ্রহণ করিলে এ সমস্তই হয় তাহার ক্ষেত্র। তাহার পর যে গোপন শক্তি বা শক্তিব্যূহ জগৎ পরিচালনা করিতেছে মানুষের তাহাকে বা তাহাদিগকেও জানিতে হইবে; যদি বিরাট পুরুষ চিৎসত্তা বা বিশ্বস্রষ্টা কেহ বা কিছু থাকেন তবে তাহার সঙ্গে মানুষকে কোন না কোন ভাবে সম্বন্ধ-যুক্ত হইতে এবং তাহার সংস্পর্শ পাইতে অথবা তাহার সহিত যোগাযোগ স্থাপিত করিতে এবং সে সম্বন্ধ ও যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইবে; বিশ্বের যাহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাহাদের বা বিশ্বপুরুষের এবং তাহার সার্ব্বভৌম সঙ্কল্পের অথবা পরাৎপর পুরুষের এবং তাহার পরম ইচ্ছার সহিত মানুষকে কোন না কোন প্রকারে নিজের সুর মিলাইতে হইবে; তিনি তাহাকে যে বিধান দিয়াছেন অথবা তাহার জীবনের যে উদ্দেশ্য ও আচরণ তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন বা তাহার কাছে প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা তাহাকে অনুসরণ করিতে হইবে; এই বর্ত্তমান অথবা পরবর্ত্তী জীবনে যে উচ্চতম চূড়ায় উন্নীত হইবার দাবী তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছে সেই ঊর্দ্ধ্ব গতির পথে তাহাকে আরূঢ় হইতে হইবে; আর যদি তেমন বিশ্বাত্মা বা পরমপুরুষ কেহ না থাকেন তবে তাহাকে জানিতে হইবে যে সেখানে কি আছে এবং তাহার বর্ত্তমান অপূর্ণতা ও অশক্তি হইতে নিজেকে কি করিয়া উন্নীত করা যাইতে পারে। ইহাই হইল ধর্ম্মসাধনার লক্ষ্য; ধর্ম্মসাধনা চায় মানুষকে ভগবানের সহিত যুক্ত করিতে এবং তাহার ফলে মন প্রাণ দেহকে এমনভাবে ঊর্দ্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে যাহাতে তাহারা অন্তরাত্মা এবং চিৎপুরুষের বিধান স্বীকার করিতে ও মানিয়া চলিতে শিখিবে। কিন্তু এই জ্ঞানকে শুধু ধর্ম্মসাধনের প্রাণালীবদ্ধ মতবাদ ব্যবস্থা অথবা রহস্যাচ্ছন্ন আপ্তবাক্য বা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ হইলেই চলিবে না, মানুষের জাগ্রত এবং ভাবনাশীল মনের পক্ষে তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা চাই, বস্তুর তত্ত্ব এবং বিশ্বের পরীক্ষা বা পর্য্যবেক্ষণলব্ধ সত্যের সহিত তাহাদিগকে সমন্বিত বা সম্বন্ধযুক্ত করা চাই ইহাই দর্শনের কাজ; অধ্যাত্ম সত্যের ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম দর্শনের দ্বারা ইহা সম্ভব হইতে পারে, তা সে দর্শনের ধারা বুদ্ধির বা বোধিজাত জ্ঞানের যাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন। কিন্তু সকল জ্ঞান এবং সাধনা কেবল তখনই সফল হইবে যখন তাহারা অনুভূতিতে রূপান্তরিত হইয়া চেতনার অঙ্গ বা অংশ এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত কার্য্যধারায় পরিণত

হইবে ; অধ্যাত্মক্ষেত্রে, ধর্ম্মের, গুপ্তবিদ্যার এবং দর্শনশাস্ত্রের সকল জ্ঞান ও সাধনা সফল হইতে গেলে তাহাদের চরম পরিণতিতে চিন্ময় চেতনার প্রস্ফুরণে পর্য্যবসিত হওয়া চাই, এমন অনুভূতিতে জাগ্রত হওয়া চাই যাহার ফলে সে চেতনা উদ্দীপিত, সমৃদ্ধ, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্প্রসারিত হইবে, জীবন এবং কর্ম্মকে চিন্ময় সত্যের বৃহৎ সুরে বাঁধিয়া দিবে ;—এই হইল অধ্যাত্ম অনুভব এবং তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের ফল।

স্বভাবতই পরিণামের সকল ধারার গতি প্রথম দিকে অতি মন্থর ; কেননা প্রত্যেক উন্মিষন্ত তত্ত্বকে নিশ্চেতনা এবং অবিদ্যার সংবৃতির মধ্য হইতে তাহার শক্তিকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। যাহার মধ্যে জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান মিশ্রিত হইয়া আছে সেই অবিদ্যার অন্ধ একগুঁয়ে পিছুটানের এবং নিশ্চেতনার সহ-জাত সকল আকর্ষণ ও প্রভাবের, তাহার স্বাভাবিক বাধা ও বিরোধের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করিয়া যে আদি বস্তুর মধ্যে তাহা প্রথমে অবস্থিত ছিল তাহাব অন্ধকারময় প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তির দারুণ বন্ধন কাটিয়া, প্রতি তত্ত্বকে সংবৃতির মধ্য হইতে বাহির হওয়া যে অতি দুরূহ কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমে প্রকৃতির মধ্যে একটা অস্পষ্ট আবেগ একটা ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা গোপনে অধিচেতন ভূমিতে ডুবিয়া ছিল এমন কোন তত্ত্ব বাহিরের ক্ষেত্রে আসিয়া ফুটিয়া উঠিবার সময় ভিতর হইতে যে চাপ দিতেছে তাহার একটা চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহার পর সম্ভূতি যে রূপে দেখা দিবে সেই ভাবী জাতকের ক্ষুদ্র অর্দ্ধস্ফুট অপরিণত সূচনা মাত্র দেখা দেয়, অমার্জিত অশোধিত উপাদান সকলের প্রাথমিক বিন্যাসে তাহার একটা অপূর্ণ ক্ষুদ্র তুচ্ছ দুর্লক্ষ্য প্রকাশ ফুটিয়া উঠে। তাহার পর সে তত্ত্বের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ রূপায়ণ সকল দেখা দেয়, তাহার অধিকতর বিশিষ্ট ধর্ম্ম চেনা যায় এমন সকল গুণ প্রথমতঃ আংশিক রূপে এখানে সেখানে অতি ক্ষীণভাবে দেখা দিতে আরম্ভ করে, তাহার পর তাহারা স্পষ্টতর সবলতর হইতে থাকে, অবশেষে ঘটে তাহার নিশ্চিত উন্মেষ, সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় তাহার মধ্যে চেতনার একটা বিপর্য্যয় বা রূপান্তর এবং এক আমূল পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু পরিণামের তপস্যার পক্ষে তখনও প্রতি দিকে বহু কিছু করিবার থাকে, তখনও নানা বাধাসঙ্কুল পথে পূর্ণতার দিকে দীর্ঘ মন্থর অভিযান চালাইতে হয়। যাহা ফুটিতেছে তাহা নিম্নের টানে যাহাতে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া না যায়, যাহাতে তাহা অকৃতকার্য্য না হয় বা বিলোপ না পায় তজ্জন্য তাহাকে দৃঢ়ভাবে সুসংবদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত করিলেই

শুধু চলিবে না, তাহার সম্ভাবনার সকল ক্ষেত্রেই তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, পূর্ণরূপে তাহার আত্মসিদ্ধি লাভ করিতে হইবে, তাহাকে উচ্চতম শিখরে পৌঁছিতে হইবে, সূক্ষ্মতায় ঐশ্বর্য্যে এবং প্রসারতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে হইবে; তাহাকে প্রতিপত্তিশালী, সর্ব্বগ্রাহী হইতে এবং সকলকে নিজের আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই প্রকৃতির ক্রিয়াধারা এইরূপ, ইহার দিকে অন্ধ থাকিলে আমরা তাহার লীলাবৈচিত্র্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিব না এবং তাহার ক্রিয়া পদ্ধতির গোলকধাঁধার মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িব।

মানুষের মনে এবং চেতনায় এই ধারাতেই ধর্ম্মবোধের উন্মেষ হইয়াছে ও পরিণতি চলিতেছে; এই সমস্ত ধারার নিমিত্ত পরিবেশ ও প্রয়োজনের দিকে যদি দৃষ্টিপাত না করি তাহা হইলে ধর্ম্মবোধ মানুষের জন্য কি কাজ করিয়াছে তাহা যথাযথ বুঝিতে বা তাহার যথার্থ মূল্য অবধারণ করিতে পারিব না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রথম পর্ব্বে ধর্ম্মবোধ অমার্জিত অশোধিত এবং অপূর্ণ হইবে; তাহার পরিণতির পথে তাহার মধ্যে অন্যান্য সংস্কারের মিশ্রণ এবং নানা ভ্রান্তি থাকাতে তাহার গতিপথে বহু দুরূহ বাধার সৃষ্টি হইয়াছে; যাহার প্রকৃতি আধ্যাত্মিকতার বিরোধী অন্ততঃ পক্ষে যাহা গুরুতর রূপে অনাধ্যাত্মিক, মন ও প্রাণের তেমন অনেক বৃত্তিকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়া লইয়া ধর্ম্মকে অগ্রসর হইতে হয় বলিয়া তাহার গতিবেগ মন্থর হইয়াছে। অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং ক্ষতিকর এমন কি সর্বনাশা উপাদানও ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ভ্রান্তি এবং অনর্থের পথে চালিত করিতে পারে; মানবমনের মতুয়া বুদ্ধি, তাহার আত্মম্ভরিতাপূর্ণ সংকীর্ণতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা এবং স্পর্দ্ধিত অহংকার, সীমিত সত্যের প্রতি তাহার পক্ষপাত এবং তন্মধ্যস্থ ভ্রান্তির প্রতি তাহার ততোধিক আসক্তি, নিম্নতর প্রাণের যুদ্ধরত অত্যাচারপরায়ণ আত্মপ্রতিষ্ঠার দুশ্চেষ্টা, তাহার হিংসা জুলুম ও গোঁড়ামি, আপন বাসনা ও প্রকৃতির অনুমোদন লাভের জন্য মনের উপর তাহার ছলনাপূর্ণ ব্যবহার ও ক্রিয়া—এই সমস্তই সহজে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মের উচ্চতর চিন্ময় উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতিকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে; এইরূপে ধর্ম্মের মধ্যে প্রভূত অজ্ঞানতা লুক্কায়িত থাকিতে পারে, ধর্ম্মের নামে বহু ভ্রান্তি, প্রভূত অন্যায়াচরণ অনেক অবৈধ কার্য্য এবং এমন কি আধ্যাত্মিকতার বিরোধী অনেক পাপ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু মানুষের সমস্ত সাধনার অতি বিচিত্র ইতিহাস এইরূপ

কলঙ্কলাঞ্ছিত, এবং এই সমস্ত যদি ধর্ম্মের সত্য এবং প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা হয় তবে মানুষের সকল প্রকার সাধনা তাহার সকল কর্ম্মের সত্য ও প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে ঠিক একই প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়; তাহার ক্রিয়া, চিন্তা, আদর্শ, শিল্প ও বিজ্ঞান সাধনা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার মানব-প্রচেষ্টার কোনটিই এ অপবাদের হাত হইতে নিস্তার পায় না।

ধর্ম্মকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; কেননা সে দাবি করে যে তাহার সত্যের প্রামাণ্য দিব্য অনুভব ও প্রেরণার উপর প্রতিষ্ঠিত, লোকোত্তর ভূমি হইতে তাহার অলঙ্ঘ্য এবং অভ্রান্ত সত্য সে লাভ করে তাই যুক্তিতর্কের বা প্রশ্নের কোন অবকাশ না দিয়া মানুষের ভাবনা বেদনা আচার বিচারের উপর সে নিজেকে জোর করিয়া আরোপ করিতে চায়, তাহার এই দাবি অত্যধিক ও অকালজাত; যদিও লোকোত্তর ভূমি হইতে যে দিব্য প্রেরণা এবং দিব্য আলোক আসে ধর্ম্মের প্রমাণ এবং সমর্থন হিসাবে তাহা নিঃসংশয়িত এবং অবশ্য-স্বীকার্য্য বলিয়াই ধর্ম্মের সাধক মনে করেন, তাহা ছাড়া মানবমনের অজ্ঞানতা, সংশয়, দুর্ব্বলতা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে অন্তরাত্মার গোপন কক্ষ হইতে আগত যে আলোক এবং শক্তি, বিশ্বাসরূপে দেখা দিয়াছে তাহার একটা অবি-সংবাদিত প্রয়োজন আছে, এই সমস্তের উপব নির্ভর করিয়া ধর্ম্ম নিজেকে চালিত করিতে চাহিলেও তাহার দাবিতে অনেক সময় অনেকটা বাড়াবাড়ি থাকে, যে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত হয় নাই তাহার উপর জবরদস্তি করিয়াই ধর্ম্মকে আরোপিত করিবার চেষ্টা হয়। মানুষের চলিবার পথে বিশ্বাসের আলোক তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য; কেননা সে-আলোক না পাইলে অজানার পথে চলাই তাহার অসম্ভব হইয়া উঠে; কিন্তু তা বলিয়া বিশ্বাসকে কাহারও ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া উচিত নয়, অন্তরের স্বাধীন অনুভূতি হইতে অন্তরস্থ চিৎপুরুষের অলঙ্ঘ্য নির্দ্দেশ বা পথপ্রদর্শন হইতেই বিশ্বাসের অভ্যুদয় প্রার্থনীয়। অবিচারে ধর্ম্মকে মানিয়া নিবার দাবি স্বীকার করা চলিত, ইতি-পূর্ব্বেই যদি তাহার অধ্যাত্ম সাধনা মানুষকে অবিদ্যাচছন্ন মনোময় ও প্রাণময় সংস্কারের মিশ্রণ হইতে মুক্ত করিয়া ঋতচিতের সমগ্র ও অখণ্ডদর্শনের তুঙ্গ ভূমিতে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে সমর্থ হইত। তাহাই আমাদের শেষ লক্ষ্য বটে কিন্তু এখনও সে লক্ষ্যে পৌঁছান যায় নাই, তাই অসময়ে কৃত সে দাবী মানষের সহজাত ধর্ম্মবুদ্ধির খাঁটি ক্রিয়াকে আচছন্নই করিয়াছে; অথচ এই ধর্ম্মবুদ্ধিই ত মানুষকে দিব্য ভাগবতী চেতনার দিকে লইয়া যাইবে, যাহা সে লাভ করিয়াছে

তাহার সমস্তকেই সুসংযতভাবে একই দিকে ইহাই ফিরাইয়া ধরিবে, ইহাই দিবে প্রত্যেক মানুষকে তাহার বিশিষ্ট অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্কেত ও ধারা, প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুসারে দিব্য সত্যের এষণা এবং সামীপ্য বা সংস্পর্শের পক্ষে উপযুক্ত একটা সাধনপন্থার নির্দ্দেশ।

ধর্ম্মৈষণার বেলায় প্রকৃতি পরিণামের উদার সাবলীলতার এবং নমনীয়তার মধ্যে বহু প্রকার সাধনার নিরঙ্কুশ অবকাশ দিয়া ধর্ম্মবোধের খাঁটি এবং মূল লক্ষ্য যে বজায় রাখা হইয়াছে, ইহার সুন্দর পরিচয় পাই ভারতবর্ষের ধর্ম্মসাধনার ইতিহাসে; এখানে অগণিত ধর্ম্মমত আচার অনুষ্ঠান ও সাধনার ধারা গড়িয়া উঠিতে দেওয়া, এমন কি এ সকলকে পরস্পর মিলিয়া পাশাপাশিভাবে বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক লোক তাহার ভাবনা সংবেদন রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজের ধর্ম্ম বাছিয়া নিবার এবং নিজ নির্ব্বাচিত পথ অনুসরণ করিবার স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন অধিকার পাইয়াছে। পরিণামধারা যেখানে পরীক্ষামূলক পথে অগ্রসর হইতেছে সেখানে এমন ভাবের সাবলীলতা থাকা খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং প্রয়োজনীয়; কেননা ধর্ম্মের প্রকৃত কাজ হইতেছে মন, প্রাণ এবং দেহকে এমনভাবে প্রস্তুত করিয়া তোলা যাহাতে অধ্যাত্মচেতনা তাহাকে গ্রহণ করিতে এবং আপনার করিয়া নিতে পারে; ধর্ম্ম মানুষকে এমন এক বিন্দুতে আনিয়া উপস্থিত করিবে যেখানে চিন্ময় অন্তর্জ্যোতির স্ফুরণ পূর্ণরূপে আরম্ভ হইতে পারে। এইখানে আসিয়া ধর্ম্মকে জীবনের পরিচালকের আসন ছাড়িয়া, নিজের বাহিরের প্রকৃতি ও আচার ব্যবহারের উপর জোর না দিয়া অন্তরাত্মাকে তাহার নিজের স্বরূপ ও সত্যকে ফুটাইয়া তোলার পূর্ণ অবকাশ দিতে শিখিতে হইবে। সেই সঙ্গে মানুষের দেহ মন ও প্রাণকে যতটা পারা যায় গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকেই তাহার সমস্ত কর্ম ও প্রকৃতির মোড় আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরাইয়া দিতে হইবে; তাহাদের মধ্যে এক চিন্ময় অর্থ আবিষ্কৃত, তাহাদিগকে এক চিন্ময় লাবণ্যে বিভূষিত করিবার এবং তাহাদের মধ্যে এক চিন্ময় প্রকৃতির প্রকাশ আরম্ভ করিবার জন্য ধর্ম্মকে উন্মুখ ও সচেষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। এই চেষ্টার মধ্য দিয়া ধর্ম্মজীবনে ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, কেননা যে সব বস্তু বা ভাব লইয়া এ জন্য আমাদের সাধনা চলে তাহার মধ্যে এমন সব উপাদান থাকে যাহার মধ্যে ভ্রমের বীজ থাকে; একদিকে অধ্যাত্ম চেতনা অন্যদিকে মনোময়, প্রাণময় এবং দৈহিক চেতনা, দুই-এর মিলন ঘটাইবার মধ্যস্বরূপে যে সমস্ত সাধনা যে সমস্ত আচার

করা হয় সেই নিকৃষ্ট উপাদানের দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হয়, ফলে অনেক সময় তাহারা খর্ব্ব, অধঃপতিত এবং বিকৃত হইয়া পড়ে অথচ চিৎপুরুষের ও প্রকৃতির মিলনের মধ্যস্থ হওয়া এবং তজ্জন্য সাধনা করাই ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান উপযোগিতা। মানুষের পরিণতির ক্ষেত্রে সত্য এবং ভ্রম সর্ব্বদা একসঙ্গে বাস করে, ভ্রমের সঙ্গী বলিয়া সত্যকে ত বর্জন করা চলে না, বরং ভ্রমকেই দূর করিতে হয়, যদিও একাজ খুবই দুরূহ, নিপুণতার সহিত করিতে হয়, হাতুড়ের মত ভ্রমের উপর অস্ত্রোপচার করিতে গেলে অনেক সময় ধর্ম্মের অঙ্গহানি ঘটিতে পারে ; কেননা যাহাকে আমরা ভ্রম বলিয়া দেখি অনেক সময় তাহা কোন সত্যেরই প্রতীক বা ছদ্ম বিকৃত বা দূষিত রূপ এবং নির্ম্মম হইয়া মূলশুদ্ধ কাটিয়া ফেলিব মনে করিয়া অস্ত্রোপচার করিতে গিয়া মিথ্যার সঙ্গে সে সত্যকে ছাঁটিয়া ফেলা হয়। প্রকৃতি নিজেই সাধারণতঃ বহুদিন পর্য্যন্ত শস্য এবং আগাছা একসঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে দেয়, কেননা শুধু এইরূপে তাহার নিজের পুষ্টি, তাহার স্বতন্ত্র পরিণাম সম্ভব হয়।

মানুষের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার প্রথম উন্মেষের সময় পরিণামবিধাত্রী প্রকৃতি তাহার চিত্তে অতীন্দ্রিয় অনন্তের একটা অস্পষ্ট বোধ জাগাইয়া তোলে, তাহার যেন মনে হয় এক অদৃশ্য অজানা রহস্য তাহার জড়ময় সত্তাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। প্রকৃতি মানুষের মনে এই অস্পষ্ট বোধ জাগাইয়া তোলে যে তাহার মন ও ইচ্ছাশক্তি সীমিত এবং বীর্য্যহীন এবং জগতের মধ্যে এমন কিছু গোপনে অবস্থিত আছে যাহা তাহার চেয়ে অনেক বড় ; এমন সব শক্তি আছে যাহা মিত্র অথবা শত্রুরূপে তাহার ক্রিয়ার ফল নিয়ন্ত্রিত করে ; যে জড়জগতের মধ্যে সে বাস করে তাহার পশ্চাতে এমন এক শক্তি আছে যাহা জগৎকে এবং তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা এমন সব শক্তি আছে যাহা প্রকৃতির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে, অথচ সে সমস্ত শক্তিও হয়ত তাহাদের অতীত কোন বৃহত্তর অজানা দ্বারা শাসিত হয়। এই সমস্ত শক্তির স্বরূপ এবং তাহাদের সহিত যোগাযোগের সূত্র মানুষকে আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহাতে সে তাহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া তাহাদের সহায়তা পাইতে পারে ; তাহা ছাড়া প্রকৃতির গোপন ক্রিয়ার উৎস আবিষ্কার ও তাহা পরিচালনা করিবার উপায়ও সে বাহির করিতে চায়। কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে সে তখনই ইহা করিতে পারে না, কেননা বুদ্ধি প্রথমে কেবল জড় তথ্য লইয়াই কারবার করিতে পারে, কিন্তু ইহা হইল অদৃশ্যের রাজ্য, এখানে চাই জড়াতীত দৃষ্টি ও বিজ্ঞানের আনুকূল্য ; পশুর মধ্যে পূর্ব্ব হইতে বোধি এবং সহজাত জ্ঞানের

যে বৃত্তি ছিল তাহার সম্প্রসারণ এবং উন্নতিবিধান দ্বারাই তাহাকে এ কার্য্য করিতে হয়। আদিমানবের মননশীল সত্তার মধ্যে আসিবার এবং মননের ধর্ম লাভ করিবার পর এ বৃত্তি নিশ্চয়ই অধিকতর তীক্ষ্ণ এবং সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল; যদিও তখন প্রধানতঃ তাহার ক্রিয়ার নিম্নতম ধারায় ইহা আবদ্ধ ছিল কেননা তাহার প্রাথমিক প্রয়োজনের সমস্ত আবিষ্কারের জন্যও তাহাকে প্রধানতঃ এই বৃত্তির উপর নির্ভর করিতে হইত; তাহা ছাড়া অধিচেতন অনুভূতিও তাহার একটা বড় সহায় ছিল; কেননা বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে মানুষের মধ্যে অবিচেতনা আরও বেশী সক্রিয় ছিল। বাহিরে তাহার তরঙ্গ আসিয়া পড়া আরও সহজ ছিল, বহিশ্চেতনায় তাহার আপন কীর্ত্তিকে রূপায়িত করিবার সামর্থ্যও ছিল অনেক বেশী। প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া এইভাবে বোধি তাহাকে যাহা আনিয়া দিত তাহার মন তাহাদিগকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিত, এইভাবে ধর্ম্মের প্রাচীন রূপ মানুষ গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহা ছাড়া বোধির এই উন্মুখ এবং সক্রিয় শক্তি মানুষের মধ্যে জড়ের পশ্চাতে অবস্থিত জড়াতীত শক্তির বোধ জাগাইয়াছে; তাহার সহজাত বৃত্তির প্রেরণায় অথবা অধিচেতন বা অতিপ্রাকৃত কোন কোন অনুভবের ফলে সে বহু অতীন্দ্রিয় সত্তার সন্ধান পাইয়াছে এবং তাহাদের সহিত কোন প্রকারে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে, এই জ্ঞানকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্য্যকরীভাবে তাহাদের প্রয়োগ-কৌশলও সে কিছুটা আবিষ্কার করিয়াছে; এমনি করিয়া যাদুবিদ্যা এবং বিভূতিবিজ্ঞানের প্রাচীন-ধারা সকল গড়িয়া উঠিয়াছে। এইভাবে চলিবার পথে কোন এক সময়ে তাহার মধ্যে এই বোধ উন্মিষিত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা জড়বস্তু নয়, তাহার মধ্যে এক আত্মা আছে যাহা দেহনাশের পরেও বাঁচিয়া থাকে; অদৃশ্যকে জানিবার আকূতিতে এমন কতগুলি অতিপ্রাকৃত অনুভূতি সে লাভ করিয়াছে যাহা তাহার নিজের মধ্যে অবস্থিত এই সত্তার সম্বন্ধে অমার্জিত অশোধিত একটা ধারণা গড়িয়া তুলিবার সহায়তা করিয়াছে। ইহার অনেক পরে সে বুঝিতে আরম্ভ করে যে বহির্বিশ্বের ক্রিয়ায় যাহাকে অনুভব করিয়াছিল তাহাই তাহার মধ্যেও কোন না কোন রূপে বর্ত্তমান আছে এবং তাহার মধ্যেই এমন উপাদান আছে শুভ অথবা অশুভের নিমিত্ত হইয়া যাহা অদৃশ্য শক্তিসকলের অভিঘাতে সাড়া দিতে পারে; এইভাবেই মানুষের মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি ও নৈতিক প্রকৃতি রূপায়িত হইয়াছে এবং অধ্যাত্ম অনুভবের সম্ভাবনা সকল দেখা দিয়াছে।

এইরূপ আদিম বোধি, গোপনভাবে অনুষ্ঠিত আচার অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম ও সমাজের অনুগত নৈতিক বোধ, পুরাণ কাহিনীতে রূপকের ভাষায় যাহা বলা হইয়াছে এরূপ নানা অলৌকিক জ্ঞান ও অনুভব, গোপন দীক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়া তাহাদের মূল অর্থ বজায় রাখিবার প্রয়াস—এই সমস্তকে একত্র মিশ্রিত করিয়া মানুষের ধর্ম্মের আদিরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা অত্যন্ত বাহ্য এবং বহিরঙ্গ ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহ যে গোড়ার দিকে ধর্ম্মের উপাদান-সকল অমার্জিত অশোধিত দৈন্য ও ক্রটি-পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাহারা ক্রমেই ব্যাপক ও গভীর হইয়াছে, কোন কোন সংস্কৃতিতে তাহাদের মধ্যে বিপুল প্রসার এবং গভীর তাৎপর্য্য দেখা দিয়াছে।

যেমন মনোময় ও প্রাণময় জীবনের উৎকর্ষ সাধিত হইতে থাকে—কেননা মানুষের মধ্যে তাহাই প্রকৃতির প্রথম কাজ এবং ইহার জন্য মানুষের মধ্যস্থ অন্য সমস্ত বৃত্তির পুষ্টির পূর্ণ সাধনা পরে করা যাইবে বলিয়া তাহাদিগের দিকে তেমন দৃষ্টি না দিয়া ইহাকেই অগ্রসর করিবার দিকে অভিনিবিষ্ট হইতে সে ইতস্ততঃ করে না—তাহার ঝোঁক পড়ে বুদ্ধিকে শাণিত ও পুষ্ট কবিবার দিকে, ফলে প্রথমে যাহা প্রয়োজনীয় ছিল সেই বোধি সহজাত বৃত্তি এবং অধি-চেতনার রূপায়ণ সকলকে আচ্ছাদিত করিয়া বর্দ্ধমান যুক্তি ও মনোময়ী-বুদ্ধির শক্তি দ্বারা গঠিত কাঠামো সকল গড়িয়া উঠে। মানুষ যতই জড় প্রকৃতির ক্রিয়াধারা ও রহস্যসকল আবিষ্কার করিতে থাকে ততই সে পূর্ব্বে যাহার আশ্রয় লইয়াছিল সেই বিভূতিবিদ্যা ও যাদুবিদ্যা হইতে দূরে সরিয়া যায়; প্রকৃতির ক্রিয়াধারা বা তাহার যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা যতই বিশ্বব্যাপার ব্যাখ্যা করিতে থাকে ততই দেবতা এবং অদৃশ্য শক্তিসমূহের আবেশ এবং পূর্ব্বানুভূত প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে; কিন্তু তখনও জীবনে আধ্যাত্মিক উপাদান এবং চিন্ময় ভাবের সমাবেশের একটা প্রয়োজন অনুভব করে এবং কিছুদিনের জন্য জীবনে দুইটি ক্রিয়াধারা একসঙ্গে চলিতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তি যতই বাড়িতে থাকে ততই ধর্ম্মের মধ্যে অলৌকিক ও গোপন উপাদানের তাৎপর্য্য নষ্ট হইতে এবং তাহার প্রতিপত্তি কমিতে থাকে, যদিও তখনও তাহা বিশ্বাস, অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান অথবা পুরাণ কথার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে; অবশেষে যখন এবং যেখানে সব কিছুকে বুদ্ধির এলাকায় ফেলিবার ঝোঁক প্রবলাকার ধারণ করে তখন ও তথায় ধর্ম্মের আর সব ভাসিয়া যায় কেবল-মাত্র মতবাদ, আচার অনুষ্ঠান, বাহ্যিক সাধনা বা নীতিবাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

এমন কি আধ্যাত্মিক অনুভবের ধারাটিও ক্ষীণ হইয়া আসে এবং কেবল বিশ্বাস, ভাবোচ্ছ্বাস এবং নৈতিক আচরণ থাকিলেই যথেষ্ট হইল বিবেচনা করা হয়; আদিযুগে ধর্ম্মবোধ, বিভূতিবিদ্যা এবং অলৌকিক অনুভূতির যে মিশ্রণ ছিল তাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং প্রত্যেক ধারা নিজের পথে, নিজের বিশিষ্ট প্রকৃতি লইয়া স্বতন্ত্রভাবে নিজের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে যদিও এ ঝোঁকটা কখনও পূর্ণ ও সর্ব্বজনীনভাবে ফুটিয়া উঠে না তথাপি তাহা খুবই স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। ইহার চরম পর্ব্বে এমন অবস্থা আসে যখন ধর্ম্ম, বিভূতিবিদ্যা এবং যাহা কিছু জড়াতীত তৎসমস্তই পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়; বহির্ম্মুখ বুদ্ধির একটা আকস্মিক শুষ্ক কঠোর প্রবল আবেগ আসিয়া আমাদের প্রকৃতির গভীরতর অংশ সকলের আশ্রয়স্থলগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু তখনও পরিণামবিধাত্রী প্রকৃতি তাহার চরম উদ্দেশ্য ও আকৃতিগুলিকে দুইচারিটি সাধকের হৃদয়ে বাঁচাইয়া রাখে এবং মানুষের বৃহত্তর মনোময় পরিণামের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে আরও গভীর করিয়া তোলে, আরও উচ্চতর ভূমিতে তুলিয়া দেয়। বর্ত্তমান সময়েও দেখিতে পাই বিজয়ী বুদ্ধি এবং জড়বাদের যুগের পর মানুষের মধ্যে এই স্বাভাবিক ধারার পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে, অন্তর্ম্মুখী হইয়া আত্মাকে আবিষ্কার করিবার আকৃতি, অন্তরের মধ্যে খুঁজিবার এবং অন্তর্ম্মুখী হইয়া ভাবিবার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে আসিতেছে, অলৌকিক অনুভবের জন্য নূতন সাধনা, অন্তরাত্মাকে পাইবার জন্য পুনঃ প্রচেষ্টা চিৎপুরুষের সত্য এবং শক্তির একটা বোধ মানুষের মধ্যে আবার জাগিয়া উঠিতে চাহিতেছে, মানুষ তাহার চৈত্যসত্তা তাহার আত্মা এবং বস্তুর গভীরতর তত্ত্বকে অন্বেষণ করিতে গিয়া তাহার হারাইয়া যাওয়া শক্তি ফিরিয়া পাইতে বসিয়াছে, সে শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে; অতীতের সাধন-পদ্ধতিতে নূতন প্রাণসঞ্চার এবং নূতন সাধন-পদ্ধতি আবিষ্কার করিতেছে এবং সাম্প্রদায়িকতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে নূতন ধর্ম্মমত গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। জড় প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কারের যে স্বাভাবিক সামর্থ্য তাহার ছিল তাহা প্রায় শেষ-সীমায় বা তাহার সাধ্যের অবধিতে পৌঁছিয়া বুদ্ধি নিজেও দেখিতে পাইতেছে যে প্রকৃতির বাহ্যক্রিয়া-ধারা ছাড়া আর কিছুরই ব্যাখ্যা দিতে সে সমর্থ হয় নাই, তাই এখনও পরীক্ষা-মূলকভাবে এবং দ্বিধান্দোলিত চিত্তে হইলেও, সে তাহার সন্ধানীদৃষ্টি মন ও প্রাণশক্তির গভীর গোপন রহস্যের দিকে এবং যাহাকে সে এতকাল নিজের

ধারণার অনুযায়ীভাবে বর্জন করিয়াছিল সেই অতীন্দ্রিয় রহস্যালোকের দিকে ফিরাইতে আরম্ভ করিয়াছে, জানিতে চাহিতেছে তাহার মধ্যে কি সত্য আছে। ধর্ম্মও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার শক্তির পরিচয় দিয়াছে এবং পরিণামধারা ধরিয়া সে-ও অগ্রসর হইতেছে, তাহার চরম তাৎপর্য্য এখনও আমাদের বুদ্ধির অগোচরে রহিয়াছে। মনের এই যে নূতন পর্ব্বে আমরা যাত্রারম্ভ করিয়াছি তাহার মধ্যে যতই স্থূলভাবে যতই দ্বিধার সহিত হউক না কেন চরমভাবে নূতন দিকে ফিরিবার, প্রকৃতির মধ্যস্থ চিৎপরিণামের দিকে অগ্রসর হইবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে এবং সে দিকে যে প্রবল চাপ বা আবেগ আছে তাহা ধরা পড়িয়াছে। প্রাচীনযুগে ধর্ম্মের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ছিল কিন্তু সে অবযৌক্তিক বা প্রাগ্‌যৌক্তিক স্তরে তাহার মধ্যে অনেকটা অস্পষ্টতা ছিল, বুদ্ধির অতিরিক্ত চাপে পড়িয়া সকল বাহুল্য বর্জন করিয়া সে ধর্ম্ম এক ঋজু অনাড়ম্বর যুক্তিময় মধ্য রূপে পরিণত হইতে চলিয়াছিল কিন্তু অবশেষে মানব-মনের উত্তরায়ণের পথে ধর্ম্মকে তাহার ঊর্দ্ধমুখী রূপরেখা অনুসরণ করিতেই হইবে এবং দিব্য জ্ঞান ও অতিচেতনার দিব্য ধামে তাহার উচ্চতম স্তর এবং বৃহত্তম যে স্বক্ষেত্র আছে তথায় পূর্ণরূপে তাহাকে পৌঁছিতেই হইবে।

অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রকৃতিপরিণামের এই ধারার নিদর্শন-সকল আমরা দেখিতে পাই, যদিও প্রথম স্তরগুলির অধিকাংশ ইতিবৃত্ত প্রাক্‌-ইতিহাসের অলিখিত পৃষ্ঠায় আমাদের কাছে গোপন রহিয়াছে। আদিম বা অসভ্য জাতির মধ্যে নানাপ্রকার আচরণ বিশ্বাস বা মতবাদ প্রচলিত আছে বা ছিল; যেমন সকল জড় পদার্থকে মনুষ্যের মত ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট মনে করা (animism), পিশাচাশ্রিতবোধে কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির পূজা করা (Fetishism), এক এক জাতীয় মানুষ এক এক ইতরপ্রাণী বা বৃক্ষ হইতে জাত হইয়াছে মনে করা (totemism), কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে পবিত্র বা অস্পৃশ্যজ্ঞানে পরিহার করা (taboo) ইত্যাদি, ইহা ছাড়া আছে যাদুবিদ্যা (magic) পুরাণের উপকথা (myth) কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রতীকোপাসনা (কোন কোন ঔষধের ক্রিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হাতুড়ে বৈদ্য অনেক সময় যাহার পুরোহিত), কাহারও কাহারও মতে ধর্ম্ম এই সমস্ত আচরণ, বিশ্বাস এবং মতবাদের একটা জগাখিচুড়ী ছাড়া আর কিছু নয়; আর্দ্র মাটিতে যেমন ব্যাঙের ছাতা জন্মে তেমনি ধর্ম্ম আদিম যুগের মানুষের অজ্ঞানার্দ্র মন হইতে জাত ভাব মাত্র; অবশেষে যখন তাহা চরমোৎকর্ষে পৌঁছিয়াছে তখনও তাহা একপ্রকার প্রকৃতি পূজা। আদিম মানুষের

মনে ইহাই হয়ত ধর্ম্মের রূপ ছিল যদিও সঙ্গে সঙ্গে একথা বলিতে হইবে যে ইহাদের অনেক বিশ্বাস ও আচরণের পশ্চাতে নিম্নতর হইলেও একটা সবল ও কার্য্যকরী সত্যের ভিত্তি ছিল, আমাদের উচ্চতর উৎকর্ষের মধ্যে আসিয়া যাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আদি মানব সাধারণতঃ প্রাণসত্তার নিম্ন এবং সংকীর্ণ ভূমিতে বাস করিত, অতীন্দ্রিয় ভূমিতে তাহার অনুরূপ গুণযুক্ত এক অদৃশ্য প্রকৃতির রাজ্যও আছে; তাহার রহস্য তাহার নিম্নতর প্রাণের বোধি এবং সহজবুদ্ধি কতকটা জানিতে পারিত, তাই সেই জ্ঞান এবং উপযোগী সাধনার দ্বারা সেই অদৃশ্য প্রকৃতি হইতে গোপন শক্তিকে আকর্ষণ করিতে সে আদিমানব সমর্থ হইত। এইরূপে ধর্ম্মের বিশ্বাস ও সাধনার একটা প্রাথমিক স্তর হয়ত গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহার প্রকৃতিতে এবং লক্ষ্যে অপুষ্ট ও অমার্জিত-ভাবে রহস্যবিদ্যার দিকে ঝোঁক ছিল—কিন্তু তখনও তাহা অধ্যাত্ম বিদ্যা হইয়া উঠে নাই; এরূপ ধর্ম্মের প্রধান উপাদান ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণশক্তি এবং সূক্ষ্মভূতময় সত্তাসকলকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সাহায্যে প্রাণের ছোট ছোট কামনার পরিতৃপ্তি সাধন এবং স্থূলভাবে বাহ্য ঐশ্বর্য্যলাভের চেষ্টা।

আমরা এখনও যতটুকু দেখিতে পাইতেছি তাহাতে ধর্ম্মবোধের এই আদি-স্তর, সভ্যতার কোন পূর্ব্বকল্পে প্রচলিত উচ্চতর জ্ঞান হইতে পতন বা তাহার চিহ্ন অথবা কোন লুপ্ত বা অপ্রচলিত পুরাতন সংস্কৃতির বিকৃত অবশেষ হইতে পারে; যদি তাহা না-ও হয় তথাপি তাহা ছিল ধর্ম্মের কেবল আরম্ভ বা আদিম-পর্ব্বমাত্র। তাহার পর তাহা অনেক স্তর পার হইয়া আরও উন্নত ধরণের ধর্ম্মরূপে দেখা দিয়াছিল, যাহার বিবরণ আমরা প্রাচীন সভ্যজাতিসকলের সাহিত্য বা লেখমালার অবিলুপ্ত অংশে দেখিতে পাই। এই ধরণের ধর্ম্মের মধ্যে আছে বহু দেবতায় বিশ্বাস এবং তাহাদের উপাসনা, সৃষ্টিতত্ত্বের একটা বর্ণনা, পুরাণ কাহিনী, নানা আচার অনুষ্ঠান সাধনা এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতার জটিল সমাহার—যে সমস্ত অনেক সময় সমাজ-ব্যবস্থার সহিত ওতপ্রোত হইয়া গভীরভাবে জড়ীভূত হইয়া গিয়াছে, সাধারণতঃ ইহা জাতি বা উপজাতির ধর্ম্ম এবং বিশেষভাবে ইহা সে জাতি চিন্তা ও জীবনের পরিণতিপথে যে স্তরে পৌঁছিয়াছে তাহার অন্তরঙ্গ পরিচয় দেয়। এ ধর্ম্মের বাহিরের কাঠামোতে কোন গভীর আধ্যাত্মিকতার তাৎপর্য্য আমরা দেখিতে পাই না; কিন্তু অধিক-তর উন্নত সংস্কৃতিসকল বিভূতিবিদ্যা এবং গুহ্যসাধনার এক সবল পটভূমিকা

দ্বারা অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সাধনার প্রাথমিক উপাদানযুক্ত অতিযত্নে গোপনে রক্ষিত রহস্যবিদ্যার ভিত্তির উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এ ন্যূনতা পূরণ করিতে চাহিয়াছে। তবুও এ সব ক্ষেত্রে বিভূতিবিদ্যা অনেক সময় একটা অতিরিক্ত অঙ্গ রূপেই রাখা হইয়াছে, ধর্ম্মের সর্ব্বক্ষেত্রে তাহা উপস্থিত থাকে নাই; দিব্য শক্তিসকলের উপাসনা, যাগযজ্ঞ, বাহ্যসদাচার এবং সমাজ-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন ইহারাই তখন ধর্ম্মের প্রধান উপাদান। মনে হয় যে প্রথমে অধ্যাত্ম দর্শন বা জীবনের অর্থ ও লক্ষ্য কি তাহার কোন বিশিষ্ট ধারণা এ অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল না, কিন্তু অনেক সময় রহস্যবিদ্যায় এবং পুরাণকথায় তাহার প্রাথমিক রূপ বা আভাস সূচিত হয় এবং দু একটা এমন উদাহরণও দেখা গিয়াছে যেখানে তাহা অবান্তর ভাবসকলের মধ্য হইতে পূর্ণরূপে বাহির হইয়া আসিয়া প্রবল ভাবে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পরিচয় দিয়াছে।

বস্তুত ইহা সম্ভব যে সর্ব্বত্রই রহস্যবিদ্যাবিৎ মরমী বা বিভূতিবিদ্যার প্রবর্ত্ত সাধকই ধর্ম্মের স্রষ্টা, তাহারাই নিজেদের রহস্যানুভবকে নানা বিশ্বাস, পুরাণ কাহিনী এবং অনুষ্ঠানের আকারে সর্ব্বসাধারণের চিত্তে সংক্রামিত করিয়াছেন; কেননা ব্যষ্টিপুরুষের কাছেই প্রকৃতির বোধিজাত রহস্যজ্ঞান সর্ব্বপ্রথম ধরা পড়ে এবং অন্য সকল মানুষকে নিজের পশ্চাতে টানিয়া লইয়া ব্যক্তিই নূতন পথে অগ্রসর হয়। এমন কি যদি স্বীকার করি যে নূতন সৃষ্টি অবচেতন গণচিত্তেই প্রথম দেখা দেয় তবু সে চিত্তের গুপ্ত বিদ্যাময় উপাদান বা রহস্যানু-ভূতিমূলক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাহার সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি হয় এবং ব্যক্তি-বিশেষকে যোগ্য আধার রূপে পাইলে তাহার মধ্য দিয়াই অভিব্যক্তি সম্ভব হয়; কেননা গণচিত্তে কোন নূতন অনুভূতি বা আবিষ্কার অথবা প্রকাশকে ব্যাপকভাবে ফুটাইয়া তোলা প্রকৃতির প্রাথমিক কর্ম্মধারা নহে; প্রথমে এক বিন্দুতে অথবা কতিপয় বিন্দুতে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠে এবং তথা হইতে এক অগ্নিস্থল হইতে অন্য অগ্নিস্থলে এক বেদী হইতে অন্য বেদীতে সে অগ্নি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মরমীয়া সাধকগণের আধ্যাত্মিক আকূতি এবং অনু-ভূতির কথা সাধারণতঃ সূত্রাকারে সযত্নে গোপনে রক্ষা করা হইত এবং দু চারিটি দীক্ষিত ছাড়া আর কাহাকেও দেওয়া হইত না; শুধু ধর্ম্ম-সাধনার পরম্পরাগত প্রতীকসকলের মধ্য দিয়া তাহা সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা হইত অথবা বরং এইভাবে তাহাদের জন্য রক্ষিত হইত। আদিকালের মানবের চিত্তে এই সমস্ত প্রতীকই ধর্ম্মের মর্ম্মরহস্যের বাহন ছিল।

ধর্ম্ম-সাধনার এই দ্বিতীয় স্তর হইতে তৃতীয় আর একটা স্তর উন্মিষিত হইয়া উঠিল যাহা গোপন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে মুক্তি দিতে এবং তাহার সত্যকে সকলের নিকট পরিবেশন করিতে চাহিল। তাহার মধ্যে যাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট রুচিকর তাহাকে সর্ব্বজনলভ্য করিতে উৎসুক হইল। আধ্যাত্মিকতাকেই ধর্ম্মসাধনার মর্ম্মকথা করিবার দিকে যেমন ঝোঁক পড়িল তেমনি প্রকাশ্য শিক্ষার দ্বারা তাহা সকল সাধকের অধিগম্য করিবার চেষ্টা চলিল; গোপনভাবে যাহারা সাধনা করিত তাহাদের প্রতি সম্প্রদায়ের যেমন বিদ্যা ও সাধনার বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি ছিল এবার তেমনি প্রত্যেক ধর্ম্মে দেখা দিল তাহার নিজস্ব মতবাদ ও দর্শন এবং অধ্যাত্ম-সাধনার বিশিষ্ট ধারা। এইখানে চিন্ময় পরিণামের দুইটি পদ্ধতির দেখা পাওয়া যায়—একটি অন্তরঙ্গ মরমী সাধকগণের অপরটি বহিরঙ্গ বা ধার্ম্মিকগণের পদ্ধতি। এ দুইটির মধ্যে পরিণামবিধাত্রী প্রকৃতির দুইটি পৃথক তত্ত্বকে ফুটাইবার প্রয়াস দেখিতে পাই, একটি সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে সংহত হওয়া এবং শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া গভীরতার দিকে অগ্রসর হওয়ার তত্ত্ব, অপরটি বিসৃষ্টিকে ব্যাপকভাবে যত বৃহৎ ক্ষেত্রে সম্ভব বিস্তারিত ও প্রসারিত করিয়া দেওয়ার তত্ত্ব। প্রথমটির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত ও একাগ্র হইয়া সক্রিয় শক্তিকে সফল করিয়া তোলা, দ্বিতীয়টি চায় তাহার ব্যাপ্তি এবং প্রতিষ্ঠা। সকলের মধ্যে আধ্যাত্মিকতাকে এইভাবে ছড়াইয়া দেওয়ার এই নূতন প্রচেষ্টার ফলে যে আধ্যাত্মিক আকৃতি ও সম্পদ কয়েকজনের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত ছিল তাহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল বটে কিন্তু তাহার শুচিতা, উচ্চতা এবং গভীরতা ও সংবেগ কমিয়া গেল। অধ্যাত্ম রসিক বা মরমীদের সাধনার ভিত্তি ছিল বোধিজাত, অনুপ্রেরণালব্ধ, দিব্যভাবাবেগে উৎসারিত অতর্ক্য জ্ঞানের শক্তি; তাঁহারা তাঁহাদের অন্তরপুরুষের শক্তিযোগেই অতীন্দ্রিয় সত্য এবং অনুভবের জগতে প্রবেশ করিতে চাহিতেন কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ সমস্ত শক্তি নাই, যাহা আছে তাহাও অমার্জিত, অপরিণত, আংশিক এবং প্রাথমিক—তাহার উপর ভিত্তি করিয়া নিরাপদে কিছু গড়িয়া তোলা যায় না; তাই এ নূতন পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিক সত্যকে বুদ্ধিকল্পিত মতবাদের সজ্জায় সাজাইতে হইল, উপাসনা-পদ্ধতি রহিল শুধু ভাবাবেগ এবং সরল অথচ অর্থপূর্ণ আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে। সেই সংগে সবল অধ্যাত্ম সাধনার কেন্দ্র (nucleus) নিম্নতর ভাবের সহিত মিশ্রিত এবং ক্ষীণ হইয়া পড়িল। মনপ্রাণদেহের নিম্নতর বৃত্তি তাহাকে

আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইল এবং তাহারা তাহার নকল করিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে আসলের সহিত নকলের খাদ মিশ্রিত হইয়া পড়ায় গুহ্য-তত্ত্ব কলুষিত হওয়ার ফলে তাহার সত্য ও সার্থকতা হানি হওয়া, অদৃশ্যশক্তির সহিত যোগস্থাপনের বলে লব্ধ অলৌকিক শক্তির অপব্যবহার করা প্রাচীন অধ্যাত্মরসিকগণ অত্যন্ত ভয়ের চক্ষুতে দেখিতেন এবং এ সমস্তকে কঠিন বিধি-নিষেধ দ্বারা গোপনে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন, প্রকৃত অধিকারী সাধক ছাড়া অন্য কাহাকেও ইহার তত্ত্ব জানান হইত না। এই ভাবের অতিবিস্তার এবং তজ্জনিত ব্যভিচারের আর একটা অবাঞ্ছিত ও বিপজ্জনক ফল এই হইয়াছে যে অধ্যাত্মবিদ্যাকে বুদ্ধির নির্দ্দিষ্ট আকারের মধ্যে ঢুকাইতে গিয়া তাহাকে মতবাদে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে। জীবন্ত সাধনার প্রাণশক্তিকে আচার অনুষ্ঠান ব্রতনিয়মের প্রাণহীন বিপুল বোঝার তলায় চাপা দিয়া তাহাকে যান্ত্রিক সাধনায় পরিণত করা হইয়াছে, ইহার ফলে কালক্রমে ধর্ম্মের দেহ হইতে তাহার প্রাণ তাহার আত্মা চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতিকে বাধ্য হইয়া এ বিপদ বরণ করিতে এ ঝুঁকি লইতে হইয়াছে, কেননা পবিব্যাপ্ত করিয়া দেওয়াও পরিণামবিধাত্রী প্রকৃতির চিন্ময় প্রবেগের একটা অঙ্গ একটা অপরিহার্য্য প্রয়োজন।

যে সমস্ত ধর্ম্ম অধ্যাত্ম সিদ্ধির জন্য প্রধানতঃ প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা এবং আচার অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে, এইভাবেই তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে; তথাপি তাহাদের মধ্যে যাহা প্রথমে বিদ্যমান ছিল সেই অনুভূতির সত্য এবং অন্তরস্থিত মৌলিক তত্ত্বজ্ঞানের জন্য তাহারা টিকিয়া থাকে এবং ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা বাঁচিয়া থাকে যতদিন তাহাদের মধ্যে এমন সব সাধক জন্মলাভ করেন যাঁহারা সে ধারাকে বজায় রাখিতে বা পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন, যাঁহাদের মধ্যে তীব্র অধ্যাত্ম সংবেগ জাগে এবং যাঁহারা এই ধর্ম্মকে উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া ভগবানকে লাভ এবং আত্মাকে মুক্ত করিতে পারেন। এই ভাবের পরিণতির ফলে কালক্রমে দুই প্রকার সাধনপন্থা এবং উদারপন্থী (Catholic) ও নববিধানী (Protestant) এই দুই দল সাধকের উদ্ভব হয়;—প্রথম মতের ঝোঁক ধর্ম্মের আদি সাবলীল প্রকৃতি অনেকটা বজায় রাখিবার দিকে, তাহারা চায় ধর্ম্মের মধ্যে যে বহুমুখীতা আছে, ধর্ম্ম মানুষের সমগ্র প্রকৃতির নিকট যে আবেদন জানায় তাহা যেন নষ্ট না হয়; নববিধানী এই উদারতা, এই প্রসারতা ভাঙ্গিয়া দিতে চায়, সে চায় শুধু বিশ্বাস, উপাসনার এবং আচার অনু-

ষ্ঠানের অনাড়ম্বরতার উপর পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে, যাহাতে সাধারণবুদ্ধি, হৃদয় এবং নৈতিক প্রবৃত্তি শীঘ্র এবং সহজে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। নববিধানের তাগিদে ধর্ম্মের যে মোড় ফিরিয়াছে তাহাতে যুক্তিবাদের আতিশয্য দেখা দিয়াছে, যাহা ইন্দ্রিয়াতীত তাহার সহিত যোগস্থাপনের জন্য রহস্য-বিদ্যা বা গুহ্য সাধনার যে সকল ধারা ছিল তাহাদের অধিকাংশকে অবিশ্বাস ও নিন্দা করা হইয়াছে, অধ্যাত্ম সাধনার জন্য বহিশ্চর মনের বৃত্তি সকলের অনুশীলনই যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে; এইজন্য প্রায়ই দেখা যায় যে নববিধানী সম্প্রদায়ে ধর্ম্মজীবন অনেকটা শুষ্ক, সঙ্কীর্ণ ও নিঃস্ব হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া বুদ্ধি এত বর্জন ও এত অস্বীকার করিয়া আরও অস্বীকার করিবার এমন সুযোগ ও সুবিধা লাভ করে যে অবশেষে সকলই অস্বীকার করিয়া বসে, তখন সে আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে মিথ্যা বলে, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা বর্জন করে, তখন বুদ্ধি অন্য সকলকে ধ্বংস করিয়া নিজের শক্তিকেই শুধু বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। চিন্ময়-ভাব-বর্জিত বুদ্ধি অপরা বাহ্য বিদ্যা ও নানাযন্ত্রের স্তূপ গড়িয়া তাহাদিগকে খুবই কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারে কিন্তু তাহার ফলে প্রাণ-শক্তির গোপন উৎস শুকাইয়া যায়, জীবনকে রক্ষা অথবা নূতন জীবন সৃষ্টি করিবার জন্য কোন নূতন শক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাই তাহার ক্ষয় হইতে থাকে। তখন বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়া, মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ করা এবং পুরাতন অজ্ঞান হইতে নূতন যাত্রারম্ভ করা ছাড়া অন্য উপায় বর্ত্তমান থাকে না।

আদিম কালের পূর্ণতা ও অখণ্ডতাকে রক্ষা করিয়া, প্রাচীন জ্ঞানগর্ভ সুষমা ও সামঞ্জস্যকে ধ্বংস না করিয়া কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং ছড়াইয়া পড়ার তত্ত্বদ্বয়কে এক বৃহত্তর সমন্বয়ে গ্রথিত করিয়া আত্মপ্রসারের দিকে অগ্রসর হওয়া পরিণাম বিধায়ক তত্ত্বের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে ভারতবর্ষে বোধির আদিম প্রবেগ এবং প্রকৃতি পরিণামের অখণ্ড ও সমগ্র ক্রিয়া বজায় আছে। কেননা ভারত কখনও এক বিশিষ্ট ধর্ম্মপদ্ধতি বা এক বিশিষ্ট মতের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে নাই। ধর্ম্মের বিচিত্ররূপায়ণের সমারোহকে সে শুধু যে স্বীকার করিয়াছে তাহা নহে, ধর্ম্মের ক্রমিক বিকাশে যে কোন উপাদান, যে কোন বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে সে-সমস্তই সে সফলতার সহিত নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। কোনটাকে সে নিষেধ করে নাই বা ছাঁটিয়া ফেলিতে চায় নাই; সে রহস্যবিদ্যার সাধনাকে চরমে তুলিয়াছে। সকল প্রকার অধ্যাত্ম বিচার বা দর্শনকে নিজের মধ্যে স্থান

দিয়াছে, অধ্যাত্ম অনুভব অধ্যাত্ম সিদ্ধি এবং অধ্যাত্ম সাধনার প্রতিটি সম্ভাবিত ধারা অনুসরণ করিয়া তাহাকে উচ্চতম, গভীরতম এবং বৃহত্তম করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে। প্রকৃতি-পরিণামেরই স্বাভাবিক ব্যাপক ধারা সে গ্রহণ করিয়াছে, সকল সাধন পদ্ধতিকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে দিয়াছে, চিৎপুরুষের সংগে যোগ-সূত্রের সকলগুলিকেই সে গ্রহণ এবং মানুষের প্রতি চিৎসত্তার প্রত্যেক বিশিষ্ট ক্রিয়াধারাকে স্বীকার করিয়াছে। মানুষ এবং পরম বা দিব্যপুরুষের সংগে মিলনের যত উপায় আছে তাহার প্রত্যেককে অনুসরণ করিতে এবং তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রত্যেক সম্ভাবিত পন্থা ধরিয়া অগ্রসর হইতে চাহিয়াছে এবং তাহার উৎকটতম আতিশয্যকেও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ভীত হয় নাই। মানুষের মধ্যে চিন্ময়-পরিণামের সকল স্তরেরই লোক আছে, প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্য তাহার অধিকার অনুযায়ী পথে চলিতে দিয়াছে, প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত পথ দেখাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনার তুঙ্গতম শিখরে সূক্ষ্মতম পরম ব্যোমে পৌঁছিবার চাপ থাকা সত্ত্বেও আদিম যে ধর্ম্মসাধনা এখনও বাঁচিয়া আছে তাহাকে উপেক্ষা করে নাই বরং তাহার মধ্যে গভীরতর তাৎপর্য্যের আবিষ্কার করিয়া তাহাকে উপরে টানিয়া তুলিতে চাহিয়াছে। এমন কি যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অপরকে বর্জন করিয়া একাই নিজেব পথে চলিতে চায় তাহাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। আধ্যাত্মিকতার সাধারণ লক্ষ্য এবং তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ স্পষ্ট থাকিলে ধর্ম্মসাধনার অগণিত বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহারও স্থান হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মসাধনার এই উদার সাবলীলতাকে সে ধর্ম্মশাসিত এক পরিবর্ত্তনশূন্য সমাজব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে। পর্ব্বে পর্ব্বে মানুষের প্রকৃতিকে উন্নতির পথে লইয়া গিয়া পরিশেষে তাহাকে অধ্যাত্ম সাধনার এক উচ্চতম বা চরম স্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়া ছিল সে ব্যবস্থার মূল সূত্র; সামাজিক জীবনের এই পরিবর্ত্তনহীনতা হয়তো এক সময় সমাজ-জীবনের ঐক্য-সাধনের জন্য প্রয়োজন ছিল, হয়তো তাহা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মুক্তি ও স্বাধীনতার নিরাপদ এবং দৃঢ় ভিত্তিও হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহা একদিকে যেমন সমাজকে আত্মরক্ষার শক্তি দিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে অখণ্ড ঔদার্য্যের স্বাভাবিক প্রকাশে বাধা দিয়াছে, বিশিষ্টভাব লইয়া দানাবাঁধার অনিষ্টকর আতিশয্য আনিয়াছে, পরিণতির পথে একটা বাধা একটা সীমাবন্ধন আনিয়া ফেলিয়াছে। একটা দৃঢ় ভিত্তি থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইতে পারে কিন্তু মূলতঃ ইহা স্থির করিলেও পরিণামের জন্য যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, তাহার

সঙ্গে মিল রাখিয়া চলিবার জন্য সে ভিত্তিতেও সাবলীলতা এবং নমনীয়তা থাকা প্রয়োজন, সমাজে একটা শৃঙ্খলা একটা ব্যবস্থা চাই কিন্তু সে শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাও বৃদ্ধি ও উন্নতিশীল হওয়া চাই।

তবু বলিব যে ভারতের এই মহান ও বহুমুখী ধর্ম্ম-সাধনা এবং অধ্যাত্ম-পরিণাম খাঁটি পথেই অগ্রসর হইয়াছে, এদেশে ধর্ম্ম মানুষের সমগ্র জীবন এবং সমগ্র প্রকৃতিকেই নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে, বুদ্ধির স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির বিরোধী না হইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছে তাহার স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে নাই বরং নিজের অধ্যাত্ম-এষণার সহায়রূপে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে, এইভাবে ধর্ম্ম ও বুদ্ধির মধ্যের বিরোধ দূর করিয়াছে এবং ইহাদের কাহাকেও অযথা প্রাধান্য দেয় নাই ; এইজন্য ভারতে পাশ্চাত্য দেশের মত বুদ্ধি ও ধর্ম্মের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে নাই অথবা বুদ্ধিকে অযথা প্রাধান্য দিয়া স্বাভাবিক ধর্ম্মবোধকে সংকুচিত করিতে ও শুকাইয়া ফেলিতে এবং মানুষকে জড়বাদ ও ইহসর্ব্বস্বতার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হয় নাই। ধর্ম্মের সকল রূপ ও সকল প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়াও সকল রূপ ও ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়ার, সকল প্রকার উপাদানকে ধর্ম্মসাধনার মধ্যে স্থান দেওয়ার এবং ধর্ম্মের এইরূপ সার্ব্বজনীন ও সাবলীল ধারার অনুসরণ করিবার জন্য হয়ত এমন অনেক ফল দেখা দেয়, শুদ্ধিবাদী যাহাতে এই ধরণের সাধনপ্রণালীর বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিতে পারে ; কিন্তু যাহাতে ইহা বিপুলভাবে সমর্থনযোগ্য হইয়া উঠে তেমন এই শুভ ও মহৎ ফল প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাইতেছে যে এদেশে আধ্যাত্মিক এষণা, সাধনা এবং সিদ্ধির এক অতিবিচিত্র অভূতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখা দিয়াছে, এ সমস্ত সম্পদকে সহস্রাধিক বৎসর বাঁচাইয়া রাখিবার সামর্থ্য এবং অজেয়ভাবে তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়াছে, তাহাদিগকে সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছে, সার্ব্বজনীন করিয়াছে, তাহাদিগকে অত্যুচ্চ ভূমিতে স্থাপিত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সূক্ষ্মতা এবং বহুমুখী প্রসারতা আনিয়াছে। বস্তুতঃ এইরূপ ঔদার্য্য এবং সাবলীলতা ছাড়া প্রকৃতি-পরিণামধারার সেই উদারতর উদ্দেশ্য কোন প্রকার পূর্ণতার সহিত কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। ব্যষ্টি-ব্যক্তি ধর্ম্মের কাছে চায়, যাহার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক অনুভূতির রাজ্যে সে প্রবেশ করিতে পারে এমন কোন দরজা অথবা তাহারি অনুকূল কোন সাধনার ধারার সন্ধান। সে চায় ভগবানের সহিত মিলন, অথবা প্রগতির পথে চলিবার জন্য দিশারী কোন নির্দ্দিষ্ট আলোকের দীপ্তি, চায় ইহোত্তর সিদ্ধির আশ্বাস ; জগতের

অতীত কোন ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে যাহাতে অধিকতর আনন্দে বাস করিতে পারে এমন কোন উপায় উদ্ভাবন, সাম্প্রদায়িক মত এবং বিশ্বাসের সংকীর্ণ ভূমিতে থাকিলেও মানুষের এই সমস্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির গভীরতর উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষকে চিন্ময়-পরিণামের জন্য প্রস্তুত করা, তাহার মধ্যে চিন্ময় স্বভাব ফুটাইয়া তোলা, এই মর্ত্ত্যের মানুষকেই চিন্ময় মানুষে রূপান্তরিত করা ; মানুষের সাধনা এবং আদর্শের মুখ এই লক্ষ্যের দিকে ফিরাইয়া দিয়া ধর্ম্ম প্রকৃতির এই মহান কার্য্যে সহায়তা করে, যাহারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেককে এই মহান্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য নূতন পদক্ষেপের সুযোগ ও সম্ভাবনা আনিয়া দেয়। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রকৃতি অগণিত মত ও পথের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের কোনটা চূড়ান্ত আদর্শানুরূপ ভাবে গঠিত এবং অপরিবর্ত্তনীয়, আবার অন্য কোনটা অধিকতরভাবে সাবলীল নমনীয় বহুবিচিত্র এবং বহুমুখী। যে ধর্ম্ম নিজের মধ্যে বহু ধর্ম্মের মিলন ও সমন্বয় সাধিত কবিতে অথচ সেই সঙ্গে প্রত্যেকের অন্তরের অনুভবের উপযোগীরূপে তাহার সাধন ধারার নির্দ্দেশ দিতে সমর্থ তাহাকেই প্রকৃতির এই উদ্দেশ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অনুগত ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে ; সেই ধর্ম্মই হইবে আধ্যাত্মিকতার এক সমৃদ্ধ তরুণ-তরু-বাটিকা (nursery), সেখানে অধ্যাত্মভাব বহুধাপুষ্ট ও পুষ্পিত হইবে ; সেই ধর্ম্মই হইবে জীবাত্মার তপস্যা সাধনা ও সিদ্ধির জন্য বহুশ্রেণীযুক্ত সুবৃহৎ বিদ্যাভবন। ধর্ম্ম যে কোন ভ্রমই করিয়া থাকুক না কেন ইহাই তাহার পেশা বা কাজ এবং তাহার মহৎ ও অপরিহার্য্য উপযোগিতা —চিৎপুরুষের পরম পূর্ণ চেতনা এবং আত্মজ্ঞানের দিকে চলিবার জন্য অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের অন্ধকারা-বৃত পথে আমাদের দিশারীরূপে ক্রমবর্দ্ধমান আলোকপাত করাই ধর্ম্মের সে মহৎকাজ।

মূলতঃ রহস্যবিদ্যা বা অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানে আছে প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্গূঢ় সত্য এবং সম্ভাবনাসকলকে জানিবার জন্য মানুষের সাধনা, যাহার ফলে সঙ্কীর্ণ জড়ের দাসত্ব হইতে মানুষ মুক্তি পাইতে পারে ; তাহার বিশেষ লক্ষ্য মনের যে শক্তি প্রাণের এবং প্রাণময় মনের যে শক্তি জড়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়া করিতে পারে অথচ বর্ত্তমানে যাহা বাহিরের ক্ষেত্রে এখনও অপরিণত রহিয়াছে রহস্যময় সেই গোপন শক্তিকে অধিকার এবং ইষ্টসিদ্ধির অনুকূলে তাহাকে সুগঠিত করা। সেই সঙ্গে তাহার মধ্যে এমন একটা সাধনার ধারা

আছে যাহার বলে বিশ্বসত্তার মধ্যে উচ্চে গভীরে এবং মধ্যবর্ত্তী স্তরে যে সমস্ত অতীন্দ্রিয় জগৎ ও সত্তা আছে, তাহাদের সহিত যোগস্থাপন করা এবং সেই যোগসূত্রকে ব্যবহার করিয়া এক উচ্চতর সত্যকে আয়ত্তে আনা যায়—যাহার ফলে প্রাকৃতিক শক্তিসকলের উপর মানুষের প্রভুত্ব-স্থাপনের সঙ্কল্পের সহায়তা হইতে পারে। মানুষের এই অভীপ্সার ভিত্তি হইল তাহার এই বিশ্বাস এবং বোধিজাত এই জ্ঞান ও পরিচয় যে মানুষ শুধু মাটির জীব নয়, স্বরূপতঃ সে আত্মা, সে মনোময়, সে সঙ্কল্পময়, এই জগৎ এবং অন্য সকল জগতের সকল রহস্য সে জানিতে পারে, সে প্রকৃতির যে শুধু শিষ্য তাহা নহে প্রকৃতির সকল জ্ঞানে জ্ঞানী এবং তাহার প্রভু হইবার সামর্থ্যও তাহার আছে। রহস্যবিদ্যা জড়-জগতের গোপন তথ্যও জানিতে চাহিয়াছে, এই চেষ্টার ফলে সে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উন্নতি ও রসায়নের সৃষ্টি করিয়াছে, অন্য সমস্ত বিজ্ঞানের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়াছে, কেননা সে জ্যামিতির ও সংখ্যা-গণিতের জ্ঞান কাজে লাগাইয়াছে; কিন্তু ইহার চেয়েও বেশী করিয়া সে অতিপ্রাকৃত রহস্য জানিতে চাহিয়াছে। এই অর্থে রহস্যবিদ্যাকে অতিপ্রাকৃতের বিজ্ঞান বলা যায়, কিন্তু বস্তুতঃ যাহা জড়ের সীমানা পার হইয়া গিয়াছে এমন অতিপ্রাকৃত বিষয়ের আবিষ্কার করাই তাহার লক্ষ্য; তাহার মূল উদ্দেশ্য যাহা প্রাকৃতিক শক্তির বাহিরে গিয়া অলীক কল্পনা বা অলৌকিক কোন খেয়ালকে ইচ্ছামত সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে এমন কোন অসম্ভব আলেয়ার পিছনে ছোটা নয়। আমরা যাহাকে অতিপ্রাকৃত মনে করি বস্তুতঃ হয় তাহা প্রকৃতির অন্য কোন ভূমি বা স্তরের কোন ক্রিয়া জড়-প্রকৃতির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে অথবা তাহা রহস্য-বিজ্ঞানীর সাধনলব্ধ কোন জ্ঞান ও শক্তির ফলে ঘটিয়াছে, রহস্যবিজ্ঞানী সে জ্ঞান ও শক্তি বিশ্বময় সত্তা এবং বিশ্ব-শক্তির কোন উচ্চতর স্তর হইতে লাভ করিয়াছে এবং জড় ও জড়াতীত জগতের মধ্যে যে যোগসূত্র আছে অথবা জড়জগতে সে সূত্রকে কার্য্যকরী করিবার যে উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিয়া জড়জগতে কোন কিছু সফল করিয়া তুলিবার জন্য সে শক্তি এবং ক্রিয়াধারাকে ব্যবহার করিতেছে। প্রকৃতি জড়ের মধ্যস্থিত প্রাণ ও মনের যে সমস্ত শক্তি লইয়া বর্ত্তমান মানুষকে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, প্রাণ ও মনের তেমন অনেক শক্তিও আছে; এই যে সমস্ত শক্তি বর্ত্তমানে সম্ভাবনারূপে আছে, তাহাদিগকে আনিয়া জড় বস্তু এবং জড়ের ঘটনায় সংক্রামিত করা যায়; এমন কি সে সমস্ত শক্তিকে

বাদ দিয়া বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া এই ব্যবস্থার মধ্যে সে সমস্ত শক্তিকে স্ফুরিত করিয়া বর্ত্তমান ব্যবস্থার রূপান্তর সাধন করা যায় ; তাহার ফলে আমাদের নিজের মন ও দেহের উপর আমাদের মনের শাসন করিবার শক্তি বাড়িয়া যায়, অথবা অপরের মন প্রাণ দেহের কিম্বা বিশ্বশক্তির ক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়। আধুনিকেরা যে সম্মোহন-শক্তির কথা স্বীকার করেন তাহাও অতীন্দ্রিয় শক্তির আবিষ্কার এবং ইহার প্রণালীবদ্ধ ক্রিয়াধারার একটা উদাহরণ, যদিও ইহার জ্ঞানের সূত্র এবং প্রক্রিয়ার ধারা আমাদের পূর্ণরূপে জানা না থাকাতে এ বিদ্যার অধিকার এখনও আমাদের কাছে সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ ; অতীন্দ্রিয় শক্তির অতর্কিত এবং নিগূঢ় ক্রিয়া অন্য ভাবেও আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যায় কিন্তু সে ক্রিয়ার ধারা আমরা জানি না অথবা আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোক আছেন যাঁহারা অপূর্ণভাবে তাহা ধরিতে পারেন ; কেননা অপরের নিকট হইতে বা বিশ্বশক্তির ভাণ্ডার হইতে সর্ব্বদাই ভাবনা, বেদনা, সঙ্কল্প, সংবেগ ও প্রবেগের কত ইঙ্গিত ও প্রেরণা, প্রাণ ও মনঃশক্তির কত তরঙ্গ আমাদের উপর আসিয়া পড়ে অথবা আমাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তার করে। এই সমস্ত গতি ও ক্রিয়াধারা তাহাদের বিধান এবং সম্ভাবনা সকল জানা, তাহাদিগকে আয়ত্ত করা, তাহাদের পশ্চাতে অবস্থিত প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করা এবং কাজে লাগান অথবা তাহাদের হাত হইতে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সুসংহত এবং প্রণালীবদ্ধভাবে চেষ্টা করা রহস্যবিদ্যাব লক্ষ্য-সকলের মধ্যে পড়ে ; কিন্তু ইহা রহস্যবিদ্যার শুধু একাংশেরই কাজ ; কেননা এই স্বল্প-অধীত বিদ্যার বিশাল পরিধির মধ্যে সম্ভাবিত যে সকল ক্ষেত্র, প্রয়োগ-বিজ্ঞান এবং ক্রিয়াধারা আছে তাহা যেমন বহুবিচিত্র তেমনি বহুবিস্তৃত।

বর্ত্তমান সময়ে জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পরিধি বাড়িয়া যাওয়াতে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে জড়শক্তির অনেক গোপন রহস্য মানুষের আয়ত্তে আসিয়াছে এবং তাহাদিগকে মানুষ অনেক কাজে লাগাইয়াছে ; কিন্তু সেই সঙ্গে রহস্যবিজ্ঞানের প্রসারতা কমিয়াছে এবং অবশেষে জড় একমাত্র সত্যবস্তু এ এবং প্রাণ ও মন জড়ের আংশিক ক্রিয়া মাত্র এই যুক্তিতে রহস্য বিদ্যার চর্চ্চা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া জড়শক্তিই বিশ্বের সকল রহস্যের চাবি এই বিশ্বাসকে পোষণ করিয়া স্বাভাবিক সুস্থ এবং অস্বাভাবিক বিকৃত মনের এবং প্রাণের প্রবৃত্তি ও ক্রিয়াধারার মূলে

জড়শক্তির যে যান্ত্রিক ক্রিয়া ও গতি আছে তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া বিজ্ঞান মন ও প্রাণের সকল ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, আধ্যাত্মিকতাকে মননেরই একটা শাখা মনে করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বিজ্ঞানের এ প্রচেষ্টা সফল হইলে সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হইতে পারে, যাহারা মনে ও ধর্ম্ম বুদ্ধিতে তেমন অতি বৃহৎ ও ভীষণ বিপদ্‌জনক শক্তি ব্যবহার করিবার উপযুক্ত বা তজ্জন্য প্রস্তুত হয় নাই, এমন লোকের হাতে পড়িয়া এখনই বর্ত্তমানে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অনিপুণভাবে প্রয়োগ বা অপব্যবহার মানুষের দারুণ দুর্দ্দৈবের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কেননা আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তিরূপে যে সমস্ত গোপন শক্তি আমাদিগকে ধারণ করিয়া আছে তাহাদের জ্ঞান লাভ না করিয়া জড়শক্তি দ্বারা প্রাণ ও মনকে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে এইরূপ বিপদ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। পাশ্চাত্যদেশে রহস্যবিদ্যা কখনও সাবালিকা হয় নাই, দার্শনিক কোন প্রকার পাকা প্রণালীবদ্ধ ভিত্তির বা দার্শনিক কোন তত্ত্বের উপর স্থাপিত হয় নাই, তাই তেমন পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই, এইজন্য তাহাকে দূর করিয়া দেওয়া তেমন কঠিন হয় নাই। অতি-প্রাকৃতের মধ্যে যাহা চমকপ্রদ তাহার আলোচনাতেই সে অতি ব্যাপৃত ছিল অথবা অতিপ্রাকৃত শক্তিকে ব্যবহারিক কাজে লাগাইবার সূত্র এবং উপায় বাহির করিবার দিকেই তাহার প্রধান চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিয়া ভুল করিয়া বসিয়াছিল। এই অপচেষ্টার ফলে সে পথভ্রষ্ট হইয়া শুভ্র অথবা কৃষ্ণ (নির্ম্মল অথবা কলুষিত) যাদুবিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে অথবা গোপন রহস্যবিদ্যার চমকপ্রদ বা ঐন্দ্রজালিক সাজসজ্জার ও আয়োজন উপকরণের রাজ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং সমস্তদিক দেখিলে যাহা সীমিত এবং স্বল্পজ্ঞান তাহাকে অতিরঞ্জিত করিয়াছে। রহস্যবিদ্যার এই সমস্ত প্রবৃত্তি থাকাতে এবং বুদ্ধির দৃঢ় ভিত্তি না থাকাতে তাহার পক্ষে আত্মরক্ষা করা বা দুর্নামের হাত হইতে বাঁচা সহজ ছিল না, সে সুগম এবং সহজভেদ্য লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু মিশরে এবং প্রাচ্য দেশে এ বিদ্যার অনুশীলন হইয়াছিল আরও বৃহত্তর ও গভীরতর রূপে ; তাহার বিশেষ পরিণতরূপ অক্ষুণ্ণভাবে অনুপম তন্ত্রশাস্ত্রে আজিও আমরা দেখিতে পাই ; তন্ত্র অপ্রাকৃত ও অতীন্দ্রিয়ের বহুশাখ বিজ্ঞান-রূপেই যে শুধু দেখা দিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু ধর্ম্মসাধনার সকল গোপন উপা-দানের ভিত্তি সেখানে পাওয়া যায়, এমন কি তাহা অধ্যাত্ম সাধনা এবং আত্মোপ-

লব্ধির এক বৃহৎ এবং শক্তিশালী পন্থাও গড়িয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ যাহা মন প্রাণ এবং চিদ্‌বস্তুর গোপন প্রবৃত্তি ও ক্রিয়াধারা এবং সক্রিয় অতিপ্রাকৃত সম্ভাবনাসকলকে আবিষ্কার করিতে পারে এবং আমাদের মনোময় এবং প্রাণময় ও চিন্ময় সত্তার বৃহত্তর সার্থকতা সাধন করিবার জন্য তাহাদের নৈসর্গিক শক্তিকে ব্যবহার অথবা সেই ব্যবহারেব পদ্ধতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে পারে—তাহাই উচ্চতম রহস্যবিদ্যা।

সাধারণের বিশ্বাস এই যে রহস্যবিদ্যা কেবল যাদুবিদ্যা এবং যাদুবিদ্যার উপযোগী সূত্র বা তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যাপার, তাহাতে শুধু অতিপ্রাকৃত শক্তিসাধনার কৌশল আছে; কিন্তু ইহা শুধু রহস্যবিদ্যার একটা দিক, রহস্যবিদ্যা একেবারেই একটা কুসংস্কার নয়, যদিও গোপন প্রাকৃতিক শক্তির এই প্রচ্ছন্ন দিকটা যাহারা গভীরভাবে অথবা একেবারেই দেখে নাই কিম্বা তাহার সম্ভাবিত সামর্থ্যকে লইয়া আলোচনা এবং পরীক্ষা করে নাই, ভ্রমবশতঃ তাহাদের কাছে তেমন মনে হইতে পারে। জড় বিজ্ঞান যেরূপ বিপুল সফলতা লাভ করিয়াছে তদ্রূপ সূত্র ও মন্ত্র-তন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতির সুপ্ত শক্তিকে উদ্বোধিত এবং যন্ত্রের মত নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়া প্রাণ ও মনের শক্তিকে অদ্ভুত সাফল্যের সহিত অপ্রাকৃত ভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু রহস্যবিদ্যার এই প্রয়োগের ক্ষেত্র যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনি ইহা তাহার মুখ্য কর্ম্ম নহে। কেননা প্রাণ ও মনের শক্তির ক্রিয়া সূক্ষ্ম, বিচিত্র এবং সাবলীল, তাহাদের মধ্যে জড়ের কাঠিন্য নাই; তাহাদের ক্রিয়া, ক্রিয়ার ধারা এবং প্রয়োগের রহস্য জানিতে হইলে এমন কি তাহাদের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত সূত্র ও তন্ত্র-মন্ত্রের ক্রিয়া বুঝিতে গেলে সূক্ষ্ম এবং সাবলীল বোধিজ্ঞানেরই প্রয়োজন হয়। মন্ত্র-তন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সূত্র বা বাঁধা গৎ প্রয়োগেব এবং তাহাদের যান্ত্রিকতার দিকে অধিক জোর দিলে জ্ঞানকে যেমন একদিকে বাহিরের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, আড়ষ্ট ও বন্ধ্যা হইয়া পড়িতে হয় তেমনি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বা ব্যবহারিক দিকে, বহু ভ্রম, মূঢ় গতানুগতিকতা, অপব্যবহার এবং বিফলতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে জড়ই একমাত্র সত্যবস্তু এই কুসংস্কার যখন আমরা কাটাইয়া উঠিতেছি তখন প্রাচীন রহস্যবিদ্যাব দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইবার এবং তাহাকে একটা নবরূপ দেওয়ার, মনের মধ্যে আজিও যে সমস্ত গোপন রহস্য এবং শক্তি আছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া তাহাদের আলোচনার, অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত মনস্তাত্ত্বিক বা চৈত্যিক ঘটনাবলীর বিশেষভাবে পরীক্ষা ও পর্য্য-

বেক্ষণের সময় ও সম্ভাবনা আসিয়াছে, কোথাও কোথাও তাহার লক্ষণও দেখা দিতেছে। কিন্তু এ সাধনার সফলতা লাভ করিতে হইলে, রহস্যবিদ্যার প্রকৃত ভিত্তি কি, খাঁটি লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি এবং এই ধরণের জ্ঞানান্বেষীকে কি বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে তাহা পুনরায় আবিষ্কার করিতে হইবে; ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হইবে মন এবং প্রাণের গোপন শক্তি এবং গুহাহিত চিৎসত্তার মহত্তর শক্তি এবং বিভূতিসকলের আবিষ্কার। রহস্যবিদ্যা মূলতঃ অধিচেতনার বিজ্ঞান, ব্যক্তি এবং বিশ্বের অধিচেতন ভূমি রহস্যবিদ্যা অনুশীলনের প্রধান ক্ষেত্র, সেই সঙ্গে অবচেতনা এবং অতিচেতনাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া যাহা কিছু অধিচেতনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহাও তাহার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত; এইজন্য আত্মজ্ঞান এবং জগৎ-জ্ঞানের অংশরূপে এবং সে জ্ঞানকে খাঁটিভাবে সক্রিয় করিবার জন্য রহস্যবিদ্যার উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

মানুষের মধ্যে প্রকৃতি এই যে উচচতম জ্ঞান ফুটাইতে চাহিতেছে তাহার জন্য মনের দ্বারা তাহাব ধারণা করা এবং বুদ্ধির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করা অপরিহার্য্যরূপে সহায়ক। সাধারণতঃ যে বুদ্ধি বিচার ও পর্য্যবেক্ষণ করে সব কিছু বুঝিতে ও সুব্যবস্থিত করিতে চায় সেই বুদ্ধিই মানুষের বাহ্য জীবনে ভাবনা ও ক্রিয়ার মুখ্য সাধন-যন্ত্র। চিন্ময় প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ প্রগতি বা পরিণামে শুধু বোধি, অন্তর্দৃষ্টি, অন্তরের বোধশক্তি, হৃদয়ের ভক্তি এবং গভীর ও সাক্ষাৎভাবে চিৎপুরুষের জীবনের সবকিছু অনুভব করিবার শক্তিরই যে স্ফুরণ এবং পুষ্টিসাধন করিতে হইবে তাহা নহে, সেই সংগে বুদ্ধিকেও আলোকিত এবং তৃপ্ত করিতে হইবে। আমাদের প্রকৃতি এবং তাহার পশ্চাতে যে গোপন সত্য আছে তাহাব উচচতম পরিণতি এবং ক্রিয়ার লক্ষ্য পদ্ধতি ও তত্ত্বসকলকে বুঝিতে এবং তাহাদের সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত ও সুশৃংখল ধারণা গড়িয়া তুলিতে চিত্তের ভাবনা এবং বিচারশক্তিকেই নিয়োজিত করিতে হইবে। সত্য বটে অধ্যাত্ম-অনুভব ও তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার, বোধিজাত সাক্ষাৎ জ্ঞান, অন্তর চেতনার এবং অন্তরাত্মার পরিস্ফুরণ ও পুষ্টি, আত্মার অন্তরঙ্গ বোধ, আত্মার দিব্যদৃষ্টি ও দিব্য অনুভূতি ইহারাই পরিণাম-ধারাতে সাধনার উপযুক্ত অঙ্গ; কিন্তু সেই সংগে ভাবনা এবং বিচারশীল বুদ্ধির সমালোচনা ও সমর্থনের মূল্যও কম নয়। অন্তরতম সত্যসকলের সাক্ষাৎ ও সুস্পষ্ট সংস্পর্শ যাহারা লাভ করিয়াছেন এবং অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি লইয়া তৃপ্ত আছেন এমন অনেক সাধক ব্যক্তিগতভাবে

বুদ্ধির সাহায্য না লইয়াও পারেন, কিন্তু পরিণামের সমষ্টিধারার দিক হইতে দেখিলে বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য। পরম সত্য যদি চিন্ময় তত্ত্ব হয় তাহা হইলে বুদ্ধির পক্ষে সেই আদি সত্য ও তত্ত্বের প্রকৃতি কি, সত্তার অন্য সকল দিকের বা জীব-জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি বুদ্ধি দিয়া তাহা জানার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। বুদ্ধি তাহার নিজ শক্তিতে চিন্ময় তত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আমাদিগকে আনিতে পারে না কিন্তু তাহা হইলেও চিন্ময় তত্ত্বের একটা মনোময় রূপায়ণের চেষ্টাদ্বারা মনের কাছে তাহার একটা তাৎপর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়া বুদ্ধি সাধনার সহায়ক হইতে পারে, এমন কি অধিকতর সাক্ষাৎ-ভাবের সাধনায়ও বুদ্ধিকে প্রয়োগ করা যায়; বুদ্ধির এই আনুকূল্যের যে বিশেষ মূল্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাধারণ চিন্ময় সত্যের স্বরূপ কি, সেই সত্যের নির্ব্বিশেষ এবং সবিশেষ এই উভয়ভাবের দার্শনিক তত্ত্ব কি তাহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ কি এবং কিরূপে তাহাদের একে অন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারে, এই চিন্ময় সত্যকে বিশ্বমূল বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা হইতে যুক্তির দৃষ্টিতে কি কি সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে এই সমস্ত সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা গড়িয়া তোলা চিন্তাশীল মনের একটা প্রধান কাজ। সত্যকে এইরূপে বোঝা এবং যুক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করা মনের একটা প্রধান অধিকার এবং বড় দায়, কিন্তু তাহা ছাড়া বুদ্ধি আধ্যাত্মিক অনুভবসকল বিচার ও সমালোচনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়; পরমোল্লাস ভাবসমাধি বা অনুরূপ কোন সাক্ষাৎ চিন্ময় অনুভূতিকে সে স্বীকার করিতে পারে কিন্তু সত্তার কোন্ সুনিশ্চিত এবং সুব্যবস্থিত সত্যের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহা জানিবার দাবী করে, বস্তুতঃ মূলে এইরূপ জানা এবং সমর্থন-যোগ্য কোন সত্য না থাকিলে বিচারবুদ্ধি স্বচ্ছন্দে এই সমস্ত অলৌকিক অনু-ভবকে অনিশ্চিত এবং দুর্ব্বোধ্য বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে অথবা সম্ভবত সত্যাশ্রিত নয় বলিয়া তাহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে পারে। অথবা তাহাদের মূলকে না হইলেও যে-সমস্তরূপে তাহারা উপস্থিত হয় তাহাদিগকে ভ্রমদ্বারা দুষ্ট এমন কি কল্পনাবিলাসী প্রাণময় মন, ভাবাবেগ, স্নায়ুমণ্ডলী বা ইন্দ্রিয়-বোধের দ্বারা বিকৃত ও কলুষিত মনে করিয়া তাহাদিগকে অবিশ্বাস করিতে পারে; কেননা তাহাদের গতিপথে স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা হইতে ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় উন্নীত হইবার সময় ইহারা কখনও ভুল পথে আলেয়ার পিছনে ছুটিতে পারে অথবা কখনও অনুভূত বিষয়কে অথবা কখনও অনুভূত বিষয়ের তাৎপর্য্যকে

অপূর্ণ বা ভুল করিয়া বুঝে বলিয়া যাহা মূলতঃ সত্য তাহাকে অন্ততঃ ভুলভাবে গ্রহণ করিতে অথবা কখনওবা খাঁটি চিন্ময় সত্যের মূল্য বা প্রকাশ আচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিতে পারে। যদি বিচারবুদ্ধি সক্রিয় রহস্যবিদ্যাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তথাপি যে সকল শক্তির অভিব্যক্তি হইতেছে তাহাদের তত্ত্ব বা সত্য প্রকৃত ক্রিয়াধারা এবং খাঁটি তাৎপর্য্য বুঝিতেই সে অধিকতর ব্যগ্র হইবে; বিভূতিযোগী তাহার বিদ্যার যে অর্থ দেন তাহা খাঁটি কি না অথবা তাহার অন্য কোনো অর্থ অথবা গভীরতর তাৎপর্য্য আছে কি না তাহার মূল সম্বন্ধ ও মূল্যের বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে কি না অথবা অধ্যাত্ম অনুভবের সমগ্র পরিবেশের মধ্যে তাহা যথাযোগ্য স্থানে স্থাপিত হইয়াছে কি না বুদ্ধি এ সমস্তই বিচার করিয়া দেখিতে চায়। কেননা আমাদের বুদ্ধির মুখ্য কাজ তত্ত্বের অবধারণ; গৌণকাজ সব কিছুর সমালোচনা করা এবং সর্ব্বশেষে সংহত, সংযত, সুবিন্যস্তভাবে তাহাদের রূপ দেওয়া।

আমাদের এই প্রয়োজন এই আকূতি চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের মনোময় প্রকৃতি আমাদিগকে যে উপায় দিয়াছে তাহার নাম দর্শনশাস্ত্র; অবশ্য এ ক্ষেত্রে দর্শন বলিতে অধ্যাত্ম দর্শনই বুঝিতে হইবে। প্রাচ্য দেশে এরূপ দর্শন অগণিত রূপে দেখা দিয়াছে, কেননা যেখানেই অধ্যাত্ম সাধনার উৎকর্ষ ঘটিয়াছে তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই বুদ্ধির কাছে সে সাধনাকে সমর্থন করিবার জন্য তাহা হইতে একটি দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। দর্শনের প্রথম ধারা ছিল বোধির দর্শন এবং তাহাকে বোধির ভাষায় ব্যক্ত করা; যে ধারার সাক্ষাৎ আমরা উপনিষদের অতলস্পর্শ ভাবনা এবং গভীর ভাষার মধ্যে পাই; তাহার পর দর্শনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে বিচার ও সমালোচনার ধারা যুক্তি ও ন্যায়ের সুদৃঢ় শৃঙ্খলা। পরবর্ত্তী কালের দর্শনের মধ্যে কখন দেখি অন্তরের অনুভব-সকলের বিবৃতি—যেমন গীতায়—কখনও যুক্তি দ্বারা তাহাদের সমর্থন; আবার কোথাও বা দেখা দিয়াছে অধ্যাত্ম অনুভব এবং তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের জন্য চিত্তভূমি প্রস্তুত বা সাধন-পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য সুসংহত এবং সুব্যবস্থিত চেষ্টা—যেমন পতঞ্জলির যোগদর্শনে। পাশ্চাত্যদেশে চেতনার সমন্বয়-সাধনীবৃত্তির স্থানে বিশ্লেষণ ও বিভেদ সাধনী বৃত্তিকে বসান হইয়াছে সেখানে প্রায় প্রথম হইতে আধ্যাত্মিক আবেগ এবং বুদ্ধির বিচার পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইজন্য প্রারম্ভ হইতেই পাশ্চাত্য দর্শন বিশ্বরহস্য শুধু বুদ্ধি ও তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে বুঝিতে চাহিয়াছে। তবুও পিথাগোরাসের,

এপিকিউরাসের এবং ষ্টোয়িকগণের দর্শনে প্রাণশক্তির একটা সাড়া ছিল, কেননা তাহাতে মনের ভাবনা ও বিচারের সঙ্গে জীবনের আচার-অনুষ্ঠানের যোগ ছিল ; অন্তর সত্তার পূর্ণতা সাধনের জন্য তাহারা প্রয়াস পাইত তজ্জন্য সাধনার একটা ধারা গড়িয়া তুলিয়াছিল ; পরবর্ত্তী খৃষ্টান বা নব-পৌত্তলিক (neo-pagan) দর্শনে যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মিলন ঘটিয়াছিল এই সমন্বয় চেষ্টা জ্ঞানের উচ্চতর অধ্যাত্মভূমিতে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে শুধু বুদ্ধির চর্চ্চা আবার পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হইল, এবং দর্শনশাস্ত্র শুধু মননের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল ; তখন দর্শনের সহিত প্রাণ ও তাহার সকল শক্তির সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া গেল, চিৎসত্তা ও তাহার সক্রিয়তা হয় একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল অথবা শুধু বুদ্ধির চর্চ্চাজাত তত্ত্ববিদ্যা জীবন ও তাহার ক্রিয়ার উপর গৌণভাবে অতি অল্প প্রভাব মাত্র বিস্তার করিতে সমর্থ রহিল। পাশ্চাত্য দেশে দর্শনকে কখনও ধর্ম্মের আশ্রয়রূপে গ্রহণ করা হয় নাই, আচার অনুষ্ঠান এবং মতবাদ-যুক্ত ধর্ম্মতত্ত্বের (Theology) আশ্রয়েই ধর্ম্মসাধনা চলিয়াছে। কদাচিৎ কোন সাধকের প্রবল ব্যক্তিগত প্রতিভার বশে একটা দর্শন শাস্ত্রের স্ফুরণ হইলেও, প্রাচ্য দেশের মত সকল প্রধান আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গ বা সঙ্গীরূপে তাহাকে গ্রহণ করা হয় নাই। ইহা সত্য যে চিন্ময় ভাবনাকে বুদ্ধিগত দর্শনরূপে ফুটাইয়া তোলা একেবারে অপরিহার্য্য নয় ; কেননা অন্তরের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ও বোধিদ্বারা আমরা অপরোক্ষভাবে আরও পূর্ণরূপে চিন্ময় সত্যে পৌঁছিতে পারি। ইহাও অবশ্য বলিতে হইবে চিন্ময় অনুভবকে বুদ্ধি বিচারের নিয়ন্ত্রণে আনিতে গেলে বাধার সৃষ্টি হইতে পারে এবং অনিশ্চয়তা আসিতে পারে, কেননা তাহাতে বুদ্ধির নিম্নতর এবং ক্ষীণতর আলোক চিন্ময় সত্তার উচ্চতর ও উজ্জ্বলতর জ্যোতির ক্ষেত্রে ফেলা হয় ; অন্তর্ম্মুখ বিবেকশক্তি, চৈত্যসত্তার বোধ ও নিপুণতা, উপর হইতে আগত কোন উচ্চতর আলোক অথবা অন্তর্য্যামীর স্বাভাবিক জ্যোতির্ম্ময় প্রেরণাই আমাদের যথার্থ দিশারী হইতে পারে। কিন্তু তবু এইভাবে বুদ্ধির পরিপুষ্টি অতীব প্রয়োজনীয় কেননা চিৎসত্তা এবং বিচারবুদ্ধির মধ্যে যোগাযোগের একটা সেতু থাকা নিতান্তই আবশ্যক ; আমাদের পরিপূর্ণ আন্তর পরিণামের জন্য চিন্ময় বুদ্ধি বা অন্ততপক্ষে চিন্ময়ভাবে বিভাবিত বুদ্ধির প্রয়োজন আছে ; এই বুদ্ধি না থাকিলে এবং অন্তরের অন্য গভীরতর নিয়ন্ত্রণ শক্তির অভাব ঘটিলে, অন্তরের ক্রিয়া এবং প্রবৃত্তি প্রমাদগ্রস্ত, অসংযত, আবিলতাপূর্ণ অনাধ্যাত্মিক

উপাদান মিশ্রিত, উদারতা এবং প্রসারতার ক্ষেত্রে একদেশদর্শী বা অপূর্ণ হইয়া পড়িতে পাবে। অতএব অজ্ঞানকে অখণ্ড পূর্ণজ্ঞানে রূপান্তরিত করিতে হইলে আমাদের মধ্যে চিন্ময়ী বুদ্ধির একটা মধ্যবর্ত্তী স্তর গঠিত ও পুষ্ট করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন, যে বুদ্ধি উচ্চতর আলোক গ্রহণের জন্য এবং সেই আলোক আমাদের প্রকৃতির সকল অংশের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দেওয়ার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে।

কিন্তু শুধু ধর্ম্মসাধনা, রহস্যবিদ্যা ও অধ্যাত্ম বিচার বা দর্শনশাস্ত্র এই ত্রিধারার কোনটাব দ্বারা প্রকৃতির বৃহত্তর এবং মহত্তর উদ্দেশ্য কখনও পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতে পারে না ; যদি বা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা অধ্যাত্ম অনুভবের দ্বার না খুলিতে পারে তাহা হইলে বা ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা মনোময় মানুষের মধ্যে চিন্ময় সত্তাকে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হয় না। সর্ব্বপ্লাবনকারী এক পরম অনুভূতি অথবা বহু অনুভূতির সমাহার ও সঞ্চয় করিয়া অন্তরের এক রূপান্তর, চেতনার এক নবরূপায়ণ সাধন করিয়া, দেহ প্রাণ মনের আবরণে আচ্ছন্ন অন্তরস্থিত গোপন চিৎপুরুষকে মুক্তি দিয়া, এই তিন পন্থা যাহাতে পৌঁছিতে চায়, তাহার বাস্তব অনুভূতি ও উপলব্ধি দ্বারাই শুধু আমাদের মধ্যে চিৎসত্তার উন্মেষ ঘটিতে পারে। আত্মার পরিণতির এই শেষ সাধনপন্থার দিকেই অন্য সকল সাধনার ধারার ইঙ্গিত রহিয়াছে, প্রাথমিক সাধনার মধ্য হইতে এই ধারা যখন নিজেকে মুক্ত করিয়া তোলে, বুঝিতে হইবে যে তখন প্রকৃত সাধনা আবম্ভ হইল এবং পথেব যে মোড়ের পরেই দিব্য রূপান্তর অবস্থিত তাহা আর বেশী দূরবর্ত্তী নয়। ইহার পূর্ব্বে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাহা বর্ত্তমান আছে মনোময় মানুষ তাহার ধারণার সহিত কেবল কিছু পরিচিত, বা লোকোত্তর কোন ক্রিয়া ও প্রবৃত্তির সম্ভাবনা সম্বন্ধে হয়ত সচেতন হইতে সমর্থ হইয়াছে, অথবা ধর্ম্মবোধের কোন পূর্ণ আদর্শের সন্ধান পাইয়াছে ; তাহা ছাড়া হয়ত বৃহত্তর শক্তি বা সত্যের কোন প্রকার স্পর্শ লাভ করিয়াছে এবং তাহার ফলে তাহার মন বা হৃদয় বা প্রাণ উদ্দীপিত হইয়াছে। হয়ত তাহার প্রকৃতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু তাহার মনোময় সত্তা চিন্ময় সত্তায় রূপান্তরিত হয নাই। প্রাচীনকালে ধর্ম্ম ও তাহার ভাবনা, নীতি এবং গুহ্য রহস্যবিদ্যা গড়িয়া তুলিযাছে, সৃষ্টি করিয়াছে পুরোহিত, অলৌকিক শক্তিশালী পণ্ডিত, সাধু সজ্জন, যাহাদের মধ্যে মননশক্তির অনেক চূড়া দেখা দিয়াছে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন এরূপ মানুষ—কিন্তু যখন হৃদয় ও মনের মধ্য

দিয়া মানুষ আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে কেবল তখনই তাহাদের মধ্যে ঋষি, যোগী, সন্ত, প্রত্যাদিষ্ট ভবিষ্যদ্বক্তা, দিব্যদ্রষ্টা, অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রের প্রাজ্ঞ ও মরমীর আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে; আর এই ভাবের চিন্ময় মানবতা যে সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে দেখা দিয়াছে তাহারাই বাঁচিয়া আছে, জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; সেই সমস্ত ধর্ম্মই মানবজাতির মধ্যে চিন্ময় আকৃতিসকল জাগাইয়াছে, চিন্ময় সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে।

চেতনায় যখন আধ্যাত্মিকতার আপনাকে ফুটাইয়া তোলা এবং নিজের বিশিষ্ট ধর্ম্মে প্রকাশ পাওয়ার সময় হয় তখন প্রথমতঃ তাহা শুধু অতি ক্ষুদ্র বীজ রূপে দেখা দেয়। চেতনাতে এক নূতন ভাবের বৃদ্ধিশীল প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটে, যে দেহ প্রাণ মন লইয়া আমাদের বহিশ্চর সত্তা গঠিত হইয়াছে এবং সাধারণ মানুষ স্বভাবতঃ একান্তভাবে যাহাতে অভিনিবিষ্ট সেই অপ্রবুদ্ধ মন প্রাণ দেহের বিশাল স্তূপের মধ্যে অনুভূতির এক অসাধারণ আলোকের স্তিমিত প্রকাশ দেখা দেয়। এ আলোক প্রথমে যেন শঙ্কিত চরণে অতি ধীরে অগ্রসর হয়, যেন দ্বিধা ও সঙ্কোচের মধ্য দিয়া হয় তাহার প্রথম স্ফুরণ। প্রথমে ধর্ম্মভাবের একপ্রকার একটা প্রাথমিক রূপ দেখা দেয় যাহাকে শুদ্ধ অধ্যাত্ম চেতনা বলা যায় না, মন বা প্রাণের নিজের মধ্যে চিন্ময় কোন ভাবের আশ্রয় বা উপাদানের আকৃতি বা অন্বেষণই যেন তাহার প্রকৃতি; এই সোপানে, যাহা তাহাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে তাহার যে সংস্পর্শটুকু সে লাভ করে, বা তাহার যে রূপ যে ধারণা গড়িয়া তোলে তাহার দ্বারা প্রধানতঃ সে মনোময় ধারণা বা ধর্ম্মবোধের একটা আদর্শ গড়িয়া তুলিতে কিম্বা তাহার দেহ ও প্রাণের প্রয়োজন সাধন করিতে একান্তভাবে ব্যস্ত হয়; সত্যকার আধ্যাত্মিক পরিণামের জন্য তখনও তাহার চিত্তক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই। আমাদের মধ্যে চিন্ময়ভাবের খাঁটি রূপায়ণ যখন প্রথম দেখা দেয় তখন স্বাভাবিক ক্রিয়াধারা আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হইয়া উঠে, একটা প্রভাব তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় তাহাদের মুখ আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরাইয়া দেয় এবং তাহাদিগকে অধ্যাত্মভাবাপন্ন করিয়া তোলে; আমাদের মন বা প্রাণের কোন অংশে বা কোন বৃত্তিতে লোকোত্তর একটা প্রভাব বা প্রবাহ আসিয়া পড়ে যাহা আধারকে প্রস্তুত করিয়া তোলে—চিন্তাধারা আলোকিত এবং উন্নীত হইয়া অধ্যাত্মভাবের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়, অথবা আবেগময় সত্তা কিম্বা রসচেতনা আধ্যাত্মিকতার দিকে উন্মুখ হইয়া উঠে, চরিত্রে এবং নৈতিক জীবনে অধ্যাত্মভাবে বিভাবিত এক নবরূপায়ণ দেখা

দেয় ; প্রাণের কোন বিশেষ ক্রিয়াধারায় অথবা সক্রিয় প্রাণময় প্রকৃতিতে এক অধ্যাত্ম-প্রেরণা উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তখন অনুভব হয় আমাদের মন ও ইচ্ছাশক্তির উপরে বা ওপারে তাহাদের অপেক্ষা বৃহত্তর এক নিয়ন্ত্রণ, এক অন্তর্জ্যোতি বা এক জন নিয়ন্তা ও শাস্তা আছেন, আবার আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সেই নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলে, কিন্তু তবু তখনও এই অনুভবের ছাঁচে আমাদের সত্তার সব কিছু ঢালাই হইয়া যায় না। কিন্তু এই সমস্ত বোধি এই সমস্ত আলোকধারার নির্ব্বন্ধ যখন বাড়িয়া উঠে, যখন তাহারা নানা ধারায় সত্তার মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে অন্তরে এক সবল রূপায়ণ গড়িয়া তোলে, সমস্ত জীবনকে শাসন করিবার দাবী জানায় এবং সমগ্র প্রকৃতিকে অধিকার করিয়া বসে, তখন সত্তার আধ্যাত্মিক রূপায়ণ আরম্ভ হয় তখন জগতে দেখা দেয় ভক্ত, সন্ত, যোগী, ঋষি, প্রত্যাদিষ্ট ভবিষ্যদ্বক্তা (বা পয়গম্বর), ঈশ্বরের দাস, ঐশী ভাবাবিষ্ট সৈনিক। চিন্ময় আলোক, শক্তি বা আনন্দের দ্বারা উর্দ্ধে উন্নীত হইয়া ইহারা সকলে মানুষের প্রাকৃত বা স্বাভাবিক সত্তার কোন না কোন অংশের উপর অধিষ্ঠিত হন। যোগী এবং ঋষিরা চিন্ময় মনোলোকের অধিবাসী, তাঁহাদের মনন এবং দর্শন, জ্ঞানের এক অন্তরতর এবং বৃহত্তর দিব্য আলোকের প্রভাবে গঠিত নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত হয় ; ভক্তের হৃদয় চিন্ময় আকৃতিতে ভরিয়া উঠে, নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া ভগবানকে অন্বেষণ করাই হয় তাহার জীবনব্যাপী সাধনা ; যে চৈত্যসত্তা অন্তরের অন্তরে জাগরিত ও প্রবুদ্ধ হইয়া আবেগময় সত্তা ও প্রাণময় সত্তাকে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তিলাভ করিয়াছে, সন্ত বা সাধু পুরুষ নিজের সেই চৈত্যসত্তা দ্বারা পরিচালিত হন ; অন্য অনেকে (কর্ম্মযোগীরা) সক্রিয় প্রাণ প্রকৃতির উপর দাঁড়াইয়া চিন্ময়ী শক্তিদ্বারা পরিচালিত এবং তাহারই অনুপ্রেরণায় কর্ম্মে রত হন, সে কর্ম্ম ভগবৎদত্ত কর্ম্ম এবং তাহার জীবনের ব্রত, অথবা তাহা কোনও দিব্য শক্তি, দিব্য ভাবনা বা দিব্য আদর্শের অনুসরণ। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বোত্তম স্ফুরণ হইল মুক্ত পুরুষের আবির্ভাব, যিনি নিজের অন্তরস্থ আত্মার বা চিৎপুরুষের উপলব্ধি করিয়াছেন, বিশ্বচেতনায় অনুপ্রবিষ্ট এবং নিত্য শাশ্বত পুরুষের সহিত একত্বে যুক্ত হইয়াছেন এবং যতদূর তিনি জীবন ও কর্ম্মকে তখনও স্বীকার করেন, তাহাতে নিজের অন্তরস্থ দিব্য পুরুষের আলোক এবং শক্তির বলে প্রকৃতির মধ্যে তাঁহার মানুষী যন্ত্ররূপেই ক্রিয়া করেন। এই চিন্ময় রূপান্তর ও সিদ্ধির বৃহত্তম রূপায়ণে আত্মা, মন, হৃদয় এবং ক্রিয়াশক্তির পূর্ণ মুক্তি

ঘটে, এবং বিশ্বাত্মার ও দিব্য সত্যবস্তুর দিব্য বোধ ও দিব্য চেতনার মধ্যে এক নূতন ছাঁচে তাহাদের সকলকে নূতন করিয়া ঢালাই করা হয়।* ব্যষ্টিজীবের চিন্ময় পরিণাম এইভাবে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে পৌঁছিয়াছে এবং তাহার পরা-প্রকৃতির শৃঙ্গরাজি দিকে দিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই বৈপুল্য এবং উচ্চতার উপরে শুধু আছে অতিমানসে অধিরোহণের পথ বা পরম অব্যক্ত সর্ব্বাতীত বস্তু।

মনোময় মানুষের মধ্যে প্রকৃতি যে চিন্ময় মানুষকে গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে তাহার পরিণতির ধারা বর্ত্তমানে এই পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে; এখানে প্রশ্ন হইতে পারে এই সিদ্ধির খাঁটি পরিমাণ এবং ইহার বাস্তব তাৎপর্য্য কি? বর্ত্তমানে জড়ের মধ্যস্থ মনোময় জীবনের দিকে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। আধ্যাত্মিকতার দাবি এই যে মানুষকে সে এক বৃহত্তর দিকের সন্ধান দিয়াছে, তাহার জীবনে দুর্লভ পরিবর্ত্তন আনিয়াছে: আধুনিক জড়সর্ব্বস্ব বিদ্রোহী চিত্ত বলে যে ইহা মানুষের কলঙ্কস্বরূপই হইয়াছে, ইহা চেতনার যথার্থ পরিণাম তো নহেই বরং ইহাতে আধ্যাত্মিকতার নামে অজ্ঞানের মূঢ়তাকেই স্ফীত করিয়া তোলা হইয়াছে তাহাতে মানুষ পরিণতির খাঁটি পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; মানুষের খাঁটি প্রগতি কেবলমাত্র তাহার প্রাণশক্তির বিবৃদ্ধি, বাস্তবতার দিকে উন্মুখ জড়ীয় মনের পরিপুষ্টি, ভাবনা ও আচরণ-নিয়ন্ত্রণকারী বিচারশক্তির এবং যাহার নূতন আবিষ্কার করিবার ও সব-কিছুকে প্রণালীবদ্ধ করিবার সামর্থ্য আছে তেমন বুদ্ধির উন্নতি ও পরিণতি-সাধন। এই যুগে, বর্ত্তমানকালের অনুপযোগী অতীতকালের একটা কুসংস্কার বলিয়া ধর্ম্মকে বর্জ্জন করা হইয়াছে, এবং আধ্যাত্মিক অনুভব ও উপলব্ধিকে শুধু ছায়াময় অস্পষ্ট ভাবকালি মনে করিয়া আধ্যাত্মিকতার উপর দোষারোপ করা হইয়াছে; এ মতে ভাবক বা রহস্যবিদ্যার অনুশীলনকারী, যাহা অবাস্তব যাহা মিথ্যা তাহারই উপাসক, তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া নিজেরই রচিত আজগুবী ও অসম্ভব কল্পনার রাজ্যে বিচরণশীল। যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যে বিচারের ফলে এই সিদ্ধান্ত গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে বাধ্য, কেননা শেষপর্য্যন্ত তাহা জড়ই একমাত্র সত্য বস্তু, বহিরঙ্গ জীবনই শুধু মূল্যবান এই ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই ভাবের উৎকট জড়বাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও যে বুদ্ধি এবং জড়ীয় মন

* গীতায় যে চিন্ময় আদর্শ ও সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে ইহাই তাহার মূল কথা।

মানুষের বাহ্যজীবনের পূর্ণতা ও তৃপ্তি শুধু চায়, সে মন ও বুদ্ধি যে মত পোষণ করিতে পারে এবং প্রকৃতই পোষণ করিতেছে—বর্ত্তমানে ইহাই মননের প্রচলিত ও প্রধান ধারা—তাহা এই যে আধ্যাত্মিকতা মানুষের বিশেষ কোন উপকার করে নাই ; তাহা জীবন-সমস্যা অথবা যে সমস্ত সমস্যা লইয়া মানুষকে যুদ্ধ করিয়া আসিতে হইতেছে তাহার কোনটাই মীমাংসা করিতে পারে নাই। ভাবক বা রহস্যবিদ্ ইহবিমুখ তপস্যার ঝোঁকে জীবনের ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়ায়, অথবা জগতের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া এক স্বপ্নলোকবিহারী হইয়া পড়ে, সুতরাং জীবনকে সাহায্য করিবার শক্তি তাহার থাকে না অথবা যদি সে কোন সমাধান আনিয়া হাজিরও করে তাহা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অথবা করিৎকর্ম্মা কোন লোকের দেওয়া সমাধান হইতে ভাল হয় না বা ভাল ফল দেয় না, বরং তাহার অনধিকারচর্চার ফলে মানুষের সহজ স্থিতিতে একটা বিক্ষোভ দেখা দেয় ; সে যে সমস্ত বস্তুকে মূল্যবান মনে করে তাহাতে একটা সন্দেহ আনিয়া দেয় ; মানুষের সহজ বাস্তব বুদ্ধির কাছে যাহা অস্পষ্ট এবং পরীক্ষা করিয়া যাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই এমন বিজাতীয় এবং অনভ্যস্ত আলোক আনিয়া ফেলিয়া সব কিছুকে সে বিকৃত করিয়া তোলে, জীবনের সহজবোধ্য অথচ গুরুতর বাস্তব সমস্যা তাহাতে আরও গোলমেলে হইয়া পড়ে।

মানুষের জীবনে চিন্ময়-পরিণামের প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং আধ্যাত্মিকতার খাঁটি মূল্য এইখানে দাঁড়াইয়া বিচার বা নির্ণয় করা যায় না ; কেননা মানুষের বর্ত্তমান বা অতীত মননের ভিত্তিতে ভর দিয়া মানব-জীবনের সমস্যা সমাধান করা আধ্যাত্মিকতার কাজ নয়, তাহার কাজ আমাদের সত্তার আমাদের জীবনের এবং আমাদের জ্ঞানের এক নূতন ভিত্তি স্থাপন। অধ্যাত্ম সাধক বা ভাবকের জীবনে ইহবিমুখীনতা এবং তপশ্চর্য্যার দিকে যে ঝোঁক দেখি তাহা জড় প্রকৃতি তাহার উপর যে সীমা ও বাধা আরোপ করে তাহাকে অস্বীকার করিবার এক চরম রূপ ; কারণ, তাহার নিজসত্তার বিধানই এই যে তাহাকে জড়প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে ; সুতরাং প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাইতে যদি সে না পারে তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে চিন্ময় মানুষ মানবজীবন হইতে একেবারে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন নাই ; কারণ আধ্যাত্মিকতা যখন সমারোহ সহকারে সক্রিয়ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মূলগত ভাবরূপে সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মতা-বোধ, সার্ব্বজনীন ভালবাসা এবং করুণার প্রবাহ, সর্ব্বভূতের কল্যাণে নিজের

শক্তিকে উৎসর্গ করিবার সংকল্প* দেখা দিয়াছে ; এই জন্য অধ্যাত্ম-সিদ্ধি-প্রাপ্ত মানুষেরা অন্য মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; তাঁহারাই তাহাদিগকে প্রগতির পথে পরিচালনা করিয়াছেন—প্রাচীন ঋষি বা প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষগণ এ ব্যাপারের উদাহরণস্থল ; কখনও বা সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহারা নামিয়া আসিয়াছেন এবং যেখানে চিৎপুরুষের কোন সাক্ষাৎ শক্তির সহায়ে তাঁহারা এ কার্য্য করিয়াছেন সেখানে অতি মহৎ ও বৃহৎ ফল ফলিয়াছে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা সমস্যার সমাধানে বহিরঙ্গ উপায়ের উপর নির্ভব করিতে চাহে নাই, যদিও তাহা সে উপেক্ষাও কবে নাই ; সে চাহিয়াছে অন্তরের সাধনার দ্বারা পরিবর্ত্তন এবং প্রকৃতিব রূপান্তর।

অধ্যাত্ম সাধনায় জনসাধারণের জীবনে কোন চূড়ান্ত ফল পাওয়া যায় নাই, জীবনের কোন বিপ্লবাত্মক পবিণাম-সাধন হয় নাই, কেবল কিছু আংশিক ফল লাভ হইয়াছে, চেতনার ভাণ্ডাবে সূক্ষ্ম ভাবের কিছু কিছু অভিনব উপাদান মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা সত্য হইলেও তাহার কারণ এই যে মানুষের গণচেতনা কোনদিনই আধ্যাত্মিকতার আবেগে উদ্‌বোধিত হয় নাই। বারবার আধ্যাত্মিকতার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে বা আধ্যাত্মিক আদর্শ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার প্রাণশূন্য বাহ্যরূপ মাত্র ধরিয়া রহিয়াছে, অন্তবেব পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরকে বর্জন করিয়াছে। ইহা আশা কবা যায় না যে, আধ্যাত্মিকতা জীবনের সহিত কারবারে অনাধ্যাত্মিক কোন উপায় বা কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন কবিবে অথবা রাষ্ট্রিক বা সামাজিক বা যান্ত্রিক কোন সর্ব্বরোগহর মহৌষধি দিয়া সংসারের সকল ব্যাধি দূর করিতে চেষ্টা করিবে ; আমাদের প্রাকৃত মন এই ভাবের চেষ্টা সর্ব্বদাই করিয়া আসিয়াছে এবং এরূপ যান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে কখনই রোগ আরোগ্য বা সমস্যা সমাধান হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও কখনও হইবে না। এই সমস্ত উপায়ে বাহিরে যতই বিপুল পরিবর্ত্তন আসুক না কেন তাহাতে প্রকৃতির খাঁটি পরিবর্ত্তন কিছু হয় না ; পুরাতন অনর্থ শুধু নূতন আকাবে দেখা দেয়, ইহাতে বাহিরের পরিবেশটার বদল হয় কিন্তু মানুষটা যাহা ছিল তাহাই থাকিয়া যায় ; এত বাহ্য পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও মানুষ অবিদ্যার দাসত্ব হইতে মুক্তি পায় না, সে তাহার জ্ঞানের অপব্যবহাব কবে বা সার্থক ব্যবহার করে

* গীতা দ্রষ্টব্য। বৌদ্ধেরা মনে করিতেন সর্ব্বভূতে করুণা এবং মৈত্রী (বসুধৈব কুটুম্বকম্) কর্ম্মের সর্ব্বোত্তম বিধান ; খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা সবার উপরে প্রেমকে স্থান দিয়াছেন ; এ সমস্তই চিন্ময় সত্তার সক্রিয়তার দিক নির্দ্দেশ করে।

না, অহমিকা প্রাণের বাসনা কামনা এবং দেহের ক্ষুধার দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হয়, তাহার দৃষ্টি বাহিরের দিকে, তাহাতে আধ্যাত্মিকতার আলোক নাই, সে নিজের আত্মাকে যেমন জানে না তেমনি জানে না কোন্ শক্তি তাহাকে তাড়িত ও চালিত করিতেছে। জীবনের যে কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সত্তার প্রকাশ-ক্ষেত্র-রূপে তাহার একটা মূল্য হয়ত আছে কেননা এ ব্যবস্থা তাহারা যে স্তরে পৌঁছিয়াছে তাহার অনুকূল, এ যন্ত্র তাহার দেহ ও প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্য এবং কল্যাণ বিধানে অনেকটা সমর্থ এবং ইহা তাহার মানসিক পরিণতি ও পুষ্টির একটা ক্ষেত্র, একটা আয়োজন; কিন্তু তাহা তাহাকে তাহার বর্ত্তমান সত্তার উপরে লইয়া যাইতে পারে না, তাহাকে রূপান্তরিত করিবার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না; ব্যষ্টি বা সমষ্টিকে পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পরিণামের পথে আরও অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন দ্বারা বহিশ্চর মনোময় চেতনাকে পরিণতিপথে গভীরতর অধ্যাত্ম-চেতনার দিকে লইয়া যাইতে পারিলে, খাঁটি এবং সার্থক পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। আধ্যাত্মিক পথের মানুষের প্রধান কাজ নিজের চিন্ময় সত্তার আবিষ্কার এবং অপর সকলকে সেই পরিণতি-পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করাই তাহার পক্ষে সমাজ ও জাতির প্রকৃত সেবা; যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা করা সম্ভব না হইতেছে ততক্ষণ বাহিরের সহায়তায় মানুষের শোচনীয় অবস্থার সাময়িকভাবে উপশম করা অথবা তাহার সহায়তা করা যাইতে পারে কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী বড় একটা কিছু করা যায় না।

ইহা সত্য যে মানুষের অধ্যাত্ম-সাধনায় এখনও ইহজগতের জীবন অপেক্ষা এ জগতের অতীত জীবনের দিকে দৃষ্টি দিবার ঝোঁকই প্রবল। ইহাও সত্য যে আজ পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক রূপান্তর শুধু ব্যষ্টিজীবের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, সমষ্টির পক্ষে হয় নাই; শুধু ব্যক্তিবিশেষের জীবনে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সার্থকতার ফুল ফুটিয়াছে কিন্তু গণজীবনে সফলতা দেখা দেয় নাই অথবা শুধু পরোক্ষভাবে একটা প্রভাবমাত্র কার্য্য করিয়াছে। প্রকৃতির চিন্ময়-পরিণাম এখনও অপূর্ণ, এখনও সে পথে রহিয়াছে, বলিতে গেলে তাহার যাত্রা শুধু আরম্ভ হইয়াছে, এখনও প্রকৃতি অধ্যাত্মচেতনা ও জ্ঞানের একটা ভিত্তি স্থাপন করিতে এবং সেই ভিত্তিকে পুষ্ট ও দৃঢ় করিতে প্রধানতঃ অভিনিবিষ্ট আছে, চিৎপুরুষের সত্যের মধ্যে যাহা শাশ্বত বলিয়া দিব্যদৃষ্টিতে অনুভব করিয়াছে, তিলে তিলে তাহার একটা রূপায়ণ গড়িয়া তুলিতে বা একটা পাদ-

পীঠ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রকৃতি যখন ব্যষ্টিব্যক্তির মধ্যে এই পরিণাম ও রূপায়ণ দৃঢ় ও পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে কেবল তখনই শক্তির প্রসারণ ও বিচ্ছুরণ দ্বারা সমষ্টি-জীবনে বিপ্লব ঘটানো আশা করা যাইতে এবং সমষ্টিগতভাবে আধ্যাত্মিক জীবন স্থায়ী ও সফলভাবে স্ফুরণের চেষ্টা করা সম্ভব হইতে পাবে,—অবশ্য গোষ্ঠী বা সঙ্ঘজীবন গঠনের চেষ্টা পূর্ব্বেও হইয়াছে কিন্তু তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিব্যষ্টিব অধ্যাত্ম-জীবনকে পুষ্ট ও রক্ষা করিবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। কেননা সমষ্টিগত রূপান্তরের আয়োজন পূর্ণ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার নিজের অন্তবতর সত্তায় এবং জ্ঞানে চিৎসত্তার যে সত্য সে লাভ করিয়াছে বা লাভ কবিতে চাহিতেছে তাহারই অনুকূলে বা তদনুরূপভাবে তাহার নিজেব প্রাণ ও মনেব সম্পূর্ণ রূপান্তরসাধনের সমস্যা লইয়াই ব্যষ্টিজীবনকে অভিনিবিষ্ট থাকিতে হইবে। অসময়ে ব্যাপক-রূপে সমষ্টিগতভাবে অধ্যাত্মজীবন প্রতিষ্ঠাব চেষ্টা ব্যাহত হইযা পড়ে কেননা তখন অধ্যাত্মজ্ঞানের শক্তিসঞ্চার বা সক্রিয়তাব দিকেব সামর্থ্য অপূর্ণ বহিয়াছে এবং ব্যষ্টিসাধকগণের মধ্যেও পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হয নাই; এ অবস্থায় মন প্রাণ দেহের প্রাকৃত চেতনা সত্যকে গ্রহণ করিতে গিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন, আড়ষ্ট, বিকৃত ও কলুষিত কবিয়া দেয। মানসীবুদ্ধি এবং তাহাব প্রধান শক্তি বিচার বুদ্ধি মানবজীবনের চিরাগত প্রকৃতি এবং তত্ত্বেব পরিবর্ত্তনসাধন করিতে পারে না—ইহা জীবনকে স্বকৌশলে কতকটা চালাইতে, তাহার পুষ্টিসাধন করিতে, নানাভাবে তাহাকে রূপায়িত করিতে এবং যান্ত্রিক কবিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু মনের সমগ্র শক্তি, এমন কি আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হইলেও, জীবনের রূপান্তরসাধন করিতে সক্ষম হয় না; আধ্যাত্মিকতা অন্তর-সত্তাকে মুক্ত ও আলোকিত করে, মনের উপরে যাহা অবস্থিত তাহার সহিত মনেব যোগ স্থাপনে সহায়তা করে, এমন কি মনকে নিজের হাত হইতে মুক্তি দিয়া মনের অতীত ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিতে পারে, ব্যষ্টি মানব সত্তার বাহ্য প্রকৃতির উপর অন্তরের প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহা নির্ম্মল কবিতে এবং উপবে টানিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে গণচেতনার উপর ক্রিয়া করিতে হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত পার্থিব জীবনকে প্রভাবিত কবিতে পারে বটে কিন্তু তাহার রূপান্তব ঘটাইতে সক্ষম হয না। এইজন্য আধ্যাত্মিক মনের প্রচলিত ঝোঁক হইতেছে শুধু সেইরূপ একটা প্রভাব বিস্তাবে সন্তুষ্ট থাকিয়া প্রধানতঃ এ জগতের অতীত জীবনকে পূর্ণ করিয়া তোলা অথবা মনের

বহির্ম্মুখী চেষ্টাকে পূর্ণরূপে নিবস্ত কবা এবং কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পূর্ণতা বা মুক্তির সাধনায় ঐকান্তিকভাবে নিমগ্ন হওয়া। বস্তুত অবিদ্যা দ্বারা স্পষ্ট প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে রূপান্তবিত কবিতে হইলে মন হইতে উচচতর এক শক্তিকে তাহার সাধনযন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে হইবে।

ভাবক বা অধ্যাত্মরসিক এবং তাহার জ্ঞানের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি তোলা হয়, এ আপত্তি জীবনের উপর তাহাব যে প্রভাব পড়ে বা জীবনকে তাহা যেভাবে পরিণত করে তাহার বিরুদ্ধে নয়, যে সাধন-পদ্ধতি দ্বারা সত্য আবিষ্কৃত হয় এবং যে সত্য আবিষ্কৃত হয় তাহার বিরুদ্ধেই এ আপত্তি। সাধন পদ্ধতির বিরুদ্ধে এই এক আপত্তি তোলা হয় যে তাহা পূর্ণরূপে অন্তরচেতনার বিষয় (subjective), ব্যক্তিগত চেতনা ও সংস্কাবের এলাকা ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে তাহা সত্য নয় এবং পবীক্ষা দ্বারা তাহার সত্য প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু এ কুতর্কের বিশেষ কোন মূল্য নাই; কাবণ ভাবকের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান, সে জ্ঞান অন্তর্ম্মুখী দৃষ্টিতেই ফোটে, বহির্ম্মুখী দৃষ্টিতে নয়। অথবা বস্তুব পরম সত্যকেই তিনি খোঁজেন, আব ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বহির্ম্মুখী অন্বেষণ এবং বাহিরের ক্ষেত্রে ও বহিস্তবে আবদ্ধ সূক্ষ্মানুসন্ধান ও গবেষণা দ্বাবা অথবা পরোক্ষজ্ঞান হইতে লব্ধ অনিশ্চিত তথ্যবাজিকে ভিত্তি করিয়া যুক্তিবিচার দ্বারা সে সত্যকে পাওয়া যায় না। কেবল সাক্ষাদ্দৃষ্টি বা সত্যের আত্মা এবং দেহের সহিত আমাদের চেতনাব সংস্পর্শদ্বাবা অথবা বস্তুর সহিত একাত্মবোধজাত জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞানে নিজেকে বস্তুর শক্তিব সত্য এবং তাহাব স্বরূপ সত্যের সহিত, তাহার আত্মাকে নিজেব আত্মাব সহিত এক বলিযা জানা যায়, সেই জ্ঞান দ্বারা সে সত্য লাভ কবা যায। কিন্তু আপত্তি উঠে যে এই উপায়ে আমরা যাহা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন এক সত্যে পৌঁছি না, ব্যক্তিভেদে সত্যের রূপভেদ দৃষ্ট হয়; এই উক্তির ফলিতার্থ এই মনে করা হয় যে এ জ্ঞান বাস্তবপক্ষে মোটেই সত্যের মূর্ত্তি নয়, ব্যক্তিগত মনের দেওয়া মনোময় রূপায়ণ মাত্র। কিন্তু অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণার জন্যই এ আপত্তি উঠে। আধ্যাত্মিক সত্য চিদ্‌বস্তুরই সত্য, বুদ্ধিব সত্য গণিতের সিদ্ধান্ত বা ন্যায়ের সূত্র নয়। এ সত্য অনন্তের সত্য, অনন্ত বৈচিত্র্যে ভবা অখণ্ডের সত্য, আপন বিভাব এবং রূপায়ণের অনন্ত বৈচিত্র্যেও সে সত্য আত্মপ্রকাশ কবিতে পাবে; চিন্ময়-পরিণামের বেলায় একই সত্যের অভিমুখে বহু পথ, বহু সাধনা এবং বহু উপলব্ধির ধারা বর্ত্তমান থাকা অপরিহার্য; এই বহুমুখীনতা হইতে ইহাই প্রমাণ

হয় যে আত্মা এক জীবন্ত সত্যের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে, প্রাণহীন প্রস্তরীভূত কোন মূর্ত্তি বা পাথরের মত দৃঢ় কোন সূত্রে যাহাকে আবদ্ধ করা যায়, বস্তুনিরপেক্ষ তেমন একটা বোধের বা বস্তুর তেমন কোন মনগড়া মূর্ত্তির নয়। তর্কবুদ্ধির ধারণা যে, সত্যের একটিমাত্র দৃঢ় রূপ আছে এবং সকলে সেই রূপকে স্বীকার করিতে বাধ্য, তাহার মতে একটিমাত্র ভাব বা ভাবাবলীর একটি মাত্র ধারা অন্য সকলকে পরাস্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে, একটি মাত্র সীমিত তথ্য বা একটিমাত্র সূত্রে গ্রথিত তথ্যাবলীকে সকলে শিরোধার্য্য করিবে, কিন্তু এ অতি অন্যায় জুলুম, কেননা ইহাতে জড়ের ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণ সত্যের সংস্কারকেই প্রাণ মন ও চিদ্‌বস্তুর সাবলীল জটিলতর এবং বহুভঙ্গিম সত্যের উপর ন্যায়বিরুদ্ধভাবে আরোপ করা হয়।

এই আরোপের ফলে অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে; ইহা আমাদের চিন্তায় আনিয়াছে সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতা, অপরিহার্য্য বৈচিত্র্য এবং দৃষ্টিভঙ্গীর বহুত্বের প্রতি আনিয়াছে অসহিষ্ণুতা অথচ এই বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব না থাকিলে সত্যের সমগ্র রূপটি প্রত্যক্ষগোচর হয় না; আবার এই সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতার জন্য আমরা একগুঁয়ে হইয়া ভুলকেই ধরিয়া বসিয়া থাকি। ইহার ফলে দর্শনশাস্ত্র বৃথা তর্কের গোলকধাঁধায় পরিণত হয়, এই ভ্রান্তির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ধর্ম্ম গোড়ামী পরমতাসহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িক মতবাদের ক্রীড়াভূমি হইয়া পড়ে। আধ্যাত্মিক সত্য সত্তা ও চেতনার সত্য চিন্তার সত্য নয়, সে সত্যের যতটুকু শক্তি বা তত্ত্ব মন অনুবাদ করিতে পারে ততটুকু শুধু মনের ভাবনা বা ধারণায় প্রকাশ পায়, তাই সেখানে সে সত্যের এক বা কতিপয় বিভাবমাত্র আমরা রূপায়িত বা প্রতিফলিত দেখিতে পাই, তাহার অনন্ত বিভূতির দু' একটি শুধু তর্জমা করা যায় মনের ভাষায়, অথবা মন তাহার বিভিন্ন বিভাবের একটা তালিকা শুধু প্রস্তুত করিতে পারে; কিন্তু সত্যকে পূর্ণরূপে জানিতে হইলে, আমাদিগকে সত্যের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে হইবে, সত্য হইয়া যাইতে হইবে; এইভাবে গড়িয়া উঠা এবং সত্যের সহিত এক হইয়া যাওয়া ছাড়া প্রকৃত অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক অনুভূতির মূলগত সত্য এক, তাহার চেতনাও এক, চিৎসত্তার জাগরণ এবং পুষ্টির বেলায় সর্ব্বত্রই সে একই সাধারণ বা সামান্য ধারা এবং প্রবৃত্তি অনুসরণ করে কেননা এ সমস্ত অধ্যাত্ম-চেতনার অনুজ্ঞা বা অবশ্যপালনীয় বিধান। কিন্তু এই বিধানকে ভিত্তি করিয়া সে সত্যের অনুভূতি ও প্রকাশে অগণিত বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা

দেখা দেয় ; এই সমস্ত সম্ভাবনাকে সংহত এবং সমন্বিত করা অথচ অনুভবের কোন একটি ধারাকে অবিচল নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া চলা, এই দুইটি প্রবৃত্তিই আমাদের অন্তর্গূঢ় অধ্যাত্ম চিৎশক্তির স্ফুরণের জন্য পরস্পরের পরিপূরকরূপে অপরিহার্য্য। তাহা ছাড়া মন ও প্রাণময় জীবনকে চিন্ময় সত্যের সুরে বাঁধিয়া তাহাদিগকে সে সত্যের প্রকাশ-ক্ষেত্র করিতে গেলে সাধকের মনের সংস্কারানুযায়ী বৈচিত্র্য তাহাতে থাকিবেই—যতদিন পর্য্যন্ত সাধক এইরূপ সুরবাঁধা বা সীমিত প্রকাশেব সমস্ত প্রয়োজনের উপরে উঠিয়া না যান। আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশে, প্রাণময় ও মনোময় এই উপাদান থাকিবার জন্য সাধকগণের মধ্যে সম্প্রদায়ভেদের ও বিরোধের উৎপত্তি এবং সত্যোপলব্ধির বিবৃতিতে নানা মতভেদ দেখা দেয়। আধ্যাত্মিক সাধনা এবং আধ্যাত্মিক পুষ্টির স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতাব জন্য এই ভেদ ও বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে ; সকল ভেদের উপরে উঠা সম্ভব বটে, কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ অনুভবের ক্ষেত্রে সহজেই সম্ভব হয় ; নৈলে সাধক যতক্ষণ মনকে একেবারে অতিক্রম করিয়া যাইতে না পারে ততক্ষণ মনোময় রূপায়ণে ভেদ থাকিয়াই যাইবে, মনের উপরিস্থিত ভূমিতে গিয়া উচচতম চেতনাতেই চিন্ময়-সত্যের নানা বিভূতি সমন্বিত হইযা অখণ্ড একত্বে পর্য্যবসিত হয়।

আধ্যাত্মিক মানুষের পবিণামধারায বহু স্তর থাকা অপরিহার্য্য, প্রতি স্তরে সত্তা, চেতনা, প্রাণ, মেজাজ ও চরিত্রের ব্যক্তিরূপায়ণের বহু বৈচিত্র্যও থাকিবেই। মনের স্বভাববশে এবং জীবনের সঙ্গে তাহার কারবারের প্রয়োজনে সাধকেব ব্যক্তিত্বেও যে স্তরে সে অবস্থিত আছে তাহার প্রকৃতি অনুসারে অগণিত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইবে। তাহা ছাড়া বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে আত্মানুভব ও আত্মপ্রকাশে যে একই শুভ্র সুর একটানা ভাবে বাজিতে থাকিবে তাহা নহে, সেখানে মৌলিক একত্বেব মধ্যে বহু বৈচিত্র্য থাকিতে পারে ; পরমাত্মা এক কিন্তু সেই পরমাত্মা বহু আত্মারূপে সচেতনভাবে প্রকাশিত হন, এই আত্মাসকলের প্রত্যেকের প্রকৃতির রূপায়ণ অনুসারে তাহার চিন্ময়, আত্মপ্রকাশেও বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। একের মধ্যে বহুর লীলাই প্রকাশ বা বিসৃষ্টির বিধান ; অতিমানসী চেতনার অদ্বৈত ভাবনা এবং অখণ্ড সমাহারের মধ্যে এই বহুত্ব সমন্বয়ে ও সুষমায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে, কিন্তু সকল বৈচিত্র্য ভাঙ্গিয়া দিয়া শুদ্ধ একত্বের মধ্যে অবস্থান প্রকৃতিস্থ চিৎপুরুষের অভিপ্রায় নহে।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

ত্রিবিধ রূপান্তর

এক চেতন পুরুষ আত্মার কেন্দ্র, তিনি অতীত এবং ভবিষ্যতের ঈশান ;...... তিনি ধূম্রবিরহিত অগ্নির মত...তাঁহাকে ধৈর্য্যের সহিত নিজের দেহ হইতে পৃথক করিতে হইবে।

কঠ উপনিষদ ৪। ১২, ১৩; ৬।১৭

হৃদয়ের বোধি চেতনা সে সত্যকে দেখে।

ঋগ্বেদ ১।২৪।১২

আমি আত্মভাবে বা অধ্যাত্ম সত্তায় স্থিত হইয়া তথা হইতে ভাস্বর জ্ঞানরূপ প্রদীপ দিয়া অবিদ্যা হইতে জাত অন্ধকার নাশ করি।

গীতা ১০।১১

এই সমস্ত রশ্মি নিম্নাভিমুখী, তাহাদের ভিত্তি রহিয়াছে উপরে ; আমাদের অন্তরে তাহারা নিহিত হউক,...হে বরুণ, এইখানে জাগরিত হও, তোমার প্রশাসন বিস্তৃত কর ; আমরা যেন তোমার কর্ম্মবিধানের মধ্যে বাস করি, এবং মাতা অদিতির (অনন্তের) কাছে নিষ্কলুষ থাকি।

ঋগ্বেদ ১।২৪, ৭, ১১, ১৫

হংস তিনি শুচিতায় স্থিত...ঋত হইতে জাত—স্বয়ং তিনি ঋত এবং বৃহৎ।

কঠ উপনিষদ ৫।২

চিন্ময় পরিণাম দ্বারা মানুষের মধ্যে পরমসত্তার বোধ জাগাইয়া প্রকৃতি তাহাকে নিজের কবল হইতে মুক্তি দিতে চায়, কেবল ইহাই যদি প্রকৃতির উদ্দেশ্য হয়, কিংবা শাশ্বত সত্তার শক্তি হইয়াও যে অবিদ্যার মুখোশে সে নিজেকে আবৃত করিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া এ জগৎ হইতে প্রস্থান করা এবং সত্তার

কোন উচ্চতর ভূমিতে পৌঁছানই যদি তাহার একমাত্র সাধনার বস্তু হয়, এইরূপে এ জগতের বাহিরে চলিয়া যাওয়া এবং আর ফিরিয়া না আসাই যদি প্রকৃতি-পরিণামের শেষ এবং চরম পদক্ষেপ হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে মূলতঃ প্রকৃতির কার্য্য এতদিনে শেষ হইয়া গিয়াছে এবং বিশেষ আর কিছু কবিবার নাই। ইহার পথসকল প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে, সে পথে চলিবার সামর্থ্য অর্জিত হইয়াছে; সৃষ্টির চরম লক্ষ্য বা পরম উচ্চতা স্পষ্টতঃ প্রকাশ হইয়াছে; এখন শুধু বাকী আছে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক জীবের প্রগতির যথার্থ স্তরে পৌঁছা, অধ্যাত্ম পথে প্রবেশ করা এবং নিজ নির্ব্বাচিত পথ ধরিয়া এই নিম্নতম জীবনেব রাজ্য হইতে প্রস্থান কবা। কিন্তু আমরা বলিয়া আসিতেছি যে প্রকৃতিব আরও কিছু সাধনের ইচ্ছা আছে—জীবের নিকট চিৎস্বরূপের আত্মপ্রকাশই পরিণামের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, প্রকৃতির আমূল এবং পূর্ণ রূপান্তরও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকৃতির সঙ্কল্প জড়জীবনের মধ্যে চিৎস্বরূপেব খাঁটি প্রকাশ ঘটাইবে; অবিদ্যা হইতে জ্ঞানের পথে গিয়া সে যে কাজ আরম্ভ করিযাছে তাহা পূর্ণ কবিবে, নিজেব মুখোশ খুলিয়া ফেলিবে এবং নিজের মধ্যে শাশ্বত সদ্বস্তু এবং তাহার সার্ব্বভৌম পরমানন্দকে বহন করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী চিন্ময়ী মহাশক্তিরূপে নিজেকে প্রকাশ করিবে। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এখনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির কিছু বাকী আছে; এখনও অনেক কিছু করিবার আছে 'ভূরি অস্পষ্ট কর্ত্ত্বম্'; তাহাকে চেতনার আরও উচ্চতর ভূমিতে পৌঁছিতে হইবে, দিব্যদৃষ্টি দ্বাবা আরও বিস্তৃত ভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে; সঙ্কল্পের পাখায় ভব করিয়া তথায় উড়িয়া যাইতে হইবে, এই জড়বিশ্বে চিদাত্মার আত্মপ্রতিষ্ঠা সফল ও পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। পরিণামের শক্তি এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছে তাহা এই যে দুই চারিজন তাহাদের আত্মার খবর পাইয়াছে, নিজ আত্মার সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে, তাহারা নিজেরা স্বরূপতঃ যে শাশ্বত সত্তা তাহার সন্ধান পাইয়াছে এবং প্রতিভাসের অন্তরালে অবস্থিত দিব্যপুরুষ বা সত্যবস্তুর সহিত তাহাদের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে; প্রকৃতির কিছু রূপান্তর এই আলোকসম্পাতের উদ্যোগপর্ব্বে দেখা দিয়াছে, আলোকের সঙ্গে বা আলোক আসিবার পরেও কিছু রূপান্তর সাধিত হইয়াছে; কিন্তু তেমন কোন পূর্ণ এবং মৌলিক রূপান্তর ঘটে নাই যাহার ফলে এক নূতন তত্ত্ব, এক অভিনব সৃষ্টি, পার্থিব প্রকৃতির ক্ষেত্রে এক নূতন ব্যবস্থা স্থায়ীরূপে এবং নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত অধ্যাত্মচেতনারই স্ফুরণ

হইয়াছে কিন্তু অতঃপর যে সেই প্রকৃতির নেতা হইবে সেই অতিমানস সত্তার আবির্ভাব হয় নাই।

ইহার কারণ চিৎতত্ত্ব এখনও এখানে তাহার পূর্ণ অধিকার ও আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। চিৎশক্তি আজ পর্য্যন্ত মনোময় সত্তাকে তাহার নিজের হাত হইতে মুক্তি পাইতে অথবা নিজেকে নির্ম্মল করিয়া অধ্যাত্ম স্থিতিতে উন্নীত হইয়া উঠিতে সমর্থ করিয়াছে; ইহা চিৎসত্তাকে মন হইতে মুক্ত হইবার এবং অধ্যাত্মভাবে বিভাবিত হৃদয় ও মনের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিবার শক্তি দিয়াছে, কিন্তু মনের সমস্ত সীমা ও সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া নিজের সক্রিয় এবং সার্ব্বভৌম আধিপত্যের সহিত আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি তাহাকে এখনও দেয় নাই; অথবা বরং যে শক্তি দিয়াছে তাহা প্রচুর নহে। আর একটি সাধন-যন্ত্রের স্ফুরণ আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু তাহা এখনও পূর্ণ ও কার্য্যকরী হয় নাই; তাহা ছাড়া তাহাকে আদিম অবিদ্যার মধ্যে এক বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত আত্মবিস্ফৃষ্টি হইলে অথবা সর্ব্বদাই পার্থিব জীবনে কৃচ্ছ্র সাধনার ফলে শুধু ব্যক্তিগতভাবে অপার্থিব বা অতিপ্রাকৃত কিছু হইয়া উঠিলেই চলিবে না। চাই এমন এক নূতন জাতীয় জীবের আবির্ভাব, চিন্ময় ভাব হইবে যাহার সহজ স্বভাব; যেমন এতকাল অবিদ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মন জ্ঞানের অন্বেষণে ফিরিয়াছে এবং জ্ঞানেব মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে, তেমনি এখন জ্ঞানেব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অতিমানসকে নিজেরই বৃহত্তর আলোক ও জ্যোতির মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে হইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্ময় ভাবে বিভাবিত মনোময় পুরুষ পূর্ণরূপে অতিমানসে আরূঢ় হইতে এবং তথা হইতে তাহার শক্তি পার্থিব জীবনে নামাইয়া আনিতে না পারিতেছে ততক্ষণ এই নূতন ধারা প্রবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারে না। এই জন্য মন এবং অতিমানসের যে দুস্তর ব্যবধান রহিয়াছে, তাহার উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া উভয়ের যোগসাধন করা চাই, যে পথ রুদ্ধ আছে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে এবং আজ যেখানে শূন্যতা এবং নৈঃশব্দ্য রাজত্ব করিতেছে সেই প্রদেশের মধ্যে দিয়া সে শক্তিতে আরোহণের এবং তথা হইতে সেই শক্তিকে সঙ্গে লইয়া অবরোহণের সোপানমালা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার উপায় হইল তিন ধারায় রূপান্তর-সাধন যাহার কথা আমরা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছি; প্রথমে চাই চৈত্য রূপান্তর যাহার ফলে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি অন্তরাত্মার সাধন শক্তিতে পবিণত হইবে; সেই সঙ্গে বা তাহাকে ভিত্তি করিয়া আনা চাই আধ্যাত্মিক রূপান্তর যাহার ফলে

আমাদের সমগ্র সত্তার মধ্যে, এমন কি দেহ ও প্রাণের সকল গোপন নিম্নতম নিভৃত স্থানে এবং অবচেতনার অন্ধকার রাজ্যের মধ্যেও, উর্দ্ধের এক জ্যোতি, জ্ঞান, শক্তি, বল, আনন্দ এবং শুচিতা নামিয়া আসিবে; অবশেষে তাহার মধ্যে অতিমানস-রূপান্তরকে আনিতে হইবে, তখন আমাদের প্রগতি-পথের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করিব, অতিমানসে আরূঢ় হইতে সমর্থ হইব এবং দিব্য রূপান্তব-সাধন-সমর্থ অতিমানস চেতনা আমাদের সমগ্র সত্তা এবং প্রকৃতির মধ্যে নামাইয়া আনিতে পারিব।

আবরণ উন্মোচন করিয়া যাহাকে প্রকাশ করা আধ্যাত্মিক রূপান্তরের প্রথম সোপান তাহা হইল প্রকৃতিস্থ আত্মা বা চৈত্য সত্তা—আমাদের সেই অঙ্গ বা অংশ যাহা গোড়ার দিকে একেবারেই ঢাকা থাকে অথচ তাহাব জন্যই প্রকৃতির মধ্যে ব্যষ্টি সত্তারূপে আমাদের অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে এবং আমরা বর্ত্তমান আছি। আমাদের প্রাকৃত সত্তার অন্য সকল অঙ্গ কেবল যে শুধু পরিবর্ত্তন-শীল তাহা নহে তাহারা বিনশ্বরও বটে; কিন্তু আমাদের চৈত্যসত্তা অবিনশ্বর এবং মূলতঃ সর্ব্বদা একরূপেই বর্ত্তমান আছে; আমাদের আত্ম-প্রকাশের সকল সম্ভাবনা মূলতঃ তাহার মধ্যে থাকিলেও তাহাদের দ্বারাই তাহার সত্তা গঠিত নয়; তাহা হইতে প্রকাশিত কিছু দ্বারা তাহা সীমিত হয় না, অথবা প্রকাশের অপূর্ণরূপের মধ্যে তাহা আবদ্ধ হইয়া পড়ে না, বহিঃসত্তার অপূর্ণতা বা আবিলতা ত্রুটি ও বিচ্যুতির কলঙ্ককালিমা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই চৈত্যসত্তাই সর্ব্ববস্তুর অন্তর্নিহিত সদাশুভ্র সদাপবিত্র ভাগবত জ্যোতির শিখা, যাহা তাহার কাছে আসে, যাহা আমাদের অনুভবের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাহার কিছুই তাহার পবিত্রতাকে কলুষিত বা শিখাকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে না। এই চিন্ময় সত্তা অপাপবিদ্ধ এবং জ্যোতির্ম্ময়; পূর্ণ-রূপে জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া সত্তার সত্য এবং প্রকৃতির সত্য, অন্তরঙ্গভাবে অব্যবহিত এবং সাক্ষাৎরূপে তাহার কাছে প্রকাশ পায়; সত্য, শিব এবং সুন্দর সম্বন্ধে সে গভীর ও অন্তরঙ্গভাবে সদা সচেতন কেননা তাহার স্বভাব সত্য শিব সুন্দরেবই সগোত্র, তাহারই স্বরূপের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনকিছুর রূপায়ণ। আবার যাহা এই সমস্ত বস্তুর বিরোধী বা বিপরীত অথবা যাহা তাহার স্বভাবধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে যাহা অসত্য যাহা অশিব যাহা অসুন্দর বা কুৎসিত তাহাও তাহার কাছে অপরিজ্ঞাত নয়; কিন্তু তাহারা দেহমন প্রাণরূপী বহিশ্চর সাধনাঙ্গ-সকলকে প্রবলরূপে প্রভাবিত ও বিক্ষুব্ধ করিতে সক্ষম হইলেও সে নিজে

এই সমস্ত হইয়া যায়না অথবা তাহারা তাহাকে প্রভাবিত, পবিবর্ত্তিত বা স্পর্শ করিতে পারেনা। কারণ আমাদের অন্তরাত্মা, আমাদের মধ্যস্থ চিরস্থায়ী সত্তা দেহ মন প্রাণকে প্রকাশিত এবং যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিলেও এবং তাহাদের অবস্থার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও তাহাদের হইতে পৃথক বস্তু এবং তাহাদের চেয়ে বৃহত্তর।

চৈত্যসত্তা যদি প্রথম হইতে অনাবৃত থাকিতেন, যদি এ রাজা পরদা-ঘেরা ঘরে পৃথক হইয়া বসিয়া না থাকিতেন যদি তাঁহাব মন্ত্রীবর্গ বা কর্ম্মচারীদের সহিত তাঁহার পরিচয় থাকিত তাহা হইলে মানুষেব পবিণাম শীঘ্রই এবং সহজে আত্মভাবে পরিপূর্ণ, চিন্ময় ফলে ফুলে বিভূষিত হইয়া উঠিত, আজ যেমন সে-পরিণাম দুরূহ, আবর্ত্তসঙ্কুল এবং বিকৃত হইয়া রহিয়াছে তাহা থাকিতনা ; কিন্তু আবরণ অতি পুরু, আমবা আমাদের অন্তরের গুপ্ত আলোককে, হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে স্থিত মণিকোঠার গোপন কক্ষে যে দীপ জ্বলিতেছে তাহাকে জানিনা। গোপন অন্তরাত্মা হইতে অনেক বাণী ও ব্যঞ্জনা আসিয়া বহিশ্চেতনায় প্রকাশ পায় কিন্তু তাহাদের উৎস কোথায় মন সে খোঁজ রাখেনা, এমন কি মন তাহাদিগকে নিজেরই ক্রিয়া মনে কবে, কেননা বাহিরে আসিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগেব উপর মনোময় ভাবের একটা রংএর প্রলেপ মাখাইয়া দেওয়া হয় ; এইভাবে কোথা হইতে আসিতেছে তাহা না জানাতে এবং তাহাদের মর্য্যাদা বুঝিতে অশক্ত হওয়াতে তখনকার মনের গতি অনুসারে জীব কখনও সে বাণীতে কান দেয়, কখনও দেয়না। মন যদি প্রাণময় অহংএর বাসনায় ও আবেগে অভিভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্তরাত্মার পক্ষে আমাদের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অথবা আমাদের মধ্যে তাহার গোপন চিন্ময় উপাদান এবং তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়াধারা ফুটাইয়া তুলিবার আদৌ অতি অল্প সম্ভাবনাই থাকে ; অথবা আবার মনের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থাকে বলিয়া যদি তাহার নিজের ক্ষুদ্র আলোকেই ক্রিয়া করিতে চায়, তাহার বিচারবুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি এবং জ্ঞানের ক্রিয়াশক্তিতে যদি অতিরিক্ত পরিমাণে আসক্ত থাকে তাহা হইলেও অন্তরাত্মা আবরণের আড়ালে নিশ্চল হইয়া থাকেন এবং মনের বৃহত্তর পরিণতির জন্য অপেক্ষা করেন। কারণ আমাদেব চৈত্যপুরুষ প্রাকৃত পরিণামধারাকে ধারণ এবং বহন করিবার জন্যই অবস্থিত আছেন ; এবং সে-পরিণামের প্রাথমিক ব্যবস্থা হইল একে একে দেহ, প্রাণ এবং মনের পর্য্যায়ক্রমে পুষ্টিসাধন, কখনওবা স্বতন্ত্র স্বভাবের নিয়মে কখনওবা যৌথভাবে মিলিত করিয়া,

যদিও সে মিলনে পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের অভাবই প্রধানতঃ লক্ষিত হয় ; এই ব্যবস্থায় তাহারা অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং স্ফুরিত ও বর্দ্ধিত হয়। আমাদের অন্তরাত্মা আমাদের মন-প্রাণ-দেহের সকল অনুভূতির রস বা সার সংগ্রহ করেন এবং তাহা পরিপাক করিয়া প্রকৃতির ক্ষেত্রে আমাদের সত্তাকে বৃহত্তর পরিণতির জন্য প্রস্তুত করেন ; কিন্তু এই ক্রিয়া গোপনে চলে বাহিরে প্রকাশ হয়না। প্রথমদিকে পরিণামের জড়ময় এবং প্রাণময় সোপানে বস্তুতঃ আত্মার কোন বোধ থাকেনা ; চৈত্যিক ক্রিয়া তখনও থাকে কিন্তু তাহার রূপ বাহন বা ধরণ হয় জড়ময় এবং প্রাণময় অথবা মন যখন ক্রিয়াশীল হয় তখন মনোময়। কেননা মন যখন প্রাথমিক অপরিণত অবস্থায় থাকে এমন কি পরিণত হইলেও যদি তাহা অতিরিক্ত মাত্রায় বহির্ম্মুখী রহিয়া যায় তাহা হইলে সে চৈত্যবৃত্তির গভীরতর প্রকৃতিকে চিনিতে পারে না। সে অবস্থায় আমরা নিজদিগকে সহজেই জড়ময় প্রাণময় বা মনোময় সত্তা বলিয়া মনে করি, মনে করি সেই সমস্ত সত্তাই প্রাণ এবং দেহকে ব্যবহার করিতেছে কিন্তু অন্তরাত্মার অস্তিত্ব একেবারেই দেখিতে পাই না বা দেখিতে চাই না ; কেননা আত্মা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আমাদের এই শুধু আছে যে, ইহা এমন একটা কিছু যাহা দেহের মৃত্যুব পরও বাঁচিয়া থাকে ; অন্তরাত্মা যে কি বস্তু তাহা আমরা জানি না, কেননা কদাচিৎ তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি সচেতন হইয়াও থাকি তাহার বিশিষ্ট বা বিবিক্ত সত্তা বা সত্য সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোনও সচেতনতা আমাদের সাধারণ অবস্থায় থাকে না অথবা আমাদের প্রকৃতির উপর তাহার কোন সাক্ষাৎ ক্রিয়া বা প্রভাব আমরা বোধ করি না।

পরিণাম যেরূপ অগ্রসর হইতে থাকে প্রকৃতি তেমনি ধীরে ধীরে যেন পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের আধারের অন্তর্গূঢ় অংশগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে থাকে, প্রকৃতি আমাদিগকে ক্রমশঃ অধিকতর রূপে অন্তরের দিকে তাকাইতে প্রবৃত্ত করায় অথবা তথা হইতে গুপ্ত অংশগুলিকে যাহা সহজে চিনিতে পারা যায় এমন রূপ ও পরিচয়ে স্পষ্টরূপে বাহিরে আনিয়া প্রকাশ করিতে চায়। দেখা যায় অন্তরাত্মা বা চৈত্যতত্ত্ব আমাদের মধ্যে গোপনে রূপায়িত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই চৈত্যতত্ত্ব নিজের এক ব্যক্তিরূপ বা এক বিশিষ্ট চৈত্য-পুরুষকে নিজের প্রতিভূরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এবং তাহাকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছেন। এই চৈত্যপুরুষ এখনও খাটি মনোময় প্রাণময় অথবা সূক্ষ্ম অন্নময় পুরুষগণের মত আমাদের অধিচেতনার মধ্যে অবগুণ্ঠনে

আবৃত হইয়া রহিয়াছেন ; এবং এই সমস্ত গোপন পুরুষের মত চৈত্যপুরুষও তথা হইতেই আমাদের বহিশ্চেতনায় তাঁহার প্রভাব ও ইঙ্গিত উৎক্ষিপ্ত করিয়া বহির্জীবনের উপর ক্রিয়া করিতেছেন, এই সমস্ত উৎক্ষিপ্ত ভাব সাধারণতঃ যাহাকে আমরা নিজের স্বরূপ বলিয়া অনুভব করি সেই বহিশ্চর সত্তারই অংশ-রূপে পরিণত হয় ; এই বহিশ্চর সত্তা হইল রাশীকৃত বহু বস্তু ও ভাবের একটা সমষ্টি যাহার মধ্যে যেমন আছে একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপায়ণ বা অজানা ভিত্তির উপর রচিত এক ভবন, তেমনি আছে ভিতর হইতে আগত বা উৎক্ষিপ্ত নানা ভাব ও চেতনার একটা স্তূপীকৃত সমাহার। আমরা অস্পষ্টভাবে অনুভব করি যে অজ্ঞানাচ্ছন্ন এই বহিঃসত্তার উপর এমন কিছু আছে যাহাকে মন প্রাণ বা দেহ হইতে পৃথক করিয়া আত্মা বলা যায়, তাহাকে আমরা আমাদের সচেতন স্বরূপের অস্পষ্ট এক মনোময় ধারণা বা সহজপ্রত্যয়রূপে যে শুধু দেখি তাহা নয় কিন্তু আমাদের প্রাণ, চরিত্র এবং ক্রিয়াতে তাহার প্রভাব যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপেই দেখা দেয়। যাহা কিছু সত্য শিব ও সুন্দর যাহা কিছু সূক্ষ্ম শুচি এবং মহৎ তাহার অনুভূতিজাত একটা বোধ, তাহাতে সাড়া দেওয়া, তাহাকে অন্তরের সঙ্গে চাওয়া আমাদের ভাবনা ও বেদনায়, আচারে ও চরিত্রে গ্রহণ ও রূপায়িত করিবার জন্য প্রাণ ও মনের উপর চাপ দেওয়া—অন্তরাত্মার প্রভাবের ইহাই হইল সর্ব্বজন-পরিচিত সুস্পষ্ট সাধারণ বিশেষত্ব ; যদিও ইহাই চৈত্য সত্তার প্রভাবের একমাত্র চিহ্ন বা লক্ষণ নহে। যে মানুষের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই না অথবা ইহার আবেশে যে একেবারেই সাড়া দেয় না, তাহার সম্বন্ধে আমরা বলি যে 'লোকটার আত্মা নাই'। কারণ এই প্রভাবকে আমাদের মধ্যস্থিত সূক্ষ্মতর এবং দিব্যতর এক অংশ বলিয়া সহজে বুঝিতে পারি এবং ইহা বলিতে পারি যে আমাদের প্রকৃতির পূর্ণতা সাধনের পথে ধীরে ধীরে ফিরিবার ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বস্তু।

কিন্তু বহিশ্চেতনায় চৈত্যপুরুষের এই প্রভাব বা ক্রিয়া ঠিক স্বচ্ছ এবং অবিমিশ্র ভাবে পৌঁছে না বা নিজের স্বচ্ছতায় অন্য হইতে পৃথক হইয়া তথায় অবস্থান করে না ; যদি তাহা হইত তাহা হইলে আমাদের অন্তরাত্মা হইতে আগত উপাদান পৃথক করিয়া লইতে পারিতাম এবং সজ্ঞানে ও পূর্ণ ভাবে তাহার অনুশাসন মানিয়া চলিতে পারিতাম। চৈত্য ক্ষেত্র হইতে বহিশ্চেতনায় নামিয়া আসিবার পথে মন, প্রাণ এবং সূক্ষ্মভূতের গোপন ক্রিয়া আসিয়া মধ্য-বর্ত্তী হইয়া পড়ে ; তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাকে ব্যবহার করিতে ও

নিজেদের কাজে লাগাইতে চেষ্টা করে, তাহার দিব্যভাবকে খর্ব্ব করে, তাহার আত্মপ্রকাশের বিকৃতি এবং ন্যূনতা ঘটায়, এমন কি তাহাকে স্খলিত এবং বিপথগামী করিয়া ফেলে, অথবা মন প্রাণ এবং দেহের অপবিত্রতা, ক্ষুদ্রতা এবং ভ্রান্তি দ্বারা রঞ্জিত করিয়া দেয়। এইভাবে মিশ্রিত এবং খর্ব্বীকৃত হইয়া আসিবার পর বহিঃপ্রকৃতি অন্ধভাবে তাহাকে গ্রহণ করে এবং অবিদ্যাচ্ছন্নভাবে রূপায়িত করিয়া তোলে এবং এই কারণে তাহার আরও পথভ্রষ্ট এবং মিশ্রিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা উপস্থিত হয় অথবা সে আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়। এইভাবে তাহাকে একটা মোচড় দিয়া দেওয়া হয়; দিগ্‌ভ্রান্তি, অপপ্রয়োগ এবং ভ্রমাত্মক রূপায়ণ দেখা দেয়; যাহা মূলতঃ আমাদের চিন্ময় সত্তার শুদ্ধ উপাদান ও শুদ্ধ ক্রিয়া তাহার পরিণতিতে ভ্রান্তি আসিয়া আশ্রয় নেয়; ফলে চেতনার মধ্যে যে রূপায়ণ দেখা দেয় তাহার মধ্যে চৈত্যসত্তার প্রভাব ও ইঙ্গিতের সঙ্গে থাকে মনের ভাবনা মতবাদ ও সংস্কার, প্রাণের বাসনা ও আবেগ, শারীর-বৃত্তির অভ্যস্ত ঝোঁক ও প্রবৃত্তির একটা এলোমেলো মিশ্রণ। তাহা ছাড়া, আমাদের বহিঃসত্তার অংগগুলির অবিদ্যাচ্ছন্ন ঊর্দ্ধাভিমুখী প্রচেষ্টা শুভেচ্ছা-প্রণোদিত হইলেও এইভাবে মলিনপ্রভ আত্মিক প্রভাবের সহিত একসঙ্গে আসিয়া সমবেত হয়; যাহার প্রকৃতিতে নানা মিশ্রণ রহিয়াছে, উচ্চভাব গঠন করিতে গিয়া যাহা প্রায়ই অস্পষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, আবার কখনও বিপজ্জনক ভাবে বিভ্রান্ত হয়, মনের তেমন এক রূপায়ণী শক্তি, আবেগ-ময় সত্তার হৃদয়োচ্ছ্বাস ও প্রমত্ততা হইতে উৎক্ষিপ্ত ফেনোচ্ছল বেদনা, অনুভূতি ও ভাবালুতার শীকরমালা, প্রাণময় অংশসকলের নানামুখী সক্রিয় উৎসাহ, দৈহিক সত্তার সদা ব্যগ্র সাড়া, দেহ ও স্নায়ুর শিহরণ ও উত্তেজনা—এই সমস্ত একত্র হইয়া যে মিশ্ররূপায়ণ সৃষ্টি হয়, প্রায়ই ভুল করিয়া আমরা তাহাকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করি, এবং তাহার বিমিশ্র ও এলোমেলো ক্রিয়া ও প্রবৃত্তিকে মনে করি আত্মার স্পন্দ বা চৈত্যসত্তার উন্মেষ ও ক্রিয়া অথবা অন্তরের সিদ্ধ-বীর্য্য। চৈত্যসত্তার নিজের মধ্যে কোনও কলঙ্ক, কলুষতা বা মিশ্রণ নাই, কিন্তু তাহা হইতে যাহা বহিশ্চেতনায় উৎক্ষিপ্ত হয় তাহার কোনও রক্ষাকবচ নাই, সুতরাং তথায় এই গোলযোগ উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়।

তাহা ছাড়া চৈত্যপুরুষ বা আত্মার ব্যক্তিসত্তা প্রথমেই ষোলোকলায় পূর্ণ হইয়া জ্যোতির্ম্ময় রূপে উদ্ভাসিত হয় না; তাহার উন্মেষ হয় কলায় কলায়, অতিধীরে চলে তাহার পুষ্টি ও রূপায়ণ; প্রথমে তাহার সত্তার আকার হয়

অস্পষ্ট এবং তাহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত তাহা দুর্ব্বল ও অপরিপুষ্ট থাকিতে পারে কিন্তু তখন তাহা অপূর্ণ হইলেও অবিশুদ্ধ নয় ; কেননা তাহার রূপায়ণ এবং সক্রিয় আত্মগঠন আত্মার সেই শক্তির উপর নির্ভর করে যাহা অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনার বাধা অতিক্রম করিয়া বস্তুতঃ অল্পাধিক পরিমাণ সফলতার সহিত বহিঃক্ষেত্রে পরিণামধারার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শক্তির আবির্ভাবে প্রকৃতির মধ্যে আত্মার উন্মেষই সূচিত হয় ; এবং সেই উন্মেষ যদি এখনও ক্ষীণ এবং অঙ্গহীন হয় তাহা হইলে চৈত্যব্যক্তিসত্তাও হইবে খর্ব্ব এবং দুর্ব্বল। আমাদের চেতনার মেঘাচ্ছন্নতার জন্য ইহাও যেন তাহার অন্তরের সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ; সত্তার গভীরে স্থিত ইহার নিজের উৎসের সঙ্গে যোগাযোগে অপূর্ণতা লক্ষিত হয় ; কেননা এখনও দু'এর মধ্যে পথটি ভালো ভাবে প্রস্তুত হয় নাই, এখনও তাহা সহজে রুদ্ধ হইয়া পড়ে, উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের তারগুলি প্রায়ই কাটা পড়িয়া যায় অথবা তাহা অন্য কোন উৎস হইতে আগত অন্য ধরণের সংবাদ দ্বারা ভর্ত্তি হইয়া থাকে ; আবার যাহা সে লাভ করে তাহা বহিঃস্থিত যন্ত্রের উপরে সংক্রামিত করিবার শক্তিও তাহার অপূর্ণ ; তাহার নিজের দীনতাবশতঃ অধিকাংশ বিষয়ের জন্য ইহাকে এই সমস্ত যন্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং তাহাদের দ্বারা আহরিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই তাহার প্রকাশ ও প্রবৃত্তির আবেগ গঠিত হয়, চৈত্যসত্তার প্রমাদহীন অনুভবের উপর শুধু নির্ভর করিয়া নয়। এই অবস্থায় চৈত্যসত্তার খাঁটি সত্য-দীপ্তি খর্ব্ব এবং বিকৃত হইয়া মননের ক্ষেত্রে তাহা কেবল-মাত্র একটা মত বা ধারণামাত্রে, চৈত্য-অনুভূতি হৃদয়ের একটা ভ্রমশীল আবেগ বা শুধু ভাবালুতায়, চৈত্য ক্রিয়া-সঙ্কল্প জীবনের ক্ষেত্রে অন্ধ প্রাণময় উৎসাহ বা উৎসুক উত্তেজনায় পরিণত হওয়া নিবারণ করিতে পারে না ; এমন কি শ্রেষ্ঠতর কিছুর অভাববশতঃ এই সমস্ত ভুল অনুবাদকে সে গ্রহণ এবং তাহাদের মধ্য দিয়া নিজেকে সার্থক করিবার চেষ্টা করে। কারণ মন হৃদয় এবং প্রাণময় সত্তাকে প্রভাবিত করিয়া তাহাদের ভাবনা বেদনা, আবেগ উৎসাহ ও সক্রিয়তাকে যাহা দিব্য এবং জ্যোতির্ম্ময় তাহার দিকে ফিরাইয়া দেওয়া অন্তরাত্মার কাজেরই অংশ ; কিন্তু একাজ প্রথমে অপূর্ণভাবে ধীরে ধীরে একটা মিশ্রণের মধ্য দিয়াই করিতে হয়। চৈত্যব্যক্তিসত্তা যত সবল হইতে থাকে, অন্তরালে স্থিত চৈত্য-সত্তার সহিত যোগ ততই নিবিড় এবং বাহিরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ ততই প্রশস্ত হইতে থাকে ; এবং মন হৃদয় ও প্রাণের নিকট ততই গভীররূপে

এবং বিশুদ্ধ আকারে তাহার নিজ ভাব সঞ্চারিত করিতে পারে ; কেননা তখন সে ক্রমশঃ অধিকতর রূপে বিমিশ্র এবং অশুদ্ধ ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি লাভ করে, তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয় ; তখন ক্রমে ক্রমে ইহা প্রকৃতির মধ্যে একটা শক্তিরূপে বিশিষ্টতর এবং স্পষ্টতরভাবে অনুভূত হইতে থাকে। কিন্তু এই দুরূহ কার্য্যের জন্য ক্রমপরিণতি-শক্তির স্বাভাবিক স্বয়ংক্রিয় গতির উপর শুধু নির্ভর করিয়া থাকিলে পরিণাম হইবে মন্থর ও বিলম্বিত ; কেবল যখন মানুষ তাহার অন্তরাত্মার জ্ঞানে জাগরিত হয় তাহাকে পুরোভাগে স্থাপন করিবার প্রয়োজন অনুভব করে এবং তাহাকেই তাহার জীবন ও কর্ম্মের নিয়ন্তা ও প্রভু করিয়া তোলে তখন পরিণামের একটা সচেতন দ্রুত-গতি-ধারা প্রবর্ত্তিত এবং এক চৈত্যরূপান্তর সম্ভব হয়।

এই মন্থর পরিণাম দ্রুততর হইয়া উঠে যখন মন, যাহা দেহের মৃত্যুর পরও বাঁচিয়া থাকে গভীরে অবস্থিত তেমন কিছুর সুস্পষ্ট ও অবাধিত ধারণা গড়িয়া তোলে এবং তাহার প্রকৃতি জানিবার জন্য প্রবলরূপে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এই জ্ঞানলাভের পথে প্রথমে এই বাধা দেখা দেয় যে আমাদের মধ্যে এমন অনেক উপাদান, অনেক রূপায়ণ আছে, যাহা চৈত্যসত্তার স্বরূপগত উপাদান-রূপে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমরা তাহাদিগকে অন্তরাত্মা বলিয়া ভুল করিতে পারি। প্রাচীন গ্রীকজাতির এবং অন্যান্য কয়েকটি জাতির ঐতি-হ্যের মধ্যে পরলোকের জীবন সম্বন্ধে যে বিবৃতি আছে তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায়, যাহাকে ভুল করিয়া জীবাত্মা বলিয়া মনে করা হইয়াছে তাহা অবচেতনা-ময় একটা রূপায়ণ, জড়ের পশ্চাতে স্থিত একটা সংস্কারময় বিগ্রহ বা ছায়াময় রূপ অথবা ব্যক্তিসত্তার একটা প্রেতাত্মা। এই প্রেতকায়াকে ভুল করিয়া স্পিরিট বা চিৎসত্তা নাম দেওয়া হইয়াছে, বস্তুত কখন কখন তাহা এক প্রাণময় রূপায়ণ যাহার মধ্যে মৃতব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এমন কি তাহার জীবিত কালের মুদ্রাদোষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, কখনও বা তাহা বহিশ্চর মনের একটা বাহিরের খোসা, সূক্ষ্ম জড়কে আশ্রয় করিয়া যাহার অনুবৃত্তি চলে ; দেহ হইতে প্রয়াণ করিয়া প্রাণময় ব্যক্তিসত্তার যে কোষ বা রূপ কিছুকাল পর্য্যন্ত পুরোভাগে অবস্থিত থাকে, বড়জোর ইহা হয়ত তাহাই। মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত যে অপচ্ছায়া বা ব্যক্তিসত্তার কোষসমূহের যে অবশেষ থাকে তাহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদিগকে আত্মা বলিয়া ভুল করা ছাড়া আর এক ভাবে ভুল হইতে পারে, আমাদের প্রকৃতির অধিচেতন অংশসকলের এবং তাহাদের ক্রিয়ার অধ্যক্ষ-

রূপে যে চেতনসত্তা বা পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহার রূপ ও শক্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই, এই অনভিজ্ঞতার জন্য অন্তর্মন বা অন্তঃপ্রাণের বিশেষ কোন বিভূতিকে চৈত্যপুরুষ বলিয়া সহজেই ভুল করিতে পারি। কেননা সমগ্র বিশ্বে যিনি সৎস্বরূপ তিনি যেমন এক হইয়াও বহু, আমাদের এবং আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ঠিক তেমনি এক বিধান আছে, আমাদের চিৎপুরুষ এক কিন্তু আমাদের প্রকৃতির মধ্যস্থ বহু রূপায়ণের প্রতি রূপে তিনি 'প্রতিরূপ' হইয়া আছেন। আমাদের আধারের প্রতি স্তরে চিৎপুরুষের এক শক্তির অধিষ্ঠান ও পরিচালনা আছে। যখন আমরা আমাদের সত্তার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হই, তখন আবিষ্কার করি যে তথায় এক মন-আত্মা বা মনোময় পুরুষ, এক প্রাণ-আত্মা বা প্রাণময় পুরুষ, এক দেহ-আত্মা বা অন্নময় পুরুষ আছে। এই মনোময় পুরুষের এক অংশের মাত্র প্রকাশ হয় বহিশ্চর মনের নানা ভাবনা অনুভূতি এবং মানস ক্রিয়ার রূপে ; প্রাণময় পুরুষ নিজের কিছুটা প্রকাশ করেন নানা বাসনা, আবেগ, বেদনা, অনুভূতি, বহিশ্চর ক্ষেত্রে প্রাণময় ক্রিয়ার আকারে ; অন্নময় পুরুষের বিভূতির আংশিক প্রকাশ হয় আমাদের দৈহিক প্রকৃতির নানা সহজাত বৃত্তি, অভ্যাস এবং নির্দ্দিষ্ট প্রণালীগত ক্রিয়ারূপে। আমাদের আত্মার এই বিভূতিপুরুষেরা বস্তুতঃ চিৎপুরুষেরই শক্তি সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের সাময়িক প্রকাশের দ্বারা সীমিত হন না, কেননা এইভাবে যাহা রূপায়িত হয় তাহাতে তাঁহাদের পূর্ণ বৈভবের এক অতি ক্ষুদ্র অংশের মাত্র স্ফুরণ হয় ; কিন্তু এই প্রকাশকে আশ্রয় করিয়া যে সাময়িক মনোময় প্রাণময় বা অন্নময় ব্যক্তিসত্তার অভিব্যক্তি হয় তাহা আমাদের চৈত্যপুরুষ বা আত্মার ব্যক্তিসত্তার মতই আমাদের মধ্যে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়। এই সমস্ত সত্তার প্রত্যেকের প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং সমগ্র সত্তার উপর প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করে স্বতন্ত্রভাবে প্রভাব বিস্তার করে ; কিন্তু এই সমস্ত ক্রিয়া ও প্রভাব বাহিরের ক্ষেত্রে আসিয়া পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক সমষ্টিগত বহিশ্চর সত্তাকে সৃষ্টি করে, যাহার মধ্যে সকল সত্তারই উপাদান বর্ত্তমান থাকে, বাহিরে তাহার অনুবৃত্তি বা প্রকাশ নিত্য চলিতে থাকে, তথাপি তাহা এই জীবন ও তাহার সীমিত অনুভবের জন্য নিত্যপরিণামশীল একটা প্রবহমান রূপায়ণ।

কিন্তু এই সমষ্টিগত সত্তা ভিন্নজাতীয় নানা উপাদানে গঠিত বলিয়া তাহা একটা সুষমাময় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রতায় পরিণত হয় নাই। এইজন্য আমাদের বিভিন্ন অংগ ও বৃত্তির মধ্যে সর্বদা একটা গোলমাল এমন কি ঠোকা-

ঠুকি দেখা যায়, আমাদের মনোময় বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি তাহাদিগকে নিয়-ন্ত্রিত ও সমন্বিত করিতে চায় কিন্তু তাহাদের বিরোধ ও হট্টগোলের মধ্যে মোটা-মুটি একটা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা আনিবার জন্য তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। সাধারণতঃ এক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রকৃতির প্রবাহে তাড়িত হই বা বড় বেশী ভাসিয়া যাই এবং যাহা সেই সময় আমাদের চিত্তের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমাদের ভাবনা ও ক্রিয়ার যন্ত্রসকলকে অধিকার করে তাহার প্রভাবেই কার্য্য করি—এমন কি যেখানে বিশেষ বিবেচনা করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কাজ নির্বাচিত করিয়াছি মনে করি সেখানেও অনেক সময় আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় খেয়ালখুশির দ্বারা পরিচালিত হই ; যখন আমরা বিচারবুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আমাদের মধ্যস্থিত বিবিধ উপাদান-গুলির মধ্যে সাম্য আনিতে চাই এবং তাহার ফলরূপে আগত ভাবনা, বেদনা, আবেগ এবং ক্রিয়াসকলের মধ্যে শৃঙ্খলা আনিতে চেষ্টা করি, যখন তাহাদিগকে সুবিন্যস্ত করিতে সচেষ্ট হই তখন তাহাতে পূর্ণভাবে সফলতা লাভ করি না, তাহা অর্দ্ধনিষ্পন্ন থাকিয়াই যায়। পশুর বেলায় প্রকৃতি নিজের মনোময় ও প্রাণময় বোধি অনুসারেই ক্রিয়া করে ; পশু যাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে মানিয়া চলে এমন সমস্ত সহজাত প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস, প্রকৃতি তাহার উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া পশুজগতে একটা শৃঙ্খলা আনয়ন করে, সুতরাং কোন পরিবর্ত্তনে পশুর চেতনার কিছু যায় আসে না। কিন্তু মানুষ তাহার মানবতার বিশেষ অধিকার ত্যাগ না করিয়া একেবারে এরূপভাবে কাজ করিতে পারে না ; তাহার সত্তার মধ্যে প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয়তা দ্বারা চালিত হইয়া সহজাত বৃত্তি এবং আবেগের এক মহাবিশৃঙ্খলাময় রাজত্ব চলিবে ইহা সে হইতে দিতে পারে না ; মানুষের মধ্যে মন সচেতন হইয়াছে ; যাহা দিয়া তাহার বহিঃ-সত্তা গঠিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে সেই সমস্ত বিভিন্ন উপাদান এবং পরস্পরের সহিত যুধ্যমান প্রবৃত্তিকে আবিষ্কার শাসন ও সমন্বয় করিবার একটা চেষ্টা—অনেকের মধ্যে তাহা অতি প্রাথমিক গোছের হইলেও—তাহার নিজ প্রকৃতির বশেই মানুষ করিতে বাধ্য হয়। গোড়ার দিকে অতি অপূর্ণ হইলেও শেষে এ সমস্তের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিবে এ আশা সে ছাড়িতে পারে না। ফলে প্রথমে সে যতটুকু সফলতা লাভ করে তাহাকে একপ্রকার নিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলা বা ছন্দোবদ্ধ হট্টগোল ছাড়া আর কিছু বলা চলে না, অন্ততঃ তখন সে মনে করে যে তাহার নিজের মন ও ইচ্ছা দ্বারাই

নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, যদিও বস্তুত সে নিয়ন্ত্রণ কেবল আংশিক ভাবেই করিতে সে সমর্থ হইয়াছে; কেননা চিরাভ্যস্ত নানামুখী বিচিত্র প্রবৃত্তি এবং শক্তির একটা সঞ্চিত ভাণ্ডার যে শুধু তাহার মধ্যে আছে তাহা নয়, যাহা সর্ব্বদা প্রত্যাশিত বা বশ্য নয় দেহ ও প্রাণের তেমন অনেক নূতন প্রবৃত্তি ও আবেগও তাহার মধ্যে স্ফুরিত হইয়া ওঠে, অসংলগ্ন এবং বেসুরা অনেক মনোময় উপাদান আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহারা তাহার বিচার বুদ্ধি ও সংকল্পকে পরিচালিত করিয়া তাহার আত্মগঠন, স্বভাবের পুষ্টি এবং জীবনের ক্রিয়ামধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষ স্বরূপতঃ এক অদ্বিতীয় পুরুষ হইলেও তাহার প্রকাশের ক্ষেত্রে তাহার মধ্যে বহু পুরুষের বিচিত্র সমাহার দেখা যায়; যতদিন পর্য্যন্ত তাহার অন্তর-পুরুষ এই বহুপুরুষকে নিজের প্রভাবের মধ্যে আনিয়া শাসন ও পরিচালন করিতে সক্ষম না হয় ততদিন পর্য্যন্ত নিজের প্রভু হইতে সে সক্ষম হয় না, তাহার স্বারাজ্য-সিদ্ধি হয় না; কিন্তু তাহার বহিশ্চর মনোময় বুদ্ধি ও সংকল্প দ্বারা ইহা পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিয়া তোলা সম্ভব নয়; ইহা তখনই পূর্ণরূপে সিদ্ধ করা সম্ভব হইবে যখন মানুষ অন্তরের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যে কেন্দ্রগত পুরুষ তাঁহার সকল প্রকাশ এবং ক্রিয়ার আদিতে থাকিয়া সকলকে তাহার বিরাট প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তাহাকে আবিষ্কার করিতে পারিবে। অন্তরতম সত্য এই যে, অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষই এই কেন্দ্রগত পুরুষ; কিন্তু বাহিরের ক্ষেত্রে বস্তুত তাঁহার সত্তার কোন না কোন অংশই শাসন বা পরিচালনা করে, অন্তরাত্মার এই প্রতিনিধিকে বা এই সহকারী আত্মাকে তাহার অন্তরতম আত্মতত্ত্ব বলিয়া মানুষ ভুল করিতে পারে।

মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিণাম ও পুষ্টির স্তরপরম্পরার মূলে এই সমস্ত বিভিন্ন প্রতিভূ-আত্মার শাসন রহিয়াছে ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; অন্তর-তত্ত্বের দ্বারা প্রকৃতির প্রশাসনের দিক হইতে সে সকলকে পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিতে চাই। কোন কোন মানুষের মধ্যে তাহার দেহগত সত্তা বা বাহ্য অন্নময় পুরুষই তাহার মন সংকল্প এবং ক্রিয়াকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে, ইহার শাসনে যে মানুষ সৃষ্ট হয় তাহাকে অন্নময় মানুষ বলিতে পারি, এ মানুষ প্রধানতঃ ব্যাপৃত থাকে তাহার দেহগত প্রাণ এবং তাহার অভ্যস্ত প্রয়োজন, দেহের আবেগ, মন প্রাণ ও দেহের অভ্যাস সকল লইয়া; সে এ সমস্তের বাহিরে বেশী অথবা একেবারেই দৃষ্টি করে না, তাহার অন্য সকল প্রবৃত্তি এবং সম্ভাবনাকে নিজের সেই সঙ্কীর্ণ রূপায়ণের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে এবং তাহার অধীনতায় আনিতে চায়। কিন্তু

এই অন্নময় মানুষের মধ্যেও অন্য উপাদান আছে এবং নরাকার পশুর মত শুধু জন্ম মৃত্যু ও প্রজনন এবং তাহার সাধারণ আবেগ ও বাসনার পরিতৃপ্তি এবং প্রাণ ও দেহ রক্ষা লইয়াই সে থাকিতে পারে না ; তাহার সাধারণ ব্যক্তিত্বের ঝোঁক এই দিকে থাকিলেও, যতই ক্ষীণভাবে হউক না কেন তাহার মধ্যে এমন সমস্ত প্রভাব আসিয়া পড়ে যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া সে অগ্রসর হইতে পারে এবং যদি তাহাদিগকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়া তোলে তবে মানব পরিণতির উচ্চতর ধারায় পৌঁছিতে পারে। অন্তরস্থিত সূক্ষ্মভূতের অধিষ্ঠাতা অন্নময় পুরুষের প্রেরণা পাইলে, তাহার মনে দেহগত জীবনের সূক্ষ্মতর, সুন্দরতর, পূর্ণতর এক আদর্শ দেখা দিতে এবং তাহার নিজের ও সমষ্টি বা সংঘগত জীবনে সে আদর্শকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার আশা বা চেষ্টা করিতে পারে। আবার কোন কোন মানুষের মনে সংকল্পে এবং ক্রিয়াতে প্রাণগত আত্মা বা প্রাণময় সত্তার প্রশাসন প্রবল। ইহাতে প্রাণময় মানুষই সৃষ্ট হয়। এ মানুষ প্রধানতঃ ব্যাপৃত থাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা আত্ম-বিস্ফারণ প্রাণের সম্প্রসারণ উচ্চাশা প্রবৃত্তি ও বাসনার তৃপ্তি লইয়া, চায় অহমিকার দাবি মিটাইতে, চায় প্রভুত্ব, শক্তি, উত্তেজনা, বিরোধ ও যুদ্ধ, অন্তরে ও বাহিরে দুঃসাহসের পথে অভিযান ; এই প্রাণময় অহং-এর পুষ্টি এবং আত্মপ্রচারের কাছে আর সমস্তই গৌণ ও আগন্তুক বা আকস্মিক। কিন্তু তথাপি প্রাণময় মানুষের মধ্যেও বর্দ্ধমান মনোময় এবং চিন্ময় ধর্ম্মযুক্ত অন্য উপাদান বর্ত্তমান থাকিতে পারে বা থাকে, যদিও এ সমস্ত তাহার প্রাণময় ব্যক্তিত্ব এবং প্রাণশক্তির তুলনায় বহুল পরিমাণে ক্ষীণ ও খর্ব্ব। মাটির বুকে থাকিয়া মাটি আঁকড়িয়া থাকাই অন্নময় মানুষের স্বভাব, তাহার মধ্যে জড়ভাবের একটা স্থিতি একটা সাম্য আছে ; কিন্তু প্রাণময় মানুষ আরও কর্ম্মমুখর আরও চঞ্চল আরও বলদৃপ্ত আরও গতিশীল, তাহার জীবন আরও দুর্দ্দান্ত আরও বিশৃঙ্খল, এক এক সময় তাহা কোন শাসনই মানিতে চায় না। প্রাণময় মানুষের মূল উপাদান বায়ুতত্ত্ব, অন্নময় মানুষের মত ক্ষিতিতত্ত্ব নয়, তাই সে অধিকতর ক্রিয়াশীল অধিকতর ভাবে সৃষ্টিসমর্থ, তাহার মধ্যে স্থিতির চেয়ে গতিই প্রবল। তেজস্বী প্রাণময় মন ও ইচ্ছা সক্রিয় প্রাণময় শক্তিসকলকে সহজে হাতের মুঠায় আনিতে এবং শাসন করিতে পারে কিন্তু তাহার পদ্ধতি হইল বলপ্রয়োগে দমন ও বাধ্য করা, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন দ্বারা নয়। কিন্তু প্রাণময় মন ও ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন সবল প্রাণময় ব্যক্তিপুরুষ যদি বিচারবুদ্ধির দৃঢ় সহায়তা পায় যদি তাহাকে নিজের মন্ত্রীপদে নিয়োগ করিতে পারে তাহা

হইলে প্রবল শক্তিশালী এক রূপায়ণ গড়িয়া উঠে যাহা অল্পাধিক পরিমাণে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সর্ব্বদাই বলদৃপ্ত সফলকাম ও কার্য্যক্ষম, যাহা প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারে এবং জীবন ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রবলভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ। প্রকৃতির ঊর্দ্ধ্বগমনের পথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপায়ণে ইহাই দ্বিতীয় ধাপ।

ব্যষ্টি ব্যক্তির পরিণামের আরও উচ্চতর স্তরে মনোময় সত্তার রাজ্য আরম্ভ হয়; এখানে মনোময় মানুষের সৃষ্টি হয়। অন্নময় ও প্রাণময় মানুষ যেমন প্রকৃতির দেহ ও প্রাণরাজ্যের অধিবাসী মনোময় মানুষ তেমনি প্রধানতঃ মনের ভূমিতে বাস করে। মনোময় মানুষ তাহার সত্তার বাকি সমস্ত অংশকে তাহার মনোময় আত্মপ্রকাশ, মনোময় উদ্দেশ্য, মনোময় স্বার্থ, মনোময় ভাব বা আদর্শের অধীন করিতে চায়; এই অধীন করা খুবই দুরূহ, অথচ ইহা সাধিত হইলে প্রবল ফলদায়ক শক্তি লাভ হয়, তাই মনোময় সাধনা দ্বারা তাহার আত্ম প্রকৃতির মধ্যে ছন্দসুষমা প্রতিষ্ঠিত করা একদিকে যেমন অধিকতর কঠিন তেমনি অন্য-দিকে অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহা সহজ এই জন্য যে মনোময় ইচ্ছাশক্তি একবার আয়ত্তে আসিলে বুদ্ধির শক্তি যুক্তিতর্কের দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া প্রাণ, দেহ এবং তাহাদের দাবিগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার, তাহাদিগকে সঙ্কুচিত বা দমিত করিতে পারা যায়, তাহাদিগকে ব্যবস্থিত ও সমন্বিত করিয়া নিজের সাধনযন্ত্ররূপে পরিণত করাও সম্ভব হয়, এমন কি তাহাদিগকে বা তাহাদের দাবি এত কমাইয়া দিতে বাধ্য করা যায় যে তাহারা আর মনোময় জীবনকে আলোড়িত বা বিক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হয় না অথবা মনকে ভাব বা আদর্শের উচ্চমঞ্চ হইতে নামাইয়া আনিতে পারে না। এ সাধনা আবার কঠিন এই জন্য যে দেহের ও প্রাণের শক্তি মনঃশক্তির অগ্রে জাত হইয়াছে, এবং যদি তাহারা সবল হয় তবে তাহারা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে প্রায় অনিবার্য্যভাবে মনোময় শাসনকর্ত্তার উপর নিজেদিগকে আরোপ করিতে পারে। মানুষ মনোময় জীব এবং মনই প্রাণ ও দেহের নেতা ও চালক; কিন্তু সে এমনি চালক যে বহুল পরিমাণে নিজের অনুবর্ত্তীদের দ্বারাই চালিত হয় এবং সময় সময় এমনও ঘটে যে তাহারা তাহার উপর যাহা চাপাইয়া দেয় তাহা ছাড়া তাহার নিজের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছাই থাকে না। মনের নিজস্ব শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই সে অবচেতন ও নিশ্চেতনের কাছে শক্তিহীনের মত আত্মসমর্পণ করে, তখন ইহাদের দ্বারা তাহার স্বচ্ছতা আবিল হইয়া পড়ে এবং সহজাত

বৃত্তি ও আবেগের স্রোতের টানে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়; নিজের দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা থাকা সত্ত্বেও সে প্রাণ ও তাহার আবেগের প্ররোচনায় নেহাৎ নির্ব্বোধের মত অবিদ্যা এবং ভ্রমের কু-চিন্তা এবং কু-কর্ম্মের অনুমোদন করে অথবা যাহা সে অন্যায় অনর্থ এবং বিপজ্জনক মনে করে প্রকৃতি যখন সেই পথ অনুসরণ করে তখন সে নিরুপায় ভাবে চাহিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। এমন কি যখন সে সবল হইয়া উঠে যখন তাহার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয় এবং সে প্রাণ ও দেহের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হয় তখনও একপ্রকার মনোময় সামঞ্জস্য এবং সুষমা সকলের উপর বহুল পরিমাণে আরোপ করিতে সক্ষম হইলেও সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতিকে পূর্ণ একত্বে গ্রথিত করিয়া তুলিতে পারে না। তাহা ছাড়া অপরা-প্রকৃতির এই নিম্নতর ক্ষেত্রের শাসন ও পরিচালনায় যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় তাহা অনিশ্চিত, কেননা সেখানে প্রকৃতির এক অংশ প্রবল হইয়া নিজেকে সার্থক করিয়া তোলে এবং সেই সঙ্গে অপর অংশ সকলকে পীড়ন করে এবং তাহাদের নিজ সার্থকতার পথে বাধা জন্মায়। এ সমস্ত উৰ্দ্ধে উঠিবার পথের মধ্যবর্ত্তী সোপান হইতে পারে, কিন্তু শেষ সোপান নয়; তাই প্রকৃতির এক অংশ একেশ্বর হইয়া একটা আংশিক সামঞ্জস্য আনিয়াছে ইহাও অধিকাংশ লোকের মধ্যে দেখিতে পাই না বরং দেখিতে পাওয়া যায় যে এক অংশ শুধু প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং বাকি অংশের কোথাও ব্যক্তি সত্তা অৰ্দ্ধ-গঠিত হইয়াছে আর কোথাও অৰ্দ্ধগঠিত হইয়া উঠিতেছে তজ্জন্য একটা অস্থায়ী সাম্য মাত্র স্থাপিত হইয়াছে, আবার কখনও বা কেন্দ্রীয় পরিচালনার অভাবে অথবা পূর্বে অর্জিত আংশিক সাম্য আলোড়িত ও নষ্ট হওয়াতে ভারসাম্যের অভাব ঘটিয়াছে, প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে অসমতা দেখা দিয়াছে। আমাদের জীবনের প্রকৃত কেন্দ্রটি আবিষ্কৃত হইলে, চরম না হইলেও একটা প্রাথমিক খাত সুষমা বা সত্য সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাহা না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনকালীন এই সমস্ত সাময়িক ব্যবস্থা অথবা অব্যবস্থা চলিতে থাকিবে। কেননা আমাদের অন্তরাত্মাই আমাদের সত্য কেন্দ্রীয় সত্তা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে এ পুরুষ পশ্চাতে কেবল গোপন সাক্ষী রূপে অবস্থিত অথবা বলা যাইতে পারে তিনি কেবল এক নিয়মতান্ত্রিক বা সাক্ষীগোপাল সম্রাট, তিনি তাহার মন্ত্রীগণকে তাহার পক্ষ হইতে শাসন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন, তাহাদিগের হাতে তাঁহার সাম্রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, নীরবে তাহাদের মতে সায় দিয়া যাইতেছেন; কেবল মধ্যে মধ্যে

নিজের একটা মত ব্যক্ত করিতেছেন কিন্তু যে কোন মুহূর্ত্তে সে মতকে উপেক্ষা করিয়া অন্যভাবে কার্য্য করিবার শক্তি মন্ত্রীদের আছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা কেবল ততদিন চলে যতদিন চৈত্যসত্তা পুরোভাগে আত্মার যে ব্যক্তিরূপ স্থাপিত করিয়াছেন তাহা উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া না উঠে; এই ব্যক্তি-রূপ যখন এমন প্রবল হইয়া দাঁড়ায় যে তাহার মধ্য দিয়া অন্তরপুরুষ আসিয়া নিজের প্রভুত্ব স্থাপনে সক্ষম হন তখন সেই অন্তরাত্মা সম্মুখে আসিয়া প্রকৃতিকে পরিচালনা করিতে পারেন। যখন আমাদের সত্তার এই খাঁটি সম্রাট অগ্রসর হইয়া আসিয়া নিজ রাজ্যের শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন কেবল তখন আমাদের সত্তা এবং আমাদের জীবনে খাঁটি সুষমা ও সামঞ্জস্য দেখা দিতে পারে।

অন্তরাত্মার এইরূপ পরিপূর্ণ উন্মেষের প্রথম সর্ত্ত বহিশ্চর সত্তার সহিত চিন্ময় সত্যবস্তুর একটা সাক্ষাৎ সংস্পর্শ। সে নিজে সেই সত্য বস্তু হইতে আসিয়াছে বলিয়া প্রাতিভাসিক প্রকৃতির মধ্যে যাহা সেই উচ্চতর সত্যের আপন অধিকারে আছে মনে হয় যাহাকে সে-সত্যের চিহ্ন এবং ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করা যায় আমাদের মধ্যস্থ চৈত্য উপাদান সর্ব্বদা সেই দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়। প্রথমতঃ চৈত্যপুরুষ প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সত্য শিব এবং সুন্দর যাহা কিছু শুচি ও সূক্ষ্ম, উচ্চ ও মহৎ তাহার মধ্য দিয়া এই চিন্ময় তত্ত্ব খোঁজে, কিন্তু বাহ্য চিহ্ন ও প্রকৃতির বাহিরের এই সমস্ত বিভূতির মধ্য দিয়া যে সংস্পর্শ পাওয়া যায় তাহাতে প্রকৃতির কতকটা শোধন ও রূপান্তর হয়, ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাহা পরিপূর্ণভাবে অন্তরতম ভাবে গভীরতম রূপান্তর সাধন করিতে সক্ষম হয় না। তাহার জন্য সত্যবস্তুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শ লাভ অপরিহার্য্য, কেননা সেই বস্তু ছাড়া অন্য কিছু আমাদের সত্তার মর্ম্মমূল তেমন গভীরভাবে স্পর্শ করিতে বা নাড়া দিতে পারে না অথবা প্রবল আলোড়নের ফলে রূপান্তরের জন্য এক মহা উত্তেজনাকে জাগাইয়া তুলিতে পারে না। মন যে সমস্ত প্রতিরূপ ফুটাইয়া তোলে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এবং শক্তির সক্রিয়তার জন্য যে সমস্ত আকার গড়িয়া উঠে তাহাদের মূল্য এবং প্রয়োজন আছে। সত্য শিব এবং সুন্দর পরম-সত্যেরই আদি ও মহাবীর্য্যশালী রূপ, এমন কি তাহাদের যে সমস্ত রূপায়ণ মনের দৃষ্টিতে ফোটে, হৃদয় দিয়া অনুভব করি অথবা জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলি তাহারাও ঊর্দ্ধ্বগমনের পথের সোপানমালা হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের মূল সত্তা চিন্ময় উপাদান যাহার মধ্যে আছে এবং তাহারা যাহার প্রতিরূপ সেই পরম সত্যবস্তুকেই আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে।

অন্তরাত্মা প্রধানতঃ মননশীল চিত্তকে মধ্যবর্ত্তী এবং তাহাকে সাধনযন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া এই সংস্পর্শলাভের চেষ্টা করিতে পারে ; অন্তরাত্মা বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বৃহত্তর মন এবং বোধিচেতনা বিভাবিত মনের উপর চৈত্য-সত্তার একটা ছাপ ফেলিতে এবং তাহাদের মুখ সেই দিকে ফিরাইয়া দিতে পারে। এই চিন্তাশীল মন তাহার উচচতম অবস্থায় সর্ব্বদা যাহা নৈর্ব্ব্যক্তিক তাহার দিকে আকৃষ্ট হয় ; খোজ করিতে গিয়া সে এমন এক চিন্ময় মূলতত্ত্ব এক নৈর্ব্ব্যক্তিক সত্যবস্তুর সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে, যাহা এ সমস্ত বাহ্য চিহ্ন এবং প্রকৃতি বা ধর্ম্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে অথচ যাহা সকল রূপায়ণ সকল অভিব্যঞ্জক রূপের অতীত। অন্তরতমভাবে এক ইন্দ্রিয়াতীত এমন কিছুকে সে অনুভব করে যাহা মনে হয় পরম সত্য, পরম শিব, পরম সুন্দর, পরম নিরঞ্জন, পরম আনন্দ ; ক্রমে যেমন সে স্পর্শ আরও গভীর আরও অন্তরতম হইতে থাকে তেমনি সে তত্ত্ব যে অনুভবের অযোগ্য এ বোধ সরিয়া গিয়া ক্রমেই তাহা অনুভবের মধ্যে অধিকতর রূপে আসিতে থাকে ; বস্তু নিরপেক্ষ একটা ভাব মাত্র না থাকিয়া তাহা ক্রমশঃ অধিকতর রূপে চিন্ময় এবং বাস্তব সত্য রূপে দেখা দিতে থাকে, যে শাশ্বত অনন্ত বস্তু যাহা কিছু বর্ত্তমান তাহা হইয়াছেন অথচ সমস্ত অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছেন তাঁহার সংস্পর্শ ও চাপ ক্রমশঃ অধিকতর রূপে তাহার চিত্তে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই নৈর্ব্ব্যক্তিকতা হইতে একটা শক্তি একটা চাপ আসিয়া সমগ্র মনকে ছাঁচে ফেলিয়া নিজেরই এক রূপে গড়িয়া তুলিতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর নৈর্ব্ব্যক্তিক রহস্য এবং বিধান ক্রমশঃ স্পষ্টতর রূপে সে মনের কাছে প্রকাশ হইতে থাকে। মন তখন পুষ্ট হইয়া জ্ঞানীর মনে পরিণত হয়, প্রথমে দেখা দেয় মনোময় মনীষীর উচচমন, তাহার পর অধ্যাত্ম যোগীর মন, যাহা অরূপ মনের অথবা অমূর্ত্ত বিষয় ভাবনার রাজ্য পার হইয়া পৌঁছিয়াছে সাক্ষাৎ অনুভবের প্রান্তভূমিতে। ইহার ফলে মন হয় শুদ্ধ, শান্ত, বৃহৎ ও নৈর্ব্ব্যক্তিক ; প্রাণের উপরও ছড়াইয়া পড়ে অনুরূপ এক শান্ত ভাবের আবেশ, কিন্তু ইহাতেও যে ফল লাভ হয় তাহা পূর্ণ না হইতে পারে, কেননা মনোময় এ রূপান্তর স্বভাবতঃ ক্রমশঃ অধিকতর রূপে অন্তরে এক অচলাস্থিতি এবং বাহিরে এক নীরবতা ও উপশমের দিকে লইয়া যায়, কিন্তু শুদ্ধিসাধক এই শান্ত সাম্যে স্থিত হইয়া, নূতন প্রাণশক্তি আবিষ্কারের দিকে প্রাণের যে স্বাভাবিক টান আছে সেরূপ ভাবে কোন নবশক্তিলাভের দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে বলিয়া প্রকৃতি পূর্ণ সক্রিয় রূপান্তরের চেষ্টা করে না।

মনের মধ্য দিয়া আরও উচ্চতর চেষ্টার সময়ও শান্ত এবং নিষ্ক্রিয় হইবার এই আবেশ কাটে না, কেননা আধ্যাত্মিকতার ভাবে বিভাবিত মন ঊর্দ্ধের পথে যখন আরোহণ করিতে চায় তখন মনের নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় রূপের উপর তাহার অধিকার খসিয়া যায় বলিয়া তাহা অরূপ অলক্ষণ এক বৃহৎ নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে প্রবেশ করে। চেতনায় তখন ফোটে সকল পরিবর্ত্তনশূন্য বা অক্ষর আত্মা, বিশুদ্ধ চিৎতত্ত্ব, অনাবৃত শুদ্ধ পরম সদ্‌বস্তু, অরূপ অনন্ত এবং অনামী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। সোজাসুজি সকল নামরূপকে অতিক্রম করিয়া ভাল বা মন্দ, সত্য বা মিথ্যা, সুন্দর বা অসুন্দরের সকল দ্বন্দ্ব পার হইয়া আরও সাক্ষাৎভাবে পৌঁছা যায় সেই চরম তত্ত্বে সকল দ্বন্দ্বের উপরে যাহা অবস্থিত, লাভ করা যায় এক পরম অদ্বয় অনন্ত শাশ্বত বস্তুর অনুভূতি অথবা পৌঁছা যায় এমন এক অনির্ব্বচনীয় উচ্চ অবস্থায় যথায় আত্মা বা চিদ্‌বস্তু সম্বন্ধে মনের শেষ বা চরম ধারণা বা প্রত্যয়ও ডুবিয়া যায়। তখন চিন্ময় এক চেতনা লাভ হয় প্রাণ শান্ত এবং নিশ্চল হইয়া পড়ে, দেহের সকল প্রয়োজন সকল দাবি দূর হইয়া যায় এবং অন্তরাত্মা নিজে চিন্ময় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ডুবিয়া যায়। কিন্তু মনের মধ্য দিয়া এই রূপান্তরেও পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীণ রূপান্তর লাভ হয় না, শুধু চেতনার তুঙ্গশৃঙ্গে স্থিত আধ্যাত্মিক রূপান্তর চৈত্যিক রূপান্তরের স্থান অধিকার করে। কিন্তু সমগ্র প্রকৃতি তাহাতে দিব্যভাবে ও শক্তিতে পরিণত হয় না।

সাক্ষাৎ সংস্পর্শের জন্য অন্তরাত্মা দ্বিতীয় আর এক পথে হৃদয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে পারে ; এ পথে সাধনা আরও নিবিড় এবং তাহার ফল দ্রুত হয়, ইহা অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষের নিজের পথ, কেননা তাহার নিজের আসন বা গোপন বাসস্থান হৃৎকেন্দ্রের ঠিক পশ্চাতে আমাদের আবেগময় সত্তার নিকটসংস্পর্শে অবস্থিত ; এই জন্য গোড়ার দিকে স্বাভাবিকভাবে শক্তিশালী এবং জীবন্ত ও মূর্ত্ত অনুভূতিলাভে সমর্থ ভাবাবেগের মধ্য দিয়াই সাধনা সর্ব্বোত্তম ভাবে আরব্ধ হইতে পারে। এ সাধনা প্রেম ও ভক্তিরই সাধনা। যিনি চিরসুন্দর, চির-আনন্দ, চিরকল্যাণ, যিনি সত্যস্বরূপ, যিনি প্রেমের চিন্ময় সত্য, এ পথে সাধক তাঁহারই দিকে অগ্রসর হয় ; এখানে আমাদের রসচেতনা এবং আবেগময় বৃত্তি যুক্ত ও মিলিত হইয়া অন্তরাত্মা জীবন ও সমগ্র প্রকৃতিকে তাহাদের উপাস্যের কাছে উৎসর্গ করে। যখন নৈর্ব্যক্তিকতার ভূমি পার হইয়া সাধকের মন পরম ব্যক্তিপুরুষের অনুভব পায় কেবল তখনই ভক্তির এই

পথে পূর্ণ শক্তি ও বেগ সঞ্চার হয়; সে অনুভবে সকল বৃত্তি হয় তীক্ষ্ণ, দীপ্ত ও মূর্ত্ত; হৃদয়ের আবেগ সংবেদন চিন্ময় বোধশক্তি সমস্তই তাহাদের চরম কোটিতে পৌঁছিয়া যায়, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ কেবল যে সম্ভব হয় তাহা নহে, তাহা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ভাবাবেগময় প্রকৃতির মধ্যে ভক্তরূপে বর্দ্ধিষ্ণু চিন্ময় মানুষের আবির্ভাব ঘটে, যদি এই ভক্তির সঙ্গে অন্তরাত্মা এবং তাহার অনুশাসনের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ হয় এবং ভাবাবেগময় সত্তার সহিত চৈত্য-ব্যক্তিসত্তার যোগসাধন করিয়া যদি কেহ পবিত্রতা, ভগবদ্‌ভাবে বিভোরতা, ভগবানে পরম প্রেম, এবং বিশ্বমৈত্রীর দ্বারা জীবন ও প্রাণের সকল বৃত্তিকে কল্যাণদীপ্ত দিব্যচিন্ময় সুষমা এবং দিব্যপূর্ণজ্যোতিতে রূপান্তরিত করে, তাহা হইলে সে সাধু বা সন্ত হইয়া উঠে, অন্তরে উচ্চতম দিব্যতম অনুভূতি লাভ করে, ভগবৎ-সত্তায় পৌঁছিবার এই পথের উপযোগীভাবে প্রকৃতির বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। কিন্তু প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ বা সম্যক্ রূপান্তরের পক্ষে ইহাও যথেষ্ট নয়; ইহার সঙ্গেও চাই মননশীল চিত্তের এবং চেতনার প্রাণময় এবং অন্নময় সকল অংশের নিজ নিজ প্রকৃতিকে বজায় রাখিয়াই দিব্য রূপান্তর।

এই বৃহত্তর রূপান্তর অংশতঃ সিদ্ধ হইতে পারে যদি হৃদয়ের অনুভূতির সঙ্গে ব্যবহারিক সঙ্কল্প বা ইচ্ছাশক্তিকে উৎসর্গ করা যায়, অবশ্য সে সঙ্কল্প এমন হওয়া চাই যাহাতে তাহা প্রাণের সেই বৃত্তি ও শক্তিকে সঙ্গে লইয়া চলিতে পারে, যাহা মনকে সক্রিয় করিয়া তোলে, এবং যাহা আমাদের বাহিরের কর্ম্মের প্রথম সাধন যন্ত্র; কেননা তাহা না হইলে সঙ্কল্প কার্য্যকরী হইতে পারে না। কর্ম্মের মধ্যে সঙ্কল্পের এই উৎসর্গ, অহংগত সঙ্কল্প এবং কর্ম্মের মূলে সাধারণতঃ যে বাসনার প্ররোচনা আছে এ উভয়কে ধীরে ধীরে বিলীন করিয়া দিয়াই অগ্রসর হয়; অহমিকা প্রথমতঃ নিজেকে কোন উচ্চতর বিধানের অধীন করে এবং অবশেষে নিজেকে একেবারেই মুছিয়া ফেলে, তখন মনে হয় যেন তাহার অস্তিত্ব নাই কিংবা এক উচ্চতর শক্তি বা বৃহত্তর সত্যকে সেবা করিবার অথবা ভগবৎ-সত্তার কাছে যন্ত্ররূপে নিজের সঙ্কল্প এবং ক্রিয়া উৎসর্গ করিবার জন্য শুধু বর্ত্তমান থাকে। সত্তার যে বিধান বা ক্রিয়া অথবা সত্যের যে আলোক তখন সাধককে চালায় তাহা তাহার মনোরাজ্যের উচ্চতম শিখরে মাত্র যাহার অনুভূতি লাভ করা যায় এমন এক স্বচ্ছতা বা শক্তি বা তত্ত্ব হইতে পারে; অথবা এমনও হইতে পারে যে যিনি দিব্য সত্য সঙ্কল্প তাঁহারই সত্যের আবির্ভাব সে অনুভব

করে, অনুভব করে তাহাই আলোক বা বাণী বা শক্তি বা দিব্যপুরুষ বা দিব্য উপস্থিতিরূপে তাহার মধ্যে থাকিয়া ক্রিয়াশীল হইয়াছে বা তাহাকে চালাইতেছে। এইভাবে অবশেষে সে এমন এক চেতনায় পৌঁছে যেখানে সে সাক্ষাৎভাবে অনুভব করে যে এক দিব্য শক্তি বা আধারে অধিষ্ঠিত এক দিব্যবস্তু তাহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে এবং তাহার সকল ক্রিয়া শাসিত ও পরিচালিত করিতেছে এবং সেই বৃহত্তর সত্যসংকল্প, সত্যশক্তি বা সত্যসত্তার ইচ্ছার কাছে তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গিত হইয়াছে অথবা তাহার সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। মনের সাধনা সঙ্কল্পের সাধনা এবং হৃদয়ের সাধনা এই ত্রিধারার একত্র মিলন ঘটিলে আমাদের বহিশ্চর সত্তার এবং প্রকৃতির এমন একটা চৈত্যিক বা চিন্ময় পরিবেশ সৃষ্টি হয় যাহাতে নিজেকে এবং তাহার বহুবিচিত্র সকল বৃত্তি ও ভাবকে বৃহত্তরভাবে এবং পূর্ণরূপে খুলিয়া ধরিতে পারে—অন্তরস্থ চৈত্যসত্তার আলোকের দিকে, তাহার চিন্ময় আত্মা বা ঈশ্বরের দিকে, যে সত্য বস্তু এক্ষণে আমাদের উপরে আমাদিগকে ঘিরিয়া এবং আমাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান আছেন বলিয়া বোধ করিতেছি তাঁহার দিকে। সাধকের প্রকৃতিতে তখন আরো শক্তিশালী এবং বহুমুখী পরিবর্ত্তন এবং আত্মগঠন ও আত্মসৃষ্টির প্রবেগ দেখা দেয়; ভক্ত, অহমিকাপরিশূন্য কর্ম্মযোগী, অধ্যাত্মজ্ঞানে বিভূষিত জ্ঞানযোগীর পরম সমন্বয়ে একই আধারে ফুটিয়া উঠে এক সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা।

এই রূপান্তরকে উদার অখণ্ড এবং গভীরভাবে পূর্ণ করিতে হইলে, চেতনার কেন্দ্র এবং তাহার সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এ উভয়ভাবের স্থিতি এখন যে বাহ্যসত্তায় অবস্থিত আছে তাহা হইতে সরাইয়া অন্তর সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; সেখানেই আমাদের ভাবনা, জীবন এবং ক্রিয়ার ভিত্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কেননা বাহিরের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অন্তর-সত্তার নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করা বা তাহার অনুশাসন মানিয়া চলা পূর্ণ রূপান্তরের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে; তাহার জন্য আমাদের বহিশ্চর ব্যক্তিত্ব বর্জন করিয়া অন্তরের সত্তা বা পুরুষ হইয়া উঠিতে হইবে। কিন্তু এ অতি দুরূহ ব্যাপার; কেননা প্রথমত: বহিঃপ্রকৃতি এই প্রগতির পথে বাধা দেয়, চিরাভ্যস্ত সাধারণ স্থিতি ও সংস্কার এবং জীবনের বহির্মুখী ধারাতে সে সংসক্ত হইয়া থাকিতে চায়, তাহা ছাড়া সত্তার যে গভীরতর প্রদেশে আমাদের চৈত্যপুরুষ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অবস্থিত আছে তথা হইতে বহিশ্চেতনার ক্ষেত্র বহুদূরে অবস্থিত এবং এই মধ্য-

বর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া যে অধিচেতন প্রকৃতি এবং তাহার গতি ও ক্রিয়া আছে, তাহাদের সকলেই যে অন্তরাভিমুখী গতির সীমায় পৌঁছিবার পক্ষে অনুকূল ইহা কোনমতেই সত্য নয়। বাহিরের প্রকৃতির ভঙ্গিমা ও স্থিতি পরিবর্ত্তিত হওয়া চাই, তাহাকে প্রশান্ত ও পরিশুদ্ধ করিয়া তাহার উপাদান ও শক্তির এরূপ সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন ঘটানো আবশ্যক যাহাতে তাহার মধ্যস্থ বহু বাধা ক্ষয়িত হইবে, ঝরিয়া পড়িবে বা অন্যভাবে দূর হইয়া যাইবে; তাহা হইলেই সত্তার গভীর প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই গভীরতা হইতেই বহিশ্চর সত্তার মধ্যে এবং তাহার অন্তরালে উভয়ত্রই এক নূতন চেতনা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে যাহা সেই গভীরতার সহিত বহিঃক্ষেত্রের সেতুবন্ধন করিবে। আমাদের মধ্যে এমন এক চেতনার প্রকাশ বা বৃদ্ধি ঘটাইতে হইবে যাহা সত্তার গভীরতা এবং উচ্চতার দিকে নিজেকে ক্রমশঃ অধিকতররূপে খুলিয়া ধরিতে,বিশ্বাত্মা বা ও বিশ্বশক্তির এবং যাহা বিশ্বাতীত হইতে আসে তাহার কাছে নিজেকে ক্রমশঃ বেশী করিয়া অনাবৃত করিতে সমর্থ হইবে, এক উচ্চতর শান্তির দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে, বৃহত্তর জ্যোতি শক্তি ও আনন্দের প্লাবনে পরিপ্লুত হইতে পারিবে; সে চেতনা ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম এবং বহিশ্চর মনের ক্ষীণ আলোক এবং অনুভব, প্রাকৃত প্রাণ-চেতনার সীমিত শক্তি এবং আকৃতি, শরীরের সঙ্কীর্ণ এবং অস্পষ্ট সাড়া দেওয়ার শক্তি পার হইয়া যাইবে।

আমাদের বহিঃপ্রকৃতিতে এইভাবে শুদ্ধি ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার সাধনা পূর্ণ বা পর্য্যাপ্ত হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেও আহ্বান বা আকূতির প্রবল শক্তি, দুর্দ্দম সঙ্কল্প বা প্রচণ্ড প্রয়াস বা কার্য্যকরী সাধনার প্রবল অভিঘাতে আমাদের অন্তঃপুরুষ এবং বহিশ্চর চেতনার মধ্যে যে প্রাচীর আছে তাহা ভঙ্গ করিয়া দেওয়া যায় কিন্তু যথাকালের পূর্ব্বে ইহা ঘটিলে সমূহ বিপদ দেখা দিতে পারে। এইরূপ অসময়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়া সাধক অপরিচিত এবং অতিপ্রাকৃত অনুভব সকলের এমন এক মহাবিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়িতে পারে যাহার রহস্য-উদ্‌ঘাটনের চাবি-কাঠি তাহার নিকটে নাই। অথবা অধিচেতনা বা বিশ্বচেতনা হইতে উত্থিত, অবচেতন, মনোময় প্রাণময় বা সূক্ষ্মভূতময় নানা শক্তির তাড়না তাহাকে অযথা-ভাবে শাসিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করিতে পারে, অন্ধকারময় গুহার মধ্যে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিতে ইন্দ্রজাল প্রলোভন বা ছলনার বিজন প্রদেশে তাহাকে ঘুরাইতে অথবা তাহাকে এমন এক অন্ধকারময় যুদ্ধক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত

করিতে পারে যে স্থান বিশ্বাসঘাতক এবং বিপথে পরিচালনাকারী গোপন শত্রুদ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে অথবা যথায় প্রকাশ্য বা দুর্দ্ধর্ষ বিদ্রোহ বর্ত্তমান আছে ; অন্তরের বোধে দৃষ্টিতে বা কর্ম্মে এমন সকল সত্তা, বাণী এবং প্রভাব আসিয়া পৌঁছিতে পারে যাহারা নিজদিগকে ভগবৎসত্তা, বা তাহার দূত, আলোকের দেবতা ও শক্তি অথবা সিদ্ধির পথে গুরু বা দিশারী বলিয়া দাবী করে কিন্তু বস্তুতঃ হয়ত তাহাদের প্রকৃতি এ সমস্তের ঠিক বিপরীত ; সাধকের প্রকৃতিতে থাকে যদি প্রচণ্ড অহমিকা, অত্যধিক বাসনা, অতিরিক্ত উচ্চাশা বা দর্প অথবা অন্য কোন প্রবল অশুদ্ধি, অথবা যদি তাহার মনের মধ্যে থাকে অন্ধকার, কিম্বা ইচ্ছা-শক্তি যদি হয় শিথিল ও দ্বিধাগ্রস্ত অথবা প্রাণশক্তি যদি সাম্যে প্রতিষ্ঠিত না থাকে, যদি তাহা দুর্ব্বল ও অস্থির হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত ত্রুটি ও দুর্ব্বলতার মধ্য দিয়া বিরোধী শক্তির পক্ষে তাহার চেতনাকে অধিকার কবিবার সম্ভাবনা থাকে ; তখন সে ব্যর্থকাম হইতে, অন্তরজীবনের খাঁটি পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কুপথে চলিতে, মধ্যবর্ত্তীকালে উপস্থিত অনুভূতির বিশৃঙ্খলতার রাজ্যে ঘুরিয়া মরিতে বাধ্য হইতে পারে ; তখন সে তাহার খাঁটি সিদ্ধির পথ খুঁজিয়া পায় না। প্রাচীন অধ্যাত্মবিদ্যাবিদ্‌গণ এ সব সঙ্কটের কথা জানিতেন ; তাহাদের প্রতিরোধ কল্পে তাঁহাদের ব্যবস্থা ছিল যে সাধনপথযাত্রীকে দীক্ষা নিতে এবং সংযম শিক্ষার ও শুদ্ধির জন্য সাধনা করিতে হইবে এবং নানা অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা শিষ্য অধিকারী হইয়াছে কি না তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে, আর ব্যবস্থা ছিল, যিনি পথের দিশারী বা নেতা, যিনি সত্যকে নিজে জানিয়াছেন, যিনি আলোক ও শক্তির অধিকারী এবং শিষ্যের হৃদয়ে তাহা সঞ্চার করিতে বা তাহাকে উচ্চতর তত্ত্ব অনুভব করাইতে সক্ষম, যিনি এমন শক্তিশালী, যে শিষ্যকে হাত ধরিয়া দুস্তর পথের যত বাধা যত সঙ্কট পার করিয়া দিতে এবং সেই সঙ্গে পথ দেখাইয়া দিতে উপদেশ দান করিতে সমর্থ, তেমন সিদ্ধগুরুর নির্দ্দেশের কাছে শিষ্য পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ করিবে। কিন্তু ইহা হইলেই যে সকল বিপদ কাটিয়া গেল তাহা নহে ; কেবল তখনই সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে যখন সাধক পরিপূর্ণ সরলতা, ঐকান্তিকতা এবং আত্মশুদ্ধির অটুট সঙ্কল্প রাখিতে পারিবে, সত্যের অনুশাসন সম্পূর্ণ মানিয়া চলিতে ও পরমতত্ত্বের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে অথবা আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী অহংকে বর্জন অথবা তাহাকে দিব্যশক্তির সম্পূণ বশে আনয়ন করিতে প্রস্তুত ও সমর্থ হইবে। এই সমস্ত দৈবী সম্পদ সূচিত

করে যে সিদ্ধিলাভের, চেতনার রূপান্তর সাধনের খাঁটি সংকল্প জাগিয়াছে, এবং সাধকের আধার প্রস্তুত হইয়াছে, পরিণতিপথে প্রয়োজনীয় অবস্থা আসিয়া গিয়াছে ; মানুষের প্রকৃতিতে যে সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি আছে এ অবস্থায় তাহারা মনোময় হইতে চিন্ময় স্থিতিতে পৌঁছিবার পথে আর স্থায়ী বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না ; অবশ্য ইহাতেও সাধনার পথ একান্ত সহজ হইবে না কিন্তু বুঝিতে হইবে যে সাধনার পথ খুলিয়া গিয়াছে এবং সে পথে চলা সম্ভব হইয়াছে।

অন্তরাত্মার মধ্যে সহজে প্রবেশের একটি কার্য্যকরী উপায় প্রায়ই অবলম্বিত হয়, তাহা হইল চেতন সত্তা বা পুরুষকে রূপায়িত প্রকৃতি হইতে পৃথক করিয়া দেখা। সাধক যদি মন এবং তাহার ক্রিয়াসকল হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে পারেন তাহা হইলে ইচ্ছামাত্র মন নিশ্চল ও নীরব হইয়া পড়ে, অথবা বাহিরের ক্ষেত্রে তাহার গতি বা ক্রিয়া চলিতে থাকিলেও সাধক নিরাসক্ত এবং উদাসীনভাবে সাক্ষীরূপে তাহার দ্রষ্টামাত্র হইয়া দাঁড়ান ; অবশেষে সাধক নিজেকে মনের অন্তরাত্মা বা খাঁটি এবং শুদ্ধ মনোময় সত্তা বা পুরুষরূপে অনুভব করিতে পারেন ; ঠিক তেমনিভাবে প্রাণের ক্রিয়াবলী হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া সাধকের পক্ষে নিজেকে প্রাণেব অন্তরাত্মা বা খাঁটি ও শুদ্ধ প্রাণময় সত্তা বা পুরুষরূপে উপলব্ধি করাও সম্ভব হয়, এমন কি দেহেরও এক আত্মা আছে এবং দেহ তাহার দাবী ও ক্রিয়াবলী হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া দৈহিক চেতনার এক নৈঃশব্দ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার শক্তির ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই খাঁটি ও শুদ্ধ অন্নময় সত্তা বা পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইতে পারে। ঠিক তেমন ভাবে মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় প্রকৃতির এই সমস্ত ক্রিয়া হইতে পর পর বা যুগপৎ সরিয়া দাঁড়াইয়া সাধক নিজের অন্তর সত্তাকে নৈর্ব্যক্তিক নিঃশব্দ আত্মা বা সাক্ষীপুরুষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহা এক চিন্ময় অনুভূতি ও মুক্তিতে লইয়া যায় কিন্তু তাহার ফলে অপরিহার্য্যরূপে রূপান্তর যে ঘটিবে এমন কোন কথা নাই ; কেননা এ অবস্থায় পুরুষ স্বতন্ত্র এবং স্বরূপে অবস্থিত হইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন এবং অনুমোদনের দ্বারা প্রকৃতির ক্রিয়াকে আর নবায়িত, উজ্জীবিত বা দীর্ঘায়িত না করিয়া তাহার অসমর্থিত সঞ্চিত সংবেগকে, যন্ত্রের মত গতানুগতিকভাবে চলিয়া ক্ষয় হইতে দিতে এবং এই বর্জনের সাহায্যে সমস্ত প্রকৃতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে পারেন। কিন্তু পুরুষকে শুধু দ্রষ্টা হইলেই চলিবে না তাহাকে জ্ঞাতা এবং সবকিছুর উৎস এবং তাহার সকল ভাবনা এবং কর্ম্মের প্রভু হইতে হইবে, কিন্তু যতক্ষণ জীব

মনোময়ভূমিতে থাকে অথবা যতক্ষণ তাহাকে প্রাকৃত মন, প্রাণ এবং দেহকে সাধনযন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে হয় ততক্ষণ ইহা শুধু আংশিকভাবে সাধিত হইতে পারে। বস্তুতঃ অবশ্য কতকটা প্রভুত্ব লাভ হয় বটে কিন্তু সে-প্রভুত্বের অর্থ রূপান্তর নয়; তাহাতে যেটুকু পরিবর্ত্তন হয় তাহা অপ্রচুর, তাহাতে পূর্ণ-রূপান্তর সিদ্ধি হয় না; সেজন্য মনোময় সত্তা, প্রাণময় সত্তা এবং অন্নময় সত্তাকে অতিক্রম করিয়া আমাদের মধ্যে অন্তরতম এবং গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত চৈত্যসত্তার কাছে ফিরিয়া যাইতেই হইবে; অথবা অতিচেতনার উচ্চতম ভূমির দিকে আত্মসত্তাকে উন্মীলিত হইতে হইবে। অন্তর্জ্যোতিময় অন্তর-পুরুষের এই মণিকোঠায় প্রবিষ্ট হইতে গেলে যতই দীর্ঘ, ক্লান্তিজনক এবং দুঃসাধ্য হউক না কেন সাধনার ধারাকে অবলম্বন করিয়া প্রাণময় যে সব উপাদান আমাদের অন্তরের সেই চৈত্যকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে তাহা পার হইয়া যাইতে হইবে। দেহমনপ্রাণের সকল দাবী আহ্বান ও আবেগে আসক্তি-শূন্যতা, হৃদয়কেন্দ্রে চেতনার কেন্দ্রীকরণ, তপস্যা, আত্মশুদ্ধি, প্রাণ ও মনের সর্ব্বপ্রকার প্রাক্তন সংস্কারের উচ্ছেদ, বাসনার দাস অহংকে বর্জন, মিথ্যা প্রয়োজন এবং কু-অভ্যাস দূরীকরণ—এ সমস্তই এই কঠিন প্রগতি পথে প্রয়োজনীয় সহায়; কিন্তু বীর্য্যবত্তম বা কেন্দ্রগত সাধনপন্থা হইল এ সমস্ত সাধনাঙ্গ এবং অন্যসকল সাধন পদ্ধতিকে ভগবৎসত্তা বা ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের, আমাদের প্রকৃতির সকল অংশের পূর্ণসমর্পণের উপর প্রতিষ্ঠিত করা। তাহা ছাড়া গুরুর জ্ঞানগর্ভ এবং বোধিপ্রণোদিত পরিচালনার একান্ত অনুবর্ত্তন দু' একজন অধ্যাত্মসম্পদে বিভূষিত সাধক ছাড়া সকলের পক্ষে স্বভাবতই অপরিহার্য্য।

ক্রমে যখন বাহ্য প্রকৃতির স্থূল আবরণ বিদীর্ণ হয়, অন্তরকে আড়াল করিয়া যে দেওয়াল আছে তাহা যখন ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে তখন অন্তরের আলোক আসিয়া সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে, হৃদয়ে অন্তরের বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠে, আমাদের প্রকৃতি এবং চেতনার সমস্ত উপাদানের খাদ কাটিয়া গিয়া অতি সূক্ষ্ম অতি বিশুদ্ধ হইয়া উঠে, এবং বিশুদ্ধীকৃত এই সমস্ত সূক্ষ্ম ও পরিমার্জিত উপাদানের মধ্যে গভীরতর চৈত্যঅনুভূতিসকলের—যাহারা শুধু অন্তর মন এবং অন্তর প্রাণের প্রকৃতি বিশিষ্ট নয়—প্রকাশ সম্ভাবিত হইয়া উঠে; অন্তরাত্মা নিজের অবগুণ্ঠন মোচন করিতে থাকেন, চৈত্যব্যক্তিসত্তার পূর্ণ পরিণতি হয়। অন্তরাত্মা বা চৈত্যসত্তা তখন সত্তার কেন্দ্রগত পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া

দেহ মন প্রাণ এবং চেতনার অন্যসকল শক্তি ও ক্রিয়ার ভর্ত্তা ও আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়ান ; আমাদের প্রকৃতিকে শাসন ও চালনার যে বৃহত্তর ও মহত্তর কর্ম্মের ভার তাঁহার উপর আছে তাহা গ্রহণ করেন। যখন ভিতর হইতে এই শাসন এবং পরিচালনা আরম্ভ হয় তখন প্রত্যেক ক্রিয়া প্রত্যেক গতির উপর সত্যের আলোক পড়ে, যাহা মিথ্যা অন্ধকারাচ্ছন্ন যাহা দিব্যসিদ্ধিলাভের বিরোধী তাহা দূরে বিতাড়িত হয় ; সত্তার প্রত্যেক প্রদেশ, তাহার প্রতিরন্ধ্র প্রতি গলি-ঘুঁজি প্রতি অণু প্রত্যেক দিক প্রত্যেক গতি প্রত্যেক রূপায়ণ, প্রতি ভাবনা সঙ্কল্প ও আবেগ, ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রতিক্রিয়া, প্রবৃত্তি সংস্কার ও প্রবণতা, মেজাজ, বাসনা, চেতন বা অবচেতনভাবে ক্রিয়াশীল সকল প্রকার স্থূল অভ্যাস, এমন কি আধারে যাহা কিছু গোপন ছদ্মবেশধারী নির্ব্বাক বা রহস্যঘন হইয়া আছে সে সমস্তের উপর এই উদার এবং অভ্রান্ত চৈত্য আলোক পড়ে, তাহাদের মধ্যস্থিত সকল বিশৃঙ্খলা দূর এবং সকল গ্রন্থি মোচন করে, তাহাদের অজ্ঞান ও অন্ধকাব, তাহাদের প্রতারণা এবং আত্মবঞ্চনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করে ; এইরূপে সবকিছু নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হয় প্রতিবৃত্তি যথাস্থানে স্থাপিত এবং যথাকার্য্যে ব্যবস্থিত হয় ; সব কিছুতে চৈত্যসত্তার সুর বাজিয়া উঠে, সমগ্র প্রকৃতি সুষমা ও সামঞ্জস্যে ভরিয়া যায়, সমস্তের মধ্যে এক চিন্ময় শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। আধারে হতাবশিষ্ট তামসিকতা এবং প্রতি-কূলতা তখনও যাহা বর্ত্তমান থাকে তাহার পরিমাণ অনুসারে এ সাধনার ধারা কখনও দ্রুত কখনও বা বিলম্বিত হইয়া চলে কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত চরম সিদ্ধিতে না পৌঁছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অবিচলিতভাবে চলিতেই থাকে। এ সাধনার শেষ ফল এই হয় যে আমাদের সমগ্র চেতনসত্তা সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক অনুভূতি গ্রহণে সমর্থ ও উন্মুখ হয়, ভাবনা বেদনাবোধ বা ক্রিয়ার মধ্যে যে চিন্ময় সত্য আছে তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়, তাহাদের ক্রিয়াতে পূর্ণরূপে সাড়া দেয় ; তখন আমাদের সত্তা তামসিকতার গভীর অন্ধকার ও অসাড়তা, রাজ-সিকতার উন্মাদনা ও দুর্দ্দম বাসনা, চিরচঞ্চল অনিয়ত গতিশীলতা ও পঙ্কিল অশুচিতা এবং সাত্ত্বিকতার সকল সীমা ও সঙ্কোচ, আলোকিত আড়ষ্ট কাঠিন্য ও মনগড়া সর্ব্বপ্রকার সাম্য হইতে মুক্তি পায়, এককথায় অবিদ্যাময় প্রকৃতির এই সকল শাসন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে।

এই হইল সিদ্ধির প্রথম পর্ব্ব, দ্বিতীয় পর্ব্বে সকলপ্রকার আধ্যাত্মিক অনুভবের একটা স্বচ্ছন্দ প্রবাহ বহিয়া যায়, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, ঈশ্বর

ও তাঁহার দিব্যশক্তি এবং বিশ্বচেতনার উপলব্ধি হয়; বিশ্বপ্রকৃতির গোপন বা অতীন্দ্রিয় গতি ও প্রবৃত্তি সকলের এবং বিশ্বশক্তির সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শ লাভ হয়; অন্যসকল সত্তা এবং প্রকৃতির সঙ্গে এক চৈত্যিক সহানুভূতি ও একত্ববোধ জাগে, সকলের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়, পরস্পর বিনিময় চলে, মন জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত হয়, হৃদয় প্রেম ও ভক্তি, চিন্ময় উল্লাস ও আনন্দের দিব্য বিভায় ভরপুর হইয়া উঠে, দেহ ও ইন্দ্রিয় দিব্য অনুভবে আলোকিত হয়; সক্রিয় প্রবৃত্তি ও কর্ম্মের ধারা, পরিশুদ্ধ হৃদয়, মন ও আত্মার সত্যে ও মহত্ত্বে, দিব্য আলোক ও দিব্য পরিচালনার নৈশ্চিত্যে, সঙ্কল্প ও আচরণের মধ্য দিয়া ক্রিয়াশীল দিব্যশক্তির আনন্দে ও বীর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমাদের অন্তরতর এবং অন্তরতম সত্তার প্রকৃতির বাহ্য-ক্ষেত্রে উন্মীলনের ফলে এই সমস্ত অনুভূতি আসে; কেননা তখন আত্মার স্বরূপ চেতনার অভ্রান্ত শক্তির, তাহার দিব্যদৃষ্টির, এবং যাহা যে কোন মনোময় জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ এমন দিব্য সংস্পর্শ সকলের অবাধ লীলা চলে; তখন চৈত্যিক-চেতনার স্বাভাবিক এবং শুদ্ধ ক্রিয়া আরম্ভ হয়, জগৎ এবং তাহার মধ্যস্থ সত্তা-সকলের এক অপরোক্ষ বোধ জাগে, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হয়, আত্মা এবং পরমপুরুষের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ হয়, সাক্ষাৎ জ্ঞানে এবং সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে যিনি সকল সত্যের পরম সত্য তিনিই ফুটিয়া উঠেন, চিন্ময় ভাবোল্লাস এবং সংবেদনের সাক্ষাৎ ও মর্ম্মস্পর্শী প্রকাশ ঘটে, ঋত সঙ্কল্প এবং সম্যক্ কর্ম্মের ধারা বোধিতে সাক্ষাৎভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন বহিশ্চর চেতনার দ্বিধাদোলিত জ্ঞান লইয়া নয়, পরন্তু অন্তর হইতে আত্মা ও সর্ব্ববস্তুর অন্তরতর সত্য এবং প্রকৃতির সকল প্রকার গোপন সত্য ও তত্ত্ব হইতে আত্মসত্তার এক নূতন রূপ সৃষ্টি ও তাহা পরিচালনা করিবার শক্তিলাভ করা যায়।

অন্তরের মনোময় ও প্রাণময় সত্তার উন্মেষ ঘটিলে, অন্তরস্থ বৃহত্তর ও সূক্ষ্ম-তর মন হৃদয় এবং প্রাণের জাগরণে অন্তরাত্মার কোন প্রকার পূর্ণ স্ফুরণ না হইয়াও এই সমস্ত অনুভূতির কতকটা লাভ হইতে পারে; কেননা এ সমস্তেরই চেতনার সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সামর্থ্য আছে; কিন্তু তাহাতে যে অনুভূতি আসে, তাহা বিশুদ্ধ না হইয়া মিশ্র জাতীয় হইতে পারে, কেননা তখন শুধু অধিচেতন জ্ঞানই যে প্রকাশ পাইবে এমন কথা নাই তৎসঙ্গে অধি-চেতন অজ্ঞানেরও প্রকাশ হইতে পারে। তখন সহজেই এরূপ হইতে পারে যে মনের সংস্কারে সীমা ও সঙ্কোচ, হৃদয়ের কোন পক্ষপাত দুষ্ট সংকীর্ণ আবেগ

অথবা স্বভাবের কোন বিশেষ ঝোঁকের জন্য সত্তার বিস্তার অপূর্ণ রহিয়া গেল, স্বচ্ছন্দ ও পূর্ণভাবে অন্তরাত্মার উন্মেষ ঘটিল না বা এক অপূর্ণ আত্মবিসৃষ্টি এবং ক্রিয়া শুধু দেখা দিল। চৈত্যসত্তার উন্মেষ যখন ঘটে নাই অথবা অপূর্ণ উন্মেষ হইয়াছে যখন বৃহত্তর জ্ঞান এবং শক্তির অলৌকিক বা অসাধারণ কোন কোন প্রকার অনুভূতি লাভ হইলে অহমিকার অতি স্ফীতি দেখা দিতে পারে, এমন কি আধারে যাহা দিব্য এবং চিন্ময় তাহা না ফুটিয়া অসুর ভাব বা শক্তির অতি-প্রাবল্য উপস্থিত হইতে পারে অথবা বিশ্বশক্তির এমন সব নিম্নতর বিভূতি বা শক্তির প্রকাশ হইতে পারে যাহারা তেমন সর্ব্বনাশা না হইলেও কিছু কম শক্তি-শালী নয়। কিন্তু আধারে চৈত্যসত্তার শাসন ও পরিচালনা স্থাপিত হইলে সকল অনুভূতির মধ্য দিয়া স্বভাবতই আলোক সামঞ্জস্য ও সুষমা, ঋতময় ব্যব-হার ও ক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রবৃত্তি বা ঝোঁক প্রকাশ পাইবে যাহা স্বরূপতঃ চৈত্যসত্তার পক্ষে স্বাভাবিক। এমনি ভাবের চৈত্যিক অথবা বিশেষ-ভাবে বলিতে গেলে চৈত্যিকচিন্ময় রূপান্তরের ফলে আমাদের মনোময় মানব প্রকৃতিতে বিশাল পরিবর্ত্তন দেখা দিবে।

কিন্তু মূলতঃ এইসমস্ত অনুভূতি এই সমস্ত রূপান্তরের প্রকৃতি চৈত্যিক ও চিন্ময় হইলেও জীবনের মধ্যে প্রকাশের অংশে তখনও তাহাদের ক্ষেত্র হইবে মনোময়, প্রাণময় এবং অন্নময় ভূমি; তাহার সক্রিয় চিন্ময় ফল* এই হইবে যে মন, প্রাণ এবং দেহের মধ্যে অন্তরাত্মা ফুটিয়া উঠিবে; কিন্তু ক্রিয়ায় এবং আকৃতি প্রকৃতিতে তাহা নিম্নতর সেই সমস্ত সাধন যন্ত্রের স্বাভাবিক সীমাদ্বারা সঙ্কুচিত থাকিয়াই যাইবে—সে সমস্ত যন্ত্র যতই বিস্তৃত উন্নীত এবং সূক্ষ্ম হউক-না কেন। ইহাতে যাহার অনতিস্ফুট প্রতিবিম্বমাত্র প্রকাশ পাইবে তাহার পূর্ণ সত্য, গভীরতা, প্রসারতা, একত্ব, সত্য এবং শক্তি বা আনন্দের বহু বৈচিত্র্য আমাদের মন বা আমাদের প্রাকৃত সত্তার উপরে অবস্থিত সুতরাং তাহা আমা-দের মনের সূত্র বা বিধানের মধ্যে আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতির ভিত্তির বা সেই ভিত্তির উপর গড়িয়া তোলা যে কোন পূর্ণতার উপরে স্থিত। এইজন্য চৈত্যিক বা চৈত্যিক-আধ্যাত্মিক রূপান্তরের পরে চাই এক উচ্চতম শুদ্ধ আধ্যাত্মিক রূপান্তর; অন্তরস্থ আত্মা বা দিব্য পুরুষের দিকে চৈত্যিক চেতনার যে আন্তর

* চৈত্যিক এবং আধ্যাত্মিক উন্মীলন এবং তজ্জনিত অনুভবের ফলে চেতনাকে ইহ-বিমুখ করিয়া দিতে বা নির্ব্বাণের দিকে লইয়া যাইতে পারে; কিন্তু এখানে চেতনার রূপান্তর সাধনের সোপান হিসাবেই তাহাদিগের বিষয় আলোচিত হইতেছে

গতি আছে, উর্দ্ধে স্থিত পরম অধ্যাত্ম স্থিতি বা সত্তার উচচতর ভূমির দিকে নিজেকে উন্মীলিত করিয়া তাহার পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে। ইহা সম্ভব করিতে হইলে যাহা আমাদের উপরে অবস্থিত তাহার দিকে নিজেকে উন্মীলিত করিতে হইবে; আমাদের চেতনাকে উন্নীত করিয়া অধিমানস এবং অতিমানস প্রকৃতির স্বক্ষেত্রে পৌঁছিতে হইবে, কেননা সেখানেই আছে পরমাত্মা এবং চিৎস্বরূপের শাশ্বত আবরণশূন্য নির্ম্মুক্ত প্রকাশ, আমাদের মনোময়, প্রাণময় বা অন্নময় প্রকৃতিতে সমস্তই যেমন সীমিত এবং বিবিক্ত হইয়া পড়ে, সেখানে সেই সত্যবস্তুর আত্মজ্যোতিতে প্রস্ফুরিত সাধন যন্ত্রে তেমন কোন কিছুর সম্ভাবনা নাই। চৈত্যিক রূপান্তর ইহাও সম্ভব করিয়া তোলে, কেননা প্রাকৃত ব্যষ্টি চেতনার বহু আবরণ উন্মোচন করিয়া ইহা যেমন বিশ্বচেতনার দিকে আমাদিগকে খুলিয়া ধরে, তেমনি সঙ্কোচকারী বিভাজনশীল ভেদদর্শী মনের উজ্জ্বল এবং অতি কঠিন আবরণের উপরে, আমাদের বর্ত্তমান প্রাকৃত সত্তার নিকট গোপনভাবে যাহা অতিচেতন রূপে অবস্থিত আছে তাহার দিকেও আমাদের চেতনাকে উন্মীলিত করে। চৈত্য-আধ্যাত্মিক রূপান্তরের প্রবেগে এবং নিজের উৎসমূলের দিকে নবোদ্ভাসিত অধ্যাত্ম-চেতনার স্বাভাবিক আকূতি ও আবেগের ফলে মনের এই আবরণ ক্ষীয়মাণ হইতে থাকে অবশেষে আবরণ উন্মোচিত হয়, বা তাহা বিদীর্ণ, বিকীর্ণ এবং বিলুপ্ত হইয়া যায়। তবে এমন হইতে পারে চৈত্যসত্তার শুধু আংশিক স্ফুরণে অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত মনের সাধরণভূমির মধ্যে দিব্য সত্যবস্তুর অনুভূতিতেই সাধক তৃপ্ত রহিল, সেক্ষেত্রে এই আবরণ বিদারণ এবং তাহার ফল সে সাধকের নিকট আদৌ দেখা না দিতে পারে; কিন্তু উর্দ্ধে স্থিত এই অতিপ্রাকৃত ভূমির অস্তিত্বের জ্ঞান এবং তাহাতে পৌঁছিবার একটা অভীপ্সা যদি সাধকের মধ্যে জাগিয়া উঠে তাহা হইলে আবরণ বিদীর্ণ হইতে বা ফাটিয়া যাইতে পারে। চৈত্যিক-আধ্যাত্মিক রূপান্তর পূর্ণতা লাভ করিবার বহুপূর্ব্বে এমন কি যখন সে রূপান্তর বহুদূর অগ্রসর হয় নাই অথবা ঠিক ভালভাবে আরম্ভই হয় নাই তখনও ইহা ঘটিতে পারে; কেননা চৈত্যব্যক্তিপুরুষ যদি সে অতিচেতন বস্তুর আভাস পাইয়া থাকে তবে ঐকান্তিকভাবে তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। অভীপ্সাব আবেগ বা অন্তরপ্রকৃতির প্রস্তুতির ফলে যথাকালের পূর্ব্বেও উর্দ্ধ হইতে জ্যোতির অবতরণ বা সত্তার উপরের আবরণ বিদীণ হইতে পারে; এমন কি মন তাহাকে আবাহন করিবার বা মনের সচেতন অংশে কোন আকূতি বা অভীপ্সা প্রকাশ

হইবার পূর্ব্বেও হয়তো কোন গোপন অধিচেতন প্রয়োজনে অথবা উর্দ্ধ্বলোকের কোন ক্রিয়া বা চাপের ফলে অপ্রত্যাশিত ভাবে ইহা ঘটিতে পারে; তখন মনে হয় যে ভগবান বা চিৎপুরুষের কোন সংস্পর্শের জন্যই ইহা ঘটিল; যেরূপ ভাবে আসুক না কেন ইহার ফল অতিবিপুল হইতে পারে। কিন্তু নিম্নতর ভূমির চাপে অসময়ে এ অবস্থালাভের চেষ্টা করিলে নানা বিঘ্নবিপদ দেখা দিতে পারে; কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক পরিণামের উর্দ্ধ্বপর্ব্বে প্রথম প্রবেশের পূর্ব্বে যদি চৈত্যপুরুষ পূণরূপে জাগরিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে উত্তর ভূমির মধ্যে এই অনুপ্রবেশে কোন বিঘ্ন বা কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এইভাবে সাধনধারা নির্ব্বাচন বা নিয়ন্ত্রণের হাত সর্ব্বদা আমাদের ইচ্ছা-শক্তির নাই। কেননা আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিণামের ক্রিয়াধারা অতি-বিচিত্র ও বহুমুখী; এবং সাধক যে ধারা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্য অনুসারে কোন পর্ব্বসন্ধিতে পরিণাম-সাধিকা চিৎশক্তিতে সত্তার উচচতর প্রকাশ ও রূপায়ণের জন্য যে এষণার প্রবেগ ও ক্রিয়াধারা আছে তাহার বশে আমাদের প্রগতির মুখ ফিরিয়া যাইবে।

মনের এই আচছাদনের মধ্যে রন্ধ্র বা ফাঁক দেখা দিবার পরে সাধকের দৃষ্টিতে উপরিস্থিত কোন কিছুর আভাস ভাসিয়া উঠে, অথবা তিনি উর্দ্ধ্বে তাহার দিকে উঠিয়া যান অথবা তথা হইতে তাঁহার সত্তাতে উর্দ্ধ্বের শক্তি নামিয়া আসে। সে দৃষ্টিতে সাধক তাঁহার উপরে প্রসারিত এক অনন্তের সাক্ষাৎ পান; এক শাশ্বত এবং অনন্ত সত্তা, এক অনন্তচেতনা, এক অনন্ত আনন্দ—অসীম এক পরমাত্মা, অসীম এক আলোক, অসীম এক শক্তি, অসীম এক পরম উল্লাসের মহিমা তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। এমন হইতে পারে যে তখনও বহুকাল পর্য্যন্ত সাধকের কাছে মাঝে মাঝে বা ঘন ঘন বা নিরবচেছদে এই দর্শনের আবৃত্তি চলিতে এবং অন্তরে এক গভীর আগ্রহ ও আস্পৃহা দেখা দিতে থাকে, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী আর কিছু ঘটে না, যেহেতু তখনও মন হৃদয় বা সত্তার অন্যকোন অংশের কিছুটা এই অনুভবের দিকে উন্মীলিত হইয়াছে কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে নিম্নপ্রকৃতি তখনও অন্ধকারে এমন আচছন্ন এমন গুরুতরভাবে ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে যে আর কিছু প্রকাশ পাইতে পারিতেছে না। কিন্তু এমনও হইতে পরে যে নিম্ন হইতে এই উদার জ্ঞানময় দৃষ্টি না ফুটিয়া অথবা তাহা ফুটিবার পরে মন উর্দ্ধ্বভূমি সকলের মধ্যে উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু মন হয়ত তখনও এই সমস্ত ভূমির প্রকৃতি না জানিতে বা

স্পষ্টভাবে না বুঝিতে পারে কিন্তু তাহার উর্দ্ধগমনেব কিছু ফল তাহার অনুভূতিতে লাভ করে, অনেকসময় হয়তো অনন্তের মধ্যে উত্তরণ এবং তথা হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার একটা বোধ থাকে কিন্তু নিম্নভূমিতে ফিরিবার পর মনে সে অবস্থার কোন ছাপ বা প্রতিলিপি থাকে না, অথবা এখানকার ভাষায় সেখানকার ভাবের অনুবাদ করিতে মন সক্ষম হয় না। তাহার কারণ যখন এই ভূমি মনের নিকট অতিচেতন রহিয়াছে, তখন সে ভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেও তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার ও তাহার বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্টভাবে অনুভব করিবার শক্তি মন সচেতনভাবে প্রথমে বজায় রাখিতে পারে না। কিন্তু এই শক্তি জাগিতে এবং ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে, যখন ধীরে ধীরে মন যাহা তাহার কাছে অতিচেতন ছিল তাহার সম্বন্ধে সচেতন হইতে থাকে তখন এই উচ্চতর ভূমি সকলের জ্ঞান ও অনুভব লাভ করিতে আরম্ভ করে। এই দৃষ্টির প্রথম উন্মেষে সাধক যাহার আভাষ পাইয়াছিল এবার অনুভূতিতে তাহা ফুটিতে থাকে; মন তখন উত্তীর্ণ হয় শুদ্ধ আত্মার উচ্চতর ভূমিতে যেখানে নৈঃশব্দ্য, শান্তি এবং অসীমতা চিরবিরাজিত; অথবা সে আরূঢ় হয় চিরভাস্বর জ্যোতির লোকে বা পরমানন্দেব নিত্যনিকেতনে; অথবা এমন লোকে সে প্রবিষ্ট হয় যেখানে অনন্ত শক্তির অবারিত খেলা তাহার বোধে বা অনুভবে ধরা পড়ে; অথবা সে ভগবানের দিব্য সানিধ্য এবং অনুভূতি লাভ করে তাহার দিব্যপ্রেম এবং সৌন্দর্য্যের অথবা দিব্য জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানের বিশালতর এবং মহত্তর পরিবেশের সংস্পর্শে আসে। তথা হইতে ফিরিবার পরেও আধ্যাত্মিক সে অনুভবের সংস্কার তাহার থাকে; কিন্তু তাহার মনোময় ছাপ প্রায়ই অস্পষ্ট হইয়া পড়ে অথবা স্মৃতিতে তাহার আংশিক এবং অস্ফুট বোধমাত্র থাকিয়া যায়; যে নিম্নতর চেতনা হইতে আরোহণ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহার বিবরণ রক্ষিত হয় নাই এমন অনুভবের দু'একটা খণ্ড অথবা যাহা মনে আছে তাহার দু'একটি ভাব শুধু সে চেতনার সঙ্গে যুক্ত থাকে কিন্তু তাহা আর কোন সক্রিয় অনুভূতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ক্রমে স্বেচ্ছায় উর্দ্ধারোহণের শক্তি সাধক লাভ করিতে থাকে এবং চিৎসত্তার এই সমস্ত উচ্চতর দেশে সাময়িকভাব বাস করিয়া যে ফল সে লাভ করে বা যে সম্পদ সে অর্জন করে তাহাব কিয়দংশ বাহ্যচেতনায় যখন সে ফিবিয়া আসে তখনও রক্ষা করিতে পারে। অনেক সাধকের পক্ষে সমাধিতেই এ আরোহণ ঘটে কিন্তু জাগ্রত চেতনার একাগ্র অভিনিবেশ দ্বারাও ইহা সম্ভব হইতে পারে, অথবা চেতনা

যখন যথাযথভাবে চৈত্যভাবময় হইয়াছে তখন ধ্যান ছাড়াও যে কোন মুহূর্ত্তে উপরের আকর্ষণ বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য এ অবস্থা লাভ হইতে পারে। কিন্তু অতিচেতনার এই দুই ধরণের সংস্পর্শ যদিও আমাদিগকে জ্ঞানের প্রবল আলোক, আনন্দ এবং মুক্তিদান করিতে পারে তবু শুধু ইহারাই পূর্ণরূপান্তর সাধনের পক্ষে প্রচুর এবং কার্য্যকরী একথা বলা যায় না ; পূর্ণ আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধন করিতে হইলে আরও বেশী কিছু প্রয়োজন, তাহার জন্য নিম্নতর চেতনা হইতে উচ্চতর চেতনাতে উন্নীত হইয়া তথায় স্থায়ীভাবে বাস করা চাই, আর চাই সেই উচ্চতর ক্ষেত্র হইতে নিম্নতর প্রকৃতিতে কার্য্যকরী শক্তি ও চেতনার স্থায়ী অবতরণ।

এই অবতরণ প্রগতির তৃতীয় ধারা, স্থায়ীভাবে ঊর্দ্ধ্বভূমিতে বাস করিবার জন্য ইহা অপরিহার্য্য ; ইহাতে ঊর্দ্ধ্ব হইতে ক্রমবর্দ্ধমান একটা ধারা নামিয়া আসে ; চিৎসত্তা বা তাহার চেতনার যে সকল শক্তি বা বিভূতির অবতরণ ঘটে তাহা ধারণ এবং রক্ষণ চলিতেছে এই অনুভূতি দেখা দেয়। ঊর্দ্ধ্বমুখী দৃষ্টির উন্মেষ এবং সাময়িকভাবে ঊর্দ্ধ্বভূমিতে আরোহণের ফলেই সাধারণতঃ এই অবতরণ সম্ভব হয় কিন্তু এই দুই ধারার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেও কখনও কখনও আপনা হইতেই আকস্মিকভাবে আবরণ বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার মধ্য দিয়া উপর হইতে শক্তি যেন গলিয়া পড়ে বা বর্ষার ধারা বা প্লাবনের মত বহিয়া যায়। একটা উত্তর জ্যোতি নামিয়া আসিয়া প্রাকৃত সত্তাকে মন প্রাণ দেহকে স্পর্শ করে, তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে বা তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় ; অথবা লোকোত্তর সত্তা বা শক্তি বা জ্ঞান, ধারা কিংবা তরঙ্গের আকারে অবতীর্ণ হয় অথবা পরমোল্লাসের এক প্লাবন প্রবাহিত হয় অথবা এক পরমানন্দ অতর্কিত ভাবে হঠাৎ আসিয়া পড়ে ; তখন বুঝিতে হইবে যে অতিচেতনার সহিত যোগ স্থাপিত হইয়াছে। কেননা এইভাবের অনুভূতির পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকে এবং অবশেষে তাহারা স্বাভাবিক পরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে এবং প্রথমে হয়ত যাহা অনুভূতির বাহ্য আকারের অন্তরালে গোপন এবং রহস্যাবৃত ছিল তাহার মধ্যে কি আছে এবং তাহাদের তাৎপর্য্য কী তাহাও এই অবতরণেই প্রকাশ করিয়া দেয়। কেন না তখন উত্তরভূমি হইতে জ্ঞানের প্রবাহ, প্রথমতঃ মধ্যে মধ্যে পরে প্রায়শঃ বহু এবং অবশেষে সদাপ্রবহমান প্রবল নির্ঝররূপে নামিয়া আসে এবং মনের উপশম ও নৈঃশব্দ্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে ; বৃহত্তর দৃষ্টি, লোকোত্তর সত্য এবং প্রজ্ঞা হইতে জাত বোধি, দিব্যশ্রুতি বা দিব্য প্রকাশের আবেশ সত্তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, বোধিদ্বারা বিভা-

বিত জ্যোতির্ম্ময় বিবেক ক্রিয়াশীল হইয়া বুদ্ধির সকল অন্ধকার, চোখধাঁধানো সকল বিশৃঙ্খলা ঘুচাইয়া দেয় এবং সবকিছুকে সুবিন্যস্ত ও যথাস্থানে স্থাপিত করে ; সত্তাতে এক নূতন চেতনার, যাহার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধভাবে লব্ধ এক উদার ভাবনাময় জ্ঞান রহিয়াছে এমন এক অভিনব উচ্চতর মনের প্রকাশ আরম্ভ হয় ; যাহা প্রাকৃত ভাবনা বা দৃষ্টির শক্তি হইতে বৃহত্তর, ভাবনা ও দৃষ্টির সাক্ষাৎ আধ্যাত্মিক অনুভূতির তেমন নূতন এবং বৃহত্তর শক্তিযুক্ত এক আলোকিত চেতনা বা বোধিচেতনা বা অধিমানস চেতনা ফুটিয়া উঠিতে থাকে, যাহাকে আমাদের সত্তার মধ্যস্থিত আধ্যাত্মিক উপাদানের এক বৃহত্তম সম্ভূতি বা পরিণতি বলিতে পারি ; তখন হৃদয় এবং ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ গভীর এবং বৃহৎ হইয়া সর্ব্বভূতকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করে, ঈশ্বরকে দর্শন, শাশ্বত সত্যবস্তুকে অনুভব শ্রবণ বা স্পর্শ করিতে এবং এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে আত্মা এবং জগতের গভীরতর একত্ব অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। এই মৌলিক রূপান্তরের স্বাভাবিক পরিণাম ও ফল রূপে আরও কত নিশ্চিত অনুভূতি, চেতনার আরও কত বিভূতি এবং পরিণাম প্রকাশ পায়। এই পরিবর্ত্তন এই বিপ্লবের কোন সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না ; কেননা ইহা সাধকের উপর অনন্তেরই দুর্ব্বার আক্রমণ।

আধ্যাত্মিক রূপান্তরের ধারা এইভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় অথবা বৃহৎ ও নিশ্চিত অনুভূতি-পরম্পরার মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে চলে। পুনঃ-পুনঃ উর্দ্ধ্বভূমিতে উঠিতে উঠিতে অবশেষে এমন দিন আসে যখন চেতনা উচ্চতর ভূমিতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তথা হইতে মন প্রাণ দেহকে দর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করে—এইভাবে আধ্যাত্মিক পরিণতির এক ক্রিয়াধারা চলে এবং তাহা চরম অবস্থায় পৌঁছে ; তাহার ক্রিয়ার অন্য এক ধারার জন্য লোকোত্তর জ্ঞান ও চেতনার শক্তি আধারে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে নামিয়া আসিতে থাকে এবং ক্রমশঃ তাহা সাধকের সমগ্র স্বাভাবিক জ্ঞান এবং চেতনায় পরিণত হইয়া পড়ে। এক দিব্য আলোক, শক্তি এবং জ্ঞানের অনুভূতি জাগে যাহা মনকে অধিকার করিয়া তাহাকে নূতন ছাঁচে ঢালে, তাহার পর প্রাণকে অধিকার করিয়া তাহাকেও নূতন ছাঁচে ঢালে, অবশেষে সে দেহগত ক্ষুদ্র চেতনাকে অধিকার করিয়া তাহাকে আর ক্ষুদ্র থাকিতে দেয় না তাহাকে উদার এবং সাবলীল এমন কি অনন্ত করিয়া তোলে। কেননা এই নূতন চেতনাতে অনন্তের স্বভাব বর্ত্তমান আছে ; ইহা আমাদের মধ্যে অনন্ত এবং শাশ্বত বস্তুর আধ্যাত্মিক বোধ ও জ্ঞান স্থায়ীভাবে

জাগায় সেইসঙ্গে আমাদের প্রকৃতি হয় সুদূরপ্রসারিত এবং সমস্ত সীমার বন্ধন যায় টুটিয়া ; অমৃতত্ব তখন শুধু বিশ্বাসের বস্তু বা উপলব্ধির বিষয় থাকে না, স্বাভাবিক আত্মজ্ঞানে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় ; ভাগবতসত্তার অন্তরঙ্গ নিত্য সম্ভাবনা নিত্য সন্নিধ্যের বোধ, তিনিই যে জগৎ, আমাদের আত্মা এবং সর্ব্ববস্তু প্রশাসন করিতেছেন—এই অনুভব, তাহার শক্তি-ই আমাদের এবং সর্ব্ববস্তুর মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে এই জ্ঞান এবং অনন্তপুরুষের শান্তি ও আনন্দ সর্ব্বদা স্পষ্ট, বাস্তব ও পূর্ণরূপে সত্তাতে বর্ত্তমান থাকে ; প্রতি দৃশ্যে প্রতিরূপে সাধক তখন শাশ্বত সত্যবস্তুকে দেখে, প্রতিশব্দে তাঁহাকেই শোনে, প্রতিস্পর্শে তাঁহাকেই অনুভব করে ; তাঁহার রূপ, তাঁহার ব্যক্তিসত্তা এবং তাঁহার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই তাহার কাছে থাকে না ; হৃদয়ের আনন্দ বা ভক্তি, সর্ব্বভূতকে পরম প্রেম ভরে আলিঙ্গন, 'মদাত্মাসর্ব্বভূতাত্মা' এই জ্ঞান তখন তাহার কাছে নিত্যসত্য বলিয়া অনুভূত হয়। তখন মনোময় জীবের চেতনা এই অধ্যাত্ম পুরুষের চেতনার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেছে অথবা পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণরূপে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনপ্রকার রূপান্তরের ইহাই দ্বিতীয়, যাহা ব্যক্ত সত্তার সহিত তাহার উপরে অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত সত্তার যোগসাধন করিতেছে ; প্রকৃতির তিনটি নিশ্চিত আধ্যাত্মিক পরিণাম ও রূপান্তরের ইহা মধ্যবর্ত্তী সোপান।

চিৎসত্তা যদি প্রথম হইতেই নিরাপদে লোকোত্তর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, মন ও জড়ের অক্ষত এবং অলিখিত পটভূমিকায় নিজের রূপরেখাপাত করিতে পারিত তাহা হইলে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধন দ্রুত এমন কি সহজ ও সুখকর হইত ; কিন্তু প্রকৃতির অবলম্বিত ক্রিয়াধারা অধিকতর দুরূহ, তাহার গতিতে আছে নানা বৈচিত্র্য, কুটিল ও আঁকাবাঁকা রেখার অতিবাহুল্য, কর্ম্মের বিধান অতিব্যাপক, আরব্ধ কর্ম্মের প্রত্যেক খুঁটিনাটিকে স্বীকার করিয়া কোন কিছু বাদ না দিয়া সে চলিতে চায়, কোনমতে কাজ সারিয়া নিজের বহু জটিলতার উপরে সহজে সরাসরিভাবে জয়লাভের ম্লান নির্বীর্য্য আনন্দে সে তৃপ্ত হয় না। আমাদের সত্তার প্রতিটি অংশের স্বভাব এবং স্বধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অতীতের ছাঁচে তাহার বুকে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা বজায় রাখিয়াই প্রকৃতি সে অংশটি গ্রহণ করে ; তাহার পর তাহার ক্ষুদ্রতম অংশ বা ক্ষীণতম স্পন্দটি পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া যদি তাহা অযোগ্য মনে হয় তবে নষ্ট করিয়া ফেলিবে এবং অন্যকিছুকে তাহার স্থানে বসাইবে অথবা যদি তাহা যোগ্য মনে হয় তবে তাহাকে লোকোত্তর সত্যের কোন উপাদানে রূপান্তরিত কবিয়া লইবে ইহাই প্রকৃতির কার্য্যের

বিধান। চৈত্যিক রূপান্তর পূর্ণ হইলে এ সাধনার ধারা আর দুঃখদায়ক হয় না; যদিও সেক্ষেত্রেও চাই অতিযত্নে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সাধনা, প্রগতি সেখানে ধীর স্থির সুবিবেচিত পথে চলিবে; কিন্তু যদি চৈত্যসত্তার নির্ম্মুক্ত প্রকাশ না ঘটে তবে সাধককে আংশিক ফললাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে অথবা যদি পূর্ণতা লাভের জন্য অদম্য আগ্রহ থাকে অন্তরাত্মার আকূতি যদি হয় অতি তীক্ষ্ণ, তবে বাধ্য হইয়া তাহাকে দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথে চলা স্বীকার করিতে হইবে, মনে হইবে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন জ্বালাযন্ত্রণাময় সে সাধনা বুঝি কোনদিনই শেষ হইবে না। কেননা কোনো কোনো অত্যুজ্জ্বল মুহূর্ত্ত ছাড়া সাধারণতঃ চেতনা উচ্চতম স্তরে পৌঁছে না; তাহা মনোময় ভূমিতেই অবস্থান করে এবং উপর হইতে আগত জ্ঞান ও শক্তির অবতরণ গ্রহণ করে। কখনও আধ্যাত্মিক শক্তির একটিমাত্র ধারা অবতীর্ণ হয়, তাহা আধারে অবস্থিত থাকিয়া তাহার সত্তাকে এমন কিছুর ছাঁচে ঢালে যাহা প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক, অথবা কখনও আধ্যাত্মিক শক্তির নানাধারা উপর্য্যুপরি নামিয়া আসিবার ফলে সত্তাতে আধ্যাত্মিক স্থিতি ও বীর্য্য অধিকতর পরিমাণে দেখা দেয়; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধক উচ্চতম ভূমিতে বাস করিতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গীণ রূপান্তর সাধিত হইতে পারে না। চৈত্যিক রূপান্তর ঘটিবার পূর্ব্বে অসময়ে যদি লোকোত্তর শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনা হয় তবে অপরাপ্রকৃতির অশুদ্ধি এবং দোষদুষ্ট উপাদান তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না এবং তাহার আশু পরিণাম বেদবর্ণিত কাঁচামাটির ঘটের মতই হইবে যাহা দিব্য সোমসুরা ধারণ করিতে গিয়া গলিয়া বা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; অথবা যে শক্তির অবতরণ হইতেছিল আধার তাহা ধারণ এবং রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই বলিয়া তথা হইতে ফিরিয়া বা সরিয়া যাইবে। শক্তিই যদি বিশেষভাবে নামিয়া আসে তবে অহংগত মন এবং প্রাণ নিজের ভোগৈশ্বর্য্যের জন্য তাহা ধারণ করিবার প্রয়াস পাইতে পারে; তখন অহংএর অতিস্ফীতি, নানা সিদ্ধাই, অহঙ্কার পরিবর্দ্ধক নানা প্রভুত্বলাভের চেষ্টারূপ অবাঞ্ছিত ফল দেখা দিতে পারে। আবার যদি অশুদ্ধ কামপ্রবৃত্তির আতিশয্য থাকে তবে উপর হইতে অবতীর্ণ আনন্দধারাকে আধার ধারণ করিয়া রাখিতে পারিবেনা, তাহাতে উন্মাদক বা অধোগতিপ্রদায়ী এক মিশ্রবস্তু সৃষ্ট হইবে; শক্তি ফিরিয়া যায় যদি আধারে দূরাকাঙ্ক্ষা, মিথ্যা অভিমান বা অপরকোন প্রতিকূল হীন প্রবৃত্তি থাকে, আলোক প্রত্যাহৃত হয় যদি অন্ধকার বা অবিদ্যার কোন রূপের প্রতি আসক্তি থাকে, ইষ্টদেবতা

বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যান যদি হৃদয়-মন্দির অমার্জিত বা অশুদ্ধিতে ভরা থাকে। অথবা প্রত্যাহৃত শক্তি আধারে যে যে পরিণাম রাখিয়া গিয়াছে কোন আসুরী শক্তি তাহাই হস্তগত করিয়া প্রতিকূলতার কাজে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে কিন্তু সে মূলশক্তিকে ধরিতে পারে না। এই সমস্ত অনর্থপাত, বহুল ভ্রম বা ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা না দিলেও শক্তির গ্রহণে নানা ভুল এবং আধারের অপূর্ণতার জন্য রূপান্তর সাধন ব্যাহত হয়। শক্তি কেবল মাঝে মাঝে নামিয়া আসে; মধ্যবর্ত্তী সময়ে তাহার ক্রিয়া আড়ালেই চলে অথবা অর্জিত দিব্যভাবকে জীর্ণ করিতে বা আধারের বিদ্রোহী অংশকে অনুকূল করিতে দীর্ঘকাল কাটিয়া যায় ততদিন শক্তি নিজেকে ভিতরেই অবরুদ্ধ রাখে; এখনও যেখানে রাত্রি রহিয়াছে সেখানে আঁধার বা আধা আঁধারের মধ্যেই আলোর তপস্যা চলে। যে কোন মুহূর্ত্তেই শক্তির ক্রিয়া এ জন্মের মত স্থগিত হইয়া যাইতে পারে কেননা তাহার বর্ত্তমান জীবনের সাধ্যের শেষ সীমায় সে পৌঁছিয়া গিয়াছে বলিয়া আধার আর কিছু গ্রহণ এবং জীর্ণ করিতে পারে না। অথবা হয়তো তাহার মন প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু প্রাণ তাহার পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ করিয়া নূতনকে বরণ করিয়া লইতে অস্বীকৃত হইতেছে; অথবা যদি প্রাণ রূপান্তরকে বরণ করিয়া নিতেও চায় তথাপি দেহ এমন দুর্ব্বল অযোগ্য বা দোষযুক্ত হইতে পারে যে রূপান্তরের জন্য অপরিহার্য্য চেতনার পরিবর্ত্তন ঘটিতে বা তাহার উপযুক্ত সক্রিয়তাকে ধারণ করিতে পারিতেছে না।

তাহা ছাড়া আধারের প্রত্যেকটি অংশকে তাহার স্বভাব এবং স্বধর্ম্ম অনুসারে পৃথকভাবে সংস্কৃত ও রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে হইবে বলিয়া চেতনাকে বাধ্য হইয়া পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক অংশে নামিয়া আসিতে হয় এবং সেই অংশের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনুসারে কার্য্য করিতে হয়। যদি শুধু কোন লোকোত্তর ভূমি হইতে শক্তি সঞ্চার করা হয় তবে নিম্নতর জীবনের একটা উর্দ্ধপাতন (sublimation) বা উন্নয়ন হইতে পারে অথবা কেবল উত্তর শক্তির প্রভাবে একটা অভিনব গঠন কার্য্য চলিতে পারে; কিন্তু নিম্নতর সত্তা এই পরিবর্ত্তন নিজের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারে; ইহাতে পূর্ণবিকাশ বা সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হয়না, পরিণতি হয় আংশিক এবং উপর হইতে তাহার উপর চাপানো একটা পরিবর্ত্তন শুধু দেখা দেয়; সত্তার কোন অংশে হয়তো তাহাতে সাড়া জাগে বা তাহা মুক্ত হইয়া যায়, অপর কোন কোন অংশকে হয়তো দমন করা হয় অথবা তাহারা যাহা ছিল তাহাই রহিয়া যায়;

স্বাভাবিক প্রকৃতির বাহির হইতে আগত কোন চাপানো বিসৃষ্টি পূর্ণরূপে স্থায়ী কেবল ততক্ষণ থাকিতে পারে যতক্ষণ যে শক্তি তাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রভাব বর্ত্তমান থাকে। এইজন্য সত্তার নিম্নতর ভূমিতে চিৎশক্তির অবতরণ অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন ; কিন্তু এই অবতরণ দ্বারাও লোকোত্তর তত্ত্বের পূর্ণ-শক্তি প্রকাশ করিয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন ; নামিবার পথে শক্তি ক্ষীণ, খর্ব্ব এবং কিছুটা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে, কাজেই ফলে বা পরিণামে অপূর্ণতা এবং সীমা বা সঙ্কোচ থাকিয়া যায় ; বৃহত্তর জ্ঞানের যে আলোক নামিয়া আসে তাহা অস্পষ্ট এবং বিকৃত হইয়া পড়ে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে আমরা ভুল করি, অথবা তাহার সত্য মনের এবং প্রাণের ভ্রমের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, অথবা আলোক যতটা আসে তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিবাব শক্তি ঠিক ততটা পরিমাণে থাকে না। অধিমানসের আলোক এবং শক্তি নিজের ক্ষেত্রে নিজের পূর্ণমহিমায় কাজ করিতেছে—ইহা হইল এক কথা, আর সেই আলোক দৈহিক চেতনার অন্ধকারময় পবিবেশ ও তাহার বিধানের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে, ইহা হইল সম্পূর্ণ আর এক কথা ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্ষীণ এবং মিশ্রিত বস্তু হইয়া পড়াতে তাহা জ্ঞানে, শক্তিতে এবং ক্রিয়াসম্পাদনার সামর্থ্যে অনেক খর্ব্ব হইয়া যায়। তাই শক্তি খণ্ডিত, গতি বাধাগ্রস্ত এবং ফল আংশিক হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ প্রকৃতির মধ্যে চিৎশক্তিব স্ফুরণ এই জন্যই এত মন্থর এবং কষ্ট-সাধ্য : কেননা মন এবং প্রাণকে জড়ের মধ্যে নামিয়া তথাকার পরিবেশের সঙ্গে নিজেদিগকে উপযোগী করিয়া লইতে হয় ; যাহার মধ্যে তাহাদিগকে ক্রিয়া করিতে হয় সেই উপাদান ও শক্তির অস্পষ্টতা এবং রূপান্তরে অনিচ্ছুক তামসিকতা দ্বারা তাহারা পরিবর্ত্তিত এবং খর্ব্বীকৃত হইয়া পড়ে তাই জড় উপাদানকে পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করিযা নিজেদের উপযোগী বাহন বা যন্ত্রে এবং খাঁটি ও স্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ ক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারেনা। প্রাণচেতনার মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যময় ও শক্তিশালী আবেগ আছে তাহা তেমন মহৎ-ভাবে এবং সাবলীল উদার ছন্দে জড়ময় জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না ; তাহার প্রেরণা ব্যর্থ হইয়া যায়, কার্য্যক্ষেত্রে যাহা সে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম তাহা, তাহার ভাবনায় সত্যের যে মূর্ত্তি ফোটে তাহা অপেক্ষা হীনতর হয়, দেহ বা রূপ আমাদের অন্তরস্থ প্রাণময় বোধিকে বিপথগামী করে, ফলে বাস্তব-ক্ষেত্রে যেরূপ সৃষ্টি হয় তাহা, বোধি যাহা জীবনে রূপায়িত করিয়া তুলিতে চায় তাহার অনুরূপ হয় না। মন, প্রাণ ও জড়ের মাধ্যমে তাহার উচচ আদর্শ

প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, কেবল তাহাকে রফা করিয়া চলিতে ও আদর্শ-কে ছোট করিয়া ধরিতে বাধ্য হইতে হয়, ফলে তাহার ভাবনা দিব্যভাববর্জিত হইয়া পড়ে; তাহার জ্ঞান এবং সঙ্কল্পে যতটা স্বচ্ছতা ও সুস্পষ্টতা আছে নিম্নতর উপাদান যাহাতে তাহা মানিয়া চলিতে অথবা প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় সেই অনুপাতে শক্তি তাহাতে সঞ্চার করিতে সে সমর্থ হয়না; বরং প্রাণের মলিনতা এবং জড়ের গ্রহণশক্তিহীনতার জন্য তাহার নিজের শক্তি কুণ্ঠিত, সঙ্কল্প দ্বিধাগ্রস্ত, জ্ঞান মেঘাচ্ছন্ন এবং অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। প্রাণ কিংবা মন জড়জীবনকে পূর্ণতা দিতে বা রূপান্তরিত কবিতে সমর্থ হয়না, কেননা এই সমস্ত পরিবেশেব মধ্যে তাহারা তাহাদের পূর্ণবীর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেনা; তাই যাহাতে জড়ের মধ্যে থাকিযা তাহারা মুক্ত ও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে তজ্জন্য লোকোত্তর শক্তিকে তাহাদের আবাহন করিতে হয়। কিন্তু উর্দ্ধ-লোক হইতে যখন আধ্যাত্মিক মনঃশক্তি প্রাণ এবং জড়ের মধ্যে নামিয়া আসে তখন তাহাতেও সেই একই অসামর্থ্য দেখা দেয়: অবশ্য তাহা অনেক বেশী কিছু কবে, অনেক জ্যোতির্ম্ময় পরিবর্ত্তন সাধন কবে: কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আগত শক্তিতে বিকৃতি এবং সঙ্কোচ দেখা দেয়, যে চেতনা নামিয়া আসিযাছে এবং জড় ও মনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য যে শক্তি সে প্রয়োগ করিতে পারে এইদুয়ের মধ্যে বিষমতা থাকিয়াই যায় ফলে যাহা সৃষ্টি হয তাহার খর্ব্বতা দূর হয় না। আধ্যাত্মিক শক্তির অবতরণে অনেকসময় অসাধাবণ পরিবর্ত্তন আসিয়াছে দেখা যায়, এমন কি যেন মনে হয় পূর্ণরূপান্তর সিদ্ধি হইয়া গিয়াছে, চেতনা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার গতিধারা উর্দ্ধে উঠিযা গিয়াছে তবুও তখন সক্রিয়ভাবে চরম রূপান্তর সাধিত হয় নাই।

একমাত্র অতিমানস তাহার ক্রিয়ার পূর্ণশক্তি অক্ষুণ্ন রাখিয়া অবতরণ করিতে পারে; কেননা কর্ম্ম ইহার পক্ষে স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত; ইহাব ইচ্ছা ও জ্ঞানে কোন ভেদ নাই; এবং যে ইচ্ছা জাগে সেই ফলই অব্যাহত-ভাবে লাভ হয়; স্বয়ং সংসাধন-সমর্থ ঋতচিৎই ইহার স্বভাব, যদি কখনও নিজেকে বা নিজের কর্ম্মকে সে সঙ্কুচিত করে তবে তাহা স্বেচ্ছাকৃত, কাহারও দ্বারা বাধ্য হইয়া নহে; ইচ্ছাপূর্ব্বক যে সীমা সে গ্রহণ করে তাহার মধ্যে তাহার ক্রিয়া এবং কর্ম্মের ফল হয় সুষমাময় এবং অপরিহার্য্য। আবার অধি-মানস, মনেরই মত বিভাজনশীল তত্ত্ব, তাহার ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য এই যে সোষম্যের একটি বিশেষ ছন্দ সে বাছিয়া নিয়া তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে রূপায়িত করিয়া তোলে;

ইহার ক্রিয়াতে ইহা সমগ্র বিশ্বের হিসাব রাখে বলিয়া একটা অখণ্ড ও পূর্ণ সুষমা সে সৃষ্টি করে অথবা বহু সুষমাময় ছন্দকে সে একত্র করে তাহাদের সমন্বয় সাধন করে অথবা মিলাইয়া মিশাইয়া দেয় ; কিন্তু মনকে প্রাণ ও জড়ের বাধা ও সঙ্কোচের মধ্যে ক্লিষ্ট হইয়া কাজ করিতে হয় বলিয়া এক এক অংশের মধ্যে তাহাকে সমন্বয় সাধন করিতে হয় এবং স্বতন্ত্র খণ্ডগুলি যোগ করিয়া সমন্বয় ও অখণ্ডতায় তাহাকে পৌঁছিতে হয়। নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ার যে প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে আছে তাহা তাহার সুসমঞ্জস সমগ্রীকরণের প্রবৃত্তিকে বাধাগ্রস্ত করে, আবার যে মনোময় ও প্রাণময় উপাদান লইয়া তাহাকে এখানে কাজ করিতে হয় তাহাদের প্রকৃতির জন্য বাধা আরও প্রবল হইয়া পড়ে ; তাই নিজেতে নিজে পূর্ণ স্বতন্ত্র সীমিত আধ্যাত্মিক বিসৃষ্টি তাহার পক্ষে সম্ভব কিন্তু পরিপূর্ণ অখণ্ড সম্যক্ জ্ঞানলাভ এবং তাহার প্রকাশ তাহার সাধ্যাতীত। এই কারণে এবং আধারে নামিবাব সময়ে তাহার স্বাভাবিক আলোক এবং শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়ে বলিয়া যাহা করা প্রয়োজন, পূর্ণরূপে তাহা করিতে সে সমর্থ হয় না এবং নিজেকে মুক্ত ও সাথক করিবার জন্য আবও ঊর্দ্ধ্বে স্থিত অতিমানস শক্তিকে তাহার আবাহন করিতে হয়। চৈত্যিক রূপান্তরকে পূর্ণতা পাইতে হইলে আধ্যাত্মিক রূপান্তরকে আবাহন করিতে হয় তেমনি প্রাথমিক আধ্যাত্মিক রূপান্তরকেও নিজের পূর্ণতা সাধনের জন্য অতিমানস রূপান্তবকে আবাহন করিতে হয়। কেননা এ পর্য্যন্ত প্রকৃতির যে পবিণামধারা চলিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি সোপান পরিবর্ত্তনশীল, পরবর্ত্তী সোপানেব মুখাপেক্ষী ; কিন্তু পরিণামধারাকে অবিদ্যার ভিত্তি হইতে পূর্ণরূপে জ্ঞানেব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা রূপ পূর্ণ ও আমূল পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর অতিমানস শক্তির মধ্যবর্ত্তিতায় এবং পার্থিব সত্তায় তাহার সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ফলে শুধু সাধিত হইতে পারে।

ইহাই হইল তৃতীয় এবং চরম রূপান্তরের প্রকৃতি, এই রূপান্তর দেখা দিলে অন্তরাত্মার অবিদ্যার মধ্য দিয়া চলা শেষ হইয়া যায়, এ রূপান্তর চেতনা, প্রাণ, শক্তি, প্রকাশের ধারাকে পূর্ণ এবং পূর্ণভাবে কার্য্যকরী আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করে। পরিণামশীল প্রকৃতিকে যখন প্রস্তুত দেখে, তখন এই ঋতচিৎ তাহার মধ্যে নামিয়া আসে এবং তাহার মধ্যে সংবৃত অতিমানস তত্ত্বকে মুক্ত করে ; তাহার ফলে জড়বিশ্বে চিদাত্মার স্বরূপসত্যের অনবগুণ্ঠিত প্রকাশ রূপে অতিমানস ও অধ্যাত্মপুরুষের আবির্ভাব হয়।

ষড়বিংশ অধ্যায়

অতিমানসের দিকে আরোহণ

সত্যজ্যোতির যাহারা প্রভু তাহারা সত্যদ্বারাই সত্যকে বৰ্দ্ধিত করেন।

ঋগ্বেদ ১।২৩।৫

বাকের তিনশক্তি তাহাদের সম্মুখে জ্যোতিকে বহন করে...শান্তির ত্রয়াত্মক গৃহ, আলোকের ত্রিধারাযুক্ত পথ।

ঋগ্বেদ ৭।১০১।১,২

যখন ঋত বা সত্যসমূহেব দ্বাবা তিনি বৰ্দ্ধিত হন তখন অন্য চারিটি চারু জগৎরূপে তিনিই রূপায়িত হন।

ঋগ্বেদ ৯।৭০।১

বিবেকশীল মন লইয়া তিনি ঋষিরূপে জন্মগ্রহণ করেন, সত্যেব তিনি সন্তান, গোপনে অন্তরে তিনি জাত হন, তাঁহার অৰ্দ্ধভাগ মাত্র বাহিবে প্রকাশ পায়।

ঋগ্বেদ ৯।৬৮।৫

তাঁহাদের মধ্যে বৃহৎ বোধিজাত প্রজ্ঞা আছে; তাঁহারা জ্যোতির স্রষ্টা; সচেতন-ভাবে সবকিছু তাঁহাবা জানেন; সত্যে তাঁহাবা বৰ্দ্ধিত হন।

ঋগ্বেদ ১০।৬৬।১

অন্ধকারেব পরপারস্থিত উত্তর জ্যোতি দর্শন কবিয়া আমরা দেবত্বের আধাবে দিব্য সূর্য্যের কাছে আসিলাম, আসিলাম সৰ্ব্বোত্তম জ্যোতিতে।

ঋগ্বেদ ১।৫০।১০

চৈত্যিক রূপান্তর এবং আধ্যাত্মিক রূপান্তরের প্রাথমিক স্তরগুলি সম্বন্ধে আমরা একটা স্পষ্ট ধাবণা লাভ করিয়াছি; এই দুই রূপান্তর-সিদ্ধির অর্থ মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির এক পূর্ণতা, অখণ্ডতা ও চরম একত্ব বোধ; মানুষ যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে ইহা তাহার অংশ,—যদিও শুধু স্বল্প কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ। কিন্তু অতিমানস-রূপান্তর আমাদিগকে যে রাজ্যে

লইয়া যায় তাহার অতি অল্প অংশই মানুষ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে ; যে অতি উচ্চ চেতনার রাজ্যে এ রূপান্তর আমাদিগকে প্রবেশাধিকার দিতে চায় কেহ কেহ তাহার আভাষ পাইয়াছে, কেহ কেহ সে স্থান দর্শন করিয়াও আসিয়াছে কিন্তু বহুস্থান এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে, তাহার কোন পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র আজিও প্রস্তুত হয় নাই। চেতনার যে উচ্চতম শৃঙ্গে বা যে সমুন্নত মালভূমিতে অতিমানসের স্বধাম রহিয়াছে, মানুষ কোন পরিকল্পনায়, নক্সায় বা মানচিত্রে তাহা উপযুক্তভাবে আঁকিয়া তুলিবে অথবা মন দিয়া তাহাকে দর্শন করিবে বা তাহার বর্ণনা দিবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ মন হইতে বহুদূরে তাহা অবস্থিত। যে চেতনার প্রকৃতি এরূপভাবে এত পৃথক, যাহার মধ্যে জ্ঞানের ধারা মূলতঃ এত অন্যধরণের, অনালোকিত এবং অরূপান্তরিত প্রাকৃত মন দিয়া তাহা প্রকাশ কিংবা সে মনের পক্ষে তাহার মধ্যে প্রবেশ করা অতি দুরূহ ; এমনকি বোধি কিংবা দিব্যদৃষ্টির সহায়তায় যদি সে চেতনার দর্শন পাওয়া যায় অথবা তাহার কোন ধারণা করা যায় তবু তাহাকে অনুবাদ করিতে গেলে আমাদের যে অবস্তুতন্ত্র (abstract), অপূর্ণ, দীন এবং মামুলী ভাষা আছে তাহাতে কোনমতে আমাদের বোধগম্য হইতে পারে এরূপভাবে তাহা প্রকাশ করা যায় না, তাহার জন্য অন্য এক ভাষার প্রয়োজন। পশু-চেতনা যেমন মানবমনের উচ্চতর স্তরসমূহের কোন ধারণা করিতে পারে না তদ্রূপ অতিমানসের গতি প্রকৃতির কোন ধারণা সাধারণ প্রাকৃত মন কোন ক্রমে করিয়া উঠিতে পারে না ; কেবল যখন কেহ মানসোত্তর কোন মধ্যবর্ত্তী চেতনার অনুভব লাভ করে তখন অতিমানস সত্তার কোন বর্ণনার দ্বারা তাহার প্রকৃত অর্থ তাহার কাছে কিছুটা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যায়, কেননা যে ভাষায় সে বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে তাহা বর্ণিত বিষয়কে প্রকাশ করিবার পক্ষে অপ্রচুর হইলেও বিবৃত বস্তুর সমজাতীয় কিছুর অনুভূতি আছে বলিয়া এই অপর্য্যাপ্ত বিবরণ হইতেও প্রকৃত তাৎপর্য্য কিছুটা গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে। অতিমানস প্রকৃতিতে প্রবেশ করিবার সাধ্য প্রাকৃত মনের না থাকিলেও, মধ্যবর্ত্তী প্রদেশস্থিত এই সমস্ত ঊর্দ্ধ্বচেতনার জ্যোতির মধ্য দিয়া যাহাকে সত্য, ঋত ও বৃহৎ বলা হইয়াছে, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন চিৎপুরুষের যাহা স্বরাজ্য সেই অতিমানসের খানিকটা আভাস বা খানিকটা প্রতিফলিত প্রতিরূপ মন দেখিতে পারে।

কিন্তু এই মধ্যবর্ত্তী চেতনার কথা বলিতে গেলেও সে বিবরণকে বাধ্য

হইয়াই অপ্রচুর হইতে হইবে ; এ সম্বন্ধে অবস্তুতন্ত্র কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত (abstract generalisations) শুধু দেওয়া যায় তাহা হইতে পথ চলিবার প্রাথমিক আলো কিছু পাওয়া যাইতে পারে। তবে এইটুকু শুধু ভরষার কথা যে এই উর্দ্ধ্ব চেতনার প্রকৃতি বা তত্ত্ব যতই স্বতন্ত্র হউক না কেন, প্রথমে যতটুকু তাহার এখানে আমরা লাভ করিতে পারি তাহা তাহার আকৃতি ও শক্তিতে যতই অপরিণত এবং খর্ব্বাকার হউক না কেন, যে-চেতনা আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে তাহারই পরম পরিণতি ও প্রকাশ। অন্য একটি তথ্যও এবিষয়ে আমাদের একটা সহায়, তাহা এই যে পরিণামশীল প্রকৃতির প্রগতির ধারা যেমন নিম্নতর ক্ষেত্রে তাহার প্রাথমিক অবস্থায় তেমনি উচ্চতম ভূমিতে অধিরোহণের সময় একই রীতিতে একই ছন্দে অগ্রসর হয়, যদিও তাহার ক্রিয়ায় কোন কোন বিধানের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যায় ; এইজন্য আমরা তাহার পরম ধারাটিও কতকটা আবিষ্কার এবং অনুসরণ করিতে পারি। কেননা বুদ্ধি হইতে আধ্যাত্মিক মনে পরিণতি ও রূপান্তরের প্রকৃতি এবং বিধান কতকটা আমরা জানিতে পারিয়াছি ; এইভাবে যাহা জানিয়াছি তাহা হইতে যাত্রা করিয়া নব-চেতনার উত্তর বিভূতির গতিপথের, আধ্যাত্মিক মন হইতে অতিমানসের দিকে সুদূরতর অভিযানের একটা রেখাচিত্র অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিতে পারি। এ ছবি অবশ্যই অপূর্ণ এবং অস্পষ্ট হইবে, কেননা দার্শনিকের গবেষণার দ্বারা একটা অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি একটা প্রাথমিক অবস্তুতন্ত্র সাধারণ প্রত্যয় মাত্র লাভ হইবে ; এ রাজ্যের কিছু প্রকৃত জ্ঞান এবং বর্ণনা পাইতে গেলে যাহা ভাবক বা অধ্যাত্ম-রসিকের সাক্ষাৎ এবং বস্তুতন্ত্র অনুভূতি হইতে লব্ধ এবং যাহা একই সঙ্গে অতিস্পষ্ট এবং দুরধিগম্য তেমন ভাষা এবং রূপক বা প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

অধিমানসের মধ্য দিয়া অতিমানসে উত্তীর্ণ হইবার অর্থ আমাদের পরিচিত প্রাকৃত বা অপরাপ্রকৃতি হইতে অতিপ্রকৃতি বা পরাপ্রকৃতিতে পৌঁছা। এই-জন্য স্বভাবতঃ কোন প্রয়াস দ্বারাই আমাদের এই মন তাহা লাভ করিতে পারে না ; উর্দ্ধ্ব চেতনার সাহায্য ব্যতীত ব্যক্তিগত অভীপ্সা বা সাধনার দ্বারা তথায় পৌঁছা যায় না ; কেননা আমাদের সাধনা প্রকৃতির নিম্নতর শক্তির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে ; অবিদ্যাশক্তির নিজের এমন কোন সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য বা উপায়-কুশলতা নাই যাহাতে আপন জোরে যাহা তাহার অধিকার-বহির্ভূত এমন কিছু সে লাভ কবিতে পারে। ইহার পূর্ব্বেও প্রকৃতি যতবার উর্দ্ধ্বে অধিরোহণ

করিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি নিগূঢ় চিৎশক্তির ক্রিয়াবলেই সাধিত হইয়াছে, সে শক্তি প্রথমে নিশ্চেতনা এবং পরে অবিদ্যার মধ্যে ক্রিয়া করিয়াছে ; প্রতিবারে প্রকৃতির মধ্যে যাহা ইতিপূর্ব্বে রূপায়িত হইয়াছে তাহার চেয়ে উচ্চতব কোন শক্তি, অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অবস্থিত নিজের গোপন বা সংবৃত সামর্থ্য বাহিরের ক্ষেত্রে স্ফুরিত করিয়া তুলিয়াছে ; কিন্তু তবু তাহার জন্য যে সব উচ্চতর শক্তি তাহাদের আপন ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাভাবিক পূর্ণ শক্তি লইয়া পূর্ব্ব হইতে রূপায়িত হইয়া বর্ত্তমান আছে তাহাদের একটা চাপ প্রয়োজন হইয়াছে ; আমাদের অধিচেতন অংশের মধ্যে এই সমস্ত ঊর্দ্ধ্বভূমি তাহাদের একটা প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র গড়িয়া তোলে এবং তথা হইতে বহিশ্চর পরিণামের ধারাকে প্রভাবিত করিতে পারে। অধিমানস ও অতিমানস পার্থিব প্রকৃতি মধ্যে সংবৃত ও গুপ্ত হইয়া অবস্থিত আছে ; কিন্তু অধিচেতনার অন্তর্লোকে যতদূর পর্য্যন্ত আমরা পৌঁছিতে পারি তাহার মধ্যে কোথাও তাহাদের কোন রূপায়ণ আজিও দেখা দেয় নাই ; আজ পর্য্যন্ত আমাদের বহিশ্চেতনায় বা আমাদের অধিগম্য অধিচেতনায় অধিমানস সত্তা বা সুব্যবস্থিত অধিমানস প্রকৃতি অথবা অতিমানস সত্তা বা সুব্যবস্থিত অতিমানুষ প্রকৃতির কোন ক্রিয়া বা প্রকাশ দেখা দেয় নাই ; কেননা চেতনার এই সমস্ত বৃহত্তর শক্তি অবিদ্যার ভূমিতে অতিচেতন বস্তু। অধিমানস এবং অতিমানসের সংবৃত তত্ত্বকে তাহাদের অবগুণ্ঠিত গোপনতা হইতে মুক্ত হইয়া আধারে স্ফুরিত করিবার জন্য, অতিচেতনার সত্তা ও শক্তিসকলের আমাদের মধ্যে নামিয়া আসা এবং আমাদিগকে ঊর্দ্ধ্বে তোলা চাই, চাই আমাদের সত্তা এবং শক্তির মধ্যে তাহাদের রূপায়িত হওয়া ; শ্রেষ্ঠ অবস্থান্তর এবং রূপান্তরের জন্য এই অবতরণ অপরিহার্য।

ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে যে ঊর্দ্ধ্ব শক্তি বা চেতনার অবতরণ ছাড়াও উপরের গোপন চাপে, দীর্ঘকালব্যাপী প্রকৃতি পরিণামের ফলে আমাদের পার্থিব প্রকৃতি এই উচ্চতর এবং বর্ত্তমানে অতিচেতন ভূমির একটা নিবিড় সংস্পর্শলাভ করিতে, আবরণের অন্তরালে আমাদের অন্তশ্চেতনায় অধিমানসের এক রূপায়ণ দেখা দিতে এবং তাহার ফলে বহিশ্চেতনায়ও ধীরে ধীরে উচ্চতর ভূমির উপযোগী এই উত্তর চেতনা স্ফুরিত হইয়া উঠিতে পারে। ইহাও কল্পনা করিতে পারি যে এইভাবে মানুষের মধ্যে এমন একটা উপজাতি বা সংঘ গড়িয়া উঠিতে পারে যাহারা বুদ্ধি, যুক্তি বা বিচারশক্তি দ্বারা অথবা প্রধানতঃ তাহাদের সাহায্যে কর্ম্ম করিবে না, করিবে এক বোধিবিভাবিত মনের দ্বারা,

যাহাকে উর্দ্ধমুখী রূপান্তরের প্রথম সোপান বলিতে পারি; তাহারও পরে অধিমানসদ্বারা বিভাবিত ও বিধৃত মন দেখা দিতে পারিবে যাহা আমাদিগকে চেতনার এমন এক প্রান্তভূমিতে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে যাহার পরেই রহিয়াছে অতিমানস বা দিব্য বিজ্ঞানের রাজ্য। কিন্তু উত্তরায়ণের এই ধারা অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রকৃতির পক্ষে এক দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনা সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া ইহার ফলে যাহা লব্ধ হইবে তাহা এক উচ্চতর অথচ অপূর্ণ মানস সিদ্ধিমাত্র হইতে পারে; নবাগত উচ্চতর উপাদান চেতনাকে গভীররূপে নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইলেও নিম্নতর মনন ক্রিয়াব প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে না, তাহাদ্বারা বিকৃত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে; হয়ত বৃহত্তর জ্ঞানের দীপ্তি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে, এক উচ্চতর ধরণের চেতনাও দেখা দিবে, কিন্তু তবু তাহাকে অবিদ্যার বিধান মানিতে হইবে, তাহার মধ্যে নিম্নতর ভাব ও জ্ঞান মিশ্রিত হইয়া পড়িবে, এবং যেমন প্রাণ ও জড়ের বিধানের বশে মনের শক্তি সীমিত হইয়া পড়ে এখানেও তেমনি সীমা ও সঙ্কোচ দেখা দিবে। খাঁটি রূপান্তরের জন্য উর্দ্ধশক্তিকে উপর হইতে অনাবৃত এবং সাক্ষাৎভাবে নিম্নতর সত্তার মধ্যে নামিয়া আসিতে হইবে; সেজন্য আরও এই চাই যে নিম্নতর চেতনা সম্পূর্ণরূপে নতি স্বীকার করিবে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে, তাহার সকল দাবি, সকল জেদ ছাড়িয়া দিবে, সে চেতনায় এমন এক ইচ্ছা এমন এক সঙ্কল্পের উদয় হওয়া চাই যাহাতে আমাদের প্রাকৃত সত্তার উপর তাহার সকল অধিকার বিসর্জন দিয়া রূপান্তরের প্রবাহে নিজের স্বতন্ত্রতার সকল বিধান সকল স্পৃহা ভাসাইয়া দিতে পারিবে। এমন কি এখনই আমাদের সচেতন আবাহন, আকূতি ও সংকল্পের ফলে যদি অবতরণ ও আত্মসমর্পণের এই যুগল বিধান আমাদের সত্তায় কার্য্যকরীভাবে দেখা দেয়, আমাদের অন্তর ও বহিঃস্থিত সমগ্র সত্তা যদি উর্দ্ধায়ণ ও রূপান্তরে পূর্ণরূপে সাড়া দেয় এবং সহযোগিতা করে, তাহা হইলে পরিণাম ধারাতে সচেতন ভাবে পরিবর্ত্তন দেখা দিতে থাকে এবং রূপান্তর অনেক দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়; উপর হইতে অতিমানসী চিৎশক্তি নামিয়া আসিয়া নিম্নে সত্তার আবরণে ঢাকা গোপন কক্ষ হইতে উর্দ্ধগামী চিৎশক্তির সহিত যদি মিলিত হয় এবং মনোময় মানুষের জাগ্রতজ্ঞান ও সংকল্পের উপর ক্রিয়া করে, তাহা হইলে তাহাদের সম্মিলিত শক্তিতে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর সিদ্ধ হইতে পারে। অতীতে পরিণাম ধারায় প্রত্যেক ধাপ অতিক্রম করিতে যে লক্ষ লক্ষ

যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, অবিদ্যাকবলিত অচেতন জীবের বেলায় প্রকৃতির বহু কৃচ্ছ্র সাধনায় পঙ্গুর মত টলিতে টলিতে পরিণাম অতি মন্থর গতিতে যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার আর প্রয়োজন থাকিবে না।

এই রূপান্তরের একটি প্রথম সর্ত্ত এই যে, যে মানুষ আজ মনোময় রহিয়াছে তাহাকে অন্তশ্চেতন হইয়া তাহার সত্তার গভীরতর বিধান এবং কর্ম্মধারা অধিকার করিয়া লইতে হইবে, তাহাকে আন্তর মনোময় চৈত্যপুরুষ হইয়া তাহার সকল শক্তির প্রভু হইতে, নিম্ন প্রকৃতির গতি ও প্রকৃতিকে জয় করিতে হইবে, তাহার দাস হইয়া থাকিলে চলিবে না, স্বাধীনভাবে প্রকৃতির উচ্চতর বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। পরিণাম তত্ত্ব এবং তাহার কর্ম্মধারার যুক্তিসঙ্গত ফল এই হইবে, ব্যষ্টি জীব নিজের কর্ম্ম ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে লাভ করিবে এবং প্রকৃতির সার্ব্বভৌম ক্রিয়ার অংশ ক্রমশঃ অধিকতর সচেতন ভাবে গ্রহণ করিবে—ইহাই হইবে তাহার সুস্পষ্ট স্বভাব বা প্রকৃতি। জগতের সকল ব্যাপার মন প্রাণ এবং জড়ের সকল ক্রিয়া বিশ্বশক্তিরই খেলা, বিশ্বপুরুষের এক চিন্ময়ী শক্তি ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত সমস্ত সত্যকে ক্রিয়ার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু এই সৃষ্টিশীলা চেতনা, জড়ের মধ্যে নিশ্চেতনার এক মুখোস পরিয়া বহির্বিশ্বে এক অন্ধ বিশ্বশক্তিরূপে, নিজে কি করিতেছে তাহা যেন না জানিয়া একটা পরিকল্পনার রূপ দিতেছে অথবা বস্তুরাজিকে সংহত এবং সুবিন্যস্ত করিতেছে—ইহাই যেন তাহার বাহ্য আকার; ইহাতে প্রথমে যে ফল বা যে পরিণাম দেখা দেয় তাহাও এই বাহ্য আকারের সমজাতীয়; তাই প্রাতিভাসিক জগতে প্রথমে দেখা দেয় ব্যষ্টি ভাবাপন্ন নিশ্চেতন জড়, তখন জীবসত্তার সৃষ্টি হয় নাই সৃষ্টি হইয়াছে জড় বস্তু সকল। এ সমস্ত বস্তুর প্রত্যেকের নিজস্ব গুণ ও নিজস্ব ধর্ম্ম, নিজস্ব শক্তি এবং নিজস্ব প্রকৃতি আছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রকৃতির পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলাবিধানের কাজ যান্ত্রিক ভাবে চলে, কোন ব্যষ্টি বস্তু সে ক্রিয়াধারা পরিচালনায় কোন অংশ গ্রহণ করে না, কোন কর্ম্ম আরম্ভ করে না অথবা কোন জ্ঞান বা সচেতনতা তাহাতে দেখা দেয় না; সমস্ত ব্যষ্টি বস্তু, প্রকৃতির ক্রিয়াধারার ও সৃষ্টিশক্তির আদি নির্ব্বাক পরিণাম এবং নিষ্প্রাণ ক্ষেত্র রূপেই শুধু স্ফুরিত হইয়া উঠে। পশু জগতে দেখি শক্তি বাহিরের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সচেতন হইয়া উঠিতেছে এবং যে রূপ গ্রহণ করিতেছে তাহা শুধু বস্তুর রূপ নয় পরন্তু তাহা ব্যষ্টি জীব

সত্তার রূপ ; কিন্তু অপূর্ণভাবে সচেতন এই ব্যষ্টিসত্তা যদিও সে ক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে, যদিও তাহার সংজ্ঞা ও বেদনা আছে, তথাপি তাহার মধ্যে শক্তির যে ক্রিয়া চলিতেছে তাহাকে সে অন্ধভাবে শুধু অনুসরণ করে, কি করা হইতেছে তাহার কোন স্পষ্ট অর্থ বা বোধ ফোটে না অথবা বুদ্ধির সহিত তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে না, তাহার গঠিত প্রকৃতিতে যে নির্ব্বাচন শক্তি এবং যে ইচ্ছা আরোপিত হইয়াছে তাহার বাহিরে তাহার নিজস্ব বলিয়া যেন কোন বৃত্তি নাই। মানুষের মধ্যেই প্রথম দেখা দেয় এমন এক বুদ্ধি যাহা পর্য্যবেক্ষণ করে, কি করা হইতেছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং তাহার মধ্যে সুস্পষ্ট সচেতন ভাবে নির্ব্বাচন ও সংকল্প করিবার শক্তি প্রকাশ পায় ; কিন্তু তাহার চেতনা তখনও সীমিত এবং বহিঃক্ষেত্রে আবদ্ধ ; তাহার জ্ঞানও সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ ; তাহার মধ্যে বুদ্ধির অর্দ্ধ প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাই তাহার বোঝা শুধু অর্দ্ধেক বোঝা, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া শুধু কিছু অনুভব কবা, যেটুকু বোঝে তাহাও প্রধানত শুধু পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা করিয়া বোঝা, বিজ্ঞানানুমোদিত ভাবে নহে ; অথবা যেটুকু বুদ্ধি দিয়া বোঝে বোধ হয় তাহা মনগড়া সিদ্ধান্ত বা সূত্র দিয়া শুধু উপরি উপরি বা ভাসাভাসা ভাবে বোঝা। এখনও মানুষের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় এমন দৃষ্টি ফোটে নাই যাহা বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে ধরিয়া জানিতে পারে, যাহা বস্তু-সকলকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত নির্ভুলতার সহিত দৃষ্ট সত্যঅনুসারে তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ সত্যের বিধানানুযায়ী ভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া তুলিতে পারে ; যদিও মানুষের মধ্যে সহজাত সংস্কার বোধি এবং অন্তর্দৃষ্টির কিছু উপাদান আছে যাহার মধ্যে এই শক্তির একটু আভাস বা আরম্ভ মাত্র দেখা দিয়াছে, তবুও মানুষের বুদ্ধির সাধারণ ধর্ম্ম এই যে তাহাতে অনুসন্ধানে উন্মুখ যুক্তি বা বিচারশীল মননতা আছে ; তাহা পর্য্যবেক্ষণ করে কিছু মানিয়া লয় কিছু অনুমান করে, কোন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে, বহুকষ্টে সত্যের একটা কাঠামো দাঁড় করায়, জ্ঞানের একটা পরিকল্পনা গড়িয়া তোলে, নিজের গড়া কর্ম্মধারাকে সুচিন্তিতভাবে সাজাইয়া রাখে। অথবা বরং বলিতে পারি ইহাই সে সাধন করিতে চায় এবং অংশতঃ মাত্র সফলকাম হয় ; কেননা আধারের যে সব শক্তি প্রকৃতির যান্ত্রিক বিধানের অর্দ্ধ অন্ধ অনুচর তাহারা আসিয়া তাহার জ্ঞান ও সঙ্কল্পকে সর্ব্বদা আক্রমণ করে, অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে বা সঙ্কল্প ও সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।

কিন্তু স্পষ্টতঃ ইহা মানুষের চেতনার সামর্থ্যের চরমসীমা তাহার শেষ পরি-ণাম বা তাহার উচ্চতম চূড়া নয়। তাহার মধ্যে বৃহত্তর এবং অধিকতর অন্তরঙ্গ

এক বোধির উন্মেষ অবশ্যই হওয়া সম্ভব যাহা বস্তুর মর্ম্মমূলে প্রবেশ করিতে এবং প্রকৃতির গতি ও প্রবৃত্তির সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ভাবে এক হইতে পারিবে, নিজের জীবনকে স্পষ্টভাবে শাসিত করিবে অথবা অন্ততপক্ষে তাহার নিজের বিশ্বের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপিত করিতে সমর্থ হইবে। কেবলমাত্র এক মুক্ত ও পরিপূর্ণ বোধিচেতনা, সাক্ষাৎ সংস্পর্শ এবং মর্ম্মাবগাহী দিব্যদৃষ্টি অথবা ভিত্তি রূপে স্থিত অন্তর্গূঢ় একত্ব বা অদ্বৈত ভাবনাজাত স্বতঃস্ফূর্ত্ত সত্যবোধদ্বারা বস্তুকে খাঁটিভাবে দেখিতে এবং মুঠার মধ্যে ধরিতে এবং প্রকৃতির সত্য অনুসারে তাহার কার্য্যধারার এক সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবে। ইহা হইবে ব্যষ্টি জীবচেতনার পক্ষে চিৎশক্তির বিশ্বলীলায় খাঁটিভাবে অংশগ্রহণ; ব্যষ্টিপুরুষ যেমন নিজের কার্য্যকরী শক্তির বা নিজপ্রকৃতির প্রভু হইবে তেমনি একই সঙ্গে বিশ্বশক্তির খেলায় সে হইবে বিশ্বপুরুষের সচেতন সহকারী, প্রতিনিধি বা যন্ত্র; বিশ্বশক্তি তাহার মধ্য দিয়া কর্ম্ম করিবে সেও তেমনি বিশ্বশক্তির মধ্য দিয়া কর্ম্ম করিবে এবং বোধিচেতনার সত্য ও সৌষম্য এই উভয় ক্রিয়াকে এক অখণ্ড কর্ম্মে পর্য্যবসিত করিবে। আমাদের সত্তা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে পরাপ্রকৃতির ভূমিতে উত্তীর্ণ হইবার সময় উচ্চচেতনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও সচেতনভাবের এই সহযোগিতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

এ জগতের পরপারে এমন এক সুষমাময় জগতের কল্পনা করা যাইতে পারে, যেখানে বোধির আলোকে দীপ্ত এই প্রকারের মনোময় বুদ্ধি শাসনভার পাইয়াছে; কিন্তু পরিণাম পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য এবং অতীত ইতি-হাস তাহার অনুকূল নয় বলিয়া আমাদের এই মর্ত্ত্যভূমিতে সেরূপ বিধান এবং কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা অতি কঠিন, এখানে এভাবের পূর্ণ এবং চরম সুনিশ্চিত প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা একরূপ নাই বলিলেই চলে। কেননা মন প্রাণ ও জড়ের মিশ্রিত চেতনার মধ্যে বোধিবিভাবিত মনন আসিয়া পড়িলে তাহাও, সাধারণতঃ চেতনার যে সকল নিম্নতম উপাদান পরিণাম বশে পূর্ব্বে স্ফুরিত হইয়াছে স্বভাবত তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইবে; নিম্নতর চেতনার উপর ক্রিয়া করিতে গিয়া এ চেতনাকে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, প্রবিষ্ট হইলে তাহার সহিত জড়ীভূত হইয়া পড়িবে এবং তাহাকেও নিজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে দিতে হইবে, তখন এ চেতনাও আমাদের ভেদ-দর্শী এবং খণ্ডধর্ম্মী মনের এবং অবিদ্যা শক্তির সীমা ও সঙ্কোচের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া থাকিতে পারিবেনা। বোধিবিভাবিত বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ ও দীপ্তিমন্ত

যে তাহা ঘনীভূত অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনার মধ্যে প্রবেশ করিতে এবং তাহা-দিগকে প্রভাবিত করিতে পারে কিন্তু তাহার মধ্যে এমন বিপুলতা ও অখণ্ডতার বীর্য্য নাই যাহার বলে সে অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনাকে গিলিয়া খাইতে কি মুছিয়া ফেলিতে পারে ; সমগ্র চেতনাকে নিজের উপাদান এবং শক্তিতে রূপান্তরিত করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। তথাপি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতেও সে চেতনা একভাবে আমাদের কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিতেছে ; আমাদের সাধারণ বুদ্ধি এতদূর জাগ্রত হইয়াছে যে বিশ্বের চেতনশক্তি তাহার মধ্যদিয়া ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার ফলে বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি অন্তরের এবং বাহিরের পবিবেশের উপর কতকটা কর্তৃত্ব স্থাপিত করিতে পারিয়াছে যদিও এখনও অনেক কাজ আনাড়ির মত চলিতেছে, পদে পদে ভুল ভ্রান্তি দেখা দিতেছে, ক্রিয়া ও শক্তি এখনও সীমিত এবং কুণ্ঠাগ্রস্ত রহিয়াছে, প্রকৃতির বিশাল ও অখণ্ড ক্রিয়াধারার সহিত এখনও সুব মিলান হয় নাই। পরাপ্রকৃতির দিকে যে পরিণামধারা চলিয়াছে, তাহাতে সচেতনভাবে বিশ্বক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ফলে ব্যষ্টিচেতনার প্রসারতা ঘটিতে থাকিবে এবং ব্যষ্টিপুরুষের নিজের মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতির ক্রিয়াধারা কিভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ইহা আরও অধিকতররূপে এবং অন্তরঙ্গভাবে দিব্যদৃষ্টি সহায়ে জানিতে এবং বিশ্বপ্রকৃতি কোন পথে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে ; আরও দ্রুত এবং সচেতনভাবে আত্মপরিণামের জন্য সাধনার কোন্-ধারা অবলম্বন করিতে হইবে ক্রমশঃ বেশী করিয়া তাহা উপলব্ধি করিতে বা বোধিজ্ঞানে জানিতে পারিবে। অন্তরস্থ চৈত্যপুরুষ বা গোপনে অবস্থিত মনোময় পুরুষ যতই তাহার জীবনের সম্মুখভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে থাকিবে ততই তাহার নির্ব্বাচন করিবার এবং প্রকৃতির কার্য্যের অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়ার শক্তিবৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছা দেখা দিতে এবং তাহা ক্রমশঃ শক্তিশালী ও কার্য্যকরী হইতে থাকিবে। কিন্তু এই স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি প্রধানতঃ তাহার নিজপ্রকৃতিব ক্রিয়াধারার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইবে ; ইহার অর্থ এই হইবে যে তাহার নিজসত্তার গতি ও প্রবৃত্তির উপর আরও পূর্ণতর-রূপে আরও সজ্ঞানে আবও স্বাধীন ও সাক্ষাৎভাবে প্রভুত্বস্থাপন করা সম্ভব হইবে ; কিন্তু তখনও প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের সৃষ্টির জালে সে নিজে আবদ্ধ থাকিবে অথবা প্রাচীন এবং নবীন চেতনার মিশ্রণের জন্য অপূর্ণতার দ্বারা আক্রান্ত হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এরূপভাবে স্বাধীন ও পূর্ণ হইতে পারিবে

না। তথাপি তখন সাধকের মধ্যে জ্ঞান এবং কর্তৃত্বের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ঊর্দ্ধ্বসত্তা এবং পরাপ্রকৃতির দিকে একটা উন্মীলন দেখা দিবে।

কিন্তু তাহার স্বাধীন ইচ্ছার ধারণার উপর অত্যধিক ব্যষ্টিভাব এবং স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির একটা ছাপ আসিয়া পড়িতে পারে ; তখন তাহা এমন এক স্বতন্ত্র ইচ্ছার মূর্ত্তি ধরিতে পারে যাহা শুধু বিবিক্ত অহংএর কথাই হিসাবের মধ্যে আনে, মনে করে যে সে ইচ্ছা নিজের স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচন করিবার এক শক্তি, অপরের সহিত সম্বন্ধরহিত গতিধারা মাত্র, অন্য কোন কিছুর দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় না, মনে হয় ইহাই বুঝি পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু এ ধারণা এই কথা ভুলিয়া যায় যে আমাদের প্রকৃত সত্তা বিশ্বপ্রকৃতিরই এক অংশ এবং পরম বিশ্বাতীত সত্তার দ্বারাই আমাদেব চিন্ময় সত্তার অস্তিত্ব বজায় আছে ; আমাদের সমগ্র সত্তা বর্ত্তমান অপরাপ্রকৃতির অধীনতা হইতে কেবল তখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে যখন বৃহত্তর এক সত্য ও প্রকৃতির সহিত নিজেকে সে এক করিয়া দেখিতে শেখে। ব্যষ্টিজীবের ইচ্ছাশক্তি যখন পূর্ণ স্বতন্ত্র তখনও অপরের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া পূর্ণ স্বাধীনভাবে সে ক্রিয়া করিতে পারে না ; কেননা ব্যষ্টিসত্তা ও তাহার প্রকৃতি বিশ্বপুরুষ ও তাহার প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত এবং সর্ব্বশাসক বিশ্বাতীত পুরুষের অধীন। অধিরোহণের পথে বস্তুতঃ দুইটি ধারা দেখা দিতে পারে। একটি ধারায় জীবসত্তা নিজের নৈর্ব্ব্যক্তিক কূটস্থ সত্যের সহিত যুক্ত হইয়া নিজেকে স্বয়ম্ভূ স্বাধীন সত্তা বলিয়া বোধ করিতে এবং তদনুরূপভাবে আচরণ করিতে পারে ; এই ভাবের স্বানুভব লইয়া তাহার কর্ম্মে বিপুল শক্তি ফুটাইয়া তুলিতে পারে কিন্তু তথাপি প্রকৃতির শক্তি লইয়া অতীত ও বর্ত্তমানে তাহার যত আত্মরূপায়ণ হইয়াছে বা আছে, তাহাদিগকে লইয়া যে বৃহত্তর কুণ্ডলী বা কাঠামো গঠিত হইয়াছে তাহারই মধ্যে থাকিয়া এ ক্রিয়া চলিবে ; অথবা তাহা না হইলে, তাহার ব্যষ্টি বিগ্রহের মধ্য দিয়া বিশ্বশক্তি বা পরমাশক্তিই ক্রিয়া সাধিত করিতেছে, সুতরাং তাহার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কোন ক্রিয়াধারা প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই, সেখানে এক পরম নৈর্ব্ব্যক্তিক বিশ্বগত ইচ্ছা ও শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে ইহাই অনুভূত হইবে, ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার কোন বোধ ফুটিবে না। দ্বিতীয় ধারায় জীবসত্তা নিজেকে এক চিন্ময় যন্ত্ররূপে দেখিবে পরমপুরুষেরই শক্তিরূপে ক্রিয়া করিবে ; নিজের সত্য এবং নিজ আত্মাব বিধান এবং নিজের মধ্যস্থিত ইচ্ছা ছাড়া যাহার আর কোন সীমা কোন বাধা নাই সেই পরাপ্রকৃতির আত্মশক্তির দ্বারা শুধু সে

ক্রিয়া সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। কিন্তু উভয় ধারায় প্রকৃতির শক্তির যান্ত্রিক ক্রিয়ার অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের উপায় এক বৃহত্তর অধ্যাত্ম শক্তির বশ্যতা স্বীকার করা, অথবা নিজের জীবনে বা বিশ্বলীলায় সেই শক্তির অভিপ্রায় গতি ও প্রকৃতির সহিত ব্যষ্টিসত্তার স্বেচ্ছায় এক হইয়া চলা।

চেতনার উর্দ্ধ্বলোকে উত্তীর্ণ হইলে সত্তায় যে নূতন শক্তির প্রকাশ হয়, তাহার ক্রিয়া বাহ্যপ্রকৃতির প্রশাসনের বেলায়ও যে বিস্ময়কর সফলতা লাভ করিতে পারে তাহার একমাত্র কারণ এই যে তখন চিন্ময় দৃষ্টির আলোক লাভ হয় এবং তাহার ফলে বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত দিব্য ইচ্ছাশক্তির সহিত সামঞ্জস্য বা তাদাত্ম্য স্থাপিত হয়; কেননা জীব যখন নিম্নতর শক্তির অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া উচ্চতর শক্তির যন্ত্র বা বাহন হইয়া দাঁড়ায় তখন তাহার ইচ্ছা বিশ্বগত মনঃশক্তি, প্রাণশক্তি এবং জড়শক্তির যান্ত্রিক ক্রিয়া বা পদ্ধতি দ্বারা আর নিয়ন্ত্রিত হয় না, অজ্ঞানান্ধ হইয়া অপরা প্রকৃতির প্রশাসন আর তাহাকে মানিয়া চলিতে হয় না। তখন হয়তো নূতন কিছু প্রবর্ত্তনা করিবার বীর্য্য, এমন কি বিশ্বশক্তির উপর তাহার ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করিবার শক্তিলাভও সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এ নূতন প্রবর্ত্তনাব সে শুধু যন্ত্র বা বাহন, এ তত্ত্বাবধান শুধু প্রতিনিধিরূপে; ব্যক্তির নির্ব্বাচন তখন অনন্তের অনুমোদন লাভ করে কেননা তাহাতে অনন্তের কোন সত্যের প্রকাশ হইতেছে। এমনি ভাবে যে অনুপাতে সে নিজেকে বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত পুরুষ-প্রকৃতির এক প্রকাশকেন্দ্র এবং রূপায়ণ বলিয়া উপলব্ধি করিতে থাকে সেই পরিমাণে ব্যষ্টিসত্তা শক্তিশালী এবং সার্থক হইয়া উঠে, কেননা রূপান্তরের পথে যতই সে অগ্রসর হইতে থাকে ততই সে দেখিতে পায় যে মুক্ত ব্যষ্টিচেতনার শক্তি, যাহা লইয়া সে সাধনা আরম্ভ করিয়াছিল সেই দেহমনপ্রাণের সীমিত শক্তিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; তখন তাহার সত্তা চেতনার এক বৃহত্তর আলোকের এবং শক্তির এক বৃহত্তর ক্রিয়ার মধ্যে উন্মিষিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছে, সেই সঙ্গে সেই আলোক এবং শক্তি তাহার মধ্যে স্ফুরিত হইয়াছে তাহার সত্তায় নামিয়া আসিয়াছে এবং তাহাকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে; তখন তাহার প্রাকৃত জীবন এক অধিমানসী এবং অতিমানসী চিৎশক্তিব বা আদ্যা ভাগবতী শক্তির যন্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। তখন সাধকের এই উপলব্ধি হয় যে পরিণামের সকল ধারা এক পরা বিশ্বচেতনা পরমা এক বিশ্বশক্তির ক্রিয়া বা খেলা; বিশ্বাতীত এবং বিশ্বপুরুষই আপন

নির্ব্বাচিত পন্থায় আপন ইচ্ছা মত চেতনার যে কোন ভূমিতে নিজের দ্বারা আরোপিত যে কোন সীমার বন্ধন নিজে স্বীকার করিয়া লইয়া সচেতন ভাবে এই খেলা খেলিতেছেন, এই খেলার মধ্য দিয়া সর্ব্বশক্তিমতী এবং সর্ব্বজ্ঞা জগজ্জননী জীবকে নিজের বুকে টানিয়া লইয়া নিজের পরাপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছেন। ব্যষ্টি চেতনাকে চারিদিকে ঘেরা ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিয়া ব্যষ্টি সত্তাকে তাহার অচেতন বা অর্দ্ধচেতন যন্ত্র বা বাহন করিয়া অবিদ্যা-ময়ী যে প্রকৃতির খেলা চলিতেছিল তাহার স্থানে দিব্য অতিমানস পুরুষের ও পরমাপ্রকৃতির দিব্য প্রকাশ লীলা দেখা দিবে ; ব্যষ্টি জীবাত্মা তাহার সচেতন, উন্মুক্ত, নির্ম্মুক্ত ক্ষেত্র এবং যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে ; জীবাত্মা দিব্য প্রকৃতির খেলায় অংশ গ্রহণ করিবে তাহার উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়াধারার জ্ঞান তাহাতে জাগিবে, সে তাহার নিজেরই বৃহত্তর আত্মা বিশ্বময় এবং বিশ্বাতীত সত্য বস্তুকে উপলব্ধি করিবে, আবার পরমচেতনার সহিত নিজে অন্তহীনরূপে এক হইলেও তাহার ব্যষ্টিরূপ থাকিবে, তাহার ব্যষ্টিসত্তাকে সেই পরম সত্তারই এক রূপ এক যন্ত্র এক চিন্ময়কেন্দ্ররূপে দেখিবে।

পরাপ্রকৃতির ক্রিয়ায় জীবচেতনার এই অংশগ্রহণ করা বা ভগবানের লীলা-সহচর হওয়াতেই সর্ব্বশেষ অতিমানস রূপান্তরের সূচনা হয় ; কেননা অন্ধকারময় এক সামঞ্জস্য এবং অন্ধ অচেতন যন্ত্রলীলা হইতে প্রকৃতি, পরিণামের পথে চিৎপুরুষের জ্যোতির্ম্ময় স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশের, স্বয়ম্ভূ সত্যের অভ্রান্ত গতি ও ক্রিয়ার দিকে যে যাত্রারম্ভ করিয়াছিল এই রূপান্তরের ফলে সে যাত্রা শেষ হইবে, চরম সার্থকতা লাভ করিবে। পরিণামধারা জড় ও নিম্নতর প্রাণের যান্ত্রিকতা লইয়া আরম্ভ হয় তখন সবকিছু অবিচলিতভাবে প্রকৃতির চালনা মানিয়া চলে, তাহার সত্তার বিধান যন্ত্রের মতই পূর্ণ করে এবং তাই জীবন ও ক্রিয়ার মধ্যে সীমিত ধরণের এক সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে সমর্থ হয় ; তাহার পর অর্থপূর্ণ দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলতায় ভরা মানুষের প্রাণ ও মনের মধ্য দিয়া সে ধারা অগ্রসর হয় তখনও তাহা এই নিম্নতর প্রকৃতির দ্বারাই চালিত হয় কিন্তু তাহার সীমা ও সঙ্কোচ অতিক্রম করিবার তাহাকে নিজবশে আনিবার, পরিচালনা ও ব্যবহার করিবার জন্য নিয়ত সংগ্রামে নিরত থাকে ; অবশেষে সে ধারা এমন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে যেখানে চিন্ময় সত্যে প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর এক স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত সুষমা ও সামঞ্জস্য এবং নিজেকে নিজে সার্থক ও পূর্ণ করিয়া তুলিতে সমর্থ স্বয়ংক্রিয় কর্ম্মধারা নিত্যবিরাজিত। এই উচ্চতর অবস্থায় চেতনা

সে সত্যকে দেখিতে পাইবে এবং পূর্ণজ্ঞানের সহিত সত্যের শক্তির ধারা অনুসরণ করিবে, সে শক্তির ক্রিয়ায় বিপলভাবে অংশগ্রহণ এবং তাহার যন্ত্র হইয়াই প্রভুত্বলাভ করিবে, কর্ম্মে এবং জীবনে পরমানন্দময় হইয়া উঠিবে। আজ তাহার ব্যষ্টিসত্তা অন্ধভাবে বিশ্বশক্তির অধীনতা মানিয়া চলিতে বাধ্য হইতেছে তখন তাহা দূর হইবে, তাহার স্থলে জ্যোতির্ম্ময় আনন্দাপ্লুত সর্ব্বাত্মভাবের এক পূর্ণতা দেখা দিবে এবং প্রতিমুহূর্ত্তে ব্যষ্টির মধ্যে বিশ্বের এবং বিশ্বের মধ্যে ব্যষ্টির ক্রিয়াধারা বিশ্বাতীতা পরাপ্রকৃতির বিধান দ্বারা আলোকিত ও পরিচালিত হইবে।

কিন্তু এই পরমাসিদ্ধিলাভ অতি দুরূহ এবং স্পষ্টই বোঝা যায় তাহার জন্য বহুকালব্যাপী সাধনার প্রয়োজন; কারণ শুধু পুরুষ সম্মতি দিলে এবং অংশগ্রহণ করিলেই এই রূপান্তর সাধিত হইবে না তাহার জন্য প্রকৃতির অনুমোদন এবং কার্য্যে অংশগ্রহণও চাই। কেবলমাত্র কেন্দ্রগত ভাবনা এবং সঙ্কল্প, সম্মতি দিলেই চলিবে না কিন্তু আমাদের সত্তার প্রতিটি অংশকে সম্মতি দিতে এবং চিন্ময় সত্যের বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে; সত্তার সকল অঙ্গ সকল অংশকেই সচেতন দিব্যশক্তির পরিচালনা অকুণ্ঠিতভাবে মানিয়া চলিতে শিখিতে হইবে। প্রগতির পথে পরিণামেব ধারা হইতেই আমাদের সত্তার বহু দুর্দ্দমনীয় বাধা ও বিপত্তি জাত হইয়াছে যাহারা রূপান্তরে সম্মতি দিবার প্রতিকূল হইয়া সংগ্রাম করে। কেননা সত্তার কোন কোন অংশ এখনও নিশ্চেতনা এবং অবচেতনার অধীন, মূঢ় অভ্যাসের সংস্কারে আচ্ছন্ন অথবা প্রকৃতির তথাকথিত বিধানে বাঁধা রহিয়াছে; যান্ত্রিক অভ্যাস আছে প্রাকৃত মানুষের মনে, প্রাণে, সহজাত বৃত্তিতে, ব্যক্তিসত্তায়, চরিত্রে; তাহার প্রাকৃত দেহমন প্রাণের মধ্যে মজ্জাগত হইয়া আছে নানা অভাববোধ, নানা আবেগ, আছে জান্তব কত কামনা বাসনা, পুরাতন কত বৃত্তি ও ক্রিয়াধারা —এই সমস্তের মূলসকল এত গভীরে প্রবেশ করিয়াছে যেন মনে হয় তাহাদিগকে উৎপাটিত করিতে গেলে আমাদিগকে খুঁড়িতে খুঁড়িতে নিশ্চেতনার পাতাল পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হইবে; সত্তার এই সকল অংশ নিশ্চেতনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, নিম্নতর বিধানে সাড়া দিতে বিরত হওয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে চায় না; ইহারা আমাদের সচেতন মন ও প্রাণে অহরহ পুরাতন সংস্কার সকল জাগাইয়া তুলিতে এবং প্রকৃতির শাশ্বত বিধান বলিয়া তাহাদিগকে আমাদের সত্তায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। অবশ্য আধারের অন্য অংশ সকল

আছে যাহারা তেমনভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, যান্ত্রিক নিশ্চেতনার দ্বারা কবলিত নয় কিন্তু সকল অংশই অপূর্ণ এবং অপূর্ণতায় আসক্ত বা অভিনিবিষ্ট, তাহাদের মধ্যেও এমন সকল প্রতিক্রিয়া এবং সংস্কার আছে যাহা কিছুতেই যাইতে চাহে না ; প্রাণ যেন আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং কামনার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ আছে ; মন তাহার নিজের গড়া গতি প্রবৃত্তিতে আসক্ত এবং উভয়েই অবিদ্যার নিম্নতর বিধান ইচ্ছাপূর্ব্বকই মানিয়া চলিতে চায়। অথচ তাহাদিগকে রূপান্তর কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিতে এবং আত্মসমর্পণ করিতেই হইবে ; পরিণামের পর্ব্ব হইতে পর্ব্বান্তর প্রাপ্তির সময় প্রতি সোপানে পুরুষের সম্মতি যেমন চাই তেমনি পরিবর্ত্তনের জন্য প্রকৃতির প্রত্যেক অংশকে উচ্চতর শক্তির ক্রিয়াতে সম্মতি দিতে হইবে। এই রূপান্তরের জন্য, প্রাকৃত প্রকৃতির স্থানে পরাপ্রকৃতিকে এইভাবে স্থাপন করিবার জন্য, এইরূপে নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য মনোময় পুরুষকে সচেতনভাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সেদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে এবং নিজেকে পরিচালিত করিতে হইবে। আরও চাই চিদ্বস্তুর উচ্চতব সত্যকে সজ্ঞানে অনুবর্ত্তন ও অনুসরণ, পরাপ্রকৃতি হইতে উৎসারিত জ্যোতি এবং শক্তির নিকট সমগ্র সত্তার নিঃশেষে আত্মসমর্পণ ; ধীবে ধীরে বহু বাধা অতিক্রম করিয়া এই দুরূহ সাধনার পথে জীবসত্তাকে অগ্রসর হইতেই হইবে, এই দ্বিতীয় সর্ত্ত পালন না করিলে অতিমানস রূপান্তর কোন-মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

ইহা হইতে বুঝা যায় চৈত্ত্যিক এবং আধ্যাত্মিক রূপান্তর অনেকটা অগ্রসর না হইলে, এমন কি যতটা পূর্ণ হইতে পারে তাহা না হইলে তৃতীয় এবং চরম এই অতিমানস রূপান্তরের সূচনাই হইতে পারে না ; কেননা কেবলমাত্র এই দুইটি রূপান্তরের ফলেই অবিদ্যার হঠকারিতার পক্ষে অনন্তের বৃহত্তর চেতনার পুনর্গঠনসমর্থ সত্য ও ইচ্ছাশক্তির নিকট আধ্যাত্মিক বশ্যতা স্বীকার সম্ভব হইতে পারে। ব্যক্তিসত্তার পক্ষে ঐকান্তিক সঙ্কল্প লইয়া কঠোর ও কষ্ট-সাধ্য নিরন্তর সাধনা ও একাগ্র তপস্যা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া করিয়া না গেলে সাধারণতঃ সেই অধিকতর নিশ্চিত অবস্থা আসে না যাহাতে পরমপুরুষ ও পরাপ্রকৃতির কাছে পূর্ণভাবে চরমরূপে সমগ্রসত্তার পূর্ণ আত্মসমর্পণ সহজ এবং স্বাভাবিক হয়। সাধনার প্রথম পর্ব্বে চাই পরমপুরুষের কাছে হৃদয়, অন্তরাত্মা এবং মনকে কেন্দ্রগতভাবে সমর্পণ করিয়া আকূতিভরা চেষ্টা ও সাধনা ; মধ্য পর্ব্বে সাধকের ব্যক্তিগত সাধনার সহায়তার জন্য পরমপুরুষের যে বৃহত্তর

শক্তির অবতরণ ঘটে তাহারই উপর সমগ্র ও সচেতনভাবে নির্ভরতা স্থাপিত করিতে হয় ; অবশেষে সেই সর্ব্বাঙ্গীণ নির্ভরতা বৃদ্ধি পাইয়া প্রকৃতিস্থ উচচতর সত্যের ক্রিয়াধারার হাতে সাধকের সকল অঙ্গের ও সকল অংশের, সকল ক্রিয়ার পূর্ণ ও ঐকান্তিক আত্মসমর্পণে পরিণত হওয়া চাই। এই ঐকান্তিক সমর্পণ পূর্ণাঙ্গ কেবল তখনই হইতে পারে যখন চৈত্যিক রূপান্তর পূর্ণ হইয়াছে এবং আধ্যাত্মিক রূপান্তর অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। কেননা ইহার অর্থ এই যে মনকে তাহার সমগ্র সংস্কার, সমস্ত ধারণা, সমস্ত মনোময় রূপায়ণ, সমস্ত মতামত, বুদ্ধির পর্য্য-বেক্ষণ এবং বিচার করিবার সমস্ত অভ্যাস বিসর্জন দিয়া তাহাদের স্থানে প্রথমে বসাইতে হইবে বোধিচেতনার এবং তাহার পর অধিমানসের বা অতিমানসের ক্রিয়াধারা ; তাহার ফলে সাক্ষাৎ সত্যচেতনা, সত্যদৃষ্টি, সত্যবিবেকের ক্রিয়া আরম্ভ হইবে, এমন এক নূতন চেতনার উন্মেষ হইবে যাহা সর্ব্বাংশেই আমাদের বর্ত্তমান মনোময় চেতনা হইতে অন্যবিধ। ঠিক তেমনিভাবে প্রাণকে ছাড়িতে হইবে তাহার চিরপোষিত সকল বাসনা, সকল সংবেদন, আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাস, গতানুগতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিযাব সকল প্রবেগ, ইন্দ্রিয়বোধের সকল ধাবা ; তাহাদের স্থানে বসাইতে হইবে নিষ্কাম, নির্ম্মুক্ত অথচ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণকাবী জ্যোতির্ম্ময় এক সংবেগ যাহা জ্ঞান শক্তি ও আনন্দের সার্ব্ব-ভৌম এবং নৈর্ব্ব্যক্তিক অথচ কেন্দ্রীভূত এক শক্তি ; প্রাণ চেতনাই হইবে সে-শক্তির এক যন্ত্র এবং দিব্যপ্রকাশ কিন্তু এই শক্তির একটু আভাসও আমাদের মধ্যে ফুটে নাই অথবা তাহার মধ্যে বৃহত্তর আনন্দ এবং পূর্ণতালাভের উপযোগী যে সামর্থ্য আছে তাহার কোন বোধও জাগে নাই। আবার আমাদের দৈহিক অংশকেও ত্যাগ করিতে হইবে তাহার সকল সহজাত বৃত্তি, অভাববোধ, অন্ধ গতানুগতিক আসক্তি, প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট খাতে চলা, জড়াতীতের প্রতি তাহার সংশয় ও অবিশ্বাস, জড়াশ্রয়ী দেহমন প্রাণের নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াধারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না এ বিশ্বাস ; এই ত্যাগের ফলে ইহাদের স্থানে এক নূতন শক্তির আবির্ভাব ঘটিবে, যাহা জড়ের রূপে এবং শক্তিতে নিজের বৃহত্তর বিধান এবং ক্রিয়াধারা প্রতিষ্ঠিত করিবে। এমন কি নিশ্চেতনা এবং অবচেতনাকেও আমাদের কাছে সচেতন হইতে হইবে ; তাহারাও উত্তর জ্যোতি গ্রহণের শক্তিলাভ করিবে, জীবকে পূর্ণ ও সার্থক করিবার জন্য চিৎশক্তির যে ক্রিয়া চলিতেছে তাহাতে আর তাহারা বাধা সৃষ্টি করিবে না, দিনে দিনে তাহারা চিৎপুরুষেরই আধার ও নিম্নতর ভূমিতে তাহার পাদপীঠ হইয়া উঠিবে। কিন্তু

যতদিন মনোময়, প্রাণময় কিংবা অন্নময় চেতনার নেতৃত্ব বা আধিপত্য অব্যাহত থাকিবে ততদিন এ সমস্ত সিদ্ধি আসিবে না। অন্তরাত্মা এবং অন্তঃসত্তার পূর্ণ উন্মেষের পর আধারে চৈত্যিক এবং আধ্যাত্মিক সঙ্কল্পের আধিপত্য-স্থাপনেব দ্বারা, তাহাদের আলোক এবং শক্তি দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের সত্তাব সকল অংশে ক্রিয়া করিলে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি চৈত্যিক এবং আধ্যাত্মিক ছাঁচে ঢালা হইয়া গেলেই এরূপ রূপান্তর শুধু সম্ভব হইতে পারে।

অতিমানস রূপান্তরের জন্য আর একটা অবস্থালাভ অপরিহার্য্য ; তাহা হইল আমাদের অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যে দেওয়াল আছে তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া বহিঃসত্তার সহিত অন্তর-সত্তার যোগসাধন এবং চেতনার কেন্দ্র বাহির হইতে সরাইয়া লইয়া অন্তরাত্মায় স্থাপিত ও তথায় চেতনাকে ঘনীভূত এবং এই নূতন ভিত্তিতে দৃঢ় করা, অন্তরাত্মা হইতে তাহাব সঙ্কল্প এবং অন্তর্দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণানুসারে সমস্ত কর্ম্ম করিবার অভ্যাস লাভ করা এবং ব্যষ্টিচেতনাকে বিশ্বচেতনার দিকে উন্মীলিত করিয়া ধরা। যতই অধ্যাত্মমুখী হউক না কেন আমাদের বহিশ্চর মন, হৃদয় এবং জীবনের ক্ষুদ্র রূপায়ণের মধ্যে ঋতচিতের পরম আবির্ভাব ঘটিবে ইহা আশা করা অলীক কল্পনামাত্র। ভিতরের সকল কেন্দ্র বা চক্র-গুলিকে উন্মীলিত হইতে এবং তাহাদের সামর্থ্যকে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতে হইবে, চৈত্যসত্তাকে সম্পূর্ণরূপে আবরণ হইতে মুক্ত হইতে এবং সমগ্রসত্তার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণ চেতনার স্থানে এই বৃহত্তর অন্তরচেতনা বা যৌগিক চেতনার সত্তাকে প্রতিষ্ঠা-করা-রূপ এই প্রাথমিক রূপান্তর না হইলে বৃহত্তর রূপান্তর অসম্ভব। শুধু তাহাই নয়, সাধকের ব্যষ্টিভাবনাকে বিশ্বাত্মভাবনায় পৌঁছিতে হইবে, তাহাব ব্যষ্টিমনকে বিশ্বমনের অসীমতার ছাঁচে ঢালিতে হইবে, তাহার ব্যষ্টি-প্রাণকে প্রসারিত এবং উদ্দীপিত কবিয়া তাহাতে বিশ্বপ্রাণের সক্রিয়গতি ও প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ অনুভূতি এবং অপরোক্ষবোধ ফুটাইতে হইবে, তাহার দেহের সহিত বিশ্বপ্রকৃতির শক্তিসকলের যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে ; এই সমস্ত সিদ্ধিলাভ না হইলে যে রূপান্তরে সে তাহার বর্ত্তমান বিশ্বগত রূপায়ণকে অতিক্রম করিয়া এবং বিশ্বভাবের নিম্নতর গোলার্দ্ধ পার হইয়া চিন্ময়ভূমির উচ্চতর গোলার্দ্ধে পরাচেতনায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে সে রূপান্তর-সিদ্ধি সম্ভব হইতে পারে না। তাহা ছাড়া আজ যাহা তাহার কাছে অতিচেতন রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে তাহাকে পূর্ব্বেই সচেতন হইতে হইবে, তাহাকে এমন এক সত্তায় পরিণত হইতে হইবে যাহা চিন্ময় জ্যোতি, শক্তি,

জ্ঞান ও আনন্দের বিষয়ে সচেতন হইয়াছে, এ সমস্ত দিব্যভাবের ধারা নামিয়া আসিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে এক আধ্যাত্মিক রূপান্তর আনয়ন করিয়াছে। চৈত্যিক রূপান্তর পূর্ণ বা অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেও আধ্যাত্মিক উন্মীলন এবং তাহার প্রগতি অগ্রসর হইতে পারে ; কেননা উপরিস্থ আধ্যাত্মিক প্রভাব চৈত্যিক রূপান্তরের সাহায্য করিতে তাহাকে জাগাইতে ও পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে ; তাহার জন্য শুধু চাই উত্তরভূমি হইতে অধ্যাত্মবীর্য্যকে নামাইয়া আনিবার জন্য চৈত্যসত্তায় একটা যথোপযুক্ত আকূতি ও চাপ। কিন্তু তৃতীয় বা অতিমানস রূপান্তরেব বেলায় অকালে উচ্চতম এই উত্তর-জ্যোতি নামিয়া আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই ; কেননা এ রূপান্তর কেবল তখনই সুরু হইতে পারে যখন অতিমানস শক্তি সাক্ষাৎভাবে কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু আধার প্রস্তুত না হইলে সে শক্তি কাজ আরম্ভ করে না। কেননা এই পরমাশক্তি এবং প্রাকৃত প্রকৃতির সামর্থ্যের মধ্যে তফাৎ এত বেশী যে নিম্নতর প্রকৃতি তাহাকে ধারণ করিতে বা ধারণ করিলেও সে শক্তি গ্রহণ করিয়া তাহাতে সাড়া দিতে পারে না, গ্রহণ করিলেও তাহাকে জীর্ণ কবিতে সে সমর্থ হয় না। তাই আধার প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত অতিমানস শক্তিকে পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করিতে হয় তখন ইহা মধ্যবর্ত্তী স্থানগত অধিমানস বা বোধিচেতনার মাধ্যমে আড়াল হইতে ক্রিয়া করে, অথবা অর্দ্ধরূপান্তরিত সত্তা যাহার ক্রিয়াতে আংশিক বা পূর্ণভাবে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য পূর্ব্বেই অর্জন কবিয়াছে নিজের তেমন কোন নিম্নতর বিভূতির মধ্য দিয়া অতিমানস তখন ক্রিয়া করে।

আধ্যাত্মিক পরিণামে উন্মীলন হয পর্ব্বে পর্ব্বে ইহাই তাহার প্রগতির বিধান ; পরিণামধাবার একটি প্রধান পর্ব্ব সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলেই নূতন আর একটি প্রধানতর পর্ব্বের কাজে নিশ্চিতভাবে হাত দেওযা হয় ; এমন কি দ্রুত এবং হঠাৎ অধিরোহণের জন্য যদি ছোটখাটো দু'চারিটি সোপানকে কোনমতে গলাধঃকরণ করিয়া এমন কি লম্ফ দিয়া পার হইয়া চলিয়া যাইতে সমর্থ হওয়া যায়, তবু চেতনাকে ফিরিযা দাঁড়াইয়া দেখিতে হয় যে-ভূমি এইভাবে পার হওয়া গিয়াছে, নূতন অবস্থায় যে রাজ্যে পরিণামধারা পৌঁছিয়াছে তাহার মধ্যে খাঁটিভাবে তাহা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কিনা। একথা সত্য যে সাধারণভাবে অপরাপ্রকৃতি ধীর মন্থর ও অনিশ্চিত গতিতে চলিয়া যে সিদ্ধিলাভ করিতে বহু শতাব্দী এমন কি যুগযুগান্ত কাটাইয়া দিত, সাধক অন্তরস্থ অধ্যাত্ম-পুরুষকে উদ্বোধিত করিয়া তাহার বিজয় অভিযানে এক জন্মে অথবা কয়েকজন্মে

তাহা সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে ; সাধনার ধাপগুলি কিরূপ গতিবেগে পার হইয়া যাওয়া যায় তাহাই এখানে বলা হইল ; কিন্তু দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেও ধাপ বাদ দেওয়া চলে না অথবা পর পর তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইবার প্রয়োজনীয়তা দূর হয় না। গতিবেগের এইরূপ বিবৃদ্ধি কেবল এইজন্যই সম্ভব হয় যে সাধকের জীবনে প্রগতিব পথে অন্তরপুরুষ আসিয়া সচেতনভাবে সাধনায় অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং অর্দ্ধরূপান্তরিত নিম্নপ্রকৃতির মধ্যে পবা-প্রকৃতির শক্তি পূর্ব্ব হইতেই সক্রিয় হইয়াছে, যাহার ফলে সাধনার যে পদক্ষেপ নিশ্চেতনা এবং অবিদ্যার অন্ধকার রাত্রিতে আন্দাজে পরীক্ষামূলক ও অনিশ্চিত-ভাবে করিতে হইত এখন তাহা জ্ঞানের বর্দ্ধমান আলোক ও শক্তিতে করা সম্ভব হইয়াছে। প্রকৃতি-পরিণামের শক্তি যখন জড়ের মধ্যেই নিবদ্ধ তখন তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রগতি অতি মন্থর, এই পর্ব্বের ক্রমপরিণতিতে তাহার লক্ষ লক্ষযুগ কাটিয়া গিয়াছে, প্রাণপরিণাম মন্থর হইলেও জড় পরিণামের তুলনায় অনেক দ্রুত তবু তাহার জন্য বহু সহস্র যুগ কাটিয়াছে, মনের পরিণাম কালের এই মন্থর ধীর সুস্থির গতিকে আরও ক্ষিপ্র করিয়াছে এবং দীর্ঘ পদক্ষেপে শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হইয়া গিযাছে, কিন্তু অন্তরাত্মা যখন সচেতনভাবে পরিণামধারার মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান তখন তাঁহার গতিবেগ চরমে আসিয়া পৌঁছে এবং কল্পনাতীতভাবে রূপান্তরের সময় সংক্ষিপ্ত হইযা উঠিতে পারে। তবু পরিণামধারাকে ভিতরে ভিতরে দ্রুততর করিয়া সাধনাব অনেকপর্ব্বকে সংক্ষেপ করা বা একসঙ্গে অধিগত করা কেবল তখনি সম্ভব হইতে পারে যখন চিদাত্মার শক্তি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে এবং অতিমানস শক্তির প্রভাব বিস্তার সাক্ষাৎভাবে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রকৃতির প্রত্যেক রূপান্তরই একটা অলৌকিক এবং বিস্ময়কর ব্যাপার ; কিন্তু তাহার একটা ক্রিয়াধারা বা একটা রীতি আছে ; নিরাপদ জমিতেই তাহার দীর্ঘতম পদক্ষেপ এবং পরিণামের পথে যখন ক্রমভঙ্গের সময় আসে তখন নিশ্চিত ও নিরাপদ ভিত্তি পাইলেই ক্ষিপ্রতম লম্ফপ্রদান সম্ভব হয়, এক গোপন সর্ব্ববিৎ প্রজ্ঞাই তাহার সবকিছুকে, এমন কি যে সমস্ত পদক্ষেপ এবং ক্রিয়াধারা অতি দুর্ব্বোধ্য মনে হয় তাহাদিগকেও শাসন ও পরিচালনা করে।

প্রকৃতিপরিণামের গতিপথের এই বিধানানুসারে রূপান্তরের শেষ পর্ব্বেও ক্রমবিন্যস্ত সোপানাবলী আছে, তাহাতে ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করিয়া আরূঢ় হইতে হয়, আধ্যাত্মিকভাবে বিভাবিত মনকে উচচ হইতে উচচতর

স্তরে আরোহণ করিয়া অতিমানসে পৌঁছিতে হয়, অন্যথায় এত খাড়া উচচতায় পৌঁছা সম্ভব হয় না। আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের প্রাকৃতসত্তার উপরে ক্রমবিন্যস্ত বহু স্তর, ভূমি বা শক্তি আছে, আমাদের স্বাভাবিক মনোভূমির ঊর্দ্ধে আমাদেরই গোপন অতিচেতন সত্তায় উচচতর মনের বহু বিভাব, অধ্যাত্ম-চেতনা ও অনুভূতির বহুপর্ব্ব রহিয়াছে; মধ্যবর্ত্তী প্রদেশস্থিত এই সমস্ত যোগসূত্রের আনুকূল্য না থাকিলে মন এবং অতিমানসের মধ্যস্থিত এই অতি বিপুল ব্যবধানকে অতিক্রম করা সম্ভব হইতে পারে না। বস্তুতঃ এই সমস্ত ঊর্দ্ধ্বস্থিত উৎস হইতে গোপন অধ্যাত্ম-শক্তির ধারা আধারে নামিয়া আসিয়া সত্তার উপর ক্রিয়া করে এবং তাহার চাপে আমাদের মধ্যে চৈত্যিক-আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধিত হয়; কিন্তু আমাদের পরিণতির আদিপর্ব্বে এ ক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ থাকে না, তাহা নিজেকে গোপন রাখে, আমরা তাহাকে ধরিতে বা ছুঁইতে পারি না। প্রথম প্রয়োজন হইল এই যে আমাদের মনোময়ী প্রকৃতি অধ্যাত্ম-শক্তির শুদ্ধ সংস্পর্শ লাভ করিবে; এই উদ্বোধিনী শক্তির চাপ, মন ও হৃদয় এবং প্রাণের উপর স্বীয় চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিবে এবং তাহাদিগকে লোকোত্তর চেতনার দিকে উন্মুখ করিয়া তুলিবে; এক সূক্ষ্ম আলোক বা রূপান্তরকারী এক মহাশক্তি তাহাদের গতিবৃত্তিকে শোধিত, শাণিত এবং ঊর্দ্ধ্বায়িত করিবে, যাহা তাহাদের নিজের সাধারণ ধর্ম্ম বা সামর্থ্যের মধ্যে নাই এমন এক উচচ চেতনার আলোকে তাহাদিগকে পরিপ্লাবিত করিয়া দিবে। চৈত্যসত্তা এবং চৈত্যব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া এক অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়া দ্বারাই ইহা সম্ভব হইতে পারে, ইহার জন্য সচেতনভাবে যাহা অনুভব করা যায় উপর হইতে তেমন কোন শক্তির অবতরণ অপরিহার্য্য নয়। চিৎপুরুষ সকল সজীব সত্তায়, সর্ব্বস্তরে, সর্ব্ববস্তুতে বর্ত্তমান আছেন, এবং আছেন বলিয়া শুদ্ধ চিন্ময় সত্তা ও চেতনা এবং দিব্যপুরুষের আবেশজনিত আনন্দ, সামীপ্য এবং সংস্পর্শ, এক কথায় সচ্চিদানন্দের অনুভূতি আমাদের মন বা হৃদয় বা প্রাণবোধ (life sense) এমন কি দৈহিক চেতনার মধ্য দিয়া লাভ করা যায়; যদি অন্তর-দ্বার যথেষ্ট পরিমাণে উন্মুক্ত হয় তবে হৃদয়ের মণিকোঠা হইতে দিব্যআলোক আসিয়া বহিশ্চর সত্তার নিকটতম হইতে সুদূরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারে। চেতনার মোড় ফিরান অথবা প্রয়োজনীয় রূপান্তরসাধন উপর হইতে অধ্যাত্ম-শক্তির গোপন অবতরণের ফলেও ঘটিতে পারে তখন তাহার প্রবাহ, প্রভাব বা আধ্যাত্মিক পরিণাম আমরা অনুভব করিতে পারি বটে কিন্তু তাহার উৎসের খবর পাই না

এবং শক্তির যে অবতরণ হইয়াছে সাক্ষাৎভাবে সে বোধও জাগে না। এই পরমাশক্তির স্পর্শ পাইয়া চেতনা এত উপরে উঠিয়া যাইতে পারে যে পরিণামের ধারাকে ত্যাগ করিয়া সাধক আত্মা বা ভগবানের সহিত সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হইয়া যায় এবং ইহাই যদি ভগবদভিপ্রায় হয় তবে সাধনার ধাপে ধাপে চলা বা কোন সাধনধারাই আর প্রয়োজন থাকে না, প্রকৃতির সহিত বিচ্ছেদ তখন হয় নিশ্চিত ; কেননা প্রকৃতি পরিহারের বিধান একবার সম্ভব হইয়া উঠিলে তাহা পরিণামের পথে রূপান্তর বা পূর্ণতার বিধানের সহিত এক নয়, অথবা তাহাদের এক হওয়ার প্রয়োজন নাই, তখন এক লম্ফ প্রদান করিয়া সকল বন্ধন দ্রুত বা অবিলম্বে ছেদন করিয়া প্রস্থান করা যায়—জগৎকে আধ্যাত্মিকভাবে পরিহার করা তখন স্থির হইয়াছে দেহপাতের নির্দ্ধাবিত সময় পর্য্যন্ত ভগবদনুমতির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া সাধকের আর কিছু করণীয় থাকে না। কিন্তু পার্থিব জীবনেব রূপান্তর যদি কাম্য হয় তবে অধ্যাত্ম-ভাবনার প্রথম সংস্পর্শের পরে ঊর্দ্ধ্বশক্তির উৎসমূলের চেতনা ও শক্তির ক্ষেত্রে জাগবিত হইতে হইবে, তাহা-দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকূতি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, আমাদের সত্তাকে প্রসারিত এবং ঊর্দ্ধ্বায়িত করিয়া তাহাদেব দিব্যস্থিতির বৈশিষ্ট্যে পৌঁছাইতে হইবে, আমাদের চেতনাকে তাহাদের বৃহত্তব বিধান এবং সক্রিয় প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। যতক্ষণ তাহার চরমক্ষণে সকল সোপান শেষ না হইয়া যায় এবং বেদে যাহার কথা বর্ণিত হইয়াছে সেই বৃহত্তম অতিবিস্তৃত চিদাকাশে, যাহা পরমোজ্জ্বল এবং অনন্ত চেতনার স্বধাম তাহার মধ্যে চেতনার উন্মীলন না ঘটে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই রূপান্তরসাধন হয় পর্ব্বে পর্ব্বে।

প্রকৃতির অন্য সকল প্রকার গতিপ্রবৃত্তির মত এখানেও পরিণামের ঐ একই ধারা চলিতেছে ; সে ধারাতে দেখা যায় যে ঊর্দ্ধ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্র-সারণের একটা প্রবেগ রহিয়াছে ; এক অভিনব ভূমিতে আরূঢ় হইয়া চেতনা নিম্নতর ভূমি সকলকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, সত্তার উচ্চতর শক্তি এইভাবে গৃহীত নিম্নতর চেতনাকে লইয়া একটা অভিনব অখণ্ড পূর্ণাঙ্গতা ও সৌষম্য স্থাপন করে এবং প্রকৃতিব প্রাক্তন পরিণামের অংশসকলের যতটা পর্য্যন্ত সে পৌঁছিতে পারে তাহার মধ্যে নিজের ক্রিয়ার ধারা, বৈশিষ্ট্য এবং বস্তুশক্তি (Substance-energy) সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করে। সকলকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া সবকে মিলাইয়া এক অখণ্ড পূর্ণাঙ্গতা-সাধনের দাবী প্রকৃতিপরিণামের এই শেষ পর্ব্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অধিরোহণের

নিম্নতর পর্ব্বসমূহে এইভাবে উচ্চতর চৈতন্যের মধ্যে সকলকে গ্রহণ এবং মিলন করিয়া চেতনার উচ্চতর তত্ত্বের মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা সাধন ক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকে; মন জড় এবং প্রাণকে পূর্ণ মনোময় করিয়া তুলিতে পারে না; তাই প্রাণময় সত্তা এবং দেহের অনেকখানি অবমানস, অবচেতনা এবং নিশ্চেতনার রাজ্যে পড়িয়া থাকে। মনের পক্ষে মানবপ্রকৃতির পূর্ণতাসাধনের তপস্যার ইহা একটি প্রবল অন্তরায়; কেননা আধারের ক্রিয়াবলীর পরিচালনায় মনের সঙ্গে এই অবমানস, অবচেতনা ও নিশ্চেতনারও একটা অংশগ্রহণ চলিতে থাকে এবং ইহারা মনোময় সত্তার বিধান হইতে ভিন্ন অন্য বিধান আনিয়া উপস্থিত করে, তাহার ফলে মন তাহাদের উপর যে বিধান চাপাইতে চায়, সচেতন প্রাণ এবং দৈহিক চেতনা তাহা অস্বীকার করিতে সমর্থ হয় এবং পরিণত বুদ্ধির যুক্তি এবং যুক্তিসঙ্গত সঙ্কল্প অবজ্ঞা করিয়া নিজেদের আবেগ এবং সহজাত বৃত্তি অনুসরণ করে। এইজন্য মনের পক্ষে নিজেকে অতিক্রম করা, তাহার নিজের ভূমি পার হইয়া যাওয়া এবং প্রকৃতিকে অধ্যাত্মভাবাপন্ন করিয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন; কেননা যাহাকে সে পূর্ণ সচেতন এবং মনোময় করিয়া তুলিতে বা যুক্তির শাসন মানিয়া চলিতে বাধ্য করিতে পারে না তাহাকে কি করিয়া সে আধ্যাত্মিক করিয়া তুলিবে? কেননা আধ্যাত্মিক রূপান্তরের অর্থ একটা বৃহত্তর এবং কঠিনতর পূর্ণাঙ্গতা-সাধন। অবশ্য আধ্যাত্মিক শক্তিকে আবাহন করিয়া আনিয়া প্রকৃতির কোন কোন অংশে বিশেষতঃ ভাবনাময় মনে এবং যাহা তাহার খুব কাছাকাছি প্রদেশে অবস্থিত সেই হৃদয়ে একটা প্রভাবকে প্রতিষ্ঠা এবং কিছু প্রাথমিক পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু আপন সীমার মধ্যেও এই পরিবর্ত্তন কোন অখণ্ড পূর্ণতা আনয়ন করিতে পারে না, অতিকষ্টে ক্বচিৎ কখনো সে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় মাত্র। অধ্যাত্ম-চেতনা যখন মনকে সাধন কার্য্যে লাগায় তখন সে একটি নিম্নতর উপায় অবলম্বন করিয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে, তাই যদিও তাহা মনকে এক দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত করে, হৃদয়ে দিব্যশুচিতা, আবেগ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করে, প্রাণের উপর এক অধ্যাত্ম-বিধান আরোপ করে তবুও এই নূতন চেতনাকে বহু বাধার মধ্যে ক্রিয়া করিতে হয়; কেননা প্রধানতঃ সে প্রাণের নিম্নতর ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত বা নিরুদ্ধ করিতে এবং দেহকে কঠোরভাবে শাসিত ও সংযত করিতে পারে কিন্তু সত্তার এই সমস্ত অঙ্গ মার্জিত বা নির্জিত হইলেও তাহারা আধ্যাত্মিক সার্থকতা লাভ করে না,

পূর্ণ বা রূপান্তরিত হইয়া উঠে না। এইজন্য যাহা আধ্যাত্মিক চেতনার ক্ষেত্রের অধিবাসী তেমন বীর্য্যবান কোন উচ্চতত্ত্বকে নামাইয়া আনা প্রয়োজন যাহার সাহায্যে ইহা আপন নিজস্ব বিধানে নিজের পূর্ণতর স্বাভাবিক আলোকে এবং শক্তিতে ক্রিয়া করিতে এবং এই সমস্তকে আধারের সকল অঙ্গে আরোপিত করিতে পারিবে।

কিন্তু এই নূতন বীর্য্যবান শক্তিব আধারে অবতরণ এবং আধারের সকল অঙ্গে প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেও দীর্ঘকাল লাগিতে পারে; কেননা সত্তার এই সমস্ত নিম্নতর অঙ্গেরও নিজস্ব অধিকার নিজস্ব দাবী আছে; এবং যদি তাহাদিগকে সত্যই রূপান্তরিত করিতে হয় তবে তাহাদিগকেও তাহাদের নিজেদের রূপান্তরে সম্মত করিতে হইবে। এইভাবে ইহাদিগকে সম্মত করা বড় কঠিন ব্যাপার, কেননা আমাদের প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে যতই অপকৃষ্ট হউক না কেন সে নিজের ধর্ম্ম বা স্বভাব অনুবর্ত্তন কবিতে চায়, যাহা তাহাব নিজেব মনে করে না সে ধর্ম্ম বা সে স্বভাব উচ্চতর হইলেও নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে চায় না; প্রতি অঙ্গ তাহার নিজস্ব চেতনা কি অচেতনায় লাগিয়া থাকিতে চায়, তাহার নিজস্ব আবেগ ও প্রতিক্রিয়ার সার্থকতা চায়, আপনভাবে নিজের সত্তাকে সক্রিয় করিতে, আপনভাবে জীবন রসের আস্বাদন করিতে চায়। এমন কি এই সমস্ত অঙ্গ নিজ ধর্ম্মে স্থিত থাকিলে যদি আনন্দের অস্বীকৃতি দেখা যায়, যদি তাহাতে দুঃখ শোক সন্তাপের অন্ধকার উপস্থিত হয় তবু আরও নাছোড়বান্দা হইয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে; কেননা বিকৃত এবং বিপরীতভাবের আস্বাদনেও সে একপ্রকাব বস পাইতে অভ্যস্ত হয়; সে রস দুঃখ ও অন্ধকারের রস, দুঃখ ও সন্তাপের মধ্যে পীড়ন করিয়া বা পীড়ন সহিয়া কামনা তৃপ্তির একটা রস। এমন কি এই অঙ্গের মধ্যে যখন উত্তম বস্তুলাভের আকূতি জাগিয়াও ওঠে তখনও সে অনেক সময় এই নিম্নতর পথ অনুসরণে বাধ্য হয়, কেননা সে-পথ যে তাহার নিজস্ব পথ, তাহার শক্তি ও ধাতুর পক্ষে স্বাভাবিক। এই সমস্ত অবাধ্য উপাদানের পূর্ণ ও আমূল রূপান্তর ঘটাইতে হইলে তাহাদের উপব অধ্যাত্ম-আলোক অবিরাম ধারায় প্রবাহিত হওয়া, চিন্ময় সত্য, শক্তি ও আনন্দের নিবিড় অনুভূতি তাহাদের মধ্যে জাগানো চাই, তাহা হইলে অবশেষে তাহারাও বুঝিবে ও স্বীকার করিবে যে এই সমস্ত উচ্চভাবের মধ্যেই তাহাদেরও পরম সার্থকতা সাধিত হইতে পারে এবং তাহারাও চিদ্বস্তুরই এক খর্ব্ব শক্তি বা প্রকাশ এবং এই নূতন পথের

অনুসরণেই তাহারা তাহাদের সত্য ও অভঙ্গ পূর্ণ স্বভাবের মহিমায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। কিন্তু অপরা প্রকৃতির শক্তিসকল এই জ্যোতির অবতরণে সর্ব্বদা বাধা দেয়, তাহার চেয়েও প্রবল বাধা জন্মায় সেই সমস্ত বিরোধীশক্তি যাহারা জগতের অপূর্ণতাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে ও প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, যাহারা নিশ্চেতনার কৃষ্ণপ্রস্তরের উপর তাহাদের দুর্ব্বোধ্য ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছে।

এই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন অন্তরসত্তা এবং তাহার শক্তিকেন্দ্রসমূহের উন্মীলন ; কেননা বহিশ্চর মন যাহা সাধন করিতে পারে না, এখানে তাহার সিদ্ধির সূচনা দেখা দিতে পারে। অন্তরমন, আন্তর-প্রাণচেতনা এবং প্রাণময় মন, সূক্ষ্মভূতময় চেতনা এবং সূক্ষ্মভূতময় মননশক্তি একবার উদ্বুদ্ধ এবং সক্রিয় হইলে তাহা সূক্ষ্মতর, বৃহত্তর এবং উদারতর এক মধ্যবর্ত্তী জ্ঞান ফুটাইয়া বিশ্বচেতনা এবং বিশ্বাতীত চেতনার সহিত যোগসাধনের সেতুস্বরূপ হইতে পারে এবং যাহা অবমানসে ও অবচেতন মনে, অবচেতন প্রাণে এমন কি দেহের অবচেতনায়, এক কথায় সত্তার সর্ব্বত্র তাহাদের শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে ; তাহারা মূল নিশ্চেতনাকে পূর্ণরূপে আলোকিত করিতে সমর্থ হয় না বটে কিন্তু কতকটা পরিমাণে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ক্রিয়া করিতে এবং তাহাকে কতকটা খুলিয়া ধরিতে পারে। তখন যেখানে সহজে পৌঁছা এবং আলোকিত করা যায় সেই মন ও হৃদয়কে ছাপাইয়া ঊর্দ্ধ্ব হইতে অধ্যাত্ম-আলোক, শক্তি, জ্ঞান আনন্দ আধারের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে পারে ; পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত আধারকে অধিকার করিয়া তাহারা প্রাণ ও দেহের মধ্যে পূর্ণতরভাবে পরিব্যাপ্ত হইতে এবং প্রচণ্ডতর অভিঘাতের দ্বারা নিশ্চে-তনার ভিত্তি কম্পিত করিতে পারে। কিন্তু ভিতর হইতে মনোময় ও প্রাণময় চেতনার এই বৃহত্তর পরিস্ফুরণে যে আলোক প্রকাশ পায় তাহাও এক নিম্নতর আলোক, তাহাতে অবিদ্যা হ্রাস পায় কিন্তু লুপ্ত হয় না ; যে সমস্ত শক্তি নিশ্চে-তনার সূক্ষ্ম এবং গোপন শাসন বজায় রাখে তাহারা আক্রান্ত ও প্রতিনিবৃত্ত হয় কিন্তু পূর্ণরূপে নির্জিত বা বিনষ্ট হয় না। এই বৃহত্তর প্রাণময় এবং মনো-ময় চেতনার মধ্য দিয়া অধ্যাত্ম-শক্তিসকল ক্রিয়া করিয়া বৃহত্তর আলোক বীর্য্য এবং আনন্দ ফুটাইয়া তুলিতে পারে ; কিন্তু সত্তার সর্ব্বাঙ্গকে পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক করিয়া তোলা, অভিনব চেতনার মধ্যে এক অভঙ্গ পূর্ণাঙ্গতা স্থাপন এ ধাপেও অসম্ভব। কিন্তু আমাদের অন্তরতম চৈত্যপুরুষ যদি সাধনার ভার গ্রহণ করেন

তবে যাহা মনোময়কে ছাড়াইয়া যায় তেমন এক গভীরতর রূপান্তর সম্ভব হয় এবং অধ্যাত্মশক্তির অবতরণ সার্থকতর হয়, কেননা সচেতন সত্তার সমগ্রতার মধ্যে অন্তরাত্মার একটা প্রথমিক আত্মরূপান্তর দেখা দেয় যাহা মন, প্রাণ এবং দেহকে তাহাদের নিজেদের অপূর্ণতা এবং অশুদ্ধির বন্ধন হইতে মুক্তি দান করে। এই সময় অধ্যাত্মশক্তির বৃহত্তর খেলা, অধ্যাত্ম-মন ও অধিমানসের ঊর্দ্ধশক্তির ক্রিয়া পূর্ণভাবে আরম্ভ হয়; বস্তুতঃ হয়তো তাহাদেব ক্রিয়া পূর্ব্বেই গোপনে আরম্ভ হইয়াছিল তবে তাহা শুধু একটা প্রভাবরূপে ছিল কিন্তু এই নূতন অবস্থায় তাহারা কেন্দ্রগত সত্তাকে তাহাদের নিজভূমিতে তুলিয়া লইতে পারে তখন প্রকৃতির অভিনব এবং শেষ অখণ্ড পূর্ণাঙ্গতা লাভের সূচনা দেখা দেয়। অবশ্য মানুষের মন অধ্যাত্মভাবাপন্ন হইবার পূর্ব্ব হইতেই এই সমস্ত শক্তির কার্য্য চলিতেছে কিন্তু পরোক্ষভাবে খণ্ডিতরূপে এবং ক্ষুদ্রাকারে; তাহারা ক্রিয়া করিবার পূর্ব্বেই মনের উপাদান ও শক্তিতে পরিণত হয় এবং এই অনুপ্রবেশেব ফলে সে সমস্ত উপাদান ও শক্তির সকল স্পন্দন আলোকিত ও বর্দ্ধিত হইতে, সকল ক্রিয়ার শক্তি গভীর হইতে এবং কোন কোন ক্রিয়াতে প্রচুর আনন্দলাভও হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের পূর্ণ রূপান্তর সাধিত হয় না। কিন্তু যখন সত্তা অধ্যাত্মভাবাপন্ন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে এবং তাহার বৃহত্তম ফলসকল, মনের নৈঃশব্দ্য, আমাদের সত্তায় বিশ্বচেতনার উন্মেষ, বিশ্বাত্মার মধ্যে আমাদের অহংএর নির্ব্বাণ, দিব্যসত্যবস্তুর সহিত সংস্পর্শ প্রভৃতি নানা আকারে দেখা দিতে থাকে, তখনই শক্তিপাতের তীব্র সংবেগ বৃদ্ধি পায় এবং আমরা ক্রমশঃ বেশী করিয়া উন্মীলিত হইতে থাকি, তখন তাহাদের পূর্ণতর শক্তি আরও সাক্ষাৎভাবে প্রস্ফুরিত হইয়া তাহাদেব বৈশিষ্ট্য আমাদের প্রকৃতিতে আরও প্রবলতরভাবে ফুটাইতে থাকে, এইভাবে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে তাহারা এক প্রকার পরিপূর্ণ এবং বিকশিত ক্রিয়াধারাতে পরিণত হয়। তখন অধ্যাত্ম-পরিণতির মোড় ঘুরিয়া অতিমানস-রূপান্তর আরম্ভ হয়; কেননা চেতনার উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে উত্তরণ দ্বারাই আমাদের সত্তার মধ্যে অতিমানসে উঠিবার সোপানাবলী রচিত হয়—সেই দুর্গম ও অন্তিম পথ প্রস্তুত হয়।

চেতনার এই রূপান্তর সকলের পক্ষেই যে একই পরিবেশে এবং একই ধারায় ঘটিবে তাহা নহে, কেননা এখানে আমরা অনন্তের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি; কিন্তু অনন্তের সকল পরিবেশ ও ধারাই যখন এক মূল অখণ্ড সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, ঊর্দ্ধারোহণের কোন একটি বিশেষ ধারাকে বিশেষভাবে

পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সকল উর্দ্ধগামী ধারা ও সম্ভাবনার মূল তত্ত্বের উপর আলোক পড়িবে ইহা আমরা আশা করিতে পারি, এইরূপ একটি ধারার পরীক্ষাতেই মাত্র আমরা এইক্ষণে হাত দিতে পারি। সব ধারার মত আলোচ্যমান এই ধারাটিও স্বাভাবিকভাবে স্তর ও সোপানের পরম্পরার মধ্য দিয়া আমাদিগকে উর্দ্ধে আরোহণের পথ দেখায়; ইহার মধ্যে বহু সোপান বা স্তর আছে, এই স্তর-বিন্যাসের ধারা অবিচ্ছিন্ন, কোথাও ফাঁক নাই; কিন্তু চেতনার উর্দ্ধায়নের দিক হইতে দেখিলে স্বক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমোর্দ্ধ-স্থিত যে সমস্ত বীর্য্যবান শক্তির মধ্য দিয়া মন নিজের অতীত ক্ষেত্রে উঠিয়া যাইতে পারে সেই সমস্ত স্তরবিন্যাসকে প্রধানতঃ চারিটি প্রধানভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যাহাদের প্রত্যেকের অতি উচ্চ সার্থকতা আছে; লোকোত্তর-গামী এই স্তরবিন্যাসকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যায় যে উত্তরমানস (higher mind), জ্যোতির্ম্ময় মানস (illumined mind) সম্বোধি (intuition) এবং অধিমানস (over mind) এই চারিভাবের প্রত্যে-কের মধ্য দিয়া চেতনা আত্মরূপান্তরের পরম্পরা পার হইয়া অবশেষে সকলের উর্দ্ধে এক ভূমিতে বা শিখরদেশে গিয়া পৌঁছে; সেই শিখরভূমির নাম অতি-মানস বা দিব্যপ্রজ্ঞা। এই সমস্ত ভূমির প্রত্যেকটি, তত্ত্বে এবং শক্তিতে বিজ্ঞানময়, কেননা ইহাদের প্রথমটিতে পৌঁছিলেই, যাহা এক আদি নিশ্চেতনায় প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা এক সাধারণ অবিদ্যার অথবা বিদ্যা এবং অবিদ্যার এক মিশ্রণের মধ্যে ক্রিয়াশীল তেমন চেতনা হইতে এমন এক চেতনার মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করি যাহা গোপন স্বয়ম্ভূ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই আলোক ও শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত; তাহার পর আমাদের চেতনা সেই জ্ঞান বা বিদ্যারই নিজস্ব উপাদানে রূপান্তরিত হয় এবং নবোন্মিষিত এই বিদ্যা-শক্তিকে তাহার সকল সাধনার যন্ত্ররূপে গ্রহণ করে। স্বরূপতঃ এই সমস্ত স্তর বা পর্ব্ব চিৎস্বরূপের শক্তি বস্তুরই পর্ব্ব; জ্ঞানের সাধন ও বীর্য্যহিসাবে প্রত্যেকের প্রধান বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেখিতেছি বলিয়া আমরা যেন ইহা না ভাবি যে তাহারা কেবল মাত্র জ্ঞানলাভের একটা উপায় বা কারণ বা বৃত্তি বা শক্তি; প্রকৃতপক্ষে তাহারা প্রত্যেকে সৎ-এর বা সত্তার একএকটি ভূমি, চিৎপুরুষের নিজস্ব শক্তি এবং উপাদানের এক একটি স্তর, বিশ্বব্যাপিনী চিৎশক্তি যেখানে নিজে এক উচ্চস্থিতিরূপে ব্যবস্থিত এবং রূপায়িত হইয়াছেন তেমন এক একটি ক্ষেত্র। ইহাদের কোন স্তর হইতে শক্তি

যখন পূর্ণরূপে আমাদের মধ্যে অবতরণ করে তখন তাহা শুধু যে আমাদের সাধারণ জ্ঞান এবং প্রাকৃতমনকে প্রভাবিত করে তাহা নহে পরন্তু আমাদের সত্তা ও চেতনার সমস্ত অবস্থা, সকল ক্রিয়া ও প্রবৃত্তি এমন কি তাহাদের উপাদান ও মর্ম্মকোষ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে, তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে, তাহাদিগকে নূতন ছাঁচে ঢালিতে এবং তাহাদের পূর্ণ রূপান্তর সাধন করিতে পাবে। অতএব প্রাকৃত মনেব উপরিস্থিত এই সমস্ত ভূমির প্রত্যেকটিতে আরূঢ় হইলে এক বৃহত্তর সত্তার নূতন আলোক এবং শক্তিতে আমাদের সত্তা পূর্ণরূপে না হইলেও সাধাবণভাবে রূপান্তরিত হয়।

এই স্তরবিন্যাস মূলতঃ সত্তার, তাহার আত্মজ্ঞানের, তাহার আনন্দের ও শক্তির সামর্থ্য ও স্পন্দনের তীব্রতার তারতম্যের এবং তাহাদের উপাদানের উচ্চনীচতার উপর নির্ভর করে। নীচের স্তরের দিকে যত আমরা নামিয়া আসি ততই দেখিতে পাই যে চেতনা ক্রমেই স্তিমিত এবং ক্ষীণ বা মিশ্রিত হইয়া পড়ে, নিজেরই অমার্জিত স্থূলতায় নিবিড় হইয়া উঠে, কিন্তু যখন এই স্থূলতা অবিদ্যার উপাদানে আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিতে থাকে, তখন তাহার মধ্যে আলোকময় উপাদানের অনুপ্রবেশ কমিতে এবং চেতনার শুদ্ধ উপাদান ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে, তাহার শক্তি হ্রাস পায়, তাহার আলোক স্তিমিত এবং আনন্দের সামর্থ্য শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ; তখন একটা কিছুতে পৌঁছিতে গেলে চেতনাকে তাহার ক্ষীণ উপাদানের নিবিড়তর স্থূলতার মধ্যে নামিয়া যাইতে হয় এবং নিজের অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন শক্তিকে অতি প্রবলভাবে প্রয়োগ করিতে হয় কিন্তু এই তীব্র প্রয়াস এবং শ্রমস্বীকার তাহার বলের নয়—দুর্ব্বলতারই চিহ্ন। পক্ষান্তরে যেমন আমরা উপরে উঠিতে থাকি তেমনি আমাদের অনুভূতিতে স্ফুরিত হইতে থাকে সুন্দরতর অনেক অধিক বীর্য্যশালী অধিকতর খাঁটি চিন্ময়ভাবে বিভাবিত বাস্তব এক উপাদান, চেতনার দীপ্ততর এবং বীর্য্যবত্তর এক সামর্থ্য, সূক্ষ্মতর মধুরতর পবিত্রতর প্রবলতর শক্তিশালী আনন্দের এক ধারা। উর্দ্ধ্বতর ক্ষেত্র হইতে এই সমস্ত উচ্চতর তত্ত্ব যখন আমাদের মধ্যে নামিয়া আসে তখন এই বৃহত্তর আলোক এবং শক্তি, সত্তা ও চেতনার মূল তত্ত্ব এবং আনন্দের বিপুল বীর্য্য মন প্রাণ দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাদের খর্ব্বতা ক্ষীণতা এবং নির্বীর্য্যতা দূর করে, তাহাদিগকে নিজের উচ্চতর এবং বৃহত্তর প্রাণোচ্ছল শক্তিতে নিজ সত্যের স্বভাবসিদ্ধ রূপ ও বীর্য্যে রূপান্তরিত করে। ইহা সম্ভব হইতে পারে কেননা সমস্তই

মূলতঃ একই বস্তু, একই চেতনা, একই শক্তি ; রূপে শক্তিতে এবং স্তরভেদে তাহারা একেরই বহুরূপ ; সুতরাং নিম্নতরকে উচ্চতরের মধ্যে গ্রহণ আধ্যাত্মিক প্রগতির পক্ষে একটা সম্ভবপর ব্যাপার এবং আমাদের মধ্যে নিশ্চেতনার দ্বিতীয়া প্রকৃতির বাধা না থাকিলে তাহা একটা স্বাভাবিক ক্রিয়া ; কেননা ইহাতে যাহা এক সময়ে উচ্চতর স্থিতি হইতে বাহির করা হইয়াছে, তাহাকে আবার সেই বৃহত্তর সত্তা ও তত্ত্বের দ্বারা পরিবেষ্টন এবং পুনর্গ্রহণ হয় মাত্র।

মানুষী-বুদ্ধি বা প্রাকৃত মানসের ভূমি হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রথম নিশ্চিত ধাপ উত্তরমানসে উত্তরণ, উত্তরমানসও মন বটে কিন্তু এ মনে আর অন্ধকার ও আলোকের মিশ্রিত বস্তুর স্থান নাই, আলো-আঁধারির ছলনা নাই, আছে চিৎস্বরূপের উদার দীপ্ত স্বচ্ছতা। এ মনের মূল উপাদান হইল সত্তার এক একত্ববোধ বা অনুভূতি, আর সেই বোধের সঙ্গে আছে জ্ঞানের বহু বিভাব, কর্ম্মেব নানা পন্থা এবং সম্ভূতির বিচিত্র রূপ ও অর্থকে রূপায়িত করিয়া তুলিবার এক শক্তিশালী সক্রিয় বহুমুখী সামর্থ্য, উত্তরমানসে এ সমস্তের এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান আছে। অন্যান্য সমস্ত বৃহত্তর শক্তির মত উত্তরমানসও অধিমানস হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, যদিও ইহাদেব সকলের আদিমূল হইল অতিমানস ; উত্তরমানসের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার চেতনার ক্রিয়া ভাবনাদ্বারা শাসিত ; ইহাকে দীপ্ত ভাবনাময় মন বা চিন্তা হইতে জাত জ্ঞানের ধারণা বা প্রত্যয়মূলক মন বলিতে পারি। ইহা অনাদি একত্ববোধ হইতে উৎসারিত এক সর্ব্ববিৎ চেতনা যে চেতনা একত্বে বিধৃত সকল সত্য নিজের মধ্যে বহন করে এবং দ্রুতগতিতে বিজয়ীরূপে বহু বিচিত্রভাবে তাহা পরিকল্পিত ও রূপায়িত করে এবং ভাবের আত্মশক্তি বলে কার্য্যকরীভাবে নিজ ধারণাকে সিদ্ধ করিয়া তোলে ; এই বৃহত্তর জ্ঞানময় মানসের ইহাই বিশেষ ধর্ম্ম। অবরোহণের পথে এই ধরণের জ্ঞান আদি চিন্ময় একত্ব হইতে সর্ব্বশেষে স্ফুরিত হয়, তাহার অব্যবহিত পরেই অবিদ্যার ভিত্তিস্বরূপ ভেদজ্ঞানের উদয় হয়, তাই উত্তরায়ণের পথে আমরা অবিদ্যাচ্ছন্ন জ্ঞানশক্তিকে সর্ব্বোত্তমভাবে সুসংহত এবং সুবিন্যস্ত করিয়া যুক্তিবুদ্ধি এবং সামান্যপ্রত্যয়-শাসিত যে উচ্চ মনকে পাইয়াছি তাহার ভূমি হইতে চিৎ-শাসিত প্রদেশে যখন অনুপ্রবিষ্ট হই তখন এই উত্তরমানসের ভূমিতেই প্রথম পদার্পণ করি ; বস্তুতঃ এই উত্তরমানসই সামান্যপ্রত্যয় বা ভাবময় মনের আধ্যাত্মিক জনক সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে আমাদের প্রাকৃত

মননের এই প্রধান শক্তি যখন আপনাকে অতিক্রম করিবে তখন তাহা সাক্ষাৎ উৎপত্তিস্থানেই প্রথম পৌঁছিবে।

কিন্তু এই মহত্তর মননের পক্ষে জ্ঞানকে খুঁজিতে হয় না, তাহার পক্ষে লব্ধ জ্ঞান সত্য কি না তাহা বুঝিবার জন্য নিজেকে নিজের পর্য্যবেক্ষণ করিবার ও বিচার করিয়া দেখিবাব প্রয়োজন নাই, ধাপের পর ধাপের মধ্য দিয়া ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত পদ্ধতি ধরিয়া যুক্তি বিচারের মধ্য দিয়া তাহাকে সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয় না, ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে অনুসিদ্ধান্ত বা অবরোহ-অনুমানের কোন ধারা ধরিয়া তাহাকে চলিতে হয় না ; সুবিন্যস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বা জ্ঞানের কোন পরিণামে পৌঁছিবার জন্য ভাবেব পর ভাব সাজাইয়া সুবিবেচিতভাবে খণ্ডজ্ঞানের যোজনা করিতে হয় না ; কেননা এ সমস্ত হইল প্রাকৃত বুদ্ধির পঙ্গুর মত চলার নিদর্শন—যে অবিদ্যা জ্ঞানের সন্ধান করিতেছে তাহার ক্রিয়ার ফল ; তাহাকে প্রতিপদে ভ্রমপ্রমাদের হাত হইতে বাঁচিবার উপায় স্থির করিতে এবং নির্ব্বাচিত উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা আশ্রয়ের জন্য এক অস্থায়ীভবন গড়িয়া তুলিতে বাধ্য হইতে হয়, পূর্ব্ব হইতে যে ভিত্তি স্থাপিত আছে তাহারই উপরে এ ভবন গড়িয়া তোলা হয় কিন্তু সে ভিত্তি সযত্নে স্থাপিত হইলেও দৃঢ় নহে কেননা তাহা স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের শক্তমাটিতে স্থাপিত হয় নাই, আদিম নিশ্চেতনার এক বালুকাস্তরেব উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আবার মন যখন তীক্ষ্ণতম এবং ক্ষিপ্রতম হইয়া উঠে তখন অনিশ্চিত হইলেও একটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে পারে ভবিষ্যদ্বাণী দিতে পারে, যাহাতে বুদ্ধির উজ্জ্বল সন্ধানী আলোক (search-light) অজানা বা অল্প-জানা প্রদেশে অনুবিদ্ধ হয়, কিন্তু উত্তরমানসের ক্রিয়াধারা সেরূপও নহে। উত্তরমানসের উচ্চতর চেতনা স্বয়ম্ভূ সর্ব্বজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া অবস্থিত জ্ঞানের এক রূপায়ণ, তাহার মধ্যে অখণ্ড বা সম্যক্ দৃষ্টির কিছুটা প্রকাশ পায়, তাহার বিচিত্র অর্থের সৌষম্যকেই ফুটাইয়া তোলে ভাবনার আকারে। ইহা পৃথক পৃথকভাবের মধ্য দিয়া পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহার নিজের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হইল সমুচ্চয় ভাবনা (mass ideation) তাহা একটি দৃষ্টিক্ষেপে সমগ্র বা সমূহ সত্যের যুগপৎ দর্শন ; তাহাকে ভাবের সহিত ভাবের বা সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ তর্কবুদ্ধির দ্বারা নির্ণয় করিতে হয় না কিন্তু এ সমস্তের যে অন্যোন্যসম্বন্ধ অভঙ্গ-সত্তার মধ্যে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান আছে, আত্মদৃষ্টিতে দেখিবার ফলে সে সমস্ত সম্বন্ধের বোধ

চেতনায় স্বতঃই স্ফুরিত হয়। যে জ্ঞান সদা বর্ত্তমান অথচ আজ পর্য্যন্ত নিষ্ক্রিয় রহিয়াছে, যাহা তথ্য হেতু বা উপনয় (Premise) হইতে তর্ক-শাস্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত কোন সিদ্ধান্ত নয়, যাহা শাশ্বত প্রজ্ঞার আত্মপ্রকাশ, কোন অর্জিত জ্ঞান নয় উত্তরমানসে তেমন জ্ঞান রূপায়িত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই উত্তরপথের-পথিক-মনের নিকট সত্যের বৃহৎ ও উদার বিভাবসকল ভাসিয়া উঠে এবং ইচ্ছা করিলে ইহা পূর্ব্বের মত তাহার মধ্যে ঘর বাঁধিয়া তৃপ্তিতে বাস করিতে পারে কিন্তু প্রগতির পথে অগ্রসর হইবার সাধনা অক্ষুণ্ন রাখিলে এই গৃহগুলি প্রশস্ততর হইয়া এক বৃহত্তর গৃহে পরিণত হইতে থাকে অথবা বহু গৃহ একসঙ্গে একত্র হইয়া সাময়িকভাবে এক বৃহত্তর সমগ্রতা গড়িয়া তোলে, যাহাকে এখনও-অলব্ধ অভঙ্গপূর্ণাঙ্গতার সোপানরূপে গণ্য করা যায়। পরিশেষে জ্ঞাত সত্য এবং অনুভূতির এক বিপুল সমগ্রতা দেখা দেয় কিন্তু এ সমগ্রতা সীমাহীনভাবে আবার সম্প্রসারিত হইতে সমর্থ, কেননা জ্ঞানের বিচিত্র বিভাবের কোন শেষ নাই, 'নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্যমে'।

উত্তরমানসের ইহাই হইল জ্ঞানের বা প্রত্যয়ের দিক ; কিন্তু ইহা ছাড়া তাহার সঙ্কল্পের একটা দিক, সত্যকে সবলভাবে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার একটা দিক আছে ; এদিক দিয়া আমরা দেখিতে পাই যে এই বৃহত্তর দীপ্তি-শালী মন সত্তার অন্যসকল অংশ বা অঙ্গের, মানসিক সঙ্কল্পের, হৃদয় এবং তাহার অনুভূতির, দেহ ও প্রাণের উপর মনন-শক্তি বা ভাবনার বীর্য্যের মধ্য দিয়া সর্ব্বদা ক্রিয়া করে। জ্ঞান দিয়া আধারকে ইহা মার্জিত ও শোধিত করিতে, জ্ঞানের মধ্য দিয়া তাহাকে মুক্ত করিতে এবং জ্ঞানের স্বভাবসিদ্ধ শক্তির দ্বারা তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়। শক্তিরূপে গ্রহণ করিবার এবং ফুটাইয়া তুলিবার জন্য উচ্চ কোন ভাবকে বীজরূপে হৃদয়ে বা জীবনে স্থাপন করা হয়, হৃদয় এবং প্রাণ তখন সে ভাবের সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং তাহার ক্রিয়া ও বীর্য্যবত্তায় সাড়া দেয় এবং তাহাদের উপাদান সেইভাবের অনুকূলে রূপান্তরিত হইয়া উঠিতে থাকে, তাহার ফলে তাহাদের অনুভূতি ও ক্রিয়া সেই উচ্চজ্ঞানের স্পন্দনে পরিণত, সেই জ্ঞানের দ্বারা উজ্জীবিত হয় তাহার ভাবোচ্ছ্বাস ও সংবেদনে পরিপ্লুত হয় ; তেমনিভাবে সেই ভাবের শক্তি এবং আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার আকৃতি মনের সঙ্কল্প এবং প্রাণের আবেগের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় ; এমন কি দেহের মধ্যেও এ-ভাব সক্রিয় হইয়া উঠে, উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে রোগের অনিবার্য্যতার বিশ্বাস এবং তাহার আগমনে

স্বীকৃতি দূর করিয়া স্বাস্থ্যের শক্তিশালী ভাবনা ও সঙ্কল্প তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে অথবা বলের ভাবনা* আধারে বলের উপাদান, শক্তি এবং রূপ উৎপাদিত এবং আমাদের মন, প্রাণ বা দেহের উপর তাহা আরোপিত করে। এইভাবে উত্তরমানসের প্রাথমিক ক্রিয়াধারা চলিতে থাকে ইহা আমাদের সমগ্র সত্তার মধ্যে এক অভিনব ও উচ্চতর চেতনা সঞ্চারিত করে, রূপান্তরের ভিত্তি স্থাপন করে এবং আধারকে সত্তার আরও বৃহৎ ও মহৎ সত্যকে গ্রহণ ও ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত করে।

উচ্চতর শক্তির শ্রেষ্ঠতর আবেগ যখন প্রথমে বোধ বা অনুভূতিতে দেখা দেয় তখন স্বাভাবিকভাবে যে ভুল হইতে পারে তাহা দূর করিবার জন্য আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে ঐ শক্তিসকল নিজের ক্রিয়াভূমিতে বা নিজের স্বাভাবিক পরিবেশে যখন অবস্থিত থাকে তখন তাহারা যেমন স্বভাবতঃ মহাবীর্য্যবান থাকে অবতরণ করিলে তখনি তাহাদের তেমন সামর্থ্য প্রকাশ পায় না। জড়ের মধ্যে পরিণামের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বিজাতীয় এক অপকৃষ্ট মাধ্যমে প্রবিষ্ট হইয়া জড়ের উপর ক্রিয়া করিতে হয়; তাহাদিগকে আমাদের দেহমন প্রাণের অসামর্থ্য, অবিদ্যার গ্রহণ-সামর্থ্যের অভাব বা অন্ধ অস্বীকৃতি, অচেতনার প্রতিষেধ বা বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। তাহাদের নিজের ভূমিতে প্রদীপ্ত চেতনা এবং জ্যোতির্ম্ময় উপাদানের উপর তাহাদের কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে তাহাদের সার্থকতাও স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু এখানে তাহাকে জড়ের পূর্ণ নিশ্চেতনা এবং মন হৃদয় ও প্রাণের ঈষদ্দীপ্ত অচেতনার যে সুদৃঢ় ভিত্তি পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। এমন কি যখন সুগঠিত মনোময় বুদ্ধিতে উচ্চতর ভাব বা জ্ঞান নামিয়া আসে তখনও তাহাকে অবিদ্যাময় জ্ঞানের মধ্যস্থিত ধারণা বা সংস্কারের বিপুল সমাহার দ্বারা গঠিত বাঁধ ভাঙ্গিয়াই প্রবিষ্ট হইতে হয়, এই সমস্ত সংস্কারের বাঁচিয়া থাকিবার এবং আত্মসার্থকতা লাভ করিবার যে প্রবল ইচ্ছা আধারে বর্ত্তমান আছে তাহাদিগকে পরাভূত করিতে হয়; কেননা মনোময় হইলেও ভাব মাত্রই শক্তিস্বরূপ বলিয়া তাহাদের একটা আত্ম-রূপায়ণ এবং আত্ম-সার্থকতার স্বাভাবিক সামর্থ্য আছে, অবশ্য সে সামর্থ্যের তারতম্য পরিবেশের উপরই নির্ভর করে, জড়ের নিশ্চেতনা লইয়া যখন কারবার করিতে হয় তখন কার্য্যতঃ সে সামর্থ্যের পরিমাণ

---

* যে শব্দ ভাবকে প্রকাশ করে তাহার মধ্যে চিৎশক্তি সঞ্চারিত হইলে, তাহা ভাবেরই মত বীর্য্যশালী হয়, ইহাই ভারতে মন্ত্রব্যবহার করিবার যুক্তি।

শূন্য হইয়া দাঁড়াইলেও সম্ভাবনারূপে তথায় তাহা বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং সত্তার মধ্যে বাধা দেওয়ার একটা শক্তি পূর্ব্ব হইতে গঠিত হইয়া বর্ত্তমান আছে যাহা উত্তর আলোকের অবতরণের পথে বাধা দেয়, কিম্বা তাহার বীর্য্য হ্রাস করিয়া ফেলে, এ বাধা এত প্রবল হইতে পারে যে তাহা আলোককে অস্বীকার বা বর্জ্জন করিতে পারে অথবা তাহাতে সমর্থ না হইলে সে আলোককে ক্ষুণ্ণ, বশীভূত, সুকৌশলে পরিবর্ত্তিত অথবা অবিদ্যার মধ্যে পূর্ব্বকল্পিত সংস্কারের উপযোগী বা অনুকূল করিয়া লইবার জন্য বিকৃত করিতে প্রয়াস পায়। ইতি-পূর্ব্বে কল্পিত বা গঠিত সংস্কারসকলের আধারে বর্ত্তমান থাকিবার দাবি যদি খণ্ডিত করা যায়, যদি তাহাদের বিদায় করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও আবার তাহারা বাহির হইতে বিশ্বমনের ভাণ্ডার হইতে ফিরিয়া আসিতে চায় অথবা তাহারা নিম্নে নামিয়া প্রাণে, দেহে বা অবচেতনায় আশ্রয় নেয় এবং সুযোগ পাইলেই তথা হইতে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাদের হৃতরাজ্য পুনরধিকারের জন্য চেষ্টা করে ; কেননা পরিণামশীল প্রকৃতির চলিবার পথে যে সোপানকে সে একবার স্থাপিত করিয়াছে, তাহাকে বাঁচিয়া থাকিবার এই অধিকার প্রকৃতিকে দিতে হইয়াছে, যাহাতে তাহার প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক ধাপ নিরেট ও দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে। তাহা ছাড়া বিসৃষ্টির মধ্যস্থিত কোন শক্তির স্বধর্ম্ম ও স্বাভাবিক দাবি এই যে তাহা ফুটিয়া উঠিবে এবং যেখানে বা যত দীর্ঘকাল সম্ভব বাঁচিয়া থাকিবে এবং নিজেকে সার্থক করিয়া তুলিবে ; তাই অবিদ্যার জগতে দেখি বহুশক্তির জটিল সমাবেশের মধ্যে শুধু থাকিযাই যে সব কিছু লাভ করিতে হয় তাহা নহে, পরন্তু সেই সমস্ত শক্তির পারস্পরিক সংঘাত সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণের মধ্যেই রহিয়াছে সে লাভের উপায়। কিন্তু পরিণামের এই উচ্চতম পর্ব্বে জ্ঞানের সহিত অবিদ্যার সকল মিশ্রণকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতেই হইবে, শক্তির সংঘর্ষের মধ্য দিয়া যে ক্রিয়া ও পরিণাম চলিতেছে তাহার স্থানে শক্তির সৌষম্যের মধ্য দিয়া ক্রিয়া ও পরিণামধারাকে চলিতে দিতে হইবে ; কিন্তু আলোক এবং জ্ঞানের শক্তির দ্বারা অবিদ্যার শক্তিকে এক চরম আঘাত হানিয়া তাহাকে পরাজিত করিতে পারিলে শুধু এই অবস্থা আনয়ন করা সম্ভব হইবে। সত্তার নিম্নতর অংশে হৃদয়ে প্রাণে এবং দেহে এই ব্যাপারই আরও তীব্রভাবে পুনরায় দেখা দেয় ; কেননা এখানে বাধা শুধু ভাবের নয়, বাধা আসে নিম্ন প্রকৃতির নানা বাসনা, আবেগ, প্রবৃত্তি, বেদনা, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রাণের নানা ক্ষুধা এবং অভ্যাস হইতে ; ইহারা মনের ভাব হইতে অনেক অল্প পরিণামে সচেতন

বলিয়া আরও অন্ধভাবে সাড়া দেয় এবং আরও অনমনীয়ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে; ইহাদের বাধা দেওয়ার বা ফিরিয়া আসিবার ক্ষমতা মানস সংস্কারেরই মত, বরং আরও বেশী, তাড়া দিলে ইহারা আমাদের চারিপাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে সচেতন পরিবেশ আছে তথায় অথবা তাহাদের নিজেদের নিম্নতর ভূমিতে অথবা বীজরূপে অবচেতনার মধ্যে লুকাইয়া পড়ে, এবং তথা হইতে পুনবায় ভাসিয়া উঠিতে এবং নূতন করিয়া আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়। পরিণামের শক্তিকে, প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত অবর শক্তির বাধা, পুনরাবৃত্তি এবং নির্ব্বন্ধপরতার সহিত লড়াই করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, অথচ রূপান্তর-সিদ্ধি তাহার চরম লক্ষ্য হইলেও অতিশীঘ্র তাহা যাহাতে না আসিয়া পড়ে তাহার জন্য সেই শক্তি নিজেই ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে।

বৃহত্তর অধিরোহণের প্রত্যেক পর্ব্বে তাহা হইলে এই বাধা থাকিবেই যদিও তাহা ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে কমিয়া আসিবে। উর্দ্ধতন আলোক যাহাতে আমাদের সত্তার মধ্যে আদৌ প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়া তাহার ক্রিয়ার ক্ষেত্র গঠিত করিতে পারে তজ্জন্য চাই আমাদের প্রকৃতিকে শান্ত করিবার শক্তি লাভ, চাই মন হৃদয় প্রাণ এবং দেহকে অনুদ্বিগ্ন প্রশান্ত এবং ইচ্ছামত নিষ্ক্রিয় করিবার এমন কি তাহাদিগকে পূর্ণ নৈঃশব্দ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার সামর্থ্য; এ শক্তি লাভ হইলেও বিশ্বগত অবিদ্যার একটা বিরামহীন বাধা স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় অথবা কখনও বা ব্যষ্টি আধারের উপাদান ও বীর্য্যে, তাহার মনের গঠনে, প্রাণনের ধরণে, জড়ের বিগ্রহে একটা প্রতিকূলতা গোপন এবং অস্পষ্টভাবে বহিয়া যাইতে পারে; অথবা অবিদ্যাশ্রিত প্রকৃতির একটা গোপন বিরোধ বা বিদ্রোহ অথবা সংযমিত ও অবদমিত শক্তিসকলের পুনবায় আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস আধারে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিতে পারে; এবং সত্তার কোন অংশ যদি সম্মতি দেয় তবে তাহাদের হৃতরাজ্য পুনরধিকার করিয়া বসিতে পারে। পূর্ব্ব হইতে চৈত্যপুরুষের শাসন প্রতিষ্ঠা অতিশয় কাম্যবস্তু, কেননা তাহাতে আধারের সর্ব্বত্র উত্তর-জ্যোতির দিকে একটা সহজ উন্মুখীনতা জাগে, এবং নিম্নতর অংশগুলির মধ্যে আলোকের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ আছে তাহা প্রশমিত অথবা অবিদ্যার দাবিতে যে তাহাদের সম্মতি আছে তাহা দূর হয়। প্রাথমিকভাবে আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটিলেও অবিদ্যার বন্ধন শিথিল হয়; কিন্তু এই দুইয়ের প্রভাবেও সকল সীমা ও বাধা পূর্ণরূপে দূর হয় না; কেননা এই প্রাথমিক রূপান্তরের ফলে সম্যক্ বা অভঙ্গপূর্ণাঙ্গ চেতনা এবং

জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না ; অবিদ্যার আদি ভিত্তি নিশ্চেতনা তখনও বর্ত্তমান থাকে, অতএব তাহার প্রসারতা এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া তাহাকে পরিবর্ত্তিত এবং আলোকিত করিবার প্রয়োজন লোপ পায় না। আধ্যাত্মিক উত্তরমানসের শক্তি এবং তাহার ভাববীর্য্য (idea-force) আমাদের মননের মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া বিকৃত এবং ক্ষীণবীর্য্য হইয়া পড়িতে বাধ্য হয় বলিয়া এই সমস্ত বাধাকে পূর্ণরূপে দূর করিয়া বিজ্ঞানময় সত্তাকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু তাহা একটা প্রাথমিক রূপান্তর আনয়ন করে, এমন পরিবর্ত্তন সাধন করে যাহাতে সাধকের অধিকতর ঊর্দ্ধে আরোহণ ও শক্তির প্রবলতর অবতরণ সহজ হয় এবং জ্ঞান ও চেতনার বৃহত্তর বীর্য্যে সত্তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরের জন্য আরো অধিক প্রস্তুত করে।

জ্যোতির্মানসের এই বৃহত্তর বীর্য্য আছে, এ মন ঊর্দ্ধ ভাবনার মন নয় কিন্তু অধ্যাত্ম আলোকের মন। ইহাতে উত্তর মানসের বুদ্ধির প্রভা এবং প্রশান্ত দিবালোকের স্থানে অথবা তাহাকে ছাপাইয়া চিৎস্বরূপের এক প্রবল জ্যোতি, এক দীপ্তচছটা এবং ঐশ্বর্য্যময় এক মহিমা ফুটিয়া উঠে ; উপর হইতে আধ্যাত্মিক সত্য ও শক্তির স্ফুরন্ত বিদ্যুদ্দাম চেতনায় নামিয়া আসে এবং বৃহত্তর-ভাবনাময়-চিন্ময় মনস্তত্ত্বের ক্রিয়ার সঙ্গে বা তাহার সহজ প্রকৃতি হইতে যে স্থির এবং উদার আলোক যে বিপুল শান্তি আধারে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার সহিত যুক্ত হয়, তখন উপলব্ধির জন্য অগ্নিগর্ভ আকূতি ও ঐকান্তিকতা এবং জ্ঞানের এক উন্মাদনাময় মহা আনন্দ জাগিয়া উঠে। প্রায়শঃ এ মনের ক্রিয়াকে ঘিরিয়া এক অন্তর্দৃশ্য আলোকের প্লাবন উপর হইতে নামিয়া আসে ; কেননা এখানে মনে রাখিতে হইবে যে আলোককে আমরা সাধারণতঃ যে দৃষ্টিতে দেখি তাহা সত্য নহে ; আলোক প্রধানতঃ জড়ময় সৃষ্টি নয়, এবং আলোকের যে অনুভব বা দিব্যদৃষ্টি আমাদের অন্তরকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলে তাহা আমাদের অন্ত-র্মুখী মনে প্রতিফলিত বস্তুর শুধু একটা চাক্ষুষ প্রতিবিম্ব বা প্রতীকময় একটা প্রতিভাস মাত্র নয় ; মূলতঃ আলোক ভাগবতসত্তারই এক চিন্ময় প্রকাশ, তাহার ধর্ম্ম সৃষ্টি করা এবং সৃষ্ট বস্তুকে উদ্ভাসিত করা ; জড় আলোক জড়ের মধ্যে সেই চিন্ময় আলোকের পরবর্ত্তী স্থূল প্রতিরূপ বা পরিণাম—জড়শক্তির প্রয়ো-জনে তাহার সৃষ্টি। জ্যোতির্মানসের এই অবতরণের ফলে অন্তর্গূঢ় মহাশক্তির মহাবীর্য্যশালী স্বর্ণদ্যুতিযুক্ত এক সংবেগ একটা প্রভাস্বর দিব্যোন্মাদ, একটা জ্যোতির্ম্ময় দুর্ব্বার পরিস্ফুরণ আসিয়া পড়ে, যাহা উত্তর মানসের মন্থর এবং

ভাবনাময় ক্রিয়াধারার স্থানে এক ক্ষিপ্র রূপান্তর প্রতিষ্ঠিত করে, যে রূপান্তর কখনও প্রবল জোয়ারের মত কখনও কূল ভাঙ্গা প্লাবনের মত মহাবেগে অগ্রসর হয়।

জ্যোতির্মানস প্রধানতঃ ভাবনার দ্বারা ক্রিয়া করে না, দিব্যদৃষ্টিই তাহার সাধন; ভাবনা এখানে গৌণ ক্রিয়ামাত্র, তাহা থাকে দৃষ্টিলব্ধ সত্যের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক রূপে। মনন বা ভাবনার উপর যাহাকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয় সেই মানবমন ধারণা করে যে মননই জ্ঞানলাভের উচ্চতম বা প্রধান-তম সাধন বা উপায়; কিন্তু অধ্যাত্মজগতে মনন গৌণবস্তু, জ্ঞানলাভের পক্ষে তাহা অপরিহার্য্য নয়। বলা যায় যে জ্ঞান যেন অনুগ্রহ করিয়া অবিদ্যাকে বাঙ্‌ময় মনন ব্যবহার করিবার অনুমতি দান করিয়াছে, কেননা অর্থবহ শব্দের সুস্পষ্ট সঙ্কেত ছাড়া অজ্ঞান বা অবিদ্যা তাহার বহুমুখী ব্যঞ্জনার সহিত সত্যকে পূর্ণরূপে নিজের কাছে প্রাঞ্জল এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া তুলিতে পারে না; ভাষার এই কৌশল বাদ দিলে সে তাহার ভাবের ঠিক রূপরেখা আঁকিতে বা প্রকাশশীল আকার দিতে অসমর্থ হয়। কিন্তু স্পষ্টতঃ ইহা একটা কৌশল একটা যন্ত্র; মনন বা ভাবনা তাহার উৎপত্তিস্থানে চেতনার উচ্চতর ভূমিতে সাক্ষাৎ প্রত্যয় রূপেই ফুটে; ইহা কোন বস্তুকে বা বস্তুর কোন সত্যকে বোধময় রূপে গ্রহণ; এ অনুভূতি বীর্য্যবান হইলেও অধ্যাত্ম দিব্যদৃষ্টির ক্ষুদ্রতর এক গৌণ পরিণাম; যখন অপেক্ষাকৃত বহির্মুখী ও বহিশ্চর ভাবে আত্মার দৃষ্টি আত্মার উপরে পড়ে অথবা বিষয়ী যখন নিজেকেই অথবা নিজেরই কোন কিছুকে বিষয়রূপে দেখে তখন এ অনুভূতি জাগে; কেননা তথায় সব কিছুই আত্মার বিচিত্র এবং বহুরূপে প্রকাশ। প্রাকৃতমনে, দৃষ্ট বা আবিষ্কৃত কোন বস্তু, তথ্য বা সত্যের সহিত সংস্পর্শজনিত অনুভূতির এক বাহ্য সাড়া জাগে এবং তাহার পর সেই সাড়া হইতে তাহার এক ভাবনাময় রূপায়ণ হয়; কিন্তু অধ্যাত্ম আলোকে চেতনার মূল উপাদান হইতে গভীরতর অনুভূতিতে জাত এক সাড়া দেখা দেয় এবং সেই উপাদানের মধ্যে পূর্ণরূপে তাহা রূপায়িত হয়, সে রূপায়ণে বস্তুর খাঁটি রূপ ফুটে, অথবা তাহাতে সত্তার উপাদানে তাহার স্বরূপ প্রকাশক ভাবলেখ (ideograph) প্রকাশ পায়; সেখানে এই উচ্চতর ভাবময় জ্ঞানকে স্পষ্ট বা পূর্ণ করিবার জন্য বাঙ্‌ময় বিগ্রহ রচনার বা অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। ভাবনা বা মনন সত্যের এক প্রতিরূপ গঠন করে এবং সত্যকে ধারণ ও জ্ঞানের বিষয়রূপে গ্রহণ করিবার জন্য সেই

প্রতিরূপটি প্রাকৃত মনের সম্মুখে উপস্থাপিত করে ; কিন্তু জ্যোতির্ম্মানসের গভীরতর অধ্যাত্ম দৃষ্টির সূর্য্যালোকে সত্যের স্বরূপমূর্ত্তিটি ধরা পড়ে, তখন তাহাকে খাঁটিভাবে ধারণ করা সম্ভব হয়। এই স্বরূপমূর্ত্তির কাছে মনন দ্বারা গঠিত প্রতিরূপ গৌণ এবং জন্য (derivative) বস্তু, এ প্রতিরূপ জ্ঞানকে অপরের নিকট প্রকাশ করিবার পক্ষে খুব শক্তিশালী হইলেও জ্ঞানের গ্রহণ বা ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য নয়।

যে চেতনা দিব্যদর্শনের দ্বারা পরিচালিত যাহাকে ঋষি বা দ্রষ্টার চেতনা বলিতে পারি জ্ঞানের শক্তিতে তাহা চিন্তাশীল বা মনস্বীর চেতনা হইতে বৃহত্তর। অন্তর্দ্দৃষ্টির বোধ বা অনুভবের শক্তি ভাবনার বোধশক্তি হইতে বৃহত্তর এবং অধিক-তর প্রত্যক্ষ ; ইহাকে এক আধ্যাত্মিক বোধ বলিতে পারি, যাহা দিয়া সত্যের মূল উপাদানের কিছু উপলব্ধি করা যায় শুধু তাহার আকারকে নয় ; কিন্তু ইহা সত্যের আকাবেব ছবিও আঁকে এবং সেই সঙ্গে আকারের তাৎপর্য্যও গ্রহণ করে, বরং মননময় ধারণার পক্ষে যাহা সম্ভব নয় এমন স্পষ্টতর রেখায় সত্যের সুন্দরতব এবং অধিকতর আত্মপ্রকাশক ছবি ফুটাইয়া তোলে, ব্যাপকতর অনুভূতি এবং সমগ্রতর বৃহত্তর শক্তি তাহাতে প্রকাশ পায়। উত্তরমানস যেমন সত্তার মধ্যে অধ্যাত্ম-ভাবনার মধ্য দিয়া এবং সেই ভাবনায় সত্যের যে শক্তি প্রকাশ পায় তাহার মধ্য দিয়া এক বৃহত্তর চেতনাকে ফুটাইয়া তোলে, তেমনই জ্যোতির্ম্মানস এবং তাহার দর্শন ও গ্রহণ বা অধিকার করিবার শক্তি তাহার সত্য-দৃষ্টি এবং সত্যজ্যোতির মধ্য দিয়া আরো বৃহত্তর চেতনাকে জাগরিত করে। ইহা আরও শক্তিশালীরূপে আরও বৃহৎ ও সক্রিয় পূর্ণাঙ্গতা গঠনে সক্ষম ; সাক্ষাৎ অন্তর্দ্দৃষ্টি এবং প্রেরণার দীপ্তিতে ইহা ভাবনাময় মনকে উদ্ভাসিত করে, হৃদয়ে অধ্যাত্মদৃষ্টি এবং তাহার অনুভূতি ও আবেগে চিন্ময় আলোক ফুটাইয়া তোলে ; প্রাণশক্তিতে চিন্ময় সংবেগ এবং সত্যানুভূতির প্রেরণা সঞ্চার করে, যাহার ফলে কর্ম্ম শক্তিশালী এবং জীবন ঊর্দ্ধস্রোতা হইয়া উঠে ; এমন কি ইহা ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেও চিন্ময় অনুভূতির এক সাক্ষাৎ এবং সমগ্র বীর্য্য ঢালিয়া দেয়, যাহাতে আমাদের প্রাণময় এবং অন্নময় সত্তা বাস্তবভাবে সর্ব্ববস্তুস্থিত ভগবানের সংস্পর্শ লাভ করে ; সে ক্ষেত্রে আমাদের হৃদয় এবং মন যত গভীরভাবে তাঁহাকে ভাবনা, ধারণা বা অনুভব করে এ সংস্পর্শের গভীরতা তাহা অপেক্ষা বিন্দুমাত্র ন্যূন নয়। ইহার রূপান্তরসাধন সমর্থ আলোক অন্নময় মনের উপর পড়িয়া তাহার সকল সীমার বন্ধন কাটিয়া এবং তাহার স্থিতিধর্ম্মী সকল অসাড়তা ভাঙ্গিয়া

দেয়, তাহার সঙ্কীর্ণ ভাবনার শক্তি এবং সন্দেহের স্থানে দিব্য অন্তর্দ্দৃষ্টিকে স্থাপিত করে, এমন কি দেহের প্রতি কোষে প্রতি অণুতে আলোক এবং চেতনার প্রবাহ বহাইয়া দেয়। উত্তরমানসের দ্বারা আনীত রূপান্তরে, অধ্যাত্ম যোগী এবং মনস্বী সাধক তাহাদের পূর্ণ এবং সক্রিয় সার্থকতা লাভ করে ; জ্যোতির্ম্মানসের দ্বারা আনীত রূপান্তরে যাহাদের আত্মা দিব্যদৃষ্টি এবং সাক্ষাৎবোধ ও অনুভূতির মধ্যে বাস করে সেই সকল দ্রষ্টা বা ঋষি অথবা দীপ্তচেতন আধ্যাত্মরসিক বা ভাবক ঠিক তেমনিভাবে সার্থকতা লাভ করে, কেননা এই সমস্ত উর্দ্ধ্বস্থিত উৎস হইতেই তাহারা আলোক পায় এবং উন্নীত হইয়া সেই আলোকের মধ্যে বাস করা হইবে তাহাদের স্বরাজ্যে প্রবেশ।

অধিরোহণের এ দুটি ভূমি তৃতীয় আর একটি ভূমি হইতে তাহাদের বীর্য্য এবং তাহাদের উভয়ের মিলনজাত পূর্ণতা লাভ করে ; কেননা এই উত্তুঙ্গ শিখরে বোধিময় সত্তা বাস করে, তথা হইতেই উত্তরমানস এবং জ্যোতির্ম্মানস তাহাদের জ্ঞানলাভ করে এবং সে জ্ঞানকে তাহারা ভাবনা অথবা দৃষ্টির আকার দিয়া প্রাকৃত-মনের রূপান্তরের জন্য আমাদের নিকট নামাইয়া আনে। সম্বোধি হইতেছে চেতনার এমন এক শক্তি যাহা একত্ববোধজাত আদিজ্ঞানের আরও নিকট আরও অন্তরঙ্গ ; কারণ গোপন তাদাত্ম্যজ্ঞান হইতেই কিছু সাক্ষাৎভাবে উদ্ভূত হইয়া সম্বোধি রূপে সর্ব্বদা আত্মপ্রকাশ করে। যখন বিষয়ীর চেতনা বিষয়ে অবস্থিত চেতনার সংস্পর্শে আসে, যখন তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং যাহার সহিত সংস্পর্শে আসিয়াছে তন্মধ্যস্থ সত্যকে দেখে, বোধ করে এবং তাহার স্পন্দনের সঙ্গে নিজেও স্পন্দিত হয়, তখন সংস্পর্শের আঘাত হইতে স্ফুলিঙ্গ বা বিদ্যুৎ-চমকের মত বোধিচেতনা হঠাৎ প্রকাশিত হয়। অথবা যখন চেতনা সেরূপ সংস্পর্শে না আসিয়া নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং সেখানে যে সত্য বা সত্যসকল আছে তাহা সাক্ষাৎ এবং অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করে অথবা প্রতিভাসের অন্তরালে অবস্থিত গোপন শক্তির সঙ্গে তেমনভাবেই নিবিড় স্পর্শ লাভ করে, তখন বোধির আলোক জ্বলিয়া উঠে ; অথবা আবার যখন চেতনা পরম সত্যবস্তুর বা বস্তু ও সত্তাসকলের চিন্ময় সত্যের সংস্পর্শ লাভ করে এবং এই লোকোত্তর স্পর্শের মধ্য দিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়, তখন তাহার গভীরে অন্তরঙ্গ সত্যবোধ জ্বলিয়া উঠে—স্ফুলিঙ্গের মত, বিদ্যুৎচমকের মত বা লেলিহান শিখার মত। এই অন্তরঙ্গ বোধিজাত অনুভূতি, অন্তর্দ্দৃষ্টি বা ভাবনা বা প্রত্যয় হইতেও বেশী কিছু ; মর্ম্মাবগাহী এবং আত্মপ্রকাশক সংস্পর্শ

হইতে এই যাহা জাত হয় দৃষ্টি এবং ভাবনা তাহার অন্তর্ভুক্ত থাকে অথবা তাহারা তাহার স্বাভাবিক পরিণাম। বোধির এই জ্ঞানের মধ্যে এক গুপ্ত এবং অর্দ্ধসুপ্ত একত্ববোধ রহিয়াছে, নিজেকে যাহা এখনও খুঁজিয়া পায় নাই, তথাপি তাহা এই বোধির সহায়তায় তাহার নিজের মধ্যস্থ বস্তু বা ভাবসকলকে আত্ম-স্বরূপে দেখিবার এবং অনুভব করিবার নিবিড়তাকে, নিজ সত্যের জ্যোতিকে, তাহার স্বতঃসিদ্ধ নৈশ্চিত্যের অমোঘ বীর্য্যকে স্মরণ ও বহন করে।

সম্বোধি এইভাবে মানুষের মনেও সত্যকে বহন করে এবং তাহাতে সত্যের স্মৃতি জাগায় অথবা পুঞ্জিত অবিদ্যার মধ্যে বা নিশ্চেতনার আবরণের মধ্য দিয়া এমনিভাবে আত্মপ্রকাশক বিদ্যুৎঝলক বা অগ্নিশিখার মতই অনুপ্রবিষ্ট হয়; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে সেখানে আসিলে ইহা মিশ্রিত হইয়া পড়ে, ইহার উপর একটা মনোময় প্রলেপ লাগিয়া যায় অথবা ইহা বাধাগ্রস্ত ও গতি-রুদ্ধ হয়, এমন কি ইহার স্থানে অন্যবস্তু দেখা দেয়; তাহা ছাড়া বহুরূপে ইহার বাণীকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকাতে তাহার শুদ্ধ ও পূর্ণ ক্রিয়া হইতে পারে না। আবার অনেক সময় মনে হয় সত্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেন বোধির প্রকাশ হইতেছে; সেগুলিকে বোধির বিকাশ না বলিয়া শুধু কোন সংবাদ বা বাণী বলাই অধিকতর সঙ্গত; ইহাদের উৎপত্তিস্থান, সার্থকতা এবং প্রকৃতিতেও বহু বৈচিত্র্য আছে। যাহার মধ্যে বিচারশক্তি এখনও প্রস্ফুরিত হয় নাই তেমন ভাবের তথাকথিত ভাবক বা অধ্যাত্মরসিক, অন্ধকারময় বিপদ-সঙ্কুল কোন উৎস হইতে প্রাণভূমিতে আগত তদ্রূপ বাণীর দ্বারা প্রায়ই অনু-প্রাণিত হয়; তথাকথিত, কেননা যুক্তিবিচারকে বর্জন করিয়া যাহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই এমন উৎস হইতে আগত কোন ভাবনা বা ক্রিয়াধারার উপর নির্ভর করিলেই খাঁটি ভাবক হওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় আমরা প্রধানতঃ যুক্তিবুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হই, এমন কি বোধির অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বোধির ছদ্মবেশে উপস্থিত অন্য কিছুর ইঙ্গিতকে ভূয়োদর্শী বিবেকী বুদ্ধির দ্বারা শাসন করিবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ি; কেননা আমাদের বুদ্ধিতে এই বোধ জাগে যে অন্য কোন প্রকারে কোন্‌টা সত্যবস্তু কোন্‌টা মিশ্রিত বা ভেজাল অথবা মিথ্যা কোন্ বস্তুকে সত্য বলিয়া চালান হইয়াছে তাহা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করিতে পারি না। কিন্তু ইহাতে বোধির সার্থকতা আমাদের কাছে অনেকটা কমিয়া যায়; কেননা এ ক্ষেত্রে আমরা তর্কবুদ্ধিকে নির্ভরযোগ্য বিচারক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না; তাহার কারণ তাহার

বিচারের ধারা পৃথক, চরম ও নিশ্চিত কোন জ্ঞানে পৌঁছিবার শক্তি তাহার নাই ববং বলিতে পারি যে সে সত্যকে অনুসন্ধান মাত্র করে ; কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য যদিও বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে কোন ছদ্মবেশী বোধির উপর নির্ভর করে – কেননা বোধির সাহায্য না লইয়া বুদ্ধি তাহার পথ স্থির করিতে বা নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতেই পাবে না—তথাপি যুক্তির বলে সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি বা অনুমানদ্বারা লব্ধ মত পরীক্ষাদ্বাবা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে ইহা মনে কবিয়া বোধির উপর তাহার এই নির্ভরশীলতা সে নিজেব কাছেও গোপন রাখিতে চায়। বুদ্ধির বিচাবে স্বীকৃত বোধিকে আর বোধি বলা চলে না, তখন বোধিব প্রামাণ্য, যাহার নিশ্চিত ভাবে সত্যকে জানিবাব কোন স্বাভাবিক আন্তর উপায় নাই সেই যুক্তিবিচারের উপরই নির্ভর করে। এমন কি মন যদি প্রধানতঃ বোধিময়, তাহার উচ্চতর বৃত্তি যদি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে তাহা হইলেও জ্ঞানের সঙ্গে তাহার পৃথক পৃথক ক্রিয়াবলির একটা সামঞ্জস্য-স্থাপন দুরূহ থাকিয়াই যাইবে, কেননা মনে বোধির বিদ্যুৎ-চমকের পরম্পবা দেখা দিলেও তাহাদেব ভিতরকার সম্বন্ধ সর্ব্বদাই অপূর্ণ এবং অস্পষ্ট বোধ হইবে ; সৌষম্য ও সামঞ্জস্য স্থাপন তখনই সম্ভব হইবে যখন এই নূতন মননশক্তি বুদ্ধির অতীত ক্ষেত্রে তাহাব নিজের যে উৎস আছে তাহার সঙ্গে সচেতনভাবে যুক্ত হইবে অথবা যখন তাহা উন্নীত হইয়া এমন এক ঊর্দ্ধ্ব চিন্ময় ভূমিতে পৌঁছিবে যেখানে বোধির ক্রিয়া শুদ্ধ এবং স্বাভাবিক।

বোধি সর্ব্বত্রই কোনও ঊর্দ্ধ্বতর আলোকেব প্রান্ত বা বশ্মি বা বহিঃ-প্রকাশ ; ইহা এক সুদূব অতিমানস আলোক হইতে আমাদেব মধ্যে প্রতিক্ষিপ্ত এক শিখা বা প্রান্ত কিম্বা একটা বিন্দু, আমাদের প্রাকৃত মন এবং অতিমানসের মধ্যস্থিত সত্য-মানসের এক অন্তরিক্ষলোকের মধ্য দিয়া আসিবার সময় ইহা কিছুটা পরিবর্ত্তিত হয় এবং এইভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদের অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাকৃত মনোময় উপাদানের মধ্যে যখন অনুপ্রবিষ্ট হয় তখন তাহা দ্বারা আরও পরিবর্ত্তিত হয় এবং অত্যন্ত অন্ধকারাবৃত হইয়া পড়ে, কিন্তু লোকোত্তর ভূমিতে, তাহার স্বধামে ইহার দীপ্তি সুনির্ম্মল সুতরাং সেখানে ইহা পূর্ণরূপে ঋতম্ভরা বা সত্যময় ; সেখানে তাহার রশ্মিমালা সংহত এবং পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ বা একত্রে ঘনীভূত, পরস্পর হইতে পৃথক নহে, সেখানে তাহার জ্যোতির তরঙ্গের যে খেলা চলে সংস্কৃত কবির ভাষায় তাহাকে "স্থিরা সৌদামিনীর" এক সমুদ্র বা তাহার পুঞ্জীভূত এক প্রভার লীলা বলা যাইতে পারে।

বোধিলোকে আমাদের চেতনা উত্তীর্ণ হওয়ার অথবা বোধির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের কোন সুস্পষ্ট পথ আবিষ্কারের ফলে বোধির এই আদি ও সহজ দীপ্তি যখন আমাদের সত্তায় নামিয়া আসিতে আরম্ভ করে তখন কখনও বিদ্যুৎ-চমকের মত থাকিয়া থাকিয়া কখনও অবিরত ধারায় আলোকপ্রবাহের মধ্য দিয়া তাহার খেলা চলিতে পারে ; কিন্তু এই অবস্থায় বুদ্ধি দিয়া বোধির বিচার একে-বারেই অচল হইয়া পড়ে, তখন বুদ্ধি কেবল দর্শক বা অনুলেখক (registrar) রূপে এই উত্তর শক্তির জ্যোতির্ম্ময় বাণী, বিচারফল, সূক্ষ্মভেদ-নির্দ্দেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে এবং বুঝিতে ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। যে চৈতন্যে বোধির অবতরণ ঘটে, বোধির কোন বিবিক্ত প্রকাশকে পরীক্ষা কিম্বা পূর্ণ করি-বার জন্য অথবা তাহার বৈশিষ্ট্য তাহার প্রয়োগবিধি তাহার অধিকার কিম্বা সীমানিরূপণ করিবার জন্য সে চৈতন্যকে অন্য এক অনুপূরক বোধি প্রকাশের উপরই নির্ভর করিতে হয় অথবা সকলকে যাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে পারে এমন এক পুঞ্জিত বোধিকে আবাহন করিয়া আধারে নামাইবার সামর্থ্য অর্জন করিতে হয়। কারণ একবার বোধির আবেশে চেতনার রূপান্তর-ক্রিয়া আরম্ভ হইলে মনের উপাদান ও ক্রিয়াবলিকে বোধির উপাদান, আকৃতি ও বীর্য্যে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। যতদিন তাহা সম্ভব না হয় যতদিন বোধির আলোককে ব্যবহার করিয়া তাহার সেবা করিয়া তাহার কার্য্য-সাধনে সহায়তা করিয়া যে নিম্নতর প্রাকৃতবুদ্ধি বর্ত্তমান আছে তাহার উপর চেতনার ক্রিয়াধারা নির্ভর করে, ততদিন সত্তায় জ্ঞান ও অজ্ঞানের মিশ্রণ থাকিয়াই যায়, কেবল তাহার জ্ঞানের অংশ উত্তর-আলোক ও শক্তি লাভ করিয়া কিছু উর্দ্ধ্বগতি লাভ করে, অজ্ঞান কতকটা প্রশমিত হয়।

সম্বোধির শক্তি বা সামর্থ্য চতুরঙ্গ ; তাহার সত্যদর্শনের সামর্থ্য বস্তুর স্বরূপজ্ঞান উন্মোচিত করে, তাহার সত্যশ্রবণের সামর্থ্য অন্তরে দিব্যপ্রেরণা জাগায়, তাহার সত্য স্পর্শের সামর্থ্য বস্তুর মর্ম্মসত্য ও তাৎপর্য্যের ধৃতি বা ধারণা সাক্ষাৎভাবে ফুটাইয়া তোলে—আমাদের মানসীবুদ্ধিতে সাধারণতঃ বোধির এই বিভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায় ; সম্বোধির চতুর্থ বিভাব হইল স্বতঃস্ফূর্ত্ত সত্য বিবেকের সামর্থ্য যাহা সত্যের সঙ্গে সত্যের সুব্যবস্থিত এবং খাঁটি সম্বন্ধ আবিষ্কার করে। অতএব তর্কবুদ্ধির যাবতীয় ক্রিয়া এমন কি তাহার যে বিশেষ ক্রিয়াধারা বস্তু ও ভাবরাজির যথার্থ সম্বন্ধ নির্ণয় করে তাহা সমস্তই সম্বোধি নিষ্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু নিষ্পন্ন করে আরও উন্নত নিজস্ব

ধারায় এবং অব্যর্থ ও অবিকম্পিতভাবে। ইহা যে কেবল ভাবনাময় মনকেই গ্রহণ করিয়া নিজ উপাদানে রূপান্তরিত করে তাহা নহে, পরন্তু সে রূপান্তরের ক্রিয়াধারা হৃদয়, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং দৈহিক চেতনাতেও সঞ্চারিত হয়; ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই গোপন আলোক হইতে জাত স্বকীয় একটা বোধি-বৃত্তি আছে; কিন্তু উপর হইতে যখন সম্বোধির শুদ্ধ বীর্য্য নামিয়া আসে তখন তাহা সকলকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে এবং হৃদয় প্রাণ ও দেহের এই সকল গভীরতর বোধিশক্তিতে একটা বৃহত্তর পূর্ণতা এবং পূর্ণাঙ্গতার সামর্থ্য জাগাইয়া তোলে। এইরূপে ইহা সমস্ত চেতনাকেই সম্বোধির উপাদানে রূপান্তরিত করে, কেননা ইহা সাধকের সংকল্পে, বেদনায়, ভাবের আবেগে, প্রাণের সংবেগে, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্রিয়ায় এমন কি দেহগত চেতনার সকল বৃত্তিতে নিজের বৃহত্তর জ্যোতির্ম্ময় গতি ও শক্তি সঞ্চারিত করে; ইহা সত্যের শক্তি ও দীপ্তির শিখা প্রজ্বালিত করে এবং সকল বৃত্তির জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়কেই আলোকিত করিয়া তাহাদিগকে এক নূতনভাবে ও বীর্য্যে ঢালাই করে। এইরূপে চেতনাতে একপ্রকার পূর্ণাঙ্গতা দেখা দিতে পারে কিন্তু তাহা পূর্ণ ও অভঙ্গ কিনা তাহা বোধির এই নূতন আলোক অবচেতনার কতখানিকে অধিকার এবং মূল নিশ্চেতনার মধ্যে কতটা প্রবেশ করিল তাহার উপর নির্ভর করে। এইখানে সম্বোধির দীপ্তি ও শক্তি ব্যাহত হইতে পারে, কেননা সম্বোধি অতিমানসের আভাস এবং ক্ষুণ্ণবীর্য্য প্রতিভূ মাত্র, অতএব একাত্মতা বোধজাত জ্ঞানের পূর্ণশক্তিকে আধারে নামাইয়া আনিতে পারে না। আমাদের অপরা প্রকৃতির ভিত্তিস্বরূপ নিশ্চেতনা এত বিশাল এত গভীর এত নিরেট যে ঋতময়ী প্রকৃতির কোন নিম্নতর শক্তি তাহাতে পূর্ণরূপে প্রবেশ করিতে বা তাহাকে জ্যোতিঃশক্তিতে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হয় না।

সম্বোধির পরের ধাপে আমরা অধিমানসে উত্তীর্ণ হই, সম্বোধিজাত রূপান্তর এই উচ্চতর আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের ভূমিকামাত্র। আমরা দেখিয়াছি যে, এমন কি যখন অধিমানস, ক্রিয়ার মধ্যে পূর্ণতার প্রকাশ না করিয়া তাহার মধ্যস্থিত নির্ব্বাচনী বৃত্তিকে শুধু ফুটাইয়া তোলে, তখনও তাহাতে বিশ্বচেতনার এক শক্তি, পরিপূর্ণজ্ঞানের এক তত্ত্বের প্রকাশ পায়, তাহা নিজের মধ্যে এমন এক আলোককে ধারণ করিয়া রাখে যাহা অতিমানস-বিজ্ঞানঘন জ্যোতিরই প্রতিভূ। অতএব কেবলমাত্র বিশ্বচেতনার মধ্যে উন্মিষিত হইয়াই অধিমানসের আরোহ ও অবরোহের ধারাকে আমরা পূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিতে সমর্থ হই; তাহার

জন্য কেবলমাত্র উর্দ্ধ্বভূমির দিকে ব্যক্তিচেতনার তীব্র এবং গভীরভাবে উন্মীলিত হওয়াই প্রচুর নহে, লোকোত্তর জ্যোতির তুঙ্গ শৃঙ্গের দিকে আরোহণের সঙ্গে আরও চাই চেতনার দিগন্তের দিকে এক সুবৃহৎ বিস্তার, চাই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া চিৎসত্তার একটা অখণ্ডতার বোধ জাগানো। অন্ততপক্ষে বহিশ্চর মন এবং তাহার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর স্থানে অন্তরপুরুষের গভীরতর ও উদারতর চেতনার প্রতিষ্ঠা করিতে এবং বিশ্বাত্মতাবোধের বিপুলতার মধ্যে বাস করিতে শিখিতে হইবে; কারণ তাহা না হইলে অধিমানসী দৃষ্টিভঙ্গী যেমন খুলিবে না, তেমনি অধিমানসী শক্তি তাহার বীর্য্যবান ক্রিয়াধারা প্রকাশের ক্ষেত্র পাইবে না। অধিমানসের অবতরণে অহংবুদ্ধির আত্মকেন্দ্রিকতার প্রাধান্য পূর্ণ বশীভূত বা ব্যাহত হইয়া পড়ে, সত্তার বিশাল বিস্তারের মধ্যে অহং আত্মহারা হইয়া যায় এবং অবশেষে তাহার বিনাশ ঘটে, তাহার স্থানে অসীম বিশ্বাত্মার ও বিশ্বগতির উদার ও বিপুল এক বিশ্বগত বোধ ও অনুভূতি আসিয়া দেখা দেয়; যাহারা পূর্ব্বে অহংকেন্দ্রিক ছিল তাহাদের অনেক ক্রিয়া তখনও সত্তায় বর্ত্তমান থাকিতে পারে কিন্তু তাহারা বিশ্বময় বিশালতার সাগর বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা প্রবাহের মতই দুলিতে বা চলিতে থাকে। তখন মননের অধিকাংশ আর ব্যষ্টিভাবে দেহ বা প্রাকৃত সত্তা হইতে জাত বলিয়া মনে হয় না; মনে হয় উর্দ্ধ্ব হইতে অথবা বিশ্বমনের তরঙ্গদোলার মাথায় চড়িয়া যেন তাহারা আসিতেছে; ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টিতে বা আন্তর জ্ঞানে বস্তুর যে রূপ ফোটে অথবা যে বোধ জাগে তাহা দিব্যদর্শন এবং দিব্যালোক বলিয়াই দেখা যায়, সে দর্শন এবং আলোকের উৎস বিশ্বাত্মার জ্ঞানের মধ্যে রহিয়াছে, বিবিক্ত কোন ব্যক্তিসত্তার মধ্যে নহে; বোধহয় যে, সমস্ত অনুভূতি সংবেদন এবং হৃদয়ের আবেগ ঠিক তেমনিভাবে সেই একই বিশ্বগত বৈপুল্য হইতে আসিয়া তরঙ্গরূপে সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং বিশ্বাত্মার ব্যক্তিকেন্দ্রে তাহার অনুরূপ সাড়া জাগিতেছে; কেননা দেহ বিপুল বিশ্বলীলার একটি ক্ষুদ্র আধার অথবা তাহার চেয়েও নগণ্য, বিরাট বিশ্বযন্ত্রের ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য একটা বিন্দু মাত্র। এই সীমাহীন বিপুলতার মধ্যে কেবল যে বিবিক্ত অহং-এর লয় ঘটিতে পারে তাহা নহে, ব্যক্তিত্বের সকল সংস্কার এমন কি ভগবানের দাস বা যন্ত্ররূপে ব্যক্তিভাবনার গৌণ বোধটুকু পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে; তখন বিশ্বসত্তা, বিশ্বচেতনা, বিশ্ব-আনন্দ এবং বিশ্বশক্তির খেলা শুধু অবশিষ্ট থাকে; যদিই বা যাহা পূর্ব্বে

সাধকের ব্যক্তিগত মন প্রাণ বা দেহ ছিল, তাহাকে আনন্দ ও শক্তির কেন্দ্ররূপে অনুভূত হয় তবু তাহাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের বোধ থাকিবে না, তাহা প্রকাশের এক ক্ষেত্র মাত্র মনে হইবে ; আনন্দের অথবা শক্তির ক্রিয়ার বোধ সেই ব্যক্তিতে বা সেই শরীরে মাত্র নিবদ্ধ থাকিবে না কিন্তু যে অসীম অদ্বয় চেতনা সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহার সর্ব্বত্র অনুভূতি হইতে পারিবে।

কিন্তু অধিমানস চেতনা এবং অনুভূতি বহুরূপে রূপায়িত হইতে পারে ; কেননা অধিমানসে আছে সাবলীলতার বৃহৎ ছন্দ, তাহা বহুবিচিত্র সম্ভাবনার ক্ষেত্র। তাহার মধ্যে কেন্দ্রবর্জিত কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অসংস্থিত অতিব্যাপ্তির স্থানে 'আমাতেই বিশ্ব অবস্থিত বা আমিই বিশ্ব' এরূপ বোধও দেখা দিতে পারে ; কিন্তু সে আমি অহংকারের কাঁচা আমি নয়, সে আমিত্ব শুদ্ধ মুক্ত স্বরূপগত আত্মচেতনারই এক সম্প্রসারণ মাত্র অথবা সর্ব্বভূতের সহিত যাহা এক এমন একটা কিছু ---যিনি বিশ্বপুরুষ ইহা তাঁহারই একটা প্রসারণ তাঁহারই এক আত্মমূর্ত্তি, ইহা ব্যষ্টিরূপে অবস্থিত বিশ্বাত্মা। বিশ্বচেতনার এক অবস্থায় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়া এক ব্যক্তিত্ব থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তি সকল বস্তু বা সত্তা, সকল ভাবনা ও বোধ, সকলের সুখ ও দুঃখের সঙ্গে, এক কথায় বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহার সঙ্গে নিজে এক হইয়াই থাকে ; আবার আর এক অবস্থায় সকল সত্তা এক ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং সেই সত্তার অংশরূপে তথায় সকল সত্তার জীবনের সত্তা বর্ত্তমান থাকে। অনেক সময় বিশ্বপ্রকৃতির বিপুল ক্রিয়ায় তাহার স্বাধীন খেলায় কোন শাসন বা নিয়ন্ত্রণ থাকে না, যাহা ব্যক্তিপুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিল তাহা, নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করিয়া অথবা সক্রিয়ভাবে তাহার সহিত এক হইয়া এ খেলায় সাড়া দেয় ; কিন্তু চিৎসত্তা তখনও এই নিষ্ক্রিয়তা অথবা এই সার্ব্বভৌম ও নৈর্ব্যক্তিক একাত্মবোধ ও সহানুভূতি ইহার কোনটির কোন প্রতিক্রিয়ার বন্ধন স্বীকার না করিয়া অবিচল ও স্বাধীনভাবেই বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু অধিমানসের গভীর প্রভাব ও পূর্ণক্রিয়ার সঙ্গে বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বরই আবিষ্ট থাকিয়া সব কিছু প্রশাসিত করিতেছেন, পূর্ণরূপে সবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত করিতেছেন---এই এক অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ বোধ জাগিয়া উঠিতে এবং স্বাভাবিক হইয়া পড়িতে পারে ; অথবা দেহরূপ যন্ত্রের শীর্ষোপরি এবং তাহার পরিচালকরূপে চিৎসত্তার এক বিশেষ কেন্দ্র অভিব্যক্ত বা সৃষ্ট হইতে পারে যাহা অস্তিত্বের তথ্যের দিক হইতে

ব্যষ্টিভাবাপন্ন হইলেও অনুভূতিতে নৈর্ব্ব্যক্তিক, স্বাধীন চেতনা যাহাকে বিশ্বাতীত ও বিশ্বপুরুষের ক্রিয়ার যন্ত্র বা নিমিত্তমাত্র বলিয়াই বোধ করিবে। অধিমানস হইতে অতিমানসে উত্তরায়ণের সময় এই কেন্দ্রীকরণ মৃত অহং-এর স্থানে এক নিত্যসত্য ব্যষ্টিসত্তাকে আবিষ্কার করিবে যে-সত্তা পরমাত্মার সহিত স্বরূপতঃ এক, ব্যাপ্তিতে বিশ্বের সহিত একাত্ম, অথচ অনন্তের বিশিষ্ট ভাবের ক্রিয়াধারার যুগপৎ বিশ্বগত এক কেন্দ্রএবং পরিধি।

অধিমানসের এই সমস্ত সাধারণ ফল তাহার প্রথম পর্ব্বে দেখা দেয়, ইহারাই উন্মিষিত অধ্যাত্মসত্তায় অধিমানস চেতনার স্বাভাবিক ভিত্তি গড়িয়া তোলে, কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য এবং পরিণামসকলের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায় না। যে চেতনা এইভাবে ক্রিয়া করে তাহাকে সত্য ও জ্যোতির চেতনা, সত্য ও জ্যোতিতে ভরা অকুণ্ঠ বীর্য্য শক্তি ও ক্রিয়ারূপে অনুভূত হয়, আত্মবিস্তারে যাহা সর্ব্বগত অথচ বহু বিচিত্র এরূপ শ্রী, রসচেতনা ও আনন্দরূপে তাহা আমাদের অনুভবে জাগে; একই ক্রিয়া ও গতিতে এবং সকল ক্রিয়ায় সকল গতিতে তাহা সমগ্রকে এবং সর্ব্ববস্তুকে আলোকোদ্ভাসিত করে; তাহার সঙ্গে থাকে তাহার অনন্ত সম্ভাবনাসকলের সর্ব্বদা বিস্তারশীল খেলা, যে খেলা অন্তহীন বিশেষের অফুরন্ত ও অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্র্যে ভরা। এই লীলোচ্ছলতার মধ্যে ঋত এবং ছন্দ প্রতিষ্ঠাকারী অধিমানস-সংবিৎ অনুপ্রবিষ্ট হইলে চেতনা ও তাহার ক্রিয়ার এক বিশ্বময় রূপায়ণ গড়িয়া উঠে, যাহা মনোময় রূপায়ণের মত আড়ষ্ট ও কঠিন নয়; এ রূপায়ণ সাবলীল ও প্রাণোচ্ছল, ইহা এমন কিছু যাহা বর্দ্ধিত ও পরিণত হইয়া অনন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে। তখন যে নূতন প্রকৃতি দেখা দেয় তাহা সকল আধ্যাত্মিক অনুভবকে আত্মসাৎ করিয়া লয়, আধ্যাত্মিক অনুভব তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত হইয়া উঠে, দেহ মন প্রাণের সকল মৌলিক অনুভব গৃহীত, আধ্যাত্মিকভাবে বিভাবিত ও রূপান্তরিত এবং তাহাদিগকে অনন্ত সৎস্বরূপের চেতনা, আনন্দ ও শক্তিরই রূপ বলিয়া অনুভূত হয়। তখন সম্বোধি ও জ্যোতির্মানসের দৃষ্টি ও ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটে, তাহাদের উপাদানে আরও প্রাচুর্য্য আরও সান্দ্রতা আরও বীর্য্য দেখা দেয়; তাহাদের গতি ও ক্রিয়া আরও সর্ব্বগ্রাহী, পূর্ণ, বহুমুখী হয়, তাহাদের সত্যবীর্য্য আরও উদার ও সমর্থ হইয়া উঠে, পুরুষের সমগ্র প্রকৃতি, জ্ঞান, করুণা, বেদনা, রসচেতনা ও শক্তি আরও উদার সর্ব্বগ্রাহী সর্ব্বাবগাহী বিশ্বতোমুখ এবং অনন্ত হইয়া উঠে।

অধিমানস রূপান্তর সক্রিয় আধ্যাত্মিক রূপান্তরের চরম ধারা, ইহা আধ্যাত্মিক মনের ভূমিতে চিৎসত্তার প্রতিষ্ঠা ও স্ফুরণের চরম অভিব্যক্তি। ইহা ইহার নিম্নস্থিত তিনটি ধাপের সব কিছুকে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিশিষ্ট ক্রিয়াধাবাকে উচ্চতম ও বিপুলতম করিয়া তোলে, তাহার সঙ্গে বিশ্বব্যাপী চেতনা ও শক্তির ঔদার্য্য, সকল সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস জ্ঞানের একতানতা, সত্তার আরও বিচিত্র আনন্দ-ধারা যোগ করিয়া দেয়। তবু অধিমানসের স্থিতি এবং শক্তিতে তাহার নিজস্ব এমন বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য আধ্যাত্মিক পরিণামেব চরম সম্ভাবনাকে রূপ দেওয়া তাহার সাধ্যে কুলায় না। অধিমানস স্বরূপতঃ নিম্নতর গোলার্দ্ধের শক্তি যদিও তাহা সেখানকার উচ্চতম শক্তি: বিশ্বগত ঐক্যভাবনা তাহার ভিত্তি হইলেও, বিভাজন ও অন্যোন্যক্রিযার মধ্য দিয়াই তাহার ক্রিযা-শক্তি প্রকাশ পায়, বহুত্বের খেলাব উপব দাঁড়াইয়া সে ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। সকল প্রকার মনের মত, সম্ভাবনারাজি লইযা তাহার খেলা চলে, যদিও অবিদ্যার মধ্যে না থাকিয়া এই সমস্ত সম্ভাবনার মধ্যে যে সত্য আছে তাহার জ্ঞান লইয়াই সে চলে তবু তাহা সে সমস্তকে তাহাদের শক্তিপরিণামেব স্বতন্ত্র ধারার মধ্য দিয়াই ফুটাইয়া তোলে। বিশ্বের প্রতি তত্ত্ব বা সূত্রেব মধ্যে যে মূল তাৎপর্য্য নিহিত আছে তদনুসাবে তাহাব কার্য্য নির্ব্বাহ করে কিন্তু বিশ্বাতীত ভূমিতে পৌঁছাইয়া দিবার সক্রিয় শক্তি তাহাতে নাই। এখানে এই পার্থিব জীবনে বিশ্বগত যে সূত্রকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে ক্রিয়া করিতে হয় তাহার ভিত্তি হইল পূর্ণ নিশ্চেতনা, মন প্রাণ ও জড় তাহাদের লোকোত্তর পরম উৎস হইতে বিচ্যুত এবং পৃথক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই সে নিশ্চেতনা দেখা দিয়াছে। এই বিভাজনের উপর সেতু নির্ম্মাণ কবিয়া অধিমানস সেই পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পাবে যেখানে ভেদদর্শী মন অধিমানসে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাব ক্রিয়াধারার অংশে পরিণত হয়; ইহা ব্যষ্টিমনকে বিশ্বমনের উচ্চতম ভূমিতে লইয়া গিয়া তাহার সহিত মিলাইয়া দিতে পারে; ব্যষ্টিসত্তাকে বিশ্বাত্মার সহিত একাত্ম করিয়া প্রকৃতিতে বিশ্বক্রিয়ার ঔদার্য্য ফুটাইতে পারে; কিন্তু মনকে সে নিজের অতীত ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে পারে না, এবং নিশ্চেতনা যাহার আদি সেই জগতে সে বিশ্বাতীত বস্তুর শক্তিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না, কেননা একমাত্র অতিমানসে আছে আত্মনিয়ন্ত্রিত চরম সত্যক্রিয়া এবং বিশ্বাতীতের আত্মপ্রকাশের সাক্ষাৎ শক্তি। অধিমানস, চেতনাকে সেই পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় যেখানে এক বিপুল আলোকিত সর্ব্বজনীনতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং

যেখানে অখণ্ড সৎ চিৎ ও আনন্দের চিন্ময় জ্ঞানের এই ঔদার্য্য ও শক্তির সুসংহত খেলা চলে, কিন্তু তাহাব পর আর অগ্রসর কবাইয়া দেওয়ার সাধ্য তাহার নাই, তাহাব পক্ষে আরও অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইতে পারে যদি বিশ্ব হইতে জীবচেতনাকে বিশ্বাতীত সত্তায় উত্তীর্ণ করিবার সংকল্প ও আকৃতি লইয়া চিৎসত্তার পরার্দ্ধেব দ্বার উন্মোচন করা যায়।

পার্থিব পরিণামের ক্ষেত্রে অধিমানসেব অবতরণ নিশ্চেতনাকে পূর্ণরূপে রূপান্তরিত কবিতে পাবে না, যে ব্যক্তিকে ইহা স্পর্শ করে তাহার সমগ্র সচেতন সত্তা, তাহার ভিতর এবং বাহির, তাহার ব্যক্তিভাব এবং বিশ্বগত নৈর্ব্যক্তিক ভাব, এ সমস্তকে তাহাব নিজের উপাদানে রূপান্তরিত করিতে এবং নিজের উপাদান অবিদ্যাব উপর আরোপ করিয়া তাহাকে বিশ্বসত্য এবং বিশ্বজ্ঞানের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিতে পাবে—ইহাই তাহাব সাধ্যেব সীমা। কিন্তু তাহাতে নিশ্চেতনাব এক ভিত্তি থাকিয়াই যায়; এ যেন সূর্য্য ও সৌবজগৎ মহাকাশেব আদিম অন্ধকাবের মধ্যে স্বীয় কিবণ বিকিবণ কবিয়া যতদূর পর্য্যন্ত তাহাদেব বশ্মিমালা বিস্তাবলাভ কবিতে পাবে ততদূব পর্য্যন্ত সমস্ত আলোকিত করিয়া তোলা, ফলে সে আলোকেব মধ্যে যাহাবা বাস কবে তাহারা বোধ করে যে তাহাদের অনুভূতির বাজ্যেব মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র অন্ধকাব নাই। কিন্তু যতদূব পর্য্যন্ত এ আলোক পৌঁছে, এ অনুভূতি বিস্তৃত হয তাহার বাহিবে আদিম অন্ধকাবেব বাজত্ব বর্ত্তমান থাকে, এবং অধিমানসেব বাজ্যমধ্যে যখন সকল কিছুই সম্ভব, তখন অন্ধকার তাহাব নিজ রাজ্যেব মধ্যে স্থাপিত আলোকের এই দ্বীপটিকে পুনরাক্রমণ করিতেও পারে। তাহা ছাড়া নানা সম্ভাবনা লইয়া অধিমানসেব কারবার চলে বলিয়া তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া হইবে এক বা একাধিক বহুবীর্য্যবান আধ্যাত্মিক রূপায়ণকে চরম পর্য্যন্ত ফুটাইয়া তোলা কিম্বা নানা সম্ভাবনাকে সংযোগ ও সৌষম্যের সূত্রে গাঁথিয়া তোলা; কিন্তু তাহাতে আদিম ও মর্ত্ত্য জগতেব বুকে এক বা একাধিক বিস্সৃষ্টির প্রত্যেক-টিকে নিজের পৃথক সত্তায় পূর্ণ প্রস্ফুরিত করা হইবে। তথায় পরিণত আধ্যা-ত্মিক ব্যষ্টিসত্তা থাকিবে, যে জগতের মধ্যে মনোময় মানুষ এবং প্রাণময় প্রাণী এক সঙ্গে আছে ঠিক সেই জগতে এক বা বহু আধ্যাত্মিক সংঘ বা গোষ্ঠীও গড়িয়া উঠিতে পারে কিন্তু জাগতিক বিধানের মধ্যে অপর সকলের সঙ্গে একটা শিথিল সম্বন্ধ রাখিয়া প্রত্যেকে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা ফুটাইয়া তুলিবে। নবোন্মিষিত চেতনার পবম বিধান যাহার মধ্যে রহিয়াছে সেই পরমশক্তি যাহা সকল

বহুত্বকে নিজের মধ্যে গ্রহণ ও শাসন করিয়া একত্বেরই অংশে বা অঙ্গে পরিণত করিতে পারে——এবং ইহাই নবোন্মিষিত চেতনার বিধান—তখনও তাহা আসিয়া উপস্থিত হইবে না। আর এক কথা, পরিণামধারা অধিমানস পর্য্যন্ত পৌঁছিলেও তাহা নিশ্চেতনার নিম্নাভিমুখী আকর্ষণের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া নিরাপদে অবস্থিত হইবে এমন কথা নাই; নিশ্চেতনার এই আকর্ষণ তাহারই মধ্যে প্রাণ ও মন যে সকল রূপায়ণ গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাদিগকে মুছিয়া ফেলিতে এবং তাহার মধ্য হইতে যাহা কিছু ফুটিয়া উঠিয়াছে অথবা তাহার উপর যাহা কিছু আরোপিত হইয়াছে তাহাদিগকে গ্রাস করিতে অথবা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহাদের আদিম উপাদানে পরিণত করিতে পারে। নিশ্চেতনার এই আকর্ষণের হাত হইতে মুক্ত করিয়া পরিণামের নিরন্তর প্রবহমান ধারাকে দিব্য বিজ্ঞানের নিরাপদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা কেবলমাত্র পার্থিব বিধানের মধ্যে অতিমানসের অবতরণ দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে; অতিমানসই চিৎসত্তার ঋতময় বিধান দিব্যালোক এবং পরমবীর্য্য উপর হইতে নামাইয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিশ্চেতনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে এবং নিশ্চেতনার ভিত্তিভূমিকে রূপান্তরিত করিতে পারে। অতএব প্রকৃতিপরিণামের চরম পর্ব্ব হইবে অধিমানস হইতে অতিমানসে উত্তরণ এবং তাহার পর অতিমানসের অবতরণ।

অধিমানস এবং তাহার সকল প্রতিভূ-শক্তি প্রাকৃত মন এবং মনের আশ্রিত প্রাণ ও দেহকে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলকেই এমন এক ক্রিয়াধারার অধীন করিয়া তুলিবে যে প্রত্যেক অংশ বা অঙ্গ উচ্চ ও মহৎ হইয়া উঠিবে; এই ধারার প্রতি ধাপে বিজ্ঞানের বৃহত্তর শক্তি ও উচ্চতর গভীরতা প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে এবং মনের শিথিল খর্ব্ব ক্ষীণ এবং বিক্ষিপ্ত উপাদানের মিশ্রণ কমিতে থাকিবে; কিন্তু শুদ্ধ বিজ্ঞান মূলতঃ অতিমানসেরই শক্তি, অতএব অধিমানসের এইরূপ অভ্যুদয়ের মূলে প্রকৃতিতে অতিমানসের আলোক এবং শক্তির অর্দ্ধাবৃত ও পরোক্ষ প্রবাহের ক্রমবর্দ্ধমান আবেগ বর্ত্তমান থাকিবে। এই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি যতক্ষণ অধিমানস নিজেই রূপান্তরিত হইয়া অতিমানসে পরিণত হইতে আরম্ভ না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চলিবে, তারপর অতিমানস চেতনা ও শক্তি রূপান্তর-ক্রিয়া সাক্ষাৎভাবে নিজের হাতে গ্রহণ করিবে, পার্থিব মনোময় প্রাণময় এবং অন্নময় সত্তার নিকট তাহাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক সত্য এবং দিব্যভাব উন্মোচিত করিবে এবং অবশেষে সমগ্র

প্রকৃতিতে অতিমানস সত্তাব পূর্ণজ্ঞান, শক্তি ও তাৎপর্য্য ঢালিয়া দিবে। তখন অন্তবাত্মা অজ্ঞানের সীমা অতিক্রম কবিয়া জ্ঞান ও অজ্ঞানের আদিম ভেদের সীমারেখা পাব হইয়া পরম স্তানে অখণ্ড পরিপূর্ণ অতিমানস বিজ্ঞানলোকে উত্তীর্ণ হইবে ; এবং বিজ্ঞানঘন আলোকেব অবতবণে অবিদ্যাব পূর্ণ রূপান্তর সিদ্ধ হইবে।

ইহাকে বা এই ধরণের কোনো ব্যাপকতর পরিকল্পনাকে আধ্যাত্মিক রূপান্তবের একটা সুব্যবস্থিত যুক্তিসঙ্গত বা আদর্শ চিত্র বলা যাইতে পারে, ইহা প্রাকৃত মনেব সমতলভূমি হইতে অতিমানসের উচ্চতম শৃঙ্গে পৌঁছিবাব সমগ্র পথের যেন একখানি সুসঙ্কলিত মানচিত্র, সে পথ ধাপে ধাপে উপবে উঠিয়া গিযাছে যাহাব একটি ধাপ সম্পূর্ণরূপে আযত্তে আসিলে পরবর্ত্তী ধাপে পদক্ষেপের অধিকাব পাওয়া যায়। মনে হয়, যে অন্তবাত্মা প্রাকৃত ব্যষ্টিসত্তা-রূপে সুসংহত হইয়া উঠিয়াছে সে যেন এক পথিক ; সে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চেতনাব এক শৃঙ্গ হইতে উচ্চতব শৃঙ্গে আরোহণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, উত্তবায়ণেব পথে সে একেব পব একটি করিয়া চেতনাব বিভিন্ন স্তবেব মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে ; প্রত্যেক স্তরেই সে যেন এক অভঙ্গ বিশেষ সত্তা, এক বিবিক্ত চিন্ময ব্যষ্টিপুরুষ। এ বিবরণের মধ্যে ইহা সত্য যে একটি ধাপের মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা না আসিলে পববর্ত্তী উচ্চতর ধাপে পূর্ণ নিবাপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়না ; অধ্যাত্ম পবিণামেব প্রথম দিকে হযত কয়েকজন সাধক এইরূপ একটি পর্ব্ব পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইবার পব পরবর্ত্তী স্তবে পৌঁছিবার চেষ্টা কবিতে পাবেন ; আবার ভবিষ্যতে পরিণামধারাব সকল সোপান যখন গঠিত ও দৃঢ় কবা হইয়াছে তখন হয়ত এমনিভাবে এক সোপানের সকল সাধনা শেষ কবিয়া পরেব সোপানে পৌঁছান স্বাভাবিক রীতি হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু পরিণামশীল প্রকৃতি এইরূপ যুক্তিসঙ্গতভাবে সাজান পৃথক পৃথক পর্ব্বের মধ্য দিয়া পরম্পরাক্রমে অগ্রসব হয় না, তাহার মধ্যে ঊর্দ্ধগামী শক্তিসমূহের একটা সমাহাব বা সমগ্রতা আছে, সে সকল শক্তি পবস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ও পবস্পবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া চলে, একে অন্যের উপর ক্রিয়া করে এবং ফলে উভয়ে পবিবর্ত্তন স্বীকাব করে। যখন উচ্চতর চেতনা নিম্নতরে অবতরণ করে, তখন উচ্চতর নিম্নতবের যেরূপ রূপান্তর সাধন করে তেমনি নিম্নতরের জন্য উচ্চতরও পরিবর্ত্তিত এবং খর্ব্ব হইয়া পড়ে ; আবার নিম্নতর যখন উচ্চতবে আরূঢ় হয় তখন সে যেমন নির্ম্মল এবং বিশোধিত হয় তেমনি বিশোধক

উচ্চতরের উপাদান ও শক্তিতে নিজের অবস্থার ছায়াপাত করে। এইরূপ অন্যোন্য ক্রিয়াব ফলে দুই পর্ব্বের মধ্যবর্ত্তী পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ বিভিন্ন চেতনা এবং শক্তির অগণিত বৈচিত্র্য দেখা দেয় ; তখন সকল শক্তিকে কোন এক বিশেষ শক্তির পূর্ণ শাসনাধীনে আনিয়া তাহাদিগের মধ্যে একটা পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গতা স্থাপন অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়ে। এইজন্য ব্যক্তিপরিণামের ধারা কার্য্যতঃ কোন বাঁধাধরা স্তরপরম্পরা মানিয়া চলে না ; তাহার স্থানে সাধকের চিত্তে এক বিপুল জটিলতার বৈচিত্র্য দেখা দেয় যাহাব কতক ব্যক্ত এবং নির্ণয়-যোগ্য এবং কতক গোলমেলে এবং দুর্ব্বোধ্য। জীবের অন্তরাত্মাকে তখনও উর্দ্ধগামী পথের পথিকরূপে বর্ণনা করা যায়, যে তাহার আদর্শের উচ্চশিখরে ধাপে ধাপে অগ্রসব হয়, তাহাকে প্রত্যেকটি ধাপ অখণ্ডরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে কিন্তু অনেক সময় তাহাকে নামিয়া আসিয়া নিম্নতব ধাপকে আবাব নূতন কবিয়া গড়িয়া তুলিতে এবং যাহাতে উপবের আশ্রয়রূপী এই ধাপ তাহার ভাবে ভাঙ্গিয়া না পড়ে সেজন্য নিশ্চিত হইতে হয় ; সমগ্র চেতনাব পরিণামকে ববং প্রকৃতিব এক উর্দ্ধগামী গতি ও আন্দোলনেব সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পাবে, ইহা যেন সমুদ্রের জোয়াব অথবা উর্দ্ধমুখী প্রবাহ যাহার অগ্র-গামী চূড়া খাড়া পাহাড়ের কোন উচ্চ দেশ স্পর্শ করিতেছে অথচ বাকী সকল অংশ তখনও নীচে রহিয়াছে। পবিণামের প্রত্যেক পর্ব্বে প্রকৃতিব উচ্চতর অংশ সাময়িকভাবে কিন্তু অপূর্ণরূপে নবাগত চেতনার মধ্যে গড়িয়া উঠে, কিন্তু নিম্নতর অংশে থাকে দ্বিধাভাবের প্রবাহ, খেলা বা রূপায়ণ ; নিম্ন-তরের কোন কোন অংশ উচ্চতরের দ্বাবা প্রভাবিত হইলেও বা তাহাদের মধ্যে পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিলেও তাহা পূর্ব্বতন পথেই চলিতেছে, আর কতক অংশ হয়তো নূতন ধরণের চেতনা ও শক্তির অনুগত হইয়াছে কিন্তু তাহারা পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয় নাই অথবা তাহাদের পরিবর্ত্তন এখনও সুদৃঢ় হয় নাই। আর একটি উপমা, ইহা যেন নূতন দেশ অধিকারে রত বিজয়ী সেনাবাহিনীর অভিযান, বাহিনীর পুরোভাগ হয়ত অগ্রসর হইয়া নূতন দেশ জয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু তাহার প্রধান ভাগ পশ্চাতে পূর্ব্বাধিকৃত প্রদেশে বহিয়া গিয়াছে, সে দেশ হয়ত এত বিশাল যে তথায় এখনও পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এইজন্য মাঝে মাঝে বাহিনীকে থামিতে হইতেছে হয়ত বা তাহার কতকাংশকে পিছু হটিয়া বিজিত প্রদেশেব অধিকার দৃঢ় ও নিরাপদ করিতে এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে নূতন শাসনের অনুগত করিয়া লইতে

ক্ষিপ্রগতিতে বিজয় লাভ করা হয়তো সম্ভব কিন্তু তাহাতে বিজিত দেশে শিবির-সংস্থাপন বা এক বৈদেশিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হইবে মাত্র, তাহাতে পূর্ণ অতিমানস রূপান্তরের জন্য যেরূপ প্রয়োজন তেমনভাবে পরিগ্রহণ, সব কিছুকে নিজের উপাদানে পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন অথবা সকলকে লইয়া অখণ্ড পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন করা সম্ভব হইবে না।

এই সমস্তের জন্য কতকগুলি অবস্থা আসিয়া পড়ে যাহার ফলে পরিণামধারার সুস্পষ্ট পরম্পরা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং আমাদের যুক্তিবুদ্ধি প্রকৃতির কাছে যেরূপ স্পষ্টভাবে স্থিরীকৃত এবং দৃঢ়রূপে সুব্যবস্থিত প্রগতি দাবী করে পরিণামধারার পক্ষে তদনুযায়ী পথ অনুসরণ করিতে বাধা পড়ে ; প্রকৃতি প্রাকৃত যুক্তির শাসন কদাচিৎ মানিয়া চলে। দেখা যায় যে প্রাণ ও মনকে প্রবেশাধিকার দিবার জন্য জড়ের উপযুক্ত আধার প্রস্তুত হইলে প্রাণ এবং মন দেখা দিতে আরম্ভ করে কিন্তু জড়ের মধ্যে আসিয়া প্রাণ এবং মনের পরিণতির সঙ্গেই জড়েব জটিলতর এবং পূর্ণতর সুব্যবস্থা সম্ভব হয় ; প্রাণের ভূমি চেতনার পরিস্ফুট পরিস্পন্দন গ্রহণের উপযোগী হইলে প্রাণের মধ্যে মন দেখা দেয় কিন্তু মন যখন তাহাব উপর ক্রিয়া করিতে পারে তখনই প্রাণের পূর্ণতর পুষ্টি ও রূপায়ণ সাধিত হয় ; আবার মানব-মন যখন আধ্যাত্মিকতার স্পন্দনে সাড়া দিতে সমর্থ হয় তখন আধ্যাত্মিক পরিণাম আরম্ভ হয় কিন্তু আধারে চিৎসত্তার জ্যোতিঃশক্তি এবং তীব্র সংবেগ ফুটিয়া উঠিবার ফলে মনেরও পরম সার্থকতা লাভ হয়, এমনি ভাবেই ঊর্দ্ধগামী চিৎশক্তির উচ্চতর পরিণাম ঘটে। অধ্যাত্ম-পরিণাম কিছুদূর অগ্রসর হইলে কতকটা বোধিচেতনা, জ্যোতির্ম্ময় প্রতিবোধ উত্তরচেতনাব ঊর্দ্ধতর স্তরসমূহের গতি ও শক্তি কখন একটা কখনও অন্যটা কখনও বা সকলে একত্রে আধারে প্রকাশ পাইতে থাকে, নিম্নতর ভূমির প্রত্যেক শক্তির আধারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য উচ্চতর শক্তি অপেক্ষা করিয়া থাকে না। যখন সম্বোধি, জ্যোতির্মানস বা উত্তরমানস আধারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তখনও কোন প্রকারে অধিমানসের আলোক ও শক্তি অবতরণকরতঃ সত্তার মধ্যে নিজের এক অপূর্ণ রূপায়ণ গড়িয়া তুলিয়া পরিণামধারার অধ্যক্ষতা এবং পরিচালনার প্রধান অংশ গ্রহণ অথবা নিম্নতর শক্তির কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারে ; তখন এই সমস্ত ঊর্দ্ধচেতনা সাধকের মধ্যস্থিত সমগ্র ক্রিয়ার মধ্যে অধিমানসের সহকারীরূপে ক্রিয়া করে ; অধিমানস সে সমস্ত শক্তির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ঊর্দ্ধায়িত করে, অথবা তাহারা উপরে উঠিয়া

বৃহত্তর বা অধিমানস বোধি, বৃহত্তর বা অধিমানস জ্যোতি, অথবা বৃহত্তর বা অধিমানস আধ্যাত্মিক মননে পরিণত হইতে পারে। এই জটিল ক্রিয়া ঘটে এইজন্য যে প্রত্যেক অবতরণশীল শক্তি প্রকৃতির উপর যে চাপ দেয়, ঊর্দ্ধ-গমনের যে শক্তি সঞ্চার করে তাহার তীব্রতার জন্য, পূর্ব্বাগত শক্তির পূর্ণ আত্ম-রূপায়ণ সাধিত হইবার পূর্ব্বে আধার আরও উচ্চতর শক্তিপাত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে; ইহা ঘটিবার আর একটা কারণ এই যে উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির আবেশ যদি না হয় তাহা হইলে অপরা প্রকৃতির পক্ষে উচ্চতর শক্তিকে পরিগ্রহণ এবং তদ্দ্বারা রূপান্তর অতি দুরূহ থাকিয়া যায়। যে অন্ধকার বা অবিদ্যার মধ্যে তাহারা ক্রিয়া করে সেই অন্ধকার ও অবিদ্যার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এবং সেখানকার কার্য্যে নিজেদের পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য জ্যোতি-র্মানস ও উত্তরমানসের ভাবনা চায় সম্বোধির সহায়তা, তেমনি সম্বোধি চায় অধিমানসের সাহায্য। কিন্তু তথাপি শেষ পর্য্যন্ত অধিমানসের স্থিতি এবং পূর্ণাঙ্গতা লাভ পূর্ণ হইবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তরমানস এবং জ্যোতির্মানস পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়া সম্বোধির আত্মভূত না হয় এবং অবশেষে বোধিমানসও পূর্ণাঙ্গতা পাইয়া অধিমানসের যে শক্তি সব কিছুকে প্রসারিত এবং ঊর্দ্ধায়িত করিয়া তুলিতে পারে তাহার মধ্যে গৃহীত না হয়। প্রকৃতিপরিণামের গতির জটিলতার মধ্যেও ক্রমপরম্পরার বিধান তাহাকে মানিয়া চলিতে হয়।

জটিলতার আর একটি কারণ সমাহরণ বা অখণ্ড পূর্ণাঙ্গতা-সাধনের প্রয়োজনের মধ্যেই নিহিত আছে; কেননা সেজন্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়াধারাতে অন্তরাত্মাকে যেমন ঊর্দ্ধভূমিতে পৌঁছিতে হয়, তেমনি এইভাবে লব্ধ উত্তর চেতনাকেও নামাইয়া আনিয়া নিম্নপ্রকৃতির রূপান্তরসাধন করিতে হয়। কিন্তু এই প্রকৃতির মধ্যে পূর্ব্বসংস্কারের যে নিবিড়তা আছে তাহা অবতরণকে বাধা দেয়, তাহাকে ব্যাহত করিতে চায়; এমন কি আমরা দেখিয়াছি যে যখন উত্তরশক্তি আবরণ বিদারণ করিয়া নামিয়া আসিয়াছে এবং কার্যারম্ভ করিয়াছে তখনও অবিদ্যা-প্রকৃতি সে ক্রিয়াতে বাধা জন্মাইতে ও তাহাকে ব্যাহত করিতে চেষ্টা করে; হয় সে রূপান্তর একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না, অথবা নূতন শক্তির ক্রিয়াধারাকে বিকৃত করিয়া কোনরূপে নিজের ক্রিয়াধারার উপযোগী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হয়, এমন কি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে বশে আনিয়া অধোগামী করিয়া নিজের ক্রিয়াধারায় নিজের হীন প্রয়োজনসাধনে নিয়োজিত করিতে প্রয়াস পায়। প্রকৃতির এই দুরূহ উপাদানকে পরিপাক

করিয়া নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য উত্তরশক্তি সাধারণতঃ প্রথমে মনে নামিয়া আসে এবং মনের কেন্দ্র সকল অধিকার করে কেননা বুদ্ধি বা জ্ঞানের শক্তিতে ইহারা তাহারই নিকটতম; কোন কোন সাধক হৃদয় বা আবেগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিময় প্রাণসত্তাকে সহজে উপরের দিকে খুলিয়া ধরিতে পারে এবং তাহাদের আহ্বানে যদি শক্তি কখন কখন প্রথমে তথায় নামিয়া আসে তবে তাহার ফল যুক্তিসঙ্গত স্বাভাবিক ধারায় নামিয়া আসিলে যেরূপ হইত তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে মিশ্রিত সংশয়সঙ্কুল অপূর্ণ এবং অধ্রুব হইয়া পড়ে। কিন্তু অবতরণের নৈসর্গিক ক্রম ধরিয়া যখন শক্তি উপর হইতে নামিয়া স্বাভাবিক ক্রিয়াধারার স্তরের পর স্তরকে গ্রহণ করে তখনও নিম্নতর স্তরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক স্তরকে পূর্ণরূপে অধিকার এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ রূপান্তর সাধন করিয়া তুলিতে সমর্থ হয় না। নবাগত শক্তি কোন স্তরকে কেবল সাধারণ এবং অপূর্ণভাবে অধিকার করিতে পারে বলিয়া সে স্তরের ক্রিয়াধারা খানিকটা চলে নূতন ধারায়, কতকটা চলে প্রাচীন অপরিবর্ত্তিত ধারায় আর কতকটা চলে এ উভয় ধারার মিশ্রণে; মনের সকল অংশই তৎক্ষণাৎ রূপান্তরিত হয় না, কেননা মনের কেন্দ্রগুলি সত্তার অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত নাই; মনের ক্রিয়ার মধ্যে প্রাণের এবং দেহের ক্রিয়াও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, এই সমস্ত অংশের মধ্যেও মনের নিম্নতর রূপায়ণ প্রাণময় মন এবং অন্নময় মনের আকারে বর্ত্তমান আছে; সমগ্র মনোময় সত্তার পূর্ণ রূপান্তরসাধন করিতে হইলে এ সমস্তেরও রূপান্তরসাধন করিতে হইবে। রূপান্তরকারী এই উত্তরশক্তিকে তাই মনের পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরসাধনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া যত শীঘ্র হয় হৃদয়ে নামিয়া আসিয়া ভাবতরঙ্গময় প্রকৃতিকে অধিকার এবং তাহার রূপান্তর সাধন করিতে হয়, তাহার পর প্রাণের নিম্নতর চক্র বা কেন্দ্র সকলে নামিয়া ইন্দ্রিয়স্পন্দনযুক্ত এবং সক্রিয় সমগ্র প্রাণময় প্রকৃতিকে অধিকার এবং তাহার রূপান্তর সাধন করিতে এবং অবশেষে দৈহিক চেতনায় নামিয়া আসিয়া তথাকার কেন্দ্রগুলিকে অধিকার করিয়া সমগ্র দৈহিক প্রকৃতিকে রূপান্তর করিতে হয়। কিন্তু এই শেষ অবতরণও শেষ নয়, কারণ ইহারও পরে আছে সত্তার অবচেতনাময় অংশ এবং নিশ্চেতনার ভিত্তি। আমাদের সত্তার এই সমস্ত শক্তি ও অংশ এমন প্রবলভাবে জটিল এবং পরস্পরের সহিত জড়ীভূত হইয়া আছে যে ইহা যেন বলা চলে যে সমগ্র রূপান্তর সিদ্ধি না হইলে এইরূপ ভাবের খণ্ড রূপান্তরে কোন কিছু সিদ্ধ হয় না।

সমগ্র সত্তা জুড়িয়া উচচ এবং নীচ শক্তির জোয়ার ভাঁটা চলে, প্রকৃতির পুরাতন শক্তিসকল পশ্চাদ্দিকে সরিয়া যায় আবার ফিরিয়া আসিয়া হৃতরাজ্যের কিয়দংশ পুনরধিকার করে, এইভাবে ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করে বটে কিন্তু পশ্চাদ্দিক হইতে পুনরায় আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে বিরত হয় না, উত্তবশক্তিপ্রবাহও ক্রমেই বিজিত প্রদেশ বেশী করিয়া অধিকার করে বটে কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত এমন কিছু থাকিয়া যায় যাহাতে তাহার জ্যোতির্ম্ময অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণ স্বারাজ্য-সিদ্ধি হইয়াছে বলা চলে না।

তৃতীয় আর এক প্রকার জটিলতা দেখা দেয় জীবচেতনার একই সময়ে একাধিক স্থিতিতে বা ভূমিতে অবস্থানেব সামর্থ্য হইতে; বিশেষতঃ আমাদের সত্তার মধ্যে আন্তর প্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকতির ভাগাভাগি আছে বলিয়া ঝঞ্ঝাট আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার উপর যাহার জন্য বাহিরের জগতের সঙ্গে আমাদের অদৃশ্য যোগাযোগ সম্ভব হইয়াছে তেমন এক গোপন পরিচেতনা আমাদের চারিদিকে পরিবেষ্টিত আছে বলিয়া জটিলতাও অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। আধ্যাত্মিক উন্মিলনের বেলায় জাগ্রত অন্তর পুরুষই উত্তর ভূমির প্রভাব সহজে গ্রহণ ও পরিপাক করে, সেই পুরুষই উচচতর প্রকৃতিকে ধারণ করে, কিন্তু বহিশ্চর এবং বহির্ম্মুখী সত্তার প্রকৃতি অধিকতর পূর্ণভাবে অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনার ছাঁচে ঢালা বলিয়া তাহা অতি ধীরে জাগরিত হয়, অতি ধীরে নূতন কিছু গ্রহণ এবং পরিপাক করিতে সমর্থ হয়। তাই বহুকাল ধরিয়া এমন একটা স্তরে মানুষকে থাকিতে হয় যাহাতে অন্তর পুরুষের রূপান্তর অনেক অগ্রসর হয় বটে কিন্তু বহিশ্চেতনা অপূর্ণ রূপান্তরের এক কৃচ্ছ্র ও মিশ্র সাধনার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। অধিরোহণের প্রতি পর্ব্বে এই ধবণের একটা অসামঞ্জস্য দেখা দেয়; কেননা প্রতি স্তরেই অন্তশ্চেতনা অধিকতর সহজভাবে প্রগতির পথে অগ্রসর হয় কিন্তু বহিশ্চেতনা অনিচছার সঙ্গে খঞ্জের শ্লথ গতিতে তাহাকে অনুসরণ করে অথবা রুচি বা আকূতি থাকিতেও, তাহার সঙ্কল্প বা যোগ্যতার জোর থাকে না, এইজন্য বহিশ্চেতনার পক্ষে উত্তর শক্তিকে গ্রহণ করিবার, নিজেকে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিবার এবং তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইবার জন্য পুনঃ পুনঃ বহু কৃচ্ছ্রসাধনা করিতে হয় এবং প্রতি পর্ব্বে সে সাধনার আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহাদের মূল তত্ত্ব একই থাকে। এমন কি যখন আধ্যাত্মিক চেতনার সৌষম্যে ব্যষ্টিপুরুষের অন্তর ও বহিশ্চেতনা একত্র মিলিত হইয়া ওঠে তখনও অনেকটা বাহিরে অবস্থিত তাহার সেই গোপন অংশ

যেখানে তাহার সত্তার সহিত বাহ্য জাগতিক সত্তার আদানপ্রদান চলে এবং যাহার মধ্য দিয়া বহির্জগৎ আসিয়া তাহার চেতনাকে আক্রমণ করে তাহা অপূর্ণতার ক্ষেত্র থাকিয়াই যায়। এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিজাতীয় শক্তি ও প্রভাবের সংঘর্ষ হয় অনিবার্য্য ; কেননা অন্তরের আধ্যাত্মিক প্রভাবের সম্মুখে, যাহা বর্ত্তমান জগৎব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া সবল হইয়াছে সেইরূপ বিরোধী প্রভাব আসিয়া উপস্থিত হয় ; নূতন অধ্যাত্ম চেতনাকে অবিদ্যার দৃঢ়প্রতিষ্ঠ প্রবল অনাধ্যাত্মিক শক্তিরাজির আঘাত গ্রহণ করিতে হয়। আধ্যাত্মিক পরিণামের প্রতি সোপানে প্রকৃতির রূপান্তরের আকূতি ও প্রবেগকে এইভাবে স্পষ্ট অতি প্রবল বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়।

এক প্রকার অন্তরাবৃত্ত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে যাহাতে সাধক জগতের সহিত কারবারকে অস্বীকার করেন বা সংক্ষিপ্ত করিয়া দেন অথবা উদাসীনরূপে জগদ্ব্যাপারের শুধু সাক্ষী হইয়া দাঁড়ান এবং তাহাদের দ্বারা নিজ সত্তায় কোন সাড়া জাগাইতে বা তাহাদিগকে অনাহূতভাবে প্রবেশ করিতে না দিয়া আক্রমণশীল প্রভাবাবলিকে ঠেকাইয়া রাখেন বা ফিরাইয়া দেন ; কিন্তু অন্তরের আধ্যাত্মিকতাকে যদি জাগতিক ক্রিয়াধারার মধ্যে স্বাধীন ভাবে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হয়, যদি ব্যষ্টি পুরুষের নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া এক অর্থে সমস্ত বিশ্বকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহার নিজের পরিচেতনসত্তা বা পরিবেষ্টনীতে অবস্থিত সত্তার মধ্য দিয়া বিশ্বের প্রভাব গ্রহণ না করিলে সক্রিয়ভাবে তাহা সম্ভাবিত হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক অন্তর চেতনাকে তখন এরূপভাবে এই সমস্ত বহিরাগত প্রভাবকে লইয়া কারবার করিতে হয় যে, যে মুহূর্ত্তে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হয় অথবা সত্তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তখনই তাহাদিগকে বিলুপ্ত বা নির্বীর্য্য করিয়া ফেলা যায় অথবা প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা সাধকের নিজস্বভাবে এবং উপাদানে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। অথবা তাহাদিগকে সাধকের আধ্যাত্মিক প্রভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়া জগতের রূপান্তরের শক্তি লইয়া যে জগৎ হইতে তাহারা আসিয়াছে সেখানে তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারে, কেননা নিম্নতর বিশ্ব-প্রকৃতিকে এইরূপ আদেশ মানিতে বাধ্য করা পূর্ণ অধ্যাত্ম সাধনারই একটি অঙ্গ। কিন্তু সেজন্য পরিচেতন বা পরিবেষ্টনগত সত্তাকে আধ্যাত্মিকতার আলোকে এবং উপাদানে এমনভাবে ভরপূর হইয়া থাকিতে হইবে যে এইরূপ রূপান্তরিত না হইয়া কিছুই সত্তার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না ; আক্রমণকারী

বহিরাগত প্রভাবের কোন নিম্নতর জ্ঞান, দৃষ্টি বা ক্রিয়া আধারে প্রবিষ্টই হইতে পারিবে না। কিন্তু এ পূর্ণতালাভ অতি দুরূহ, কেননা সাধারণতঃ আমাদের পরিচেতনা পূর্ণরূপে আমাদের গঠিত বা অনুভূত আত্মার অংশ নয় কিন্তু তাহার মধ্যে যেমন আমরা আছি তেমনি বাহ্য বিশ্বপ্রকৃতিও আছে। এইজন্য বাহিরের ক্রিয়াধারাকে রূপান্তরিত করা অপেক্ষা আমাদের অন্তরে আপনাতে আপনি তৃপ্ত যে সকল অংশ আছে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবে বিভাবিত করা সর্ব্বদাই অনেক সহজ কাজ; জগৎ হইতে দূরে থাকিয়া অথবা জগতের ছোঁয়াচ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া অন্তরেই যাহার অধিষ্ঠান, যাহা অন্তর্দর্শী বা অন্তরাবৃত্ত এমন এক আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করা তত কঠিন নহে, তদপেক্ষা অনেক দুরূহ ব্যাপার হইল সমগ্র প্রকতিকে চিদ্‌বীর্য্যে সক্রিয়ভাবে বিভাবিত এবং সমস্ত জগৎকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া, পরিবেশের প্রভু এবং জগৎ প্রকৃতির স্বরাট্ হইয়া সমগ্র জীবনে আধ্যাত্মিকতাকে বাস্তবরূপে মূর্ত্ত ও পূর্ণ করিয়া তোলা। কিন্তু পরিণামশীল প্রকৃতি এই পূর্ণতর রূপান্তর সিদ্ধিই দাবী করিতেছে, এমন এক অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর দাবী করিতেছে যাহাতে আমাদের সক্রিয় বীর্য্যবান সত্তা কর্ম্মের জীবন এবং আমাদের বহিঃস্থিত জগৎ বা জগদাত্মাকে পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া এক পরিপূর্ণ পূর্ণতা লাভ করিবে।

আমাদের প্রাকৃত সত্তার উপাদান নিশ্চেতনা হইতেই গৃহীত হইয়াছে, ইহাই আমাদের আসল বাধা ও বিপত্তির কারণ। যে সত্তার উপাদান অচেতনা তাহারই মধ্যে থাকিয়া যে জ্ঞানের পুষ্টি হইতেছে তাহাই আমাদের কাছে অবিদ্যারূপে দেখা দিতেছে; যে চেতনা ফুটিয়া উঠিতেছে, যে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এই নিশ্চেতনা দৃঢ়ব্রত হইয়া তাহাকে অনুসরণ করিতেছে, তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। নিশ্চেতনার এই উপাদানকে অতিচেতনার উপাদানে রূপান্তরিত করিতে হইবে, তাহা এমন উপাদান হইবে যাহাতে চেতনা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিবে—তখনও থাকিবে যখন তাহারা সক্রিয়, প্রকাশিত অথবা জ্ঞানের আকারে রূপায়িত হইয়া উঠে নাই। যতক্ষণ তাহা না হইবে ততক্ষণ নিশ্চেতনা যাহা কিছু তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে তাহাকে আক্রমণ করিবে বা ঘিরিয়া ধরিবে এমন কি তাহাকে গ্রাস করিয়া বিস্মৃতিজনক অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া দিবে; ইহাই উপর হইতে আগত আলোককে নিম্নতর যে আলোকের মধ্যে সে নামিয়া আসিয়াছে তাহার

সঙ্গে আপোষ রফা করিতে বাধ্য করে ; তখন তাহার স্বরূপ বিমিশ্র খর্ব্ব এবং ক্ষীণ, তাহার সত্য ও শক্তি ক্ষুণ্ণ বিকৃত এবং অপূর্ণ, তাহার প্রামাণ্য অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। আর কিছু না হউক, নিশ্চেতনা সত্যকে সীমিত, তাহার বীর্য্যকে ক্ষুণ্ণ এবং তাহার প্রযোজ্যতার পরিধিকে সঙ্কুচিত করে ; ব্যক্তির সিদ্ধিতে বা জাগতিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে, সত্যের সিদ্ধ পূর্ণ তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিবার পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে জীবনের একটা বিধানরূপে প্রেম বস্তুতঃ অন্তরের এক সক্রিয় তত্ত্বরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে, কিন্তু সত্তার সমস্ত উপাদানকে অধিকার করিতে না পারিলে ব্যক্তিগত সমস্ত অনুভূতি এবং ক্রিয়া প্রেমের বিধানের ছাঁচে ঢালা সম্ভব হয় না ; এমন কি ব্যষ্টি-জীবনে প্রেম পূর্ণতা লাভ করিলেও যাহা ইহার দিকে অন্ধ এবং ইহার প্রতিকূল সেই সাধারণ নিশ্চেতনার জন্য ইহা একদেশদর্শী সঙ্কুচিত এবং নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে অথবা বিশ্ব-প্রেমে ব্যাপ্ত হইবার সামর্থ্যহারা হইতে বাধ্য হয়। কোন নূতন বিধানের সুরের সহিত সঙ্গতি স্থাপন করিয়া পূর্ণভাবে ক্রিয়া করা মানব-প্রকৃতির পক্ষে সর্ব্বদাই দুরূহ ; কেননা নিশ্চেতনার উপাদানের মধ্যে দুর্দ্দমনীয় অন্ধ নিয়তির আত্মরক্ষাকারী এক প্রবল শক্তিশালী বিধান আছে যাহা, তাহার মধ্য হইতে যাহা স্ফুরিত হইয়া উঠে বা বাহির হইতে যাহা আইসে এরূপ সম্ভাবনা সকলের খেলাকে সীমিত ও সঙ্কুচিত করে, সত্তার মধ্যে তাহাদের স্বতন্ত্র ক্রিয়া ও তাহার পরিণামের ক্ষেত্র গড়িতে অথবা তাহাদের নিজেদের চরম সিদ্ধিতে পৌঁছিতে দেয় না। সে সকল সম্ভাবনার খেলা তাই বিমিশ্র পরতন্ত্র নিগৃহীত বা খর্ব্ব হইয়া পড়ে, তাহা না হইলে তাহারা নিশ্চেতনার কাঠামোকে বিলুপ্ত করিয়া দিত এবং জগদ্‌ব্যাপারের মধ্যে এক বিষম বিক্ষোভ আনিয়া ফেলিত বটে কিন্তু জগদ্‌ব্যবস্থার ভিত্তির মূলতঃ কোন রূপান্তর ঘটাইতে পারিত না ; কেননা যাহা এই অন্ধ আদি তত্ত্বের উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাহার স্থানে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের জগদ্‌ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারে এমন কোন দৈবী শক্তি এই সমস্ত সম্ভাবনার, মনোময় বা প্রাণময় খেলার মধ্যে নাই।

যখন সত্তার সমগ্র উপাদান আধ্যাত্মিক তত্ত্বে এমন ভরপুর হইয়া উঠিবে যে তাহার সকল ক্রিয়া সকল গতি সৌষম্যের ছন্দে চিত্তেরই বীর্য্যবান সক্রিয় স্ফুরণ হইয়া দাঁড়াইবে কেবল তখনই সমগ্র মানব প্রকৃতির রূপান্তর সম্ভব হইবে। কিন্তু উত্তর শক্তিসকল তীব্র সংবেগ লইয়া আধারে নিশ্চেতনার মধ্যে যখন অনুপ্রবিষ্ট হয় তখনও তাহারা এই অন্ধ বিরোধী নিয়তির সম্মুখীন হয় এবং

নিশ্চেতনার এই মূঢ় বিধান তাহাদের বীর্য্যকে সীমিত ও খর্ব্ব করিয়া তোলে। প্রতিষ্ঠিত এবং কঠোর আইনের বিধানে তাহাকে যে অধিকার দেওয়া আছে তাহার প্রবল সহায়তায় সে উর্দ্ধ্বাগত উত্তর শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, জীবনের দাবীর বিরুদ্ধে মৃত্যুর বিধান খাড়া করে, আলোককে স্পষ্টভাবে ফুটাইবার জন্য প্রয়োজন আছে বলিয়া আলোকের পিছনে ছায়া এবং অন্ধকারের পটভূমিকা লইয়া আসে, চিৎসত্তার স্বারাজ্য, স্বাধীনতা এবং বীর্য্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়া সেখানে ব্যবস্থার জন্য নিজের সীমিত করিবার শক্তি প্রয়োগ করে, অশক্তি দিয়া সীমা-রেখা টানে, এক আদিম জড়ত্বের নিশ্চলতার উপর শক্তির ভিত্তি স্থাপিত করে। নিশ্চেতনার আলোক, জ্ঞান ও শক্তিকে প্রতিষেধ করিবার এই যে নেতিবাচক শক্তি আছে তাহারও মূলে এক গোপন সত্য আছে; একমাত্র অতিমানসই সে সত্যকে গ্রহণ করিতে এবং এক অনাদি সত্যবস্তুর মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের এক পরম সমন্বয় সাধন করিতে পারে। তাই কার্য্যতঃ কেবলমাত্র অতিমানসই সকল দ্বন্দ্বের এই দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকার মধ্য হইতে প্রকৃত মর্ম্ম, প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ। এই মূল নিশ্চেতনার বাধা পূর্ণরূপে জয় করিবার শক্তি কেবল অতিমানসেরই আছে; কেননা অতিমানসের সঙ্গে অন্ধ নিয়তির ঠিক বিপরীত প্রকৃতিসম্পন্ন এক জ্যোতির্ম্ময়ী ও সর্ব্বজয়া মহানিয়তি আধারে অনুপ্রবিষ্ট হয়, এই মহানিয়তি ভিত্তিরূপে সর্ব্ববস্তুর পশ্চাতে বর্ত্তমান আছে, ইহাই স্বয়ম্ভূ অনন্ত পুরুষের আদি সত্যবীর্য্য ইহাই সেই পুরুষের আত্মবিশেষণ এবং আত্মবিভাবনার আদি ও চরম শক্তি। কেবল এই বৃহত্তর জ্যোতির্ম্ময়ী চিন্ময়ী নিয়তি তাহার অপ্রতিহত শক্তিদ্বারা নিশ্চেতনার অন্ধ নিয়তির মধ্যে পূর্ণরূপে প্রবেশ করিতে, তাহাকে নিজ সত্তায় রূপান্তরিত করিতে এবং তাহার স্থলে নিজেকে অভিষিক্ত করিতে পারে।

যখন অপরা প্রকৃতির মধ্যে সংবৃত অতিমানস স্ফুরিত হইয়া পরাপ্রকৃতি হইতে যে অতিমানস আলোক এবং শক্তি নামিয়া আসিয়াছে তাহার সহিত মিলিত হয় তখন সত্তার সকল উপাদানে সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহার সকল ধর্ম্মে শক্তিতে এবং কর্ম্মে অতিমানস রূপান্তর দেখা দেয়। অবশ্য ব্যষ্টি ব্যক্তিই এই রূপান্তরের যন্ত্র বা নিমিত্ত এবং প্রথম ক্ষেত্র; কিন্তু অন্য সকল হইতে বিশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের রূপান্তরই যথেষ্ট নয় হয়তো তাহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভবও নহে। এমন কি যদি তাহা সম্ভব হইত তবু ব্যক্তিগত রূপান্তর একটা স্থায়ী বিশ্বগত তাৎপর্য্যলাভ কেবল তখনই করে যখন প্রকৃতির পার্থিব ক্রিয়ার মধ্যে

কার্য্যকরী শক্তিরূপে স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে অতিমানসী চিৎশক্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে সে ব্যক্তি এক কেন্দ্র এবং চিহ্ন হইয়া দাঁড়ায়--ঠিক এমনি ভাবে মানুষের পরিণাম-ধারায় প্রাণ ও জড়ের জগতে প্রকাশ্যভাবে ক্রিয়াশীলরূপে মনবুদ্ধির অভিব্যক্তি হইয়াছে। অতিমানসের এই আবির্ভাবের অর্থ পরিণামধারার মধ্যে বিজ্ঞানঘন পুরুষ ও বিজ্ঞানময়ী প্রকৃতির আবির্ভাব। অতিমানস চিৎশক্তিকে মুক্ত এবং সক্রিয় হইয়া সমগ্র মর্ত্ত্যলোকে স্ফুরিত ও মূর্ত্ত হইতে এবং প্রাণ ও দেহকে অতিমানসের আধার বা যন্ত্ররূপে সুগঠিত ও সুব্যবস্থিত করিয়া তুলিতে হইবে, কেননা এই নূতন ব্যবস্থায় দৈহিক চেতনাকেও এমনভাবে জাগ্রত হইতে হইবে যাহাতে তাহা এই নব বিধানে নূতন এই অতিমানস শক্তির উপযুক্ত সাধন যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারে। যতদিন অতিমানসের এই দিব্য অবতরণ না ঘটিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী ঘটনারূপে যে রূপান্তর হয় তাহা আংশিক এবং অনিশ্চিত; প্রকৃতিকে অধিমানস বা বোধিমানসের যন্ত্ররূপে পরিবর্ত্তিত ও গঠিত করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা মৌলিকভাবে এবং পরিবেশরূপে অবস্থিত নিশ্চেতনার উপর আরোপিত এক জ্যোতির্ম্ময় রূপায়ণই হইবে। অতিমানস তত্ত্ব এবং তাহার বিশ্বক্রিয়া নিজের ভিত্তিতে একবার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষলোকস্থিত অধিমানস এবং অধ্যাত্মমানসের অন্য সকল শক্তি সেই একই ভিত্তির উপর নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহাদের নিজ পূর্ণতায় পৌঁছিবে; পার্থিব জগতের মধ্যে মন এবং জড়াশ্রিত প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যাত্ম-ভূমির চরম অবস্থা পর্য্যন্ত চেতনার একটা পরম্পরা প্রসারিত হইবে। আধ্যাত্মিক পরিণামধারার মধ্যে মন এবং মনোময় মানুষজাতি একটা ধাপরূপে থাকিয়া যাইবে; কিন্তু তাহার উপরে সুগঠিত অন্য অনেক ধাপ গঠিত হইয়া উঠিবে, দেহধারী মনোময় সত্তা যেমন প্রস্তুত হইয়া উঠিবে তেমনই ঐ সমস্ত স্তরে আরূঢ় হইতে সমর্থ হইবে, সে বিজ্ঞানময় ভূমি পর্য্যন্ত পৌঁছিতে এবং দেহধারী অতিমানস ও অধ্যাত্মপুরুষে রূপান্তরিত হইতে পারিবে। এই ভিত্তিতে পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে এক দিব্যজীবনের তত্ত্ব অভিব্যক্ত হইবে, এমন কি অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনার জগৎও তাহার নিজের গুহাহিত গোপন রহস্য খুঁজিয়া পাইবে এবং নিম্নতর প্রতি স্তর ও রূপায়ণের মধ্যেও তাহার দিব্য তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিতে পারিবে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

বিজ্ঞানময় পুরুষ

অন্ধকারের পরপারে যাইবার জন্য সত্যের এক পূর্ণ পথ আবির্ভূত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ ১।৪৬।১০

হে ঋতচেতন, সত্য সম্বন্ধে সচেতন হও, বিদারণ করিয়া সত্যের নানা ধারা প্রকাশ কর।

ঋগ্বেদ ৫।১২।২

হে অগ্নি, হে সোম, তোমাদের শক্তি চিন্ময় হইল; তোমরা বহুর জন্য অদ্বয় জ্যোতি আবিষ্কার করিয়াছ।

ঋগ্বেদ ১।৯৩।৪

শুদ্ধ শুভ্র তিনি (ঊষা), দ্বিধা তাহার বিশালতা, যিনি জানেন তাহার মত সত্যের পথে তিনি সিদ্ধগতিতে তাহার দিকসমূহকে সঙ্কুচিত না করিয়া চলিয়াছেন।

ঋগ্বেদ ৫।৮০।৪

যজ্ঞের শক্তিতে পরম ব্যোমে ঋত দিয়া সর্ব্বধারক ঋতকে তাহারা ধারণ করেন।

ঋগ্বেদ ৫।১৫।২

হে অমৃত, তুমি মর্ত্ত্যের মধ্যে সত্য, অমৃত এবং সৌন্দর্য্যের বিধানে জন্মিয়াছ। ......ঋত হইতে জাত ঋতের দ্বারা তিনি বর্দ্ধিত হন,—তিনি রাজা, তিনি দেবতা, তিনি সত্য এবং বৃহৎ।

ঋগ্বেদ ৯।১১০।৪; ১০৮।৮

মনের অধিমানসে পরিণতির ধারা যেখানে অধিমানসের অতিমানসে পরিণতির ধারাতে গিয়া মিশিয়াছে, উভয় ধারার মধ্যস্থিত সেই সীমারেখায় যখন আমাদের মননশক্তি পৌঁছে তখন তাহার নিকট এমন একটি বাধা আসিয়া উপস্থিত হয় যাহা পার হওয়া প্রায় অসম্ভব মনে হয়। কারণ অবিদ্যার মধ্যে

থাকিয়া পরিণামশীলা প্রকৃতি যে অতিমানস বা বিজ্ঞানময় সত্তাকে প্রসব করিবার জন্য আয়াস-আতুর হইয়া আছে, সুব্যক্ত মনোময় ভাষায় তাহার একটা বিশদ বিবরণ জানিতে, তাহার সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় ; কিন্তু অতিমানসে পৌঁছিতে হইলে ঊর্দ্ধায়িত মনেরও শেষ সীমা পার হইয়া অপরার্দ্ধ ছাড়াইয়া মনের বিশিষ্ট ধর্ম্মকেও অতিক্রম করিয়া চেতনাকে এমন স্থানে পৌঁছিতে হয় মন যাহা ধারণা করিতে পারে না, তাহা মনোময় অনুভূতি এবং জ্ঞানের বাহিরের রাজ্য। অতিমানস প্রকৃতিতে থাকিবে একটা পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গতা, তাহা যে অধ্যাত্ম প্রকৃতি ও অনুভূতির একটা চরম অবস্থা, বস্তুতঃ ইহাতে কোন সংশয় নাই ; পরিণামধারার স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে অতিমানসের মধ্যে পার্থিব প্রকৃতির পূর্ণ আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটিবে কিন্তু অতিমানস এই রূপান্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইবে না ; আমাদের পরিণামের এই পর্ব্বের মধ্যে আমাদের জাগতিক অনুভব গৃহীত ও রূপান্তরিত হইবে, ফলে তাহার মধ্যে যে দৈবী অংশ আছে তাহা স্ফুরিত, যে সমস্ত অপূর্ণতা ও ছদ্মরূপ আছে তাহা বর্জিত হইবে এবং তাহারা এক নব সৃষ্টির মধ্যে ভাগবত কোন সত্যে এবং দৈবী কোন সম্পদে পরিণত হইবে। কিন্তু এই সমস্ত শুধু সাধারণ সূত্রাকারে কিছু বলা হইল, যে রূপান্তর সাধিত হইবে তাহার সঠিক ধারণা ইহাতে জন্মে না। চিন্ময় বস্তু বা জাগতিক পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের প্রাকৃত সত্তা সাধারণ অবস্থায় যাহা কিছু ধারণা বা কল্পনা করে, যাহা কিছু রূপায়িত করিয়া তোলে তাহা মনোময় ; কিন্তু বিজ্ঞানময় রূপান্তরে পরিণামের ধারা মনের সীমারেখা পার হইয়া যেখানে যায় সেখানে চেতনার এক আমূল পরম রূপান্তর ঘটে, তখন মনোময় জ্ঞানের মাপকাঠি দিয়া পরিমাপ করা বা মনোময় জ্ঞানের রূপের মধ্যে তাহার পরিচয় ফুটাইয়া তোলা আর সম্ভব হয় না ; তাই অতিমানস-প্রকৃতিকে মনবুদ্ধির দ্বারা বোঝা বা তাহার বিবরণ দেওয়া একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

মননধর্ম্ম এবং মনোময় প্রকৃতি সান্তের চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত ; অতিমানস প্রকৃতি স্বরূপতঃ অনন্তেরই এক চেতনা এবং শক্তি। অতিমানস প্রকৃতি সব কিছুই অদ্বৈতদৃষ্টিতে দেখে, যেখানে বৈচিত্র্য ও বহুত্বের অন্ত নেই, এমন কি যেখানে মন অতি প্রবল ও অনপনেয় দ্বন্দ্ব বা পরস্পরবিরোধই শুধু দেখে সেখানেও অতিমানস একত্বের আলোকেই সর্ব্ব পদার্থ দর্শন করে, তাহার সংকল্প ও ধারণা, বেদনা ও অনুভূতি একত্বের উপাদানেই গড়া, তাহার কর্ম্মও সেই ভিত্তি হইতে

উৎসারিত হয়। পক্ষান্তরে মনোময় প্রকৃতি যাহা কিছু ভাবনা বা সংকল্প করে, যাহা কিছু দেখে, হৃদয় বা ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা কিছু অনুভব করে, তাহার সমস্তই ভেদজ্ঞান হইতে আরম্ভ হয়; তাহার পর খণ্ডিত বস্তু সকলকে জুড়িয়া তাহার একত্ববোধ গড়িয়া তোলে, এমন কি যখন সে একত্ব অনুভব করে তখনও সীমা ও ভেদের ভিত্তিতে অবস্থিত একত্ব হইতে তাহাকে ক্রিয়া করিতে হয়। কিন্তু দিব্য অতিমানস জীবন একত্বেরই মূল স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং স্বাভাবিক জীবন। আমাদের জীবনের ক্রিয়ার অংশে আমাদের বাহ্য ব্যবহারে অতিমানস রূপান্তর কি হইবে অথবা ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে ইহা কোন্ রূপ ফুটাইয়া তুলিবে, মনের পক্ষে পূর্ব্ব হইতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। কেননা মন, বুদ্ধির বিধান বা কৌশল অথবা সংকল্পের যুক্তিসঙ্গত নির্দ্দেশ অনুসারে ক্রিয়া করে অথবা নিজের বা প্রাণের কোন আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়; কিন্তু অতিমানস প্রকৃতি মনোময় কোন ধারণা বা বিধান অথবা নিম্নতর ক্ষেত্রের কোন আবেগের প্রশাসন বা প্ররোচনা অনুসাবে কোন ক্রিয়া করে না; তাহার প্রতি পদক্ষেপে আছে এক সহজ চিন্ময় দৃষ্টির প্রেরণা, আছে সর্ব্ব এবং প্রতি বস্তুব সত্যের মধ্যে খাঁটিভাবে অনুপ্রবেশ এবং সর্ব্বতোভাবে তাহা গ্রহণ; তাহার ক্রিয়া অন্তর্নিহিত সত্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—মনের কোন ভাব দ্বারা নহে; আচরণ বা ব্যবহারের কোন নিয়ম বা গড়িয়া তোলা ভাবনার কোন বিধান অথবা ইন্দ্রিয়ানুভূতির কোন কৌশল তাহার ক্রিয়ার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাহার গতি ও বৃত্তি প্রশান্ত, স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সাবলীল; তাহার সকল ক্রিয়া ও গতি স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্যরূপে একত্ববোধের সৌষম্য ও সত্য হইতেই উত্থিত হয়, এই বোধ সচেতন সত্তার মর্ম্মমূলে তাহার নিজস্ব উপাদানের মধ্যেই অনুভূত হয়; এ উপাদান চিন্ময় এবং সর্ব্বগত সুতরাং সত্তার জ্ঞানের মধ্যে যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে ইহা তাহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে এক। অতিমানস প্রকৃতির মনোময় বিবরণ যে ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে তাহা হয় অতিরিক্তমাত্রায় বস্তুতন্ত্রহীন (abstract) শুধু বাঙ্ময়, নতুবা এমন সব মনোময় আকার হইয়া পড়ে যাহাতে ইহাকে সত্য হইতে সম্পূর্ণ অন্যবিধ কিছুতে পরিণত করে। অতএব মনে হয় যে অতিমানস পুরুষ কি হইবেন বা কিরূপে ক্রিয়া করিবেন তাহার পূর্ব্বাভাস পাওয়া বা তাহার কোন বিবরণ দেওয়া মনের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ এখানে তাহারা অতিমানস প্রকৃতির আত্মদৃষ্টি এবং বিধান হইতে বহুদূরে আছে বলিয়া মনোময়

ভাব বা রূপায়ণী বৃত্তি তাহার সম্বন্ধে কোন কিছু স্থির ভাবে নির্ণয় করিতে বা স্পষ্টভাবে কোন সংজ্ঞা বা বিশেষণ দিতে পারে না। অথচ সেই সঙ্গে ইহা বলা যায় যে অধিমানস হইতে অতিমানসে পৌঁছিবার পথে যে সকল পার্থক্য দেখা যাইবে তাহার এমন একটা সাধারণ বর্ণনা দেওয়া বা তাহা হইতে অনুমান দ্বারা এমন কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে যাহা সত্য হওয়া সম্ভব, অথবা এইভাবে অতিমানস পরিণামের আদিপর্বে একটা অস্পষ্ট আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

অধিমানস হইতে অতিমানসে পৌঁছিবার সময়ে অতিমানস বিজ্ঞান অধিমানসের হাত হইতে পরিণামধারা পরিচালনার ভার গ্রহণ করে এবং নিজের বিশেষ প্রকাশ ও অনাবৃত ক্রিয়াধারার প্রাথমিক ভিত্তি গড়িয়া তোলে, তাই যে পরিণামধারা অজ্ঞানের মধ্যে থাকিয়া দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যার দ্বারা সত্তাকে প্রস্তুত করিতেছিল এই চূড়ান্ত পরিবর্ত্তনে তাহা অজ্ঞানের হাত হইতে মুক্ত হইয়া নিত্যবৃদ্ধিশীল জ্ঞানময় পরিণামধারার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তবু মনে রাখিতে হইবে যে শুদ্ধ অতিমানস ও অতিমানস সত্তা যে ভাবে তাহাদের স্বক্ষেত্রে স্বমহিমায় অবস্থিত আছে, এখানে সেই ভাবেই যে হঠাৎ আবির্ভূত বা সক্রিয় হইয়া উঠিবে তাহা নয়, যাহা নিত্য স্বতঃপূর্ণ আত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ সেই ঋতচিন্ময় জীবনের অতর্কিত অতিদ্রুত আত্মপ্রকাশ যে হইবে তাহা নহে; অতিমানস সত্তা জাগতিক ক্রমপরিণামশীল সম্ভূতির মধ্যে নামিয়া আসিয়া নিজেই তথায় রূপায়িত হইয়া উঠিবেন, এবং পার্থিব প্রকৃতির মধ্যস্থিত বিজ্ঞানময় শক্তিসকল ক্রমশঃ উন্মিষিত ও প্রস্ফুরিত করিয়া তুলিবেন। বস্তুতঃ ইহাই পার্থিব সত্তার সকল বিকাশের রীতি; কেননা পার্থিব জীবনের সকল ক্রিয়াধারাই এক অনন্ত সত্য বস্তুর খেলা, প্রথমে তাহা অন্ধকারাবৃত, সীমিত, অস্বচ্ছ, অপূর্ণ, অর্দ্ধ-বিকশিত রূপপরম্পরার মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখে; ইহারা তাহাদের অপূর্ণতা এবং ছদ্মরূপায়ণের দ্বারা যে সত্যকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তাহাদের সাধনা চলিতেছে তাহাকেই বিকৃত করিয়া তোলে; তাহার পর ক্রমশঃ সত্যের অর্দ্ধভাস্বর রূপায়ণসকল দেখা দিতে থাকে এবং একবার অতিমানসের অবতরণ ঘটিলে সত্য খাঁটি অথচ ক্রমবর্দ্ধমানভাবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বক্ষেত্র হইতে মূল অতিমানসের অবতরণ এবং পরিণামের ক্ষেত্রে পরিণতিশীল অতিমানসরূপ গ্রহণ হইল একটা সোপান যাহার গঠন অতিমানস-বিজ্ঞান সহজে আরম্ভ ও পূর্ণ করিতে পারে কিন্তু তজ্জন্য তাহার স্বকীয় স্বরূপ-

ধর্ম্মের কোন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় না। ইহা এক ঋতচিন্ময় জীবন পরিগ্রহ করিতে পারে যাহা স্বভাবসিদ্ধ আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সঙ্গে মনোময় ও প্রাণময় প্রকৃতি এবং জড় দেহকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে। কারণ অতিমানস অনন্ত সৎ স্বরূপের ঋতচেতনা, তাই স্বাধীনভাবে নিজেকে বিশেষিত করিবার এক অনন্ত শক্তি তাহার ক্রিয়াধারার মধ্যে বর্ত্তমান। নিজের মধ্যে সকল জ্ঞান থাকিলেও ইহা পরিণামের প্রতি পর্ব্বে যতটুকুমাত্র প্রয়োজন, তাহার রূপায়ণের মধ্যে ততটুকুমাত্র প্রকাশ হইতে দিতে পারে; বিসৃষ্টির মধ্যস্থিত ভাগবত সংকল্প এবং যাহাকে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার সত্য অনুসারে ইহা সব কিছু রূপায়িত করিয়া তোলে। এই শক্তিবলে অতিমানস নিজের জ্ঞানকে সংবরণ করিয়া রাখিতে পারে, নিজের বিশিষ্টধর্ম্ম এবং ক্রিয়ার বিধানকে গোপন করিয়া অধিমানসকে প্রকাশ এবং অধিমানসের অধীন অবিদ্যার এক জগৎকে প্রকটিত করিতে সমর্থ হয়—যে জগতে সত্তা নিজের বহিরংশকে অজ্ঞানতার আবরণে আবৃত রাখিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ হয়, এমন কি আপনাকে ব্যাপক নিশ্চেতনার শাসনে স্থাপিত করে। কিন্তু এইভাবে যে আবরণে সে নিজেকে আবৃত করিয়াছিল, পরিণামের এই নূতন পর্ব্বে তাহা উত্তোলিত হইবে, এখন হইতে পরিণামের প্রতি পদক্ষেপ ঋতচিতের শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং অধ্যাত্ম জ্ঞান তাহার প্রগতি নিয়ন্ত্রিত করিবে, সে প্রগতি অবিদ্যা বা নিশ্চেতনার রচিত রূপের মধ্য দিয়া আর চলিবে না।

যেমন বর্ত্তমানে পৃথিবীতে মনোময় চেতনা ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া মনোময় সত্তা বা মানুষের একটা জাতি গড়িয়া তুলিয়াছে এবং পার্থিবপ্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু রূপান্তরিত হইবার জন্য প্রস্তুত ছিল তাহা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে তেমনি এবার পৃথিবীতে এক বিজ্ঞানময় চেতনা ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহা বিজ্ঞানঘন চিন্ময় সত্তার একটা জাতি গড়িয়া তুলিবে এবং পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু এই নূতন রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবে। সেই সঙ্গে ইহা উর্দ্ধস্থিত পূর্ণ আলোক, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের স্বধাম হইতে পার্থিবসত্তার রাজ্যে যাহা কিছু নামিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে তাহাও ক্রমবর্দ্ধমানভাবে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবে। অতীতেও প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে একদিকে নিশ্চেতনার মধ্যে সংবৃত একটা গোপন শক্তি উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং অন্যদিকে সেই শক্তি যেখানে নিজের স্বাভাবিক উর্দ্ধক্ষেত্রে সিদ্ধ বীর্য্য অবস্থায় বর্ত্তমান আছে তাহার সেই

নিজস্বভূমি হইতে শক্তির একটা অবতরণ হইয়াছে এবং এই উভয় শক্তির সাহায্যে পরিণামধারা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত প্রাক্তন পর্ব্বে বহিশ্চর সত্তা ও চেতনা এবং অধিচেতন সত্তা ও চেতনার মধ্যে একটা ভাগাভাগি ছিল ; সত্তার বাহিরের দিকটা প্রধানতঃ নিম্ন হইতে উৎক্ষিপ্ত শক্তির অভিঘাতে গড়িয়া উঠিয়াছে, এখানে নিশ্চেতনা চিৎসত্তার এক গোপন শক্তিকে ধীরে ধীরে উন্মিষিত ও রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছে ; আর সত্তার অধিচেতনের দিকটা অংশত এইরূপ উৎক্ষেপের কিন্তু প্রধানতঃ সেই সঙ্গে উপর হইতে আগত সেই শক্তিরই প্রবল প্রবাহের দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে ; এক মনোময় বা এক প্রাণময় সত্তা উপর হইতে অধিচেতন অংশে নামিয়া আসিয়াছে, এবং অধিচেতনার গোপন কেন্দ্র হইতে বাহিরের ক্ষেত্রে এক মনোময় ও এক প্রাণময় ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অতিমানস রূপান্তর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই অধিচেতনা ও বহিশ্চেতনার মধ্যস্থিত দেওয়াল নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া পড়িবে ; উপর হইতে যে শক্তিপ্রবাহ নামিয়া আসিবে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া তাহা আংশিক-ভাবে ক্রিয়া করিবে না বা সত্তার এক অংশে নিবদ্ধ থাকিবে না, সে অবতরণ সমগ্র চেতনার মধ্যেই ঘটিবে ; তাহার ক্রিয়াধারা তখন আর গোপন, অস্পষ্ট বা দ্বিধাসঙ্কুল হইবে না, তাহা প্রকাশ্যেই ফুটিয়া উঠিবে এবং সচেতনভাবেই তাহার প্রকাশ অনুভূত হইবে, তাহার পর হইবে সমগ্র সত্তার রূপান্তর। অন্য সব বিষয়ে এই রূপান্তরের রীতি পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য সব রূপান্তরের সঙ্গে ঠিক একই রূপ হইবে ; উপর হইতে অতিমানসের এক নির্ঝর নামিয়া আসিবে, প্রকৃতির মধ্যে এক বিজ্ঞানময় সত্তার অবতরণ ঘটিবে এবং নিম্ন হইতে গোপন অতিমানস শক্তি উপরের দিকে উন্মিষিত ও স্ফুরিত হইয়া উঠিবে ; শক্তির এই প্রপাত ও আবরণ অপসরণের ফলে অবিদ্যার শেষ রেশটুকুও মুছিয়া যাইবে। নিশ্চেতনার শাসন চলিয়া যাইবে ; কেননা তাহার মধ্যে যে বিশাল প্রচ্ছন্ন চেতনা, যে গোপন আলোক আছে তাহার প্রকাশ ও বিস্ফোরণে নিশ্চেতনা নিজে এতকাল স্বরূপত যাহা ছিল সেই গোপন অতিচেতনার সমুদ্রে রূপান্তরিত হইবে। তাহার ফলে বিজ্ঞানঘন চেতনা ও প্রকৃতির এক প্রথম রূপায়ণ দেখা দিবে।

পরিণামধারার এই পর্ব্বে পৃথিবীর বুকে অতিমানস সত্তা, অতিমানসপ্রকৃতি এবং অতিমানস জীবনই যে শুধু সৃষ্ট হইবে তাহা নহে ; প্রগতি পথের পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্বাবলিতে যাহা যাহা প্রস্ফুরিত হইয়াছে এ পর্ব্বে তাহারা তাহাদের

চরমসিদ্ধিতে পৌঁছিবে ; কেননা ইহা পার্থিবপ্রকৃতিতে অধিমানস, সম্বোধি এবং চিন্ময়ী প্রকৃতিশক্তির অন্যান্য স্তরসমূহকেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবে, বিজ্ঞানময় এক জাতি গড়িয়া তুলিবে ; দেখা দিবে ক্রমোর্দ্ধ্বভাবে স্থাপিত শ্রেণী-সকল, জ্যোতির্ম্ময় সোপানমালার ক্রমিক অভ্যুদয় এবং বিজ্ঞানময় আলোক ও শক্তিতে পরম্পরাক্রমে অবস্থিত পার্থিব প্রকৃতির রূপায়ণসমূহ। কারণ, যে সমস্ত চেতনা সত্তার সত্যের উপর স্থাপিত, অবিদ্যা বা নিশ্চেতনার উপর নয় তাহারা সকলেই বিজ্ঞানময়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করা যাইতে পারে। যে সমস্ত জীবন ও জীবসত্তা মনোময় অবিদ্যাকে অতিক্রম করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে অথচ অতিমানসের ঊর্দ্ধ্বস্তরে অধিরোহণের জন্য উপযুক্ত হইতে পারে নাই তাহারা চরম সত্যবস্তুতে পৌঁছিবার পথে সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর স্থাপিত অন্যোন্য সংযুক্ত এক সোপানমালা দেখিতে পাইবে, সেই সোপানমালাকে অবলম্বন করিয়া আত্মরূপায়ণের মধ্য পর্ব্বগুলিকে আয়ত্ত করিতে, আধ্যাত্মিক স্থিতির সিদ্ধ সামর্থ্য সকলকে জীবনে রূপায়িত করিতে সমর্থ হইবে। তাহা ছাড়া যে প্রমুক্ত অতিমানস জ্যোতি ও শক্তি এ সময় প্রভু হইয়া দাঁড়াইবে পরিণাম-ধারার নেতৃত্ব তাহার হাতে যাওয়াতে ইহার প্রভাব সমগ্র পরিণামের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, ইহাই আশা করা যাইতে পারে। উত্তরশক্তির একটা দৃঢ় চাপের ফল পরিণামের নিম্নতর স্তরসমূহের মধ্যস্থ জীবনেও দেখা দিবে ; কিছুটা আলোক, কতকটা শক্তি নিম্নতর ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইবে, এবং প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্র অনুস্যূত প্রচ্ছন্ন ঋতম্ভরা শক্তিকে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিবে। অবিদ্যার জীবনের উপরও সৌষম্য ও সামঞ্জস্যের তত্ত্ব নিজ আধি-পত্য বিস্তার করিবে ; আমাদের সত্তার যে অংশে বৈষম্য ও বিবাদ, অন্ধ বাসনা ও সংঘর্ষ, পর্য্যায়ক্রমে উচ্ছ্বাস ও অবসাদের অস্বাভাবিক আলোড়ন, অনিয়ন্ত্রিত অন্ধশক্তি সকলের মিশ্রণ ও সংঘাতের জন্য অসাম্য ও চঞ্চলতা রাজত্ব করিতেছে তাহাতেও এ প্রভাব অনুভূত হইবে এবং তাহাদের স্থানে দেখা দিবে সত্তার বিবৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য সুনিয়ন্ত্রিত সুষমাময় ছন্দ ও ক্রম, প্রাণ ও চেতনার ঋতময় সচেতন উপচীয়মান সুব্যবস্থা, উচ্চতর এক সুরে বাঁধা হইবে মানুষের জীবন-বীণা। বোধিচেতনা, সহানুভূতি এবং অপরকে জানিবার ও বুঝিবার সামর্থ্য আরও অধিকরূপে ও স্বাধীনভাবে মানুষের জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইবে, আত্মা ও বস্তুর মর্ম্মগত সত্যের অনুভূতি হইবে উজ্জ্বলতর, জীবনের সুযোগ ও দুর্যোগ বুঝিয়া চলিবার সামর্থ্য হইবে দীপ্ততর। আজ যে পরিণামধারার মধ্যে

চেতনার উন্মেষ ও নিশ্চেনার প্রভাব, আলোকের শক্তি ও অন্ধকারের বীর্য্যের সংমিশ্রণ এবং বিক্ষুব্ধ সংঘাত রহিয়াছে তাহার স্থানে পরিণামের প্রগতি হইবে ক্রমবদ্ধ সোপানপরম্পরার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্রতর আলোক হইতে বৃহত্তর আলোকের দিকে; প্রতিপর্ব্বেই তন্মধ্যস্থ আত্মসচেতন সত্তাসকল অন্তরস্থিত চিৎশক্তির আহ্বানে সাড়া দিবে এবং সর্ব্বজনীনতায় বিভাবিত তাহাদের আত্মপ্রকৃতির বিধানকে ঐ প্রকৃতিরই উচচতর বিভূতির দিকে প্রসারিত করিতে সমর্থ হইবে। অন্ততঃপক্ষে এ সমস্ত ঘটা খুবই সম্ভব, এ সমস্তকে পরিণামধারার মধ্যে অতি-মানসের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার স্বাভাবিক ফল মনে করা যাইতে পারে। পরিণামের ক্ষেত্রে অতিমানসের অবতরণে পরিণামধারার মূলতত্ত্বের উচেছদ ঘটিবে না, কেননা অতিমানসের মধ্যে তাহার জ্ঞানশক্তিকে নিবৃত্ত বা স্তম্ভিত রাখিবার সামর্থ্য যেমন আছে তেমনি তাহাকে পূর্ণ বা আংশিকভাবে সক্রিয় করিয়া তুলি-বার শক্তিও আছে, কিন্তু এই অবতবণ পরিণামধারার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিবার দুরূহ ও ক্লেশকর প্রয়াসকে সামঞ্জস্য ও সৌষম্যে মণ্ডিত করিবে, তাহাকে স্থির ধীর প্রশান্ত ও সহজসাধ্য এবং বহুল পরিমাণে সুখকর করিয়া তুলিবে।

অতিমানসের প্রকৃতির মধ্যেই এমন কিছু আছে যাহার জন্য এই সমস্ত মহৎফল লাভ অনিবার্য্য হইবে। ইহার ভিত্তিতেই ইহা এক অভঙ্গ পূর্ণাঙ্গতা-সাধক এবং মহাসৌষম্যস্থাপক অদ্বৈত চেতনা; অবতরণ করিয়া পরিণাম-ধারার মধ্যে অনন্তের বিভূতিবৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার সময় একত্বপ্রকাশের দিকে তাহার ঝোঁক, পূর্ণাঙ্গতা সাধনার দিকে তাহার উদ্যম বা সৌষম্যস্থাপনের দিকে তাহার প্রভাব হ্রাস পাইবে না। অধিমানস, বৈচিত্র্য এবং বহু সম্ভাবনাকে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ধারায় ফুটাইয়া তোলে; ইহা বিরোধ ও বিবাদ ঘটিতে দিতে পারে কিন্তু বিরোধশীল ও বিবদমান প্রতিবস্তু বা ভাবকে সে অখণ্ড বিশ্বভাবনার উপাদান করিয়া তোলে, ফলে যতই নিজের অজ্ঞাতসারে বা অনিচ্ছায় হউক না কেন তাহারা তাহার সমগ্রতাসাধনেই নিয়োজিত করিতে বাধ্য হয় তাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য। অথবা আমরা বলিতে পারি যে, অধিমানস বিরোধ বা বৈষম্যকে স্বীকার করে এমন কি উৎসাহ দেয়; কিন্তু আবার সকল বিরোধ ও বৈষম্যকে পরস্পরের আশ্রয় স্থল হইতে বাধ্য করে; তাই সত্তা, চেতনা ও অনুভূতির বিভিন্ন পথসকলের সৃষ্টি হয়, যাহা প্রত্যেককে অপর সকল এবং পরম এক হইতে ক্রমশঃ দূরে লইয়া যায় বটে, কিন্তু তথাপি তাহারা একত্বে বিধৃত থাকিয়াই নিজেদিগকে বজায় রাখে এবং প্রত্যেককে

আপন স্বতন্ত্র পথেই সেই অদ্বৈত তত্ত্বে পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে পারে। এমন কি আমাদের অবিদ্যাজগতেরও মর্ম্মরহস্য এই : ইহা নিশ্চেতনাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করে কিন্তু তাহার মধ্যে তাহাকে ধারণ করিয়া অধিমানসের যাহা মূলতত্ত্ব সেই বিশ্বভাবনা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু সেই অবিদ্যার জগতে অবস্থিত ব্যক্তিসত্তা তাহার জ্ঞানে এই গোপন তত্ত্বকে লাভ করিতে পারে না, এবং তাহাকে ভিত্তি করিয়া কর্ম্মও করে না। কিন্তু এই জগতে অবস্থিত অধিমানস পুরুষের নিকট এ রহস্য অবিদিত থাকিবে না, কিন্তু তথাপি তিনি নিজের প্রকৃতি এবং কর্ম্মের বিধান বা তাহার স্বধর্ম্ম ও স্বভাব অনুসরণ করিয়া তাহার অন্তরস্থিত ভগবান বা চিৎপুরুষের প্রেরণা, সক্রিয় শাসন বা অন্তর্গূঢ় নিয়ন্ত্রণ অনুসারে ক্রিয়া করিতে এবং বাকী সকলকে সমগ্রতার মধ্যে থাকিয়া তাহাদের নিজস্ব ধারায় চলিতে দিতে পারেন ; সুতরাং অবিদ্যার মধ্যে অধিমানস দ্বারা সৃষ্ট জ্ঞান তাহার চারিদিকে স্থিত অবিদ্যার জগৎ হইতে পৃথক এবং নিজস্ব তত্ত্বের জ্যোতির্ম্ময় কিন্তু বিভেদকারী দেওয়াল দিয়া ঘেরা থাকিয়া সে জগৎ হইতে রক্ষিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে অতিমানস বিজ্ঞানময় পুরুষের অন্তর ও বহির্জীবন এবং সত্ত্বজীবন যে সৌষম্যপূর্ণ পরম একত্বে বিধৃত আছে তাহার কার্য্যকরী উপলব্ধি ও অন্তরঙ্গবোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার সমস্ত জীবনধারা ; কিন্তু সেই সঙ্গে তখনও বর্ত্তমান মনোময় জগতের অবশিষ্ট অংশের সহিত—তাহা যদি পূর্ণভাবে অবিদ্যার রাজ্যরূপে থাকিয়াও থাকে তথাপি—এই পুরুষের এক সৌষম্যপূর্ণ একত্ববোধই থাকিবে। কেননা তাহার মধ্যস্থিত বিজ্ঞানময় চেতনা অবিদ্যার রূপায়ণসমূহের মধ্যে লুক্কায়িত সৌষম্যের উন্মেষেচ্ছু সত্য এবং তত্ত্ব দেখিতে পাইবে এবং তাহাদিগকে উন্মিষিত করিয়া তুলিবে ; তাহার মধ্যে অভঙ্গ পূর্ণাঙ্গতার বোধ আছে বলিয়া তাহার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, তাহার মধ্যে এমন শক্তি আছে যাহার বলে এই সমস্ত রূপায়ণকে তাহার নিজের বিজ্ঞানময় তত্ত্বের এবং তাহার নিজের দিব্যজীবনের বৃহত্তর বিসৃষ্টির মধ্যস্থিত উন্মিষিত সত্য ও সৌষম্যের সঙ্গে ঋতময় যোগে যুক্ত করিতে সমর্থ হইবে। হয়ত জগৎ-জীবনে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া ইহা সম্ভব হইবে না, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে এই নবশক্তির আবির্ভাব হইলে তাহার সর্ব্বতোব্যাপী প্রভাবে সেরূপ পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর স্বাভাবিক ফলরূপে দেখা দিবে। বিজ্ঞানময় পুরুষের আবির্ভাব পার্থিব প্রকৃতিতে আরও সৌষম্যপূর্ণ এক পরিণামের ধারা প্রতিষ্ঠার আশা বহন করিবে।

অতিমানব বা বিজ্ঞানময় জাতির সকলের প্রকৃতি ঠিক একই প্রকার বা তাহারা সকলেই একই নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা হইবে না ; কেননা অতিমানসের ধর্ম্ম বহুত্বের মধ্যে একত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি, সুতরাং বিজ্ঞানময় চেতনার আত্ম-প্রকাশে অনন্ত বৈচিত্র্য দেখা দিবে যদিও সে চেতনার ভিত্তিতে মূল উপাদানে তাহার সর্ব্বপ্রকাশক ও সর্ব্বযোগসাধক শক্তিতে তাহা একই হইবে। ইহা অবশ্য স্পষ্ট যে এই নূতন অভিব্যক্তিতে অতিমানসের তিন ধারাই আত্মপ্রকাশ করিবে ; তাহার নিম্নে তাহারই প্রশাসনে বিধৃত হইয়া থাকিবে বিজ্ঞান বিভাবিত অধিমানস ও বোধিমানস ভূমির স্তরসমূহ—যে সমস্ত সাধক এই সমস্ত ঊর্দ্ধ্বগামী চেতনায় সিদ্ধ হইয়াছেন তাহাদের লইয়া ; জ্ঞানের মধ্য দিয়া পরিণামধারা যেমন চলিতে থাকিবে ঊর্দ্ধ্বগামী সোপানাবলির শীর্ষদেশে এমন সব ব্যক্তিপুরুষও দেখা দিবেন যাহারা অতিমানসরূপায়ণও পার হইয়া অতিমানসের উচ্চতম শিখর হইতে মানবদেহেই অদ্বৈততত্ত্বে আত্মোপলব্ধির এমন স্তরে আরূঢ় হইবেন যাহা বিসৃষ্টির মধ্যে সত্যস্বরূপের আত্মপ্রকাশের চরম ও পরম অবস্থা। কিন্তু অতিমানব জাতির মধ্যেও ব্যষ্টিসত্তার স্ফুরণে বহু বৈচিত্র্য ও তারতম্য থাকিবে, ব্যক্তিত্বের কোন বিশেষ ছাঁচে সকল ব্যক্তিপুরুষকে ঢালাই করা হইবে না ; এ জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি অপর হইতে পৃথক হইবেন, প্রত্যেকে হইবেন সৎস্বরূপের এক অদ্বিতীয় রূপায়ণ, যদিও ভিত্তিতে একত্ববোধে এবং সত্তার মূলতত্ত্বে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য সকলের সহিত এক হইবেন। আমাদের সীমিত মনোময় ভাবনা এবং মনোময় ভাষার দুর্ব্বল বা অস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত চিত্রের সাহায্যে অতি ক্ষীণভাবে অতিমানসী স্থিতির এই সাধারণ তত্ত্বের একটা ধারণা শুধু আমরা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে পারি। কেবলমাত্র অতিমানসী চেতনাই বিজ্ঞানময় পুরুষের আরও জীবন্ত ছবি আঁকিতে পারে, মনশ্চেতনার পক্ষে তাহার বস্তুনিরপেক্ষ (abstract) একটা অস্পষ্ট রেখাচিত্র রচনা করাই শুধু সম্ভব।

বিজ্ঞান চিৎপুরুষের ক্রিয়াশীল তত্ত্ব বা কার্য্যকরী চেতনা, ইহা চিৎপুরুষের আত্মপ্রকাশের উচ্চতম ও মহত্তম বীর্য্য। বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুষই আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে উন্নীত মানবের পরম পর্য্যবসান ; তাহার সত্তার সকল ভাব, তাহার ভাবনা, জীবন ও ক্রিয়ার সকল ধারা সার্ব্বভৌম আধ্যাত্মিকতার বিরাট শক্তি দ্বারাই পরিচালিত হইবে। তাহার আত্মজ্ঞানে ব্রহ্মের সৎ চিৎ ও আনন্দ এই তিন বিভাবের সত্যই বর্ত্তমান থাকিবে, তাহার অন্তর্জীবনে হইবে তাহাদের

নিত্য উপলব্ধি ; তাহার সকল জীবন সকল সত্তা বিশ্বাতীত এবং বিশ্বাত্মক চিদাত্মার সহিত একত্ববোধে নিত্য প্রপূরিত থাকিবে ; চিন্ময় পরমপুরুষ হইতে এবং বিশ্বপ্রকৃতির উপর চিদাত্মাব যে প্রশাসন আছে তথা হইতে তাঁহার প্রেরণায় তাঁহারই অধীনে থাকিয়া তাহার সকল কর্ম্ম উদ্ভূত ও পরিচালিত হইবে। তাহার সমগ্র জীবন অন্তর্যামী চিন্ময়পুরুষের বোধে ও অনুভবে ভরপুর থাকিবে এবং প্রকৃতির মধ্যে সকলই তাঁহার আত্মপ্রকাশ বলিয়া দেখা যাইবে ; তাহার সমগ্রজীবন, তাহার সকল ভাবনা বেদনা সকল ক্রিয়া সেই পরমসত্যের ভিত্তিতে স্থাপিত এবং তাহাই হইবে তাহাদের একমাত্র তাৎপর্য্য। চেতনার প্রতি কেন্দ্রে, তাহার প্রাণশক্তির প্রতি স্পন্দনে, দেহের প্রত্যেক কোষে তিনি ভগবানের উপস্থিতি ও আবির্ভাব অনুভব করিবেন। তাহার প্রকৃতির প্রতি ক্রিয়াতে প্রতি শক্তিতে তিনি পরাপ্রকৃতি, পরমা বিশ্বজননীর ক্রিয়াধারা দেখিতে পাইবেন ; তিনি তাহার প্রাকৃতসত্তাকে জগন্মাতার আত্মশক্তিরই সম্ভূতি ও প্রকাশরূপে দেখিবেন। তিনি এই চেতনায় লোকোত্তর পূর্ণ স্বাধীনতায় চিৎপুরুষের পরিপূর্ণ আনন্দে বিশ্বাত্মার সহিত পূর্ণ একাত্মতায় সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত্ত মৈত্রীতে বাস ও ক্রিয়া করিবেন। সমস্ত জীব হইবে তাহার আত্মস্বরূপ, চেতনার সকল খেলা সকল শক্তি তাহারই বিশ্বাত্মচেতনার শক্তি ও খেলা বলিয়া অনুভূত হইবে। কিন্তু সর্ব্বগ্রাহী এই বিশ্বাত্মবোধে কোন নিম্নতর শক্তির অধীনতা বা নিজের উচ্চতম সত্য হইতে কোন বিচ্যুতি থাকিবে না, কেননা এই সত্য বিশ্বের সকল সত্যকে ঘিরিয়া ধরিবে, প্রত্যেককে তাহার যথাযথ স্থানে স্থাপিত করিবে, সকলকে লইয়া বৈচিত্র্যে ভরা এক পরম সৌষম্য ও সামঞ্জস্য স্থাপিত করিবে —কোন মিশ্রণ, সংঘর্ষ, উচ্ছৃঙ্খলতা বা বিকৃতির দ্বারা এই পূর্ণ সৌষম্যের অন্তর্গত বিভিন্ন সামঞ্জস্যকে খণ্ডিত হইতে দিবে না। তাহার কাছে তাহার নিজের জীবন এবং বিশ্বজীবন হইবে যেন শিল্পনৈপুণ্যের এক চরম চমৎকার ; ইহা বহু বিচিত্র উপাদান হইতে কোন বিশ্বশিল্পী বা বিশ্বকবির দ্বারা স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত ও অভ্রান্তভাবে গঠিত সৃষ্টিরই পরিচয় দিবে। বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুষ জগতের মধ্যে থাকিয়া জগতের বস্তু হইয়াও নিজ চেতনায় জগৎকে অতিক্রম করিয়া যাইবেন এবং ইহার উপরে স্থিত বিশ্বাতীত আত্মাতে নিত্য বাস করিবেন ; তিনি বিশ্বাত্মক হইয়াও বিশ্ব হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিবেন, ব্যক্তিতে পূর্ণ ব্যক্ত হইয়াও বিবিক্ত ব্যক্তিভাব দ্বারা সীমিত হইবেন না। খাঁটি ব্যক্তিপুরুষের সত্তা কোন বিবিক্ত সত্তা নহে, তাহার ব্যষ্টিভাবও বিশ্বাত্মক, কেননা বিশ্বই

তাহার মধ্যে ব্যষ্টিভাবাপন্ন হইয়াছে; আবার সেই সঙ্গে তিনি উচচ অভ্রভেদী চূড়ার মত বিশ্বাতীত অনন্তের চিদাকাশেও দিব্যভাবে উন্মিষিত হইয়া উঠিবেন, কেননা তুরীয়াতীতই তাহার মধ্যে ব্যক্তিরূপ ধারণ করিয়াছেন।

জীবন রহস্যের তিনটি চাবিরূপে আমরা তিনটি শক্তির দেখা পাই, তাহারা হইল ব্যষ্টিজীবশক্তি, বিশ্বশক্তি এবং পরম সত্যবস্তুর স্বরূপশক্তি যাহা জীব ও বিশ্ব এ উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আছে। বিজ্ঞানঘন পুরুষের জীবনে এই তিন শক্তি যুক্তভাবে বর্ত্তমান থাকিবে এবং তিনের এক পরম সামঞ্জস্য দেখা দিবে। তাহার মধ্যে ব্যষ্টিভাবনা পরম পূর্ণতায় পৌঁছিবে, পরম অভ্যুদয় এবং আত্মপ্রকাশের সিদ্ধিতে তিনি নিত্য তৃপ্ত থাকিবেন, কেননা তাহার সকল উপাদান সর্ব্বাঙ্গীণভাবে এক প্রকার সর্ব্বাবগাহী উদারতা এবং বিপুলতার মধ্যে উৎকর্ষের চরমসীমায় পৌঁছিবে। পূর্ণতা ও সৌষম্যের সাধনাই ত আমাদের জীবনে চলিতেছে। আমাদের প্রকৃতিতে অপূর্ণতা, শক্তিহীনতা এবং বৈষম্য রহিয়াছে এবং তাহার জন্য আমাদের অন্তরে একটা মর্ম্মন্তুদ বেদনা আছে; কিন্তু তাহার কারণ আমাদের সত্তা পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে নাই আমরা নিজেকে পূর্ণরূপে জানি না আমরা নিজেদের অথবা আমাদের প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারি নাই। জীবনের সকল মুহূর্ত্তে এবং সর্ব্ববস্তুর মধ্যে অতিমানসবিজ্ঞান এক পরিপূর্ণ আত্ম-জ্ঞান দান করে, সেই সঙ্গে পরিপূর্ণ আত্মকর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, সে কর্ত্তৃত্বের অর্থ কেবল প্রকৃতির পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার নহে, তাহা প্রকৃতির মধ্যে অব্যাহত আত্মপ্রকাশের শক্তিও বটে। যে আত্মজ্ঞান প্রকাশ হইবে তাহাই আত্মার সংকল্পে পূর্ণভাবে রূপ গ্রহণ করিবে এবং সংকল্প পূর্ণভাবে আত্মার ক্রিয়াতে রূপায়িত হইয়া উঠিবে; তাহার ফলে নিজ প্রকৃতির মধ্যে আত্মার পূর্ণবীর্য্য এবং পূর্ণায়ত রূপায়ণ দেখা দিবে। বিজ্ঞানময় সত্তার নিম্নতর ভূমিতে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের অনুযায়ীভাবে আত্মপ্রকাশের বৈভব সঙ্কুচিত হইতে পারে, দিব্যভাবের সমগ্রতার কোন একটি দিক কোন একটি বিশেষ উপাদান বা কয়েকটি উপাদানের সুষম সমাহারকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য পূর্ণতা সীমিত হইতে, অন্তহীন বৈচিত্র্যে বিলসিত অদ্বৈতস্বরূপের বিশ্বশক্তির একটি সীমিত চয়নিকা আধারে স্ফুরিত হইতে পারে। কিন্তু অতিমানস সত্তার আত্মপ্রকাশে পূর্ণতার সঙ্কোচ-সাধনের প্রয়োজন আর থাকিবে না; সেখানে সীমা ও সঙ্কোচের দ্বারা বৈচিত্র্য না আনিয়া তাহা আনা হইবে পরাপ্রকৃতির শক্তি ও বর্ণৈশ্বর্য্যের অফুরন্ত

উল্লাসে ; একই সমগ্র পুরুষ এবং একই সমগ্র প্রকৃতি দিব্যভাবে অনন্তবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া নিজদিগকে প্রকাশ করিবেন, কেননা সেখানে প্রত্যেকটি সত্তা হইবে অখণ্ডতা ও সৌষম্যের এক নব প্রকাশ, অদ্বৈত সত্তারই এক আত্মরূপ। যে কোন মুহূর্ত্তে যাহা পুরোভাগে প্রকাশিত হইবে অথবা যাহা সত্তার গভীরে ধরিয়া রাখা হইবে তাহা সামর্থ্য বা অসামর্থ্যের উপর নির্ভর করিবে না, নির্ভর করিবে চিৎপুরুষের নিজের সক্রিয় নির্ব্বাচনের, আত্মপ্রকাশের আনন্দের এবং ব্যষ্টির মধ্যস্থিত দিব্য পুরুষের নিজ সংকল্প ও উল্লাসের সত্যের উপর, আর গৌণভাবে নির্ভর করিবে সমগ্রের সৌষম্যের মধ্যে ব্যষ্টির মধ্য দিয়া যাহা সাধন করিতে হইবে তাহার সত্যের উপর। কারণ পরিপূর্ণ ব্যষ্টিপুরুষই বিশ্বগত ব্যষ্টি-পুরুষ, কেননা আমাদের ব্যক্তিত্ব কেবল তখনই পূর্ণ হইবে যখন বিশ্বকে আমাদের নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে এবং বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিব।

অতিমানসময় পুরুষ তাহার বিশ্বাত্মচেতনার সব কিছুকে তাহার আত্মস্বরূপ বলিয়া দেখিবেন ও অনুভব করিবেন এবং সেই দৃষ্টি ও অনুভূতি লইয়াই কর্ম্ম করিবেন ; তিনি সার্ব্বভৌম জ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া কর্ম্ম করিবেন এবং তাহার ব্যষ্টি-আত্মার সহিত সমগ্র বিশ্বাত্মার, ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত সমগ্র বিশ্ব-ইচ্ছার, তাহার ব্যক্তিগত কর্ম্মের সহিত সমগ্র বিশ্বকর্ম্মের একটা সৌষম্য ও সমন্বয় দেখা দিবে। আমাদের বাহ্য জীবনে এবং অন্তর্জীবনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়ায়, যাহার জন্য আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখে জর্জ্জরিত হই তাহা এই যে জগতের সহিত আমাদের খাঁটি সম্বন্ধের জ্ঞান অপূর্ণ, অপরকে আমরা জানি না, বস্তুর সমগ্রতার সহিত আমাদের একটা অসামঞ্জস্য রহিয়াছে, জগতের কাছে আমাদের দাবির সঙ্গে আমাদের কাছে জগতের দাবির সঙ্গতি স্থাপিত হয় নাই। আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং যে জগতে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, এ উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পাই, মনে হয় সে জগৎ আমাদের পক্ষে অতি বৃহৎ এবং আমাদের আত্মা, মন, প্রাণ ও দেহের প্রতি উদাসীন থাকিয়া যেন ঝড়ের বেগে তাহার নিজের লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছে—আমাদের এই প্রাকৃত সত্তা ও জগৎ এ উভয় হইতে পলায়ন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বাণে পৌঁছা ছাড়া এ বিরোধ সমাধানের কোন উপায় খুঁজিয়া পাই না। আমাদের গতি ও লক্ষ্যের সঙ্গে বিশ্বের গতি ও লক্ষ্যের সম্বন্ধ কি তাহা আমরা আজিও নির্ণয় করিতে পারি নাই, তাই বিশ্বের সহিত নিজেদের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে গিয়া হয় বিশ্বের উপর জোর করিয়া আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে এবং বিশ্বকে সে

কার্য্যে সহযোগিতা করিতে বাধ্য করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয়, না হয় নিজেদিগকে দমন করিয়া বিশ্বের অধীন হইয়া পড়িতে হয়, অথবা ব্যষ্টি ব্যক্তির নিয়তি এবং সমগ্র বিশ্ব ও তাহার গোপন উদ্দেশ্য, এই দুইএর প্রয়োজনীয় তাগিদের মধ্যে একটা দুরূহ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু যে অতিমানস পুরুষ বিশ্বচেতনায় বাস করেন, তাহার কাছে এ বাধা বা বিরোধের কোন অস্তিত্ব নাই, কেননা তাহার ক্ষুদ্র ব্যষ্টি অহংবোধ নাই, তাহার বিশ্বগত ব্যষ্টিভাব (Cosmic individuality) সমগ্র বিশ্বশক্তি এবং তাহার গতি, ক্রিয়া ও তাৎপর্য্য নিজের অংশরূপেই জানিবে; এবং তাহার মধ্যস্থিত ঋতচেতনা প্রতি পদক্ষেপে সমগ্রের সহিত তাহার সত্য সম্বন্ধ দেখিতে পাইবে এবং সেই সম্বন্ধ খাঁটি ও বীর্যবন্ত ভাবে ফুটাইয়া তুলিবে।

কারণ বস্তুতঃ একই বিশ্বাতীত সত্তা পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ জীব ও বিশ্বরূপে যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছেন; যদিও অবিদ্যা এবং তাহার বিধানের অধীন থাকিয়া আমরা এ উভয়ের মধ্যে বিরোধ ও অসঙ্গতি দেখিতে পাই তথাপি যে তাহাদের এক খাঁটি সমন্বয়ী সত্য সম্বন্ধ, সকলকে একত্রে বাঁধিবার এক সূত্র আছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের অহংএর অন্ধতাবশতঃ সকলের মধ্যে যিনি অদ্বয় সেই আত্মাকে স্থাপিত না করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বকে স্থাপন করিতে চেষ্টা করি বলিয়া আমরা সে সম্বন্ধ হারাইয়া ফেলি। নিজের স্বাভাবিক শক্তি ও অধিকাররূপে এ সত্য সম্বন্ধের জ্ঞান অতিমানসচেতনায় নিত্য বর্ত্তমান আছে; কেননা অতিমানসই বিশ্বের সকল সম্বন্ধ এবং ব্যষ্টিজীবের সহিত বিশ্বের সমস্ত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে; অতিমানস বিশ্বাতীত সত্তার স্বরূপশক্তি বলিয়া তাহার এ নিয়ন্ত্রণ হয় স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ। এমন কি মনোময় চেতনায় অহংকে অভিভূত করিয়া বিশ্বচেতনার আবেশ হইলে এবং বিশ্বাতীত সত্যের জ্ঞান জাগিলে শুধু তাহার ফলে বিশ্ব ও জীবের পরস্পরের সম্বন্ধের একটা সার্থক সমাধান না হইতেও পারে; কেননা তখনও বিমুক্ত আধ্যাত্মিক মন এবং বিশ্বগত অবিদ্যাগ্রস্ত অন্ধকারময় ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে অসঙ্গতি থাকিয়া যাইতে পারে; মনের সে অসঙ্গতি দূর বা জয় করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু অতিমানস চেতনা কেবল এক নিষ্ক্রিয় জ্ঞান নহে, বিশ্বাতীতের সৃষ্টিশীল আলোক ও শক্তিতে, অতিমানসের সত্য আলোক বা ঋত জ্যোতিতে সর্ব্বদা তাহা বীর্য্যবান ও ক্রিয়াশীল; তাই তাহার সে শক্তি আছে। অতিমানস পুরুষের বিশ্বাত্মার সহিত অদ্বৈতানুভূতি আছে, বিশ্বপ্রকৃতির নিম্নতর রূপায়ণে

যে অবিদ্যার বন্ধন আছে তাহা তাহাতে নাই; পক্ষান্তরে সত্যের আলোকে অবিদ্যার উপর ক্রিয়া করিবার শক্তি তাহার মধ্যে আছে। আত্মপ্রকাশের এক বৃহৎ সার্ব্বভৌমতা এবং পার্থিব সত্তার মধ্য দিয়া সর্ব্বব্যাপী এক মহাসৌষম্যের স্ফুরণই বিজ্ঞানময় প্রকৃতিতে অবস্থিত অতিমানস পুরুষের স্বাভাবিক লক্ষণ।

অতিমানসসত্তা অদ্বৈতসত্তা ও অদ্বৈতচেতনার অনন্তভাবে প্রকাশশীল সত্য-শক্তির অনন্ত বিচিত্র প্রকাশ ও খেলা—অদ্বৈত আনন্দেরই পরমপ্রেরণা বশে। আপন সত্তার সত্য মধ্যে চিৎপুরুষের আত্মপ্রকাশের আনন্দই বিজ্ঞানময় জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য্য। তাহার সমগ্র গতিবৃত্তি চিৎপুরুষের যেমন সত্যের তেমনি তাহার আনন্দের এক রূপায়ণ, চিন্ময় সত্তা, চিন্ময় চেতনা, চিন্ময় আনন্দেরই আত্মপ্রতিষ্ঠা। ভিত্তিতে অদ্বয়স্বরূপ হইলেও প্রাকৃত জীবনে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা এমন কিছু যাহা অহংকেন্দ্রিক ও বিবিক্ত, অপরের আত্ম-প্রতিষ্ঠার অথবা জীবনের প্রতি তাহাদের দাবির হয় তাহা বিরোধী না হয় উদাসীন কিম্বা অতি অল্পপরিমাণে মনোযোগী, কিন্তু অতিমানস জীবনে সেরূপ হইবে না। অতিমানস পুরুষ নিজের আত্মা সকলের আত্মার সহিত এক বলিয়া জানিবেন ও অনুভব করিবেন, তাই নিজের মধ্যে চিৎস্বরূপের আত্ম-প্রকাশের আনন্দ যেমন চাহিবেন তেমনি চাহিবেন সকলের মধ্যে ভগবদ্‌ভাবের পরমানন্দময় প্রকাশ; তাহার মধ্যে যেমন থাকিবে এক সার্ব্বভৌম ও বিশ্বগত আনন্দ, তেমনি থাকিবে অপর সকলের মধ্যে চিৎপুরুষের আনন্দ, সত্তার পরমো-ল্লাস সঞ্চার করিবার এক শক্তি; কেননা তাহাদের আনন্দ তাহার আপন সত্তার আনন্দেরই অংশ। সর্ব্বভূতহিতে রত থাকা অপরের সুখ ও দুঃখ নিজেরই সুখ ও দুঃখ বলিয়া অনুভব করা চিন্ময় সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত আছে; অতিমানস পুরুষের পক্ষে তজ্জন্য নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে মুছিয়া ফেলিবার প্রয়োজন নাই, কেননা বিশ্বজনীনতা তাঁহার আত্মসম্পূর্ত্তির, সকলের মধ্যে পরম এককেই পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিবার সাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; তাহার মধ্যে নিজ হিত এবং পরহিতের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ থাকিতেই পারে না; বিশ্বের সহিত সমবেদনায় এক হইতে গিয়া নিজেকে অবিদ্যাকবলিত জীবের সুখ দুঃখের অধীন করিবার কোন প্রয়োজন তাহাতে থাকিবে না; কেননা সর্ব্বজনীন সহানুভূতি তাহার সত্তার সহজাত সত্যের এক অংশ, তাহা ব্যক্তিগতভাবে অপরের নিম্নতর সুখ দুঃখের অংশগ্রহণ করিবার উপরে নির্ভর করে না; তাহার সহানুভূতি যাহাকে আলিঙ্গন করে

তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায় এবং এই অতিক্রমণের মধ্যেই থাকে তাহার পরমশক্তি। তাহার অনুভূতি এবং ক্রিয়ার সর্ব্বজনীনতা সর্ব্বদাই তাহার স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা ও স্বাভাবিক ক্রিয়া, পরমসত্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ, চিৎপুরুষের আত্মসত্তার আনন্দের অভিব্যক্তি। সসীম জীবসত্তার বা তাহার বাসনার অথবা এ উভয়ের তৃপ্তি বা বিফলতার কোন স্থান অতিমানস পুরুষে নাই, আবার আপেক্ষিক ও পরতন্ত্র যে সুখ বা দুঃখ আমাদের সঙ্কীর্ণ প্রকৃতিকে অধিকার করে বা অভিভূত করিয়া তোলে, তাহারও কোন অস্তিত্ব তাহাতে নাই ; কেননা এ সমস্ত অহংকার এবং অবিদ্যারই ধর্ম্ম. চিৎসত্তার স্বাতন্ত্র্য এবং সত্যের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

বিজ্ঞানময় পুরুষের যেমন কর্ম্মের ইচ্ছা আছে তেমনি কী ইচ্ছা করিবেন তাহার জ্ঞান আছে এবং সেই জ্ঞানানুসারে কার্য্যসিদ্ধি করিবার শক্তিও আছে, যাহা অকরণীয় এমন কোন কার্য্যে অবিদ্যাবশতঃ তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে না। তাহা ছাড়া তাঁহার কর্ম্মে কোন ফল কামনা নাই ; সত্তায় এবং কর্ম্মে, চিৎসত্তার শুদ্ধ স্থিতিতে, শুদ্ধ কর্ম্মে এবং শুদ্ধ আনন্দেই তাঁহার উল্লাস। যেমন তাঁহার নিষ্ক্রিয় চেতনাতে নিখিল বিশ্বের সব কিছু অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে সুতরাং তাহা সর্ব্বদাই আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ, তেমনি তাঁহার সক্রিয় চেতনা প্রতি পদক্ষেপে প্রতিকর্ম্মে এক আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ও আত্মসম্পূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। সব কিছুকে তিনি সমগ্র ভাবনার সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে পাইবেন, তাই তাঁহার প্রতি পর্ব্ব প্রতি পদক্ষেপ হইবে জ্যোতির্ম্ময় আনন্দপূর্ণ এবং আপনাতে আপনি তৃপ্ত, কেননা তাহা জ্যোতিরুজ্জ্বল সমগ্রতার সহিত সম্পূর্ণরূপে এক সুরে বাঁধা। বস্তুতঃ অতিমানস চেতনার বৈশিষ্ট্যই হইল এই চেতনার, এই চিন্ময় সমগ্রতার মধ্যে বাস করা এবং তথা হইতে সকল কর্ম্ম করা ; এ চেতনা যেমন স্বরূপসত্তায়, তেমনি সত্তার সক্রিয় গতি প্রবৃত্তিতেও সমগ্রতার মধ্যে নিত্য তৃপ্ত এবং পূর্ণ, বস্তুতঃ প্রতি পদের সহিত সমগ্রতার নিত্য সম্বন্ধের জ্ঞান সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকাই অতিমানস চেতনার বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন এবং ইহাই আমাদের অবিদ্যাগ্রস্ত চেতনার পর্ব্বগুলির বিচ্ছিন্ন এবং অন্ধ পদক্ষেপ-পরম্পরা হইতে অতিমানস চেতনার পার্থক্য। বিজ্ঞানময় সত্তা এবং আনন্দ বিশ্ব-পুরুষেরই পূর্ণ সত্তা এবং আনন্দ, তাই সে সত্তার প্রত্যেক পৃথক ক্রিয়া এবং গতিতে সেই বিশ্বচেতনা ও সমগ্রতার আবেশ আছে ; প্রতি ক্রিয়াতে যে আত্মার এক অপূর্ণ অনুভূতি মাত্র হইবে অথবা তাহার আনন্দের এক খণ্ডিত অংশ যে

শুধু লাভ হইবে তাহা নহে, প্রতি ক্রিয়াতে অখণ্ড সত্তার সমগ্র গতি বা শক্তির বোধ এবং তাহারই পরিপূর্ণ অখণ্ড ও পূর্ণাঙ্গ আনন্দ বর্ত্তমান থাকিবে। বিজ্ঞানময় পুরুষের মধ্যে যে জ্ঞান অনায়াস কর্ম্মের মধ্যে রূপায়িত হয় তাহা মনোময় ভাবনাজাত জ্ঞান নহে, তাহা অতিমানসের সত্যভাবনা বা সম্ভূত বিজ্ঞান, পরা-চেতনাব স্বরূপ জ্যোতির এক প্রকাশ; সত্যস্বরূপের সমগ্র সত্তা ও সম্ভূতির আত্মজ্যোতি সে ক্ষেত্রে প্রতি বিশিষ্ট কর্ম্মের উপর নিয়ত এবং অজস্র ধারায় সর্ব্বদা ঝরিয়া পড়ে এবং তাহাকে তাহার আত্মসত্তার শুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। কারণ এক অনন্ত চেতনা তাহার একত্ববোধজাত জ্ঞানের সহিত সর্ব্বদা প্রতি ক্রিয়ার প্রতি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, তাহাতে থাকে সেই পরম একেরই আনন্দ ও অনুভূতি, ফলে প্রতি সান্তের মধ্যে অনন্তের সাক্ষাৎ-স্পর্শ লাভ হয়।

বিজ্ঞানময় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ আমাদের বিশ্বচেতনা এবং বিশ্ব-কর্ম্মে এক রূপান্তর আনয়ন করিবে; কেননা ইহা তাহার অভিনব জ্ঞানশক্তি লইয়া যে কেবল আমাদের অন্তর্জীবনকে অধিকার করিবে তাহা নহে, পরন্তু আমাদের বহির্জীবন এবং জগৎ-জীবনও পূর্ণরূপে তাহার বশে আসিবে; অন্তর এবং বাহির উভয়ই এক নবরূপে গঠিত হইবে, আধ্যাত্মিক জীবনের শক্তি ও অনুভবের মধ্যে উভয়কে লইয়া এক অখণ্ড পূর্ণাঙ্গতা সাধিত হইবে। এই রূপান্তরের ফলে অবিলম্বে আমাদের বর্ত্তমান জীবনধারা যেমন বর্জিত হইবে তেমনি তাহা বিপরীতমুখী এক নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত এবং তাহার অন্তরের আকূতি ও অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। বস্তুতঃ বর্ত্তমানে আমরা এক দোটানার মধ্যে বাস করি, আমাদের উপর একদিকে আছে যাহা আমাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে প্রাণ এবং জড়ময় সেই বাহ্য জগতের প্রভাব, অপরদিকে আছে উন্মিষন্ত চিৎপুরুষের দিকে আমাদের আকর্ষণ, যাঁহারই ভাবে আমাদিগকে আমাদের জগৎ পুনরায় গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান জীবনে যেমন আছে জড় ও প্রাণশক্তির আধিপত্য, তেমনি আছে তাহাদের সঙ্গে একটা সংগ্রাম। প্রথম যেন মনে হয় যে বাহিরের এক সত্তা বা জীবন, তাহার অভি-ঘাতে আমাদের মধ্যে যে সাড়া জাগে তাহারই সহায়তায়, আমাদের অন্তর বা মনোময় জীবন গড়িয়া তোলে; যদিই বা আমরা নিজেদিগকে কিছুটা গড়িয়া তুলি মনে করি তাহা আমাদের অধিকাংশের জীবনে জাগতিক প্রকৃতি এবং পরিবেশ আমাদিগকে যে অভিঘাত দেয় তাহার প্রতিক্রিয়ার উপর যতটা নির্ভর

করে আমাদের নিজের স্বাধীন বুদ্ধি বা অন্তরাত্মার সচেতন আবেশ ও প্রভাবের উপর ততটা নির্ভরশীল নয় বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু আমাদের সচেতন সত্তার উন্মেষ এবং পুষ্টির পথে আমরা এমন এক অন্তর্জীবনের দিকে অগ্রসর হই যে জীবন নিজেরই শক্তি এবং জ্ঞানে নিজেরই বাহ্য রূপ এবং আত্মপ্রকাশোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানময় প্রকৃতিতে এই সাধনা চরম সিদ্ধিতে পৌঁছিবে, তখন যে জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার প্রকৃতিতে তাহা হইবে এক সংসিদ্ধ অন্তর্জীবন এবং তাহারই শক্তি ও জ্ঞানে বহির্জীবন পূর্ণভাবে রূপায়িত হইবে। বিজ্ঞানময় পুরুষ প্রাণ এবং জড়ের জগৎ গ্রহণ করিবেন বটে কিন্তু নিজের সত্য এবং জীবনের উদ্দেশ্যের অনুকূলে তাহাদের মোড় ফিরাইয়া দিবেন এবং তিনি জীবনকে নিজের অধ্যাত্ম-ভাবনার ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইবেন; অধ্যাত্ম-সৃষ্টির গোপন রহস্য তাহার কাছে সুবিদিত থাকিবে এবং তাঁহার নিজের অন্তরস্থ দিব্য স্রষ্টার সহিত যোগে এবং একত্ব জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবেন বলিয়া তাঁহাতে এ সামর্থ্য নিশ্চিতভাবেই বর্ত্তমান রহিবে। প্রথমে তাঁহার নিজের অন্তর এবং বাহিরের ব্যষ্টিজীবন এইভাবে গঠিত হইয়া উঠিবে, কিন্তু সেই একই শক্তি এবং তত্ত্ব বিজ্ঞানময় সংঘজীবনেও ক্রিয়া করিবে; বিজ্ঞানময় পুরুষগণের পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে একই বিজ্ঞানঘন আত্মা এবং পরমা প্রকৃতি তাহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছেন, এবং তাহাদের সমগ্র সাধারণ জীবনকে নিজেরই এক সার্থক শক্তি ও রূপে ফুটাইয়া তুলিতেছেন।

অধ্যাত্ম জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অন্তর্জীবনের মূল্য খুব বেশী; আধ্যাত্মিক মানুষকে সর্ব্বদা অন্তরেই বাস করিতে হয়, যে অবিদ্যার জগৎ রূপান্তর গ্রহণে অস্বীকার করে তাহার মধ্যে এক অর্থে তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত হইতে এবং অবিদ্যার অন্ধকারময় শক্তিসকলের প্রবল আক্রমণ এবং প্রভাবের হাত হইতে নিজের অন্তর-জীবনকে রক্ষা করিতে হয়; তিনি সংসারের ভিতরে থাকিয়াও তাহার বাহিরে রহিয়া যান, যদি তাঁহাকে জগতের উপর ক্রিয়া করিতে হয় তবে তাহাও তিনি করেন অন্তরের চিন্ময় দুর্গে অবস্থিত থাকিয়া নিজের অন্তরতম প্রদেশ হইতে; হৃদয়ের সেই মণিকোঠায়, তিনি পরম সৎস্বরূপের সহিত অভিন্ন বা তথায় কেবল মাত্র ঈশ্বরের সহিত তাঁহার অন্তরাত্মা একত্রে ও একান্তে বাস করে। কিন্তু বিজ্ঞানময় জীবন এমনই এক অন্তর্জীবন যাহার মধ্যে ভিতর এবং বাহির, আত্মা এবং জগতের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ প্রশমিত হইয়াছে, সে-সকলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানময় পুরুষ তাহার অন্তরতম

সত্তায় একাকী ভগবানের সান্নিধ্যে সদা বিদ্যমান, শাশ্বত পুরুষের সহিত সর্ব্বদা এক, নিজের অন্তরের গভীরে নিত্য নিমগ্ন, তুঙ্গতম শিখর হইতে জ্যোতির্ঘন গোপন অতলান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বভাবের সহিত যুক্ত ; কোথাও এমন কিছু নাই যাহা এই গভীরে গিয়া তাহাকে আক্রমণ বা বিক্ষুব্ধ করিতে পারে অথবা সে তুঙ্গতা হইতে তাঁহাকে নামাইয়া আনিতে পারে, জগতের কোন কিছু, তাঁহার কর্ম্ম অথবা তাঁহার চারিপাশে যাহা কিছু আছে তাহার কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। অধ্যাত্ম-জীবনের ইহা সর্ব্বাতিক্রমী বিভাব, চিৎপুরুষের স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য্য ; কেননা তাহা না হইলে, প্রকৃতির মধ্যে জগতের সহিত এক হইয়া গেলে সঙ্কীর্ণতার বন্ধন আসিয়া পড়ে, স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র একাত্মতা বোধ থাকে না। কিন্তু সেই সঙ্গে সেই অন্তরের যোগ এবং একাত্মানুভব হৃদয়ের মধ্য দিয়া ভগবৎ-প্রেম এবং দিব্য আনন্দরূপে প্রকাশ পাইবে, এবং সেই প্রেম ও আনন্দ প্রসারিত হইয়া নিখিল বিশ্বকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিবে। বিজ্ঞানময় পুরুষের বিশ্বানুভবে তাঁহার অন্তবস্থ ভাগবতী শান্তি প্রসারিত হইয়া সমদর্শনের এক সর্ব্বগত প্রশান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবে. অথচ তাহাতে কেবল যে নিষ্ক্রিয়তা থাকিবে তাহা নহে, প্রবল কর্ম্মের মধ্যেও তাহার প্রকাশ হইবে ; একত্বের স্বাধীন এই শান্তি যাহা কিছু স্পর্শ করিবে তাহাকে অভিভূত ও বশীভূত এবং যাহা কিছু তাহাতে প্রবিষ্ট হইবে তাহাকে অবিক্ষুব্ধ ও সুস্থির করিবে, যে জগতের মধ্যে অতিমানস সত্তার বাস তাহার সকল সম্বন্ধের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব সেই শান্তির বিধান পরিব্যাপ্ত হইবে। ভিতরের এই যোগ এই আন্তর একত্বজ্ঞান তাঁহার সকল কর্ম্মে অপরের সহিত সকল সম্বন্ধে অনুস্যূত থাকিবে, অপর তাঁহার কাছে পর থাকিবে না, তাহারা তাঁহার নিজের সার্ব্বভৌম পরম অদ্বয় সত্তায় তাহারই আত্মা হইয়া যাইবে। চিৎস্বরূপের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠা এই স্বাতন্ত্র্য তাঁহাকে সকল জীবন নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য দিবে, এমন কি অবিদ্যার জগৎকে আলিঙ্গন করিয়াও তিনি নিজে অবিদ্যাগ্রস্ত হইবেন না, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ চিন্ময় আত্মস্বরূপে থাকিয়া যাইবেন।

কারণ বিশ্বজীবনে বিজ্ঞানময় পুরুষের আত্মানুভবে ব্যষ্টিভাবে কেন্দ্রীভূত প্রকৃতির এক রূপ থাকিবে, যে রূপে তিনি বিশ্বের একজন অধিবাসী, সেই সঙ্গেই তাঁহার মধ্যে নিজের আত্মপ্রসারণে ও আত্মব্যাপ্তিতে অনুভূতি থাকিবে যে যিনি সমগ্র বিশ্ব এবং সর্ব্বভূতকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন সেই পরম

একের সঙ্গেও তিনি এক। সত্তার আত্মপ্রসারিত এই অবস্থা আত্মার অথবা ভাবনাময় চেতনা বা দৃষ্টির অদ্বয় জ্ঞানে শুধু নিবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে, কিন্তু হৃদয়ে, ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে, বস্তুতন্ত্র দৈহিক চেতনায় সব্বত্র এই অদ্বৈতানুভূতি প্রসারিত হইবে। তাঁহার মধ্যে বিশ্বাত্মক চেতনা, বিশ্বাত্মক বেদনা, বিশ্বাত্মক অনুভূতি দেখা দিবে যাহার ফলে বাহিরে বিষয়রূপে অবস্থিত সকল জীবন তাঁহার অন্তরের চেতনা ও সত্তার অংশ হইয়া দাঁড়াইবে; আবার যাহার ফলে তিনি তাহার উপলব্ধি, অনুভূতি, সংবেদন, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি সর্ব্বত্রই পাইবেন ভগবানের সংস্পর্শ; সকল রূপ সকল গতিপ্রবৃত্তির উপলব্ধি, অনুভূতি, দর্শন, শ্রবণ এবং সংস্পর্শ তাঁহার নিজেরই বিশাল আত্মার মধ্যে ঘটিতেছে, তাঁহার চেতনায় এই বোধ দেখা দিবে। শুধু বাহিরের জীবন দিয়া নয় অন্তর্জীবনের দ্বারাও তিনি বিশ্বের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকিবেন। শুধু বাহ্য সংস্পর্শ দ্বারা যে তাঁহার সহিত জগতের বহিরাবরণের সংযোগ ঘটিবে তাহা নহে, তিনি অন্তরে সকল বস্তু ও সকল সত্তার অন্তরাত্মার সংস্পর্শ লাভ করিবেন; তিনি সচেতনভাবে তাহাদের অন্তরেব এবং বাহিরের প্রতিক্রিয়া সকল যথাযথভাবে গ্রহণ করিবেন; তাহাদের মধ্যস্থিত যাহা তাহারা নিজেরা অবগত নহে তাহাও তিনি জানিবেন, অন্তরে এক সর্ব্বাবগাহী সম্যক্ জ্ঞান লইয়া তিনি ক্রিয়া করিবেন, পরিপূর্ণ সহানুভূতি এবং একত্ববোধে তিনি সকলেব সংস্পর্শে আসিবেন অথচ কোন সংস্পর্শ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিবে না, তিনি স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন থাকিবেন। তাঁহার চিন্ময়ীশক্তি, তাঁহার আধ্যাত্মিক-অতিমানসী (Spiritual-supramental) ভাববীর্য্য (idea-force) জগতে রূপায়িত হইয়া প্রধানতঃ ভিতর হইতে ক্রিয়া করিবে, সে ক্রিয়া চলিবে অকথিত বাণীতে, হৃদয়ের শক্তিতে, প্রাণশক্তির সক্রিয় সংবেগে, তাহার মধ্যে থাকিবে যিনি সকলের সহিত এক সেই আত্মার সর্ব্বানুস্যূত এবং সর্ব্বব্যাপী শক্তি; বাহিরের প্রকাশিত দৃশ্যক্রিয়া এই সুবিশাল একমাত্র সমগ্র ক্রিয়ার একটি প্রান্ত বা শেষ প্রতিক্ষেপ মাত্র।

আবার বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুষের বিশ্বময় অন্তর্জীবন কেবল যে জড় বিশ্বের অন্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া সব কিছুকে ঘিরিয়া ধরিয়া তাহাদের সংস্পর্শে আসিবে এবং তাহাতেই সীমাবদ্ধ হইবে তাহা নহে; তাঁহার অনুভূতি ভূলোককে অতিক্রম করিয়া যাইবে, অধিচেতন সত্তার অন্য লোকসকলের সহিত যে স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে তাহার মধ্য দিয়া সে সমস্ত ভূমির সম্যক্ অনুভব লাভের সামর্থ্যও

তাঁহার মধ্যে পূর্ণভাবে দেখা দিবে ; সে সমস্ত লোকের শক্তি ও প্রভাবের জ্ঞান তাহার আন্তর অনুভূতির স্বাভাবিক উপাদানে পরিণত হইবে, এবং এই জগতের ঘটনাবলি তিনি শুধু তাঁহার বাহ্য বিভাবের মধ্য দিয়া দেখিবেন না পরন্তু পার্থিব জড় বিসৃষ্টি ও ক্রিয়ার অন্তরালে যাহা কিছু গোপন রহিয়াছে তাহাদের সকলের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দেখিবেন। বিজ্ঞানময় পুরুষ চিৎপুরুষের সিদ্ধ-বীর্য্যে ঋতচিতের দ্বারা, শুধু যে জড়জগৎ প্রশাসন কবিবেন তাহা নহে কিন্তু প্রাণলোক এবং মনোলোকের উপরও তাঁহার পূর্ণ আধিপত্য থাকিবে এবং জড়জীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য সে সমস্ত লোকের বৃহত্তর শক্তিও সম্যক্-রূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন। এই বৃহত্তর জ্ঞান এবং সকল লোকেব উপর এই উদারতর আধিপত্য, তাহার পরিবেশ এবং জড় জগতের উপর বিজ্ঞানময় পুরুষের প্রভাববিস্তার ও ক্রিয়া করিবার শক্তিকে অতি বিপুলভাবে বাড়াইয়া দিবে।

অতিমানস যাহার সক্রিয় সত্যচেতনা সেই স্বরূপস্থিতিতে স্বয়ং হওয়া বা থাকা ছাড়া সত্তার আর কোন তাৎপর্য্য নাই, আত্মসত্তা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া ছাড়া তাঁহার চেতনার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, স্বরূপে আনন্দিত থাকা ছাড়া তাঁহার আনন্দের আর কোন লক্ষ্য নাই, সেখানে সব কিছুই এক স্বয়ম্ভূ এবং আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ শাশ্বত সত্তা। প্রকাশ বা সম্ভূতির আদি অতিমানস গতিবৃত্তিতে সেই একই ধর্ম্ম বা প্রকৃতি বর্ত্তমান ; ইহা স্বয়ম্ভূ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ছন্দের মধ্যে ধারণ করে সত্তার এক ক্রিয়াধারা যাহা সম্ভূতির বহুধা বিচিত্র রূপে নিজেকেই দেখে, ধারণ করে চেতনার এক ক্রিয়াধারা যাহা আত্মজ্ঞানের বহুরূপে রূপায়িত হয়, ধারণ করে সচেতন সত্তার শক্তির এক ক্রিয়াধারা যাহা নিজেরই মহিমায় ও সৌন্দর্য্যে সত্তার বহু শক্তিরূপে প্রকাশ পায়, ধারণ করে তাহার আনন্দের এক ক্রিয়াধারা যাহা আনন্দেরই অফুরন্তরূপে দেখা দেয়। এখানে জড়ের মধ্যে অতিমানস-সত্তা এবং চেতনা স্ফুরিত হইয়া উঠিলে তাহার এই মৌলিক প্রকৃতির কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না ; কিন্তু পার্থিব জগতে নিজের ব্যক্ত শক্তিতে ক্রিয়া করিবার সময় অতিমানসের মধ্যে কতকগুলি গৌণধর্ম্ম দেখা দিবে অতিমানসের স্বক্ষেত্রে যাহাদের প্রকাশ ছিল না। কেননা এখানে থাকিবে এক পরিণামশীল সত্তা, এক পরিণামশীল চেতনা, সত্তার এক পরিণাম-শীল আনন্দ। পরিণামধারা অবিদ্যার চেতনা হইতে যখন সচ্চিদানন্দের চেতনায় রূপান্তরিত হইবে তখন তাহারই চিহ্নরূপে বিজ্ঞানময় পুরুষের আবির্ভাব

ঘাটিবে। অবিদ্যার মধ্যে আমাদিগকে প্রধানতঃ বৃদ্ধি পাইতে, জানিতে এবং ক্রিয়া করিতে হয় অথবা অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে আমাদিগকে বৃদ্ধি পাইয়া কিছু হইয়া উঠিতে, জ্ঞানে কিছুতে পৌঁছিতে, কর্ম্মে কিছু নিষ্পন্ন করিয়া তুলিতে হয়। আমরা অপূর্ণ, আমাদের সত্তাতে আমাদের তৃপ্তি নাই, কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্যে নানা বাধাবিপত্তি পার হইয়া সবলে চলিয়া আমরা আজ যাহা নহি আমাদিগকে তেমন কিছুতে গড়িয়া উঠিতে হইবে; আমরা অজ্ঞান এবং অজ্ঞানভাব চেতনায় ভারাক্রান্ত, আমাদের এমন কিছুতে পৌঁছিতে হইবে যেখানে গিয়া বোধ করিতে পারিব যে আমরা নিশ্চিতভাবে জানিয়াছি; অসামর্থ্যের শৃঙ্খলে বাঁধা আছি বলিয়া আমাদিগকে বল ও শক্তির অনুসরণে ফিরিতে হয়, জ্বালা যন্ত্রণার চেতনায় অভিভূত হইয়া আমরা এমন কিছু করিতে চাই যাহার ফলে কিছু সুখ মিলিবে অথবা জীবনের তৃপ্তিদায়ক সত্যবস্তুর কিছুটা ধরিতে পারিব। আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার প্রয়াস এবং প্রয়োজন আমাদের কাছে মুখ্য বটে, কিন্তু এখান হইতে আমাদের যাত্রারম্ভ; কেননা দুঃখ জর্জরিত অপূর্ণ জীবন কোনক্রমে বহন করিয়া বেড়ানো আমাদের জীবনের যথাযথ উদ্দেশ্য হইতে পারে না; বিশ্বের মূলে ভিত্তিরূপে যে গোপন আনন্দ এবং শক্তি আছে তাহার মধ্য হইতে অবিদ্যা বাঁচিয়া থাকিবার এই সহজাত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, বাঁচিয়া থাকিবার এই সুখ মাত্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহার পূর্ণতাসাধনের জন্য কিছু করা এবং কিছু হইয়া উঠা একান্ত প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদিগকে কি করিতে হইবে বা কি হইতে হইবে তাহার স্পষ্ট কোন জ্ঞান আমাদের নাই; তাই যতটা পারি আমরা জ্ঞান আহরণ করি, যতটা পাই শক্তি, বীর্য, শুদ্ধি, শান্তি লাভ করিতে চেষ্টা করি, যতটা পাই আনন্দকে ধরিতে চাই, এইভাবে যাহা কিছু পারি তাহা হইয়া উঠি। কিন্তু আমাদের এই আকৃতি ও উদ্দেশ্য এবং তাহাদের পূরণ করিবার জন্য এই প্রচেষ্টা এবং তাহার ফলে এই স্বল্প যাহা কিছু পাই তাহার সমস্তই পাশ হইয়া আমাদিগকে বন্ধন করে; এই সমস্ত লাভই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়; বাহিরের বিদ্যা লাভ করা, বাহিরের সঞ্চয় দ্বারা আমাদের জ্ঞানের কাঠামো গড়িয়া তোলা, বাহিরের কর্ম্মশক্তি এবং বহিরাগত স্থূল আরাম ও সুখ লাভ করা লইয়া আমরা এমন অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকি যে আমাদের অন্তরাত্মার জ্ঞান লাভ করা এবং আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে রহস্য জানিলে আমাদের সত্তার গন্তব্যপথের খাঁটি ভিত্তি স্থাপিত করা সম্ভব হইবে তাহার কথা আমরা

ভুলিয়া যাই। তিনিই আধ্যাত্মিকতাতে পৌঁছিয়াছেন যিনি তাঁহার আত্মাকে আবিষ্কার করিয়াছেন ; যিনি তাঁহার আত্মাকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে বাস করেন তাহার সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন আছেন, তাহারই আনন্দে বিভোর থাকেন, তাঁহার আত্মসত্তাকে পূর্ণ করিবার জন্য বাহিরের কিছুরই তাঁহার প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞানময় পুরুষ এই অভিনব ভিত্তির উপর আরও কিছু গড়িয়া তুলিবেন, তিনি অবিদ্যার মধ্যস্থিত সম্ভূতিকে গ্রহণ করিবেন, তাহাকে জ্ঞানের মধ্যস্থিত জ্যোতির্ম্ময় সম্ভূতিতে এবং সত্তার সিদ্ধ বীর্য্যে রূপান্তরিত করিবেন। সুতরাং আমরা অবিদ্যার মধ্যে যাহা কিছু হইয়া উঠিতে সচেষ্ট রহিযাছি জ্ঞানের মধ্যে তিনি তাহা পূর্ণ করিয়া তুলিবেন। তিনি সকল জ্ঞানকে সৎস্বরূপের আত্ম-জ্ঞানের অভিব্যক্তিতে, সকল শক্তি ও ক্রিয়াকে সেই সত্তাব আত্মশক্তির বীর্য্য ও ক্রিয়ার প্রকাশে, সকল আনন্দকে সেই পরমসতের বিশ্বব্যাপী স্বরূপানন্দের উচছলতায় রূপান্তরিত কবিবেন। তাঁহার সকল আসক্তি সকল বন্ধন খসিয়া পড়িবে, কেননা প্রতিপদক্ষেপে প্রতি বস্তুতে তিনি স্বয়ম্ভূসত্তার পূর্ণতৃপ্তির সন্ধান পাইবেন, পরম চেতনাব আলোকে সত্তার পূর্ণতা সাধন করিবেন এবং তাঁহার মধ্যে পবমানন্দস্বরূপের নিজেকে ফিরিয়া পাইবার পরিপূর্ণ আনন্দের অভিব্যক্তি দেখিবেন। তখন জ্ঞানের মধ্যে পরিণামধারার প্রতি পর্ব্বে সৎ-স্বরূপের এই শক্তি এই সঙ্কল্প স্বরূপস্থিতির এই আনন্দ প্রস্ফুরিত হইতে থাকিবে, অনন্তের ভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রহ্মের পরমানন্দের মধ্যে বিশ্বাতীত সত্তার জ্যোতির্ম্ময় অনুমোদনে সম্ভূতির ধারা স্বাধীনভাবে চলিতে থাকিবে।

অতিমানস-পরিণাম ও অতিমানস-রূপান্তরে মন প্রাণ দেহকে তাহাদের নিম্নতর প্রকৃতি হইতে উন্নয়ন করিয়া সত্তার মহত্তর পন্থাতে প্রতিষ্ঠা করা হইবে অথচ তাহাদের নিজস্ব পন্থা ও সামর্থ্যের দমন বা উচেছদ করা হইবে না, কিন্তু আপনাদিগকে অতিক্রমণের ফলেই তাহারা পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করিবে। কারণ অবিদ্যার মধ্যে সকল পথ আত্মানুসন্ধানের পথ হইলেও তাহা, হয় অন্ধকারাচছন্ন অথবা ক্রমবর্দ্ধমান এক আলোকের অনতিস্ফুটতার মধ্যে নিমগ্ন, কিন্তু বিজ্ঞানময় পুরুষ তাঁহার জীবনে এই সমস্ত পথের মধ্যে স্বীয় আত্মাকে আবিষ্কার ও দর্শন করিবেন এবং তাহাদের লক্ষ্যে পৌঁছিবেন কিন্তু মনের চেয়ে এক বৃহত্তর উপায়ে, নিজ সত্তার সত্য চেতনার আত্মপ্রকাশের পরমোজ্জ্বল আলোকে। মন চায় আলোক, চায় জ্ঞান, চায় সেই পরম অদ্বয় সত্যের জ্ঞান, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সব কিছু বর্ত্তমান আছে, যাহা জীব ও

জগতের মূল বা স্বরূপ সত্য ; আবার সেই সঙ্গে সে চায় সেই এক বহুরূপে যে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন তাঁহার সকল সত্যের সকল প্রকাশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানিতে, চায় সকল ক্রিয়া, রূপ, গতি ও ঘটনার বহুমুখী পন্থা বা বিধানের, সকল পরিবেশের, সকল অভিব্যক্তি ও বিসৃষ্টির জ্ঞান ; কেননা ভাবনাশীল মনের ধর্ম্ম এবং আনন্দই হইল অজানাকে আবিষ্কার এবং বস্তুসকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া তাহার সৃষ্টি-রহস্য নির্ণয় করা। বিজ্ঞানময় রূপান্তরে এই আকূতির চরম সার্থকতা হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার মধ্যে একটা নূতন ধর্ম্ম বা প্রকৃতি দেখা দিবে। তখন অজানাকে আবিষ্কার করিতে হইবে না, জানাকে প্রকট করাই হইবে তাহার ক্রিয়াধারা, সবই তখন হইবে আত্মার দ্বারা আত্মাতে আত্মাকে পাওয়া। কারণ বিজ্ঞানময় পুরুষের আত্মা মনোময় অহং নহে কিন্তু সর্ব্বভূতে যিনি এক সেই চিৎপুরুষ ; তাঁহার দৃষ্টিতে এ জগৎ চিন্ময় জগৎরূপেই প্রতিভাত হয়। সর্ব্বভূতের ভিত্তিরূপে যে একত্ব আছে তাহাকে আবিষ্কার করিবার অর্থই হইল অদ্বয়স্বরূপ হইয়া অদ্বয় তত্ত্ব ও অদ্বয় সত্যকে সর্ব্বত্র দর্শন এবং সেই সঙ্গে সেই অদ্বয় তত্ত্বের সকল শক্তি প্রবৃত্তি ও সম্বন্ধকে সর্ব্বত্র অনুধাবন করা। বিসৃষ্টির অজস্র ধারা এবং সুপ্রচুর রূপরাজি এবং তাহাদের সকল পরিবেশ ও বিস্তারের মধ্যে যাহা কিছু প্রকাশ পাইবে তাহার সমস্তই অদ্বয় তত্ত্বের বিচিত্র সত্যের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য বলিয়া তখন অনুভূত হইবে, তাহারা সকলেই তাহার আত্মার রূপ এবং শক্তির বহুধাবৃত্ত রূপায়ণের অপরূপ উচ্ছলনে সেই অদ্বয় তত্ত্বেরই অনন্তরূপের প্রকাশ বলিয়া দেখা যাইবে। তখন সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইবার ও সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইবার ফলে এবং যে সংস্পর্শে আত্মজ্ঞান চকিতে দেখা দেয়, পরিচয়ের শিখা জ্বলিয়া উঠে সেই সংস্পর্শের পরিণামরূপে এই জ্ঞানের প্রকাশ হইবে ; এ জ্ঞানে, এ বোধিতে সত্যের যে মহৎ এবং নিঃসংশয় বোধ ফুটিবে মন তাহাতে পৌঁছিতে পারে না ; সেই সঙ্গে যাহাদের বলে দৃষ্ট সত্যকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূর্ত্ত এবং বীর্য্যবান, ক্রিয়াধারাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা যায় সেই সমস্ত সক্রিয় পদ্ধতির বোধিজাত সাক্ষাৎ দিব্যজ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে এবং যখন চিন্ময় পুরুষের সেবা এবং ক্রিয়ার বাহন হইবার জন্য তাঁহাকেই জীবনে এবং জড়ে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-চেতনার ডাক পড়িবে তখন এই সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ জ্ঞানই প্রতি পদে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে।

যখন বুদ্ধির অনুসন্ধানী বৃত্তির স্থানে অতিমানসের একাত্মজ্ঞান এবং যাহা

একত্বের মধ্যে কি আছে তাহার খবর রাখে সেই বিজ্ঞানময় বোধিচেতনার প্রতিষ্ঠা হইবে তখন চিৎপুরুষের সর্ব্বব্যাপক আলোক জ্ঞানের সমগ্র পদ্ধতিতে এবং তাহার ব্যবহারের সকল ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইবে, তাহার ফলে জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বস্তুর অথবা কার্য্যসাধক চেতনা, তাহার যন্ত্র বা সাধন এবং কৃত কর্ম্মের মধ্যে এক অভঙ্গ পূর্ণাঙ্গতা স্থাপিত হইবে ; তখন একই আত্মা সমগ্র ও পূর্ণাঙ্গ গতি প্রবৃত্তির দ্রষ্টা হইবেন, তাহার মধ্যে নিজেকে নিবিড়ভাবে সার্থক করিয়া তুলিবেন এবং আত্মরূপায়ণের দোষলেশশূন্য একক গড়িয়া তুলিবেন ; বিজ্ঞানময় চেতনার প্রত্যেকটি জ্ঞানে এবং তাহার প্রতি ক্রিয়ায় এই ধর্ম্ম, এই দৃষ্টি বর্ত্তমান থাকিবে। মন পর্য্যবেক্ষণ এবং যুক্তিবিচার দ্বারা যাহাকে জানিতে চায় তাহা হইতে নিজেকে পৃথক রাখিতে এবং তাহাকে নিজের বাহিরে বস্তু বা বিষয়রূপে স্থাপিত করিয়া খাঁটিরূপে দেখিতে চেষ্টা করে ; যাহা ব্যক্তিগত চিন্তাধারা বা আত্মার কোন সান্নিধ্য দ্বারা প্রভাবিত হয় না বস্তুকে এইরূপ অনাত্মা বোধে স্বতন্ত্র এবং নিজ হইতে ভিন্ন সত্যরূপে মন দেখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিজ্ঞানময় চেতনা বিষয়কে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া পূর্ণরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া একত্ববোধের দ্বারা সাক্ষাৎরূপে এবং খাঁটিভাবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ জানিয়া ফেলিবে। সে চেতনা যাহা জানিতে চায় তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে বটে কিন্তু তাহা তাহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ; নিজ সত্তার কোন অংশ বা কোন গতিকে যেমনভাবে সে জানিবে জ্ঞানের বিষয়কেও তেমনি-ভাবে নিজের অংশ বলিয়াই জানিবে অথচ এইভাবে একত্ববোধে জানিবার জন্য যাহাতে তাহার মধ্যে ভাবনা শৃঙ্খলিত অথবা জ্ঞান সীমিত বা বদ্ধ হইয়া উঠে চেতনার তেমন কোন সঙ্কোচ আসিবে না। সেই সাক্ষাৎ-আন্তর-জ্ঞান অন্তরঙ্গ, নিখুঁত এবং পরিপূর্ণ হইবে, কিন্তু বিপথে চালক ব্যক্তিগত মননের বশে আমরা যে সর্ব্বদা ভুল করি তাহাতে তাহা থাকিবে না, যেহেতু চেতনা এখানে বিশ্বচেতনা, অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মার সঙ্কুচিত চেতনা নহে। ইহা সর্ব্বজ্ঞানের দিকেই অগ্রসর হইবে, আমরা এক সত্যকে অন্য সত্যের বিরুদ্ধে স্থাপিত করিয়া কোন্‌টা জয় লাভ করে তাহা দেখিবার জন্য যেমন অপেক্ষা করি তাহার পক্ষে সে প্রয়োজন থাকিবে না, সকল সত্য যে এক পরম সত্যের বিভিন্ন বিভাব তাহারই আলোকে সত্যের দ্বারা সত্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। তাহার সকল ভাবনা, সকল দৃষ্টি, সকল অনুভূতির ধর্ম্ম হইবে এই আন্তর দর্শন, তাহার মধ্যে থাকিবে সম্প্রসারিত অন্তরঙ্গ আত্মানুভব, সকল সত্যের স্বতঃসমাহারে

গড়া এইরূপ এক বৃহৎ জ্ঞান, সত্যস্বরূপ সত্তার নিজ স্বতঃকার্য্যকরী সৌষম্যের মধ্যে আলোকের উপর আলোকের এইরূপ ক্রিয়াজাত এক অখণ্ড অবিভাজ্য সমগ্রতা। একটা উন্মেষ থাকিবে, কিন্তু তাহা অন্ধকার হইতে আলোকের মুক্তি নয়, তাহা আলোক হইতেই আলোকের প্রকাশ; কেননা উন্মিষন্ত অতিমানস-চেতনা যদি তাহার আত্মজ্ঞানের কোন অংশ অন্তরালে নিজেরই মধ্যে রাখিয়া দেয় তাহা অবিদ্যার এক পদক্ষেপ বা তাহার এক ক্রিয়াধারা নহে, তখন তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার কালাতীত জ্ঞান হইতে কিছু, কালগত বিসৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করিবার এক ধারা। পরিণামশীল এই অতিমানস প্রকৃতির জ্ঞানের ধারা হইল আলোক হইতে আলোকের প্রকাশ, চিৎজ্যোতির আত্ম-বিকীরণ।

মন যেমন আলোক চায়, চায় নূতন জ্ঞানের আবিষ্কার এবং জ্ঞানের দ্বারা প্রভুত্ব স্থাপন; তেমনি প্রাণ চায় নিজ শক্তির বৃদ্ধি এবং শক্তির দ্বারা প্রভুত্ব স্থাপন; সে চায় পুষ্টি, শক্তি, বিজয় ও সম্পদ, চায় তৃপ্তি, সৃষ্টি, আনন্দ, প্রেম ও সৌন্দর্য্য; সর্ব্বদা আত্মপ্রকাশে, নিজের অভ্যুদয়ে, ক্রিয়া, সৃষ্টি এবং ভোগের বহু বৈচিত্র্যে তাহার আনন্দ, নিজেকে এবং নিজশক্তিকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলাতেই তাহার উল্লাস। বিজ্ঞানময় পরিণতি এই আনন্দকে উচ্চতম এবং পূর্ণতম প্রকাশের ক্ষেত্রে উন্নীত করিয়া তুলিবে কিন্তু তাহা মন বা প্রাণময় অহংকারের শক্তি, তৃপ্তি বা ভোগের জন্য ক্রিয়া করিবে না, নিজেকে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে শুধু পাওয়া, ভোগ বা তৃপ্তির জন্য অন্য সত্তা বা বস্তুকে আকূল আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরা অথবা বৃহত্তরভাবে অহংএর প্রতিষ্ঠা এবং নিজেকে ফাঁপাইয়া তোলার দিকে সে চেতনার কোন দৃষ্টি থাকিবে না, কেননা আধ্যাত্মিক পূর্ণতা এবং সিদ্ধি এইভাবে কখনই আসিতে পারে না। যে দিব্যপুরুষ নিজেতে নিজে, জগতে এবং সর্ব্ববস্তুতে যুগপৎ অবস্থিত, বিজ্ঞানময় জীবন শুধু তাহার জন্যই বর্ত্তমান থাকিবে এবং শুধু তাহার জন্যই কর্ম্ম করিবে; দিব্যপুরুষের সত্তা, আলোক, শক্তি, প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্য্য দ্বারা ব্যষ্টি জীব এবং জগৎকে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে অধিকার করাই হইবে বিজ্ঞানময় জীবনের তাৎপর্য্য। এইভাবে উপচীয়মান প্রকাশের ক্রমশঃ অধিকতর পূর্ণতালাভের সার্থকতায় এবং তৃপ্তিতে ব্যষ্টি-জীবনও সার্থক এবং তৃপ্ত হইয়া উঠিবে; তাহার শক্তি হইবে পরমাপ্রকৃতির বা পরাশক্তিরই বাহন বা যন্ত্র, যাহা সেই বৃহত্তর জীবন এবং মহত্তর প্রকৃতিকে জগজ্জীবনে লইয়া আসিবে ও সম্প্রসারিত করিবে। সে পুরুষের জীবনে

যে কোন বিজয় বা অভিযান আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহার উদ্দেশ্য শুধু ইহাই হইবে ; বিশেষ কোন ব্যক্তিগত বা সংঘগত অহংকারের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। এই জীবনে প্রেম হইবে আত্মার সহিত আত্মার, চিৎপুরুষের সহিত চিৎপুরুষের সংস্পর্শ মিলন এবং একত্ব ; সে মিলনে সকল সত্তা এক বলিয়া অনুভূত হইবে, তাহা হইবে শক্তিতে, আনন্দে, অন্তরঙ্গতায় এবং নিবিড়তায় অন্তরপুরুষের সহিত অন্তরপুরুষের, অদ্বৈত স্বরূপের সহিত অদ্বৈত স্বরূপের মিলন ; সেখানে থাকিবে একত্বের আনন্দ এবং একেরই বহুরূপে প্রকাশের আনন্দ। বহুর মধ্যে একেরই আত্ম-প্রকটনশীল এই নিবিড় আনন্দ, একের মধ্যস্থিত বহুর পরস্পর এই মিলন এবং আনন্দময় এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই হইবে বিজ্ঞানময় পুরুষের জীবনের পূর্ণ প্রকাশিত তাৎপর্য্য। রসময় বা সংবেগ-শীল বিসৃষ্টি, মনোময় বিসৃষ্টি, প্রাণময় বিসৃষ্টি এবং জড়ময় বিসৃষ্টি অর্থাৎ সকল বিসৃষ্টি তাহার কাছে এই একই তাৎপর্য্য বহন করিবে। সে-সকল সৃষ্টিই হইবে শাশ্বত শক্তি, জ্যোতি, শ্রী এবং সত্যের সার্থক রূপাবলি, তাহারা হইবে তাহার রূপ এবং দেহের সৌন্দর্য্য ও সত্য, তাহার শক্তি এবং গুণের সৌন্দর্য্য ও সত্য, তাহার আত্মার সৌন্দর্য্য ও সত্য, তাহার স্বরূপ সত্তার অরূপ এক সৌন্দর্য্য।

অতিমানস-ভূমিতে যে পূর্ণ রূপান্তর এবং বিপরীত দিকে চেতনার যে আবর্ত্তন ঘটিবে, যাহাতে মন প্রাণ এবং জড়ের সহিত চিৎসত্তার এক নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, সে সম্বন্ধে এক নূতন তাৎপর্য্য ও পূর্ণতা আসিয়া পড়িবে, তাহার ফলে চিৎসত্তা এবং যে দেহে সে সত্তার বাস এ উভয়ের সম্বন্ধের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং পূর্ণতাসাধক এক নূতন তাৎপর্য্য দেখা দিবে। আমাদের বর্ত্তমান জীবনে আমাদের অন্তরাত্মা, মন এবং প্রাণের মধ্য দিয়া নিজেকে যতটা পারে প্রকাশ করে, যদিও সে প্রকাশ স্বচ্ছন্দ না হইয়া কুণ্ঠিত হইতে বাধ্য হয়, অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তরাত্মার অনুমোদনে মন ও প্রাণই ক্রিয়া করে, আমাদের স্থূল দেহ এই ক্রিয়ার বাহন বা যন্ত্র। কিন্তু দেহের শক্তি ও সম্ভাবনা সীমিত এবং জড়ের বাহন বা যন্ত্ররূপে তাহাতে সঞ্চিত সংস্কার আছে বলিয়া, তাহা যখন মন ও প্রাণকে মানিয়া চলে তখনও তাহাদের আত্মপ্রকাশকে সঙ্কুচিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে ; তাহা ছাড়া দেহের ক্রিয়া ও গতির একটা বিধান আছে, তাহার অবচেতন বা অর্দ্ধ-উন্মিষিত সচেতন সত্তার একটা নিজস্ব ইচ্ছা বা শক্তি বা গতি ও ক্রিয়ার সংবেগ আছে, মন ও প্রাণ যাহার উপর কেবল আংশিকভাবে

আধিপত্য বিস্তার করিতে অথবা যাহাকে অতি অল্প পরিমাণে মাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারে; তাহাদের যেটুকু ক্ষমতা আছে তাহারও ক্রিয়া হয় প্রধানতঃ পরোক্ষে সাক্ষাৎভাবে নয়, অথবা যেখানে অপরোক্ষভাবে ক্রিয়া হয় সেখানেও সে ক্রিয়া সচেতনভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে ততটা হয় না যতটা হয় অবচেতন ভাবে। কিন্তু বিজ্ঞানময় পুরুষের সত্তা ও জীবনের ধারায় চিৎ পুরুষের সঙ্কল্পই সাক্ষাৎভাবে দেহের গতি ও বিধান শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবে; কেননা দৈহিক বিধান অবচেতনা বা নিশ্চেতনা হইতে জাত হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞানময় পুরুষের পক্ষে অবচেতনার মধ্যে অতিমানসের আলোক এবং ক্রিয়াধারা অনুপ্রবিষ্ট হইবে, অবচেতনা তাহার শাসনাধীনে আসিয়া পড়িবে এবং সচেতন হইয়া উঠিবে; অতিমানসের উন্মেষে নিশ্চেতনার ভিত্তি তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্বৈধভাব তাহার বাধা এবং মন্থর প্রতিক্রিয়ার শক্তি লইয়া এক নিম্নতর অথবা আধাররূপী অতিচেতনায় রূপান্তরিত হইবে। অতিমানস উন্মেষের পূর্ব্বে যখন উত্তরমানস, সম্বোধি বা অধিমানস সত্তা নিজ নিজ সিদ্ধরূপ পাইবে তখন দেহে ভাব বা ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সাড়া দেওয়ার শক্তিযুক্ত একটা সচেতনতা প্রভূত পরিমাণে ফুটিয়া উঠিবে, আজ দেহের যে সমস্ত জড়ীয় অংশের উপর মনের ক্রিয়া অতি প্রাথমিক, অত্যন্ত এলোমেলো, বিশৃঙ্খলাময়, যে ক্রিয়ার অধিকাংশ আমাদের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না পরন্তু যাহার ক্রিয়া প্রধানতঃ যন্ত্রের মতই যেন আপনা আপনি চলে, এই সচেতনতার ফলে সে সমস্ত স্থানেও আমাদের মন যথেষ্ট বীর্য্যবান হইবে অনেকটা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করিবে; কিন্তু অতিমানস-পুরুষের বেলায় তাহার চেতনা নিজ মধ্যস্থিত সদ্‌ভূত বিজ্ঞানের বা ঋতচিতের (real-idea) দ্বারা সব কিছু শাসন ও পরিচালনা করিবে। এই সদ্ভূত বিজ্ঞান এক সত্য অনুভূতি যাহা স্বতঃই কার্য্যকরী; কেননা তাহা চিৎসত্তার সাক্ষাৎ ক্রিয়ারই ভাব ও সঙ্কল্প, সত্তার উপাদানে তাহা এমন এক গতি সৃষ্টি করিবে যাহা তাহার স্থিতি এবং কর্ম্মকে অমোঘ সিদ্ধিতে লইয়া যাইবে। উন্মিষিত বিজ্ঞানময় পুরুষ ঋতচিতের এই অপ্রতিহত অধ্যাত্ম-সত্যের উচ্চতম ধারায় সচেতন হইয়া উঠিবেন এবং সচেতনভাবে সিদ্ধিতে পৌঁছিবার সামর্থ্য লাভ করিবেন; তাহার ক্রিয়া এখনকার মত আপাত-নিশ্চেতনায় আবৃত অথবা যান্ত্রিক বিধানে সীমিত বা সঙ্কুচিত থাকিবে না কিন্তু সাক্ষাৎ সত্যের সর্ব্বজয়ী প্রভুত্ব লইয়া তাহা স্বতঃই সফলতা এবং সার্থকতায় পৌঁছিবে। পূর্ণ জ্ঞান এবং শক্তি লইয়া তখন ইহাই সমগ্র জীবনের শাসনভার গ্রহণ করিবে,

সে শাসনের মধ্যে দেহের ক্রিয়া এবং ক্রিয়াধারাও অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে। অধ্যাত্মচেতনার শক্তিতে তখন দেহ চিৎস্বরূপের খাঁটি. উপযুক্ত এবং পূর্ণরূপে সাড়া দিতে সক্ষম যন্ত্রে রূপান্তরিত হইবে।

চিৎপুরুষের সহিত দেহের এই নূতন সম্বন্ধের জ্ঞান সমগ্র জড়প্রকৃতিকে বর্জন না করিয়া স্বাধীনভাবে গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা ও সামর্থ্য আনিয়া দেয়; মুক্তির জন্য অধ্যাত্মচেতনার পক্ষে প্রকৃতি হইতে পরাঙ্মুখ হওয়া, তাহার সহিত কোন প্রকারে একীভূত না হওয়া অথবা তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়া, সাধনার প্রথম পর্ব্বে স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়োজন বটে কিন্তু বিজ্ঞানময় চেতনার উন্মেষের পর এ-সমস্তের আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। আধ্যাত্মিক মুক্তি অথবা আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করিয়া প্রকৃতির প্রভু হইবার জন্য সুস্বীকৃত এবং প্রয়োজনীয় সাধনাঙ্গ হইল দৈহিক চেতনা হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া দেখা, 'আমি দেহ নই' এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কিন্তু জড়ের হাত হইতে এই উদ্ধার লাভ একবার সিদ্ধ হইলে, আধ্যাত্মিক আলোক এবং শক্তি আবার নামিয়া আসিতে, দেহকে আক্রমণ ও অধিকার করিতে এবং মুক্ত থাকিয়া প্রভুরূপে জড়প্রকৃতিকে আবার নূতন করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বস্তুতঃ ইহা সম্ভব হইতে পারে যদি চিতের সঙ্গে জড়ের এক রূপান্তরিত যোগা-যোগ স্থাপিত হয়, এমন এক শাসন যদি প্রতিষ্ঠিত হয় যাহার ফলে ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ার বর্ত্তমান যে সাম্য আছে যাহাতে জড়প্রকৃতি চিৎকে আবরণ করিয়া নিজের প্রভুত্ব-স্থাপনের অধিকার পাইয়াছে তাহা বিপরীত মুখে আবর্ত্তিত হইয়া যায়। বৃহত্তর এক জ্ঞানের আলোকে ইহাও দেখা যায় যে জড়ও ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে উৎ-সারিত তাঁহারি এক আত্মশক্তি, ব্রহ্মেরই এক রূপ. এক উপাদান; জড়বস্তুর মধ্যস্থ গোপন চেতনাকে জানিয়া এই বৃহত্তর জ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া বিজ্ঞানময় আলোক এবং শক্তি সেইভাবে দৃষ্ট জড়ের সহিত নিজেকে মিলাইতে পারে এবং তাহাকে আধ্যাত্মিক প্রকাশের সাধন বা যন্ত্ররূপে অঙ্গীকার করিয়া লইতে পারে; এমন কি জড়কে শ্রদ্ধা করা এবং তাহাকে একটা পবিত্র উপকরণ-বোধে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গীতাতে আহার-গ্রহণ করাকেও দ্রব্যযজ্ঞ বলা হইয়াছে, এই যজ্ঞে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মদ্বারা ব্রহ্মরূপ হবি অর্পণ করিবার কথা বর্ণিত আছে, ঠিক এই দৃষ্টিতে বিজ্ঞানময় চেতনা চিতের সহিত জড়ের সকল ক্রিয়াই দেখিতে পারে। চিদ্‌বস্তু নিজেই জড় হইয়াছেন এবং সৃষ্ট প্রাণীগণের মঙ্গল ও আনন্দ, যোগ ও ক্ষেমের জন্য নিজের এই জড়রূপকে বাহন

বা যন্ত্ররূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন ; বিশ্বহিত ও বিশ্বসেবার জন্য জড়রূপে তিনিই এই আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন ; বিজ্ঞানময় পুরুষ জড়ের আসক্তি বা প্রাণের বাসনাপরিশূন্য হইয়া জড়কে ব্যবহার করিবেন কিন্তু সেই ব্যবহারকালে তাঁহার অনুভূতি হইবে চিদ্‌বস্তুকেই তাঁহার এই জড়রূপে তাঁহারই সম্মতি এবং অনুমোদনে তাঁহারই নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিতেছেন। তাহার মধ্যে থাকিবে জড়বস্তুরাজির প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা, তাহাদের মধ্যস্থ গোপন চেতনার একটা জ্ঞান এবং সেই চেতনাতে যে বিশ্বহিত-সাধনা এবং সেবার অব্যক্ত ইচ্ছা আছে তাহার একটা অনুভূতি ; যাহা তিনি ব্যবহার করিবেন তাহাতে থাকিবে তন্মধ্যস্থ ব্রহ্মের পূজা, উপাসনা ও সেবা ; যাহাতে জড়ের ব্যবহারের মধ্যে জড়ের জীবনে শ্রী, সুনিয়ন্ত্রিত সৌষম্য এবং খাঁটি সত্যের ছন্দ ফুটিয়া উঠে সেইজন্য তিনি এ সমস্ত দিব্য-উপকরণ পূর্ণরূপে নিখুঁতভাবে অতি যত্নে ব্যবহার করিবেন।

চিদ্‌বস্তুর সহিত দেহের এই নূতন সম্বন্ধের ফলে বিজ্ঞানময় পরিণামধারা অন্নময় সত্তাকেও চিন্ময়, পূর্ণ এবং সার্থক করিয়া তুলিবে ; মন ও প্রাণের মত দেহও চিন্ময়পুরুষের লীলাভূমিতে পরিণত হইবে। দেহের মধ্যে যে সকল দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা তামসিকতা এবং সীমিত সামর্থ্য আছে তাহা এই রূপান্তরে দূর হইবে ; এ সমস্ত বাদ দিলেও দৈহিক চেতনা এক অনুগত এবং সহিষ্ণু ভৃত্য, তাহার মধ্যে বিপুল শক্তির যে সঞ্চয় গোপনে সংরক্ষিত আছে তাহার সাহায্যে দেহ ব্যষ্টিসত্তার শক্তিশালী সাধনযন্ত্র হইতে পারে, অথচ দেহ নিজের জন্য অতি অল্পই চায় ; সে অবশ্য চায় আয়ু, স্বাস্থ্য, বল, দৈহিক পূর্ণতা ও সুখ ; চায় জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য। দেহের এ সমস্ত দাবি মূলতঃ গ্রহণের অযোগ্য নহে, তাহার মধ্যে অন্যায় বা হীনতার কিছু নাই, কেননা তাহারা জড়ের ভাষায়, রূপ ও উপাদানে, শক্তি ও আনন্দের সেই পূর্ণতারই অনুবাদ বা অভিব্যক্তি, চিৎস্বরূপের অভিব্যঞ্জক আত্মপ্রকাশে যাহা স্বাভাবিকভাবেই বাহিরে আসিয়া ফুটিয়া উঠে। যখন বিজ্ঞানময় শক্তি দেহে ক্রিয়া করিতে পারে তখন দেহের এই সমস্ত সম্পদ পূর্ণভাবে লাভ হয় ; কেননা এই সমস্তের বিপরীত যাহা কিছু তাহা জড়াশ্রয়ী প্রাণ ও মন, স্নায়ুমণ্ডলী এবং স্থূল দেহের উপরে বাহ্যশক্তিসকলের একটা চাপের ফলে আসিয়া পড়ে,—তখন আসিয়া পড়ে যখন অবিদ্যাবশতঃ সে চাপকে কি ভাবে গ্রহণ করিতে হয় তাহা আমরা জানি না, অথবা যেরূপ যথাযথভাবে বা যে খাঁটি শক্তি লইয়া তাহার

সম্মুখীন হইতে হয় তাহা বুঝি না, অথবা যখন আমাদের জড়চেতনার উপাদানে কোনপ্রকার অজ্ঞানতা ও তামসিকতা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে যাহা বিকৃতভাবে শক্তির অভিঘাত গ্রহণ করে এবং প্রতিক্রিয়ারূপে ভুল সাড়া দেয়। অতিমানসের স্বয়ংক্রিয় এবং স্বতঃ-পরিণামী চেতনা এবং জ্ঞান, অবিদ্যার স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেহের যে বোধিভাবিত সহজ সংস্কারসমূহ আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় পুনঃস্থাপিত করিবে এবং পরিপূরক এক বৃহত্তর সচেতন ক্রিয়াধারার দ্বারা তাহাদিগকে আলোকিত করিবে। এই রূপান্তরের ফলে একটা সত্য জড়ীয় অনুভূতি, বস্তু ও শক্তিসকলের মধ্যে একটা সত্য সম্বন্ধ এবং ঋতময় প্রতিক্রিয়া, মনে দেহে স্নায়ুমণ্ডলীতে এক ঋতময় ছন্দ-সুষমা স্থাপিত এবং রক্ষিত হইবে। এই রূপান্তরে এক উচ্চতর চিন্ময় শক্তি এবং বিশ্বপ্রাণশক্তির সহিত নিত্যযুক্ত ও সেই শক্তির ভাণ্ডার হইতে বীর্য্য আহরণে সমর্থ এক বৃহত্তর প্রাণশক্তি দেহের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে. জড়প্রকৃতির সহিত দেহও এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময় সৌষম্যে বাঁধা পড়িবে. এক শাশ্বত পরমাশান্তির বিপুল এবং শান্ত সংস্পর্শ পাইয়া দেহ দিব্যতর শক্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর হইবে। সর্ব্বোপরি ইহার ফলে সমস্ত সত্তা চিৎশক্তির পরম বীর্য্যে প্লাবিত হইবে; যে সমস্ত শক্তি দেহকে ঘিরিয়া আছে এবং তাহাকে চাপ দিতেছে এই চিৎশক্তিই তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া এক পরম শক্তি-সৌষম্যে স্থাপন করিবে; ইহাই হইবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মৌলিক রূপান্তর।

মনোময় প্রাণময় এবং অন্নময় সত্তায় চিৎশক্তির প্রকাশ অপূর্ণ ও কুণ্ঠিত, তাহাদের উপর বিশ্বশক্তির যে অভিঘাত বা সংস্পর্শ আসিয়া পড়িতেছে চেতনা তাহাকে ইচ্ছামত গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে না অথবা গ্রহণ করিলেও আত্মসাৎ করিয়া সৌষম্যের ছন্দে গাঁথিয়া তুলিবার শক্তি তাহার নাই; ইহাই দুঃখ এবং জ্বালা সৃষ্টির কারণ। জড়ের রাজ্যে প্রকৃতির অভিযান আরম্ভ হয় চেতনার সম্পূর্ণ অসাড়তা হইতে; ইহা একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য যে প্রাণের খেলার আদি পর্ব্বে, পশুর এমন কি মানুষের আদিম বা অসংস্কৃত অবস্থাতে, অপেক্ষাকৃত অধিক অসাড়তা কিম্বা ক্ষীণ সংবেদনশীলতা দেখা যায়, আরও দেখা যায় যে সেখানে সহ্য করিবার শক্তি অধিক এবং দুঃখ কষ্ট বোধ করিবার শক্তি অল্প; কিন্তু মানুষের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যে সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং মন প্রাণ ও দেহে বেদনা তীব্রতরভাবে অনুভূত হয়।

কেননা মানুষের চেতনার বৃদ্ধির অনুপাতে শক্তির বৃদ্ধি ঘটে না ; তাহার দেহের উপাদান এবং গ্রহণশক্তি সূক্ষ্মতর হয় কিন্তু তাহার বাহিরের শক্তি তেমন পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হয় না ; মানুষকে মনের জোরে ইচ্ছাশক্তির সহায়তা লইয়া তাহার স্নায়ুময় সত্তাকে মার্জিত শাসিত এবং বীর্য্যশালী করিয়া তুলিতে হয়, সে তাহার সাধন-যন্ত্রের নিকট যে কৃচ্ছ্রসাধনা দাবি করে তাহাতে তাহাকে জোর করিয়াই নিয়োজিত করিতে হয় ; দুঃখ এবং বিপদের অভিঘাতে যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে তজ্জন্য লোহার মত দৃঢ় করিয়া তুলিতে হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে আধারের উপর চেতনার শক্তি এবং সঙ্কল্পের প্রভাব, বাহ্য মনন, স্নায়ুময় সত্তা এবং দেহের উপর চিৎসত্তা ও আন্তর মনের প্রশাসন শক্তি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায় ; বহির্জগতের সকল সংস্পর্শ ও অভিঘাতে অবিচলিত থাকিবার শক্তি, একটা প্রশান্ত বিপুল সমতার বোধ আসিয়া স্বভাবগত হইয়া পড়ে, ক্রমে তাহা মন হইতে প্রাণের সকল অংশে সঞ্চারিত হয়, এবং সেখানেও এক বৃহৎ বিপুল ও স্থায়ী শক্তি ও শান্তির প্রতিষ্ঠা করে ; এমন কি এই অবস্থা দেহেও সংক্রমিত হইতে এবং দুঃখ শোক ও সন্তাপের সকল অভিঘাত অন্তরে অবিচলিতভাবে গ্রহণ করিতে পারে। এমন কি ইচ্ছাপূর্ব্বক দৈহিক চেতনাকে অসাড় করিয়া ফেলাও যায় অথবা বাহির হইতে আগত সকল সংঘাত বা আঘাত হইতে মনকে বিমুক্ত রাখিবার শক্তিও অর্জন করা যায় ; ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে জড়প্রকৃতির চিরাভ্যস্ত প্রতিক্রিয়ার বা সাড়ার কাছে দৈহিক সত্তার অবশভাবে আত্মসমর্পণ করিবার যে সাধারণ রীতি চলিত আছে তাহা যে অবশ্যম্ভাবীরূপে চলিতে থাকিবে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না এ কথা সত্য নয়। আরও বেশী সার্থক এক শক্তি আধ্যাত্মিক মন বা অধিমানস-ভূমিতে আগত হয় যাহার বলে দুঃখের স্পন্দন আনন্দের স্পন্দনে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয় ; এ শক্তি যদি কিছুটা লাভ হয় এবং পূর্ণতায় নাও পৌঁছে তবুও ইহাতে বুঝা যায় চেতনার প্রতিক্রিয়ার যে সাধারণ বিধানের সহিত আমরা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে আবর্ত্তিত করা অসম্ভব নয় ; তাহা ছাড়া যে অভিঘাত রূপান্তরিত করা দুরূহ অথবা সহ্য করা কঠিন তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার শক্তি ইহার সহিত যুক্ত হইতে পারে। বিজ্ঞানময় পরিণাম একটা বিশেষ পর্ব্বে পৌঁছিলে এইভাবে বিপরীত মুখে ঘুরাইয়া দিবার এবং আত্মরক্ষা করিবার শক্তি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে, তখন দুঃখের হাত হইতে মুক্তির বা দুঃখ দ্বারা অস্পৃষ্ট বা অপরামৃষ্ট থাকিবার ও প্রশান্তি লাভ করিবার জন্য দেহের যে দাবি আছে তাহা

পূর্ণ হইবে এবং দেহের মধ্যে শুদ্ধসত্তার পূর্ণ আনন্দসম্ভোগের শক্তি গঠিত হইয়া উঠিবে। এক চিন্ময় আনন্দধারা দেহের মধ্যে প্রবেশ এবং প্রতি অঙ্গ প্রতি কোষ পরিপ্লাবিত করিবে; লোকোত্তর ও ঘনীভূত এই আনন্দের জ্যোতির্ম্ময় দেহধাতুতে পরিণতিই জড়প্রকৃতির অসম্পূর্ণ বা বিরোধী সংবেদনশীলতার পূর্ণ রূপান্তর আনয়ন করিতে পারে।

শুদ্ধসতের অখণ্ডপরমানন্দ লাভ করিবার অভীপ্সা ও দাবি আমাদের সত্তার মর্ম্মে মর্ম্মে নিগূঢ় হইয়া আছে, কিন্তু তাহাকে ঢাকিয়া রহিয়াছে আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিবিক্ততা ও তাহাদের বিভিন্নমুখী আকূতি; বাহ্য সুখ ছাড়া অন্য কিছুর ধারণা ও গ্রহণের অসামর্থ্যই সে অভীপ্সা ও দাবিকে অন্ধকারাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। দৈহিক চেতনার এই দাবিই দেখা দিয়াছে দৈহিক সুখলাভের আকুলতা রূপে; তাহাই প্রাণে আসিয়াছে প্রাণের সুখভোগের পিপাসা হইয়া,—তাই নানাপ্রকারের সুখ ও উল্লাসে এবং চমকভরা সকল তৃপ্তিতে প্রাণে এত তীব্র স্পন্দন ও শিহরণ জাগে; মনের মধ্যে আবার তাহা সর্ব্ববিধ মনোময় আনন্দের সহজ স্বীকৃতির রূপ ধরিয়াছে, আরও উর্দ্ধ্বভূমিতে তাহাই আধ্যাত্মিক মনের শান্তি এবং দিব্য আনন্দের আকূতি হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই অভীপ্সা ও দাবির মূল সত্তার সত্যের মধ্যেই নিহিত আছে; কেননা আনন্দ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, আনন্দই সর্ব্বগত পরম সত্য বস্তুর পরমা প্রকৃতি। প্রকাশ বা সৃষ্টির অবরোহক্রমে অতিমানস নিজে আনন্দ হইতে উন্মিষিত হয় এবং পরিণামের আরোহক্রমে আনন্দের মধ্যেই নিজেকে মিলাইয়া দেয়। এই মিলাইয়া দেওয়ার অথ অতিমানসের নির্ব্বাণ বা বিলয় নয়; সেখানে সৎস্বরূপের আনন্দের মধ্যে যে আত্মজ্ঞান এবং স্বয়ংক্রিয় শক্তি আছে তাহাতে অনুস্যূত ও তাহার সহিত এক হইয়া তাহা বর্ত্তমান থাকে, যেখানে তাহাকে আর পৃথক করিয়া দেখা যায় না। সংবৃতির অবরোহ এবং বিবৃতি বা পরিণামের আরোহ এই উভয় ধারার মধ্যে অতিমানসের আশ্রয়রূপে সৎস্বরূপের অনাদি আনন্দ বর্ত্তমান থাকে, এবং সেই আনন্দই তাহার সকল ক্রিয়ার মূল ও পরিপোষক; কেননা আমরা বলিতে পারি যে সৎস্বরূপের চৈতন্য যেমন অতিমানসের মধ্যস্থ জনক-শক্তি তেমনি তাঁহার আনন্দই তাঁহার সেই চিন্ময় মাতৃগর্ভ, যাহা হইতে সে জীবচেতনাকে (বা অন্তরাত্মাকে) অভিব্যক্ত করে এবং আনন্দই অভিব্যক্তিকে রক্ষা করে এবং চিন্ময়ী পরমাস্থিতিতে তাহার ফিরিবার পথে অতিমানসই জীবচেতনাকে সঙ্গে করিয়া এই মূল উৎসে আবার ফিরিয়া

যায়। অতিমানস-অভিব্যক্তির আত্মলীলার উর্দ্ধ পরিণামে পরবর্ত্তী অনুক্রম এবং চূড়ারূপে আনন্দঘন ব্রহ্মের প্রকাশ হইবে ; বিজ্ঞানঘন পুরুষের আত্মপ্রকাশের পর হইবে আনন্দঘন পুরুষের প্রকাশ ; বিজ্ঞানময় জীবন মূর্ত্ত হওয়ার স্বাভাবিক পরিণামরূপে আনন্দময় জীবনের রূপায়ণ দেখা দিবে। বিজ্ঞানময় সত্তা এবং বিজ্ঞানময় জীবনের সর্ব্বত্র সকল অতিমানস আত্ম-অভিজ্ঞতার অবিভাজ্য অঙ্গস্বরূপ হইয়া তাহার সর্ব্বতোব্যাপ্ত সার্থকতারূপে আনন্দের কোন না কোন শক্তিও অবশ্য বর্ত্তমান থাকিবে। অবিদ্যা হইতে জীবাত্মার মুক্তিতে প্রথমেই শাশ্বত অনন্তের প্রশান্তি, নিশ্চলতা এবং নৈঃশব্দ্যের এক ভিত্তি স্থাপিত হয়, কিন্তু চিৎশক্তির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বৃহত্তর আধ্যাত্মিক উর্দ্ধায়নে মুক্তির এই প্রশান্তি শাশ্বত আনন্দস্বরূপের পরিপূর্ণ অনুভূতি ও উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়, শাশ্বত এবং অনন্তের পরমানন্দ দেখা দেয়। এই আনন্দ বিজ্ঞানময় চেতনায় বিশ্বানন্দরূপে সদা বর্ত্তমান থাকে এবং বিজ্ঞানময় প্রকৃতির পরিণামের সহিত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অনেকের ধারণা যে অধ্যাত্ম-সাধনায় আনন্দ বা রসাস্বাদ প্রগতি-পথের মধ্য দিয়া যাইবার সময়কার অচিরস্থায়ী ও নিম্নতর বস্তু ; পরমব্রহ্মের চরম উপলব্ধিতে যে নিত্যস্থায়ী পরমা প্রশান্তি দেখা দেয় তাহাই চরম ও পরম সিদ্ধি। আধ্যাত্মিক মনের ভূমিতে ইহা সত্য হইতে পারে, তথায় যে মহোল্লাস প্রথমে অনুভূত হয় তাহা বস্তুত চিন্ময় আনন্দ কিন্তু তাহার মধ্যে চিৎশক্তির দ্বারা গৃহীত প্রাণের পরমসুখ বা রসাবেশ মিশ্রিত থাকিতে পারে এবং অনেক সময় থাকে ; তাহার মধ্যে হৃদয়ের উপলব্ধিজাত একটা গর্ব্ব, উল্লাস, উত্তেজনা, তীব্রতম সুখের একটা শিহরণ, আত্মার শুদ্ধ এবং অন্তরতর এক অনুভূতি বর্ত্তমান থাকে যাহা উর্দ্ধগামী পথের পরম ঐশ্বর্য্য এবং উন্নয়নকারিণী শক্তি, কিন্তু তাহা অধ্যাত্মচেতনার চরম এবং নিত্য প্রতিষ্ঠা নয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক আনন্দের উচ্চতম শিখরে এইরূপ কূলভাঙ্গা উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা নাই ; সেখানে তাহার স্থানে আছে শাশ্বত আনন্দের অমেয় গভীরতার উপলব্ধি, শাশ্বত সৎস্বরূপই যাহার ভিত্তি, সুতরাং তাহা কল্যাণময় প্রসন্ন নিশ্চলতার উপর প্রতিষ্ঠিত এক পরমানন্দময় প্রশান্তি, শান্তি ও আনন্দে সেখনে কোন ভেদ নাই উভয়ে এক হইয়া গিয়াছে। অতিমানস সমস্ত প্রভেদ এবং বিরোধের সমন্বয় করিয়া সকলকে মিলাইয়া এই একত্ব ফুটাইয়া তোলে ; অতিমানসে আত্মোপলব্ধির প্রথম পর্ব্বে এক উদার প্রশান্তি এবং বিশ্বসত্তার গভীর আনন্দ বোধ জাগিয়া উঠে, কিন্তু এই

প্রশান্তি এবং এই আনন্দ একত্রে একই অবস্থারূপে দেখা দেয় এবং তাহাদের গভীরতা বৃদ্ধি পাইয়া যাহা অনন্ত এমন এক নিত্য শাশ্বত পরম আনন্দে, পরম-তত্ত্বের পরমা-হ্লাদিনী শক্তির মহোল্লাসে পর্য্যবসিত হয়। বিজ্ঞানময় চেতনার সকল পর্ব্বে সত্তার সকল গভীরে এই মূল চিন্ময় স্বরূপানন্দ কোন না কোন আকারে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিবে ; কিন্তু তাহা ছাড়া প্রকৃতির সকল গতি-বৃত্তিতে, প্রাণ ও দেহের সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেও সেই আনন্দ পরিব্যাপ্ত থাকিবে ; কেহই আনন্দের বিধান ও প্রশাসন হইতে মুক্তি পাইবে না। এমন কি বিজ্ঞানময় রূপান্তর ঘটিবার ঠিক পূর্ব্বে এই মূল পরমানন্দ আধারে নানা উল্লাস ও সুষমার অপরূপ আকারে দেখা দিতে আরম্ভ করিবে। মনে তাহা আধ্যাত্মিক অনুভূতি, দর্শন এবং জ্ঞানের গভীর ও শান্ত আনন্দ হইয়া আসিবে ; হৃদয়ে তাহা বিশ্বের সহিত মিলনের এবং বিশ্বব্যাপ্ত মৈত্রী ও করুণার এক গভীর উদার বা উচ্ছ্বসিত আনন্দরূপে প্রকাশিত হইবে—যে আনন্দ সর্ব্ব সত্তা বা সর্ব্ববস্তুর অন্তর্নিহিত আনন্দ। আমাদের সঙ্কল্পে এবং প্রাণে তাহাই ক্রিয়াশীল দিব্যপ্রাণশক্তির আনন্দঘন বীর্য্যরূপে অনুভূত হইবে, অথবা সর্ব্বত্র পরম একের সাক্ষাৎ ও সংস্পর্শ লাভ করাতে সকল ইন্দ্রিয়ের এক পরম পরি-তর্পণ দেখা দিবে, তাহাদের প্রবৃত্তির সহজ সুন্দর ধর্ম্ম হইবে বিশ্বসৌন্দর্য্যের সর্ব্বগত এক মাধুরী এবং অন্তর্গূঢ় সৌষম্যের দর্শন ও আস্বাদন, আমাদের প্রাকৃত মনে মধ্যে মধ্যে ইহার অস্পষ্ট এবং অপূর্ণ আভাস মাত্র পাওয়া যায় অথবা কদাচিৎ এই অতিপ্রাকৃত অনুভবের একটা ছবি মাত্র ফুটে। আবার দেহে তাহাই চিৎসত্তার তুঙ্গ শিখর হইতে মহোল্লাসের এক অমৃত নির্ঝররূপে নামিয়া আসিবে এবং শুদ্ধ আধ্যাত্মিকভাবে বিভাবিত দৈহিক জীবনে পরাশান্তি ও পরমানন্দরূপে দেখা দিবে। সত্তার এক বিশ্বগত সৌন্দর্য্য এবং মহিমা ব্যক্ত হইতে থাকিবে ; সকল বস্তুই যাহা প্রাকত মন এবং ইন্দ্রিয়ের নিকট লুক্কায়িত আছে তেমন গোপন রূপরেখা, স্পন্দন, শক্তি এবং সার্থক সৌন্দর্য্য ও সৌষম্য প্রকাশ করিবে। বিশ্বের সকল রূপে সকল ঘটনায় শাশ্বত আনন্দ স্বরূপের আত্মপ্রকাশ দেখা দিবে।

অতিমানসী প্রকৃতির প্রস্ফুরণের অপরিহার্য্য পরিণামে যে আধ্যাত্মিক রূপান্তর দেখা দেয় এই সব হইল তাহার প্রাথমিক মহাসিদ্ধি। কিন্তু যদি আন্তর সত্তার ও চেতনার এবং অন্তরের আনন্দের পূর্ণতা লাভই শুধু লক্ষ্য না হয়, যদি জীবনে এবং কর্ম্মেও পূর্ণতা আনিতে হয় তাহা হইলে প্রাকৃত মনের দিক

হইতে দুইটি প্রশ্ন আসিয়া পড়ে, আমাদের প্রাণ ও তাহার গতি-প্রবৃত্তির সম্বন্ধে আমাদের মানুষী ভাবনার পক্ষে যাহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, এমন কি যাহাই মুখ্যতম প্রয়োজন। প্রথম প্রশ্ন :—বিজ্ঞানময় সত্তায় ব্যক্তিত্বের স্থান সম্বন্ধে, আমরা ব্যক্তির যে জীবন ও রূপের অনুভূতি লাভ করি বিজ্ঞানময় পুরুষের স্থিতি এবং গঠনে তাহার অনুরূপ কিছু কি থাকিবে অথবা তাহা হইতে কি সম্পূর্ণ অন্য কিছু হইবে ? যদি তাহার ব্যক্তিত্ব থাকে এবং যদি তাহার কৃত কর্ম্মে কোন দায়িত্ব থাকে তাহা হইলে পরের প্রশ্ন আসে ;—বিজ্ঞানময় প্রকৃতিতে নীতি ও ধর্ম্মবোধের স্থান কি হইবে এবং তাহার সার্থকতা ও চরম পরিণতিই বা কি আকার ধারণ করিবে ? আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে বিবিক্ত অহং-ই আমাদের আত্মা, এবং যদি বিশ্বচেতনা বা বিশ্বাতীত চেতনায় অহং-এর বিলোপ ঘটে তাহা হইলে সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবন এবং ক্রিয়াও লয় পাইবে —কেননা ব্যষ্টির বিলয়ের পর কেবল এক নৈর্ব্যক্তিক চেতনা, এক বিশ্বাত্মাই শুধু থাকিতে পারে ; কিন্তু ব্যষ্টিভাব নিঃশেষে তিরোহিত হইলে ব্যক্তিত্বের বা তাহার দায়িত্বের বা তাহার নীতি অথবা ধর্ম্মবোধের পরিপূর্ণতার আর কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অপর কোন কোন মতে চিন্ময় ব্যক্তিপুরুষের বিনাশ হয় না, তিনি প্রকৃতিতে শুদ্ধ, মুক্ত ও পূর্ণ হইয়া নিত্যধামে বাস করেন। কিন্তু এখানে মুক্ত হইবার পরও আমরা পৃথিবীতে থাকিব অথচ মনে করা হইবে যে ব্যক্তিগত অহংএর নির্ব্বাণ ঘটিয়াছে এবং তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে বিশ্বগত চিন্ময় এক ব্যষ্টিসত্তা যিনি বিশ্বাতীত পুরুষেরই এক শক্তি এবং প্রকাশ-কেন্দ্র। ইহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে এই বিজ্ঞানময় বা অতিমানস ব্যষ্টি-সত্তার আত্মা আছে কিন্তু ব্যক্তিত্ব নাই, তিনি এক নৈর্ব্যক্তিক পুরুষ। বহু বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিসত্তা থাকিবেন কিন্তু তাহাদের কাহারও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব থাকিবে না, সত্তা এবং প্রকৃতিতে সকলেই এক হইবেন। ইহা আবার এই ধারণার সৃষ্টি করিবে যে, যাহাকে আমরা বর্ত্তমানে দেখিতে পাই এবং বহিশ্চেতনায় বিবিক্ত অহং মনে করি তেমন কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠিত না করিয়া এক শুদ্ধ সত্তার রিক্ততা বা শূন্যতা হইতে অনুভবশীল চেতনার ক্রিয়া ও বৃত্তিধারা উত্থিত হইতেছে। অহং-এর প্রলয়ে চিন্ময় এক ব্যষ্টিচেতনার অস্তিত্ব বা অনুভূতিতে তাহার বোধ বর্ত্তমান থাকা সম্ভব কি না এই সমস্যার মনোময় সমাধান ইহা হইলেও অতিমানস সমাধান নহে। অতিমানস চেতনায় ব্যক্তি-কতা এবং নৈর্ব্যক্তিকতা বিরোধী তত্ত্ব নহে, দুইই সেখানে একই সত্যবস্তুর

অবিভাজ্য বিভাব মাত্র। এই সত্যবস্তু অহং নহে ইহা এক সত্তা যাহা স্বরূপ-প্রকৃতিতে নৈর্ব্যক্তিক এবং বিশ্বাত্মক কিন্তু ইহাই তাহার আত্মপ্রকৃতি হইতে এক প্রকাশশীল ব্যক্তিসত্তা গড়িয়া তোলে যাহা প্রকৃতি-পরিণামের মধ্যে তাহার আত্মারই এক রূপ।

মূলতঃ নৈর্ব্যক্তিকতা এমন একটা কিছু যাহা মৌলিক এবং বিশ্বাত্মক; ইহা একটা সত্তা, এক শক্তি, একটা চেতনা যাহা নিজ সত্তা এবং শক্তিতে বহু বিচিত্র আকার ধারণ করে; শক্তি গুণ বা বীর্য্যের এই নানা আকারের প্রত্যেকটি মূলতঃ সামান্যাত্মক নৈর্ব্যক্তিক এবং সর্ব্বগত হইলেও ব্যষ্টি জীব তাহার ব্যক্তি সত্তা গঠন করিবার উপাদানরূপে তাহা গ্রহণ করে। যেখানে ভেদ ও বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় নাই নির্ব্বিশেষ সেই অনাদি সত্যের দিক হইতে নৈর্ব্যক্তিকতা পরম সত্তা বা পুরুষের প্রকৃতির শুদ্ধ উপাদান; আবার সক্রিয় বা সবিশেষ সত্যের দিক হইতে সেই নৈর্ব্যক্তিকতাই তাহার শক্তিনিচয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে এবং সেই সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য উপাদানরূপে ব্যক্তিসত্তার অভিব্যক্তির কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। প্রেম প্রেমিকের প্রকৃতি বা ধর্ম্ম, যোদ্ধার ধর্ম্ম সাহস বা শৌর্য্য; প্রেম এবং শৌর্য্য প্রত্যেকে এক বিশ্বগত নৈর্ব্যক্তিক শক্তি অথবা প্রত্যেকে এক মহা বিশ্বশক্তির রূপায়ণ, তাহারা চিৎপুরুষেরই বিশ্বাত্মক সত্তা এবং প্রকৃতির শক্তি। এইভাবে যাহা নৈর্ব্যক্তিক তাহাকে নিজের মধ্যে নিজ আত্মার প্রকৃতিরূপে যিনি ধারণ করিয়া আছেন তিনিই পুরুষ; সেই পুরুষই প্রেমিক এবং যোদ্ধা। পুরুষের এই ব্যক্তিসত্তা প্রকৃতির স্থিতি ও গতির মধ্যে তাহার নিজেরই প্রকাশ বা স্ফুরণ, তাহার আত্মসত্তার মূলে এবং পরিণামে তিনি তাহার ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা অনেক বড়; তিনি তাঁহার নিজেরই যে রূপ, ব্যক্ত এবং পূর্ব্ব হইতে পরিণত প্রাকৃত সত্তা বা প্রকৃতিস্থ আত্মারূপে স্থাপিত করেন তাহাই তাহার ব্যক্তিসত্তা। সীমিত ও গঠিত ব্যষ্টিসত্তায় যাহা নৈর্ব্যক্তিক তাহাই ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ হয়, ব্যষ্টি ব্যক্তিগতভাবে নৈর্ব্বক্তিকতাকে আত্মসাৎ করে; আমরা বলিতে পারি বিস্সৃষ্টিতে নৈর্ব্যক্তিকতার উপাদান লইয়া পুরুষ নিজের সার্থক ব্যক্তিরূপ গড়িয়া তোলেন। তাঁহার অরূপ অসীম স্বরূপে তিনি খাঁটি পরম পুরুষ ব্যক্তিপুরুষ নহেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে ব্যক্তিরূপ প্রকাশের অনন্ত ও সার্ব্বভৌম সম্ভাবনা বর্ত্তমান আছে; বিস্সৃষ্টিতে পরম পুরুষ দিব্য ব্যষ্টিপুরুষরূপে এই সমস্ত ব্যক্তিরূপের প্রত্যেককে তাঁহার নিজ বৈশিষ্ট্য দান করেন, ফলে বহুর মধ্যস্থিত প্রত্যেকে সেই অদ্বয়

দিব্যপুরুষের এক অদ্বিতীয় আত্মরূপায়ণ রূপেই প্রকাশ পায়। শাশ্বত দিব্য পুরুষ সত্তা, চেতনা, আনন্দ, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্য্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, আমরা তাঁহাকে এই সমস্ত নৈর্ব্যক্তিক এবং বিশ্বগত শক্তিরূপে ভাবনা করিতে এবং এ সমস্তকে শাশ্বত দিব্য সত্তার প্রকৃতিরূপে দেখিতে পারি ; আমরা বলিতে পারি ব্রহ্ম প্রেমস্বরূপ, ব্রহ্ম প্রজ্ঞাস্বরূপ, ব্রহ্ম সত্য বা ঋতস্বরূপ ; কিন্তু তিনি নিজে শুধু কোন নৈর্ব্যক্তিকভাব অথবা ভাব বা গুণের অব্যক্ত নিষ্কর্ষ মাত্র নহেন ; তিনি আবার সত্তা বা পুরুষ, যে পুরুষ যুগপৎ বিশ্বাতীত, বিশ্বাত্মক এবং ব্যষ্টিভূত। যদি সত্যের এই ভিত্তি হইতে দেখি তাহা হইলে স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই যে নৈর্ব্যক্তিকতা এবং ব্যক্তিভাবের মধ্যে কোন বিরোধ বা কোন অসঙ্গতি নাই, উভয়ের একত্রে বা এক হইয়া থাকা অসম্ভব নয় ; ইহাদের একই অন্য রূপে প্রকাশ হয়, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বাস করে, একে অন্যের মধ্যে মিলাইয়া যায়, তথাপি তাহারা এক ভাবে একই সত্যবস্তুর বিভিন্ন প্রান্ত বা ধারা অথবা এপিঠ ওপিঠ রূপে প্রকাশ পাইতে পারে। বিজ্ঞানময় পুরুষে দিব্য পুরুষের প্রকৃতিই প্রকাশ পায় সুতরাং তাঁহার মধ্যেও অস্তিত্বের এই স্বাভাবিক রহস্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

বিজ্ঞানময় অতিমানস ব্যষ্টিসত্তা অধ্যাত্মপুরুষ বটে, কিন্তু তাহা কোন বিশেষ গুণাবলির নিরূপিত সমাহারে এক বিশেষ চরিত্রে গঠিত এক সুনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি-সত্তা নহে ; তিনি তাহা হইতে পারেন না কেননা তিনি বিশ্বপুরুষ এবং বিশ্বা-তীত পুরুষের সচেতন প্রকাশ ; কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার সত্তা নৈর্ব্যক্তিকতার তেমন এক অস্থির প্রবাহও হইতে পারে না যাহা উদ্দেশ্যহীনভাবে যদৃচ্ছা-ক্রমে ব্যক্তিত্বের নানা রূপের তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়াছে। এইরূপ একটা কিছু সেই লোকের মধ্যে অনুভূত হয়, যাহার গভীরে কেন্দ্রীকরণসমর্থ বীর্য্যবান ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে নাই সুতরাং সাময়িকভাবে যে ভাব প্রবল হইয়া উঠে তদনুসারে বিশৃঙ্খলতায় ভরা এক প্রকার বহু ব্যক্তিসত্তা তাঁহার মধ্যে ক্রিয়া করে কিন্তু বিজ্ঞানময় চেতনা সৌষম্য, আত্মজ্ঞান এবং আত্মকর্ত্তৃত্বের চেতনা, তাঁহার মধ্যে এরূপ অব্যবস্থার স্থান নাই। কোন্ কোন্ উপাদান দিয়া ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র গঠিত হয় তৎসম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে। এক মতে ব্যক্তিত্ব হইল কতকগুলি সুনিরূপিত গুণের একটা নির্দ্দিষ্ট কাঠামো যাহার মধ্য দিয়া সত্তার কোন শক্তির প্রকাশ হয় ; কিন্তু অন্য মতে ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের মধ্যে একটা ভেদ দেখা হয়—ব্যক্তিত্ব হইল সত্তার সক্রিয়তা ও প্রবাহের দিক, যাহা

আত্মপ্রকাশক বা অনুভূতিসম্পন্ন এবং বাহিরের অভিঘাতে যাহাতে সাড়া জাগে, আর চরিত্র হইল প্রকৃতি নিরূপিত ব্যষ্টিরূপায়ণের স্থাণুরূপটি। কিন্তু প্রকৃতির গতি ও স্থিতি সত্তারই দুইটি বিভাব, ইহাদের কাহারও বা উভয়ের দ্বারা ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দেওয়া চলে না। কেননা সকল লোকের মধ্যেই দুইটি বিভাব আছে; একটি সত্তা বা প্রকৃতির অগঠিত কিন্তু সীমিত প্রবাহ ও সক্রিয়তার দিক যাহার মধ্য হইতে ব্যক্তিত্ব গঠিত হইয়া উঠে,—অপরটি সেই প্রবাহ হইতে গঠিত বা রূপায়িত ব্যক্তিসত্তার এক ব্যক্ত বিগ্রহ। এই রূপায়ণ কখন আড়ষ্ট এবং কঠিন হইয়া পড়ে যাহা আর সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না অথবা তাহা এমনভাবে নমনীয় থাকিতে পারে যাহাতে সর্ব্বদা তাহার পরিবর্ত্তন ও পরিণতি ঘটিতে পারে; কিন্তু গঠনশীল এই প্রবাহের মধ্য দিয়াই এ পরিণতি ঘটে তাহাতে ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন বা পুনর্গঠন হয়, কিন্তু সাধারণতঃ যে ব্যক্তিসত্তা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে একেবারে উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে সত্তায় এক সম্পূর্ণ নূতন বিগ্রহ স্থাপন করা হয় না—সম্পূর্ণ নূতন রূপগ্রহণ অনৈসর্গিক ব্যাপার অথবা অতিপ্রাকৃত রূপান্তরগ্রহণে শুধু সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এই প্রবাহ এবং স্থিতির ভাব ছাড়া ব্যক্তিত্বের রূপায়ণে আর একটি তৃতীয় গোপন উপাদান ক্রিয়া করে তাহা হইল ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্ব যাহার আত্মরূপায়ণ সেই অন্তর্গূঢ় পুরুষ; যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহার সৃষ্টি বা সম্ভূতির যে নাটকাভিনয় চলিতেছে তাহার মধ্যে সেই পুরুষ বর্ত্তমান অঙ্কে যে ভূমিকায় যে চরিত্রে দেখা দিয়াছেন তাহাই তাঁহার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সে পুরুষ তাঁহার ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা অনেক বড়, অবশ্য এরূপ ঘটিতে পারে যে অন্তরের সেই বৃহত্তা বহিশ্চর রূপায়ণকে ছাপাইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে; তখন কোন নিরূপিত গুণ, মনের স্বাভাবিক কোন অবস্থা বা মেজাজ, নির্দ্দিষ্ট কোন রূপরেখা অথবা রূপায়ণের কোন স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য দিয়া সে প্রকাশকে বর্ণনা করা যায় না, তাহাকে সীমার মধ্যে ধরিয়া রাখা যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়া যাহাকে অপর হইতে পৃথক করিয়া দেখা অথবা ধরা-ছোঁয়া যায় না তাহা, আকাররহিত তেমন একটা প্রবাহ মাত্রও নহে; তাহার স্বরূপ জ্ঞান না হইলেও তাহার ক্রিয়া ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়, স্পষ্টভাবে তাহাকে অনুভব করা তাহার ক্রিয়াধারা অনুসরণ করা এবং তাহাকে চিনিতে পারা যায়; যদিও তাহাকে সহজে বর্ণনা করা চলে না, কেননা এ ধরণের প্রকাশকে সত্তার বিগ্রহ বা রূপায়ণ না বলিয়া তাহার একটা শক্তির খেলা বলাই অধিকতর সঙ্গত। সাধারণ মানুষের সীমিত ব্যক্তিসত্তাকে

চেনা যায় তাহার জীবন, ভাবনা এবং ক্রিয়ার উপর তাহার চরিত্রের যে ছাপ অঙ্কিত হয় তাহার বিবরণের দ্বারা, তাহার বহিশ্চর সত্তার বিশিষ্ট গঠন এবং প্রকাশভঙ্গীর সাহায্যে, তাহার মধ্যের যাহা বাহিরে প্রকাশ হয় নাই বলিয়া আমরা ধরিতে পারি নাই তাহার জন্যও সাধারণভাবে তাহার যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাতে বিশেষ অপূর্ণতা থাকে বলিয়া মনে হয় না ; কেননা সাধারণতঃ এইভাবে অলক্ষিত উপাদান হয়ত এখনও আকারহীন কাঁচা মাল মাত্র, প্রবাহের মধ্যে তাহা আছে বটে কিন্তু ব্যক্তিসত্তার কোন সার্থক অঙ্গে পরিণত হয় নাই। কিন্তু এই অন্তর্গূঢ় পুরুষের আত্মশক্তি যখন প্রচুরতররূপে প্রকাশিত হয় এবং বাহ্য রূপায়ণ ও জীবনে তাঁহার গোপন দেববীর্য্যের প্রস্ফুরণ ঘটে তখন এই ভাবের বিবরণ শোচনীয়ভাবে অপর্য্যাপ্ত হইয়াই পড়িবে। আমরা চেতনার এক মহাজ্যোতি, এক বিপুল সামর্থ্য, শক্তির এক সমুদ্রের সম্মুখে আসিয়াছি ইহা অনুভব করিতে পারি, তাহার গুণ ও কর্ম্মের স্বতন্ত্র তরঙ্গাবলিকে পৃথক করিয়া চিনিতে পারি বা তাহাদের বিবরণ দিতে পারি কিন্তু তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি না, তথাপি সেখানে ব্যক্তিসত্তার একটা ছাপ দেখিতে পাই, এক মহাবীর্য্যশালী সত্তার সান্নিধ্য অনুভব করি, মনে হয় ইনি যেন অতি উচচ মহাবলবান বা মহাসুন্দর চিনিবার যোগ্য কেহ, যিনি প্রকৃতির কোন সীমিত জীব নহেন কিন্তু যিনি আত্মা বা চৈত্যসত্তা বা পুরুষ। বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিসত্তা এমনই অনাবৃত এক অন্তরপুরুষ, এ পুরুষ তখন আর আত্মগোপন করিবেন না, যুগপৎ সত্তার গভীরে এবং বহিস্তলে একীভূত এবং আত্মজ্ঞানে দীপ্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন ; যিনি অন্তরের গোপন বৃহত্তর সত্তাকে অংশতঃ মাত্র প্রকাশ করেন সেই বহিশ্চর ব্যক্তিসত্তা আর তিনি নহেন ; তিনি আর সমুদ্রের তরঙ্গ নহেন স্বয়ং সমুদ্র ; এবার অন্তরের চিন্ময় সত্তা বা দিব্যপুরুষের আত্মপ্রকাশ দেখা দিয়াছে, যাহা বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করে সেরূপ প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের কোন মুখোশ পরিবার প্রয়োজন আর তখন নাই।

তাহা হইলে বিজ্ঞানময় পুরুষের স্বভাব এই হইবে :—অনন্ত এক বিশ্বপুরুষ কালের ক্ষেত্রে ব্যষ্টিভাবের সার্থক আত্মরূপায়ণ এবং ভাবব্যঞ্জক শক্তির মধ্য দিয়া শাশ্বত আত্মারূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন ; অথবা আমাদের মনোময় অবিদ্যার মধ্যে এই ভাবের আভাস জাগাইতেছেন। ব্যষ্টিরূপে প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ সুস্পষ্ট রূপ-রেখায় অঙ্কিত অনুপম চিত্ররূপেই হউক অথবা বহু-ভঙ্গিম বৈচিত্র্য সত্ত্বেও নানা ভাবের এক সুষম অভিব্যক্তিই হউক তাহাতে

পরিপূর্ণ সত্তার সবখানি কখনও ফুটিতে পারে না তবু তাহা সে সত্তাকে যেন অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিবে; অনুভব করা যাইবে যে প্রকাশের পশ্চাতে তিনি আছেন। তাঁহাকে চিনিতে পারা যাইবে কিন্তু অনির্দ্দেশ্য এবং অনন্ত বলিয়া অনুভূত হইবেন। বিজ্ঞানময় পুরুষের চেতনাও হইবে এক অনন্ত চেতনা যাহা হইতে তাঁহার বহুবিচিত্র আত্মরূপসকল উপজাত হইবে কিন্তু তাহাদের মধ্যে অখণ্ড বিশ্বাত্মভাবের অবন্ধন চেতনা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিবে, এমন কি খণ্ডপ্রকাশের মধ্যেও সেই অনন্ত এবং বিশ্বাত্মার বীর্য্য ও বোধ পূর্ণরূপেই অনুভূত হইবে; তাহা ছাড়া পরক্ষণের নূতন আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক্ষণের প্রকাশ দ্বারা কোন প্রকারে বদ্ধ হইবে না। কিন্তু তবু চেতনার এই প্রকাশ অনিয়ন্ত্রিত এবং অবোধ্য প্রবাহ মাত্র হইবে না, তাহা হইবে আত্ম-প্রকাশের এমন এক ধারা যাহাতে, অনন্তের সকল আত্মপ্রকাশ যে সৌষম্যের স্বাভাবিক ছন্দে ও বিধানে নিত্য নিয়ন্ত্রিত হয় সেই ছন্দানুযায়ীভাবে, সৎস্বরূপেব শক্তিতে অনস্যূত সত্য পরিদৃশ্যমান হইবে।

বিজ্ঞানময় পুরুষের জীবন ও ক্রিয়ার সকল প্রকৃতিই বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিভাবের এই আত্মপ্রকৃতি হইতে জাত এবং তদ্দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রিত হইবে। তাঁহার মধ্যে কোন পৃথক নৈতিক সমস্যা বা তজ্জাতীয় কিছু থাকিবে না, তথায় ভাল এবং মন্দের কোন দ্বন্দ্বের স্থান হইবে না। বস্তুতঃ তাঁহার জীবনে কোন সমস্যারই অস্তিত্ব একেবারে অসম্ভব, কেননা মনোময় যে অবিদ্যা জ্ঞানকে খুঁজিতেছে সকল সমস্যা তাঁহারই সৃষ্টি; যাহাতে আত্মসচেতন চিৎসত্তার পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান সত্য হইতে জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত্ত বা আপনা হইতে জাত হয় এবং জ্ঞান হইতে কর্ম্ম স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া উঠে সেই চেতনায় অবিদ্যা বা তজ্জাত সমস্যার কোন স্থান থাকিতে পারে না। যেখানে স্বরূপগত এক সার্ব্বভৌম অধ্যাত্ম সত্য নিজেকেই নিজে প্রকাশ করিতেছে, আত্মপ্রকৃতিতে স্বাধীনভাবে চেতনার স্বতঃস্ফুরণে নিজেকে নিজে পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিতেছে, যেখানে সত্যের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যস্থিত প্রত্যেক বস্তুতে একই সত্য রহিয়াছে এবং সকলই যে এক এ অনুভূতি জাগিতেছে, সেখানে সে সত্যের অভিব্যক্তিও স্বরূপত হইবে বিশ্বগত শিবস্বরূপেরই অভিব্যক্তি, শিবময় সত্যই চেতনার স্বতঃস্ফুরণে আত্ম-প্রকৃতিতে নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, কল্যাণের অনন্ত বৈচিত্র্যের ভিতরে সকলের মধ্যে এবং সকলের জন্য একই কল্যাণময় সত্য প্রকাশ পাইবে। শাশ্বত সৎস্বরূপের নির্ম্মলতা বিপুলভাবে বিজ্ঞানময় পুরুষের সকল কর্ম্মে

অনুপ্রবিষ্ট হইবে, সব কিছুকে পরিশুদ্ধ করিবে এবং বিশুদ্ধ রাখিবে; তাহার মধ্যে অবিদ্যা না থাকাতে অনৃত সঙ্কল্প এবং প্রমাদবশতঃ যে ভুল পদক্ষেপ হয় তাহা দূর হইবে, বিবিক্ত অহং না থাকাতে তজ্জনিত অবিদ্যা এবং বিবিক্ত ও বিরোধী ইচ্ছার প্রভাবে নিজের বা পরের যে অনিষ্ট সাধিত হয় তাহার সম্ভাবনা থাকিবে না অথবা কার্য্যতঃ মানুষ যাহা অশুভ ও অনর্থ মনে নিজের বা অপরের আত্মা, মন, প্রাণ বা দেহ লইয়া তেমন কোন অন্যায় অযোগ্য আচরণে নিজেকে নিজে চালিত করিবে না। পাপ ও পুণ্য, ও অশুভের উপরে উঠা মুক্তির বৈদান্তিক ধারণার ও সাধনার একটা অপরিহার্য অঙ্গ, এবং এই পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে একটা স্বতঃস্পষ্ট পারম্পর্য্য আছে। কেননা মুক্তির অর্থই সত্তার খাঁটি আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মধ্যে পরিস্ফুরিত হইয়া উঠা যেখানে সকল ক্রিয়া হইবে সেই সত্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মরূপায়ণ, সেখানে আর কিছু থাকিতে পারে না। আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ ও বিভিন্ন বৃত্তির অপূর্ণতা এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে সদাচারের আদর্শে পৌঁছিবার এক প্রবৃত্তি এবং তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক প্রয়াস আছে; এই প্রয়াসের অনুকূল কর্ম্মকে আমরা নীতি, ধর্ম্ম, সুকৃতি বা পুণ্য এবং তাহার অন্যথাচরণকে অধর্ম্ম দুষ্কৃতি বা পাপ বলি। নীতি বা ধর্ম্মবোধযুক্ত মন বলে প্রেমের এক বিধান, ন্যায়ের এক বিধান, সত্যের এক বিধান, এইরূপ অগণিত বিধান আছে, এই সমস্ত বিধান যেমন পালন করা দুরূহ তেমনি তাহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা অতি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যেখানে সিদ্ধ অধ্যাত্ম প্রকৃতির স্বরূপই হইতেছে অপর সকলের সহিত এবং পরম সত্যের সহিত এক হওয়া সেখানে সত্যের বা প্রেমের কোন বিধানের প্রয়োজন থাকিতে পারে না—বিধান বা আদর্শ আমাদের উপর আরোপ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে কেননা আমাদের প্রাকৃত সত্তার মধ্যে বিবিক্তবোধ, বৈষম্য, বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের একটা বিরুদ্ধ শক্তি, অপরকে শত্রু বোধ করিবার একটা প্রবৃত্তি বা সম্ভাবনা আছে। প্রকৃতি যখন অনর্থ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, প্রাচীন বৈদান্তিক আখ্যানে যাহাকে বৃত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে অবিদ্যাজাত সেই অন্ধকারময় শক্তিদ্বারা প্রকৃতি যখন প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে তখন তাহার মধ্যে কল্যাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হইতে সকল নীতি বা ধর্ম্মানুশাসনের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু যেখানে সকলই চেতনার সত্য এবং সত্তার সত্যের দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রিত হয় সেখানে কোন আদর্শ বা মান, তাহা রক্ষা বা লাভের প্রয়াস, প্রকৃতিতে কোন পুণ্য বা সুকৃতি কোন পাপ

বা দুষ্কৃতি থাকিতে পারে না। প্রেম, সত্য এবং ন্যায়ের শক্তি সেখানে নিশ্চয়ই থাকিবে, থাকিবে আত্মপ্রকৃতির মূল গঠন এবং উপাদানরূপে, মনের গড়া কোন বিধানরূপে নয়; আবার আধারের অভঙ্গ পূর্ণাঙ্গতার জন্য কর্ম্মময় প্রকৃতির অপরিহার্য্য গঠন এবং উপাদান রূপেও প্রেম সত্য এবং ন্যায় সদা বর্ত্তমান থাকিবে। এইভাবে আমাদের খাঁটি সত্তার প্রকৃতিতে অধ্যাত্ম সত্য এবং একত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই হইল অধ্যাত্মপুরুষের পরিণামধারার মধ্য দিয়া মুক্তিলাভ; বিজ্ঞানময় পরিণাম আমাদের এই স্বরূপসত্তায় ফিরিয়া যাইবার পূর্ণ বীর্য্য দান করে। একবার এ সিদ্ধিলাভ হইলে সকল আদর্শ, সকল ধর্ম্ম, সকল পুণ্য কর্ম্মের প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়; যেখানে প্রমুক্ত চিৎস্বরূপের বিধান এবং স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলি আরোপিত বা মনের গড়া তেমন কিছুর আর কোন স্থান সেখানে থাকিতে পারে না। তখন সকলই আধ্যাত্মিক আত্মপ্রকৃতি বা স্বধর্ম্ম ও স্বভাবের স্বতঃস্ফুরণে পরিণত হয়।

অবিদ্যাচ্ছন্ন মনোময় জীবন ও প্রকৃতি এবং বিজ্ঞানময় পুরুষের জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে যে গভীর পার্থক্য আছে তাহার মূল এখানে দেখিতে পাই। বিজ্ঞানময় পুরুষ পূর্ণাঙ্গ গঠিত পূর্ণ সচেতন এক সত্তা, নিজ সত্তার সত্য পূর্ণরূপে তাঁহার অধিগত এবং সমস্ত কৃত্রিম বা রচিত বিধান হইতে মুক্ত থাকিয়া নিজস্ব স্বাধীনতায় সেই সত্যকে প্রস্ফুরিত করাই তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার জীবনে সম্ভূতির সকল ঋতময় বিধান তাহাদের মূল অর্থে ও ভাবে পূর্ণ ও সার্থক হইয়া উঠে; অপরটি হইল অবিদ্যাচ্ছন্ন আত্মবিভক্ত বা খণ্ডিত এক সত্তা, যে নিজের সত্য খুঁজিতেছে এবং সে যেটুকু সত্যের সাক্ষাৎ পাইতেছে তাহা দিয়া বিধানসকল গড়িয়া তুলিতেছে এবং এইভাবে গড়া একটা ছক বা একটা কাঠামোর সাহায্যে নিজের জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে; ইহাই এই দুই ভাবের জীবনের পার্থক্য। সকল সত্য বিধান এক সত্য বস্তুর ঋতময় গতি ও কার্য্যধারা, তাহাতে আছে নিজ সত্তার সত্যের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অন্তর্নিহিত এক বীর্য্য বা শক্তি যাহা ক্রিয়ার মধ্য দিয়া নিজের মধ্যে অনুস্যূত গতি বা স্পন্দন সার্থক করিয়া তোলে। এ বিধান অচেতন হইতে পারে, বোধ হইতে পারে তাহার ক্রিয়া যন্ত্রের মত অন্ধভাবে পরিচালিত হইতেছে, জড়প্রকৃতির মধ্যে যে বিধান দেখিতে পাই তাহার প্রকৃতি এইরূপ, অন্ততঃ তাহাই মনে হয়; আবার এ বিধান এক সচেতন শক্তিরূপে দেখা দিতে পারে সত্তার চেতনার দ্বারা যাহার ক্রিয়াধারা স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, যে চেতনায় যাহা অবশ্যই ফুটিয়া উঠিবে সেই নিজ

সত্যের জ্ঞান আছে, সেই সত্যের আত্মপ্রকাশের যে সমস্ত সম্ভাবনা আছে তাহার সকল ভঙ্গিমার জ্ঞানও সে চেতনায় আছে, আবার সে চেতনার মধ্যে যাহা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে তাহার বাস্তবরূপের সমগ্রতার এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অঙ্গের জ্ঞান বর্ত্তমান আছে, তাহাতে যেমন অখণ্ড দৃষ্টি দিয়া জানা জ্ঞান আছে তেমনি আছে প্রতিমুহূর্ত্তের ভাব ও ভাবনার জ্ঞান—চিৎপুরুষের বিধানের স্বরূপ-মূর্ত্তি এই। বিজ্ঞানময় পরাচেতনার ক্রিয়ার ধর্ম্ম এই যে তাহাতে চিৎপুরুষ পূর্ণ স্বাধীন, সেখানে রহিয়াছে পূর্ণ স্বয়ম্ভূ-সত্তার লীলা, নিজের স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য গতি-প্রবৃত্তিতে তাহা স্বতঃকার্য্যকরী স্বপ্রতিষ্ঠ এবং আপনি আপনার স্রষ্টা।

সত্তার তুঙ্গতম শিখরে যিনি আছেন তিনি পরম ও চরম বস্তু, তাঁহার মধ্যে অনন্তের চরম ও পরম স্বাধীনতা যেমন আছে তেমনি আছে নিজের চরম ও পরম সত্য এবং সত্তার সেই সত্যের চরম ও পরম শক্তি; পরাপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত চিৎসত্তার জীবনেও এই দুই বিভাবের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় সকল ক্রিয়া ও গতি পরাপ্রকৃতির সত্যে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা বা পরমেশ্বরেরই গতি ও ক্রিয়া। এখানে পরমাত্মার স্বরূপ-সত্য এবং পরমেশ্বরের সঙ্কল্পের সত্য যুগপৎ বর্ত্তমান—উভয় সত্য এক হইয়া আছে, অথবা উভয়ে একই সত্যের দুইটি দিক, প্রত্যেক বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুষে এ যুগল সত্য তাহার পরাপ্রকৃতি অনুসারেই প্রকাশ হয়। নিজ সত্তার সত্য এবং নিজ শক্তির বীর্য্য জীবনে পরিপূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলিবার যে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা তাহাই প্রত্যেক বিজ্ঞানময় পুরুষের স্বাধীনতা, কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের অর্থ তাহার জীবনে পরমাত্মার যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহার ও সকলের মধ্যে দিব্যপুরুষের যে ইচ্ছা ক্রিয়া করিতেছে নিজ প্রকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুগত হইয়া চলা। প্রত্যেক বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুষে, বহু বিজ্ঞানময় পুরুষে এবং সর্ব্বস্বরূপে যে চিৎ-পুরুষ এ সকলকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছেন তাঁহাতে—সর্ব্বত্রই এই সর্ব্বসঙ্কল্প একই বস্তু, প্রত্যেক বিজ্ঞানময় পুরুষে ইহা তাহার সঙ্কল্পের সহিত এক হইয়া সচেতনভাবে বর্ত্তমান আছে, সেই সঙ্গে সেই এক সঙ্কল্প একই আত্মা একই শক্তিসকলের মধ্যে বহু বিচিত্র হইয়া ক্রিয়া করিতেছে এই বোধ এই সাক্ষাৎ অনুভূতি বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুষে নিত্য বর্ত্তমান আছে। এই ভাবের এক বিজ্ঞানময় চেতনা এবং বিজ্ঞানময় সঙ্কল্প বহু বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুষের সহিত নিজের একত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইবে, আবার নিজের ঐক্যতানযুক্ত সমগ্রতা এবং বহু

বৈচিত্র্যের তাৎপর্য্য ও সংযোগবিন্দু সম্বন্ধে তেমনি সচেতন থাকিবে ; এই চেতনা এবং সঙ্কল্পের জন্য সকল গতি ও প্রবৃত্তিতে একটা সুরসঙ্গতি একটা একত্ব একটা সৌষম্য এবং সমগ্রের ক্রিয়ায় একটা অন্যোন্যতা আসিয়াই পড়িবে। সেই সঙ্গে ব্যষ্টিপুরুষের মধ্যে একটা একত্ব, তাহার নিজসত্তার সকল শক্তি এবং গতিবৃত্তির মধ্যে একটা সুরসঙ্গতি, একটা একতানতাও দেখা দিবে। সত্তার সকল শক্তিই আত্মপ্রকাশ এবং সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় তাহাদের নিজেদেরই পরম অবস্থায় পৌঁছিতে চায় ; পরমাত্মার মধ্যে সকল শক্তি এই চরম অবস্থা লাভ করে এবং সেই সঙ্গে অতিমানসবিজ্ঞানের স্বতঃপরিণাম ও আত্মবিসৃষ্টির সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বসমন্বয়ী সক্রিয় শক্তিতে তাহারা তাহাদের এক পরম একত্ব দেখিতে পায় এবং তাহাদের মিলিত ও সাধারণ আত্মরূপায়ণে এক সৌষম্য এবং অন্যোন্য সঙ্গতি লাভ করে। যে বিবিক্তসত্তা নিজেকে শুধু আপনাতে বর্ত্তমান মনে করে অন্য বিবিক্ত সত্তার সহিত তাহার বিরোধ থাকিতে পারে, যাহার মধ্যে সর্ব্বভূত একত্রে অবস্থিত সেই বিশ্বগত সর্ব্বের সহিত তাহার মিল নাই ইহাও দেখা যাইতে পারে, যে পরম সত্য বিশ্বে আত্মপ্রকাশেচ্ছু হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেও পারে ; ঠিক ইহাই ঘটে অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যষ্টিসত্তার বেলায়, কেননা সে আপনার বিবিক্ত ব্যষ্টিভাবের চেতনার উপর শুধু দাঁড়ায়। সত্তার সত্য, শক্তি, গুণ, বীর্য্য ও বিভাবসকল বিবিক্ত এবং বিভিন্নমুখী হইয়া যখন ব্যষ্টি ও বিশ্বের মধ্যে ক্রিয়া করে তখনও তাহাদের মধ্যে এইরূপ একটা বিরোধ একটা সংঘর্ষ একটা বৈসাদৃশ্য দেখা দিতে পারে। বিশ্ব দ্বন্দ্বে পূর্ণ, আমাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, পরিবেশরূপে যে জগৎ রহিয়াছে তাহার সহিত ব্যষ্টিব্যক্তির দ্বন্দ্ব, মানুষের অবিদ্যাশ্রিত বিবিক্ত চেতনার এবং বেসুরা জীবনের ইহাই স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য বিশেষত্ব। কিন্তু বিজ্ঞানঘন চেতনায় ইহা ঘটিতে পারে না, কেননা তথায় যাহা সব কিছুকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে অথচ সব কিছুই যাহার আত্মপ্রকাশ তাহার মধ্যে প্রত্যেকে তাহার পরিপূর্ণ আত্মাকে লাভ করে এবং সর্ব্ব বা সকল সত্তা তাহাদের নিজ সত্য এবং তাহাদের বিভিন্ন গতিবৃত্তির পরম সৌষম্য দেখিতে পায়। সুতরাং বিজ্ঞানময় জীবনে, পুরুষের স্বাধীন আত্মরূপায়ণের সঙ্গে বিশ্বগত পরম সত্যের মধ্যে অনুস্যূত বিধানের প্রতি তাহার স্বচ্ছন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনুগত্যের বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। তাহার কাছে তাহারা এক সত্যের পরস্পর সম্বন্ধ দুইটি দিক মাত্র ; একই পরাপ্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া তাহার নিজের এবং

সর্ব্ববস্তুর মিলিত সমগ্র সত্যের মধ্যেই তাহার নিজ সত্তার পরম সত্য নিজেকে স্ফুরিত করিয়া তোলে। সেই সঙ্গে তাহার সত্তার বহু এবং বিভিন্নমুখী সকল শক্তি ও তাহাদের ক্রিয়ার মধ্যেও এক পরিপূর্ণ সুরসঙ্গতি দেখা দেয়; কারণ যাহাদের আপাতগতি পরস্পর বিরোধী এবং আমাদের মনোময় অনুভবে আমরা যেখানে দেখিতে পাই যে পরস্পরের মধ্যে একটা সংঘর্ষ চলিতেছে সেখানেও তাহারা এবং তাহাদের ক্রিয়াবলী পরস্পরের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে, স্বাভাবিক ভাবে মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যায়; কেননা বিজ্ঞানময় পরাচেতনায় প্রত্যেকের আত্মসত্য এবং অপরের সহিত সম্বন্ধের সত্য এ উভয়ই পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গত হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং স্বপ্রতিষ্ঠ ভাবে অবস্থিত থাকে।

মন আমাদের জীবনের উপর বিধিনিষেধের একটা কঠিন এবং অনড় ব্যবস্থা চাপাইতে চায়, সে জীবনকে একটা আদর্শের মধ্যে সীমিত, বাঁধা ধরা কতকগুলি নীতি ও রীতির মধ্যে আবদ্ধ করিতে চায়, সমস্ত জীবনকে বাধ্য করিয়া একটা বিশিষ্ট ধারায় চালাইতে একটা বিশেষ ছকে বা কাঠামোর মধ্যে পুরিতে চায়, তাহার কাছে কেবল এ সমস্তই ন্যায্য মনে হয় কেননা ইহাই সে সত্তার ও তাহার আচরণের পক্ষে একমাত্র খাঁটি সত্য মনে করে; কিন্তু অতিমানসী বিজ্ঞানময় প্রকৃতির পক্ষে এ সমস্তের কোন প্রয়োজন নাই। মনঃ-কল্পিত সেরূপ আদর্শ এবং মনগড়া সেরূপ সঙ্কীর্ণ কাঠামোর মধ্যে সমগ্র জীবনকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না তাহা স্বাধীনভাবে সর্ব্বপ্রাণের চাপের সঙ্গে নিজেকে মিলাইতে পারে না অথবা পরিণামশীল শক্তির সকল প্রয়োজন সাধনের পক্ষে তাহা নিজেকে উপযুক্ত বা উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে না; তাহার নিজের হাত হইতে বা তাহার আপনগড়া সীমার গণ্ডি হইতে নিস্তার পাইতে হইলে হয় তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে বা নিজেকে মরিতে হইবে অথবা প্রবল সংঘর্ষ এবং বিপুল বিপ্লব ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে। নিজে বদ্ধ এবং নিজের দৃষ্টিশক্তি ও সামর্থ্য সীমাবদ্ধ বলিয়া বাধ্য হইয়া মনকে জীবনের পন্থা ও বিধান বাছিয়া এবং সীমিত করিয়া লইতে হয়; কিন্তু বিজ্ঞানময় পুরুষ সমগ্র জীবন এবং সত্তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেন, যাহা যুগপৎ এক এবং বহু, অনন্তভাবে এক এবং অনন্তভাবে বহু, তেমন এক মহাসত্যের পরম সমন্বয়ী আত্মপ্রকাশে তাঁহার জীবন পরিপূর্ণ এবং রূপান্তরিত হইয়া উঠে। বিজ্ঞানঘন পুরুষের জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে অনন্ত স্বাধীনতার এক দিব্য উদারতা

এবং সাবলীলতা বর্ত্তমান থাকিবে। তাহার জ্ঞান তাহার জ্ঞেয় বস্তুরাজিকে সমগ্রতার অত্যুদার ভূমিতেই গ্রহণ করিবে; যাহা সমগ্র এবং অখণ্ড সেই পূর্ণাঙ্গ সত্য এবং বস্তুর অন্তরতম পূর্ণতম সত্যের দ্বারা শুধু সে জ্ঞান বদ্ধ থাকিবে, কিন্তু বদ্ধ থাকিবে না মনের গড়া কোন ধারণা ভাব বা সংস্কার অথবা মনের বিশিষ্ট কোন প্রতীকের দ্বারা, প্রাকৃত মন যেমন এ সমস্তে নিজে বদ্ধ থাকে; তেমনি বিজ্ঞানময় পুরুষের কোন কর্ম্মই পরিবর্ত্তনশূন্য কোন আড়ষ্ট বিধানের অথবা অতীত কোন অবস্থা বা কর্ম্মের অথবা কর্ম্মফলের কোন দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে না; তাহার ক্রিয়াতে একটা অনুক্রম থাকিবে কিন্তু তাহা হইবে আপনার সান্তভাবের উপর সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়াশীল অনন্তের আত্মনিয়ন্ত্রিত এবং স্বতঃ পরিণামী সাবলীলতার সংক্রমণ। এই শক্তি-সংক্রমণে একটা উদ্দেশ্যহীন প্রবাহ বা একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে না বরং সৌষম্যের ছন্দে ভরা প্রমুক্ত সত্যের প্রকাশ দেখা দিবে; অধ্যাত্ম সত্তা সাবলীলভাবে এবং পূর্ণরূপে আত্ম-সচেতন প্রকৃতির মধ্যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে আত্মবিসৃষ্টি বা আত্মপ্রকাশ করিবে।

অনন্তের চেতনায় ব্যষ্টিত্ব বিশ্বচেতনাকে খণ্ডিত বা সঙ্কুচিত করে না তদ্রূপ বিশ্বচেতনায় বিশ্বাতীত চেতনা বাধিত হয় না। বিজ্ঞানময় পুরুষ অনন্তের চেতনায় বাস করিবেন এবং ব্যষ্টিচেতনার সৃষ্টি করিয়া নিজে আত্মপ্রকাশ করিবেন কিন্তু তাহা করিবেন বৃহত্তর বিশ্বচেতনার এবং সেই সঙ্গে বিশ্বাতীত চেতনার এক কেন্দ্ররূপে। তাঁহার মধ্যে ব্যষ্টিভাব এবং বিশ্বভাব একসঙ্গেই বর্ত্তমান থাকিবে, তাঁহার সকল ক্রিয়া বিশ্বক্রিয়ার সুরেই বাঁধা হইবে, কিন্তু তিনি নিজে স্বরূপতঃ বিশ্বাতীত বলিয়া তাঁহার কর্ম্ম কোন সাময়িক নিম্নতর রূপায়ণের দ্বারা সীমিত বা সঙ্কুচিত হইবে না অথবা কোন বিশিষ্ট বা সমগ্র বিশ্বশক্তির অধীন থাকিবে না। তিনি বিশ্বাত্মার সহিত এক বলিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ অবিদ্যাও তাঁহার বৃহত্তর আত্মার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, কিন্তু অবিদ্যাকে অন্তরঙ্গভাবে জানিলেও তিনি তাহা দ্বারা প্রভাবিত হইবেন না; তিনি তাঁহাব বিশ্বাতীত ব্যষ্টিসত্তার বৃহত্তর বিধান অনুসরণ করিবেন এবং আপন সত্তা ও ক্রিয়ার ধারায় তাঁহার বিজ্ঞানময় সত্যকেই প্রকাশ করিবেন। তাঁহার জীবন হইবে তাঁহার আত্মার ঋতসুষমাময় স্বাধীন প্রকাশ; কিন্তু তাঁহার উচ্চতম সত্তা ভাগবতী সত্তার সহিত এক বলিয়া জীবনে তাঁহার আত্মপ্রকাশের ধারা স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার উচ্চতম সত্তা ও পরাপ্রকৃতি বা পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরীর দিব্য প্রশাসনে নিয়ন্ত্রিত হইবে; তাঁহার জ্ঞানে, জীবনে এবং কর্ম্মে সেই প্রশাসনের এক বৃহৎ

বাধাবন্ধনহীন পূর্ণ ঋতময় ছন্দ ও সুষমা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে আসিয়া পড়িবে। ব্যষ্টিসত্তার প্রকৃতিকে পরমপুরুষ এবং পরা প্রকৃতির অনুগত করা তাঁহার স্বভাবেরই ছন্দ হইবে, এবং বস্তুতঃ এই আনুগত্যেই তাঁহার আত্মস্বাতন্ত্র্যের বিধান সার্থক হইবে, কেননা তাহা তাঁহার নিজেরই পরম সত্তার আনুগত্য—সকল সত্তার উৎসমূলের ইচ্ছাকে সজ্ঞানে বহন। তাঁহার ব্যষ্টিপ্রকৃতি আর বিবিক্ত কিছু থাকিবে না, তাহা হইবে পরাপ্রকৃতিরই একটি ধারা। পুরুষ ও প্রকৃতির সকল দ্বন্দ্বের এবং যাহা অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যষ্টিসত্তাকে প্রপীড়িত করিয়া রাখে অন্তবাত্মা এবং প্রকৃতির মধ্যগত সেই সকল অদ্ভুত ভেদ ও বৈষম্যের চিহ্ন মাত্রও আর অবশিষ্ট থাকিবে না ; কেননা তখন প্রকৃতি হইবে পরম ব্যক্তি-পুরুষের আত্মশক্তির প্রস্ফুরণ এবং ভাগবতী সত্তার অতিমানসী শক্তি বা পরাপ্রকৃতির প্রবাহেই তখন ব্যষ্টিপুরুষ প্রকট হইয়া উঠিবেন। তাঁহার সত্তার এই পরম সত্য, অন্তহীন সৌষম্যের এই পরম ছন্দ বিজ্ঞানময় পুরুষের মধ্যে এমন এক চিন্ময় স্বাধীনতার লীলা ফুটাইবে যাহা হইবে অমোঘবীর্য্য, স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং সাবলীল।

নিম্নতর প্রকৃতির খেলা যন্ত্রের মত চলে, সেখানে নিয়মের বাঁধন অতি কঠিন, চলিবার পথ নির্দ্দিষ্ট ও অলঙ্ঘনীয় ; সেখানে বিশ্বচেতনার শক্তি প্রকৃতি-পরিণামের একটা পরিকল্পনা এবং নির্দ্দিষ্ট ও বিশিষ্ট ক্রিয়ার এক ধারা গড়িয়া তুলিয়াছে, অভ্যস্ত সংস্কারের একটা ছাঁচ প্রস্তুত করিয়াছে, এবং যাহাদের মধ্যে যুক্তি বুদ্ধি জাগে নাই এমন সত্তা সকলকেও এই গতানুগতিক আদর্শে গড়িয়া উঠিতে এই ছাঁচে ঢালা রীতিতে বাস এবং ক্রিয়া করিতে বাধ্য করিতেছে। মানুষের মন এই পূর্ব্বগঠিত পরিকল্পনা এই গতানুগতিক ব্যবস্থার দাসত্ব স্বীকার করিয়াই যাত্রারম্ভ করে ; কিন্তু যেমন মন পরিণত হইতে থাকে তেমনি সে সেই পরিকল্পনাকে বৃহত্তর, ছাঁচকে প্রশস্ততর করিতে থাকে এবং এই অচেতন বা অর্ধচেতন নির্দ্দিষ্ট যান্ত্রিক বিধানের স্থানে ভাবনা, অভিপ্রায় এবং স্বীকৃত জীবনাদর্শকে বসাইতে চায় অথবা যুক্তি সঙ্গত উদ্দেশ্য, উপযোগিতা এবং সুবিধা অনুসারে বুদ্ধির পরিচায়ক কোন আদর্শ বা কাঠামো গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। মানুষ যে জ্ঞানের সৌধ বা জীবনের ইমারত গড়িয়া তোলে বস্তুতঃ কিন্তু সেরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিতে সে বাধ্য নয় এবং তাহা কখনই স্থায়ী হয় না ; কিন্তু তবু ভাবনায়, জ্ঞানে, ব্যক্তিত্বে, জীবনে এবং আচারে অল্প-বিস্তর সচেতন ভাবে ন্যূনাধিক পূর্ণ একটা আদর্শ খাড়া না করিয়া সে পারে না ;

সে তাহার জীবন এই আদর্শের উপর স্থাপিত করে; অথবা অন্ততপক্ষে বুদ্ধি দিয়া গঠিত তাহার নির্ব্বাচিত বা স্বীকৃত ধর্ম্মের এই কাঠামো অনুসারে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক চিন্ময় জীবনের পথে যে পরম আদর্শ উপস্থাপিত করা হয় তাহা হইল চেতনার প্রমুক্তি, কোন নিয়ম বিধানের অনুবর্ত্তন নয়; চিৎসত্তা নিজের আত্মস্বরূপ পাইবার জন্য বিধিনিষেধের সকল বাঁধন ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং তাহার পর যদি তাহার আত্মপ্রকাশের কোন দায় থাকে, সে-প্রকাশ হইবে খাঁটি ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত আধ্যাত্মিকতা বিভাবিত স্বাধীন ও সত্য প্রকাশ, কোন কৃত্রিম প্রকাশ নয়। "সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, সত্তা এবং ক্রিয়ার সকল আদর্শ সকল নিয়ম ছাড়িয়া দাও, একমাত্র আমারই শরণ লও" উচচতম জীবনের চরম বিধানরূপে সাধকের সম্মুখে দিব্যপুরুষ এই অনুশাসন উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই যে স্বাধীনতার অন্বেষণ, এই যে মনের গড়া বিধান হইতে আত্মা এবং চিৎসত্তার বিধানের মধ্যে মুক্তি, এই যে চিন্ময় সত্য বস্তুর শাসন স্থাপিত করিবার জন্য মনোময় শাসনকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া, এই যে সত্তার উচচতর স্বরূপ-সত্যের জন্য বুদ্ধির দ্বারা গঠিত মনোময় সত্যকে বর্জন করা, ইহার ফলে পরিণামের পথে একটা অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হইতে পারে যেখানে অন্তরের স্বাধীনতা আসিবে কিন্তু বাহিরের জীবনে তাহার ছন্দ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, তখন ক্রিয়ার ধারাতে যে প্রকৃতির প্রকাশ দেখা যাইবে তাহা হইবে বালকবৎ অথবা ভূপতিত বা বায়ুদ্বারা চালিত নিষ্ক্রিয় শুষ্ক পত্রের মত জড়বৎ এমন কি বহির্দ্দৃষ্টিতে উন্মত্তবৎ বা উচছৃঙ্খল পিশাচবৎ। এই জীবনের পক্ষে বা যে অবস্থায় সাময়িকভাবে সাধক পৌঁছিতে পারে তাহার পক্ষে যাহা প্রচুর, অধ্যাত্ম প্রকাশের তেমন এক ছন্দে কিছুকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াও সম্ভব হইতে পারে; অথবা হয়ত এমনও হইতে পারে যে সাধক আধ্যাত্মিক সত্যের যেটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার প্রকৃতি অনুসারে ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশের একটা ছন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে কিন্তু পরে আধ্যাত্মিক শক্তির আবেগে স্বচছন্দভাবে সাধক ভবিষ্যতে যে আরো বৃহত্তর সত্য উপলব্ধি করিবেন তাহারই প্রকাশের ছন্দে তাহা রূপান্তবিত হইবে। কিন্তু অতিমানস বিজ্ঞানময় পুরুষ চেতনার যে ভূমিতে অবস্থিত সেখানে জ্ঞান স্বয়ম্ভূত এবং পরাপ্রকৃতিতে নিহিত অন্তরের ইচছা দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রিত হইয়া তাহারই ছন্দে প্রকাশিত হয়। স্বয়ম্ভূজ্ঞানের এই আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারা নিম্নপ্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিয়া এবং মনের গড়া আদর্শের

স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবে এমন এক সত্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ততা যাহা নিজেকে নিজে জানে এবং যাহা সত্তার প্রতি অনুপরমাণুতে স্বয়ংক্রিয়।

বিজ্ঞানময় পুরুষের ঐকান্তিক স্বভাবধর্ম্মের মধ্যে জ্ঞানের এই আত্মনিয়ন্ত্রণকারী বৃত্তি থাকিবে অথচ তাহার জ্ঞান আপন স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখিয়াই সৎস্বরূপের আত্মসত্য এবং অখণ্ড সত্যের অনুগত হইয়াই চলিবে। তাহার মধ্যে জ্ঞান এবং সঙ্কল্প এক হইয়া যাইবে সুতরাং তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিবে না; চিৎসত্তার সত্য এবং জীবনের সত্য তেমনি তাহার কাছে এক হইয়া যাইবে এবং তাহাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব আসিতে পারিবে না; তাহার সত্তার আত্মরূপায়ণে তাহার চিদাত্মা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরোধ বা বৈসাদৃশ্যের কোন স্থান থাকিবে না। প্রাকৃত মন এবং জীবনে স্বাধীনতা ও নিয়ম সংযম এই দুইটি বৃত্তির মধ্যে সর্ব্বদা বিরোধ এবং অসামঞ্জস্য দেখা যায়; অথচ এ বিরোধকে যে থাকিতেই হইবে তাহা নহে; স্বাধীনতা যদি জ্ঞান দ্বারা রক্ষিত এবং সত্তার সত্যের উপর যদি নিয়ম সংযমের ভিত্তি স্থাপিত হয় তাহা হইলে বিরোধের কোন কারণ থাকে না; কিন্তু অতিমানস চেতনায় এ দুই-এর একের মধ্যে অন্যে বাস করে এমন কি মূলতঃ উভয়ে এক। ইহার কারণ এখানে ইহারা উভয়ে অন্তরের অধ্যাত্ম সত্যের অবিভাজ্য বিভাব, সুতরাং আত্মবিভাবনায়ও তাহারা এক; তাহারা একে অন্যের মধ্যে অনুস্যূত, একত্ব হইতে জাত, সুতরাং ক্রিয়ার মধ্যে তাহারা স্বাভাবিকভাবেই একত্বে মিলিত হয়। তাহার ভাবনা এবং ক্রিয়ার অবশ্য পালনীয় বিধানের দ্বারা তাহার স্বাধীনতা কোন প্রকারে একটুও খণ্ডিত হইল এ কথা বিজ্ঞানময় পুরুষ কখনও বোধ করেন না, কেননা সে নিয়ম তাহাতে অনুস্যূত তাহার স্বভাবেরই স্বতঃস্ফুরণ; তিনি তাহাব স্বাধীনতা এবং নিয়ন্ত্রণ বা সংযম তাহার সত্তার একই সত্য বলিয়া অনুভব করেন। তাহার জ্ঞানের স্বাধীনতার অর্থ মিথ্যা বা ভ্রমের অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা নহে, কেননা মনের মত জ্ঞানে পৌঁছিতে হইলে ভ্রান্তির সম্ভাবনার ভিতর দিয়া সাধনা করিয়া তাহাকে চলিতে হয় না; পক্ষান্তরে এইভাবের উন্মার্গগমন বিজ্ঞানময় প্রকৃতি হইতে স্খলনই সূচিত করে, ইহাতে তাহার আত্মসত্য খর্ব্ব হইয়া পড়ে ইহা তাহার সত্তার পক্ষে বিজাতীয় এবং অনিষ্টকর, কেননা তাহার স্বাধীনতা আলোকেরই স্বাধীনতা, অন্ধকারের নহে। তেমনি তাহার কর্ম্মের স্বাধীনতা অনৃত সঙ্কল্প বা অবিদ্যার আবেগবশতঃ যথেচ্ছাচার নহে, কেননা তাহাও তাহার সত্তার পক্ষে বিজাতীয়, তাহাতে তাহার স্বভাবের সঙ্কোচ এবং

সঙ্কীর্ণতাই ঘটে, তাহা তাহার প্রমুক্ত স্বভাব নহে। মিথ্যা এবং অনৃত সঙ্কল্পকে সার্থক করিবার গতি বা আবেগ কিরূপ তাহা তিনি অনুভব করিবেন কিন্তু সে আবেগ স্বাধীনতার দিকে চলিতেছে মনে করিবেন না, মনে করিবেন চিৎসত্তার স্বাধীনতার উপর তাহা এক বলপ্রয়োগ, এক আক্রমণ ও অধ্যারোপ, তাহার পরাপ্রকৃতির উপর একটা উপদ্রব, বিজাতীয় প্রকৃতির এক অত্যাচার।

অতিমানস চেতনা মূলতঃ এক ঋতচিৎ বা সত্য চেতনা, ইহার মধ্যে সত্তার সত্য এবং বস্তুর সত্য স্বাভাবিক এবং সাক্ষাৎ ভাবে বর্ত্তমান ; ইহা হইল অনন্তের এক শক্তি যাহা দ্বারা তিনি নিজেরই সকল সান্ত বস্তু বা ভাবকে জানেন এবং তাহাদিগকে ফুটাইয়া তোলেন, ইহা বিশ্বপুরুষের শক্তি যাহা দ্বারা তিনি তাহার অখণ্ড ও খণ্ড ভাবকে তাহার বিশ্বকে ও সকল ব্যষ্টি সত্তাকে জানেন এবং প্রকাশিত করেন ; সত্য তাহার স্বরূপসত্তার বিত্ত, তাই অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের মত তাহাকে সত্য খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না অথবা তাহা হারাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনাও নাই। উন্মিষিত বিজ্ঞানময় পুরুষ অনন্ত এবং বিশ্বপুরুষের এই সত্য-চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হইবেন এবং তাহার জন্য তাহার মধ্যে এই ঋত চেতনাই তাহার ব্যষ্টি ভাবের সকল দর্শন ও ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিবে। তাহার চেতনা বিশ্বচেতনার সহিত একীভূত বলিয়া তাহাতে সত্যজ্ঞান, সত্য দৃষ্টি, সত্য অনু-ভূতি, সত্য সঙ্কল্প, সত্য বোধ এবং ক্রিয়ার সত্যশক্তি স্বভাবতঃ নিত্য বর্ত্তমান থাকিবে, পরম একের সহিত এক বলিয়া এ সমস্ত স্বাভাবিকভাবে তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে অথবা সর্ব্বের সহিত এক বলিয়া তাহারা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে জাগিয়া উঠিবে। মনোময় ভাবনার বিধান এবং প্রাণ ও দেহের কামনা ও প্রয়োজনের বিধান হইতে মুক্ত হইয়া পরিবেশে স্থিত জীবনের অধীনতার সকল পাশ ছিন্ন করিয়া তাহার জীবনের গতি অধ্যাত্ম স্বাধীনতা এবং বৃহত্তা ও বিস্তৃতির পর্ব্বে পর্ব্বে অগ্রসর হইবে ; যে দিব্যজ্ঞান এবং সঙ্কল্প নিজ ঋত চিতের বিধান অনুসারে তাহার উপর এবং তাহার মধ্যে ক্রিয়া করিবে, তাহার জীবন ও ক্রিয়াধারা তাহা ছাড়া আর কোন বিধি নিষেধে বদ্ধ থাকিবে না। মানুষের অহং বিবিক্ত এবং ক্ষুদ্র, ইহা অপরের উপর আপতিত হইবার, তাহা-দিগকে অধিকার এবং তাহাদের জীবন নিজ কার্য্যে লাগাইবার প্রয়োজন বোধ করে, এই জন্য বুদ্ধি দিয়া গড়া কোন বিধান না মানিয়া চলিলে অবিদ্যার মধ্য-স্থিত তাহার জীবনে সংঘর্ষ, যথেচ্ছাচার এবং অহমিকাজারিত বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে ইহা মনে করা হয়, কিন্তু বিজ্ঞানময় পুরুষের জীবনে

এমন কিছু থাকিতে পারে না ; কেননা অতিমানস সত্তার বিজ্ঞানময় ঋত চিতে সত্তার—সে সত্তা ব্যক্তি সত্তা বা কোন সমষ্টি সত্তা যাহাই হউক না কেন—সকল অঙ্গ এবং গতি-প্রবৃত্তির মধ্যে একটা সত্য সম্বন্ধ তাহার চেতনার সকল গতিতে এবং জীবনের সকল ক্রিয়াতে একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং জ্যোতির্ম্ময় একত্ব ও অখণ্ডত্ব অপরিহার্য্যরূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিবে। সেখানে আধারের এক অঙ্গের সঙ্গে অন্য অঙ্গের কোন বিরোধ থাকিতে পারে না, কেননা শুধু জ্ঞান এবং সঙ্কল্পময় চেতনা নহে, কিন্তু হৃদয়চেতনা, প্রাণচেতনা, এবং দেহচেতনা অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতির আবেগময়, প্রাণময় এবং অন্নময় অংশ সকল অখণ্ডতা ও একত্বের এই পূর্ণাঙ্গ সৌষম্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। আমাদের ভাষায় বলিতে পারি মন, হৃদয়, প্রাণ এবং দেহের উপর বিজ্ঞানময় পুরুষের অতিমানস জ্ঞান ও সঙ্কল্পের পরিপূর্ণ আধিপত্য ও প্রশাসন স্থাপিত হইবে ; কিন্তু পরিবর্ত্তনের সোপানে যখন পরাপ্রকৃতি নিজের ছাঁচে আমাদের সমস্ত অংশ এবং অঙ্গ পুনরায় ঢালাই করিতেছে তখনই শুধু এ বিবরণ খাটে ; একবার রূপান্তর সিদ্ধ হইলে প্রশাসনের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, কেননা তখন সকলকে লইয়া এক অখণ্ড চেতনার প্রতিষ্ঠা হইবে এবং সে চেতনা একত্ব এবং পূর্ণাঙ্গতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশের মধ্যে অখণ্ডরূপেই ক্রিয়া করিবে।

বিজ্ঞানময় পুরুষের মধ্যে অহং-এর আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং পরম অহং-এর প্রশাসনের মধ্যে কোন বিরোধ নাই ; কারণ বিজ্ঞানময় ব্যষ্টি পুরুষ তাহার জীবনের কর্ম্মে যেমন তৎক্ষণাৎ নিজেকে, নিজসত্তার সত্যকে প্রকাশ করিবেন তেমনি সেই সঙ্গে দিব্য পুরুষের ইচ্ছাকেও রূপায়িত করিবেন, কেননা তিনি জানিবেন যে দিব্য পুরুষই তাহার খাঁটি আত্মা, তাহার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের উৎস এবং উপাদান, তাহার প্রতি কর্ম্ম ও আচরণের প্রেরণা যুগপৎ আসিবে এই যুগল উৎস হইতে কিন্তু বস্তুতঃ এ দুই দুই নয় একই গতিপ্রদ শক্তি। এই প্রেরণার শক্তি প্রতি পরিস্থিতিতে সেই পরিস্থিতির সত্যের অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি-সত্তাতে তাহার প্রয়োজন, প্রকৃতি এবং সম্বন্ধের অনুযায়ী হইয়া প্রতি ঘটনায় সেই ঘটনার উপর দিব্য ভাগবতী ইচ্ছার যে দাবি আছে তদনুরূপভাবে ক্রিয়া করিবে, কারণ এখানে যাহা কিছু ঘটিবে তাহার মূলে থাকিবে একই মহাশক্তির বহুমুখী নানা বীর্য্যের জটিল এক সমাহার ও এক নিবিড় গ্রন্থি, বিজ্ঞানময় চেতনা এবং সত্য সঙ্কল্প এই সমস্ত শক্তির, তাহাদের প্রত্যেকের এবং এক যোগে সকলের সত্য জানিবে এবং তাহার মধ্য দিয়া দিব্য পুরুষের

সংকল্পিত সিদ্ধি মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সে চেতনা ও সংকল্প এই শক্তি-ব্যূহের উপর প্রয়োজনমত অভিঘাত বা হস্তক্ষেপ করিবে—শুধু যেটুকু প্রয়োজন ততটুকু, একটুও কম বা একটুও বেশী নয়। যে পরম একত্ব সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, যাহা সব কিছুকে শাসিত করিতেছে, সকল বহুত্বের মধ্যে সৌষম্য আনিতেছে তাহার জন্য, নিজের পৃথক আত্মপ্রতিষ্ঠায় একান্ত উন্মুখ অহং-এর কোন খেলা বিজ্ঞানশাসিত এই জগতে থাকিতে পারে না ; বিজ্ঞানময় পুরুষের আত্ম সঙ্কল্প হইবে ঈশ্বরেরই সত্য সঙ্কল্প ; তাহা ভেদভাবের অহং-এর কোন বিবিক্ত বা বিরোধী ইচ্ছা নহে। সে সঙ্কল্পের মধ্যে কর্ম্ম ও তাহার ফলের আনন্দ থাকিবে কিন্তু তাহার মধ্যে অহং-এর কোন দাবি, কর্ম্মে কোন আসক্তি বা কর্ম্মফলের জন্য কোন আকাঙক্ষা থাকিবে না ; যাহা করিতে হইবে বলিয়া দেখিয়াছে এবং করিবার প্রেরণা পাইয়াছে সে সংকল্প তাহা করিয়াই যাইবে। মনোময় প্রকৃতিতে আত্মপ্রচেষ্টা এবং ঈশ্বরেচ্ছার আনুগত্যের মধ্যে একটা বিরোধ একটা বৈসাদৃশ্য দেখা দিতে পারে, কেননা সেখানে ব্যষ্টি পুরুষ বা ব্যবহারিক সত্তা পরমপুরুষের সত্তা, ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্ব হইতে নিজেকে পৃথক মনে করে ; কিন্তু এখানে পুরুষ সেই পরম সত্তারই সত্তা, তাই এখানে বিরোধ বা বৈসাদৃশ্যের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। এ পুরুষের ক্রিয়া এ পুরুষের মধ্যস্থ ঈশ্বরেরই ক্রিয়া, যিনি বহুর মধ্যে এক তাহারই ক্রিয়া ; সুতরাং এখানে পৃথকভাবে নিজের ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা অথবা নিজ স্বাতন্ত্র্যবোধের অভিমানের কোন স্থান নাই।

দিব্য জ্ঞান এবং শক্তি, ভগবানের পরাপ্রকৃতি বিজ্ঞানময় পুরুষের মধ্য দিয়া কাজ করিতেছে এবং তিনিও সে ক্রিয়ায় পূর্ণভাবে নিজেকে মিলাইয়া দিয়াছেন এই তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানময় পুরুষের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইবে ; এই অদ্বৈতানুভূতিই তাহাকে স্বাধীনতা দান করিবে। 'অধ্যাত্ম পুরুষ বিধি-নিষেধের এমন কি ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত' এই যে উক্তি প্রায়ই শোনা যায় তাহার মূলে আছে তাহার সঙ্কল্পের সহিত শাশ্বত সত্তার সঙ্কল্পের এই একত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। তাহার কাছে কোন মনোময় আদর্শের স্থান থাকিবে না, কেননা সে আদর্শের আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না ; তাই তাহার স্থান অধিকার করিবে দিব্যপুরুষ এবং সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মতার মৌলিক ও উচ্চতর বিধান। বিজ্ঞানময় পুরুষের ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতার কোন প্রশ্ন, নিজের এবং অপরের বলিয়া কোন কথা উঠিবে না, কেননা সেখানে সকলের মধ্যে এক আত্মা দেখা দিবেন এবং সকলের সঙ্গে একাত্মতাই সাক্ষাৎভাবে

অনুভূত হইবে—এবং সেই পরম সত্য ও শিবস্বরূপ যাহা স্থির করিবেন কেবল তাহাই কৃত হইবে। তাহার ক্রিয়ার মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া এক সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিশ্বব্যাপী প্রেম, করুণা এবং একাত্মবোধের অনুভব বর্ত্তমান থাকিবে কিন্তু সে অনুভব তাহার কর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইবে তাহাকে অনুরঞ্জিত এবং প্রাণময় করিয়া তুলিবে; তাহা দ্বারা সে কর্ম্ম কেবল যে প্রশাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা নহে; এ অনুভব শুধু নিজের জন্য বস্তুর বৃহত্তর সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে না অথবা দিব্য সঙ্কল্পের খাঁটি গতিপথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য কোন আবেগ-তাড়িত প্ররোচনা তাহার থাকিবে না। এই ভাবের বিরোধ এবং বিচ্যুতি অবিদ্যার জগতেই ঘটিতে পারে, সেখানে প্রেম কি অন্য কোন বীর্য্যবান তত্ত্ব যেমন জ্ঞান হইতে তেমনি শক্তি হইতে বিযুক্ত হইয়া দেখা দিতে পারে; কিন্তু অতিমানস বিজ্ঞানে সকল শক্তিই পরস্পরের অন্তরঙ্গ এবং সকলে মিলিত হইয়া এক শক্তিরূপেই ক্রিয়া করে। বিজ্ঞানময় পুরুষে সত্য জ্ঞানই সকল ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে এবং অন্য সকল শক্তি ক্রিয়াতে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবে; তাহার প্রকৃতিতে বিভিন্ন শক্তির বা বৃত্তির মধ্যে বিরোধ বা অসামঞ্জস্য থাকিতেই পারিবে না। সকল কর্ম্মের মধ্যে সত্তার এক অমোঘ প্রেরণা আত্মসম্পূর্ত্তি চায়; আজিও যাহার প্রকাশ হয় নাই সত্তার তেমন সত্যকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে, অথবা যে সত্য প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছে তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে, বৃদ্ধি করিতে এবং পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে; আর যদি তাহা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে তবে তাহার মধ্যে সত্তার আনন্দ বা আত্মপ্রস্ফুরণের উল্লাস আস্বাদন করিতে হইবে ইহাই তাহার দিব্য প্রেরণা। অবিদ্যার আধা আলোক এবং আধা শক্তির মধ্যে এ প্রেরণা গুপ্ত থাকে অথবা শুধু অল্পমাত্র প্রকাশ পায়, তাহার পূর্ণতা এবং প্রস্ফুরণের জন্য সাধনা হয় অপূর্ণ, দ্বন্দ্বসঙ্কুল এবং অংশতঃ পর্য্যুদস্ত; কিন্তু বিজ্ঞানময় সত্তায় এবং জীবনে সত্তার সকল প্রেরণা অন্তরে অনুভূত হইবে, বোধে অন্তরঙ্গভাবে ভাসিয়া উঠিবে এবং কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইবে; তাহাদের সকলের স্বাধীন খেলা চলিবে; পরিবেশের সত্য এবং পরাপ্রকৃতির অভিপ্রায়ের অনুরূপভাবে তাহা সিদ্ধ হইবে। এ সমস্তই জ্ঞানে দৃষ্ট হইবে এবং কর্ম্মের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে; ক্রিয়াশীল শক্তি-সমূহের মধ্যে কোন অনিশ্চিত সংঘর্ষ বা পরস্পর পীড়ন থাকিবে না; সে পুরুষে সত্তার মধ্যে অসামঞ্জস্য, চেতনার মধ্যে পরস্পর বিরোধী ক্রিয়ার কোন স্থান থাকিবে না; যেখানে সত্য

এই সহজভাবে অন্তরে বর্ত্তমান আছে এবং প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে তাহার স্বতঃ-স্ফুরণ চলিতেছে সেখানে বহিশ্চর মনদ্বারা গঠিত যান্ত্রিক কোন বিধানের আরোপ একেবারেই অনাবশ্যক। কর্ম্মে সৌষম্য দেখা দিবে, দিব্য অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে, বস্তুর সত্যে যে দিব্য প্রেরণা আছে তাহা সফল হইবে—ইহাই বিজ্ঞানময় পুরুষের সমগ্র জীবনের বিধান এবং স্বাভাবিক বীর্য্য।

পূর্ণাঙ্গ সত্তার শক্তিসকল ব্যবহার করিয়া একাত্মজ্ঞান দ্বারা পুরুষের বিভূতিকে দিব্য সাধনের ঐশ্বর্য্যে রূপান্তরিত করাই অতিমানস জীবনের তত্ত্ব। বিজ্ঞানময় চেতনার অন্যান্য স্তরে যদিও আধ্যাত্মিক সত্তা এবং চেতনার সত্য নিজেকে সার্থক করিয়া তোলে তবু তথায় ক্রিয়া বা সাধনের উপকরণ হয় ভিন্ন প্রকারের। উত্তরমানসময়-পুরুষ মননের ভাব বা ভাবনার সত্যের মধ্য দিয়া সাধনা এবং সেই সত্যকেই জীবনের ক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন; কিন্তু অতিমানস বিজ্ঞানের ভূমিতে মনন বা ভাবনা একটি উদ্ভূত বস্তু, একটি জন্যবৃত্তি মাত্র, এ মনন সত্যদৃষ্টির এক রূপায়ণ কিন্তু নিয়ামক বা মুখ্য পরিচালক শক্তি নয়; মনন জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার সাধন বা যন্ত্র যতটা, জ্ঞান লাভ অথবা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সাধন ততটা নয়,—অথবা একত্বের জ্ঞান ও সঙ্কল্পের একটা সূচীমুখ-রূপে শুধু ইহা ক্রিয়াশক্তির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে। তেমনি নিম্নতর বিজ্ঞানভূমিস্থ জ্যোতির্ম্মানসময়-পুরুষে সত্য দৃষ্টি এবং সে ভূমির সম্বোধিময়-পুরুষে সাক্ষাৎ সত্য সংস্পর্শ এবং সত্যবোধ বা অনুভূতিই হইবে কর্ম্মের প্রধান উৎস। অধিমানস বিজ্ঞানে আছে বস্তুর সত্য, প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ-তত্ত্ব এবং তাহার সক্রিয় সকল পরিণামের মর্ম্মগ্রহণের এক সর্ব্বতোগ্রাহী সাক্ষাৎ শক্তি এবং তাহা হইতে বিজ্ঞানময় দৃষ্টি ও মননের এক বিপুল প্রসার জাত ও সংগৃহীত হয় এবং তাহাই তাহার জ্ঞান ও ক্রিয়ার ভিত্তি স্থাপন করে; অধিমানস সত্তার দৃষ্টি (বা জ্ঞান) ও কর্ম্মের এই অতি বিপুলতা তাহার ভিত্তিরূপে স্থিত একত্ব-চেতনার বহু বৈচিত্র্যময় ফল বটে কিন্তু তথায় চেতনার স্বরূপ উপাদান বা ক্রিয়ার স্বরূপশক্তিরূপে এই একত্ববোধ চেতনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় না। কিন্তু অতিমানস বিজ্ঞান ভূমিতে বস্তু-সত্যের এই সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় সাক্ষাৎ প্রকৃতি বা মর্ম্মাবগতি, এই সত্য অনুভূতি, সত্য দৃষ্টি এবং সত্য মনন উৎস-মূলে একত্ব চেতনায় ফিরিয়া যাইবে এবং সেখানে এক অখণ্ড জ্ঞানরূপে বর্ত্তমান আছে দেখা যাইবে। এই একত্ব চেতনাই হইবে সব কিছুর নিয়ামক ও নেতা এবং সব কিছুই তাহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, এই একত্বচেতনা সত্তার সকল উপাদানে

তাহার অনুপরমাণুতে জ্ঞানরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহার মধ্যে নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার যে স্বাভাবিক শক্তি আছে তাহা ফুটাইবে এবং সক্রিয় ও বীর্য্যবন্তভাবে চেতনা এবং কর্ম্মের বিশিষ্ট রূপায়ণে নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তুলিবে। এই স্বভাবসিদ্ধ একত্বজ্ঞানই অতিমানস বিজ্ঞানের ক্রিয়াধারার মূল উৎস এবং তত্ত্ব; ইহা নিজেতেই নিজে পূর্ণ, ইহাকে রূপায়িত বা মূর্ত্ত করিতে অন্য কিছুরই প্রয়োজন হইবে না; তবু তাহার মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় দিব্য দর্শন অথবা আলোকময় দিব্যমনন প্রভৃতি অধ্যাত্ম চেতনার অন্য সকল গতি বা বিভূতির খেলার কোন অভাব থাকিবে না, তাহাদের নিজেদের উজ্জ্বল ক্রিয়াধারার জন্য দিব্য ঐশ্বর্য্য এবং বৈচিত্র্য প্রকাশের জন্য আত্ম বিসৃষ্টির বহুমুখী আনন্দের জন্য অনন্তের শক্তিসকলের উল্লাসের জন্য এ সমস্ত বিভূতি তথায় থাকিবে এবং প্রমুক্ত সাধন বা যন্ত্ররূপে ক্রিয়া করিবে। বিজ্ঞানময় চেতনার প্রগতির পথে মধ্যবর্ত্তী ধাপরূপে দিব্য পুরুষ এবং তাহার প্রকৃতির নানা বিভাবের পৃথক এবং বিচিত্র আত্মপ্রকাশ হইতে পারে; প্রেমের আত্মা এবং জীবন, দিব্য আলোক এবং জ্ঞানের আত্মা ও জীবন, দিব্য শক্তি ও তাহার অবাধ ক্রিয়া এবং বিসৃষ্টির আত্মা ও জীবন এবং দিব্য জীবনের আরও অগণিত রূপ দেখা দিতে পারে; অতিমানসের উচচ ভূমিতে বৈচিত্র্যময় পরম একত্বের মধ্যে সত্তা এবং জীবনের চরম পূর্ণাঙ্গতায় সব কিছুই গৃহীত হইবে। সত্তার সকল অবস্থা বা বিভাব এবং শক্তির জ্যোতিরুজ্জ্বল আনন্দময় সমাহারে এবং তাহাদের আত্মতৃপ্ত নিরঙ্কুশ ক্রিয়াধারায় সত্তার পরিপূর্ণতা লাভই হইবে বিজ্ঞানময় এই জীবনের তাৎপর্য্য।

সকল অতিমানস বিজ্ঞানে ঋতচিতের দুইটি ধারা আছে, একটি স্বভাবসিদ্ধ আত্মজ্ঞানের স্বরূপগত চেতনা এবং অপরটি আত্মা ও জগতের একত্ববোধজাত একটা অন্তরঙ্গ জগৎ-জ্ঞানের চেতনা, এই আত্মজ্ঞান এবং জগৎ-জ্ঞানের যুগপৎ প্রস্ফুরণই বিজ্ঞানময় চেতনার মানদণ্ড এবং অনন্যসাধারণ বিশিষ্ট শক্তি। কিন্তু এ জ্ঞান বিশুদ্ধ মানবধর্ম্মী সামান্যজ্ঞান মাত্র নহে, যে প্রাকৃত চেতনা পর্য্যবেক্ষণ করে ভাব বা ধারণা গড়িয়া তোলে এবং তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে চায় ইহা সে চেতনা নহে; ইহা চেতনার এক স্বরূপগত আলোক, সত্তা ও সম্ভূতির সকল সত্যের আত্ম-জ্যোতি, যে সত্তা নিজেকে নিজে বিশেষিত রূপায়িত এবং স্ফুরিত করিয়া তুলিতেছে ইহা তাহারই আত্ম-সত্য; বিসৃষ্টির বা প্রকাশের উদ্দেশ্য- হওয়া, জানা নয়; জ্ঞান সত্তার সক্রিয় চেতনার একটা সাধন বা যন্ত্র

মাত্র। ইহাই হইবে পৃথিবীতে বিজ্ঞানময় জীবন—ঋতচিন্ময় সত্তার প্রকাশ বা খেলা ; সে সত্তার মধ্যে সর্ব্বাত্মভাবের পূর্ণ চেতনা বিদ্যমান থাকিবে ; প্রাকৃত জীবের মত তাহার চেতনা আত্মহারা হইয়া পড়িবে না, রূপে এবং ক্রিয়াতে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িবার জন্য তাহাতে নিজের স্বরূপের বিস্মৃতি বা অর্ধ-বিস্মৃতি ঘটিবে না ; কিন্তু তাঁহার প্রমুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা রূপ ও ক্রিয়াকে তাহার নিজের স্বতন্ত্র এবং পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের জন্যই তিনি ব্যবহার করিবেন ; তাঁহাকে নিজের হারানো বা বিস্মৃত বা আবৃত এবং গোপন তাৎপর্য্য অথবা তাৎপর্য্যসকল খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না ; তিনি আর বদ্ধ নহেন, নিশ্চেতনা এবং অবিদ্যার হাত হইতে চিরমুক্ত, নিজের সত্য এবং শক্তি অবগত, তাঁহার সকল গতি বিশ্বাতীত এবং বিশ্বগত সত্য বস্তুর গতির সহিত পূর্ণরূপে একীভূত, তাঁহার জীবনের তুচ্ছতম তন্ত্রীটি পর্য্যন্ত সেই পরম তত্ত্ব এবং বিশ্বগত সত্যের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা বলিয়া তিনি স্বাধীনভাবে তাঁহার জীবনের সকল উপাদানের, সকল চেতনার, সকল শক্তির, সকল আনন্দের খেলা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করিবেন।

বিজ্ঞানময় পরিণামে চেতনা শক্তি এবং আনন্দের নানা স্থিতি, নানা অবস্থা, সুষমা-মণ্ডিত নানা ভাবের ক্রিয়া-ধারা দেখা দিবে। পরিণামশীল অতিমানসে নিজের তুঙ্গ শিখরে অধিকতর অধিরোহণের পথে স্বাভাবিকভাবে কালক্রমে আরও অনেক স্তর প্রকাশ পাইবে, কিন্তু তাহাদের সকলের মধ্যে একটা সাধারণ ভিত্তি ও তত্ত্ব থাকিবে। চিৎসত্তার আত্মপ্রকাশে নিজের সব কিছু জানিয়াও সত্তার সাক্ষাৎ সমগ্রশক্তি এবং আত্মপ্রকাশের সবখানিকে প্রকাশের ক্ষেত্রে বাস্তবিক রূপায়ণ ও ক্রিয়ার মধ্যে পুরোভাগে স্থাপিত করিতে অতিমানস পুরুষ বাধ্য নহেন, তাঁহার আত্মপ্রকাশের মধ্যে নিজ সত্তার একটি পাদ মাত্র সম্মুখে রাখিয়া বাকী সমস্তটা আত্মসত্তার অব্যক্ত আনন্দের মধ্যে অন্তর্গূঢ়ভাবে রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু পশ্চাতে অবস্থিত সেই সর্ব্ব এবং তাঁহার আনন্দ বহিঃপ্রকাশের পুরোভাগে ও মধ্যে নিজেকে পূর্ণরূপে দেখিতে ও জানিতে পারিবেন, এবং আপন সত্তার সান্নিধ্য এবং অখণ্ডতা ও অনন্তের অনুভূতির দ্বারা সে বিসৃষ্টি বা সে প্রকাশকে পরিপ্লাবিত ও স্বপ্রতিষ্ঠ করিবেন। এইভাবে পুরোভাগে রূপায়িত হওয়া এবং বাকী সব কিছুকে সে রূপায়ণের পশ্চাতে তাহার মধ্যস্থিত শক্তিদ্বারা ধারণ করিয়া রাখা, আত্মজ্ঞানেরই ক্রিয়া, অবিদ্যার নয় ; ইহা অতি-চেতনারই এক জ্যোতির্ম্ময় আত্মপ্রকাশ, নিশ্চেতনার কোন উৎক্ষেপ নয়।

অতএব বিজ্ঞানময় চেতনা এবং জীবনের পরিণামে সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতার উপাদানরূপে অফুরন্ত বৈচিত্র্যের একটা পরম সুষমাময় ছন্দ থাকিবে। এমন কি তাহার চারিদিকে যে অবিদ্যাশ্রিত মন অথবা বিজ্ঞানময় পরিণামের যে নিম্নতর পর্ব্বসকল থাকিবে তাহাদের সহিত কারবারে অতিমানস জীবন নিজ সত্তার সত্যের এই স্বভাবসিদ্ধ শক্তি ও গতি ব্যবহার করিবে ; সেই পূর্ণাঙ্গ সত্যের আলোকে ইহা নিজ সত্তার সত্যের সহিত অবিদ্যার অন্তরালে অবস্থিত সত্তার সত্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিবে ; তাহার সব সম্বন্ধই সকলের মধ্যস্থিত চিন্ময় একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রকাশের নানা বৈচিত্র্যকে স্বীকার এবং সকলকে সুষমা ও সামঞ্জস্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। বিজ্ঞানময় চেতনার আলোক সর্ব্বত্র বস্তু ও ভাবের মধ্যে খাঁটি সম্বন্ধ দেখিতে পাইবে এবং তাহাদের পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার খাঁটি রূপ প্রতিষ্ঠিত করিবে ; বিজ্ঞানময় শক্তি বা প্রভাব পরিণত এবং অপরিণত জীবনের মধ্যে খাঁটি সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, এক বৃহত্তর সুর-সঙ্গতির মধ্যে তাহাদিগকে সফল করিয়া তুলিবে এবং নিজের প্রভাবে নিম্নতর জীবনধারার উপর এক বৃহত্তর সৌষম্য আরোপ করিবে।

যেখানে পরিণামের ধারা অধিমানসের সীমা পার হইয়া অতিমানস বিজ্ঞানে পৌঁছিবে সেই পর্য্যন্ত আমাদের মনোময় ধারণা দিয়া তাহার যতটা আমরা দেখিতে পারি তাহাতে মনে হয় বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুষের সত্তা, জীবন ও ক্রিয়াধারার প্রকৃতি এইরূপই হইবে। বিজ্ঞানময় পুরুষগণের ব্যষ্টি এবং সমষ্টি জীবনের সকল সম্বন্ধ স্পষ্টতঃ বিজ্ঞানের এই প্রকৃতি দ্বারা নিরূপিত এবং নিয়ন্ত্রিত হইবে ; কেননা সত্যচেতনা যেমন বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুষের আত্মশক্তি তেমনি সেই সত্যচেতনা বিজ্ঞানময় সঙ্ঘেরও সঙ্ঘগত আত্মশক্তি ; এই সঙ্ঘ বা গোষ্ঠীতেও ফুটিবে সেই এক সুরে গাঁথা জীবন ও কর্ম্মের পূর্ণাঙ্গতা, সর্ব্বসত্তার একত্ববোধের সেই সচেতন সিদ্ধ অনুভব, সেই একই স্বতঃস্ফূর্ত্ততা এবং অন্তরঙ্গভাবে অনুভূতির একত্ব, নিজ আত্মা এবং অন্য সকলের এক ও সম্মিলিত সত্য দৃষ্টি এবং সত্য বোধ ; ব্যষ্টির সহিত ব্যষ্টির, সমষ্টির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধে একই সত্য ক্রিয়া ; এই সঙ্ঘ যন্ত্রচালিত বস্তুসকলের মধ্যে যেরূপ একটা যৌথবৃত্তি থাকে সেরূপ ভাবে এক হইবে না সেখানে দেখা দিবে এক আধ্যাত্মিক একত্ব বা-অখণ্ডত্ব। বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিজীবনের মত সঙ্ঘ জীবনেও স্বাতন্ত্র্য এবং নিয়মের এক অপরিহার্য্য মিলনই হইবে জীবনের বিধান ; দিব্য আত্মাসকলের মধ্যে অনন্তের বহুবিচিত্র খেলাই যেমন হইবে সে স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ, তেমনি সকল আত্মার সচেতন একত্ববোধ,

অতিমানস অনন্তেরই যাহা বিধান, তাহাই হইবে তাহার নিয়ম। আমাদের মন একত্ব অর্থে একাকার হওয়া বুঝে; মনে করে সব কিছুকে একই ছাঁচে ঢালিতে পারিলেই পূর্ণ একত্ব স্থাপিত হইবে, তাহার সঙ্গে পার্থক্যের গৌণ ছায়া শুধু থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বহুত্বের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য এবং সমারোহের ভিতর দিয়া একেরই আত্মপ্রকাশ হইবে বিজ্ঞানময় জীবনের বিধান। বিজ্ঞানময় চেতনায় পার্থক্যবোধ বিরোধ আনয়ন করে না, ফুটাইয়া তোলে এক ভাবকে অপরের সহিত মিলাইবার সহজ নৈপুণ্য; সেখানে বৈচিত্র্য সমগ্রের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের পরিপূরক; সঙ্ঘগত ভাবে যাহা জানিতে করিতে বা জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে সেখানে সমৃদ্ধ ও বহুমুখী ভাবে তাহা সংসাধিত হইবে। কেননা প্রাকৃত মনে এবং জীবনে অহং-এর জন্যই বাধা দেখা দেয়, অহং-ই অখণ্ডকে, পূর্ণকে বহু ভগ্নাংশে বিভক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে বৈষম্য বিরোধ এবং অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে; তথায় বহুধা প্রকাশের মধ্যে পরস্পরে যাহা কিছু ভেদ আছে তাহা সহজেই অনুভূত ও স্থাপিত হয় এবং সেই ভেদের উপরই জোর দেওয়া হয়; যাহাতে সকলে মিলিত হয়, যাহা বহুত্বকে এক যোগসূত্রে বাঁধিয়া রাখে তাহা প্রায়ই দেখা যায় না, অথবা বহু কষ্টে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; যাহা কিছু করিতে হইবে তাহার জন্য ভেদের বাধাকে জোর করিয়া জয় করিতে হয় অথবা সে ভেদের সহিত আপোষ রফা করিয়া চলিতে, একটা কৃত্রিম একত্ব গড়িয়া তুলিতে হয়। অবশ্য সব কিছুর ভিত্তিরূপে একত্বের একটা তত্ত্ব আছে, প্রকৃতি তাই নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে একটা একত্বকে গড়িয়া তুলিতে এবং পরিস্ফুরিত করিতে চায়; কেননা প্রকৃতির মধ্যে যেমন ব্যষ্টি ও অহংগত চেতনা আছে তেমনি সামাজিক ও সঙ্ঘ-গত চেতনাও আছে এবং তাহার পরিস্ফুরণের জন্য আছে আসঙ্গলিপ্সা, সহানু-ভূতি, স্বার্থ এবং প্রয়োজনে সমতা, আকর্ষণ ও আত্মীয়তাবোধ এবং প্রয়োজন হইলে বলাৎকার দ্বারা ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা; কিন্তু তাহার অহংশাসিত জীবন ও প্রকৃতির তাগিদ তত্ত্বহিসাবে গৌণ এবং আরোপিত বস্তু হইয়াও এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে একত্ব জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সকল সাধনা, সকল কর্ম্মকে অপূর্ণ ও অনিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহা ছাড়া বোধিচেতনা এবং অন্তরের সাক্ষাৎ সংস্পর্শের অভাব অথবা বরং অপূর্ণতার জন্য প্রত্যেক বিবিক্ত সত্তার পক্ষে অপরের সত্তা ও প্রকৃতিকে জানা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে, পরস্পরকে বুঝিতে পরস্পরের সহিত মিলিত ও সামঞ্জস্যে

প্রতিষ্ঠিত হইতে গিয়া আমাদিগকে বাহিরের উপর নির্ভর করিতে হয়, অন্তরের দিক দিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যয় ও সংস্পর্শের সহায়তা পাই না ; তাহার ফলে সকল প্রকার প্রাণ ও মনের বিনিময়ে বাধা পড়ে, সব কিছু অহন্তার দ্বারা কলুষিত হইয়া যায় এবং পরস্পরের মধ্যস্থিত অবিদ্যার আবরণের জন্য অপূর্ণ ও অনিশ্চিত হইতে বাধ্য হয়। বিজ্ঞানময় সত্ত্ব-জীবনে সর্ব্বাবগাহী ও সর্ব্ব-সমন্বয়ী সত্যানুভূতি এবং বিজ্ঞানময় প্রকৃতির সুরসঙ্গতি-স্থাপনক্ষম একত্ব বোধের মধ্যে সকল বিভেদ ও বৈচিত্র্য নিজেরই ঐশ্বর্য্যরূপে বর্ত্তমান থাকিবে এবং ভাবনা ক্রিয়া ও অনুভূতির অন্তহীন বৈচিত্র্যকে সংহত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় এক পরিপূর্ণ জীবনের অখণ্ডতাকে প্রকাশ করিবে। ইহাই হইল ঋতচেতনার স্বরূপ প্রকৃতির এবং তাহার সাহায্যে সর্ব্বসত্তার চিন্ময় একত্বের সাক্ষাৎ উপ-লব্ধির সুস্পষ্ট তত্ত্ব এবং অপরিহার্য্য পরিণাম। এই উপলব্ধি হইতেই জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার উপায় পাওয়া যায়, কিন্তু মনের ভূমিতে দাঁড়াইয়া এ উপলব্ধি লাভ করা অতি দুরূহ কিম্বা এ অনুভূতি আসিলেও ইহাকে সংহত এবং বীর্য্যবন্ত করিয়া তোলা আরও কঠিন ; কিন্তু বিজ্ঞানময় জীবনে এবং বিজ্ঞানময় সকল বিসৃষ্টিতে এই সিদ্ধ অনুভব স্বাভাবিক ও সহজভাবে নিজেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত-রূপে সংহত এবং বীর্য্যবন্ত হইয়া উঠিবে।

যদি মনে করি বিজ্ঞানময় পুরুষগণ অবিদ্যার জীবনের সহিত কোন সংস্পর্শে না আসিয়া তাঁহাদের আপন জীবন যাপন করেন তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে এই যাহা বলা হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এখানে পরিণামের সহজ ধারার মধ্যে বিজ্ঞানময় চেতনার প্রকাশ একটা বিশেষ ঘটনা, যদিও তাহা সমগ্রতার মধ্যে সে ধারাকে এক নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত করিবে ; তখনও জীবন ও চেতনার নিম্নতর ভূমিসকল বর্ত্তমান থাকিবে ও সে ভূমির কয়েকটির মধ্যে অবিদ্যার প্রকাশ বজায় থাকিবে, অবিদ্যার প্রকাশ এবং বিজ্ঞানময় প্রকাশ এ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায়ও কয়েকটি ধারা থাকিবে ; সত্তা এবং জীবনের এই দুই ধারা হয় পাশাপাশি অথবা ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত হইবে। এ দুই-এর যাহাই হউক না কেন, তখনই না হইলেও অবশেষে বিজ্ঞানময় তত্ত্বই সকলকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে ইহা আশা করা যায়। তখন আধ্যাত্মিক-মননের উচ্চতর স্তরসকল, এই সময় যাহা প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে আশ্রয় দিতেছে বা একত্রে ধারণ করিয়া রহিয়াছে সেই অতিমানস তত্ত্বের সংস্পর্শে আসিবে ; ফলে, অবিদ্যা ও নিশ্চেতনার আবরণকারী যে প্রভাবের

এতদিন অধীন ছিল তাহা হইতে তাহারা মুক্ত হইবে। যদিও এই সমস্ত স্তরে সত্তার স্বরূপ-সত্যের বিশিষ্ট এবং কুণ্ঠিত রূপায়ণ ঘটে তবু তাহারা এইবার অতিমানস বিজ্ঞান হইতেই তাহাদের সকল আলোক এবং বীর্য্য গ্রহণ করিবে এবং অধিকতরভাবে অতিমানসেরই কার্য্যকরী শক্তিসকলের সংস্পর্শে আসিবে; তাহারা যে চিৎপুরুষের সাধনা ও ক্রিয়ার শক্তি এই চেতনা তাহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে; এবং সিদ্ধ আধ্যাত্মিক উপাদানের পরিপূর্ণ শক্তিরূপে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত না হইলেও নিশ্চেতন উপাদানের প্রভাববশতঃ তাহাদের সাধনবীর্য্য খর্ব্বিত, খণ্ডিত, মিশ্রিত এবং স্তিমিত হইয়া পড়িবে না। অধি-মানস, সম্বোধি, জ্যোতির্ম্মানস অথবা উত্তর মানসে যে অবিদ্যা উত্থিত হইবে বা প্রবেশ করিবে তাহা আর অবিদ্যা থাকিবে না; অবিদ্যা এবার আলোকের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং যাহাকে নিজের অন্ধকার দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল এই আলোকে সেই সত্যকে দেখিতে পাইবে, তখন সে মুক্তিলাভ করিয়া সত্তা এবং চেতনার নূতন এক অবস্থায় রূপান্তরিত হইবে; তখন সেই সত্তা ও চেতনা তাহাকে জীর্ণ করিয়া এই সমস্ত উচ্চতর অবস্থায় পরিণত করিবে এবং তাহাকে অতিমানস উত্তরায়ণের যোগ্য করিয়া তুলিবে। সেই সঙ্গে অতিমানস বিজ্ঞানের সংবৃত শক্তি জাগরিত ব্যক্ত এবং বীর্য্যবন্ত হইয়া সর্ব্বদা ক্রিয়া করিবে, পূর্ব্বের মত অন্তরালে থাকিয়া ক্রিয়া ও প্রকাশের প্রবর্ত্তনা দেওয়া, আবরণের আড়াল হইতে সর্ব্ববস্তুর আশ্রয় হওয়া অথবা ক্বচিৎ কখনও হস্তক্ষেপ করাই তাহার ক্রিয়াপদ্ধতি থাকিবে না—তাই অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনারূপে যাহা কিছু তখনও অবশিষ্ট থাকিবে অতিমানস তাহার উপর তাহার সৌষম্য এবং সামঞ্জস্যের বিধান কিছুটা আরোপ করিতে পারিবে। কেননা অতিমানসের এই বৃহত্তর শক্তির আশ্রয় ও প্রবর্ত্তনা লাভ করিয়া তাহার স্বাধীন এবং বীর্য্যবান মধ্যস্থতায় অবিদ্যা ও নিশ্চেতনার অন্তর্গূঢ় বিজ্ঞানময় শক্তিও জাগিয়া উঠিবে এবং ক্রিয়াশীল হইবে; বিজ্ঞানময় পুরুষগণের সঙ্গলাভ করিয়া বিজ্ঞানের আলোকে প্রভাবান্বিত এবং পার্থিব প্রকৃতিতে উন্মিষিত বীর্য্যবান অতিমানস সত্তা ও শক্তির সান্নিধ্য লাভ করিবার ফলে অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণও অধিকতর সচেতন হইবে, তাহাদের সাড়া দেওয়ার শক্তি বাড়িয়া যাইবে। মনুষ্য জাতির যে অংশে অতিমানস রূপান্তর ঘটিবে না, তাহার মধ্যেও মনোময় মানুষের এক নূতন এবং মহত্তর উপজাতি গড়িয়া উঠার খুবই সম্ভাবনা আছে; কেননা তখন বিজ্ঞান-বিভাবিত মনোময় সত্তার উন্মেষ না হইলেও

যাহাদের মধ্যে সম্বোধি বা জ্যোতির্ম্মানসের সাক্ষাৎ বা আংশিক প্রকাশ হইয়াছে অথবা উত্তর মানসের সহিত যাহাদের পূর্ণ বা আংশিক যোগ সাধিত হইয়াছে এমন মানবগণের আবির্ভাব ঘটিবে; ক্রমেই এইরূপ মানুষের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে, ক্রমেই তাহাদের অধিকতর আত্মোন্মেষ ঘটিবে; তাহারা এক নূতন প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে; এমন কি উচ্চতর মানবতার ধর্ম্ম লইয়া নূতন এক মানবজাতি হয়ত গড়িয়া উঠিবে, তাহারা সর্ব্বভূতে এক দিব্য পুরুষই আত্মপ্রকাশ করিতেছেন এই জ্ঞানজাত খাঁটি ভ্রাতৃত্ববোধে অনুপ্রাণিত হইয়া নিম্নাধিকারী মানুষকে উত্তরায়ণের পথে পরিচালিত করিবে। এইভাবে মানুষের মধ্যে যাহারা উচ্চতম তাহাদের পরম পুরুষার্থের চরম সিদ্ধির সঙ্গে মানবতার যে সমস্ত অংশ এখনও নীচে রহিয়াছে তাহারাও তাহাদের সাধ্যের যাহা চরম এমন অবস্থায় হয়ত পৌঁছিবে। অন্যদিকে পরিণামের উত্তর প্রান্তে দেখা দিতে থাকিবে অতিমানসের ক্রমোর্দ্ধ্ব শিখরপরম্পরা, যাহারা চরমে সচ্চিদানন্দের শুদ্ধ চিন্ময় সত্তা, চেতনা এবং আনন্দের যেখানে পরম প্রকাশ এমন এক ঊর্দ্ধ্বতম পরম ভাস্বর মহিমার দিকে উন্নীত হইয়া উঠিতে থাকিবে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যদি বিজ্ঞানময় এই যুগান্তর আসিয়া পড়ে যদি পরিণামের ধারা বিজ্ঞানময় ভূমিতে আরূঢ় হইয়া তাহাকেও পার হইয়া যায় তবে তাহার অর্থ কি এই হইবে না যে শীঘ্র বা বিলম্বে নিশ্চেতনা হইতে পরিণাম ধারাই লুপ্ত হইয়া যাইবে, কেননা তখন অন্ধকার হইতে যাত্রা করিবার প্রয়োজন অন্তর্হিত হইবে। এ বিষয়টির উত্তর আর একটি প্রশ্নের উপর নির্ভর করে; অতিচেতনা এবং নিশ্চেতনা, সত্তার এই দুইটি মেরুর মধ্যে যে গতি প্রবৃত্তি আছে ইহা কি জড়ময় বিসৃষ্টির নিত্য বিধান অথবা শুধু একটা সাময়িক ব্যাপার? ইহাকে সাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা দুরূহ, সমস্ত জড় জগতে নিশ্চেতনার ভিত্তি এমন ব্যাপক এবং স্থায়ীরূপে স্থাপিত করা হইয়াছে যে সে শক্তির প্রচণ্ড আবেগকে সাময়িক বা নৈমিত্তিক ব্যাপার বলিতে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে কুণ্ঠার উদয় হয়। পরিণামধারার আদিতত্ত্ব এই নিশ্চেতনার একেবারে উচ্ছেদ ঘটা অথবা তাহার ঠিক বিপরীত তত্ত্বে একেবারে রূপান্তরিত হওয়ার অর্থ এই হইবে—এই বিরাট বিশ্বব্যাপী নিশ্চেতনা যেখানে আছে তাহার প্রতি বিন্দুতে আজ যে চেতনা অন্তর্গূঢ় ও সংবৃত হইয়া আছে তাহার পরিপূর্ণ পরিস্ফুরণ হওয়া; পার্থিব পরিণামধারা বিশ্ব পরিণামের একটি বিশিষ্ট ধারা মাত্র, পৃথিবীর এইরূপ রূপান্তরে বিশ্বের সর্ব্বত্র

এই একই রূপান্তর দেখা দিবে এমন হইতে পারে না ; পার্থিব প্রকৃতিতে বিসৃষ্টির একটি বিশেষ ধারার প্রকাশ হইয়াছে, সেই ধারার সম্যক চরিতার্থতার কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এখানে এই পর্য্যন্ত সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে যখন পরিণামধারার শেষ ফলরূপে এক দিব্য সৃষ্টি আত্মপ্রকাশ করিবে অথবা চিন্ময় পুরুষের পরার্দ্ধের তত্ত্বসকল যখন এখানে অপরার্দ্ধের ত্রিতত্ত্বের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে, তখন মর্ত্ত্যপরিণামের পর্ব্ব-পরম্পরা বা তাহাদের প্রকাশের তারতম্য পূর্ব্বের মতই থাকিবে কিন্তু সব কিছু সৌষম্যের এক পরম ছন্দের বশবর্ত্তী হইবে, বহুত্বের মধ্যে একত্বের বিধান দেখা দিবে, বহু হইবে পরম একেরই লীলা বা খেলা ; তখন পরিণামধাবার মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধ থাকিবে না ; এক স্তর হইতে উর্দ্ধ্বতর স্তরে উন্নয়নে থাকিবে একটা ঋত-সুষমার ছন্দ, এক আলোক হইতে বৃহত্তর আলোকে চলিবে প্রগতির অভিযান, চিৎসত্তার আত্মোন্মিলনের লীলায় এক বিশিষ্ট ধরনের প্রকাশ হইতে উচ্চতর অন্যধরনের প্রকাশে দেখা দিবে শক্তি ও সৌন্দর্য্যের এক ক্রমবৃদ্ধি। চিৎসত্তার নিশ্চেতনার মধ্যে অবগাহনের মূলে আছে অনন্তের অনির্ব্বচনীয় সম্ভাবনার তত্ত্ব, সেই সম্ভাবনার পরিস্ফুরণের জন্য কোন কারণে যদি সংঘর্ষ ও দুঃখজ্বালার প্রয়োজনীয়তা থাকে তবেই প্রগতির অভিযান অন্য আকারে দেখা দিবে। কিন্তু মনে হয় অতিমানস-বিজ্ঞান নিশ্চেতনা হইতে একবার উন্মিষিত হইলে পার্থিব প্রকতির পক্ষে এই ভাবের প্রয়োজন আর থাকিবে না। বিজ্ঞানের স্বপ্রতিষ্ঠিত আবির্ভাবে এক নূতন রূপান্তরের সূচনা দেখা দিবে ; যখন অতিমানস-পরিণাম পূর্ণ হইয়া সচ্চিদানন্দের সৎ চিৎ ও আনন্দের পরম প্রকাশের বৃহত্তর পরিপূর্ণতায় উন্নীত হইবে তখন রূপান্তরও তাহার চরমে পৌঁছিবে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ভাগবত জীবন

হে সর্ব্বদর্শী অগ্নি, যে মানুষ কুটিল পথে চলে তুমি তাহাকে নিত্য সত্য ও জ্ঞানে লইয়া যাও।

ঋগ্বেদ ১।৩১।৬

সত্যের দ্বারা আমি পৃথিবী ও স্বর্গ এই উভয় লোককে পবিত্র করি।

ঋগ্বেদ ১।১৩৩।১

নিজের মাঝে দিব্য উন্মাদনাকে যে ধারণ করে তাহার সে উন্মাদনা দুইটি জন্মকে প্রস্ফুরিত করে। একটি তাহার মানব এবং অপরটি দিব্যরূপে আত্মপ্রকাশ, এবং এই দুই-এর মধ্যে চলে তাহার সকল গতি বৃত্তি।

ঋগ্বেদ ৯।৮৬।৪২

তাহার বোধিচেতনার অপরাজেয় কিরণমালা অমৃতের পিপাসায় ভরা তাহার দুই জন্মকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকুক; তাহাদের দ্বারা তিনি একই প্রবাহের মধ্য দিয়া নরের বীর্য্য এবং দেবতার বিভূতি ফুটাইয়া তোলেন।

ঋগ্বেদ ৯।৭০।৩

যখন শুষ্ক তরু হইতে তুমি জীবন্ত দেবতারূপে প্রজাত হও, তখন সকলে তোমার ক্রতু বা ইচ্ছাকে স্বীকার করুক, যাহাতে সকলে দেবত্ব লাভ করিতে, তোমার গতিবেগে সকলে সত্য এবং অমৃতের অধিকারী হইতে পারে।

ঋগ্বেদ ১।৬৮।২

আমরা জানিতে চেষ্টা করিয়াছি জড়বিশ্বে সচেতন সত্তারূপে অবস্থিত আমাদের এই জীবনের সত্য এবং তাৎপর্য্য কি এবং সে তাৎপর্য্য একবার আবিষ্কৃত হইলে কোন্ দিকে এবং কতদূর পর্য্যন্ত, কোন্ মানবীয় অথবা দিব্য ভবিষ্যতের পানে আমাদিগকে তাহা লইয়া যাইবে। আমাদের এখানকার জীবন জড়ের অথবা যাহা জড়কে গড়িয়া তুলিতেছে তেমন কোন শক্তির অর্থশূন্য ও উদ্দেশ্যহীন

এক অজানা খেয়াল, অথবা তাহা চিৎসত্তার এক অজ্ঞেয় খেয়াল বা লীলা হইতে পারে, অথবা আবার তাহা হয়ত বিশ্ববহির্ভূত কোন কামচারী খেয়ালি স্রষ্টারএক কল্পনার খেলা। যদি তাহাই হয় তবে জীবনের কোন মূল তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না ; আর এই কল্পনার খেলা যদি জড় বা জড়শক্তি হইতে জাত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাৎপর্য্যের কোন প্রশ্নই উঠে না ; কেননা সে ক্ষেত্রে জীবনের ইতিহাস বড়জোর কুণ্ডলিত (spiral) পথে ভ্রমণকারী আকস্মিকতা বা যদৃচ্ছা-শক্তির দেওয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিবরণ অথবা তাহা এক অন্ধ নিয়তির দ্বারা অঙ্কিত কঠিন বক্র রেখা মাত্র ; আর তাহা যদি চিৎসত্তার ভ্রম হয় তবে ইহার কেবল ভ্রমাত্মক তাৎপর্য্য থাকিতে পারে যাহা অবশেষে শূন্যে মিলাইয়া যায়। সচেতন স্রষ্টা হয়ত আমাদের জীবনের মধ্যে কোন অর্থ স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ইচ্ছা তিনি স্বেচ্ছায় প্রকাশ না করিলে আমরা তাহা ধরিতে পারি না, বস্তুস্বভাবের পরিচয়ের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সে অর্থ প্রকাশ হয় না অথবা তথায় আমরা তাহা আবিষ্কার করিতেও সক্ষম হই না। কিন্তু আমাদের এই মর্ত্ত্যজীবন যদি কোন স্বয়ম্ভূ সদ্‌বস্তুর পরিণাম হয় তাহা হইলে সেই সৎস্বরূপেরই কোন সত্য ইহার মধ্য দিয়া নিশ্চয়ই নিজেকে স্ফুরিত করিয়া তুলিতেছে, পরিণত ও প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছে, এবং সেই সত্যই হইবে আমাদের সত্তা ও জীবনের তাৎপর্য্য। সেই সত্যবস্তুর স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, তাহা এমন কিছু যাহা কালের ক্ষেত্রে সম্ভূতির এক বিভাবরূপে দেখা দিয়াছে—এই সম্ভূতি একটা অখণ্ডবস্তু, কেননা আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তাহাদের মধ্যে, যাহা তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে সেই অতীতকে বহন করিতেছে, অতীত তথায় রূপান্তরিত হইয়াছে অন্য রূপ ধারণ করিয়াছে, আবার আমাদের অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে ছিল এবং আজিও আছে সেই ভবিষ্যৎ, যাহা এখনও আমাদের কাছে অপ্রকাশিত ও অনুন্মিষিত বলিয়াই অদৃশ্য, যাহা আজিও সৃষ্ট হয় নাই যাহা অতীত ও বর্ত্তমানেরই ভবিষ্য রূপান্তর। আমাদের বর্ত্তমান জীবনের তাৎপর্য্যই আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়তি নিরূপিত করে ; সেই নিয়তি এমন একটা কিছু যাহা আমাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই প্রয়োজন ও প্রচ্ছন্নাবস্থা বা সম্ভাবনারূপে (necessity and potentiality) বর্ত্তমান আছে, সে প্রয়োজন হইল আমাদের সত্তার গোপন ও উন্মিষেচ্ছু সত্যের প্রকাশ, সে সত্য প্রচ্ছন্নাবস্থায় রহিয়াছে এবং ক্রমশঃ আমাদের জীবনে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে ; সে প্রয়োজন এবং সে সম্ভাবনা আজিও আমাদের মধ্যে

সিদ্ধরূপ গ্রহণ করে নাই বা তাহাদের পূর্ণ প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এখনও তাহার ব্যঞ্জনা আছে। এমন সত্তা যদি থাকেন যিনি সম্ভূতিতে নিত্য পরিণত হইতেছেন, যিনি কালের মধ্য দিয়া নিজেকে ক্রমশঃ ফুটাইয়া তুলিয়া চলিয়াছেন, তাহা হইলে সেই সত্তা সেই সত্য, নিজ গোপন সত্তায় যাহা, আমাদিগকে তাহা হইয়া উঠিতে হইবে এবং তাহা হওয়াই আমাদের জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য্য।

কালের ক্ষেত্রে এইভাবে যাহা ফুটাইয়া তোলা হইতেছে তাহার মধ্যে চেতনা এবং জীবনই মুখ্য বস্তু যাহা সমস্যা সমাধান করিতে পারে; কেননা ইহাদিগকে বাদ দিলে জড় এবং জড়ের জগৎ অর্থহীন প্রতিভাস মাত্র হইয়া পড়ে, তখন আকস্মিকতার খেয়াল অথবা নিশ্চেতন নিয়তি বশেই এ জগৎ দেখা দিয়াছে একথা বলিতে হয়। কিন্তু প্রাণ এবং চেতনা আজ আমাদের কাছে যাহা হইয়াছে তাহাই বিশ্বরহস্যের সব কিছু হইতে পারে না, কারণ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে তাহারা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহাদের পরিণামধারা চলিতেছে। আমাদের মধ্যে চেতনা মনের রূপ ধরিয়াছে আর আমাদের সে মন অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং অপূর্ণ একটি বস্তু, ইহা একটি মধ্যবর্ত্তী শক্তিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মনের অতীত কোন কিছুর দিকে এখনও গড়িয়া উঠিতেছে; মনের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে চেতনার অনেক নিম্নতর স্তর দেখা দিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে মন জাগিয়া উঠিয়াছে, স্পষ্টতঃ মনেরও উচ্চতর স্তরসমূহ আছে, মনের অভিযান চলিয়াছে তাহাদের অভিমুখে। আমাদের মননশীল বুদ্ধিযুক্ত বিচারপ্রবণ মনের পূর্ব্বে ভাবনাশূন্য এক চেতনা ছিল কিন্তু তাহাতে প্রাণ ও সংজ্ঞা ছিল; তাহারও পূর্ব্বে ছিল অবচেতনা এবং নিশ্চেতনা; স্বচ্ছন্দে মনে করা যাইতে পারে যে আমাদের পরে অথবা আমাদেরই অনুন্মেষিত আত্মায় যাহা মনের কৃত্রিম বা রচিত ভাবনার উপর নির্ভরশীল নয় এমন এক স্বয়ংজ্যোতি বৃহত্তর চেতনা আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে; ইহা নিশ্চিত যে আমাদের অপূর্ণ অবিদ্যাচ্ছন্ন ভাবনাশীল মনই চেতনার শেষ কথা বা তাহার চরম সম্ভাবনা নয়। কারণ চেতনা মূলতঃ নিজেকে এবং বস্তুরাজিকে জানিবার এক শক্তি এবং নিজের স্বরূপ-প্রকৃতিতে এই শক্তি হইবে অপরোক্ষ, আপনাতে আপনি সার্থক এবং পরিপূর্ণ; কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের চেতনার ক্রিয়া পরোক্ষ, অপূর্ণ, ও অসিদ্ধ এবং কৃত্রিম সাধনযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল; তাহার কারণ এখানে চেতনা আবরণকারী আদিম নিশ্চেতনার মধ্য হইতে উন্মিষিত হইতেছে, তাই

তাহা প্রথমে নিশ্চেতনার অচেতন আবরণে আবৃত ও ভারাক্রান্ত হইয়া আছে; কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে পূর্ণরূপে পরিস্ফুরণের শক্তিও তাহাতে আছে, এবং যাহা তাহার স্বরূপ-প্রকৃতি নিজের সেই পূর্ণতা লাভই ইহার নিয়তি। চেতনার খাঁটি প্রকৃতি হইল তাহার বিষয়সকলকে সম্পূর্ণরূপে জানা, এই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রথমটি হইল আত্মা বা সেই সত্তা এখানে যাহার চেতনার ক্রমবিকাশ চলিতেছে। আমরা যাহাকে অনাত্মা বলি তাহাই চেতনার অন্য জ্ঞাতব্য বিষয়—কিন্তু সত্তা যদি অখণ্ড হয় তাহা হইলে তথাকথিত অনাত্মাও স্বরূপতঃ আত্মা; অতএব উন্মিষন্ত চেতনাব নিয়তি হইল পূর্ণজ্ঞান লাভ করা, আত্মাকে এবং সকলকে পূর্ণরূপে জানা। কিন্তু চেতনার এই পূর্ণ এবং স্বাভাবিক অবস্থা আমাদের প্রাকৃত সত্তাকে অতিক্রম করিয়া আমাদের কাছে অতিচেতনরূপে বর্ত্তমান আছে এবং হঠাৎ যদি আমাদের মন তথায় গিয়া পৌঁছে তাহা হইলে তাহার ক্রিয়াশক্তি প্রথমে লোপ পায়—অথচ এই অতিচেতনার দিকেই আমাদের উন্মিষন্ত সচেতন সত্তার অভিযান চলিয়াছে। কিন্তু অতিচেতনা বা নিজের চরম সত্তার দিকে আমাদের চেতনার এই প্রগতি শুধুই সম্ভব হইতে পারে, এই মর্ত্ত্যধামে আমাদের যাহা ভিত্তিভূমি সেই নিশ্চেতনা নিজে প্রকৃতপক্ষে যদি সংবৃত অতিচেতনা হয়; কেননা সত্য বস্তু সম্ভূতিতে আমাদের মধ্যে যাহা হইয়া উঠিবে তাহা তথায় পূর্ব্ব হইতে অবশ্যই সংবৃত বা গোপন অবস্থায় থাকা চাই। নিশ্চেতনাকে এইরূপ এক সংবৃত সত্তা বা শক্তিরূপে সহজেই ধারণা করিতে পারি, যখন আমরা অচেতন শক্তির এই জগৎসৃষ্টি-ব্যাপার গভীররূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পাই যে, তথা কথিত অচেতন শক্তি অদ্ভুত উপায়ে অনন্ত কলা কৌশলের সঙ্গে জড়জগতে যাহা গড়িয়া তুলিতেছে তাহার মধ্যে সংবৃত এক বিশাল প্রজ্ঞার ক্রিয়াধারা চলিতেছে; যখন আরো দেখি যে আমরা নিজেরাও এই প্রজ্ঞার কোন অংশ, সেই সংবৃতি হইতে এক উন্মিষন্ত চেতনারূপে উদ্ভূত হইয়াছি তখন বুঝি যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা সংবৃত তাহা পূর্ণরূপে বিবৃত হইয়া আত্মপ্রকাশ না করিতেছে, পূর্ণরূপে নিজেকে এবং সকলকে যাহা জানে এমন চরম ও পরম প্রজ্ঞার পূর্ণ প্রকাশ না হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চেতনার এই উন্মেষের ধারা পথে কোথাও থামিয়া থাকিতে পারেনা। এই চেতনাকেই আমরা অতিমানস বা বিজ্ঞানময় চেতনা নামে অভিহিত করিয়াছি। কেননা স্পষ্টতঃ এই অতিমানসই আমাদের অন্তর্গূঢ় সত্য বস্তু, পরম সত্তা বা চিৎপুরুষের আত্মচেতনা, সেই পরম সত্যবস্তুই

আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন ; আমরা সেই পরমসত্তারই সম্ভূতি এবং আমাদিগকে তাহারই প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠিতে হইবে ইহাই আমাদের জীবনের তাৎপর্য্য।

যেমন চেতনাই জড়াশ্রয়ী সত্তার মর্ম্মরহস্য তেমনি প্রাণই সেই সত্তার বহির্ব্যঞ্জনা এবং কার্য্যকরী শক্তি ; কেননা প্রাণই চেতনাকে মুক্ত ক'রে তাহাকে শক্তির বিগ্রহে রূপায়িত করে এবং জড়ের ক্রিয়ায় তাহাকে ফুটাইয়া তোলে। জড়ের মধ্যে কোন প্রকার আত্মপ্রকাশ যদি উন্মিষন্ত সত্তার জন্মগ্রহণের চরম উদ্দেশ্য হয় তবে তাহার বহির্বিকাশ ও সফলতা দেখিতে পাই সক্রিয় প্রাণের লীলায়, প্রাণেই সে প্রকাশের চিহ্ন এবং পরিমাণের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের যে প্রাণকে আজ দেখিতে পাইতেছি তাহা এখনও অপূর্ণ, এখনও উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে ; চেতনার বিবৃদ্ধি ও পরিণতির সঙ্গে প্রাণের যেমন বিবৃদ্ধি ও পরিণতি ঘটে তেমনি প্রাণ সুগঠিত ও পূর্ণ হইতে থাকিলে চেতনারও প্রকাশ অধিকতর অব্যাহত ভাবে হয়, বৃহত্তর চেতনা এক বৃহত্তর জীবনকে সূচিত করে। মনোময় মানুষের জীবন অপূর্ণ কেননা মন সত্তার চেতনার মুখ্য এবং উচচতম শক্তি নয় ; এমন কি মনের পরিপূর্ণ পরিস্ফুরণ হইলেও আরও কিছু লাভ করা বাকি থাকে, আরও কিছু অব্যক্ত থাকিয়া যায়। কেননা আমাদের মধ্যে যাহা অন্তর্গূঢ় হইয়া আছে এবং উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে তাহা মন নয়—এক চিৎসত্তা ; মন চিৎপুরুষের চেতনার স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তি নয়, তাহার অভিব্যক্তি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে অতিমানস বা বিজ্ঞানময় চেতনার আলোকেই হইতে পারে। অতএব চিৎপুরুষেরই পূর্ণ অভিব্যক্তিরূপে যদি প্রাণকে ফুটিয়া উঠিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে চিন্ময় সত্তার প্রকাশ করিবার এবং তাহারই অতিমানস বা বিজ্ঞানময় শক্তির মধ্যে পরিপূর্ণ চৈতন্যময় দিব্যজীবন উন্মিষিত করিয়া তুলিবার দায় রহিয়াছে গোপনে পরিণামশীল প্রকৃতির মধ্যে, তাহাই তাহার লক্ষ্য।

তত্বতঃ সকল অধ্যাত্ম জীবনের তাৎপর্য্য হইল দিব্যজীবনকে ফুটাইয়া তোলা। কোথায় যে মনোময় জীবনের শেষ এবং দিব্যজীবনের আরম্ভ তাহা নির্ণয় করা দুরূহ, কারণ জীবনের এই দুই ধারা পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং অনেকদূর পর্য্যন্ত জীবনের এই মিশ্রিত ধারা বহিয়া চলে। আধ্যাত্মিকতার আবেগে সাধক যদি একান্তভাবে ইহবিমুখ না হইয়া পড়ে, তাহা হইলে মনোময় জীবন এবং দিব্যজীবনের এই মধ্যবর্ত্তী অংশের অনেকখানি

জুড়িয়া উচ্চতর জীবনের ক্রিয়াধারা গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যায়। মন এবং প্রাণ যে পরিমাণে চিৎসত্তার আলোকে আলোকিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাহারা দিব্যভাবের মহিমা ও বৃহত্তর গোপন সত্যবস্তুর দ্বারা অনুরঞ্জিত হইতে এবং তাহারই কিছুটা প্রতিফলিত করিতে থাকে, এবং এই ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে মধ্যবর্ত্তী অবস্থা ও সীমারেখা যখন পার হইয়া যায় তখন অধ্যাত্ম তত্ত্বের পূর্ণ আলোক এবং শক্তিতে সমগ্র জীবন এক অখণ্ড পূর্ণতায় ভরিয়া উঠে। কিন্তু উর্দ্ধ্বপরিণামী প্রকৃতির আকূতি পরিপূর্ণভাবে চরিতার্থ হইবার পূর্ব্বে চাই যে এই জ্যোতি এবং রূপান্তরের ধারা মন, প্রাণ এবং দেহকে অর্থাৎ সমগ্র সত্তাকে নিজেদের মধ্যে তুলিয়া লইবে এবং তাহাদিগের সবখানিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে; শুধু অন্তরে দিব্যপুরুষের যে উপলব্ধি হইবে তাহা নহে কিন্তু তাহারই শক্তিতে অন্তর এবং বাহিরের জীবনকে নূতন ছাঁচে ঢালাই করিতে হইবে; আবার শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয় বিজ্ঞানময় সঙ্ঘ-জীবনেও পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে চিৎপুরুষের সম্ভূতির উচ্চতম শক্তি এবং রূপের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহা সম্ভব করিবার জন্য আমাদের মধ্যস্থিত অধ্যাত্ম সত্তাকে কেবল তাহার অন্তরস্থিতিতে নয় তাহার বহির্গামী শক্তি-প্রবাহের মধ্যেও নিজের পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, এবং সেই পূর্ণতালাভের সহিত এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণ কর্ম্ম-ধারার জন্য নিজের বীর্য্যবন্ত ক্রিয়াশক্তিতে ফুটাইয়া তুলিতে এবং বাহিরেব জীবনকেও তাহার সাধনযন্ত্রে রূপান্তরিত করিতে হইবে।

ইহা নিঃসন্দেহ যে আমাদের অন্তরে এমন এক অধ্যাত্ম জীবন, হৃদয়ে এমন এক বৈকুণ্ঠ বা স্বর্গরাজ্য থাকিতে পারে যাহা আমাদের বহিঃসত্তার বাহিরের কোন প্রকাশ, কোন সাধনযন্ত্র বা কোন সূত্রের উপর নির্ভর করে না। অন্তরের জীবনের এক আধ্যাত্মিক পরম প্রয়োজন আছে এবং অন্তরের স্থিতি বা সত্যকে বাহিরে রূপ দিতে পারে বলিয়াই বহির্জীবনের মূল্য আছে। অধ্যাত্ম সিদ্ধপুরুষ যেখানে যে ভাবে বিচরণ করুন যে ভাবেই তাহার ক্রিয়া এবং আচরণ চলুক না কেন, তিনি দিব্য পুরুষের মধ্যেই বাস করেন, তিনি চিন্ময় সত্তাকে উপলব্ধি করেন, তাঁহার সত্তা ও তাহার সকল গতি প্রবৃত্তি সেই পুরুষের মধ্যেই নিবদ্ধ; গীতায় এই কথা বলা হইয়াছে, "স সর্ব্বথা ময়ি বর্ত্ততে"—'সে সর্ব্বভাবে আমাতে বর্ত্তমান থাকে'—এই ভাষায়। যিনি নিজের ভিতরে এবং সর্ব্বত্র দিব্যপুরুষের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন চিৎস্বরূপ আত্মার ভাবনায় তন্ময়

হইয়াছেন সেই অধ্যাত্ম সাধক ভিতরে দিব্যজীবনে বাস করিবেন এবং তাহার বাহিরের জীবনের ক্রিয়াধারায় তাহা প্রতিফলিত হইবে—যদিও বাহিরের সে জীবনে মর্ত্ত্যপ্রকৃতি সুলভ মানুষী ভাবনা এবং ক্রিয়াধারার সাধারণ ব্যাপার ছাড়া অলৌকিক কোন কিছু না থাকিতে পারে অথবা আপাত দৃষ্টিতে নাই বলিয়াই মনে হইতে পারে। আধ্যাত্মিক জীবনের ইহাই প্রাথমিক সত্য এবং মূল কথা, তথাপি আধ্যাত্মিক পরিণামের দিক হইতে দেখিলে দেখা যাইবে যে ইহা কেবল ব্যক্তিগত মুক্তি ও পূর্ণতা লাভ, ইহাতে পরিবেশের কোন পরিবর্ত্তন আসিবে না ; পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে এক বীর্য্যবন্ত বৃহত্তর পরিবর্ত্তন আনিতে হইলে চাই জীবন এবং ক্রিয়াধারার সমগ্র তত্ত্ব ও সাধন-যন্ত্রের আধ্যাত্মিক রূপান্তর—চাই দিব্য পরিণামের চরম ও পরিপূর্ণ অবস্থা যাহার মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে এমন এক নূতন দেবমানব-জাতির আবির্ভাব ঘটানো এবং এক নূতন পার্থিব প্রাণের বিকাশের ছবি আমাদের ভাষা ও ধারণায় গভীরভাবে অঙ্কিত করা। এ কার্য্যে বিজ্ঞানময় রূপান্তরের স্থান সর্ব্বোপরি ; এতকাল ধরিয়া যত সাধনা চলিয়া আসিয়াছে তাহা সমগ্র প্রকৃতির এই আমূল দিব্য রূপান্তরের দিকে আমাদিগকে তুলিয়া দিতেছে এবং তাহার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিতেছে ইহাই মনে করা যাইতে পারে। কেননা বিজ্ঞানঘন চেতনায় পূর্ণবীর্য্যে সক্রিয়ভাবে বাসই হইল পৃথিবীর বক্ষে পরিপূর্ণ দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা ; সে জীবনধারা পার্থিব জীবনে চেতনার বীর্য্যবন্ত ও সক্রিয় প্রকাশের জন্য বিশ্বজ্ঞান এবং বিশ্বকর্ম্মের উচ্চতর করণ বা সাধন-যন্ত্র গড়িয়া তুলিবে এবং জড়প্রকৃতির বিভাবনাসকল গ্রহণ করিয়া তাহাদের রূপান্তর সাধন করিবে।

কিন্তু বিজ্ঞানময় জীবনের সমগ্র ভিত্তি স্বভাবসিদ্ধভাবে সর্ব্বদাই অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, বাহিরে নয়। চিৎ পুরুষের এই জীবনে চিৎসত্তা বা আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত সত্য বস্তুই মনন, প্রাণসত্তা এবং দেহকে তাহার সাধন-যন্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং ব্যবহার করিতেছে ; ভাবনা, বেদনা এবং ক্রিয়া তাহা-দের নিজেদের জন্য বর্ত্তমান নাই, তাহারা উদ্দেশ্য নয়—উপায় বা উপলক্ষ্য মাত্র ; তাহারা নিমিত্ত মাত্র হইয়া আমাদের মধ্যস্থিত দিব্যসত্তাকে প্রকাশ করে ; অন্যথায়, এই অন্তর্ম্মুখিনতা এই আধ্যাত্মিক প্রবর্ত্তনা ছাড়া অতি মাত্রায় বাহ্য ভাবে বিভাবিত এক চেতনায় অথবা কেবলমাত্র বাহ্য উপায় দ্বারা মহত্তর বা দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আমাদের বর্ত্তমান প্রাকৃত জীবনে আমাদের বহির্ম্মুখ বহিশ্চর সত্তায় মনে হয় জগৎই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে ; কিন্তু

আমাদের জীবনের গতি আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরিলে আমাদিগকে নিজেকে এবং আমাদের জগৎকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের অন্তর জীবনই মুখ্য বস্তু এবং বাকী সকল তাহা হইতে জাত এবং তাহার প্রকাশ মাত্র ইহাই এই নব-সৃষ্টির বিধান বা সূত্র হইবে। বস্তুতঃ আমাদের নিজের অন্তরাত্মার, আমাদের মন প্রাণের ও জাতীয় জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য আমাদের যে আকৃতি ও সাধনা চলিতেছে তাহার মূলে এই বিধানই রহিয়াছে। কেননা আমাদিগকে যে জগতে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছে সে জগৎ অন্ধকারময় অবিদ্যাচ্ছন্ন জড় ও অপূর্ণ এবং এই বিরাট নির্ব্বাক্ অন্ধ তমিস্রার শক্তি ও চাপে, ক্রিয়াধারা ও গঠন পদ্ধতিতে, তৎসঙ্গে জড়ের মধ্যে জন্মে, তাহার পরিবেশে ও প্রভাবে, প্রাণের ঘাত প্রতিঘাতজাত শিক্ষাতে আমাদের বহিশ্চর চেতন-সত্তা সৃষ্ট হইয়াছে ; তথাপি আমরা অস্পষ্টভাবে যেন জানি যে আমাদের মধ্যে আর একটা কিছু আছে বা একটা কিছু হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে এই কিছু তাহা হইতে স্বতন্ত্র ; সে কিছু যেন এক চিৎপুরুষ বা এক স্বয়ম্ভূ সত্তা, যিনি নিজেকে নিজেই নিয়ন্ত্রিত করেন—তিনিই বুঝি আমাদের প্রকৃতিকে তাহার নিজের গুহ্যসিদ্ধি এবং পূর্ণতার ভাবনার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। এই দাবি বা এই প্রেরণার সাড়ায় আমাদের মধ্যে কে যেন জাগিয়া উঠে, সে যেন এক দিব্য কিছুর প্রতিরূপে নিজে গড়িয়া উঠিতে চায় ; আবার যে বাহ্য জগতে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে সেই জগৎকেও নিজের আধ্যাত্মিক মনোময় এবং প্রাণময় পরিণতির একটা বৃহত্তর প্রতিমূর্ত্তি রূপেই নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে-ই যেন আমাদের মন হইতে আমাদের চিৎসত্তার গভীর হইতে স্বতঃ উৎসারিত ভাবানুরূপে নূতন, পূর্ণ এবং সুষমায় ভরা কিছুরূপে আমাদের আন্তর জগৎকেও গড়িয়া লইতে চায়।

কিন্তু আমাদের প্রাকৃত মন অন্ধকারাচ্ছন্ন, ধারণায় পক্ষপাতদোষে দুষ্ট, প্রতিভাসের পারস্পরিক বিরোধ দ্বারা বিপথচালিত, বহু সম্ভাবনায় বিভ্রান্ত ; সে মন তিনটি বিভিন্ন লক্ষ্যের দিকে চালিত হইতে এবং তাহাদের কোন একটিকে একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারে। আমাদিগকে কি হইতে হইবে তাহার সন্ধান করিতে গিয়া মন আমাদের অন্তরের আধ্যাত্মিক পরিণতি এবং পূর্ণতার দিকে অভিনিবিষ্ট হইতে, আমাদের ব্যক্তিসত্তা এবং তাহার অন্তর জীবনের দিকে একাগ্র হইয়া পড়িতে পারে ; অথবা সে মন ব্যক্তিগত ভাবে

আমাদের বহিঃপ্রকৃতির পরিণতি সাধন করিবার, মননশক্তি এবং বাহ্য জগতে সক্রিয় বা ব্যবহারিক কর্ম্মকে পূর্ণ করিয়া তুলিবার অথবা পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কোন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য অভিনিবিষ্ট হইতে পারে; অথবা তাহা বাহিরের জগতের দিকেই অভিনিবিষ্ট হইতে পারে, তখন সে জগৎকে উৎকৃষ্টতর করা, তাহা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা রুচি সংস্কার বা আদর্শ আছে জগৎকে অধিকতরভাবে তাহার অনুরূপ করিয়া তোলাই হয় তাহার ব্রত। একদিকে যাহা বিশ্বাতীত সত্যবস্তু, যাহা দিব্যসত্তারই এক সত্তা, জগতের দ্বারা যাহা সৃষ্ট হয় নাই, যাহা নিজের মধ্যে নিজে বাস করিতে সমর্থ, যাহা আমাদের সত্য আত্মা সেই অধ্যাত্ম সত্তা জগৎকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বাতীত স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য আমাদিগকে আবাহন করে; অন্য দিকে যাহা দিব্য সত্তার এক বিরাট আত্মরূপায়ণ এবং ছদ্মবেশে সত্য বস্তুর এক শক্তি বা বিভূতি আমাদের চারিদিকে অবস্থিত সেই বিশ্বও আমাদের উপর তাহার দাবি জানায়। আমাদের প্রকৃতিস্থ সত্তা বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত এই দুই তত্ত্বের মধ্যে অবস্থিত আছে, তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে এবং তাহাদিগকে যুক্ত করিতেছে; এই সত্তার দ্বৈধ বা যুগল দাবি আছে, কেন না আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এ সত্তা বিশ্ব দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে তথাপি ইহার প্রকৃত স্রষ্টা আমাদের মধ্যেই রহিয়াছেন এবং সে স্রষ্টা সৃষ্টির জন্য প্রথমে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেই শুধু জগৎকে স্রষ্টা বলিয়া বোধ হইতেছে; বস্তুতঃ আমাদের প্রকৃতিস্থ সত্তা আমাদের মধ্যস্থিত বৃহত্তর অধ্যাত্ম সত্তারই এক রূপ, এক ছদ্ম প্রকাশ। এই দাবি একদিকে অন্তরের পূর্ণতার, অধ্যাত্ম মুক্তির প্রতি অভিনিবেশ অপর দিকে বাহিরের জগৎ এবং তাহার রূপায়ণের প্রতি অভিনিবেশের মধ্যে মধ্যস্থতা করে, এ উভয়ের মধ্যে একটা মধুরতর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিতে চায় এবং মহত্তর বিশ্বে মহত্তর ব্যক্তিত্বের আদর্শ সৃষ্টি করে। কিন্তু পরম সত্যকে এবং পরিপূর্ণ জীবনের ভিত্তি ও উৎসকে আমাদের অন্তরেই পাইতে হইবে; বাহিরের কোন রূপায়ণ সে স্থান অধিকার করিতে পারে না। যদি জগতে এবং প্রকৃতিতে সত্য জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে চাই তাহা হইলে অন্তরে সত্য আত্মস্বরূপকে প্রথমে জানিতে এবং উপলব্ধি করিতে হইবে।

দিব্যজীবনের উন্মেষ এবং প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে চিৎসত্তায় অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে। যতক্ষণ আমরা তাহার মনোময় প্রাণময়

অথবা অন্নময় আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার ছদ্মবেশ দূর করিয়া তাহাকে উপলব্ধি করিতে না পারিতেছি যতক্ষণ তাহা আমাদের আত্মাতে উন্মিষিত ও প্রকাশিত হইয়া না উঠিতেছে, উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে যতক্ষণ আমাদের এই দেহ হইতে ধৈর্য্যের সহিত তাহাকে নিষ্কাশিত করিতে সমর্থ না হইতেছি, এককথায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের অন্তরে এক চিন্ময় জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিতেছি, ইহা বেশ সুস্পষ্ট যে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের বাহিরের জীবনকে দিব্যজীবনরূপে গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। এমন কি দিব্য চিন্ময় ভাগবত জীবনের আদর্শ গ্রহণ না করিয়া যদি বস্তুতঃ আমরা দিব্যজীবন বলিতে শুধু মনোময় এবং প্রাণময় দেবতার জীবনের আদর্শ বুঝি এবং তাহাই হইয়া উঠিতে চাই তাহা হইলেও যতক্ষণ আমাদের ব্যষ্টি মনোময় সত্তা অথবা শক্তি-সাধনায় রত বাসনাময় প্রাণসত্তা সেই দেবতারূপে গড়িয়া উঠিতে না পারিতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই নিম্নতর অর্থে দিব্যজীবনের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হইবে না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনোময় দেবভাব বা প্রাণময় অসুরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবচিন্ময় (infra-spiritual) অতিমানবের অধিকারও আমরা লাভ করিতে পারিব না। অন্তরের এই জীবন একবার লাভ হইলে, জগতের ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র বহিশ্চর সত্তাকে আমাদের সমস্ত ভাবনা, বেদনা এবং ক্রিয়াকে সেই অন্তর জীবনের পূর্ণশক্তিতে পরিণত করিবার জন্য অভিনিবিষ্ট হওয়াই হইবে আমাদের সাধনার দ্বিতীয় পর্ব্ব। আমরা যদি শুধু আমাদের সক্রিয় শক্তিময় অংশে এই ভাবের মহত্তর এবং গভীরতর জীবন যাপন করিতে পারি তাহা হইলেই সেই শক্তির সাক্ষাৎ পাইব যাহা আমাদের মধ্যে বৃহত্তর জীবন সৃষ্টি করিবে অথবা জগৎকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে—হয় মন ও প্রাণের অথবা চিৎসত্তার কোন শক্তি এবং পূর্ণতায়। যাহারা নিজে অপূর্ণ এরূপ লোকসকলের দ্বারা বা তাহাদের সমাহারে পূর্ণ বা সিদ্ধ মানবজগৎ গড়িয়া উঠিতে পারে না। এমন কি দীক্ষা শিক্ষা বা আইন কানুন বা সমাজ-ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রতন্ত্র দ্বারা আমাদের সমস্ত কর্ম্মকে যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়ন্ত্রিত করি তাহার ফলে আমরা মনের নিয়ন্ত্রিত বিশিষ্ট ধারা, জীবনের সাজান বৈশিষ্ট্য বা আচারের পরিমার্জিত বিশেষ ধরণ পাইতে পারি; কিন্তু এই সমস্ত নিয়মতন্ত্র দ্বারা ভিতরের মানুষের রূপান্তর সিদ্ধ করা বা তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা যায় না ; এ সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা একটি পূর্ণ জীবাত্মা অথবা পূর্ণ মননশীল পুরুষ অথবা পূর্ণ বা উপচীয়মান জীবন্ত সত্তাকে পাথরে কাটা ভাস্কর্য্যের মত

কাটিয়া বাহির করা যায় না। কেননা আমাদের অন্তরাত্মা মন এবং প্রাণ, সত্তারই শক্তি, তাহাদের বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু কোন ছাঁচে ঢালিয়া বা কাটিয়া তাহাদিগকে প্রস্তুত করা যায় না; বাহিরের ক্রিয়াধারা এবং রূপায়ণ আত্মা মন এবং প্রাণের সহায় হইতে পারে, তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে পারে কিন্তু তাহাদিগকে সৃষ্টি করিতে বা গঠিত করিয়া তুলিতে পারে না। জীবনীশক্তির ক্রিয়াবর্দ্ধক কোন প্রভাব বিস্তার করিয়া অথবা কাহারও আত্মা বা মন বা প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার গঠন কার্য্যে শুধু সাহায্য করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা যান্ত্রিকভাবে (কলে ফেলিয়া) নিয়মানুগত ব্যাপক গঠন প্রণালীর দ্বারা সিদ্ধ হয় না, সে ক্ষেত্রেও অভ্যুদয় অন্তর হইতেই আসিবে, সেই সমস্ত প্রভাব এবং শক্তিকে কি ভাবে গ্রহণ করা অথবা কাজে লাগান যাইবে তাহা ভিতর হইতেই স্থিরীকৃত এবং নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাহির হইতে নহে। আমাদের সৃষ্টির উৎসাহ এবং অভীপ্সাকেও এই প্রাথমিক সত্য শিখিতে হইবে, তাহা না হইলে আমাদের সকল মানুষী চেষ্টা ব্যর্থতার আবর্ত্তে ঘুরিয়া মরিবে এবং তাহার সিদ্ধি হইবে অসিদ্ধির আপাত রম্য বঞ্চনা মাত্র।

প্রাকৃতিক শক্তির সকল সাধনাই কিছু হইয়া উঠিবার, কিছুকে ফুটাইয়া তুলিবার সাধনা; আমাদের জ্ঞান বেদনা বা অনুভূতি এবং কর্ম্ম সত্তার গৌণ শক্তি, তাহাদের মূল্য আছে বটে কেননা সত্তা নিজে যাহা, তাহার আংশিক আত্মরূপায়ণ বা আত্মপ্রকাশে তাহারা সহায়তা করে; আবার যাহা এখনও সিদ্ধ হয় নাই, সত্তা সেই আরো বেশী যাহা হইয়া উঠিবে তাহার আকৃতিরও তাহারা অনুকূল ও সহায়। কিন্তু ধর্ম্ম, নীতি, রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজধর্ম্ম, অর্থনীতি, যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ হউক না কেন, আত্মসুখ বা জনহিতের প্রয়োজনে, মনোময় প্রাণময় বা অন্নময় জীবনের যে কোন রূপে বা গঠনে কাজে লাগুক না কেন, জ্ঞান ভাবনা এবং কর্ম্ম জীবনের মূল বা উদ্দেশ্য হইতে পারে না; তাহারা শুধু সত্তার শক্তির অথবা তাহার সম্ভূতি-শক্তির ক্রিয়াধারা, তাহারা সে সত্তার বীর্য্যবন্ত প্রতীক, দেহধারী চিৎসত্তার তাহারা বিসৃষ্টি, সেই সত্তা যাহা হইতে চায় তাহা আবিষ্কারের অথবা ফুটাইয়া তুলিবার উপায় মাত্র। কিন্তু মানুষের জড়াশ্রয়ী মন অন্যভাবে বস্তুকে উল্টা করিয়া নীচের জিনিষ উপরে নিয়া এবং উপরের বস্তু নীচে আনিয়া দেখিতে চায়, কেননা তাহা বহিশ্চর শক্তিকে অথবা প্রকৃতির আপাত প্রতীয়মান অবস্থাকে মূল বা স্বরূপবস্তু মনে করে; প্রকৃতির দৃশ্য ও বাহ্য কার্য্যক্রমকে ক্রিয়াধারার মূল মনে করিয়া সে তাহার বিসৃষ্টিকে

গ্রহণ করে, বুঝিতে পারে না সে গৌণ বাহ্য রূপ মাত্র দেখিতে পাইতেছে এবং সেই বাহ্যরূপ এক বৃহত্তর এবং গোপন ক্রিয়াধারাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে ; কেননা প্রকৃতির গোপন এবং রহস্যপূর্ণ ক্রিয়াধারা হইল সত্তারই শক্তি এবং রূপের বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাদের মধ্য দিয়া তাহাকে প্রকাশ করা ; এই পরিণাম এই আত্মরূপায়ণের প্রয়োজনে সংবৃত সত্তাকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য প্রকৃতির বাহিরের চাপ একটা উপায় মাত্র। যখন প্রকৃতির পরিণামধারা আধ্যাত্মিকতার সোপানে পৌঁছে তখন এই গোপন ক্রিয়াধারাই তাহার সমগ্র ক্রিয়াধারাতে পরিণত হয় ; বাহ্য শক্তির সকল আবরণ ভেদ করিয়া যিনি স্বরূপতঃ চিৎসত্তা তাহাদের সেই প্রধান গোপন প্রযোজকের নিকট পৌঁছানই সাধনার পরম ও চরম প্রয়োজন। আত্মস্বরূপ হওয়া বা নিজেকে পাওয়াই আমাদের একমাত্র করণীয় বস্তু, কিন্তু আমাদের এই খাঁটি আত্মস্বরূপ আমাদের অন্তরে রহিয়াছে, সেই উচ্চতম খাঁটি দিব্যসত্তাতে পৌঁছিতে হইলে, তাহাকে স্বতঃ-প্রকাশিত এবং স্বয়ং-ক্রিয়াশীল রূপে দেখিতে হইলে, আমাদিগকে দেহ প্রাণ ও মনের বাহ্য আত্মাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। কেবলমাত্র অন্তরের দিকে গড়িয়া উঠিয়া অন্তরে বাস করিতে শিখিলে আমরা এ অবস্থায় পৌঁছিতে পারি ; একবার সে সিদ্ধি লাভ হইলে তথা হইতে আমরা আধ্যাত্মিক বা দিব্য মন প্রাণ দেহ গড়িয়া তুলিতে পারিব এবং তাহাদের মধ্য দিয়া যাহা দিব্যজীবনের খাঁটি পরিবেশ হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে তেমন এক জগৎ গড়িয়া লইতে সমর্থ হইব—প্রকৃতির শক্তি এই চরম লক্ষ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে। সুতরাং প্রথম প্রয়োজন এই যে প্রত্যেক ব্যষ্টি-সত্তাকে আবিষ্কার করিতে হইবে তাহার নিজের মধ্যে চিৎসত্তাকে, দিব্য-পুরুষকে এবং তাহাকে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার সকল সত্তায় ও সকল জীবনে। দিব্যজীবন প্রথমতঃ এবং মুখ্যতঃ অন্তরেরই এক জীবন ; কেননা বাহ্যতঃ যাহা কিছু আছে বা ঘটিতেছে তাহা অন্তরে যাহা আছে তাহারই অভি-ব্যক্তি, তাই অন্তরের সত্তা যদি দিব্যভাবে ভাবিত না হইয়া উঠে তাহা হইলে বাহিরের জীবনে দিব্যভাব ফুটিতে পারে না। মানুষের চিন্ময় কেন্দ্রে দিব্য-পুরুষ আবরণে আবৃত হইয়া গোপনে বাস করেন ; মানুষের মধ্যে শাশ্বত সত্য-বস্তু ও পরমাত্মা যদি না থাকিতেন তবে তাহার কোন উচ্চতর জীবনলাভের বা নিজেকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার কোন কথা উঠিত না।

আমাদের মধ্যে প্রকৃতির উদ্দেশ্য হইল হইয়া উঠা এবং পূর্ণরূপে হইয়া

উঠা ; কিন্তু পূর্ণরূপে হইয়া উঠিবার অর্থই হইল আত্মসত্তার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সচেতন হওয়া, অচেতনা অর্দ্ধচেতনা বা অপূর্ণচেতনার মধ্যে নিজেকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না ; সে সমস্তকে সত্তা বা জীবন বলিতে পারি কিন্তু তাহারা সত্তার পূর্ণতা নহে। পূর্ণভাবে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে নিজেকে এবং নিজ সত্তার সকল সত্যকে জানা, সত্তাকে খাঁটিভাবে পাওয়ার অপরিহার্য্য নিমিত্ত। এই আত্মজ্ঞানই যথার্থ অধ্যাত্মবিদ্যা ; অধ্যাত্মবিদ্যা স্বরূপতঃ এই স্বভাবসিদ্ধ স্বয়ম্ভূচেতনা ; তাহার জ্ঞানের সকল ক্রিয়ায় এমন কি তাহার যে কোন ক্রিয়ায় এই চেতনাই নিজেকে রূপায়িত করিয়া তোলে। ইহা ছাড়া চেতনার অন্য সকল জ্ঞানে ফুটিয়া উঠে, চেতনার নিজেকে ভুলিয়া গিয়া আবার নিজেকে এবং নিজের মধ্যে যাহা আছে তাহা জানিবার প্রয়াস ; যাহাকে বলিতে পারি আত্ম-অজ্ঞানের বা আত্ম-অবিদ্যার আত্মজ্ঞানে পুনরায় রূপান্তরিত হওয়ার সাধনা।

আবার চেতনা নিজের মধ্যেই সত্তার শক্তিকে বহন করে বলিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ পূর্ণাঙ্গ শক্তিকে পাওয়াই হইবে সম্ভূতির চরমোৎকর্ষ ; ইহাতে আত্মার সকল শক্তির এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহা ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার লাভ হয়। যে জীবন শুধু বর্ত্তমান আছে, শক্তির উপর অধিকার পায় নাই বা অর্দ্ধেক বা অপূর্ণ অধিকার পাইয়াছে তাহা পঙ্গু এবং খর্ব্ব জীবন ; ইহা বাঁচিয়া থাকা বটে কিন্তু সত্তার পূর্ণতা নয়। আবার সত্তার শক্তিকে আত্মাতে সমাহৃত এবং সমাহিত করিয়া নিশ্চল নিষ্ক্রিয় স্থিতিলাভও সম্ভব, কিন্তু তখনও বলিব শুধু সেই অবস্থাতে পূর্ণশক্তি নাই—তাহা ছিন্নাঙ্গ ও খর্ব্ব, বলিব যে যুগপৎ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় স্থিতিতে শক্তিমন্ত হওয়াই সত্তার পূর্ণাঙ্গতা বা সম্যক্ চরিতার্থতা ; আত্মার শক্তি আত্মার ভগবত্তারই চিহ্ন, শক্তিশূন্য চিৎপুরুষ চিৎপুরুষই নহেন। অধ্যাত্ম চেতনা যেমন স্বরূপগত এবং স্বয়ম্ভূ, তেমনি আমাদের অধ্যাত্ম সত্তার এই শক্তিও স্বরূপগত স্বয়ং-ক্রিয় ও স্বয়ম্ভূ এবং আপনি আপনাকে পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলিতে সমর্থ। সাধন বা যন্ত্ররূপে যাহা সে ব্যবহার করে তাহা তাহার নিজেরই অংশ ; এমন কি বাহিরের যাহা কিছু সে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে তাহাকেও নিজের অংশ এবং নিজসত্তার প্রকাশ-ক্ষেত্র করিয়া লয়। সচেতন ক্রিয়াতে সত্তার শক্তি, সঙ্কল্প বা ইচ্ছারূপে প্রকাশ পায় ; চিৎপুরুষে যে কোন সচেতন ইচ্ছার প্রকাশ হউক তাহার সত্তা বা সম্ভূতিতে যে কোন সংকল্প জাগুক না কেন, সর্ব্ব-সত্তা তাহাকে সুষমা ও সামঞ্জস্যে সার্থক করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবেই। যে ক্রিয়া বা ক্রিয়াশক্তির মধ্যে এই স্বচ্ছন্দ স্ফুরণের স্বাধীনতা নাই,

কর্ম্মের সাধনযন্ত্রের উপর যাহার প্রভুত্ব নাই সেখানে বুঝিতে হইবে সত্তার শক্তিই অপূর্ণ রহিয়াছে, চেতনা বিভক্ত হইয়া পড়িবার জন্য তথায় আছে পঙ্গুতা, সত্তার প্রকাশে রহিয়াছে অপূর্ণতা।

অবশেষে পূর্ণরূপে সম্ভূত হইলে পরিপূর্ণ স্বরূপানন্দ লাভ হইবে। এমন যদি হয় যে সত্তা আছে আনন্দ নাই অথবা আত্মোপলব্ধির এবং বিশ্বাত্মভাবের অনুভূতির পরিপূর্ণ আনন্দ নাই তাহা হইলে বলিতে হয় যে উদাসীন বা খর্ব্ব-রূপে অস্তিত্ব আছে, তাহা সত্তা বটে কিন্তু সত্তার পরিপূর্ণতা তথায় নাই। এই আনন্দও হইবে স্বরূপগত, স্বয়ম্ভূ এবং স্বয়ংক্রিয়; নিজের বাহিরের কোন জিনিষের উপর তাহা নির্ভর করিবে না; যাহাতে তাহার আনন্দ থাকিবে তাহাই নিজের অঙ্গীভূত করিবে, তাহার বিশ্বাত্মভাবের অংশরূপে থাকিবে তাহাতে আনন্দ। সকল নিরানন্দ সকল দুঃখ সকল জ্বালা যন্ত্রণা, অসিদ্ধি এবং অপূর্ণ-তারই নিদর্শন; সত্তার খণ্ডিত আত্মবোধ, তাহার চেতনার সঙ্কোচ এবং তাহার শক্তির অপূর্ণতা হইতেই তাহাদের উৎপত্তি। সত্তায়, তাহার চেতনায়, তাহার শক্তিতে এবং তাহার আনন্দে পরিপূর্ণ হওয়া এবং এই সহস্রদল পূর্ণতার মধ্যে বাস করাই হইল দিব্যজীবন।

কিন্তু আবার সম্ভূতিতে পূর্ণ হওয়ার অর্থ বিশ্বাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সীমিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া অহংএর ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে বাস করা এক অস্তিত্ব বটে কিন্তু তাহা অপূর্ণ অস্তিত্ব; কেননা স্বভাবতঃই চেতনা সেখানে অপূর্ণ, শক্তি পঙ্গু এবং আনন্দ কুণ্ঠিত। ইহা হইবে নিজ স্বরূপ হইতে ছোট কিছু হওয়া; ইহা অপরিহার্য্যরূপে অবিদ্যার বশ্যতা, দুর্ব্বলতা এবং দুঃখ ও জ্বালা লইয়া আসে; এমন কি প্রকৃতিতে দৈবী সম্পদের আবেশে যদিই বা কোন-রূপে ইহাদিগকে বর্জ্জন করা যায় তাহা হইলেও যে জীবন যাপন চলিবে তাহাতে সত্তার প্রসার সঙ্কুচিত, চেতনা শক্তি এবং আনন্দ সীমিত থাকিয়াই যাইবে। সর্ব্বসত্তা এক অদ্বয়বস্তু এবং সম্ভূতির পূর্ণতার অর্থ নিজে সর্ব্ব হওয়া বা সর্ব্বকে পাওয়া। নিজেকে সকলের সত্তার মধ্যে অনুভব করা, সর্ব্বকে নিজের সত্তার অন্তর্ভুক্ত করা, সকলের চেতনায় সচেতন হওয়া, শক্তিতে বিশ্বশক্তির পূর্ণাঙ্গতায় যুক্ত হওয়া, সকল ক্রিয়া এবং অনুভূতি নিজের মধ্যে বহন করা এবং তাহাদিগকে নিজেরই কর্ম্ম এবং অনুভূতি বলিয়া অনুভব করা, সকল আত্মাকেই নিজের আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করা, সকলের আনন্দকে নিজ সত্তারই আনন্দ বলিয়া বোধ করা—ইহাই হইল পূর্ণাঙ্গ দিব্যজীবনের অপরিহার্য্য সাধন।

কিন্তু এইভাবে বিশ্বচেতনার পূর্ণতা এবং স্বাধীনতা লইয়া বিশ্বাত্মভাবে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে বিশ্বাতীত ভাবের সিদ্ধিতেও পৌঁছান চাই। শাশ্বতের উপলব্ধিতেই সত্তার আধ্যাত্মিক পূর্ণতা ; কালাতীত শাশ্বত সত্তার অনুভূতি লাভ যদি না হয়, যদি আমাদিগকে স্থূল দেহ বা তাহার আশ্রিত মন প্রাণের উপর, এ জগতের বা সে জগতের, সত্তার এই অবস্থা বা সেই অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয়, তবে আত্মার সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি অথবা আমাদের আধ্যাত্মিকজীবন পূর্ণতালাভ করিয়াছে, তাহা বলা চলে না। কেবল শারীর-আত্মারূপে বাঁচিয়া থাকিলে অথবা একান্ত দেহনির্ভর হইয়া থাকিলে আমরা ক্ষণজীবী প্রাণী মাত্র ; তাহা মৃত্যু ও কামনা, দুঃখ ও যন্ত্রণা, ক্ষয় ও ক্ষতিরই অধীনতা। দৈহিক চেতনাকে যদি অতিক্রম করিতে বা ছাড়াইয়া উঠিতে পারি, দেহের মধ্যে বা দেহদ্বারা যদি বাঁধা না পড়ি, দেহকে যদি শুধু যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে পারি, যদি তাহাকে আত্মার বাহ্য গৌণ রূপায়ণ বলিয়া জানি, তবে আমাদের দিব্যজীবন-সাধনার প্রথম পাঠ গ্রহণ করা হইবে। অবিদ্যা-চ্ছন্ন এবং সীমিত চেতনার বশীভূত মন না হইয়া মনকে যদি অতিক্রম করিতে পারি, তাহাকে যদি যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে পারি, আত্মার বহিরঙ্গ রূপায়ণরূপে যদি তাহাকে শাসন ও পরিচালনা করিতে পারি, তবে দ্বিতীয় পাঠ গ্রহণ করা হইবে। যদি চিন্ময় আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, প্রাণের উপর যদি নির্ভরশীল না হই, যদি প্রাণের সঙ্গে নিজেকে এক করিয়া না ফেলি, যদি তাহাকে অতিক্রম করিতে পারি, যদি আত্মার এক প্রকাশ এবং যন্ত্র জানিয়া তাহাকে শাসন নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার করিতে পারি, তাহা হইলে তৃতীয় পাঠ গ্রহণ করা হয়। এমন কি দৈহিক জীবন তাহার নিজের ক্ষেত্রেও নিজের পূর্ণ সত্তা লাভ করিতে পারে না, যদি চেতনা দেহকে অতিক্রম করিয়া সকল জড়জগতের সহিত জড়ভাবেও এক, এই অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত না হয় ; প্রাণময় জীবনও নিজের ক্ষেত্রে তাহার পূর্ণাঙ্গ স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে না, যদি চেতনা ব্যক্তিগত প্রাণের সীমিত খেলাকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বপ্রাণকে নিজের প্রাণ বলিয়া অনুভব না করে, সকল প্রাণের সহিত একত্বে যুক্ত না হয়। আমাদের মননও আপনার ক্ষেত্রে সচেতনভাবে পরিপূর্ণরূপে স্ফুরিত এবং ক্রিয়াশীল হইতে পারে না, যদি আমাদের ব্যষ্টিমনের সীমা অতিক্রম করিয়া আমরা বিশ্বমনের এবং সকল মনের সহিত একত্ব অনুভব করিতে না পারি এবং বিভিন্ন মনে বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের যে সম্পদ আছে তাহা পূর্ণরূপে

রক্ষা করিয়াও চেতনায় এক পূর্ণাঙ্গতার আস্বাদন লাভ না করি। কিন্তু এইরূপে আমাদিগকে শুধু ব্যষ্টিভাবনা নয় বিশ্বভাবনাকেও ছাড়াইয়া যাইতে হইবে, কেননা কেবল তাহা হইলেই ব্যষ্টিজীবন বা বিশ্বজীবন নিজের স্বরূপ-সত্যকে লাভ করিতে এবং পরিপূর্ণ সৌষম্যে অবস্থিত হইতে পারে ; ব্যক্তি ও বিশ্ব এ উভয়ই তাহাদের বাহ্য রূপায়ণে বিশ্বাতীতেরই অপূর্ণ বিভূতি, কিন্তু তাহাদের স্বরূপে তাহারা বিশ্বাতীতের সহিত এক এবং সেই মূল সত্যের সম্বন্ধে সচেতন হইয়াই ব্যষ্টিচেতনা বা বিশ্বচেতনা নিজের পূর্ণ সত্য ও স্বাতন্ত্র্যে পৌঁছিতে পারে। তাহা না হইলে ব্যষ্টিসত্তা বিশ্বের গতি ও স্পন্দের, তাহার প্রতিক্রিয়ার এবং সীমা সঙ্কোচের অধীন হইয়া পড়িতে এবং তাহার আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা একেবারেই হারাইয়া ফেলিতে পারে। জীবকে পরম দিব্য সত্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে, তাহার সহিত নিজের একত্ব অনুভব করিতে, তাহার মধ্যে বাস করিতে, তাহার আত্মবিসৃষ্টি হইতে হইবে ; তাহার মন প্রাণ এবং দেহের সবখানিতে রূপান্তরিত হইয়া তাহার পরাপ্রকৃতির বিভূতিতে পরিণত হইতে হইবে; তাহার সকল ভাবনা, বেদনা এবং ক্রিয়াকে সেই পরাপ্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে তাহার আত্মরূপায়ণ এবং আত্মস্বরূপ হইয়া উঠিতে হইবে। তাহার মধ্যে এ সমস্তের পূর্ণতা কেবল তখনই ঘটিতে পারে যখন অজ্ঞান হইতে সে জ্ঞানে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং জ্ঞানের মধ্য দিয়া পরম চেতনায় তাহার শক্তিতে এবং পরম আনন্দে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক রূপান্তরের প্রথম পর্বেই সাধকের জীবনে এই সমস্তের কতকটা স্বরূপ এবং তাহাদেব যথেষ্ট রূপায়ণ দেখা দেয় এবং বিজ্ঞানঘন পরাপ্রকৃতির জীবনে তাহারা চরম সার্থকতা লাভ করে।

এ সমস্ত সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না, যদি আমরা অন্তরাবৃত্ত হইয়া বাস করিতে না শিখি, যাহার মুখ বাহিরের দিকে ফিরানো এবং যাহা কেবল বা প্রধানতঃ বহির্বিষয়ের উপর ক্রিয়াশীল সেই বহিশ্চেতনার মধ্যে অবস্থিত থাকিলে এই সব সিদ্ধিতে কখনই পৌঁছিতে পারা যায় না। ব্যষ্টিসত্তার নিজেকে পাইতে, তাহার সত্যস্বরূপ জানিতে হইবে ; অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তরে বাস করিতে এবং তথা হইতে নিজেকে উৎসারিত করিতে না পারিলে ইহা কখনই সম্ভব হইবে না ; কেননা অন্তরেব চিৎপুরুষ হইতে বিযুক্ত বহিরঙ্গ বা বাহ্যজীবন বা বহিশ্চেতনা অবিদ্যার ক্ষেত্র ; ব্যক্তিপুরুষ শুধু অন্তরের আত্মা এবং জীবনের বিপুলতার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াই নিজেকে

এবং অবিদ্যাকে অতিক্রম করিতে পারে। আমাদের মধ্যে বিশ্বাতীত সত্তা যদি বর্ত্তমান থাকেন তবে তিনি আমাদের গোপন আত্মার মধ্যেই আছেন; বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে সীমা ও পরিবেশ দ্বারা গঠিত এক ক্ষণস্থায়ী সত্তা মাত্র আছে। আমাদের মধ্যে বিশ্বাত্মভাবের উদার ব্যাপ্তিতে অবগাহন করিতে, বিশ্বচেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হইতে সমর্থ কোন আত্মা যদি থাকে তবে সে আত্মাও রহিয়াছে আমাদের আন্তর সত্তার অভ্যন্তরে; বহিশ্চেতনা শুধু এক জড়ময় চেতনা যাহা তাহার ব্যষ্টিভাবের সীমার মধ্যে মন, প্রাণ এবং দেহ এই তিনটি রজ্জুদ্বারা বাঁধা আছে; আমরা যদি শুধু বহির্ম্মুখ সাধনার দ্বারা বিশ্বচেতনার উন্মেষ বা সার্ব্বভৌমতা লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে হয় আমরা ব্যক্তিগত অহংকেই স্ফীত করিয়া তুলিব অথবা গণচেতনার মধ্যে ব্যক্তিসত্তার প্রলয় ঘটাইব অথবা তাহাকে গণচেতনার অধীন করিয়া তুলিব। কেবল অন্তরের গতি প্রবৃত্তি এবং ক্রিয়ার দ্বারা অন্তরের দিকে বাড়িয়া উঠিয়াই ব্যষ্টিসত্তা স্বাধীন ও সক্রিয়ভাবে বিশ্ব এবং বিশ্বাতীতে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিতে পারে। দিব্যজীবন যাপনের জন্য আমাদের সত্তার কেন্দ্র বাহির হইতে সরাইয়া লইয়া অন্তরে স্থাপিত করিতে হইবে, অন্তরেই বীর্য্যবন্ত ক্রিয়াধারার মূল উৎসকে সাক্ষাৎভাবে আবিষ্কার করিতে হইবে, কেননা আমাদের অন্তরপুরুষ বা আত্মা অন্তরেই অবস্থিত আছেন, তিনি আবৃত বা অর্দ্ধাবৃত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং আমাদের ক্রিয়াধারার উৎসরূপে সাক্ষাৎভাবে এখন যে সত্তাকে জানিতেছি তাহা বাহিরেই অবস্থিত আছে। উপনিষদ বলেন "স্বয়ম্ভূ আমাদের চেতনার দুয়ারকে বাহিরের দিকেই কাটিয়া বাহির করিয়াছেন, তাই সাধারণ মানুষ বাহিরের দিকটাই শুধু দেখে; কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক আছেন যাহাদের চক্ষু অন্তরাবৃত্ত, তাহারাই চিৎপুরুষকে দর্শন করেন এবং জানেন, তাহারাই আধ্যাত্মিক সত্তা গড়িয়া তোলেন।" তাই প্রকৃতির রূপান্তর সাধন এবং দিব্যজীবনলাভের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন আমাদের নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টিকে ফিরানো, সেখানে নিজেকে দেখা, নিজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া এবং অন্তরের মধ্যে বাস করা।

এইভাবে অন্তরে প্রবিষ্ট হওয়া এবং তথায় বাস করা মানব-সত্তার প্রাকৃত চেতনার পক্ষে এক দুরূহ সাধনা; কিন্তু ইহা ছাড়া আত্মোপলব্ধির অন্য কোন পন্থা নাই। জড়বাদী মনীষীরা বহিরাবৃত্ত এবং অন্তরাবৃত্ত চিত্তের মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি করিয়া কেবল বহিরাবৃত্ত স্বভাবকেই নিরাপদে গ্রহণযোগ্য বলিয়া

স্থির করিয়াছেন ; তাঁহাদের মতে অন্তরে প্রবেশের অর্থ অন্ধকার বা শূন্যতার মধ্যে প্রবেশ অথবা চেতনার সাম্য নষ্ট করিয়া ফেলা এবং রুগ্ন অবস্থা লাভ করা ; অন্তরের জীবন যতটুকু গঠিত হইতে পারে তাহা বাহির হইতেই গঠন করা যাইতে পারে, বাহিরের স্বাস্থ্যজনক এবং পুষ্টিকর উপাদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলেই অন্তরের স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে ; বাহিরের সত্য বস্তুর দৃঢ় আশ্রয় না থাকিলে ব্যক্তিগত মন ও প্রাণের ভারসাম্য রক্ষিত হয় না, কেননা জড়জগৎই হইল একমাত্র মূল সত্যবস্তু। যে অন্নময় মানুষ, যে বহিরাবৃত্ত হইয়াই জন্মিয়াছে, যে নিজেকে বহিঃপ্রকৃতির সৃষ্ট জীব বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত তাহার পক্ষে ইহা সত্য হইতে পারে, বহিঃপ্রকৃতি যাহার জননী এবং ধাত্রী সে যদি অন্তরে প্রবেশ করে তবে সে আত্মহারা হইয়া পড়ে ; তাহার পক্ষে আন্তর সত্তা বা অন্তর্জীবন বলিয়া কিছু নাই। এই পার্থক্য অনুসারে যাহাকে সাধারণতঃ অন্তরাবৃত্ত বলা হয় তাহারও কোন অন্তরের জীবন নাই ; সে অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিয়াও খাঁটি অন্তরপুরুষ বা অন্তর্জগৎকে দেখিতে পায় না, তাহার চোখে পড়ে মনোময় খর্ব্ব মানুষ ; যে উপরে-ভাসা দৃষ্টি নিয়া নিজের ভিতরে দেখে, তথায় সে তাহার চিন্ময় আত্মাকে দেখিতে পায় না, সে তথায় দেখে তাহার প্রাণময় এবং মনোময় অহংকে এবং এই ক্ষুদ্র করুণার্হ খর্ব্বকায় প্রাণীর গতি-বৃত্তিতে অপ্রকৃতিস্থ ভাবেই অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। যে সর্ব্বদা বাহিরের জীবনেই বাস করিয়াছে এবং অন্তর্জীবনের সিদ্ধ অনুভব লাভ করে নাই সে অন্তরের দিকে তাকাইলে তাহার মননের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় অন্ধকার ছাড়া আর কিছু অনুভব করিতে পারিবে না ; অন্তরেব একটা কৃত্রিম সংস্কার বা অনুভূতিই কেবল তাহার আছে, যাহা তাহার সত্তার উপাদানের জন্য বাহিরের জগতের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু আরো বেশী অন্তরে বাস করিবার শক্তি দিয়া যাহাদের সত্তা গঠিত হইয়াছে তাহাদের পক্ষে ভিতরে অনুপ্রবেশ এবং বাস করিবার ফলে নিছক অন্ধকারের অথবা কেবল একটা নীরস শূন্যতার অনুভূতি জাগে না কিন্তু তাহার মধ্যে দেখা দেয় অনুভূতির একটা বিপুল প্রসারণ, উপ-স্থিত হয় একটা নূতন অতর্কিত অনুভবের আবেগ, দেখা দেয় একটা উদারতর দৃষ্টি, একটা বিপুলতর সামর্থ্য ; অন্নময় প্রাকৃত মানুষের নিজের জন্য গড়া জীবনের ক্ষুদ্রতা অপেক্ষা বহুল পরিমাণে প্রসারিত অনন্ত গুণে বাস্তব ও বিচিত্র এক জীবন আসিয়া উপস্থিত হয় ; আর স্থূল প্রাণময় মানুষ বা মনের বহিঃ-প্রাঙ্গণে অবস্থিত মনোময় মানুষ তাহার বীর্য্যবন্ত প্রাণশক্তি ও ক্রিয়া অথবা

তাহার মনোময় জীবনের সূক্ষ্মতা এবং প্রসারতার দ্বারা যে আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয় তদপেক্ষা বহুগুণে বৃহত্তর এবং সমৃদ্ধতর আনন্দ তাহার সে জীবনকে ঘিরিয়া থাকে। এক নৈঃশব্দ্যের, এক বিপুল বা অমেয় অথবা এমন কি অনন্ত মহাশূন্যতার মধ্যে প্রবেশ করা অন্তরাবৃত্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটা অঙ্গ ; কিন্তু জড়াশ্রয়ী মনের এ অবস্থার প্রতি একটা ভীতি আছে, বহিঃপ্রাঙ্গণের ক্রিয়াশীল ভাবনা বা প্রাণময় ছোট মন ইহা হইতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, বিরাগ ভরে ইহাকে এড়াইয়া যাইতে চায়, কেননা সে মন নৈঃশব্দ্যকে ভাবে প্রাণ ও মনের জড়ত্ব বা অসামর্থ্য, শূন্যতাকে ভাবে বিনাশ বা অস্তিত্বহীনতা ; কিন্তু এ নৈঃশব্দ্য চিৎপুরুষের নৈঃশব্দ্য, যাহা বৃহত্তর জ্ঞান, শক্তি এবং আনন্দের নিমিত্ত বা উৎস ; মধ্যস্থিত পঙ্কিল ও কলুষিত বিষয় রূপ মদ্য ঢালিয়া ফেলিয়া প্রাকৃত সত্তার পানপাত্রকে রিক্ত এবং তাহা ব্রাহ্মীচেতনার অমৃত-রসে পূর্ণ করিবার আয়োজনই হইল এই শূন্যতা ; এক বৃহত্তর এবং মহত্তর জীবনে পৌঁছিবার জন্য এ অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতে হয়, অস্তিত্বহীনতার মহাশূন্যে মিলাইবার জন্য নহে। এমন কি যখন সত্তা এই আত্মবিলয়ের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায় তখনও সে বিলয় অস্তিত্বহীন অত্যন্ত বিনাশ নহে পরন্তু তাহা এক অতি বিপুল অনির্ব্বচনীয় চিন্ময় সত্তার মধ্যে বিলয় পাওয়া অথবা চরম তত্ত্বের বাক্য মনের অতীত অতিচেতনায় ডুবিয়া যাওয়া।

বস্তুত: এইভাবে অন্তরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ান এবং অন্তরাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার অর্থ ব্যক্তিসত্তার কারাগারে বদ্ধ হওয়া নয়, বরং বিশ্বচেতনায় পৌঁছিবার ইহাই হইল প্রথম ধাপ ; ইহা হইতেই আমরা আমাদের বহির্জীবন এবং অন্তর্জীবনের সত্য পরিচয় পাই। কেননা এই অন্তরের জীবনই আত্মবিস্তার করিতে এবং বিশ্বজীবনকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিতে পারে ; ইহা এমন বৃহত্তর বাস্তবতা এবং এরূপ মহত্তর শক্তির সহিত সকল প্রাণের সংস্পর্শে আসিতে, তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে, তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিতে পারে, আমাদের বহিশ্চেতনার পক্ষে যাহা একেবারে অসম্ভব। বাহিরের জীবনে বিশ্বের সহিত এক হইবার সাধনায় আমরা যে উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছিতে পারি তাহাও বিশ্বাত্মভাবের এক অক্ষম পঙ্গু প্রচেষ্টা মাত্র ; ইহা একটা কৃত্রিম বস্তু, মনকে শুধু চোখ্ ঠারা বা নিজেকে প্রবঞ্চিত করা মাত্র, সত্যবস্তু নহে, কেননা আমাদের বহিশ্চেতনায় আমরা অপর হইতে পৃথক এই বিবিক্ত চেতনা এবং অহংকারের শৃঙ্খলে বাঁধা আছি। সেখানে আমাদের নিঃস্বার্থপরতাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে

সূক্ষ্ম স্বার্থপরতার এক রূপ অথবা আমাদের অহংকে দৃঢ়তর ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার এক উপায় হইয়া দাঁড়ায়। পরার্থপরতার ভঙ্গীতে সন্তুষ্ট হইয়া আমরা দেখিতে পাই না যে আমাদের প্রসারিত কক্ষার মধ্যে যাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছি তাহাদের উপর আমাদের ব্যক্তিসত্তা আমাদের ব্যক্তিগত ভাবনা আমাদের মনোময় এবং প্রাণময় ব্যক্তিত্ব আমাদের অহংএর পুষ্টির প্রয়োজন চাপাইয়া দেওয়ার জন্য এই পরার্থপরতা একটা আবরণ মাত্র। যেখানে আমরা সত্য সত্যই অপরের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হই সেখানে আমাদের অন্তরের চিন্ময় মৈত্রী এবং করুণাই ক্রিয়া করিতেছে; কিন্তু এই শক্তির বীর্য্য এবং ক্রিয়াক্ষেত্র আমাদের মধ্যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, এইজন্য চৈত্য পুরুষের যে প্রেরণা আসা প্রয়োজন তাহা সাধারণতঃ অপূর্ণ, তাহার ক্রিয়া প্রায়ই অবিদ্যাচ্ছন্ন, কেননা অপরের সহিত আমাদের মনের এবং হৃদয়ের সংস্পর্শ হয় বটে কিন্তু আমাদের সত্তা তাহাদিগকে নিজেরই আত্মস্বরূপ মনে করিয়া আলিঙ্গন করিতে পারে না। অপরের সঙ্গে বাহিরের ক্ষেত্রে একত্ব-স্থাপন, তাহাদের বাহ্যজীবনের একত্র সমাহার ও বাহ্যিক মিলন ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না, অন্তরের দিকে তাহার ফলও হয় ক্ষুদ্র এবং গৌণ; এই সাধারণ জীবনের এবং তথায় যাহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় তাহাদের সহিত আমাদের মন ও হৃদয়ের গতিবৃত্তি যুক্ত হয়; কিন্তু যৌথ হইলেও বাহ্য জীবনই সেখানে ভিত্তি থাকিয়া যায়, সে একত্ব সহজ এবং স্বাভাবিক নহে তাহা মন দিয়া গড়া একটা কৃত্রিম একত্ব মাত্র; অথবা পরস্পরের অপরিচয়, অহমিকার সংঘর্ষ, মন প্রাণ হৃদয়ের সংঘাত ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও যে একত্ব থাকে তাহা অপূর্ণ এবং অনিশ্চিত বস্তু। অধ্যাত্মচেতনা এবং অধ্যাত্ম জীবনের গঠন-রীতি ইহার বিপরীত; সে ক্ষেত্রে সমষ্টিজীবনের মধ্যে ক্রিয়ার ভিত্তি স্থাপিত হয় অন্তরের এক অনুভবের উপর, অপর সকলে আমাদের নিজ সত্তায় অন্তর্ভূক্ত আছে এই বোধের উপর, অদ্বয় সত্যের আন্তর উপলব্ধির উপর। অধ্যাত্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত ব্যষ্টিজীব একত্ব-বোধ হইতেই ক্রিয়া করেন; আত্মার উপর অন্য আত্মার দাবি, জীবনের প্রয়োজন, মঙ্গল, মৈত্রী ও করুণার কর্ম্ম কি এবং কি ভাবে তাহা সার্থক করা যায় তাহার সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ অনুভূতি সেই একত্ববোধ হইতে লাভ হয়। আধ্যাত্মিক একত্বের উপলব্ধি ও সর্ব্বভূতে অবস্থিত অদ্বয় আত্মার অপরোক্ষ চেতনার ক্রিয়াশক্তিই শুধু দিব্যজীবনের প্রতিষ্ঠা এবং নিজের সত্যের দ্বারা তাহার ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

বিজ্ঞানময় বা দিব্য সত্তায়, বিজ্ঞানময় জীবনে অপর সকলের আত্মার চেতনা, তাহাদের মন প্রাণ এবং দৈহিক সত্তার চেতনা এমন নিবিড় এবং পূর্ণভাবে অবস্থিত থাকিবে যাহাতে অনুভূত হইবে যে এ সমস্ত আত্মা মন প্রাণ দেহও তাহার নিজের। বিজ্ঞানময় পুরুষ মৈত্রী ও করুণার কোন বাহ্য ভাবাবেগ বা অনুরূপ কোন হৃদয়-বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ক্রিয়া করিবেন না, তাঁহার ক্রিয়ার উৎস হইবে এই নিবিড় অন্যোন্য চেতনা, এই অন্তরঙ্গ একত্ববোধ। তাঁহার সকল জাগতিক কর্ম্ম আলোকিত হইবে এক দিব্য দৃষ্টির সত্যের আলোকে, যাহাতে তাঁহার এবং অপরের মধ্যে যে একই সত্যস্বরূপ আছেন তাঁহার দিব্য ইচ্ছার নির্দ্দেশে কি করিতে হইবে তাহা স্থির হইবে ; তাঁহার নিজের মধ্যে অপরের মধ্যে এবং সকলের মধ্যে যে দিব্যপুরুষ রহিয়াছেন সে কর্ম্ম হইবে তাঁহা-রই জন্য, সর্ব্বস্বরূপের উদ্দেশ্যের যে সত্য তাঁহার উচ্চতম চেতনার আলোকে দৃষ্ট হইবে তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য, এবং যে পন্থা বা সোপান-মালার মধ্য দিয়া পরাপ্রকৃতির শক্তির মধ্যে তাহা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে সেই ভাবে সেই ছন্দেই চলিবে সে ক্রিয়া। বিজ্ঞানময় পুরুষ যখন নিজে পরিপূর্ণ ও সার্থক হইয়া উঠেন তখন তাঁহার মধ্যস্থ দিব্যপুরুষ এবং তাঁহার সঙ্কল্পই পরিপূর্ণ এবং সার্থক হইয়া উঠে, তিনি যেমন নিজের সার্থকতার মধ্য দিয়া নিজেকে প্রাপ্ত হন বা জানেন তেমনি অপরের সার্থকতার মধ্য দিয়াও নিজেকেই পান ; বৃহত্তর সম্ভূতির দিকে সর্ব্বভূতের মধ্যস্থিত সর্ব্বসত্তার যে গতিপ্রবৃত্তি আছে বিশ্বাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুষ তাহাই নিজের মধ্যে সার্থক করিয়া তোলেন। সর্ব্বত্রই তিনি দিব্যপুরুষের ক্রিয়া দেখিতে পান ; তাঁহার নিকট হইতে অথবা অন্তরের যে জ্যোতি ইচ্ছা ও সঙ্কল্প তাঁহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে তাহা হইতে যাহা এই সমষ্টিভূত দিব্য কর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে তাহাই তাঁহার কর্ম্ম। তাহার মধ্যস্থিত কোন বিবিক্ত অহংবোধ তাহাকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় না ; যিনি বিশ্বাত্মা এবং বিশ্বাতীত তিনিই তাঁহার বিশ্বব্যাপ্ত ব্যষ্টিসত্তার মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া বিশ্বকর্ম্মে প্রকাশিত হন। যেমন তিনি বিবিক্ত ব্যক্তিগত অহং এর জন্য কোন কিছু করেন না তেমনি সমষ্টিগত অহংএর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যও কিছু করেন না ; তাহার নিজের মধ্যে সমষ্টির মধ্যে এবং সর্ব্বভূতে যে একই দিব্যপুরুষ আছেন তাঁহারই মধ্যে তিনি সর্ব্বদা অবস্থিত, তাঁহারই কাজে তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসৃষ্ট। সকলের মধ্যে একত্বের সিদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক সর্ব্বদর্শী ইচ্ছা দ্বারা

পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত বিশ্বাত্মভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই হইবে বিজ্ঞানময় পুরুষের দিব্যজীবনের ক্রিয়ার ধারা বা বিধান।

তাহা হইলে যখন আমরা দিব্যজীবনের কথা বলি তখন তাহার প্রথম অর্থ এই বুঝি যে তাহা ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা এবং অন্তরের পূর্ণতালাভের যে আকূতি দেখিতে পাই তাহার চিন্ময় সার্থকতা সাধন। ইহাই পৃথিবীতে পরিপূর্ণ জীবনের প্রথম এবং মূল প্রয়োজন, তাই যখন আমরা ব্যষ্টিজীবনকে চরম পূর্ণতায় উন্নীত করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য বা প্রথম পুরুষার্থ মনে করি, তখন আমরা ঠিকই করি। তাহার পর ব্যষ্টিপুরুষের সহিত তাহার চারিপাশের সকলের আধ্যাত্মিক এবং ব্যবহারিক সম্বন্ধকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য আমাদিগকে অভিনিবিষ্ট হইতে হয়; বিশ্বের সকল প্রাণের সহিত এক হইতে পারিলে পরিপূর্ণভাবে সর্ব্বাত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে এই দ্বিতীয় অভীপ্সা বা অভীষ্ট পূরণ হয়; বিজ্ঞানময় চেতনা এবং প্রকৃতি উন্মিষিত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই এ অবস্থা লাভ হয়। কিন্তু তাহার পরও বাকী থাকে তৃতীয় আর এক অভীষ্ট-পূরণ, তখন চাই এক নূতন জগৎ, মানুষের সমগ্র জীবনের এক দিব্য রূপান্তর, অন্ততঃপক্ষে পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে এক নূতন পরিপূর্ণ সঙ্ঘজীবন। ইহার জন্য অনুন্মিষিত প্রাকৃত গণ-চেতনার মধ্যে ক্রিয়ারত, উন্মিষিত ও পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র ব্যষ্টিপুরুষগণের আবির্ভাব যে শুধু প্রয়োজন তাহা নহে, চাই বহু বিজ্ঞানময় পুরুষ লইয়া এক প্রকার নূতন মানুষ গঠন, একটা নূতন সঙ্ঘজীবন, যাহা হইবে বর্ত্তমান ব্যষ্টি জীবন এবং সামাজিক জীবন অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর। যে তত্ত্বে যে আদর্শে বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিজীবন গড়িয়া উঠিবে এই ভাবের সঙ্ঘজীবন স্পষ্টতঃ সেই একই তত্ত্বে একই আদর্শে গঠিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান মানবজীবনে যে বহিশ্চর জীবের সঙ্ঘ রহিয়াছে তাহার মধ্যে মিলনের মূলসূত্র হইতেছে তাহাদের সাধারণ বাহ্য জীবন-ব্যাপার বা জীবনের তথ্য এবং তাহা হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে সেই সমস্ত; তাই সে সঙ্ঘের মূলে আছে সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক ঐক্য, সাধারণ সমাজ বিধান, মননের সমতা ও সহযোগিতা, অর্থনৈতিক সমবায়, সংঘাত, অহং-এর আদর্শ আবেগ এবং প্রচেষ্টা; আবার তাহার সহিত ব্যক্তিগত বন্ধন এবং সম্বন্ধের সূত্রসকল সমগ্র সঙ্ঘের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে যাহা সঙ্ঘের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে সহায়তা করে। অথবা এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে যদি ভেদ, দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ থাকে তখন একত্রে বাস

করিবার প্রয়োজনে কার্য্যক্ষেত্রে চেষ্টা করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা মিলমিশ করিতে হয় বা একটা আপোষ রফা জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়; এইভাবে কখনও একটা স্বাভাবিক কখনও বা একটা কৃত্রিম সাম্য গড়িয়া তোলা হয়। বিজ্ঞানময় সঙ্ঘজীবনের ধারা এরূপ হইবে না; কেননা সকলকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য জীবনের বাহ্য ব্যাপার দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে মিলিত সামাজিক চেতনা গড়িয়া তুলিতে হইবে না কিন্তু তথায় ঐক্যের এক অন্তরঙ্গ চেতনা সাধারণ জীবনকে সংহত করিয়া সঙ্ঘগত সকলকে একত্রে ধারণ করিয়া রাখিবে। তাহাদের মধ্যে ঋতচেতনার পরিস্ফুরণ হওয়াতেই তাহারা সকলে মিলিত হইবে; এই চেতনা তাহাদের জীবনে রূপান্তরিত এমন এক নূতন ধারা প্রতিষ্ঠিত করিবে যাহাতে তাহারা অনুভব করিবে যে, তাহারা সকলে একই পরমাত্মার আত্মরূপায়ণ, একই সত্যবস্তুর জীবরূপী আত্মা-সকল; মৌলিক একত্বজ্ঞানের দ্বারা আলোকিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং মূল এক একীভূত সঙ্কল্প ও অনুভূতির প্রেরণা দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবন অধ্যাত্ম সত্য প্রকাশ করিবে এবং তাহাদের মধ্য দিয়া তাহার নিজ সম্ভূতির স্বাভাবিক রূপ সকল দেখিতে পাইবে। তথায় এক ক্রমবদ্ধ সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, কেন না সত্য তাহার নিজেরই ক্রম ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে; জীবনের এক বা বহু বিধানও তথায় থাকিতে পারে কিন্তু তাহা হইবে আত্ম-নিরূপিত; তাহারা হইবে চিন্ময় ভাবে মিলিত সঙ্ঘসত্তার এবং অধ্যাত্মভাবে মিলিত সঙ্ঘজীবনের সত্যেরই এক প্রকাশ। সঙ্ঘজীবনের সমগ্র রূপায়ণ আধ্যাত্মিক শক্তি সকলের দ্বারা গঠিত হইবে এবং সে জীবনে তাহারা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ক্রিয়াশীল হইবে; অন্তরসত্তা অন্তরেই এ সমস্ত শক্তি গ্রহণ করিবে এবং ভাব ক্রিয়া ও উদ্দেশ্যের এক স্বাভাবিক সৌষম্য ও সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রকাশ বা আত্মপ্রকাশ হইবে।

জীবনকে একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শের অনুগত করা, ক্রমশঃ অধিকতররূপে যান্ত্রিক করিয়া তোলা, সকলকে এক সাধারণ ছাঁচে ঢালাই করাই হইল সঙ্ঘ জীবনে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার মনোময় ধারা; কিন্তু এই জীবনের আদর্শ এবং বিধান তাহা নহে। বিজ্ঞানময় সঙ্ঘসমূহের মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য এবং বৈচিত্র্য থাকিবে, প্রত্যেক সঙ্ঘ আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিজের সঙ্ঘজীবন গড়িয়া তুলিবে; তাহা ছাড়া প্রত্যেক সঙ্ঘের মধ্যে ব্যষ্টিপুরুষের আত্মপ্রকাশে নিরঙ্কুশভাবে আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ থাকিবে, সুতরাং

বহুভাবে তাহাদের প্রকাশ দেখা যাইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া এই স্বাতন্ত্র্য এবং বৈচিত্র্য অসামঞ্জস্য বা বিশৃঙ্খলা আনিয়া ফেলিবে না অথবা পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিবে না, কেননা জ্ঞানের বা জীবনের একই সত্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে সংগতি ও সহযোগই থাকিতে পারে, দ্বন্দ্ব বা সংঘাত নহে। বিজ্ঞানময় চেতনায় ব্যক্তিগত ভাব ও ধারণা লইয়া বিবিক্ত অহং-এর কোন নির্ব্বন্ধ, স্বার্থসিদ্ধি বা ব্যক্তিগত সঙ্কল্প পূরণের জন্য কোন কলরব, কোন ধাক্কা ধাক্কি থাকিবে না ; এ সমস্তের স্থানে তথায় মিলন ও সামঞ্জস্যবিধায়ক এই বোধ থাকিবে যে একই সত্য সকলের মধ্যে নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে এবং বহু চেতনা ও দেহের মধ্যে রহিয়াছে এক আত্মা ; তথায় এমন এক সর্ব্বজনীনতা ও সাবলীলতা বর্ত্তমান থাকিবে, যাহা নিজেরই বহুরূপের মধ্যে অবস্থিত অদ্বয়বস্তুকে দেখিতে পাইবে এবং প্রকাশ করিবে, ঋতচেতনা ও নিজ প্রকৃতির সত্যের মধ্যে অনুস্যূত বিধানরূপে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বই ফুটাইয়া তুলিবে। দিব্য সঙ্ঘের সকলেই জানিবে যে একই চিৎশক্তি সকলের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে এবং তাহাদের সকল ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে, তাহারা দেখিবে তাহারা নিজেরাও তাহার নিমিত্ত বা যন্ত্র। বিজ্ঞানময় পুরুষ অনুভব করিবেন যে পরাপ্রকৃতির এক অখণ্ড শক্তি সকলের মধ্যে সকল ক্রিয়া করিতেছে ; তাঁহার নিজের মধ্যে এই শক্তি যাহা রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে তাহা তিনি স্বীকার করিবেন এবং দিব্য কর্ম্মের জন্য তাঁহাকে সে শক্তি যে জ্ঞান এবং বীর্য্য দিয়াছে তাহার অনুবর্ত্তন বা তাহাকে ব্যবহার করিবেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যস্থিত জ্ঞান ও বীর্য্যকে অপরের জ্ঞান ও বীর্য্যের বিরুদ্ধে স্থাপিত অথবা অহংরূপে নিজেকে অপর অহং-এর প্রতিস্পর্ধীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন বা তাড়না কখনই অনুভব করিবেন না। কারণ যিনি চিদাত্মাস্বরূপ, তাঁহার হৃদয়ে থাকিবে তাঁহার অবিচ্ছেদ্য আনন্দ এবং প্রাচুর্য্যের সর্ব্বাবস্থায় অব্যাহত অনুভূতি, থাকিবে তাঁহার অনন্ত স্বরূপসত্যের নিত্য বোধ ; বাহিরের রূপায়ণ যাহাই হোক না কেন তিনি নিজে তাঁহার এই পরিপূর্ণতার অনুভূতি হইতে কখন বিচ্যুত হইবেন না। অন্তরস্থ চিৎপুরুষের সত্য কোন বিশিষ্ট রূপায়ণের উপর নির্ভর করিবে না ; তাই কোন বাহ্য রূপায়ণ বা আত্মপ্রতিষ্ঠাতে আবদ্ধ থাকিবার প্রয়োজন বা প্রচেষ্টা তাঁহার থাকিবে না ; স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং সাবলীলভাবেই তাঁহার রূপসকল অন্য সকল রূপায়ণের সঙ্গে যথাযোগ্য সম্বন্ধ রাখিয়া প্রকাশ পাইবে এবং সমগ্র রূপায়ণের মধ্যে প্রত্যেকে তাহার যথাস্থানে

স্থাপিত হইবে। তাহার পরিবেশের অন্য সকল সত্যের সহিত সৌষম্য রক্ষা করিয়াই হইবে বিজ্ঞানময় চেতনা ও সত্তার সত্যের আত্মপ্রতিষ্ঠা। চিন্ময় বা বিজ্ঞানময় সত্তা, সমগ্রের মধ্যে যেখানেই তাঁহার স্থান হউক না কেন, তাহার চারিপাশের সকল বিজ্ঞানময় জীবনের সহিত সামঞ্জস্যহারা হইবে না। তিনি জানিবেন যে এই নূতন জগতে তাঁহার স্থান কোথায়, তদনুসারে যেমন তিনি নেতা বা শাস্তা হইতে তেমনি অধীন হইতেও পারিবেন; এ দুই ক্ষেত্রেই তাঁহার সমান আনন্দ বর্ত্তমান থাকিবে; কেননা চিৎপুরুষের স্বাধীনতা শাশ্বত, স্বয়ম্ভূ এবং অবিচেছদ্য বলিয়া তিনি সেবায়, স্বেচছায় অধীনতা গ্রহণে ও অপরের ছন্দানুবর্ত্তনে যেমন তাহা অনুভব করিবেন ঠিক তেমনি অনুভব করিবেন প্রভুত্ব এবং অপরকে শাসনের বেলায়। অন্তরের চিন্ময় স্বাধীনতা যেমন অন্তরের চিন্ময় শ্রেণীবিভাগের সত্যের তেমনি স্বরূপগত আধ্যাত্মিক সমতার সত্যের মধ্যে নিজের স্থান গ্রহণ করিতে পারে, এ উভয়ের মধ্যে সে কোন অসঙ্গতি দর্শন করে না। সত্যের নিজস্ব এই আত্মব্যবস্থা চিন্ময় সত্তার এই স্বাভাবিক ক্রম-বিন্যাস দেখা দিবে সঙ্ঘের সাধারণ জীবনে—যে সঙ্ঘের মধ্যে উন্মিষন্ত বিজ্ঞানময় পুরুষগণ বিভিন্ন শক্তি লইয়া বিভিন্ন ধাপে অবস্থিত থাকিবেন। একত্ব বিজ্ঞানময় চেতনার ভিত্তি, অন্যোন্যভাবের চেতনা বহুর মধ্যে একত্বের সাক্ষাৎ জ্ঞানের স্বাভাবিক ফল, সৌষম্য তাহার শক্তির ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সুতরাং একত্ব, অন্যোন্যভাব এবং সৌষম্য, সাধারণ বা সঙ্ঘবদ্ধ বিজ্ঞানময় জীবনের অপরিহার্য্য বিধান। সে-জীবনে কোন্ বিশিষ্টরূপ ফুটিবে তাহা পরিণামশীল পরমা প্রকৃতির ইচছার উপর নির্ভর করিবে কিন্তু ইহাই হইবে সে জীবনের সাধারণ ধর্ম্ম এবং তত্ত্ব।

খাঁটি মনোময় এবং অন্নময় সত্তা ও জীবন হইতে আধ্যাত্মিক এবং অতিমানস সত্তা ও জীবনে প্রবেশের পূর্ণ অর্থ, স্বাভাবিক বিধান এবং প্রয়োজন এই যে অবিদ্যাচছন্ন সত্তাতে যে মুক্তি, পূর্ণতা এবং আত্মসম্পূর্তির আকূতি রহিয়াছে, বর্ত্তমান অবিদ্যাচছন্ন প্রকৃতি পার হইয়া আত্মজ্ঞানময় এবং জগৎ-জ্ঞানময় চিন্ময় প্রকৃতিতে পৌঁছিতে পারিলেই শুধু তাহার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা লাভ হয়। এই বৃহত্তর প্রকৃতিকে আমরা পরাপ্রকৃতি বলিতেছি কেননা ইহা প্রাকৃত জীবের বর্ত্তমান চেতনা এবং সামর্থ্যের অতীত; অথচ বস্তুতঃ ইহাই তাহার খাঁটি প্রকৃতি, তাহার উচচতম এবং পূণতম অবস্থা, যদি তাহার নিজের প্রকৃত আত্মাকে পাইতে হয় যদি তাহার সত্তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ফুটাইয়া

তুলিতে হয় তবে এই প্রকৃতিতে তাহাকে পৌঁছিতেই হইবে। প্রকৃতিতে যাহা কিছু ঘটে তাহা প্রকৃতির পরিণাম, অর্থাৎ যাহা কিছু তাহার মধ্যে লক্ষিত বা অন্তর্নিহিত হইয়া বর্ত্তমান আছে তাহা পরিস্ফুরিত হয়, অপরিহার্য্য ফল বা পরিণামরূপে দেখা দেয়। যদি আমাদের প্রকৃতি মূলতঃ এক অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনা হয় যাহা কৃচ্ছ্র সাধনায় এক অপূর্ণ জ্ঞানে, চেতনার এবং সত্তার এক অপূর্ণ রূপায়ণে পরিণত হইতেছে তবে আমাদের সত্তা, জীবন এবং ক্রিয়া ও সৃষ্টি পরিণামে অবশ্যই, এখন যেরূপ আছে তেমন সর্ব্বদা অসম্পূর্ণ অনিশ্চিত থাকিবে, তাহাতে অর্দ্ধসিদ্ধিমাত্র দেখা দিবে, আমাদের মন প্রাণ এবং দেহ অপূর্ণ থাকিয়াই যাইবে। আমরা জ্ঞানের এবং জীবনের এমন ধারাসকল গড়িয়া তুলিতে চাই যাহা দ্বারা আমাদের সত্তা কতকটা পূর্ণ করিয়া খাঁটি সম্বন্ধের কতকটা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারি, মনের খাঁটি ব্যবহার, প্রাণের খাঁটি ব্যবহার, খাঁটি সুখ ও খাঁটি সৌন্দর্য্য, দেহের খাঁটি ব্যবহার কতকটা আয়ত্ত করিতে পারি। কিন্তু আমরা চেষ্টা দ্বারা স্বরচিত অর্দ্ধ সিদ্ধিতে অর্দ্ধ খাঁটি অবস্থায় মাত্র পৌঁছি, যাহা লাভ করি তাহার মধ্যে এমন অনেক কিছু মিশ্রিত থাকে যাহা অন্যায় যাহা কুৎসিৎ যাহা অসুখকর; আমরা জীবন-ধারার পরম্পরা রচনা করিয়া চলি কিন্তু তাহাদের মধ্যে এই মূল দোষ থাকিয়া যায় বলিয়া এবং আমাদের মন ও প্রাণ তাহাদের আকতির বশে কোথাও স্থায়ীভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া সে ধারার প্রত্যেকটিতে ক্ষয় ধরে অথবা তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে বা ধ্বংস হয়; আমরা তখন একটা ছাড়িয়া অন্য একটা ধরি, কিন্তু এই নূতনটিতেও চরমভাবে সফলকাম হই না বা তাহাও স্থায়ী হয় না যদিও কোন কোন দিকে তাহারা সমৃদ্ধতর পূর্ণতর হইতে অথবা অধিকতরভাবে আপাত যুক্তিযুক্ত মনে হইতে পারে। আমাদের সাধনা এমন ভাবে ব্যর্থ হইতে বাধ্য. কেননা আমাদের প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যায় এমন কিছু আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি না; আমাদের বুদ্ধির কৌশল দিয়া যে যন্ত্র আবিষ্কার করি তাহা আমাদের কাছে যতই চমৎকার বলিয়া বোধ হউক না কেন, বাহ্য ক্ষেত্রে যতই কার্য্যকরী হউক না কেন, আমরা নিজে অপূর্ণ বলিয়া তাহা দ্বারা পূর্ণতাকে গড়িয়া তোলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা অবিদ্যাচ্ছন্ন বলিয়া আত্মজ্ঞান বা জগৎ-জ্ঞানের সর্ব্বতোভাবে সত্য এবং সার্থক কোন ধারা গড়িয়া তুলিতে পারি না; আমরা যাহাকে বিজ্ঞান বলি তাহা নিজেই মানুষের গড়া একটা বস্তু, তাহা নানা সূত্র এবং কলা-কৌশলের একটা বিপুল সমাহার,

ক্রিয়ার ধারা বা পদ্ধতির জ্ঞান তাহার বিপুল, উপযুক্ত যন্ত্রনির্ম্মাণের শক্তিও তাহার প্রচুর কিন্তু আমাদের আত্মসত্তা এবং জগৎসত্তার ভিত্তি সম্বন্ধে সে অজ্ঞ, ইহা আমাদের প্রকৃতিকে অতএব আমাদের জীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে না।

আমাদের প্রকৃতিতে আমাদের চেতনায় আমরা পরস্পরকে চিনি না, আমরা পরস্পর হইতে পৃথক, মূলে রহিয়াছে প্রত্যেকের মধ্যে এক বিবিক্ত অহংবোধ, অথচ অবিদ্যার দ্বারা আচছন্ন দেহধারী জীবগণের সহিত কোন না কোন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা না করিয়া আমাদের কোন উপায়ও নাই; কেননা প্রকৃতির মধ্যে যেমন আছে মিলনের আকূতি তেমনি আছে মিলন ঘটাইবার জন্য নানা শক্তি। তাহার ফলে ব্যষ্টি এবং সঙ্ঘ জীবনে অল্পবিস্তর পূর্ণ সীমিত সৌষম্যের নানা রূপ সৃষ্ট হয়, একটা সামাজিক সংসক্তি গড়িয়া উঠে; কিন্তু যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, গণচিত্তে সহানুভূতির ন্যূনতা, পরস্পরকে জানিবার বা বুঝিবার অপূর্ণতা, পরস্পরের সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণা, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সংঘাত এবং অশান্তির অস্তিত্বের জন্য তাহা সর্ব্বদাই ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়ে। পূর্ণ ঐক্য এবং সৌষম্য স্থাপন ততদিন সম্ভব হইবে না, যতদিন আত্মজ্ঞান এবং অন্যোন্য-জ্ঞান বিভাবিত প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদের চেতনার খাঁটি মিলন না ঘটিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা জ্ঞানে এবং অন্তরের উপলব্ধিতে সকলের সঙ্গে খাঁটি একত্ব লাভ না করিব, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সত্তার এবং জীবনের অন্তরতর শক্তিসমূহের মধ্যে সুরসঙ্গতি স্থাপিত না হইবে। সমাজ গঠনে একত্ব, অন্যোন্য ভাব এবং সৌষম্যের অন্ততঃ পক্ষে আংশিক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমরা করিয়া থাকি, কেননা এসমস্ত না থাকিলে পূর্ণ সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না; কিন্তু সে চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা সমাজের যে কৃত্রিম কাঠামো গড়িয়া তুলি তাহাতে আইন ও আচার দ্বারা জোর করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অহংসকলকে জোড়াতালি দিয়া মিলাই, এক মনগড়া সমাজ বিধান সকলের উপর চাপাইয়া দিই, সে বিধানের মধ্যে কাহার কাহারও স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা অপরের স্বার্থসিদ্ধি অপেক্ষা প্রধান স্থান লাভ করে, ফলে যে সমগ্র সমাজব্যবস্থা চলে তাহার কতকাংশ স্বীকৃত হয় কতকাংশ জোর করিয়া চালান হয়, তাহা আধা স্বাভাবিক আধা কৃত্রিম একটা আপোষ রফা হইয়া দাঁড়ায়, এইভাবেই সমগ্র সমাজ-জীবন কোন প্রকারে চলিতে থাকে। আবার এক সমাজের সহিত অন্য সমাজের আপোষ রফাতে আরও ক্ষণভঙ্গুরতা থাকে,

ফলে এক সমাজগত অহং এর সঙ্গে অন্য সমাজগত অহং এর বিবাদ ও সংঘর্ষ সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে। ইহাই হইল আমাদের সাধ্যের সীমা, নিয়ত চেষ্টার দ্বারা সমাজ ব্যবস্থায় যত অদলবদল করি না কেন এক অপূর্ণ সামাজিক জীবন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু গড়িয়া তুলিতে পারি না।

যদি আমাদের প্রকৃতি প্রগতির পথে নিজেকে অতিক্রম করিয়া যায়, যদি তাহা আত্মজ্ঞান, অন্যোন্যজ্ঞান এবং একাত্ম প্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল হয়, সত্তা এবং জীবনের স্বরূপ সত্যে প্রতিষ্ঠিত প্রকৃতিতে পরিণত হয়, কেবল তাহা হইলেই আমাদের সত্তা এবং জীবন পূর্ণতা লাভ করিবে; কেবল তখনই আমাদের মধ্যে সত্তার খাঁটি জীবন, ঐক্য অন্যোন্যভাব এবং সৌষম্যের জীবন, সত্য শ্রী এবং আনন্দের জীবন প্রকাশ পাইবে। আমাদের প্রকৃতি বর্ত্তমানে যাহা হইয়া উঠিয়াছে তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন যদি না ঘটে তাহা হইলে পার্থিব জীবনে পূর্ণতা লাভ করা, সত্য এবং নিত্য আনন্দের অধিকারী হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে; তাহা হইলে আমাদের অপূর্ণতাকে মানিয়া লইয়া পূর্ণতালাভের আকূতি ছাড়িতে হইবে অথবা অন্যত্র, এ জীবনের পরপারে জগদতীত কোন ক্ষেত্রে তাহা সন্ধান করিতে হইবে; কিম্বা সমস্ত আকূতি সমস্ত অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া জীবনকে অতিক্রম করিয়া যাহা হইতে আমাদের এই অজানা এবং অসন্তোষজনক সত্তা জাত হইয়াছে তেমন কোন চরম নির্ব্বিশেষ সত্তার মধ্যে আমাদের প্রকৃতি এবং অহং এর নির্ব্বাণ ঘটাইতে হইবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি এক অধ্যাত্ম সত্তা থাকে যাহা ধীরে উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যদি শুধু সে উন্মেষের অপূর্ণ বা অর্দ্ধপ্রকাশ মাত্র হয়, যদি নিশ্চেতনা পরিণামধারার আদি বিন্দু মাত্র হয় যদি নিশ্চেতনার মধ্য হইতে যাহাকে পরিস্ফুরিত হইয়া উঠিতে হইতে হইবে এমন এক অতিচেতনা এবং পরাপ্রকৃতির পরম বীর্য্য অব্যক্ত বা সুপ্তভাবে অবস্থিত থাকিয়া থাকে, প্রাতিভাসিক প্রকৃতির আবরণে আবৃত হইয়া এক বৃহত্তর চেতনা গুপ্তভাবে যদি বর্ত্তমান থাকিয়া থাকে এবং এমন যদি হয় যে সে চেতনাকে একদিন না একদিন ফুটিয়া উঠিতেই হইবে, পরিণামধারার মধ্য দিয়া সত্তার আত্মপ্রকাশই যদি বিধান হয়, তাহা হইলে আমাদের অভীপ্সার সিদ্ধি শুধু সম্ভব নহে, তাহা হইবে বিশ্বনিয়তির অপরিহার্য্য পরিণাম। আমাদের মধ্যে পরাপ্রকৃতির প্রকাশ হইবে, আমাদের প্রাকৃত প্রকৃতি পরাপ্রকৃতিতে রূপান্তরিত হইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক নিয়তি; কেননা তাহাই আমাদের আত্মস্বরূপের,

আমাদের সমগ্র সত্তার প্রকৃতি, কেবল তাহা উন্মিষিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া এখনও আমাদের কাছে গোপন রহিয়াছে। অদ্বয়ভাবে বিভাবিত প্রকৃতির আত্মপ্রকাশের ফলে জীবনে ঐক্য, অন্যোন্যভাব এবং সৌষম্য অপরিহার্য্যরূপে আসিয়া পড়িবে। পরিপূর্ণ চেতনায় জাগ্রত এবং চেতনার পরিপূর্ণ শক্তিতে উদ্বোধিত অন্তর জীবন যাহার মধ্যে ফুটিবে তাহার অপরিহার্য্য ফল রূপে তাহার মধ্যে আত্মজ্ঞান, পরিপূর্ণ জীবন, পরিতৃপ্ত সত্তার এবং সার্থক প্রকৃতির পরম আনন্দ দেখা দিবে।

বিজ্ঞানময় চেতনা এবং পরাপ্রকৃতির মধ্যে স্বভাবসিদ্ধভাবে দৃষ্টি এবং ক্রিয়াশক্তির পূর্ণতা, জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের ঐক্য থাকিবে; আমাদের মনোময় দৃষ্টিতে এবং জ্ঞানে যে সমস্ত স্থানে দ্বন্দ্ব এবং বৈষম্য আছে বলিয়া বোধ হয় এ চেতনা তথায় সমন্বয় ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে, এ চেতনায় জ্ঞান ও সঙ্কল্প এক হইয়া একই শক্তিরূপে বস্তুসত্যের সহিত ছন্দ রক্ষা করিয়া ক্রিয়া করিবে; পরাপ্রকৃতির এই স্বাভাবিক ধর্ম্মই তাহার পরিপূর্ণ একত্ব, অন্যোন্য ভাব এবং ক্রিয়ার সকল সৌষম্যের ভিত্তি। মনোময় সত্তার মধ্যে তাহার গড়িয়া তোলা জ্ঞানের সহিত স্বরূপ বা সমগ্র সত্যের একটা বিরোধ থাকে, যাহার ফলে তাহার জ্ঞানের মধ্যে যে সত্য আছে তাহাও প্রায় বা পরিশেষে ব্যর্থ হইয়া পড়ে অথবা কেবল আংশিকভাবে সফল হয়। আমাদের একদিনের আবিষ্কৃত সত্য পরদিন মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিতে হয়, হৃদয়ের আবেগ দিয়া যে সত্যকে কার্য্যকরী করিয়াছি মনে করি তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে; প্রায়ই আমাদের কর্ম্মের অবাঞ্ছিত পরিণাম ঘটে, যাহা আমরা চাই না বা যাহার উদ্দেশ্য আমরা বিধিসঙ্গত মনে করি না হয়ত তাহা তাহারই অংশ হইয়া পড়ে; অথবা বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে যে সফলতা আসে তাহার দ্বারা আমাদের ভাবের সত্য পরাভূত ও বঞ্চিত হইয়া যায়। এমন কি আমাদের ভাবাদর্শ যদি কখনও সফল হইয়াও উঠে তখনও তাহা অখণ্ড সমগ্র সত্য হইতে ভিন্ন আমাদের মন গড়া বিবিক্ত এবং অপূর্ণ কিছু বলিয়া শীঘ্র অথবা বিলম্বে আশাভঙ্গের বেদনা দেয়, ক্ষণিকের সে সফলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং নূতন সাধনার প্রয়োজন আসিয়া পড়ে। আমাদের দৃষ্টির ও ধারণার সঙ্গে বস্তুর খাঁটি সত্য এবং সমগ্র সত্যের মিল থাকে না, মন যাহা কিছু কেবল বাহিরের ক্ষেত্রে গড়িয়া তোলে তাহা ভ্রান্তিজনক হয়, তাহার মধ্যে একদেশদর্শিতা এবং অগভীরতা থাকিয়া যায়, এই সমস্ত কারণে আমাদের ব্যর্থতা আসিয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের কেবল যে জ্ঞানের সঙ্গে

জ্ঞানের বিরোধ আছে তাহা নহে, আমাদের একই সত্তার মধ্যে সঙ্কল্পের সহিত সঙ্কল্পের এবং জ্ঞানের সহিত সঙ্কল্পের, বৈষম্য বিচ্ছেদ ও অসামঞ্জস্য দেখা যায়, তাই যখন আমাদের জ্ঞান পর্য্যাপ্ত এবং পরিপক্ক, সত্তার মধ্যে কোন সঙ্কল্প তখন হয়ত তাহার বিরোধী হইয়া দাঁড়ায় অথবা সহযোগিতা করে না, আবার যখন সঙ্কল্প বীর্য্যবন্ত, দৃঢ় বা তীব্র সংবেগশালী অথবা সফল হইবার সামর্থ্য-যুক্ত, তখন যে জ্ঞান তাহাকে সত্যপথে চালিত করিবে তাহার হয়ত অভাব রহিয়াছে দেখা যায়। আমাদের জ্ঞানে, সঙ্কল্পে, সামর্থ্যে, ক্রিয়াশক্তিতে এবং আচরণে সকল প্রকার অসামঞ্জস্য অব্যবস্থা ও অপূর্ণতা আমাদের কর্ম্ম ও জীবনধারার সকল সাধনার মধ্যে আসিয়া বাসা বাঁধে, এবং তাহাদের অপূর্ণ ও অসিদ্ধ থাকিয়া যাইবার প্রবল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই অব্যবস্থা ত্রুটি বিচ্যুতি এবং অসামঞ্জস্য অবিদ্যার মধ্যে স্থিতির এবং অবিদ্যাশক্তির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, মনোময় এবং প্রাণময় প্রকৃতির আলোক অপেক্ষা বৃহত্তর আলোকেই শুধু তাহারা দূর হইতে পারে। বিজ্ঞানময় ভূমির সকল দর্শন এবং কর্ম্মের সহজ ধর্ম্ম সত্যের সঙ্গে সত্যের একত্ব, প্রামাণিকতা এবং সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠা ; মন যেমন বিজ্ঞানময় চেতনার মধ্যে উন্মিষিত হইতে থাকে তেমনি আমাদের মনোময় দর্শন এবং কর্ম্মও সেই বিজ্ঞানের আলোকের মধ্যে উন্নীত হইতে অথবা তাহার আবেশে এবং প্রশাসনে এই নূতন ধর্ম্ম লাভ করিতে থাকে, এবং যদিও তাহার সীমার বন্ধন তখনও কাটিয়া যায় নাই তথাপি সেই সীমার মধ্যে অনেক বেশী পূর্ণ এবং কার্য্যকরী হইয়া উঠে ; আমাদের অসামথ্য এবং বিফলতার সকল কারণ ক্ষয় পাইতে থাকে এবং অবশেষে নিঃশেষ হইয়া যায়। সেই সঙ্গে বিপুলতর চেতনা এবং বৃহত্তর শক্তির অকুণ্ঠ সামর্থ্য লইয়া এক মহত্তর সত্তা মনকে আক্রমণ ও অধিকার করে এবং সত্তার মধ্যে নূতন শক্তিসকল ফুটাইয়া তোলে। জ্ঞান চেতনারই শক্তি এবং ক্রিয়া, সঙ্কল্প সত্তার শক্তির সচেতন বীর্য্য এবং সচেতন ক্রিয়া ; বিজ্ঞানময় পুরুষের মধ্যে জ্ঞান এবং সঙ্কল্প এ উভয়ই আমরা যাহা জানি তাহা অপেক্ষা বিপুলতর পরিমাণে পরিস্ফুরিত হইবে ; তাহাদের সংবেগ ও সাধনবীর্য্যে প্রবল প্রসারতা ঘটিবে ; কেননা যেখানেই চেতনার বিবৃদ্ধি বা উপচয় ঘটে সেখানেই সত্তার ব্যক্ত এবং অব্যক্ত শক্তিও বৃদ্ধি পায়।

জ্ঞান এবং শক্তির পার্থিব রূপায়ণে তাহাদের মধ্যের এই সম্বন্ধ খুব স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় না, কেননা সেখানে চেতনা নিজেই এক আদি নিশ্চেতনার

মধ্যে সংবৃত ও গুপ্ত ছিল এবং তাহার স্বাভাবিক শক্তি ও তাহার প্রকাশের ছন্দ, অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপের জন্য ক্ষুব্ধ ও কুণ্ঠিত হইয়াই উন্মিষিত হয়। নিশ্চেতনাই সেখানে আদি বীর্য্যবন্ত এবং স্বয়ংক্রিয় কার্য্যকরী শক্তি, সচেতন মন কেবল তাহার আয়াস-ক্লিষ্ট ক্ষুদ্র এক অনুচর মাত্র; কিন্তু তাহার কারণ এই আমাদের মধ্যে সচেতন মনের শুধু সীমিত ব্যষ্টিভাবে ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য আছে আর নিশ্চেতনা হইল বিশ্বগত এক গোপন চেতনার অমেয় ক্রিয়াধারা; যে বিশ্বশক্তি আমাদের নিকট জড়ের ছদ্মবেশে উপস্থিত হইয়াছে সে তাহার জড় ক্রিয়াধারার নির্ব্বন্ধাতিশয় দ্বারা এই রহস্য আমাদের কাছে গোপন রাখিয়াছে যে নিশ্চেতনার ক্রিয়াধারা বস্তুতঃ এক বিরাট বিশ্বপ্রাণের, এক আবৃত বিশ্বমনের, এক অন্তর্গূঢ় বিজ্ঞানঘন চেতনারই আত্মপ্রকাশ; নিশ্চেতনার মর্ম্মমূলে এই সমস্ত যদি না থাকিত তবে তাহার কোন ক্রিয়াশক্তি থাকিত না, তাহার ক্রিয়াধারার মধ্যে সুব্যবস্থিত কোন ছন্দ বর্ত্তমান থাকিত না। জড়জগতে মনে হয় প্রাণ-শক্তি মন অপেক্ষা অধিক বীর্য্যবন্ত এবং ফলপ্রসূ; শুধু ভাবনা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে মন স্বাধীন এবং সেখানে তাহার পূর্ণশক্তির প্রকাশ; মননের এই নিজস্ব-ক্ষেত্রের বাহিরে তাহার ক্রিয়া ও সফলতালাভের শক্তি প্রাণ এবং জড়কে যন্ত্র-রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং তাহাকে প্রাণ ও জড়ের দ্বারা অরোপিত বিধান মানিয়া চলিতে হয়, ফলে মন তাহার ক্রিয়াতে বাধা পায় এবং কেবল অর্দ্ধফলপ্রসূ মাত্র হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও দেখি যে নিজের সঙ্গে এবং প্রাণ ও জড়ের সঙ্গে ব্যবহারে মনোময় সত্তার প্রাকৃতিক শক্তি পশুর প্রাকৃতিক শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী; এই উৎকর্ষ মানুষের মধ্যে চেতনা ও জ্ঞানের উদারতর বীর্য্য, সত্তার এবং সঙ্কল্পের বৃহত্তর শক্তির উন্মেষের ফল। মানবসমাজে মনোময় মানুষের অপেক্ষা প্রাণময় মানুষের মধ্যে তাহার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যের এবং উৎকর্ষের জন্য ক্রিয়াশক্তির বীর্য্যও অনেক বেশী দেখিতে পাওয়া যায়; বুদ্ধিজীবী মানুষ ভাবনা এবং মননের ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী হইলেও জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারে সে অক্ষম; পক্ষান্তরে বীর্য্যবন্ত ক্রিয়াশীল প্রাণময় মানুষ জীবনের ক্ষেত্রে হয় বিজয়ী। কিন্তু মননশক্তির ব্যবহারই তাহাকে এই উৎকর্ষ পূর্ণরূপে কার্য্যে প্রয়োগ করিতে সমর্থ করে; জড়াশ্রিত প্রাণ তাহার নিজের শক্তিতে যাহা সাধিত করিতে পারে অথবা ফলিত বিজ্ঞানের সাহায্য না লইয়া প্রাণময় মানুষ তাহার প্রাণশক্তি এবং প্রাণের সহজাত বৃত্তি-সকলের সাহায্যে যে সফলতা লাভ করে, মনোময় মানুষ জ্ঞানের শক্তি ও

জড়বিজ্ঞানের বলে শেষ পর্য্যন্ত জীবনের উপর তদপেক্ষা অনেক বেশী আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইতে পারে। যখন মনের অপেক্ষাও এক বৃহত্তর চেতনা উন্মিষিত হইয়া উঠিবে এবং আমাদের ব্যষ্টিভাবাপন্ন সীমিত জীবনের মধ্যে যে বাধাপ্রাপ্ত বা কুণ্ঠিত মনোময় ক্রিয়াশক্তি আছে তাহার স্থান অধিকার করিবে তখন সমস্ত জীবন এবং প্রকৃতির উপর এক অতিবিরাট শক্তির আধিপত্য প্রকাশ পাইবে।

মন যখন নিজের এবং জগতের উপর বৃহত্তম প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হয় তখনও মূলতঃ মনের উপর প্রাণ এবং জড়ের কিছু প্রশাসন থাকে যাহা মনকে মানিয়াই চলিতে হয়, তখনও মনের বিধান সাক্ষাৎভাবে প্রধান হইয়া বসিতে পারে না তখনও মন তাহার শক্তি দিয়া সত্তার এই সমস্ত অন্ধ নিম্নতর শক্তির বিধান এবং ক্রিয়াধারাকে পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না; কিন্তু মনের শক্তির এই দৈন্য যে দূর করা যায় না তাহা নহে। রহস্য-বিদ্যা আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একটা বীর্য্যবন্ত শক্তি হইতেও আমরা প্রমাণ পাই যে মনের উপর জড়ের এই প্রভুত্ব চিৎসত্তার উপর প্রাণের নিম্নতর বিধানের এই আধিপত্য চিরকাল থাকিয়াই যাইবে ইহাই প্রথমতঃ বোধ হইলেও বস্তুতঃ তাহা বস্তুব স্বরূপগত ব্যবস্থা বা অলঙ্ঘ্য এবং অপরিবর্ত্ত-নীয় বিধান নয়। মানুষের বৃহত্তম এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক আবিষ্কার এই যে মন এবং বিশেষ করিয়া চিৎশক্তি সকল দিকে পরীক্ষিত অথবা অপরীক্ষিত নানা উপায়ে তাহার নিজ প্রকৃতি এবং সাক্ষাৎ শক্তিদ্বারা— এবং কেবল জড়বিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত উচ্চতর জড়যন্ত্রের মত কোন কল কৌশল দ্বারা নহে—জীবন ও জড়কে জয় ও শাসন করিতে পারে। বিজ্ঞানময় পরা চেতনার উন্মেষে চেতনার এই অপরোক্ষবীর্য্য সত্তার এই শক্তির সাক্ষাৎ ক্রিয়া প্রাণ এবং জড়ের উপর তাহার প্রভুত্ব ও প্রশাসন পরিপূর্ণ হইবে এবং তাহাদের চরম উৎকর্ষে পৌঁছিবে। কেননা বিজ্ঞানময় পুরুষের এই বৃহত্তর জ্ঞান প্রধানতঃ বাহ্যভাবে লব্ধ বা শিক্ষাদ্বারা প্রাপ্ত নহে তাহা চেতনা এবং তাহার শক্তির উন্মেষ ও পরিণতির, এক নব ভাবে সত্তার আত্মবীর্য্য প্রকাশের ফল। ইহার ফলে তিনি বহু বস্তুর জ্ঞানে জাগরিত হইবেন তাহাদের আয়ত্ত করিবেন, তাহার মধ্যে জাগিবে স্পষ্ট এবং পূর্ণ আত্মজ্ঞান, অপর সকলের সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান, গোপন শক্তি সকলের সাক্ষাৎ জ্ঞান এবং দেহমন প্রাণ যন্ত্রের সকল রহস্যের সাক্ষাৎ জ্ঞান, —যে সমস্ত জ্ঞান আজিও আমাদের প্রাকৃত মনের অগোচরে রহিয়াছে।

এক সাক্ষাৎ বোধিচেতনা এবং বোধির প্রশাসনই হইবে এই নূতন জ্ঞান এবং তাহার ক্রিয়ার ভিত্তি ; আজ আমাদের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত রহিয়াছে তেমন এক নূতন ক্রিয়াশীল অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে এবং সেই চেতনা আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িবে, এবং এই রূপান্তরের ফলে সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা সমগ্র এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, নিশ্চিত ও পূর্ণাঙ্গরূপে ফলপ্রসূ হইবে। কেননা সকল বস্তুর মূলে যে চিৎশক্তি রহিয়াছে বিজ্ঞানময় পুরুষ তাহার সহিত যোগযুক্ত থাকিবেন, তাঁহার জীবনও তাঁহার সহিত এক সুরে বাঁধা থাকিবে ; তাঁহার দৃষ্টি এবং সঙ্কল্পের মধ্য দিয়া অতিমানস সম্ভূত বিজ্ঞানের (Real-Idea) স্বয়ংক্রিয় সত্যশক্তির প্রকাশ হইবে ; যাঁহার চেতনার রূপায়ণরাজি মন প্রাণ এবং জড়ের মধ্যে অমোঘভাবে ফুটিয়া উঠে সেই সচেতন সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতা-পুরুষের যে শক্তি জগৎ এবং জীবনের মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞানময় পুরুষের ক্রিয়া হইবে সেই শক্তির স্বাধীন আত্মপ্রকাশ এবং প্রস্ফুরণ। উন্মিষন্ত বিজ্ঞানময় পুরুষ অতিমানস জ্ঞানের আলোক এবং শক্তিতে ক্রিয়া করিয়া ক্রমশঃ অধিকতর রূপে নিজের, চেতনা এবং প্রকৃতির সকল শক্তির, প্রাণময় এবং জড়-ময় যন্ত্রসমূহের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবেন। উন্মিষন্ত বিজ্ঞানময় প্রকৃতির নিম্নতর ভূমিতে, অর্থাৎ মন এবং অতিমানসের মধ্যবর্ত্তী-স্তর বা রূপায়ণসমূহে এই শক্তি পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকিবে না ইহা সত্য ; তবু সেখানে তাহার ক্রিয়া-ধারা কিছু পরিমাণে দেখা যাইবে ; সেখানে তাহার প্রারম্ভ এবং আরোহণের স্তরে স্তরে তাহা বাড়িয়া চলিবে ; চেতনা এবং জ্ঞানের বিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এ শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে।

চিৎশক্তি তাহার আত্মপ্রকাশের পরিণামধারা ধরিয়া যখন মনের ভূমি পার হইয়া উচ্চতর জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির ভূমিতে পৌঁছিতে থাকে তখন তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে চেতনার নব নব শক্তিসকল জাগিয়া উঠে। তাহাদের স্বরূপ প্রকৃতি অনুসারে এই সমস্ত নূতন শক্তির ধর্ম্মে দেখা যাইবে যে প্রাণ ও জড়ের উপর মনের, জড়ের উপর সচেতন প্রাণ সঙ্কল্প এবং প্রাণশক্তির, মন প্রাণ জড়ের উপর চিৎসত্তার প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; তাহা ছাড়া এই নবাগত শক্তির আত্মপ্রকৃতিই হইবে এক জীবাত্মা এবং অন্য জীবাত্মার, এক মন এবং অন্য মনের, এক প্রাণ এবং অন্য প্রাণের মধ্যে ভেদের যে সমস্ত দেওয়াল আছে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া ; বিজ্ঞানময় জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ পরিবর্ত্তন আসা অপরিহার্য্য। কেননা পরিপূর্ণ বিজ্ঞানময় বা দিব্যজীবনের মধ্যে

সত্তার ব্যক্তিগত জীবন শুধু থাকিবে না, ঐক্য-বিধায়ক এক সাধারণ চেতনার মধ্যে ব্যষ্টিজীবন অপর সকল জীবনের সহিত এক হইয়াই বর্ত্তমান থাকিবে। সেরূপ জীবনের প্রধান স্বভাবশক্তি হইবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাভাবিক একত্ব এবং সৌষম্য, কোন কৃত্রিম একত্ব বা সামঞ্জস্য নয় ; এই অবস্থা কেবল তখনই আসিতে পারে যখন প্রত্যেক ব্যষ্টিসত্তা অপর সকল ব্যষ্টিসত্তার সহিত তাহাদের চিন্ময় উপাদানে মিলিত এবং একীভূত হওয়ার ফলে সত্তা এবং চেতনার এই বৃহত্তর একত্ববোধ জাগিয়া উঠে ; যখন প্রত্যেকে অনুভব করেন যে তিনি এক আত্মা, যিনি অদ্বয় পরমাত্মা তাঁহারই আত্মস্বরূপ, যখন তাহাদের সকল কার্য্যের মূলে থাকে একত্বমূলক জ্ঞানের এক বীর্য্য, সত্তার বৃহত্তর এক শক্তি। তখন আসিবে অদ্বয় চেতনা ও তাদাত্ম্যজ্ঞানের ভিত্তিতে অন্তরঙ্গভাবে পরস্পরের সাক্ষাৎ জ্ঞান, পরস্পরের সত্তা, ভাবনা বেদনা, ভিতরের এবং বাহিরের গতি প্রবৃত্তির নিবিড় অনুভূতি, মনের সঙ্গে মনের, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সচেতন যোগাযোগ ; প্রাণের সহিত প্রাণের সচেতন সংস্পর্শ এবং মিলন, সত্তার শক্তির সহিত সত্তার শক্তির পরস্পর সচেতন বিনিময় ; এই সমস্ত শক্তি এবং তাহাদের অন্তরের আলোকের অভাব বা ন্যূনতা থাকিলে একত্ববোধ খাঁটি এবং পূর্ণ হইতে অথবা প্রত্যেক ব্যষ্টিপুরুষ সত্তা, ভাবনা বেদনা অন্তরের এবং বাহিরের গতি প্রবৃত্তিতে তাহার চারিদিকে অবস্থিত অপর সকলের সহিত খাঁটি সহজ ও সম্পূর্ণভাবে সঙ্গত এবং মিলিত হইতে পারে না। আমরা বলিতে পারি যে এই অধিকতর পরিণত জীবনের ধর্ম্ম এই হইবে যে সচেতনভাবে একত্ব-বোধের ভিত্তি ক্রমশঃ দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সৌষম্যই চিৎসত্তার স্বাভাবিক বিধান, বহুর মধ্যে একের, বৈচিত্র্যের মধ্যে অখণ্ডতার, অদ্বৈত স্বরূপের বহুরূপে আত্মপ্রকাশের ইহাই স্বভাবছন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত পরিণাম। শুদ্ধ নির্ব্বিষয় অদ্বয় তত্ত্বের মধ্যে বস্তুতঃ কোন সৌষম্যের স্থান নাই, কেননা সৌষম্যের সূত্রে গাঁথিয়া তুলিবার কোন বস্তুই তথায় নাই ; যেখানে পুরাপুরি বহুত্বই শুধু আছে অথবা যেখানে বহুত্বই সব কিছুকে শাসন ও পরিচালন করে সেখানে হয় বিরোধ বা বৈষম্য আছে অথবা ভেদ এবং বৈচিত্র্যকে কোনরূপে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া একটা কৃত্রিম সৌষম্য গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানময় চেতনায় বহুর মধ্যে যে একত্বের অনুভব থাকিবে সেখানে সৌষম্য হইবে একত্বেরই এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মপ্রকাশ, এবং এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ হইতে বুঝা যাইবে যে তাহার মূলে

রহিয়াছে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ এবং বিনিময় দ্বারা যাহা অপর চেতনাকে জানে এমন এক অন্যোন্যচেতনা। যেখানে বুদ্ধি ও বিচারশক্তি উন্মিষিত হয় নাই সেই ইতর প্রাণীর জগতে প্রাকৃতিক এক সহজাত একত্ব আছে এবং প্রকৃতিবশে তাহাদের ক্রিয়াধারা সহজাতভাবে একই রূপে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া তথায় সৌষম্য রক্ষিত হয়, তাহারা সহজাত বৃত্তিবশে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে; এক প্রকার সহজাত বৃত্তি বা প্রাণজ বোধির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় বোধ তাহাদের আছে, এই সমস্তের সহায়তায় পশু বা কীট-পতঙ্গ-সমাজের ব্যষ্টি প্রাণীগণ পরস্পরের সহযোগিতা করিতে পারে। মানুষের মধ্যে ইন্দ্রিয় জ্ঞান এবং মনোময় ধারণার ও ভাষার সাহায্যে ভাবের আদানপ্রদানের মধ্য দিয়া বুদ্ধির দ্বারা সৌষম্য স্থাপনের চেষ্টা চলে, কিন্তু যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হয় তাহারা সকলই অপূর্ণ বলিয়া সৌষম্য এবং সহযোগিতাও অপূর্ণ থাকিয়া যায়। বিজ্ঞানময় জীবন বুদ্ধির অতীত ক্ষেত্রে পরাপ্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সত্তার চিন্ময় একত্বের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মজ্ঞান এবং প্রকৃতিতে পরস্পরের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবে সচেতন যোগাযোগ এবং অন্যোন্য বিনিময় পরস্পরকে জানিবার ও বুঝিবার মূল হওয়াতে জানা ও বোঝা হয় গভীর এবং প্রচুর; এই বৃহত্তর জীবন চেতনার সহিত চেতনার অন্তরঙ্গ মিলন এবং ঐক্যসাধনের জন্য শ্রেষ্ঠতর নূতন উপায় এবং শক্তিসকল উন্মিষিত করিয়া তুলিবে; সেখানে ভাব বিনিময়ের স্বাভাবিক মূলীভূত সাধন-যন্ত্র হইবে চেতনার সহিত চেতনার, ভাবনার সহিত ভাবনার, দর্শনের সহিত দর্শনের, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের, দৈহিক চেতনার সহিত দৈহিক চেতনার সাক্ষাৎ ও অন্তরঙ্গ যোগাযোগ। এই সমস্ত নূতন শক্তি পুরাতন বহির্ম্মুখী যন্ত্রসকলকে গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের মধ্যে বিপুল এবং সার্থক বীর্য্য সঞ্চার করিয়া গৌণ উপায়রূপে ব্যবহার করিবে এবং সত্তা ও জীবনের গভীর একত্বের মধ্যে চিৎপুরুষের আত্মপ্রকাশের কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত রাখিবে।

চেতনার যে সব শক্তি স্বভাবসিদ্ধরূপে গুপ্তভাবে অবস্থিত আছে, এখনও উন্মিষিত হইয়া ওঠে নাই তাহারা যে উন্মিষিত হইয়া উঠিবে একথা আধুনিক মন স্বীকার করিতে চায় না, কারণ আমাদের মনে বর্ত্তমানে যাহা রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে তাহারা পড়ে না, সীমিত এবং সঙ্কীর্ণ অনুভূতিজাত অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনের ধারণায় সে সমস্ত অতিপ্রাকৃত গোপন রহস্যের মধ্যে শুধু পড়ে বলিয়া বোধ হয়, কেননা একমাত্র যাহাকে সর্ব্ববস্তুর কারণ ও প্রকাশধারা

বলিয়া অথবা বিশ্বশক্তি একমাত্র যাহা সাধন করিতে সমর্থ বলিয়া সাধারণত স্বীকার করা হয় সেই পরিচিত জড়শক্তির ক্রিয়াকে অতিক্রম করিয়া এ সমস্ত শক্তি বর্ত্তমান আছে। জড়শক্তির ক্রিয়াধারার মধ্যে প্রকৃতি নিজে যাহা কিছু গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায় এমন অভাবনীয় আশ্চর্য্য কোন কিছু, সচেতন মানব-সত্তা যখন আবিষ্কার করে এবং অনুশীলন দ্বারা তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া তোলে তখন এই আধুনিক মনই তাহা একটা স্বাভাবিক তথ্য বলিয়া স্বীকার করে, এবং এইরূপ অভিনব আবিষ্কারের অসীম সম্ভাবনা আছে বলিয়া আশায় উল্লসিত হয়, কিন্তু সেই মনই স্বীকার করিতে চায় না যে প্রকৃতি অথবা মানুষ আজ যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে এমন কিছু আবিষ্কার করিতে বা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ চেতনার কোন বীর্য্য, চিন্ময় মনোময় বা প্রাণময় কোন শক্তি জাগরিত বা ক্রিয়াশীল হইতে পারে। কিন্তু এরূপ উন্মেষের মধ্যে অতিপ্রাকৃত বা অজ্ঞেয় কোন রহস্য নাই কেবল ইহাই বলা চলে যে মানব-প্রকৃতি যে হিসাবে পশু উদ্ভিদ এবং জড়বস্তুর প্রকৃতির তুলনায় অতিপ্রাকৃত বা শ্রেষ্ঠতর কিছু, এই অভিনব উন্মিষিত বস্তুর প্রকৃতি বর্ত্তমান মানব-প্রকৃতির কাছে সেই হিসাবে অতিপ্রাকৃত বা শ্রেষ্ঠতর কিছু। পরিণামধারার মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে মন এবং তাহার শক্তির, বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির, মনোময় বোধি ও অন্তর্দৃষ্টির, ভাষার, দর্শন বিজ্ঞান এবং রসচেতনার নানা সম্ভাবনার আবিষ্কারের মধ্য দিয়া সত্তার বহু সত্য এবং নানা বীর্য্যের উন্মেষ ও প্রকাশ ঘটিয়াছে, ইহাদিগকে শাসিত ও পরিচালিত করিবার শক্তিও আমরা লাভ করিয়াছি ; কিন্তু পশু জগতের সীমিত চেতনা এবং সামর্থ্যের মধ্য হইতে দেখিলে এ সমস্ত অসম্ভব মনে হইত ; কেননা সেখানে এমন কিছু দেখা যায় না যাহাতে এই বিপুল প্রগতির আশা তথায় জাগিতে পারে। কিন্তু তথাপি পশুর মধ্যে অস্পষ্টরূপে এমন সব প্রাথমিক প্রকাশ অপরিণত আদিম উপাদান বা রুদ্ধ সম্ভাবনা ছিল, যাহারা এক নিঃস্ব ও নিঃসার অবস্থা হইতে যাত্রা করিয়া অকল্পনীয় এবং অভাবনীয় পথে আমাদের মননশক্তি ও বিচারবুদ্ধির এই অসাধারণ পরিণতি এবং ঐশ্বর্য্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তেমনিভাবে বিজ্ঞানময় পরাপ্রকৃতির অনেক চিন্ময় শক্তি বীজরূপে বা প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের প্রাকৃত সত্তার মধ্যেও রহিয়াছে কিন্তু কেবল কখনও কখনও তাহারা কুণ্ঠিতভাবে ক্রিয়াশীল হয় মাত্র। মানুষ পরিণামধারায় আজ যে উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছে তাহাতে ইহা আশা করা অযৌক্তিক নহে যে তাহার মধ্যস্থিত

এই সমস্ত প্রথমিক সূচনা হইতে যাত্রা করিয়া এক বৃহত্তর প্রগতির পথে সে আর এক অতিবিপুল পরিণতির ক্ষেত্রে পৌঁছিবে।

স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে অথবা অন্য কোন উপায়ে যথা ইচ্ছাশক্তি বা সাধনার দ্বারা কিম্বা চিৎশক্তির স্বাভাবিক পরিণতিবশে, রহস্যময় অনুভূতির মধ্য দিয়া অন্তরের কেন্দ্রগুলি যখন খুলিতে থাকে, তখন চেতনার অভিনব শক্তিসকল উন্মিষিত হয় ইহা সাধকের জানা আছে; অন্তশ্চেতনার কোন অংশের উন্মীলনে স্বতঃ-স্ফূর্ত্তভাবে অথবা সত্তার আকৃতির বা আবাহনের সাড়ারূপে যে ভাবেই হউক না কেন তাহাদের স্ফুরণ এত স্বাভাবিক যে সাধককে এই সমস্ত শক্তি বা ঋদ্ধি খুঁজিতে নিষেধ করিবার, তাহাদিগকে স্বীকার এবং ব্যবহার না করিবার জন্য উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা পার্থিব জীবন হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে এ সমস্ত ঋদ্ধি বর্জন যুক্তিসঙ্গত; কেননা বৃহত্তর শক্তিসকলকে স্বীকার করিয়া লইলে সাধকের জীবনের বন্ধন দৃঢ়তর হইবে অথবা অন্য সব কিছু বাদ দিয়া একমাত্র মুক্তির দিকে যাঁহাদের তীব্র সংবেগ আছে তাঁহাদের পক্ষে বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবৎ প্রেমিক ভগবানের জন্যই ভগবানকে চান, শক্তি বা অন্য কোন নিম্নতর কাম্যবস্তুর জন্য চাহেন না, তাই অন্য কোন পুরুষার্থলাভে উদাসীন হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; এই সমস্ত লোভনীয় এবং অনেকক্ষেত্রে বিপজ্জনক শক্তির অনুসরণ করিবার ফলে সাধক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। অধ্যাত্ম-সাধনার পথে আত্মসংযম, তপস্যা বা নিয়মনিষ্ঠার জন্য কাঁচা বা প্রবর্ত্তসাধকের পক্ষেও অনুরূপভাবে এ সমস্তের বর্জন প্রয়োজন, এই সমস্ত শক্তিলাভ তাহার পক্ষে বিশেষ এমন কি মারাত্মক বিপদের কারণ হইতে পারে, কেননা এই সমস্ত অলৌকিক শক্তির খোরাক পাইয়া তাহার অহং অতিরিক্ত পরিমাণে স্ফীত হইয়া উঠিতে পারে। পূর্ণতা-কামী নিজের মধ্যে শক্তির প্রকাশ দেখিলে তাহাকে প্রলোভনজনক মনে করিয়া ভীত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতে পারে, কেননা শক্তি যেমন মানুষকে উন্নত তেমনি অধঃপতিত করিতে পারে; শক্তির যত অপপ্রয়োগ হইতে পারে তেমন আর কিছুরই নয়; কিন্তু যখন চিন্ময়পরিণামের বশে সাধক বৃহত্তর চেতনা এবং জীবনের মধ্যে উন্মিষিত ও বিবৃদ্ধ হইয়া উঠে তখন তাহার অপরিহার্য্য ফলরূপে নূতন সামর্থ্যসকল লাভ হয়; এবং যখন অধ্যাত্মচেতনা ও জীবনের সেই প্রসার ও বিবৃদ্ধি আমাদের মধ্যস্থিত চিন্ময় সত্তার পরম উদ্দেশ্যেরই অঙ্গ হয়, এ সমস্ত শক্তিকে তখন বর্জন করিবার প্রয়োজন থাকে না; কেননা সত্তা

এবং জীবনের পরা প্রকৃতির মধ্যে উন্মেষ এবং বিবৃদ্ধি হইতে পারে না অথবা তাহা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না যদি তাহার সঙ্গে চেতনা এবং জীবনে বৃহত্তর শক্তি আসিয়া না পড়ে, সে-পরাপ্রকৃতির পক্ষে যাহা স্বাভাবিক সেই জ্ঞান ও শক্তিরূপ সাধন সম্পদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভ্যুদয় ও বিবৃদ্ধি যদি না ঘটে। সত্তার এই ভবিষ্যপরিণামের মধ্যে এমন কিছু নাই যাহাকে অযৌক্তিক বা অবিশ্বাস্য মনে করা যাইতে পারে, এমন কিছু নাই যাহা অস্বাভাবিক বা অলৌকিক ; চেতনা এবং তাহার শক্তির পরিণামের ধারায় আমাদের জীবন যখন মনোময় ভূমির উপরে উঠিয়া বিজ্ঞানময় বা অতিমানস ক্ষেত্রে রূপায়িত হইয়া উঠিবে তখন ইহা অবশ্যই ঘটিবে। আত্মপরিণামের ধারায় সত্তা যখন এই নূতন উচ্চতর ও বৃহত্তর চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হইবে তখন সহজ স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে পরাপ্রকৃতির এই সকল শক্তির খেলা দেখা দিবে ; মনোময় প্রকৃতিতে বর্দ্ধিত হওয়া এবং তাহার মনোময় শক্তিসকলকে ব্যবহার করা যেমন মানুষের স্বধর্ম্ম, বিজ্ঞানময় পুরুষ বিজ্ঞানময় জীবন গ্রহণ করিলে এই বৃহত্তর চেতনার শক্তিসকলের স্ফুরণ হওয়া এবং তাহাদিগকে ব্যবহার করা তেমনি তাঁহার স্বভাবগত ধর্ম্ম।

ইহা স্পষ্ট যে বৃহত্তর এবং পূর্ণতর জীবনে চেতনার শক্তি বা শক্তিসকলের এইরূপ বিবৃদ্ধি কেবল স্বাভাবিক নয় অপরিহার্য্যও বটে। মানুষের জীবনে সৌষম্যের স্থান এখনও সীমিত, অনেক সময় তথায় আংশিক সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় সমাজের মধ্যস্থিত ব্যষ্টি ব্যক্তিবর্গের উপর নির্দ্ধারিত বিধান এবং ব্যবস্থা চাপাইয়া দিয়া ; তাহারা সে সব মানিয়া চলে কতক স্বেচ্ছায়, কতক অনুরোধে, কতক বাধ্য হইয়া, কতক তাহাদের উপর বল প্রয়োগের ফলে স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই বলিয়া ; যেখানে এই সমস্ত কারণ বর্ত্তমান নাই, তথায় সামঞ্জস্য নির্ভর করে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মন, হৃদয় ও প্রাণবোধের মধ্যস্থিত আলোকিত বা স্বার্থ সম্বন্ধযুক্ত উপাদানসকলের ঐক্য ও মিলনের উপর ; সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণা, প্রাণের পরিতৃপ্তি, জীবনের আদর্শ প্রভৃতি দ্বারা গঠিত নানা ভাব ও ভাবনাবলিকে স্বীকার করিয়াই সে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। কিন্তু গণমন যে সকল ভাব বা ধারণা, জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে সমাজের অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান এবং বোধের অপূর্ণতা থাকিয়া যায় ; সে আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তুলিবার কার্য্যকরী শক্তি তাহাদের অপূর্ণ, অক্ষুণ্নভাবে সর্ব্বদা সে আদর্শ বজায়

রাখিবার অথবা তাহা জীবনে পূর্ণরূপে সার্থক করিয়া তুলিবার অথবা জীবনের মধ্যে বৃহত্তর পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সঙ্কল্প বা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োজন তাহাও যথোচিতভাবে তাহাদের মধ্যে থাকে না ; তাহাদের মধ্যে থাকে কত দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য, কত দমিত বা অসার্থক বাসনা ও ব্যর্থ সংকল্পের তাড়না, কত অবদমিত ও ধূমায়িত অতৃপ্তির জ্বালা, কত অসমভাবে তৃপ্ত স্বার্থজাত প্রবল অশান্তির জাগরণ বা জ্বালাময় বিস্ফোরণ ; আবার সমাজের মধ্যে আসিয়া পড়ে কত নূতনভাব, প্রাণপুরুষের কত নূতন স্বার্থ ও বাসনার আক্রমণ, কিন্তু বিদ্রোহ এবং বিপর্য্যয় ছাড়া তাহাদিগকে পুরাতনের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া লইবার শক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না ; যে সামঞ্জস্য গড়িয়া তোলা হইয়াছে তাহার বিরোধী কত প্রাণশক্তি মানুষের জীবন এবং তাহার পরিবেশের উপর ক্রিয়া করে ; বহু মন এবং প্রাণের সংঘর্ষে এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যস্থ ধ্বংসকারী শক্তি-সকলের আক্রমণে কত বৈষম্য এবং বিপর্য্যয় ঘটে, তাহাদিগকে জয় করিবার উপযুক্ত শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে যাহার অভাব রহিয়াছে সে হইল চিন্ময় জ্ঞান এবং চিন্ময়ী শক্তি ; আত্মজয়ের শক্তি, অপরের সহিত অন্তরের ঐক্যবোধজাত শক্তি, পরিবেশের বা আক্রমণকারী বিশ্ব-শক্তির উপর প্রভুত্ব, জ্ঞানকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য পূর্ণজাগ্রত ও পূর্ণসমৃদ্ধ সামর্থ্য ; এই যে সমস্ত সামর্থ্য বা শক্তির অভাব বা ন্যূনতা আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, বিজ্ঞানময় পুরুষের মধ্যে তাহার উপাদানরূপেই সে সকল রহিয়াছে, কেননা বিজ্ঞানময় প্রকতির আলোক এবং বীর্য্যের মধ্যে তাহারা স্বভাবসিদ্ধ রূপেই বর্ত্তমান আছে।

কিন্তু যাহাদের লইয়া মানবসমাজ গঠিত কেবল সেই ব্যষ্টিব্যক্তিগণের পরস্পরের মন, হৃদয় ও প্রাণের মিলন এবং সামঞ্জস্যের যে অভাব বা অপূর্ণতা আছে তাহা নহে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই মন এবং প্রাণ এমন সকল শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় যাহাদের পরস্পরের মধ্যে একতানতা নাই ; তাহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য আমাদের চেষ্টা ও সাধনা অপূর্ণ, ততোধিক অপূর্ণ সেই শক্তি যাহার বলে আমরা তাহাদের কোন একটিকে জীবনে পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক করিয়া তুলিতে পারি। এই যেমন, প্রেম ও সমবেদনা আমাদের চেতনার স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; চেতনার পরিণতির সঙ্গে আমাদের উপর তাহাদের দাবি বাড়িয়া চলে ; কিন্তু আমাদের উপর আরও অনেক বৃত্তির দাবি আছে—আছে বুদ্ধির দাবি, প্রাণ-শক্তি এবং তাহার সংবেগের দাবি, মৈত্রী এবং করুণার সহিত যাহাদের মিল

নাই এমন অনেক বৃত্তির চাপ ও দাবি ; এ সমস্ত বৃত্তিকে আমাদের অখণ্ড-জীবনের মধ্যে কি করিয়া মিলাইয়া লওয়া যাইবে তাহা আমাদের জানা নাই, অথবা ইহাদের সকলকে বা কোন একটিকে কি করিয়া পরিপূর্ণরূপে সার্থক অথবা অমোঘবীর্য্য করিয়া তোলা যাইবে তাহাও আমরা জানি না। সমগ্র সত্তায় এবং জীবনে এই সকল বৃত্তির মধ্যে সুরসঙ্গতি স্থাপন এবং সক্রিয়ভাবে তাহাদিগকে সার্থক করিতে হইলে আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মধ্যে আমাদিগকে পূর্ণরূপে উন্মীলিত হইতে হইবে, এবং এই উন্মীলনের ফলে যাহার মধ্যে জ্ঞান ও শক্তি, প্রেম ও করুণা এবং প্রাণসঙ্কল্পের সকল খেলা স্বাভাবিকভাবে এক সুরে বাঁধা উপাদানরূপে নিত্য বর্ত্তমান, সেই উচচতর বৃহত্তর এবং পূর্ণাঙ্গতর চেতনা আলোক এবং শক্তির মধ্যে আমাদিগকে বাস করিতে হইবে ; যাহা কি করিতে হইবে এবং কি ভাবে করিতে হইবে তাহা বোধির সাহায্যে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে দেখিতে পায় এবং বোধির সাহায্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই যাহা কর্ম্ম এবং শক্তির মধ্যে তাহা সার্থক করিয়া তোলে, সেই সত্যের আলোকের মধ্যে আমাদিগকে বিচরণ ও ক্রিয়া করিতে হইবে, তখন সেই সত্যের বোধিজাত স্বতঃস্ফূর্ত্ততার, তাহার সরল চিন্ময় পরম স্বভাব ছন্দের মধ্যে আমাদের সত্তার বহু বিচিত্র শক্তিসকল গৃহীত হইবে এবং প্রকৃতিপরিণামের সকল পর্ব্ব সুষমাময় সত্য দ্বারা পরিপ্লুত হইবে।

ইহা স্পষ্ট যে বুদ্ধির সাহায্যে একত্র করিয়া এবং জোড়া দিয়া অথবা মনের কোন নির্ম্মাণকুশলতার বলে এই জটিলতার মধ্যে একতানতা বা সৌষম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না ; কেবল জাগরিত চিৎসত্তার বোধি এবং আত্মজ্ঞান ইহা করিতে সমর্থ। এইভাবে সৌষম্যস্থাপনই হইবে উন্মিষিত অতিমানস সত্তার এবং জীবনের স্বধর্ম্ম, তাহার অধ্যাত্ম-দৃষ্টি এবং চিন্ময়-বোধ এক ঐক্যবিধায়ক চেতনার মধ্যে সত্তার সকল শক্তি গ্রহণ এবং স্বাভাবিকভাবে তাহাদের কর্ম্মের মধ্যে একতানতা প্রতিষ্ঠা করিবে ; কেননা এই একতানতা এবং সুরসঙ্গতি চিৎসত্তার খাঁটি স্বভাবছন্দ ; আমাদের জীবন ও স্বভাবের বিরোধ এবং বৈষম্য আমাদের অবিদ্যাচছন্ন প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও তাহারা বিজ্ঞানময় জীবনের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। বস্তুতঃ চিৎপুরুষের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই আমাদের মধ্যের প্রাকৃত জ্ঞান অতৃপ্ত থাকিয়া যায় এবং আমাদের জীবন এক বৃহত্তর সৌষম্যের অনুসন্ধান করে। সমগ্র সত্তার এই একতানতা এবং সুরসঙ্গতি যেমন বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিসত্তার পক্ষে স্বাভাবিক

তেমনি তাহা বিজ্ঞানময় সঙ্ঘের পক্ষেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইবে, কেননা সে সঙ্ঘজীবনের ভিত্তি হইবে সাধারণ জীবনে পরস্পরের সম্বন্ধে আত্ম-জ্ঞানের আলোকের মধ্যে আত্মার সহিত অন্য আত্মার মিলন ও একাত্মবোধ। ইহা অবশ্য সত্য যে বিজ্ঞানময় জীবন যাহার অংশ সেই পূর্ণ পার্থিব জীবনের অংশরূপে তাহার মধ্যে তদপেক্ষা ন্যূনতররূপে উন্মিষিত জীবনের এক ধারা তখনও থাকিবে; বোধিময় এবং বিজ্ঞানঘন জীবন সমগ্র সত্তার মধ্যে নিজেকে যথা-স্থানে স্থাপন করিবে এবং যতটা সম্ভব নিজের একত্ব ও সৌষম্যের বিধান তাহার মধ্যে সঞ্চারিত করিবে। মনে হইতে পারে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সৌষম্যের বিধান বুঝি এখানে খাটিবে না কেননা বিজ্ঞানময় জীবনের সহিত তাহার চারিদিকে অবস্থিত অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবনের সম্বন্ধ আত্মজ্ঞানের অন্যোন্যতা এবং সত্তার ও চেতনার একত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না; এখানে সম্বন্ধ হইবে জ্ঞানের ক্রিয়ার সঙ্গে অবিদ্যার ক্রিয়ার। কিন্তু আমাদের নিকট যেমন সমস্যাটি গুরুতর মনে হয় বস্তুতঃ তাহা নহে; কেননা বিজ্ঞানময় জ্ঞানে অবিদ্যাচ্ছন্ন চেতনারও পূর্ণ পরিচয় বর্ত্তমান থাকিবে, সুতরাং সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানময় সত্তার পক্ষে পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে অন্য যে সমস্ত অপরিস্ফুট জীবনের সঙ্গে সে একত্র বাস করিবে তাহাদের সহিত নিজের জীবনের সৌষম্য স্থাপন অসম্ভব হইবে না।

ইহাই যদি আমাদের পরিণামধারার চরম নিয়তি হয় তাহা হইলে মন এবং অতিমানসের এই সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া প্রগতির পথে আমরা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি তাহা দেখা দরকার; আমাদের প্রকৃতির ধারা ঋজু পথে চলে নাই, অনেক আবর্ত্তের মধ্য দিয়া কুণ্ডলিত বা শঙ্খাবর্ত্ত পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অথবা অন্ততঃপক্ষে অনেক আঁকিয়া বাঁকিয়া আগু পিছুর মধ্যে দোল খাইয়া চলিয়াছে, তবু মোটের উপর সে ধারা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; অদূর বা অনতিদূর ভবিষ্যতে চূড়ান্ত কোন বিশিষ্টভাবের দিকে সে গতির মুখ ফিরিবার সম্ভাবনা আছে কিনা ইহাই আমাদের প্রশ্ন। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত পূর্ণতালাভের জন্য মানুষের যে অভীপ্সা আছে তাহার মধ্যে এমন সকল উপাদান আছে যাহা ভবিষ্য পরি-ণামের আভাস দেয়, সেদিকে প্রচেষ্টাও জাগায় কিন্তু আমাদের চিত্তে জ্ঞানের আলোক পূর্ণভাবে আসিয়া পড়ে নাই বলিয়া তাহাদিগকে আমরা স্পষ্টরূপে ধরিতে বা বুঝিতে পারি না; প্রগতির পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান-সমূহের মধ্যে একটা বিরোধ আছে, বিরোধের উপর জোর দেওয়া আছে, জীবন-সমস্যার

সমাধান-সমূহের প্রাচুর্য্য আছে বটে কিন্তু তাহার কোনটাই সন্তোষজনক নহে, কোনটার মধ্যেই সকল উপাদানের সমন্বয় নাই। আমাদের জীবনের তিনটি প্রধান আদর্শের পরিচয় এ সমস্ত সমাধানের মধ্য দিয়া পাই, এবং মানুষের মন এই তিন আদর্শের মধ্যে দোল খাইয়া ফিরে; প্রথম ব্যষ্টি সত্তার অন্যনিরপেক্ষ হইয়া নিজের পুষ্টিসাধন, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলা; দ্বিতীয়টি সঙ্ঘ-সত্তার সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি ও পরিণতি, সমাজকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলা; তৃতীয়টি ব্যষ্টির সহিত ব্যষ্টির এবং সমাজের, এবং এক সমাজের সহিত অন্য সমাজের সম্বন্ধকে পূর্ণ করিয়া তোলা অথবা তাহাদের মধ্যে যতদূর সম্ভব আদর্শ সমন্বয় স্থাপন করা, যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই তৃতীয় আদর্শ খুব সঙ্কুচিত হইয়াই রহিয়াছে। আমরা একান্তভাবে অথবা প্রধানত জোর দিই কখন ব্যক্তির কখনও সঙঘের বা সমাজের, কখনও-বা ব্যষ্টির সহিত সমগ্র মানবজাতির খাঁটি এবং সুষম সম্বন্ধের উপর। প্রথম আদর্শ অনুসারে আমাদের জীবনের খাঁটি উদ্দেশ্য ব্যষ্টি ব্যক্তিজীবনের পুষ্টিসাধন, তাহার স্বাধীনতা ও পূর্ণতা লাভ—সে আদর্শ কেবল ব্যক্তিসত্তার নিরঙ্কুশ আত্মপ্রকাশ অথবা পূর্ণ মন, সুন্দর এবং প্রাচুর্য্যে ভরা প্রাণ এবং নিখুঁত শরীর লইয়া আত্মশাসিত এক পরিপূর্ণ জীবন অথবা আধ্যাত্মিক পূর্ণতা এবং মুক্তি ইহার যে কোনটা হইতে পারে। এমতে সমাজ ব্যষ্টি-মানুষের পুষ্টি এবং ক্রিয়ার ক্ষেত্র মাত্র, সমাজের কর্ত্তব্য তখনই সর্ব্বোত্তমভাবে সংসাধিত হইবে যখন তাহা ব্যক্তিসত্তাকে তাহার ভাবনা কর্ম্ম ও পুষ্টির জন্য, তাহার সত্তার পরিপূর্ণতা সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র, প্রচুর সুযোগ এবং উপায় ও যথেষ্ট স্বাধীনতা দান করে এবং এ সমস্ত লাভের পথ দেখাইয়া দেয়। ইহার বিপরীত এক মতে সমষ্টি-জীবনই প্রথম এবং এক-মাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু; জাতির অস্তিত্ব এবং পুষ্টিই সব; ব্যষ্টি শুধু সমষ্টির বা মানবজাতির জন্যই বাঁচিয়া থাকিবে, এমন কি ব্যক্তিসত্তা সমাজ-দেহের একটি কোষ মাত্র, সমাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা ছাড়া তাহার জন্মের অপর কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন নাই, প্রকৃতির মধ্যে তাহার আবির্ভাবের আর কোন অর্থ নাই, তাহার আর কোন কর্ম্ম আর কোন ধর্ম্ম নাই, অথবা ইহা বলা হয় যে জাতি সমাজ বা সম্প্রদায় একটি সমষ্টিগত সত্তা; তাহার সংস্কৃতি, প্রাণশক্তি, আদর্শ, আচার, অনুষ্ঠান তাহার আত্মপ্রকাশের বিভিন্নধারার মধ্য দিয়া তাহার আত্মারই অভিব্যক্তি হয়; ব্যক্তিকে সেই সংস্কৃতির ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করিতে হইবে, সেই প্রাণশক্তির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে,

সমষ্টিজীবনকে বজায় রাখিবার, তাহাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য তাহার সাধনযন্ত্র হইয়াই শুধু তাহাকে বাঁচিতে হইবে। অন্য এক ভাবে, মানুষের পূর্ণতা অন্য মানুষের সহিত তাহার নৈতিক এবং সামাজিক সম্বন্ধসকলের উপর নির্ভর করে, মানুষ সামাজিক জীব, তাহাকে সমাজের জন্য, অপর সকলের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য বাঁচিতে হইবে ; সমাজ হইয়াছে সকলের সেবার জন্য, সমাজের সকলকে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধে শিক্ষায় দীক্ষায়, অর্থনৈতিক ব্যাপারে যথার্থ জীবনাদর্শ গড়িয়া তুলিতে সকল প্রকার ন্যায় সঙ্গত সুযোগ ও সুবিধা দিবার জন্য। প্রাচীন সংস্কৃতিসমূহে সমাজসত্তার উপরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জোর দেওয়া হইত, ব্যক্তিকে সমাজের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইত, কিন্তু সেখানে ব্যক্তিগত পূর্ণতার আদর্শও উদ্ভুত হইয়াছিল ; প্রাচীন ভারতে আধ্যাত্মিকতা বিভাবিত ব্যক্তিত্বের আদর্শেরই ছিল মুখ্য স্থান। কিন্তু সমাজের গুরুত্বও যে কিছু কম নয় ইহাও স্বীকৃত হইত, কেননা সমাজের মধ্যে এবং তাহারই গঠনক্ষম প্রভাবের অধীনে থাকিয়া ব্যষ্টিসত্তাকে প্রথমতঃ তাহার অন্নময় প্রাণময় এবং মনোময় সত্তাতে সামাজিক জীবনে বাস করিয়া তাহার স্বার্থ, বাসনা, জ্ঞানান্বেষণ এবং খাঁটি প্রাকৃত জীবনের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে হইত, তাহার পর সে আরও খাঁটি আত্মোপলব্ধি এবং স্বাধীন অধ্যাত্ম জীবনের অধিকার লাভ করিত। আধুনিক কালে মানুষের সকল ঝোক পড়িয়াছে জাতীয় জীবনের উপর ; সে এক আদর্শ বা পূর্ণ সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে, আবার অতি আধুনিক কালে খাঁটি সুব্যবস্থার বলে সমগ্র মানব-জাতির জীবনকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যন্ত্রের মত চালিত করিবার জন্য সকলকে এক ছাঁচে ঢালিবার জন্য সে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, ক্রমেই এ ধারণা পুষ্ট হইতেছে যে ব্যষ্টিমানুষ সমষ্টি-জীবনের একজন সদস্য মাত্র, জাতি-দেহের একটি কোষ মাত্র, তাহার জীবনকে প্রধানতঃ ব্যবস্থিত এবং বিধিবদ্ধ সমাজের সাধারণ উদ্দেশ্য এবং পূর্ণাঙ্গ স্বার্থের অনুগত করিতেই হইবে, নিজের অধিকার ও আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত মনোময় বা অধ্যাত্ম সত্তারূপে তাহাকে অতি অল্প পরিমাণে দেখা হইবে অথবা একেবারেই দেখা হইবে না। এই ঝোঁক সর্ব্বত্র এখনও চরমে পৌঁছে নাই, কিন্তু সর্ব্বত্রই ইহা দ্রুতভাবে বৃদ্ধি হইতেছে এবং প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য প্রয়াসী হইয়াছে।

মানুষের চিন্তাজগতের এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে এক দিকে দেখিতে পাই কি করিয়া ব্যষ্টিমানব নিজে স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে, তাহার মন প্রাণ দেহের পুষ্টি এবং

ব্যক্তিগতভাবে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা সাধন করিবে তাহা আবিষ্কার করিতে এবং সে-সমস্ত সফল করিয়া তুলিবার জন্য সাধনরত হইতে সে প্রবৃত্ত বা আমন্ত্রিত হয়; অপর দিকে নিজেকে মুছিয়া ফেলিয়া বা নিজেকে গৌণ মনে করিয়া সমষ্টি-জীবনের ভাবনা, আদর্শ, সঙ্কল্প, সহজাত বৃত্তি এবং স্বার্থকে নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহাকে ডাক দেওয়া হয়। স্বভাবতঃ মানুষ নিজের জন্যই বাঁচিয়া থাকিতে চায় এবং তাহার মধ্যে গভীরে এমন কিছু আছে যাহা তাহার ব্যষ্টিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রেরণা দেয়, অথচ সমাজ এবং তাহারই এক মনোময় আদর্শ মানবজাতির জন্য বা সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যই শুধু তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে বলে। এক দিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং নিজ স্বার্থসাধন অপর দিকে বিশ্বহিতৈষণা এই দুই পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আজ রাষ্ট্র ঈশ্বরের আসন দাবি করিতেছে, সে চায় ব্যষ্টি-ব্যক্তি তাহার সম্পূর্ণ বাধ্য ও অনুগত সেবক হউক; নিজেকে গৌণ করিয়া তাহাকেই মুখ্যস্থান দিক এবং তাহার জন্য নিজেকে বলি দিক; এই অত্যুগ্র দাবির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মানুষকে তাহার আদর্শ ভাবনা ব্যক্তিসত্তা এবং বিবেকের নিজস্ব অধিকার রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইতে হয়। এই যে আদর্শের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে তাহার স্পষ্ট কারণ এই যে মনোময় অবিদ্যার অন্ধকারের মধ্যে মানুষ নিজের পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, সত্যের বিভিন্ন অঙ্গকে পৃথকভাবে ধরিতেছে, এমন পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তাহার নাই যাহাতে এই সকল একত্র করিয়া সে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে। এক একত্ব-বিধায়ক এবং সমন্বয়ী জ্ঞান শুধু প্রকৃত পথ দেখাইতে পারে, কিন্তু একত্ববোধ এবং পূর্ণাঙ্গতা যাহার স্বভাবধর্ম্ম, সে জ্ঞান আমাদের সত্তার গভীরে নিহিত আছে। এই জ্ঞান যখন আমরা নিজেদের মধ্যে খুঁজিয়া পাইব তখনই আমাদের জীবনের সমস্যা মিমাংসিত এবং সেই সঙ্গে ব্যষ্টি-জীবন এবং সমষ্টি-জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হইবে, প্রকৃত পথের সন্ধান মিলিবে।

যাহা সর্ব্বসত্তার সত্য এমন এক পরম সদ্বস্তু আছেন যাহা শাশ্বত এবং সকল প্রকাশ সকল রূপায়ণ হইতে মহত্তর ও বৃহত্তর; ব্যষ্টিসত্তা বা সঙ্ঘসত্তার পূর্ণতার রহস্য হইল সেই সদ্বস্তুকে জানা তাহাতে বাস করা তাহার যতটা পূর্ণ রূপায়ণ এবং প্রকাশ হইতে পারে তাহা নিজের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই ঐ সত্যবস্তু রহিয়াছে এবং তাহার প্রত্যেক রূপায়ণে নিজ সত্তার শক্তি ও সার্থকতা বা মূল্য অর্পণ করিতেছে। বিশ্ব সেই সত্য বস্তুর

এক আত্মপ্রকাশ, তাহার মধ্যে বিশ্বসত্তার এক সত্য এবং এক শক্তি, এক বিশ্ব-আত্মা বা বিশ্বচিৎ আছে। মানবজাতি বিশ্বের মধ্যে সত্যবস্তুর এক রূপায়ণ বা আত্মপ্রকাশ, মানবজাতির মধ্যে এক সত্য এবং আত্মা, এক চিৎসত্তা, মানব-জীবনের একটা নিয়তি আছে। সঙ্ঘও সত্য-বস্তুর এক রূপায়ণ, মানবাত্মার এক আত্মপ্রকাশ, সঙঘসত্তার মধ্যে এক সত্য এক আত্মা এক শক্তি আছে। ব্যষ্টি-সত্তা সেই সত্যবস্তুর এক রূপায়ণ, ব্যষ্টিসত্তার এক সত্য এক অন্তর পুরুষ এক ব্যষ্টি আত্মা আছে যাহা ব্যষ্টি মন, প্রাণ এবং দেহের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে এবং মন প্রাণ দেহকে এমন কি মানবতাকে অতিক্রম করিয়া যে কিছু বর্ত্তমান আছে তাহার মধ্য দিয়াও এ আত্মার আত্মপ্রকাশ হইতে পারে। কেননা মানবতা সত্যবস্তুর সবখানি অথবা সর্ব্বোত্তম আত্ম-রূপায়ণ বা আত্মপ্রকাশ নহে, মানুষের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অবমানব (infra-human) রূপে সত্য বস্তুর এক রূপায়ণ বা আত্মবিসৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই সত্যবস্তু মানুষের পরে অথবা তাহারই মধ্যে অতিমানবরূপে রূপায়িত হইতে বা আপনাকে সৃষ্টি করিতে পারেন। আত্মারূপে ব্যষ্টিসত্তা তাহার মানবতার মধ্যে আবদ্ধ নহে, সে এক সময় অবমানব বা মানবতার চেয়ে ছোট কিছু ছিল, আবার সে মানব-তার চেয়ে বড় কিছু বা অতিমানব হইতে পারে। মানুষ যেমন বিশ্বের মধ্যে আপনাকে পাইতে পারে তেমনি বিশ্বও মানুষের মধ্য দিয়া নিজেকে খুঁজিয়া পায়, কিন্তু আবার সে বিশ্ব হইতেও বৃহত্তর কিছু হইতে পারে কেননা ব্যষ্টিসত্তা বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া এমন কিছুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে যাহা তাহার নিজের মধ্যে ও বিশ্বের মধ্যে যেমন আছে তেমনি এ উভয়কে অতিক্রম করিয়া চরম এবং পরম সৎরূপে বর্ত্তমান আছে। সে সমাজ বা সঙ্ঘের মধ্যে আবদ্ধ নহে, যদিও এক ভাবে তাহার মন এবং প্রাণ সমাজগত মন ও প্রাণের অংশ তবু তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সমাজকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। আবার ব্যষ্টির জন্যই সমাজের অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে, কেননা সমাজের মন প্রাণ এবং দেহ ব্যষ্টি মন প্রাণ এবং দেহের সমষ্টি লইয়াই গঠিত; ব্যষ্টির যদি উচ্ছেদ হয় অথবা তাহারা যদি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তবে সমাজের উচ্ছেদ ঘটে অথবা সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, যদিও তাহার মধ্যস্থ কোন আত্মা বা শক্তি আবার অন্য ব্যষ্টিসত্তা সকলের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে; কিন্তু তাহা হইলেও ব্যক্তি সমাজদেহের একটি কোষ (cell) শুধু নহে, সমাজ-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন বা বিতাড়িত হইলেও তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় না। কেননা সমাজ

বা গোষ্ঠী জগৎ নয়, এমন কি সমগ্র মানবজাতিও নয়; ব্যষ্টি-ব্যক্তি সমাজকে ছাড়িয়া মানবজাতির মধ্যে অন্য কোথাও অথবা জগতে একাকী বাস করিতে পারে। সমাজ-দেহে একটা প্রাণ আছে যাহা তন্মধ্যস্থ ব্যষ্টিসত্তাগণকে শাসন করিতে পারে কিন্তু সে প্রাণ ব্যষ্টিসত্তা সকলের সমগ্র প্রাণ নহে। সমাজের যেমন এক সত্তা আছে যাহা সে ব্যষ্টি ব্যক্তিগণের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় তেমনি ব্যষ্টিসত্তার এক নিজস্ব সত্তা আছে সমাজ-জীবনে যাহার প্রতিষ্ঠা করিতে সে সচেষ্ট। কিন্তু ব্যক্তি সমাজ-জীবনে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ নয়; সে অন্য কোন সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, অথবা শক্তি থাকিলে সে যাযাবর-জীবন অথবা আরণ্যক তপস্বীর নিঃসঙ্গ জীবন গ্রহণ করিতে পারে, হয়ত সেখানে পূর্ণাঙ্গ অন্নময় জীবন যাপন করিতে বা তাহা অনুসরণ করিতে পারে না কিন্তু সে চিন্ময় জীবন যাপন করিতে এবং নিজের সত্যস্বরূপ ও নিজের মধ্যস্থিত আত্মসত্তাকে আবিষ্কার করিতে পারে।

বস্তুতঃ পরিণামধারার চাবিকাঠি রহিয়াছে ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে; কেননা সে-ই আত্মোপলব্ধি করে, সত্যবস্তুর চেতনা তাহারি মধ্যে ফোটে। সমষ্টির গতিবৃত্তি প্রধানতঃ জনগণের অবচেতনা অবলম্বন করিয়া প্রকাশ হয়; সমষ্টিকে সচেতন হইতে হইলে তাহার নিজেকে ব্যষ্টি-ব্যক্তিগণের মধ্যে রূপায়িত হইতে এবং তাহাদের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে; সাধারণ গণচেতনা সমষ্টির মধ্যস্থিত অত্যুন্নত ব্যষ্টি-চেতনার তুলনায় অনেক অপরিণত, সমষ্টি যদি তাহাদের দেওয়া ছাপ গ্রহণ করে অথবা তাহারা যাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছে তাহা ফুটাইতে সচেষ্ট হয় তবেই তাহার উন্নতি সাধিত হয়। ব্যষ্টিব্যক্তি রাষ্ট্রের অথবা সমাজের নিকট তাহার রাজভক্তির চরম অর্ঘ্য দিতে বাধ্য নয় অথবা তাহাদিগের আদেশ পালন বা তাহাদের সেবা করা তাহার চরম কর্ত্তব্য নয়, কেননা রাষ্ট্র ত একটা যন্ত্রমাত্র এবং সমাজ-জীবনের একটি অংশ, অখণ্ড পূর্ণ জীবন নহে; তাহাকে ভক্তির অর্ঘ্য দিতে হইবে, অনুগত হইতে হইবে সত্যের কাছে, আত্মার কাছে, চিৎস্বরূপের কাছে, যিনি তাহার মধ্যে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে রহিয়াছেন সেই ভগবানের কাছে; তাহার জীবনের খাঁটি উদ্দেশ্য হইবে গণচেতনার অধীন না হইয়া বা তাহার কাছে আত্মবলি না দিয়া তাহার নিজের মধ্যস্থিত সত্তার সেই সত্যকে আবিষ্কার এবং প্রকাশ করা, এবং সমাজ ও মানবজাতিকে তাহাদের নিজের সত্য আবিষ্কার করিতে সাহায্য করা। কিন্তু ব্যক্তি-জীবনের শক্তি বা তাহার মধ্যস্থ আধ্যাত্মিক সত্য কতটা কার্য্যকরী হইবে তাহা

তাহার নিজের পরিণতির উপর নির্ভর করে ; যতক্ষণ সে উন্নতির পথে বেশী অগ্রসর হয় নাই ততক্ষণ তাহার অপরিণত আত্মাকে নানাভাবে যাহা তাহার চেয়ে বৃহত্তর বা মহত্তর তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। তাহার আত্মপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে কিন্তু এই স্বাধীনতা, যিনি সর্ব্বসত্তা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত কোন বস্তু নহে ; সর্ব্বসত্তার সঙ্গে ব্যষ্টিসত্তার একটা ঐক্য একটা একাঙ্গতা আছে, কেননা সেও যে তাহার আত্মা, উভয়ত্র একই চিৎস্বরূপ অবস্থিত। যেমন সে চিন্ময় স্বাধীনতার দিকে চলিতে থাকে তেমনি সেই সঙ্গে সে আধ্যাত্মিক একত্বের দিকেও অগ্রসর হয়। গীতাতে আছে অধ্যাত্মচেতন মুক্তপুরুষকে সর্ব্বভূতহিতে রত হইতে হয় ; তাই ত নির্ব্বাণের পথ আবিষ্কার করিয়াও যাহারা প্রকৃতসত্তার অথবা যাহাকে অ-সৎ বলা হইয়াছে সেই পরম সত্তার সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভেদ এবং অহংভাবে গঠিত সত্তার ভ্রমের মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে তাহাদের জন্য লোকোত্তরের পথ খুলিয়া দিবার জন্য বুদ্ধকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই হয় ; নির্ব্বিশেষ চরমবস্তুর প্রবল টান হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিলেও, তাইত বিবেকানন্দ নরের মধ্যে ছদ্মবেশী নারায়ণের ডাক বিশেষতঃ আর্ত্ত এবং পতিতের কণ্ঠে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন দেহধারী আত্মার প্রতি পরমাত্মার আবাহনের বাণী শুনিতে পান। জাগরিত ব্যষ্টি-ব্যক্তির পক্ষে তাহার নিজের সত্তার সত্য উপলব্ধি করা এবং অন্তরের মুক্তি ও পূর্ণতা লাভ করা প্রথম ও প্রধান সাধনার বিষয়, কেননা প্রথমতঃ ইহাই তাহার অন্তর্য্যামী পুরুষের আহ্বান ; দ্বিতীয়তঃ মুক্তি ও পূর্ণতা লাভ এবং নিজ সত্তার সত্য উপলব্ধি করিয়াই সে তাহার জীবনের সত্যকে খুঁজিয়া পায়। তাহার মধ্যস্থিত ব্যষ্টি-সত্তাসমূহের পর্ণতা দ্বারাই শুধু সমাজ পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে ; আর এ পূর্ণতা কেবল তখনই আসিবে যখন প্রত্যেকে তাহার নিজের অধ্যাত্মসত্তাকে আবিষ্কার ও জীবনে রূপায়িত করিবে এবং সকলে যখন তাহাদের চিন্ময় একত্ব আবিষ্কার করিবে এবং তাহার ফলে সমগ্র জীবনে একত্ব প্রতিষ্ঠা হইবে। আমাদের অন্তরাত্মা এবং অধ্যাত্মজীবনের সত্য যখন আমাদের প্রাকৃত যান্ত্রিক জীবনের সকল সত্যকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবে এবং সকলের মধ্যে একত্ব পূর্ণাঙ্গতা ও সৌষম্য আনয়ন করিবে কেবল তখনই আমাদের মধ্যে খাঁটি পূর্ণতা আসিবে। আমাদের অন্তরস্থ অধ্যাত্ম সত্যের আবিষ্কারে এবং স্বচ্ছন্দ প্রকাশেই কেবল আমাদের খাঁটি স্বাধীনতা বা মুক্তি আসিতে পারে, তেমনি

খাঁটি পূর্ণতা লাভের একমাত্র উপায় আমাদের প্রকৃতির সকল উপাদানে চিন্ময় সত্যবস্তুর নিরঙ্কুশ আত্মরূপায়ণ বা অবাধ প্রকাশ।

আমাদের প্রকৃতি জটিলতায় ভরা, এই জটিলতার মধ্যে পূর্ণতা এবং পূর্ণ একত্ব প্রতিষ্ঠার কোন কৌশল আমাদিগকে বাহির করিতে হইবে। পরিণাম ধারার প্রথম ভিত্তি হইল অন্নময় জীবন; প্রকৃতি তথা হইতে যাত্রারম্ভ করিয়াছে, মানুষকেও তাহাই করিতে হইবে; তাহাকে প্রথমতঃ তাহার অন্নময় এবং প্রাণময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। কিন্তু সেখানে থামিয়া থাকিলে তাহার পরিণাম পূর্ণ হয় না; তাই তাহার পরবর্ত্তী মহত্তর তপস্যা এবং অভিনিবেশের বস্তু হইল ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জড়জীবনের মধ্যে নিজেকে মনোময় সত্তা বলিয়া জানা এবং সেই মনোময় জীবনকে যতটা সম্ভব পূর্ণ করিয়া তোলা। প্রাচীন গ্রীসের এই ভাবধারা ও আদর্শ ইউরোপীয় সভ্যতাকে এইদিকেই চালিত করিয়াছিল, রোমান সভ্যতা শক্তির সুসংহত ব্যবস্থা দ্বারা এই আদর্শকেই পুষ্ট—অথবা দুর্ব্বল—করিয়াছে; এই প্রেরণা হইতে অবশেষে আসিয়াছে যুক্তিবাদের যুগ, সমালোচনাকুশল, কার্য্যকরী গঠন ও ব্যবস্থা কার্য্যে দক্ষ, বুদ্ধিযুক্ত ভাবনা দ্বারা জীবন-সমস্যা সমাধানের এবং জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে জীবন পরিচালনার যুগ। কিন্তু প্রাচীন যুগের আদর্শের মধ্যে উচ্চতর সৃষ্টিশীল এবং বীর্য্যবন্ত উপাদান ছিল সত্য মঙ্গল এবং সৌন্দর্য্যের আদর্শকে অনুসরণ করা এবং এই আদর্শ দ্বারা মন প্রাণ এবং দেহকে পূর্ণতা এবং সৌষম্যের মধ্যে গড়িয়া তোলা। কিন্তু মন যথেষ্ট পরিমাণে পরিণত হইলে মানুষ এ সাধনাকে অতিক্রম করিয়া যায়; ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আধ্যাত্মিক সাধনার আকূতি যখন তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে তখন মানুষ চায় তাহার আত্মাকে এবং সত্তার অন্তরতম সত্যকে আবিষ্কার করিতে, তাহার মন প্রাণকে চিৎস্বরূপের সত্যের মধ্যে মুক্তি দিতে, চিৎপুরুষের শক্তির দ্বারা নিজে পূর্ণ হইতে; চায় এক চিৎসত্তার মধ্যে সর্ব্বসত্তার সহিত নিবিড় একত্ব ও অন্যোন্যভাবনায় বিভাবিত হইতে। বৌদ্ধ এবং অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীগণ এই প্রাচ্য আদর্শ পশ্চিম এসিয়া এবং ইজিপ্টের উপকূলে লইয়া যান, এবং তথা হইতে খৃষ্টধর্ম্মের ধারা যোগে তাহা ইউরোপে প্রবাহিত হয়। বর্ব্বরতার প্লাবনে যখন ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতা ডুবিয়া গেল তখনও সেই বিপর্য্যয় এবং অন্ধকারের মধ্যে প্রাচ্যের এই আদর্শ, মশালের ক্ষীণ আলোকের মত কিছু কাল জ্বলিতেছিল, কিন্তু আধুনিক জগৎ জড়বিজ্ঞানের অন্য এক আলোক

পাইয়া সে আদর্শকে বিসর্জন দিয়াছে। বর্ত্তমানের মানুষ একান্তভাবে চায় এক অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক জীবন, লৌকিক সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য জড়জগৎকে সুব্যবস্থিত করাই এ সভ্যতার আদর্শ; উপযোগিতা এবং যুক্তিবাদ ইহার ভিত্তি, উপকরণ-বাহুল্যে পূর্ণ এক অর্থনৈতিক সমাজের মধ্যে ব্যষ্টি মানুষ হইবে পূর্ণ এক সামাজিক জীব এই হইল তাহার লক্ষ্য, এই প্রয়োজন সাধনের জন্য তাহার বুদ্ধি বিজ্ঞান দীক্ষা শিক্ষার যত সর্ব্বজনীন আয়োজন। প্রাচীন আদর্শের যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা হইতে কিছু সময়ের জন্য মনন এবং নীতির উপর ভিত্তি করিয়া এক মানবতাবাদের জন্ম হইল যাহার সঙ্গে ধর্ম্মের আর কোন সম্বন্ধ থাকিল না, এক সমাজনীতি দেখা দিল যাহা ধর্ম্ম বা ব্যক্তিগত নীতির স্থানে বসিবার জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল। যখন মানবজাতি এইরূপ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তখন সে দেখিতে পাইল যে অগ্রসর হইবার জন্য তাহার নিজের গতিবেগে মননে এবং জীবনে সে এক মহা বিশৃঙ্খলতার মধ্যে দ্রুত আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার ফলে জীবনের চিরপোষিত সকল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, মনে হইতেছে সমাজব্যবস্থা, তাহার আচরণ এবং সংস্কৃতির নীচের সমগ্র দৃঢ় ভিত্তি বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কারণ এ-আদর্শের, অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত এই অন্নময় জীবনকে সজ্ঞানে মুখ্য করিয়া তোলার প্রকৃত অর্থ মানুষের আদিম বর্ব্বর যুগে জড় ও জীবন লইয়া অভিনিবিষ্ট থাকিবার অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া; পরিণত মানবের মনের বিপুল ঐশ্বর্য্য এবং জড়বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইহা আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে পশ্চাদপসরণ। সমগ্র মানবজাতির জীবনে তাহার বিপুল জটিলতার মধ্যে একটা উপাদানরূপে অর্থনৈতিক এবং জড়জীবনের পূর্ণতাসাধনের জন্য এই ঝোঁকের একটা স্থান আছে; কিন্তু এই ঝোঁক যদি একান্ত বা মুখ্য হইয়া উঠে তবে সমগ্র মানবজাতির এবং ক্রম-পরিণতিধারার পক্ষে বিশেষ বিপদের আশঙ্কাই আসিয়া পড়ে। প্রথম বিপদ ইহাতে সভ্যতার মুখোস পরিয়া সেই প্রাচীন অন্ন-প্রাণময় আদিম বর্ব্বরতা আবার জাগিয়া উঠে; জড়বিজ্ঞান আমাদিগকে যে শক্তি দিয়াছে তাহার বলে অধিকতর শক্তিশালী আদিম জাতি কর্ত্তৃক অবসাদগ্রস্ত সভ্যতার বিধ্বস্ত এবং বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে, সভ্য-জাতির মধ্যে, বর্ব্বরতার পুনরাবির্ভাব দেখা দিয়াছে, ইহাই আসল বিপদ আর আজ চারিদিকে তাহাই ত দেখিতেছি। কারণ এই বর্ব্বরতা আসিতে বাধ্য,

যদি মনোময় বা নৈতিক আয়াসসাধ্য কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের মধ্যস্থিত অন্নপ্রাণময় পশুটাকে শাসিত ও সমুন্নত না করে এবং আধ্যাত্মিক কোন আদর্শ আমাদিগের নিজের হাত হইতে আমাদের অন্তরসত্তার মধ্যে আমাদিগকে মুক্তি না দেয়। বর্ব্বরতার এই পুনরাবৃত্তির হাত হইতে যদি মুক্তি পাই তবুও অন্য এক বিপদ কাটে না, কেননা তখন এমন এক অবস্থা আসিতে পারে যাহাতে সমাজ-জীবন হইবে যান্ত্রিক ও আরামপ্রদ, তাহা একরূপ বিশিষ্টভাবে স্থায়ীরূপে দানা বাঁধিয়া উঠিবে, পরিণামধারার আকৃতি তাহা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, উচ্চ আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে আমাদের উন্নতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা রহিত হইবে। শুধু বুদ্ধিবিচার জাতিকে প্রগতির পথে দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে না, প্রতিষ্ঠিত রাখিতে কেবল তখনই সমর্থ হয় যখন বুদ্ধি প্রাকৃত জীবন ও দেহের সহিত মানুষের অন্তরস্থ বৃহত্তর ও মহত্তর কিছুর মধ্যস্থ হইয়া দাঁড়াইতে পারে, কেননা মন একবার পরিস্ফূরিত হইলে কেবল আধ্যাত্মিক অভীপ্সা, নিজের মধ্যস্থিত যে কিছুকে মানুষ আজিও উপলব্ধি করিতে পারে নাই তাহার প্রেরণা বা আকর্ষণেই মানুষকে পরিণামের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়, তাহার অধ্যাত্ম সাধনার প্রয়াসকে বজায় রাখে। এই আকর্ষণ এই প্রেরণা যদি না থাকে তবে মানুষকে হয় তাহার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে এবং তথা হইতে আবার নূতন করিয়া সব কিছু আরম্ভ করিতে হইবে নতুবা পরিণামের আবেগ ও উদ্দেশ্য ধারণ করিতে বা তদনুসারে চলিতে পারে নাই বলিয়া যেমন অন্য অনেক জীবকে মানুষের পূর্ব্বে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইতে হইয়াছে মানুষকেও তেমনিভাবে পৃথিবীর বক্ষ হইতে মুছিয়া যাইতে হইবে। বড়জোর যেমন অন্য অনেক জন্তুকে রাখা হইয়াছে তেমনি মানুষ মধ্যবর্ত্তীকালের কোন বিশিষ্ট দিকে পূর্ণ এক জীবরূপে থাকিয়া যাইতে পারে তবে তাহার মধ্যে পরিণামের ধারা অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবে এবং প্রকৃতি তাহাকে অতিক্রম করিয়া প্রগতির পথে চলিবে এবং তাহার চেয়ে বৃহত্তর কিছু সৃষ্টি করিবে।

বর্ত্তমানে মানবজাতির পরিণামধারা এক পর্ব্বসন্ধিতে এক সঙ্কটকালে উপস্থিত হইয়াছে, কোন্ দিকে সে অগ্রসর হইবে, তাহার নিয়তি কি হইবে এবার তাহা বাছিয়া লইবার গোপন তাগিদ তাহার কাছে উপস্থিত হইয়াছে; কেননা মানবজাতির জীবনে এমন এক অবস্থা আসিয়াছে যাহাতে কোন কোন দিকে তাহার বিপুল উৎকর্ষ ঘটিয়াছে, সেই সঙ্গে অন্য কোন কোন দিকে তাহার

গতি রুদ্ধ হইয়াছে সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে আর পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। নিত্য ক্রিয়াশীল মন এবং প্রাণসঙ্কল্পের দ্বারা বাহ্য জীবনের এক কাঠামো সে গড়িয়া তুলিয়াছে যাহা এত বৃহৎ ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধান তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; এই কাঠামো সে গড়িয়াছে তাহার মন প্রাণ ও দেহের নানা দাবি এবং আবেগ চরিতার্থ করিবার জন্য, তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে জটিল রাষ্ট্র, সমাজ শাসন ও অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক অনেক যান্ত্রিক বিধান ও ব্যবস্থা, তাহার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, রসচেতনা এবং জড়দেহের তৃপ্তির জন্য সুব্যবস্থিত সাধন সামগ্রীর সঙ্ঘগত বিপুল আয়োজন। মানুষ তাহার ভ্রমশীল অহং এবং তাহার কামনাবাসনার বিপজ্জনক ভৃত্যরূপে এক বিপুল সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু তাহার মনোময় সীমিত বুদ্ধি ও সামর্থ্যের এবং অধিকতর সীমিত অধ্যাত্মচেতনা ও নীতিবোধের পক্ষে তাহা এমন অতিকায় হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার শাসন পরিচালন অথবা তাহাকে কাজে লাগান মানুষের সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেননা তাহার বহিশ্চেতনায় বৃহত্তর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কোন মন অথবা বোধিজ্ঞানময় কোন আত্মা উন্মিষিত হইয়া উঠে নাই, যাহা জীবনের এই বিপুল ঐশ্বর্য্যকে ভিত্তি করিয়া ইহাদের সাহায্যে স্বচ্ছন্দভাবে লোকোত্তর কিছু গড়িয়া তুলিতে পারে। আর্থিক এবং দৈহিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুষের নিত্য অতৃপ্ত বাসনার যে প্রবল চাপ আছে তাহা হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া জীবনের নবসঞ্চিত অতিবিপুল এই উপকরণরাজি আপন শক্তিতে এমন এক সুযোগ আনিয়া দিতে পারিত যাহার ফলে মানুষ তাহার জড়ময় জীবনকে অতিক্রম করিয়া অন্য মহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে চলিতে, সত্য শিব ও সুন্দরের বৃহত্তর আবিষ্কারে রত হইতে, এক বৃহত্তর ও দিব্যতর চিৎসত্তাকে চিনিতে পারিত, যিনি তাহার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে তাহার সত্তার বৃহত্তর পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবার জন্য এই জীবনকেই ব্যবহার করিতেন; কিন্তু ইহা না করিয়া জীবনের বিপুল উপকরণকে বহু-গুণিত নূতন অভাবের সৃষ্টি এবং পরস্বলোলুপ সমষ্টিগত অহংকে স্ফীতকায় করিবার জন্য ব্যবহার করা হইতেছে। আবার ইহার সঙ্গে জড়বিজ্ঞান বিশ্ব-শক্তির অনেক বীর্য্য মানুষের হাতে তুলিয়া এবং জড়ের দিক হইতে মানুষের জীবনকে এক করিয়া দিয়াছে; কিন্তু যে এই বিশ্বশক্তিকে ব্যবহার করিতেছে সে হইল ব্যক্তিবিশেষ বা সঙ্ঘবিশেষের ক্ষুদ্র এক অহমিকা, তাহার চেতনায় বা গতিপ্রবৃত্তিতে বিশ্বাত্মার কোন আলোক নাই; অন্তরের এমন কোন বোধ

বা শক্তি তাহার নাই যাহার দ্বারা সে মানবজগতের এই বাহ্যসংহতির ভিতরে প্রাণ ও মনের প্রকৃত মিলন অথবা খাঁটি আধ্যাত্মিক একত্ব সংসাধিত করিতে পারে। আজ জগৎ জুড়িয়া চলিতেছে মনোময় আদর্শসকলের সংঘাতজাত বিশৃঙ্খলা, ব্যষ্টি এবং সমষ্টি-জীবনের বাহ্য প্রয়োজন বা অভাবের তাড়না, অজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রাণের দাবি, কামনাবাসনা এবং আবেগের প্রমত্ত নৃত্য, প্রাণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, শ্রেণী এবং জাতিসমূহের স্বার্থের এবং ভোগসুখের প্রবল ক্ষুধা ও আকর্ষণের তুমুল কোলাহল ও তীব্র সংগ্রাম; তাহার মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মত যেখানে সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির নানা মত গজিয়া উঠিতেছে, অনেক টোট্‌কা ঔষধ বা মুষ্টিযোগ আমদানী করা হইতেছে, বহু তথাকথিত মহৌষধির ব্যবস্থা, নানা মত এবং প্রত্যেক মতের নানা জিগির এবং হুঙ্কার ভিড় করিয়া আসিয়াছে; সেই সঙ্গে চলিতেছে নানা মতের প্রবল প্রতিযোগিতা, যে অতি বিপুল ও অতি ভীষণ শক্তি আজ মানুষের করায়ত্ত তাহার সাহায্যে ইহারা প্রত্যেকে অপরের উপর নিজ মত চাপাইয়া দেওয়ার জন্য অতি ব্যগ্র হইয়াছে এবং তজ্জন্য মানুষ অত্যাচার সহিতে বা করিতে, অপরকে হত্যা করিতে বা নিজে হত হইতেও প্রস্তুত আছে, মনে করিতেছে তাহার পন্থায় চলিলেই জগৎ এক আদর্শ অবস্থায় পৌঁছাইয়া যাইবে। মানুষের মন এবং প্রাণের স্বাভাবিক পরিণতি তাহাকে বিশ্বব্যাপ্তির দিকে লইয়া যায়; কিন্তু অহং এবং বিভাজনশীল মনের ভিত্তিতে যদি বিশ্বব্যাপ্তির দিকে এই বিকাশ ঘটে তবে কেবল বেসুরা ভাব ও আবেগ ব্যাপকভাবে উদ্ভূত হইবে, প্রবল শক্তি এবং বাসনার তরঙ্গ উত্থিত হইবে, বৃহত্তর জীবনের মনোময় প্রাণময় এবং অন্নময় উপাদান সকলের অর্দ্ধজীর্ণ এবং মিশ্রিত বিশৃঙ্খলায় ভরা এক বিরাট স্তূপ দেখা দিবে। চিৎপুরুষের সমন্বয়কারী এবং সৃষ্টিশীল আলোকের মধ্যে তাহা গৃহীত না হওয়ার ফলে তথায় জগৎজোড়া এক বিশৃঙ্খলা গোলযোগ এবং বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে, তাহার মধ্য দিয়া সুষমাময় বৃহত্তর জীবন গড়িয়া তোলা কখনই সম্ভব হইবে না। অতীতে মানুষ আদর্শ বা ভাবকে যথোচিত সীমার মধ্যে বদ্ধ রাখিয়া তাহাকে সুব্যবস্থিত করিয়া জীবনে সৌষম্য আনিয়াছে; বিশেষ বিশেষ সুনির্দ্দিষ্ট ভাব বা আচারকে ভিত্তি করিয়া পৃথক পৃথক সমাজ গড়িয়াছে, প্রত্যেক সমাজে একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতি অথবা এক সুনির্দ্দিষ্ট জীবনের ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রত্যেক সমাজের ব্যবস্থা হইয়াছে পৃথক, আজ ক্রমেই যেখানে সংমিশ্রণ বিপুল হইতে বিপুলতর

ভাবে চলিয়াছে জীবনের সেই বৃহৎ কটাহে এই সমস্ত একত্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আবার তাহার উপর নিত্যনূতন ভাব, আদর্শ, তথ্য এবং সম্ভাবনার ধারাসকল ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে; ইহাদের পরিপাকে এক অমৃতময় জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার জন্য চাই এক নূতন এবং বৃহত্তর চেতনা; সেই চেতনাই নিত্যবর্দ্ধমান সম্ভাবনাসকলকে মিলাইয়া মিশাইয়া শাসন করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে সেই পরম সুষমাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে। যুক্তি এবং জড়বিজ্ঞান একটা বিশেষ আদর্শ বা মান স্থাপন করিয়া কৃত্রিমভাবে ব্যবস্থিত সুনির্দ্দিষ্ট জড়জীবনের ছাঁচে ঢালাই করা এক একত্বের মধ্যে সকলকে স্থাপিত করিয়া যেটুকু সাহায্য করা সম্ভব তাহাই শুধু করিতে পারে। অখণ্ড পূর্ণ জীবনে সব কিছুকে জুড়িয়া সৌষম্য স্থাপন করিতে হইলে এক বৃহত্তর পূর্ণসত্তা পূর্ণজ্ঞান এবং পূর্ণশক্তির প্রয়োজন।

আমাদের সত্তার গভীরতর এবং উদারতর সত্য হইতে জাত একত্ববোধ অন্যোন্যতা এবং সৌষম্যে বিভূষিত জীবনই শুধু অতীতকালে মনের দ্বারা গঠিত অপূর্ণ জীবনের স্থান সফলতার সহিত অধিকার করিতে পারে, যে অপূর্ণ জীবন পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া এবং বিরোধের সাময়িক আপোষ ও নিয়ন্ত্রণ সাধন করিয়া গঠিত হইয়াছে, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত অহংকে লইয়া দলবদ্ধ হইয়া বা তাহাদিগকে জোড়া দিয়া বা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের প্রাণের আশা আকাঙ্ক্ষার একটা ব্যবস্থা করিয়াই যে সমাজজীবন স্থাপিত হইয়াছে, জীবনের সাধারণ প্রয়োজন ও প্রেরণা অভাবের তাড়না এবং বাহিরের শক্তির সহিত সংঘর্ষের চাপ যেখানে মিলন এবং সঙ্ঘজীবনের ভিত্তি স্থাপনের সহায়তা করিয়াছে। মানবজাতির মনে আজ জীবনের এইরূপ একটা রূপান্তর এবং পুনর্গঠনের অন্ধ আকূতি জাগিয়া উঠিতেছে, সে ক্রমশঃ অধিকতররূপে বুঝিতেছে যে এক নূতন পন্থা আবিষ্কার না করিতে পারিলে তাহার সমস্ত অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যাইতে পারে। মন উন্মিষিত হইয়া প্রাণের উপর ক্রিয়া করিয়া মনের ক্রিয়া এবং জড়ের ব্যবহারের এমন এক বিরাট ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে, নিজের অন্তরের রূপান্তর ছাড়া যাহাকে ধারণ করিয়া রাখিবার শক্তি মানুষের নাই। অহংকেন্দ্রিক ব্যষ্টি মানবসকলের নিকট যাহা একত্ব, পূর্ণ অন্যোন্যতা এবং সামঞ্জস্য দাবি করে এমন এক সামাজিক জীবনব্যবস্থার সহিত যাহা মিলনের মধ্যেও বিবিক্ত থাকিতে পারে এমন একটি ব্যষ্টিজীবনের আপোষ রফা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যে বোঝা আজ মানুষের ঘাড়ে আসিয়া

পড়িয়াছে তাহা বহন করিবার সাধ্য আধুনিক মানবজাতির নাই ; কেননা তাহার ব্যক্তিসত্তা, মন এবং প্রাণের সহজাত শক্তি ক্ষুদ্র, ইহার জন্য যে রূপান্তর প্রয়োজন তাহা সাধন করিবার সামর্থ্য তাহার নাই, কেননা মানবজাতির পুরাতন যে প্রাণময় সত্তার মধ্যে আজিও আধ্যাত্মিকতা এমন কি যুক্তি বিচারের আলোক পৌঁছে নাই তাহারই তৃপ্তি এবং প্রয়োজনসাধনে তাহার এই নূতন যন্ত্র এবং সমাজব্যবস্থা ব্যবহার করিতেছে ; তাই দেখিতে পাই মানুষ জীবন এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এক বিরাট যান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে বটে কিন্তু তাহারই অনুরূপ অতিপ্রবল আসুরিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত প্রাণময় অহংএর তাড়নায় তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানবজাতির নিয়তি যেন দীর্ঘস্থায়ী বিশৃঙ্খলা, ভয়াবহ সঙ্কট, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল অনিশ্চয়তার সংঘর্ষসঙ্কুল অন্ধকারের দিকে অধীরভাবে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে ; কেননা সে শক্তি এত বিশাল যে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উপযুক্ত বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তি মানুষের নাই। এমন কি যদি এ বিপদাশঙ্কা সাময়িক বা আপাতপ্রতীয়মান মনে হয়, যদি মোটামুটিভাবে গঠনমূলক এমন একটা আপোষরফার সন্ধান পাওয়াও যায় যাহার ফলে মানুষের এই অনিশ্চিত পথে চলা তেমন সর্ব্বনাশকর হইয়া পড়িবে না, তবু তাহা হইবে কিছু সময় নেওয়া, সমস্যা সমাধান নহে। কেননা ইহা একটা মৌলিক সমস্যা, মানুষের মধ্যস্থিত পরিণামশীল প্রকৃতি এ সমস্যা জাগাইয়া সঙ্কটের মধ্য দিয়া সমাধানের জন্য ইহাকে যেন নিজেরই সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে, মানবজাতির ভবিষ্য-সিদ্ধি, এমন কি তাহার বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ইহার খাঁটি সমাধান একদিন না একদিন তাহাকে করিতেই হইবে। পরিণামধারার সংবেগ পার্থিব জীবনে বিশ্বশক্তিকে ফুটাইতে চাহিতেছে, তাহার জন্য প্রয়োজন যাহা তাহার আশ্রয় হইতে পারে এমন বৃহত্তর মনোময় এবং প্রাণময় সত্তা. এক উদারতর মন এক উদারতর মহত্তর জৈবসংস্কারবর্জিত সচেতন প্রাণপুরুষ আবার তাহার জন্য চাই তাহারই আধার ও আশ্রয়রূপী অন্তর্য্যামী চিন্ময় আত্মার নিরাবরণ আত্মপ্রকাশ।

এই সঙ্কটকালে এই গুরুতর সমস্যা সমাধানের জন্য আধুনিক মন যে আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা হইল প্রাণময় এবং অন্নময় সত্তা ও জীবনকে ভিত্তি করিয়া বুদ্ধিশাসিত বৈজ্ঞানিক সূত্র ও বিধান দ্বারা পরিচালিত অর্থনৈতিক হিসাবে পূর্ণ এক সমাজ এবং সাধারণ মানুষ লইয়া এক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এই সমস্ত ভাবধারাকে ধারণ করিয়া যে সত্যই থাকুক না কেন,

ইহা স্পষ্ট যে মানবজাতির যে জীবনব্রত নিজেকে অতিক্রম করিয়া কোন কিছুর মধ্যে উন্মিষিত হইয়া উঠা, তাহার প্রয়োজন সাধনের পক্ষে এ ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, অথবা অন্ততঃ যদি তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয় তবে বর্ত্তমানে সে যাহা আছে তাহা হইতে উন্নততর কিছু তাহাকে হইয়া উঠিতেই হইবে। মানবজাতির এমন কি সাধারণ মানুষের প্রাণের সহজাত চেতনা বর্ত্তমানের ব্যবস্থা অপ্রচুর বোধ করিতেছে, ইহাদের মূল্য উল্টাইয়া দিতে চাহিতেছে আর এক নূতন মূল্যের ও ব্যবস্থার আবিষ্কার এবং এক নূতন ভিত্তির উপরে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। এই জন্য সাধারণ জীবনের ঐক্য, অন্যোন্যতা এবং সৌষম্যের ভিত্তিরূপে সহজ ও সুনির্দ্দিষ্ট এবং পূর্ব্ব হইতে ঠিক ঠাক্ করা এক সাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে; বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৈচিত্র্যের স্থানে সঙ্ঘজীবনে সকলকে ভেদশূন্য একই ছাঁচেঢালা জীবনে প্রতিষ্টিত করিবার জন্য অহং পরিচালিত ব্যক্তিবর্গের সকল প্রতিযোগিতার সংঘর্ষ দমিত করিয়া এই ব্যবস্থা জোর করিয়া চালাইবার প্রয়াস করা হইতেছে। এই বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা চলিতেছে তাহা হইল :—অন্য সমস্ত ভাব ও ভাবনা দূরে রাখিয়া শুধু কয়েকটি সীমিত ভাব বা বুলিকে সিংহাসনে বসাইয়া গায়ের জোরে তাহাদিগকে বাস্তবে রূপ দেওয়া, ব্যক্তির স্বাধীন মননকে দমিত করিয়া রাখা, জীবনের ধারাসকলকে যন্ত্রতন্ত্রের খাতের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া আনা, প্রাণশক্তির উপর এক যান্ত্রিক শাসন চাপাইয়া দিয়া তাহাকে এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে জোর করিয়া প্রবাহিত করিয়া দেওয়া, রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা জোর করিয়া মানুষকে সর্ব্ব বিষয়ে পরিচালনা করা, ব্যক্তিগত অহং-এর স্থানে সঙ্ঘগত অহং-এর প্রতিষ্ঠা করা। সম্প্রদায়গত অহংকে জাতি বা সম্প্রদায়ের আত্মার আসনে বসাইয়া পূজা করা হইতেছে, কিন্তু ইহা একটা বিরাট ভ্রান্তি, এমন কি এ ভ্রান্তি প্রাণঘাতী হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এই ব্যবস্থায়, সমষ্টিগত সত্তা বা সমষ্টিগত প্রাণকে বৃহত্তর কিছু মনে করিয়া তাহারই চালনায় সকল বৈচিত্র্যকে মুছিয়া ফেলিয়া মন, প্রাণ এবং কর্ম্মের উপর জোর করিয়া একটা মতৈক্য স্থাপনের চরম চেষ্টার বিধান দেওয়া হয়। কিন্তু এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমষ্টিগত সত্তা ত বাস্তবিক সম্প্রদায়ের আত্মা নয়, বস্তুতঃ ইহা অবচেতনা হইতে উত্থিত একটা প্রাণশক্তি, বুদ্ধির আলোক যদি ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ না করে তাহা হইলে ইহা অতিপ্রবল অন্ধ আসুরীশক্তিসকল দ্বারা শুধু পরিচালিত হইবে কিন্তু তাহারা জাতিকে মহা বিপদে পাতিত

করিবে, কেননা মানুষ যাহার বাহন এবং মানুষকেই যাহার প্রগতির পথে চলিবার দায় অর্পণ করা হইয়াছে তাহারা সেই সচেতন পরিণামধারার বিরোধী। পরিণামশীল প্রকৃতি মানুষকে এ দিকে অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করে নাই ; সে যাহা তাহার পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে ইহা হইবে আবার সেই দিকে অগ্রসর হওয়া।

আর একটা সমাধান খাড়া করা হয় তাহা হইল বস্তুতন্ত্র বুদ্ধির ভিত্তিতে জাতির অর্থনৈতিক জীবনের এক মিলিত সুব্যবস্থা স্থাপন ; কিন্তু এজন্য সেই একই উপায় অবলম্বিত হয়—জোর করিয়া মন ও প্রাণকে সঙ্কুচিত করা এবং তাহাদের উপর এক মতৈক্য চাপাইয়া দেওয়া এবং সঙ্ঘজীবনকে এক যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত করা। ভাবনা এবং জীবনের সকল স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত বা নিষ্পেষিত করিয়া শুধু এই ভাবের একটা মতৈক্য স্থাপিত করা যায়, তাহার ফলে, হয় উইপোকার সমাজের মত কর্ম্মপটু এক নিশ্চল সঙ্ঘজীবন প্রতিষ্ঠা করা যায় অথবা জীবনের সকল উৎস শুকাইয়া দিয়া তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হয়। একমাত্র চেতনার পরিস্ফুরণ বা বিবৃদ্ধির মধ্য দিয়া সঙ্ঘগত সত্তা এবং তাহার জীবন নিজেকে জানিতে এবং প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে ; মন এবং প্রাণের স্বাধীন ক্রিয়াশক্তি না থাকিলে চেতনার পরিপুষ্টি হইতে পারে না ; কেননা উচ্চতর সাধনযন্ত্র পরিস্ফুরণের পূর্ব্বে কেবল প্রাণ এবং মনই আত্মার সাধনযন্ত্র হইয়া রহিয়াছে ; তাহাদের কর্ম্মশক্তিকে নিরুদ্ধ করা অথবা তাহাদের প্রকৃতি আড়ষ্ট এবং অনম্য করিয়া তাহার প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। ব্যক্তিগত মন এবং প্রাণের বিবৃদ্ধি বা পরিণতির ফলে যে সমস্ত বাধা বা বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িয়াছে তাহা দূর করিতে গিয়া ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যহরণ করিলে সমাজ-জীবনের স্বাস্থ্যহানিই ঘটিবে ; বরং যে বৃহত্তর চেতনার মধ্যে উন্মিষিত হইয়া উঠিতে পারিলে ব্যক্তিত্ব সার্থক এবং পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে তাহার দিকে তাহার প্রগতির পথ উন্মুক্ত রাখাই সমস্যার খাঁটি সমাধান।

এ সমস্ত সমাধানের অনুকল্প হিসাবে অন্য একটা সমাধান হইতেছে সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও সঙ্কল্পকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিয়া তাহাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা লইয়া এমন এক নূতন সমাজ গঠন করা যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সঙ্ঘজীবনের যথাযথ ব্যবস্থার জন্য নিজের অহংকে সমাজের অধীন করিয়া রাখিবে। এই আমূল পরিবর্ত্তন কি করিয়া সম্ভব

করা যাইবে তাহা প্রশ্ন করিলে দুইটি পরিকল্পনা উপস্থিত করা হয়, একটি সামাজিক জীব এবং পৌরজন হিসাবে প্রতি ব্যক্তিকে বৃহত্তর এবং শ্রেষ্ঠতর মনোময় জ্ঞান-সম্পদে বিভূষিত করা, তাহাকে খাঁটিভাবে শিক্ষিত করা, তাহার মধ্যে খাঁটি ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া, তাহাকে খাঁটি খবর সরবরাহ করা ; অপরটি এমন একটি নূতন সমাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করা যাহা নিজের কলে কাটিয়া উন্নততর সামাজিক জীবকে বাহির করিয়া আনিবার যাদুবিদ্যা দেখাইতে পারিবে। কিন্তু একদিন যাহা কিছু আশা করা হইয়া থাকুক না কেন, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে শুধু মনোময় শিক্ষা এবং বুদ্ধির পরিমার্জনা মানুষকে রূপান্তরিত করিতে পারে না ; ইহা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অহংকে আরও অধিক খবর দেয়, এবং তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহার হাতে আরও বেশী কার্য্যকরী যন্ত্র তুলিয়া দেয়, অথচ মানুষের অহং পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাই থাকিয়া যায়। আবার কোন প্রকার সমাজ-যন্ত্রের দ্বারা মানুষকে এক পূর্ণতার ছাঁচে ঢালাই করা যায় না—এমন কি সে পূর্ণতা যদি আসল পূর্ণতা না হইয়া একটা কৃত্রিম মনগড়া পূর্ণতাও হয় ; জড়কে অথবা চিন্তাকে বিশেষ আকারে কাটা বা বিশিষ্ট ছাঁচে ঢালাই করা যায়, কিন্তু মানুষের জীবনে জড় ও চিন্তা আত্মা ও প্রাণশক্তির যন্ত্রমাত্র। যন্ত্রদ্বারা আত্মা এবং প্রাণশক্তিকে আদর্শ কোন আকারে গঠিত করা যায় না, যন্ত্র বড় জোর শক্তিপ্রয়োগে আত্মা এবং মনকে অসাড় ও নিশ্চল করিয়া ফেলিতে পারে, এবং প্রাণের বাহ্য কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে ; কিন্তু তাহাও সুষ্ঠুভাবে করিতে গেলে মন এবং প্রাণকে জোর করিয়া সঙ্কুচিত করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে মানুষের জীবনে প্রগতিশূন্য নিশ্চলতা অথবা অধঃপতন আসিয়া পড়ে। বুদ্ধি তাহার ব্যবহারিক ক্ষেত্রের যুক্তিপ্রবণতা লইয়া মন এবং প্রাণশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত এবং যান্ত্রিক বিধানে আড়ষ্ট করা ছাড়া প্রকৃতির দ্ব্যর্থক জটিল গতিবৃত্তিকে আপন বশে আনিবার অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া পায় না। যদি তাহাই করা হয় তাহা হইলে মানবাত্মাকে হয় বিদ্রোহী হইয়া যে যন্ত্রের কবলে তাহাকে নিক্ষেপ করা হইয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং পুষ্টির পথে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে অথবা জীবনকে বর্জ্জন করিয়া জগৎ হইতে পলায়নের জন্য নিজের মধ্যে গুটাইয়া আসিতে হইবে। মানুষের এ সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার প্রকৃত পন্থা হইল তাহার আত্মা ও আত্মশক্তিকে আবিষ্কার করা, তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা এবং তাহাকেই মনের যন্ত্রমূঢ়তা এবং প্রাণপ্রকৃতির অবিদ্যা ও বিশৃঙ্খলার

স্থানে স্থাপিত করা। কিন্তু নিবিড়ভাবে নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রভাবাপন্ন সমাজ-জীবনে আত্মাকে আবিষ্কার এবং রূপায়িত করিয়া তুলিবার মত স্বাধীনতা বা অবকাশ নাই বলিলেই চলে।

একটা সম্ভাবনা আছে যে, জীবন এবং সমাজের যান্ত্রিক ধারণা ও বিধান হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মানুষের মন ধর্ম্মভাবের আশ্রয় লইতে এবং ধর্ম্মানুমোদিত এবং ধর্ম্মশাসিত এক সমাজ আবার স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইতে পারে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বৈধমার্গের আনুশাসনিক ধর্ম্ম ব্যক্তি-জীবনের অন্তরের উন্নতি বিধান করিবার উপায় দেখাইতে এবং তাহার মধ্যে বা পশ্চাতে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দিকে উন্মিষিত হইবার একটা পথ উন্মুক্ত রাখিতে পারে বটে কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা মানব-জীবন ও মানব-সমাজের রূপান্তর সাধন করিতে পারে নাই; করিতে পারে নাই তাহার কারণ এই যে সমাজকে শাসন এবং পরিচালন করিতে গিয়া তাহাকে প্রাণের নিম্নতর বৃত্তিসকলের সহিত আপোষ রফা করিতে হইয়াছে এবং সমগ্র সত্তার আন্তর রূপান্তর দাবি করিতে সমর্থ হয় নাই; ইহা মানুষকে শুধু কোন ধর্ম্মমত মানিয়া চলিবার, ধর্ম্মের এবং নীতির আদর্শকে লৌকিকভাবে স্বীকার করিবার, বিশেষ আচার অনুষ্ঠান বিধি নিষেধ মানিয়া চলিবার দাবি শুধু সার্থকভাবে জানাইতে পারিয়াছে। এই ধরণের ধর্ম্ম সমাজের বহির্জীবনে নীতি ও ধর্ম্মের উপর একটু আলগা রং লাগাইতে শুধু সমর্থ হয়; ধর্ম্ম, আন্তর অনুভূতির একটা সারাংশ যদি নিজের মধ্যে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে পারে তবে কখনও কখনও আধ্যাত্মিকতার একটা অপূর্ণ আবেগ সমাজ-জীবনের মধ্যে কতকটা সঞ্চার করিতেও পারে; কিন্তু জাতির প্রকৃতির পূর্ণরূপান্তর সাধন করিতে অথবা মানব-জীবনে এক নূতন তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। সমস্ত জীবন এবং সমগ্র প্রকৃতির গতি আধ্যাত্মিকতার দিকে পূর্ণরূপে ফিরাইতে না পারিলে মানবজাতি নিজেকে অতিক্রম করিয়া উত্তর ভূমিতে পৌঁছিতে পারিবে না। ধর্ম্মদ্বারা মানবসমাজের সমস্যা-সমাধানের অনুরূপ আর একটা সমাধান হইল সমাজকে অধ্যাত্মক্ষেত্রে সিদ্ধ মহাজনের পরিচালনার অধীন করা, সমধর্ম্মী বা সমপন্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কিম্বা একত্ববোধ জাগান, প্রাচীন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিয়া অথবা নূতন কোন ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়া মানুষের জীবন এবং সমাজ অধ্যাত্মভাবে বিভাবিত করিয়া তোলা। এরূপ প্রচেষ্টা পূর্ব্বে হইয়াছে কিন্তু সফল হয় নাই; পূর্ব্বগত একাধিক ধর্ম্ম স্থাপনের মূল ধারণা ইহাই ছিল; কিন্তু মানুষের অহং এবং প্রাণপ্রকৃতির শক্তি এত

অধিক যে ধর্ম্মভাব মনের উপর ক্রিয়া করিয়া মনের সাহায্যে তাহাদের দেওয়া বাধাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। কেবল মাত্র আমাদের আত্মার পরিপূর্ণ পরিস্ফুরণ হইলে, চিৎপুরুষের স্বরূপজ্যোতি এবং স্বরূপশক্তির পরিপূর্ণ অবতরণ ঘটিলে এবং তাহার ফলে অতিমানসী এবং চিন্ময়ী পরমাপ্রকৃতি আমাদের অপ্রচুর মনোময় এবং প্রাণময় প্রকৃতির স্থান অধিকার করিলে অথবা তাহার বীর্য্যে এই অপরা প্রকৃতির উর্দ্ধায়ন বা রূপান্তর সাধিত হইলে পরিণাম ধারার মধ্যে এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতে পারে।

প্রকৃতির এই আমূল রূপান্তরের দাবির সম্বন্ধে মানুষের সকল আশা কোন সুদূর ভবিষ্যতে শুধু মিটিতে পারে প্রথম দৃষ্টিতে তাহাই মনে হয়, কেননা মানুষের পক্ষে তাহার প্রাকৃত স্বভাব ছাড়াইয়া যাওয়া, তাহার মনোময় প্রাণময় এবং অনুময় সত্তাকে অতিক্রম করিয়া আরো উপরে উঠা, এমন এক উচচাবস্থা এবং তাহার সাধনা এত দুরূহ যে, মনে হয় বর্ত্তমান মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব। যদি তাহাই হয় তথাপি তাহা ছাড়া মানুষের দিব্য রূপান্তরের আর কোন সম্ভাবনা ত নাই ; কেননা মানব প্রকৃতির রূপান্তর সাধন না করিয়া মানব-জীবনের সত্যকার রূপান্তর সাধন সম্ভব হইবে এ আশা অযৌক্তিক এবং অনাধ্যাত্মিক ; ইহা চাওয়ার অর্থ অস্বাভাবিক ও অবাস্তব বা অসম্ভব অলৌকিক কিছুর দাবি। কিন্তু যাহা বস্তুতঃ বহু দূরে অবস্থিত, আমাদের সত্তার যাহা বিরোধী এবং মূলতঃ যাহা অসম্ভব, এই রূপান্তর তেমন কিছুর দাবি করে না ; কেননা যাহাকে পরিস্ফুরিত করিতে হইবে তাহা আমাদের সত্তাতে অবস্থিত আছে, তাহার বহিঃস্থিত কোন কিছু নয় ; পরিণামশীল প্রকৃতির তাগিদ আত্মজ্ঞানে জাগরিত হওয়া, আত্মাকে আবিষ্কার করা ; তাহা আমাদের মধ্যে যে আত্মা বা চিৎপুরুষ রহিয়াছেন তাহারই প্রকাশের তাগিদ, প্রকৃতি শুধু চায় আমাদের মধ্যে যে আত্মজ্ঞান, আত্মশক্তি এবং আত্মার স্বাভাবিক সাধনসম্পদ গুপ্ত আছে তাহারই শুধু মুক্তি ঘটুক। তাহা ছাড়া ইহা এমন একটা অবস্থা যাহাতে পৌঁছিবার জন্য সমগ্র পরিণামধারা দীর্ঘ যুগ ব্যাপিয়া প্রস্তুত হইতেছে ; মানুষের নিয়তির প্রতিটি সঙ্কট এই অবস্থাকে নিকটতর করিয়াছে ; মনোময় এবং প্রাণময় পরিণামধারা এমন এক বিন্দুতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যেখানে বুদ্ধি এবং প্রাণশক্তির উপর চাপ এক প্রকার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, এবার হয় তাহারা ভাঙিয়া যাইবে বা পরাজয়ের জড়তার মধ্যে অবসনু হইয়া পড়িবে ; কিম্বা প্রগতিশূন্য নিশ্চেষ্টতার মধ্যে নিদ্রিত হইবে, অথবা যে আবরণের বিরুদ্ধে এত

কাল তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছিল তাহা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। এখন প্রয়োজন কয়েকজন অথবা অনেকের দৃষ্টিতে যে রূপান্তরের ছবি পরিস্ফুরিত হইয়াছে মানবজাতির সেই দিকে ফিরিয়া দাঁড়ান, ইহার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা, এবং ইহা যে সম্ভব হইবে সেই বোধ গড়িয়া তোলা, ইহাকে নিজেদের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার ইচছা ও ইহাকে সিদ্ধ করিবার সাধনার ধারা আবিষ্কারের প্রেরণা জাগাইয়া দেওয়া। মানব জাতির মধ্যে এদিকে ঝোঁক নাই তাহা নহে, মানুষের জাগতিক নিয়তির সঙ্কট এ ঝোঁক বাড়াইয়া দিবে, একটা নিষ্কৃতি বা সমাধান চাই এবং অধ্যাত্ম সমাধান ছাড়া অন্য কোন সমাধান নাই, এ অনুভূতি সঙ্কটজনক অবস্থার তাড়নে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিবেই এবং মানুষকে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য করিবে। মর্ত্ত্যজীবের সত্তার এই আকূতিতে পরমপুরুষ এবং পরমাপ্রকৃতির মধ্যেও সাড়া জাগিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হয়ত এই সাড়ায় শুধু ব্যষ্টিজীবনই ফুটিয়া উঠিতে পারে; ইহার ফলে হয়ত বহু অধ্যাত্মচেতন ব্যক্তিপুরুষের এবং এমন কি অদিব্য গণচেতনার মধ্যে পৃথকভাবে এক কিম্বা একাধিক বিজ্ঞানময় পুরুষের আবির্ভাব হইবে —অবশ্য কল্পনায় ইহা সম্ভব হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে কতদূর সম্ভব হইবে তাহা বলা যায় না। এইরূপ নিঃসঙ্গ সিদ্ধপুরুষগণকে হয় কোন গোপন দিব্যধামে প্রস্থান করিতে এবং চিন্ময় নির্জ্জনতার মধ্যে বাস করিয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে অথবা এই অবস্থায় উচ্চতর ভবিষ্যতের জন্য মানুষকে যতটুকু প্রস্তুত করিতে পারা যায় তাহার জন্য নিজেদের আন্তর আলোকের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতে হইবে। মনে হয় যে অন্তরের এই রূপান্তরের সূচনা সমষ্টিজীবনে দেখা দিতে পারে যদি বিজ্ঞানময় পুরুষ তাহার নিজের অনুরূপভাবে যাহাদের অন্তর্জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে নিজের স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনের সঙ্গে তাহাদিগকে লইয়া একটা সঙ্ঘ অথবা একটা পৃথক সম্প্রদায় অথবা যাহাদের জীবনের মধ্যে তাহার নিজের আন্তর বিধান ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাদের একটা মণ্ডলী স্থাপন করিতে পারেন। আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তরের শক্তি, উদ্দেশ্য বা আকূতির সঙ্গে সুর মিলাইয়া নিজ জীবনের বিধান অনুসারে পৃথকভাবে জীবনযাপনের এবং তাহার পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তদনুরূপ একটা পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনবশতই অতীতে সন্ন্যাসীর সঙ্ঘজীবন রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে অথবা আধ্যাত্মিকতার তত্ত্বে সাধারণ মানবজীবন হইতে যাহা অন্যবিধ এরূপ পৃথক

পৃথক নানা প্রকারের অভিনব সম্প্রদায়গত আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের বহু চেষ্টা দেখা দিয়াছে। সন্ন্যাসীর সঙ্ঘগত জীবনে স্বভাবতই পারত্রিক মঙ্গলেচ্ছু সাধকগণের মিলন হয়, যাহাদের সহিত মিলন হয় তাহাদের সকলেরই একমাত্র চেষ্টার বিষয় থাকে নিজেদের মধ্যস্থিত চিন্ময় সত্যবস্তুকে অন্বেষণ ও উপলব্ধি করা এবং জীবনের যাহা যাহা তাহাদের সেই সাধনার সহায় হইবে সেই সমস্ত বিধান লইয়া সঙ্ঘজীবন স্থাপন করা। যাহাতে সাধারণ মানব-সমাজকে অতিক্রম করিয়া এক নূতন জগৎব্যবস্থা স্থাপিত হইতে পারে তজ্জন্য অভিনব জীবনের রূপায়ণ সাধারণতঃ তাহাদের সাধনার উদ্দেশ্য নয়। কোন কোন ধর্ম্ম ইহাকে ভবিষ্যতের শেষ সম্ভাবনারূপে নিজের সম্মুখে স্থাপিত করিতে অথবা সেই সম্ভাবনাকে প্রাথমিকভাবে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে পারে কিম্বা মনোময় একটা আদর্শ এ সাধনায় তাহাকে প্রবৃত্তি দিতে পারে। কিন্তু যাহা কিছুতেই দূর হইতে চায় না মানুষের প্রাণপ্রকৃতিতে সেই নিশ্চেতনা এবং অবিদ্যা দ্বারা এ সাধনা চিরকালই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে ; কেননা সে প্রকৃতির বাধা এত প্রবল যে কেবলমাত্র মনোময় আদর্শ অথবা অপূর্ণ আধ্যাত্মিক অভীপ্সা তাহার দুর্দ্দান্ত পুঞ্জীভূত তামসিকতাকে রূপান্তরিত অথবা স্থায়ীভাবে শাসিত করিতে পারে না। হয় তাহার নিজের অপূর্ণতার জন্য সাধনা ব্যর্থ হইয়া যায় অথবা বাহ্য জগতের অপূর্ণতার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহার অভীপ্সাদীপ্ত উচ্চ শিখর হইতে সাধারণ মর্ত্ত্যভূমিতে নামিয়া আসিয়া একটা মিশ্রিত এবং নিম্নতর ভাবে পরিণত হইয়া পড়ে। যাহার উদ্দেশ্য চিন্ময় সত্তারই প্রকাশ মনোময় প্রাণময় বা অন্নময় সত্তার নয়, এমন এক সমষ্টিগত অধ্যাত্ম-জীবনকে প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষা করিতে হইবে ; সে প্রতিষ্ঠার মূলে থাকিবে সাধারণ মানবসমাজের অন্ন-প্রাণ-মনোময় বাসনা বা আকূতি হইতে বৃহত্তর ইষ্টার্থ (value) লাভের প্রেরণা ; তাহা না হইলে তাহাকে প্রাকৃত মানব-সমাজের একটুখানি ইতরবিশেষ ছাড়া আর কিছু বলা চলিবে না। পৃথিবীতে নব জীবনের আবির্ভাব ঘটাইতে হইলে চাই বহুব্যক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন এক চেতনার সমাবেশ, চাই তাহারই শক্তিতে তাহাদের অন্ন-প্রাণ-মনোময় বাহ্য প্রকৃতির, এক কথায় সমগ্র সত্তার রূপান্তর ; কেবলমাত্র মানব-সাধারণের মন প্রাণ এবং দেহে এই পূর্ণরূপান্তর সাধিত হইলে সার্থক নব সঙ্ঘজীবন আসিতে পারে। পরিণামশীল প্রকৃতির পক্ষে কেবল এক নূতন ধরণের মনোময় সত্তার সৃষ্টির জন্য সাধন করিলে চলিবে না, তাহাকে ঘটাইতে হইবে অন্য এমন এক

জাতীয় সত্তার প্রকাশ যাহারা তাহাদের সমগ্র জীবন বর্ত্তমান মনোময় পাশবতার ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া লইয়া পার্থিব প্রকৃতির মধ্যস্থিত এক বৃহত্তর চিন্ময়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে।

বহুলোকের মধ্যে পার্থিব জীবনের এইরূপ পূর্ণ রূপান্তর এক সঙ্গে কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না ; এমন কি যখন প্রকৃতি-পরিণাম নূতন পথে মোড় ফিরিয়াছে, যখন সীমারেখা পার হইয়াছে তখনও প্রথমে কিছুকাল এই নূতন জীবনকে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিতে এবং কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা পুষ্ট হইতে হইবে। সমস্ত জীবনকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মধ্যে গ্রহণ করিয়া পুরাতন চেতনাধারার সাধারণ পরিবর্ত্তন—ইহাই হইল প্রথম পদক্ষেপ ; ইহার জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনা করিতে দীর্ঘকাল লাগিতে পারে, এবং রূপান্তর একবার আরম্ভ হইলেও পর্ব্বে পর্ব্বে তাহা চলিতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনের প্রগতি কোন একটা বিন্দুতে আসিয়া পৌঁছিলে রূপান্তরের গতিবেগ খুব ক্ষিপ্র হইতে পারে এমন কি পরিণামধারা ক্রমভঙ্গ করিয়া লম্ফ দিয়া নিজেকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে ; কিন্তু এক ব্যক্তির রূপান্তরে এক নূতন জাতীয় সত্তার বা নূতন সঙ্ঘজীবনের সৃষ্টি হয় না। কল্পনা করা যাইতে পারে যে পুরাতন জীবনধারার মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে এই নূতন চেতনার উন্মেষ হইবে এবং তাহাদিগের একত্র মিলনে নূতন জীবনের এক কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। কিন্তু মনে হয় না যে এই প্রণালীতে প্রকৃতি ক্রিয়া করিবে, নিম্নতর প্রাকৃতিক জীবনের আবেষ্টনে বেষ্টিত থাকিয়া কোন ব্যক্তির পক্ষে পূর্ণ রূপান্তর লাভ করাও অতি দুরূহ ব্যাপার। তাই একটা বিশেষ পর্ব্বে চিরাগত প্রথামত একটা বিবিক্ত সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহার দুইটি উদ্দেশ্য থাকিবে : প্রথমতঃ একটা নিরাপদ আবহাওয়া, একটা স্থান একটা বিবিক্ত জীবন গড়িয়া তোলা, যেখানে সঙ্ঘজীবনের সকলেই এক সাধনায় এক তপস্যায় রত থাকাতে এক অনুকূল পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিচেতনা তাহার এই পরিণতির জন্য অভিনিবিষ্ট হইয়া যাইতে পারে ; তাহার পর সকল আয়োজন পূর্ণ হইলে এই পরিবেশের, এই প্রস্তুত আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার মধ্যে নূতন জীবনকে রূপায়িত ও পুষ্ট করিয়া তোলা যাইতে পারে। ইহা হইতে পারে যে সাধনার এইরূপ অভিনিবেশ এবং কেন্দ্রীকরণের মধ্যে রূপান্তরের সকল বাধা আরও ঘনীভূত শক্তির সঙ্গে আসিয়া দেখা দিবে ; কেননা ব্যক্তিগতভাবে প্রতি সাধকের মধ্যে যেমন থাকিবে ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাকে সফল করিবার একট আবেগ তেমনি

থাকিবে যে-জগৎকে রূপান্তরিত করিতে হইবে তাহার নানা অপূর্ণতা, সাধকের সামর্থ্যের সঙ্গে তাহার পুরাতন সংস্কারের নানা বাধা এবং বিরোধও আসিয়া পড়িবে; যেখানে প্রসারতা অল্প, সাধারণ জীবন সংকীর্ণ এবং পরস্পরের জীবন অতি নিকটে অবস্থিত সেখানে পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই বাধাগুলি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া উৰ্দ্ধ পরিণামের দিকে বৰ্দ্ধিত এবং একাগ্র বীর্য্যকেও বিপর্য্যস্ত করিতে চাহিবে। অতীতে মনোময় মানুষ তাহার সাধারণ মনপ্রাণময় জীবনের অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর অধিকতর সত্য ও ছন্দ সুষমাময় জীবন যতবার স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে ততবারই এই সকল বাধা তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি যদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, এই রূপান্তরসাধনের সঙ্কল্প যদি তাহার মধ্যে জাগিয়া থাকে, অথবা উৰ্দ্ধভূমি হইতে চিৎপুরুষের যে শক্তি নামিয়া আসিতেছে তাহা যদি প্রচুর বলশালী হয় তাহা হইলে বাধা অতিক্রান্ত হইবে এবং দিব্য পরিণামের এক বা একাধিক প্রাথমিক রূপায়ণ দেখা দেওয়া সম্ভব হইবে।

দিব্য এক আলোক এবং ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া জীবনে চিৎপুরুষের সত্যকে প্রদীপ্ত তেজে ফুটাইয়া তোলাই যদি বিধান হয় তবে যেখানে সকল সত্তার চেতনা এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তেমন এক বিজ্ঞানময় জগৎ পূৰ্ব্ব হইতে কোন স্থানে বৰ্ত্তমান আছে ইহা যেন স্বীকার করিয়া লইতে হয়; ইহা বুঝা যায় যে তথায় এক বা বহু সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিসত্তাসকলের পরস্পর প্রাণবিনিময় তাহাদের স্বভাবধৰ্ম্ম অনুসারেই হইবে এক সচেতন ও সুসমঞ্জস সুষমার ধারা। কিন্তু এই জগতে কার্য্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানময় পুরুষ এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাকৃত সত্তাসকলের জীবনধারা পাশাপাশি থাকিয়া যাইবে, বিজ্ঞানময় জীবন অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবনের মধ্যে থাকিয়া তথা হইতে উন্মিষিত হইতে চাহিবে অথচ এই দুইটি জীবনধারার বিধান বিরোধী এবং পরস্পরকে আঘাত করিবে ইহাই মনে হয়। তাই যেন বোধহয় চিন্ময় সঙ্ঘের জীবন এবং অবিদ্যার জীবন সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন; অন্যথায় এই দুই জীবনধারার মধ্যে একটা আপোষ রফা করা যেন অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে এবং আপোষ রফার অর্থ বৃহত্তর জীবনে কলুষতা এবং অপূর্ণতার বিপদকে ডাকিয়া আনা; জীবনের দুইটি বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধধৰ্ম্মী ধারা পাশাপাশি থাকিলে, উন্নততরটি নিম্নতরটিকে প্রভাবিত করিলেও নিম্নতর জীবনের প্রভাব বৃহত্তরের উপর পড়িবে কেননা পাশাপাশি থাকিলে ও পরস্পরের

মধ্যে বিনিময় চলিলে পরস্পরের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত দেখা দিবে ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এ প্রশ্নও তোলা যাইতে পারে যে এরূপ ক্ষেত্রে উভয় জীবনধারার পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ কি প্রথম ও প্রধান বস্তু হইবে না ? কেননা অবিদ্যার জীবনের মধ্যে যাহারা অশিবের সেবক এবং হিংসার আশ্রয়স্থল অন্ধকারের তেমন দানবী শক্তিসমূহের দুর্দ্ধর্ষ প্রভাব ক্রিয়াশীলভাবে বর্ত্তমান থাকিবে, যাহাদের স্বার্থ, মানুষের জীবনে যে কোন উচচ আলোক অনুপ্রবিষ্ট হয় তাহাকে কলুষিত এবং ধ্বংস করা। অতীত যুগে পুনঃ পুনঃ ইহা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে যাহা কিছু নূতন উপস্থিত হইয়াছে বা মানুষের অবিদ্যাচছন্ন জীবন ব্যবস্থার উপরে উঠিতে চাহিয়াছে অথবা তাহার বিধানভঙ্গ করিয়া আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিয়াছে, এই দানবী শক্তি তাহার প্রতি অসহিষ্ণু হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধাচরণ এমন কি তাহাকে নিগৃহীত করিয়াছে, অথবা যে ক্ষেত্রে নবাগত ভাব জয়লাভ করিয়াছে তখন তাহাকে স্বীকার করিয়াও তাহার মধ্যে এই শক্তি অনাহূতভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন বিরোধাপেক্ষা এই স্বীকৃতিই হইয়াছে জগতের পক্ষে আরও বিপজ্জনক, ফলে অবশেষে জীবনের নূতন তত্ত্ব অবনত, কলুষিত বা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে ; ইহাই কি খুবই সম্ভব নহে যে সম্পূর্ণ নতন কোন আলোক বা অভিনব কোন শক্তি আসিয়া যদি উত্তরাধিকার সূত্রে জগতের উপর অধিকারের দাবি উপস্থিত করে তবে এ শক্তির বিরোধ আরও বেশী উগ্র এবং হিংস্র হইবে এবং তাহার ব্যর্থতার আশঙ্কাও আরও বেশী পরিমাণে দেখা দিবে ? কিন্তু ইহাও ধরিয়া লইতে পারি যে এই নূতন এবং পূর্ণ আলোক তাহার সঙ্গে এক নূতন এবং পূর্ণ শক্তিকেও লইয়া আসিবে। এই জন্য হয়ত জগতে তাহাকে পূর্ণরূপে বিবিক্ত হইয়া থাকিতে হইবে না, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দ্বীপে (ব্যষ্টি-সত্তায়) হয়ত সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং তথা হইতে পুরাতন জীবন-ধারার মধ্যে প্রসারিত হইয়া পড়িবে, তাহার অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিবে, এইভাবে ক্রমশঃ তাহাকে জয় করিবে তাহার মধ্যে এমন এক আলোক এবং সহায়তা বহন করিয়া আনিবে, যাহাকে কিছুদিন পরে মানবজাতি তাহার নব জাগ্রত অভীপ্সার বলে চিনিতে পারিবে এবং সাদরে আবাহন করিয়া লইবে।

কিন্তু পরিণামধারার প্রগতিতে উন্মিষন্ত নূতন শক্তি যখন বিপরীত দিকের আবর্ত্তন সফল করিয়া পূর্ণভাবে জয়লাভ করিবে এবং যখন বিজ্ঞানময় সত্তা মনোময় সত্তার মত পার্থিব জগৎ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইবে তাহার

পূর্ব্বে যে সময় পুরাতন চেতনা নূতন চেতনায় পরিবর্ত্তিত হইবার পর্ব্ব-সন্ধিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে স্পষ্টতঃ এ সমস্ত সেই সময়ের সমস্যা। কিন্তু যদি আমরা মানিয়া লই যে, বিজ্ঞানময় চেতনা পার্থিব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার হাতে যে জ্ঞান এবং শক্তি থাকিবে তাহা মনোময় মানুষের জ্ঞান ও শক্তি হইতে হইবে বহুগুণে বৃহত্তর; এবং যদি ধরিয়া নেওয়া যায় যে বিজ্ঞানময় সঙ্ঘজীবন বিবিক্তভাবেই অবস্থিত থাকিবে তাহা হইলেও সে জীবন দানবীয় শক্তিসকলের আক্রমণ হইতে তেমনি নিরাপদ হইবে, নিম্নতর প্রাণীর আক্রমণের হাত হইতে আজ মনোময় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ যেরূপ নিরাপদ হইয়াছে। এই জ্ঞান এবং বিজ্ঞানময় প্রকৃতির স্বভাবধর্ম্ম বিজ্ঞানময় পুরুষসকলের সাধারণ জীবনে অদ্বৈতবোধের দীপ্তি যেমন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে তেমনি তাহার প্রভাব বিদ্যার এবং অবিদ্যার জীবন এ উভয়কে একটা সামঞ্জস্য এবং সুষমাময় ছন্দে গ্রথিত হইতে বাধ্য করিবার পক্ষেও যথেষ্ট শক্তিশালী হইবে। পৃথিবীর বুকে অতিমানস তত্ত্বের প্রভাব অবিদ্যার জীবনের উপর পতিত হইবে এবং সে জীবনেও তাহার সীমার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে বিজ্ঞানময় জীবন বিবিক্তভাবে অবস্থিত থাকিবে কিন্তু মানুষের জীবনের যতটুকু আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরিবে এবং ঊর্দ্ধ্ব পথযাত্রী হইবে ততটুকু সে নিশ্চয়ই তাহার নিজ সীমান্তপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবে; প্রধানতঃ মনস্তত্ত্ব এবং পুরাতন ভিত্তির উপরই জীবনের বাকী অংশ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে কিন্তু স্পষ্ট অনুভূত হইবে যে এক বৃহত্তর জ্ঞানের সাহায্যে এবং প্রভাবেই যাহা করিতে আজ পর্য্যন্ত কোন সমাজ বা সঙ্ঘ সমর্থ হয় নাই এমন এক পূর্ণতর সৌষম্যের ধারায় সকলের মধ্যে সে-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এখানেও মন ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার একটা ছবি শুধু আঁকিতে পারে; জগতের এই নূতন ব্যবস্থা বস্তুসত্য অনুসারে কি ভাবে সাম্য আনিবে তাহা পরাপ্রকৃতিতে অবস্থিত অতিমানস নিজেই স্থির করিবে।

বিজ্ঞানময়ী পরাপ্রকৃতি আমাদের অবিদ্যাচ্ছন্ন সাধারণ প্রকৃতির সকল আদর্শ সকল ধর্ম্মের উপরে অবস্থিত; আমাদের সকল আদর্শ, জীবনের সকল মূল্য ও মান অবিদ্যার দ্বারা সৃষ্ট অতএব তাহা দিয়া পরাপ্রকৃতির প্রাণের ছন্দকে বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে হয় যে আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতি পরাপ্রকৃতি হইতে জাত হইয়াছে তাহাকে বিশুদ্ধ অজ্ঞান বলা চলে না, তাহাতে এক অর্দ্ধজ্ঞান আছে; সুতরাং ইহা মনে করা যুক্তিযুক্ত যে তাহার

আদর্শ ও পুরুষার্থের অন্তরালে যে অধ্যাত্ম সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এই উচ্চতর জীবনে তাহা পুনরায় ফুটিয়া উঠিবে—ঠিক আদর্শরূপে নহে, কিন্তু অবিদ্যা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অধিকতর জ্যোতির্ম্ময় জীবনের সত্য সুষমার মধ্যে উন্নীত এবং রূপান্তরিত হইয়া তাহারই উপাদানরূপে দেখা দিবে। বিশ্বাত্মভাবে বিভাবিত চিন্ময় ব্যষ্টি পুরুষের নিকট হইতে যখন অহংরূপী সংকীর্ণ ব্যক্তিত্ব খসিয়া পড়িবে, যখন তিনি মনের উপর উঠিয়া অতিমানসের মধ্যস্থ পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবেন তখন সঙ্গে সঙ্গে মনের দ্বন্দ্বভাবময় আদর্শও শূন্যে মিলাইয়া যাইবে, কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে যে সত্য আছে পরাপ্রকৃতির জীবনে তাহা বর্ত্তমান থাকিবে। বিজ্ঞানময় চেতনা এমনই এক চেতনা যাহার মধ্যে সকল বিরোধ লয় পায় অথবা সত্তা এবং দৃষ্টির বৃহত্তর আলোকে আত্মজ্ঞান এবং জগৎ-জ্ঞানের পরম মিলনে দ্বন্দ্বের এক কোটি অপরের মধ্যে গলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। বিজ্ঞানময় পুরুষ মনের আদর্শ এবং মান গ্রহণ করিবেন না; তাঁহার জীবন তাঁহার নিজের বা তাঁহার অহংএর জন্য অথবা অপর মানব বা মানবজাতির জন্য অথবা সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য নহে; কেননা তিনি এই সমস্ত অর্দ্ধসত্য হইতে বৃহত্তর কিছুকে, দিব্য সত্যবস্তুকে জানিবেন এবং সেই তৎস্বরূপের জন্যই তাঁহার জীবন; তাঁহার নিজের এবং সকলের মধ্যে সেই সত্যময় পুরুষের ইচ্ছা পূরণের জন্য উদার বিশ্বাত্মভাবে বিভাবিত হইয়া বিশ্বাতীত পুরুষের দিব্য ইচ্ছার আলোকের মধ্যে হইবে তাহার বাস। ঠিক একই কারণে বিজ্ঞানময় জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং পরার্থপরতার মধ্যে কোন বিরোধ নাই কেননা বিজ্ঞানময় পুরুষের আত্মা সকলেরই আত্মার সহিত এক, তাঁহার মধ্যে ব্যক্তিজীবনের এবং সমষ্টিজীবনের আদর্শের মধ্যেও কোন বিরোধ নাই কেননা উভয়ই এক বৃহত্তর সত্যবস্তুর আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন দিক, ইহার কোনটা যতটা সেই সত্যস্বরূপকে প্রকাশ করিবে অথবা তাহাদের সার্থকতা যে পরিমাণে সত্যস্বরূপের ইচ্ছা পূর্ণ করিবে সেই পরিমাণে তাঁহার কাছে তাহাদের মূল্য থাকিবে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনোময় আদর্শের মধ্যে যে সত্য আছে এবং যাহা মনোময় জীবের মধ্যে শুধু অস্পষ্টরূপে ফুটিয়াছে তাহা তাঁহার জীবনে সার্থক হইবে; কেননা যেমন তাঁহার চেতনা সকল মানুষী আদর্শ ও মানকে অতিক্রম করিয়া যাইবে যেমন তিনি ভগবানের আসনে নিজেকে বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা মানবজাতিকে, রাষ্ট্র বা অন্য কাহাকেও বসাইতে পারেন না, তেমনি তাঁহার নিজের মধ্যে ভগবানের প্রতিষ্ঠা অপরের মধ্যে ভগবানের

অনুভূতি, তাহাদের মধ্যে ভগবান আছেন বলিয়া সমস্ত মানবজাতির সর্ব্বভূতের সকল জগতের সহিত একত্ববোধ স্থাপন হইবে তাঁহার জীবনব্রত; আবার সেই সঙ্গে তাহাদের মধ্যে উন্মিষন্ত সত্যবস্তুকে বৃহত্তর ও সুষ্ঠুতরভাবে প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করাও হইবে তাঁহার জীবনের ক্রিয়ার এক প্রধান অঙ্গ। কিন্তু তিনি যাহা করিবেন তাহা তাঁহার মধ্যস্থ দিব্যজ্ঞান ও দিব্য সঙ্কল্পের সত্য দ্বারাই নির্ণীত হইবে, সে সত্য সমগ্র এবং অনন্ত যাহাকে মনোময় কোন এক বিধান আদর্শ বা মান দ্বারা বাঁধা যায় না; কিন্তু সমগ্র সত্যের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার মধ্যেই চলিবে সে ক্রিয়া; অথচ প্রত্যেক খণ্ডসত্যকে যথাযথস্থানে স্থাপন করিবার বিধানের দিকে যেমন থাকিবে তাঁহার শ্রদ্ধা তেমনি যে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহার এবং বিশ্বপরিণামের প্রতি স্তরে প্রত্যেক ঘটনায় দিব্যপুরুষ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন তাহার সুস্পষ্ট জ্ঞানও থাকিবে সে ক্রিয়ার মধ্যে।

বিজ্ঞানময় পুরুষের সিদ্ধচেতনায় সমস্ত জীবনই হইবে চিৎসত্তার সিদ্ধ সত্যের আত্মপ্রকাশ; তাহার জীবনে কেবল তাহারই স্থান হইবে যাহা নিজেকে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইবে, যাহা সেই বৃহত্তর সত্যের মধ্যে নিজের চিন্ময় স্বরূপের সন্ধান পাইবে এবং তাহার সৌষম্যের মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিতে পারিবে। এইভাবে কাহার স্থান হইবে বা আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতির কতটা বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে তাহা মন নির্ণয় করিতে পারে না, কেননা অতিমানস বিজ্ঞান নিজের সত্যকে নামাইয়া আনিবে এবং সেই সত্য তাহার নিজেরই যেটুকু আমাদের মন প্রাণ এবং দেহের আদর্শও উপলব্ধির মধ্যে স্থাপিত আছে তাহা গ্রহণ করিবে। যাহা এই ভাবে বাঁচিতে সমর্থ হইবে তাহার বর্ত্তমান আকার হয়ত তখন থাকিবে না, কেননা রূপান্তর করিয়া না লইলে বা নূতন করিয়া গড়িয়া না তুলিলে নূতন জীবনের পক্ষে তাহারা উপযোগী হইবে না, ইহাই সম্ভব মনে হয়; তাহাদের মধ্যে বা এমন কি তাহাদের আকারের মধ্যে যাহা সত্য এবং টিকিয়া থাকিবার উপযুক্ত তাহাদিগকেও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রয়োজনীয় রূপান্তরের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। মানুষের জীবনে আজ যাহা স্বাভাবিক তাহার অনেক কিছু লোপ পাইবে। এই অতিমানস বিজ্ঞানের আলোকে মানুষের অনেক মনোময় প্রতিমা, অনেক মনগড়া তত্ত্ব এবং প্রতিষ্ঠান, মন এবং প্রাণের সকল ক্ষেত্রে মানুষ পরস্পর বিরোধী যে সকল আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাদের অনেক অশ্রদ্ধেয় এবং গ্রহণের অযোগ্য

বলিয়া বিবেচিত হইবে ; আপাতরম্য বা দৃশ্যতঃ যুক্তিপূর্ণ এই সমস্ত প্রতি-মূর্ত্তির অন্তরালে যদি কোন সত্য লুকাইয়া থাকে কেবল তাহাই উদারতর ভিত্তিতে স্থাপিত এই জীবনের সমন্বয় ও সুষমার উপাদানরূপে গৃহীত হইবে। স্পষ্টই বুঝা যায় যে বিজ্ঞানময় চেতনার দ্বারা শাসিত জীবনে বিরোধ এবং শত্রুতা ও নৃশংসতার সহিত বিজড়িত যুদ্ধ, ধ্বংস এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন হিংসা, নিয়ত সংগ্রাম-রত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং তাহার প্রায় নিত্যসঙ্গী অত্যাচার অসাধুতা নীচতা ও স্বার্থপরতা তাহার অজ্ঞানতা অযোগ্যতা এবং বিশৃঙ্খলা—ইহাদের কাহারও কোন স্থান হইবে না। সে জীবনে কলা ও শিল্পের স্থান থাকিবে কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে না মনোময় বা প্রাণময় কোন নিম্নতর সুখভোগ, অথবা অবসর-বিনোদন কিম্বা শ্রান্তচিত্তের সাময়িক সুখ বা উত্তেজনার কোন ব্যবস্থা, কিন্তু অধ্যাত্মসত্য এবং জীবনের সৌন্দর্য্য ও আনন্দ প্রকাশের বাহন ও উপায়রূপেই তাহারা ব্যবহৃত হইবে। প্রাণ এবং দেহ আর অত্যাচারী প্রভুরূপে তাহাদের নিজ তৃপ্তির জন্য জীবনের পনর আনা অংশ জুড়িয়া অবস্থিত থাকিতে পারিবেনা, পরন্তু তাহারাও চিৎপুরুষের আত্মপ্রকাশের শক্তি এবং সাধনযন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে। সেই সঙ্গে জড় এবং দেহকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া জড়বস্তুর যথাযথ ব্যবহার এবং প্রশাসনও পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত চিৎপুরুষের সিদ্ধ জীবনের অঙ্গরূপে গণ্য হইবে।

প্রায় সর্ব্বজনীনভাবে মনে করা হয় যে অধ্যাত্ম জীবনকে অপরিহার্য্যরূপে তপস্যা এবং ত্যাগের জীবন হইতেই হইবে, কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যাহা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় নয় তাহা দূরে সরাইয়া দেওয়াই এ জীবনের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য ; যে অধ্যাত্মজীবনের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য জীবন হইতে সংসার হইতে দূরে পলায়ন, নিশ্চয়ই এ কথা তাহার সম্বন্ধে খাটে। এ আদর্শকে ঐকান্তিক বলিয়া না মানিলেও মনে করা যাইতে পারে যে অধ্যাত্ম জীবনের ঝোঁক সর্ব্বদাই অত্যন্ত সাদাসিধা অনাড়ম্বর জীবনের দিকে থাকা উচিত ; কারণ অন্যথায় জীবন প্রাণের বাসনা এবং স্থূল ভোগাসক্তিরই জীবন হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু উদারতর দৃষ্টিতে দেখিলে আমরা বুঝিব যে কামনা যাহার প্রধান চালক সেই অবিদ্যার বিধানের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা মনের গড়া আদর্শ ; অবিদ্যাকে জয় এবং অহমিকার উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য কেবল কামনাকে নয়, যে সমস্ত বস্তু দ্বারা কামনার তৃপ্তি সাধন হয় তাহাদেরও সম্পূর্ণ বর্জন আবশ্যক, ইহাই সে আদর্শ অনুসারে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু

যে চেতনা কামনার উপরে উঠিয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে এই মনোময় আদর্শ বা মনঃকল্পিত যে কোন আদর্শ চরম হইতে পারে না বা এরূপ কোন আদর্শের বিধান তাহাকে বাঁধিতে পারে না; অকলঙ্ক শুচিতা এবং অখণ্ড আত্মসংযম এরূপ নিষ্কাম পুরুষের প্রকৃতির মর্ম্মগত ধর্ম্ম, দারিদ্র্য বা ঐশ্বর্য্যে তাহা সমভাবেই বর্ত্তমান থাকিবে; এ উভয়ের কোনটাই যদি তাহাকে বিচলিত বা কলঙ্কিত করে তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার নিষ্কামতা সত্য বা অখণ্ড হয় নাই। চিৎ-পুরুষের আত্মপ্রকাশ বা ভগবৎসত্তার সঙ্কল্পই হইবে বিজ্ঞানময় জীবনের একমাত্র বিধান; সে সঙ্কল্প সে আত্মপ্রকাশ দেখা দিতে পারে যেমন অতিসরলতা তেমনি অতি জটিলতার যেমন রিক্ততা তেমন ঐশ্বর্য্যের অথবা উভয়ের স্বাভাবিক সাম্যের মধ্য দিয়া—কেননা শ্রী এবং ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতা, বস্তুর গোপন মাধুর্য্য ও স্মিত-হাস্য, প্রাণের সৌরকরোজ্জ্বল প্রসন্নতা চিৎপুরুষেরই শক্তি এবং বৈভবের প্রকাশ। যিনি প্রকৃতির বিধান নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রিত করেন সেই অন্তরস্থিত চিৎপুরুষই সকল দিকে এ জীবনের কাঠামো, পরিবেশ এবং প্রকাশের সকল ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই নিরূপিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিবেন। সে নিয়ন্ত্রণে সর্ব্বাবস্থায় থাকিবে স্বাতন্ত্র্যের সাবলীলতা; মনের দ্বারা সুব্যবস্থিত জীবন গঠনের জন্য মনের পক্ষে এক অচল অনড় বিশিষ্ট আদর্শ যতই প্রয়োজনীয় হউক, অধ্যাত্ম জীবনের তাহা বিধান হইতে পারে না। অন্তরের এক একত্বের ভিত্তিতে আত্মরূপায়ণের বিপুল বৈচিত্র্য এবং স্বাতন্ত্র্য সেখানে ফুটিবে বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই থাকিবে সুষমা এবং সত্যের ছন্দ।

বিজ্ঞানময় পুরুষগণের যে জীবন অতিমানসের ঊর্দ্ধ্ব পরিণামে পৌঁছিয়াছে তাহাকে খাঁটিরূপেই দিব্য বা ভাগবত জীবন বলা যাইতে পারে; কেননা তাহা হইবে ভগবানের মধ্যস্থিত জীবন, যাহাতে জড়প্রকৃতির মধ্যে চিন্ময় দিব্য আলোক এবং শক্তি ও আনন্দের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে ইহা তেমন এক জীবন। মানুষের মনোময় স্তর অতিক্রম করিয়া যায় বলিয়া এ জীবনকে আধ্যাত্মিকতা এবং মনের অতীত অতিমানবতার জীবন বলা যাইতে পারে। কিন্তু অতিমানবতার অতীত এবং বর্ত্তমান ধারণার সহিত ইহাকে এক করিয়া দেখার ভুল যেন আমরা না করি; মনোময় ধারণায় অতিমানব সাধারণ মানুষের রাজসংস্করণ, তাহাতে মানুষ মানুষই থাকে অর্থাৎ তাহার মনশ্চেতনার রূপান্তর হয় না কেবল তাহার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য বহুগুণে বাড়িয়া যায়, ব্যক্তিসত্তা অতি-স্ফীত হইয়া ওঠে, অহং অতিরঞ্জিত এবং বহুগুণিত হইয়া দাঁড়ায়, মন ও

প্রাণের শক্তি অতিশয় বৃদ্ধি পায়; স্থূল অথবা সূক্ষ্মভাবে মানুষের অবিদ্যার শক্তির অতি বৃদ্ধি ঘটে; সাধারণতঃ ইহাও মনে হয় যে অতিমানব জোর করিয়া মানবজাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে। নিট্‌সের অতিমানব এই ধরণেরই জীব; এই অতিমানবের প্রাধান্য চরমে পৌঁছিলে পৃথিবীতে গৌর-বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ বা অন্য কোন বর্ণের পশুর রাজ্য স্থাপিত হইবে; বর্ব্বরতা, নিষ্ঠুরতা, বলোন্মত্ততার যুগ ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু ইহাকে প্রগতি বা পরিণতি বলা চলে না, ইহা হইবে প্রাচীন আয়াসবিধুর বর্ব্বরতার মধ্যে অবিচলিত ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন। অথবা ইহার অর্থ এই দাঁড়াইবে—ভুল পথে মানবতাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার অত্যুগ্র প্রচেষ্টার ফলে মানুষের রূপে রাক্ষস বা অসুরের আবির্ভাব। একটা হিংস্র দুর্দ্দান্ত অতিস্ফীত প্রাণময় অহমিকা এক অতি প্রবল যথেচ্ছাচারী অরাজক শক্তি লইয়া নিজেকে বা নিজের ভোগ বাসনাকে চরিতার্থ করিতে চাহিতেছে—ইহাই হইল অতিমানব রাক্ষসের রূপ; কিন্তু আমাদের মধ্যে এই নরখাদক বিরাটকায় রাক্ষসটা যদিও মরে নাই তবুও তাহার প্রকৃতিতে সে অতীত যুগের জীব; এই ধরণের জীব যদি বিপুল শক্তিশালী হইয়া আজ আবার ফিরিয়া আসে তবে বলিব পরিণামধারা উল্টা পথে চলিয়াছে। অসুরের মধ্যে আছে এক অপ্রতিরোধ্য দুর্দ্ধর্ষ শক্তি, আছে স্বপ্রতিষ্ঠ স্বনিরুদ্ধ এমন কি কৃচ্ছ্র সাধনার দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রিত মন এবং প্রাণের সামর্থ্য ও বীর্য্য; সবল স্থির নিঃস্নেহ সূক্ষ্ম প্রশাসনক্ষম আত্মকেন্দ্রিত হইয়া আছে যাহার অতি দারুণ প্রচণ্ডতা; মনোময় এবং প্রাণময় অহংকে মিলিত এবং অতিবর্দ্ধিত করিয়া যাহার অহং স্পষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অতীতে পৃথিবী এই ধরণের বহু অসুরের দেখা প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছে, এবং তাহার পুনরাবৃত্তিতে সেই প্রাচীন ধারাই বর্ত্তমানে থাকিয়া যাইবে; অসুরের নিকট হইতে জগৎ তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কোন খাঁটি উপকার, নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইবার কোন শক্তি পাইবে না; আসুরিক শক্তির অসাধারণ বৃদ্ধির ফলে জগৎ তাহার পুরাতন কক্ষাতেই ঘুরিবে কেবল তাহার পরিধি বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু মানুষকে যাহা উন্মিষিত করিতে হইবে তাহা ইহাপেক্ষা অনেক বেশী দুরূহ অথচ অনেক বেশী সরল; মানুষকে তাহার নিজের সিদ্ধ সত্তাতে পৌঁছিতে, চিন্ময় আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তাহার অন্তরাত্মার আকূতি এবং তীব্রসংবেগ জাগাইয়া মুক্তির মধ্য দিয়া তাহার আত্মজ্যোতি আত্মশক্তি এবং আত্মানন্দকে তাহার জীবন রাজ্যের প্রভু করিয়া তুলিতে হইবে—অহমিকাপূর্ণ

তথাকথিত যে অতিমানবতা মন ও প্রাণকে অধিকার করিয়া মানবজাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চায় তাহাকে ফুটাইয়া তোলা তাহার জীবনের উদ্দেশ্য নয়; তাহাকে নিজের দেহ মন প্রভৃতি সকল সাধনযন্ত্রের উপর চিৎপুরুষের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে, তাহারই শক্তিতে নিজেকে এবং জীবনকে অধিকার করিতে হইবে। এমন এক নূতন চেতনাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যাহা যে দিব্যপুরুষ তাহার মধ্যে জাত হইতে চাহিতেছেন তাঁহাকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিয়া মানবজাতিকে এমন এক সামর্থ্য দিবে যাহাতে সে নিজেকে অতিক্রম করিয়া গিয়া সার্থক হইবে—ইহাই তাহার পরম পুরুষার্থ। ইহাই হইল একমাত্র খাঁটি অতিমানবতা, এই পথে পরিণামশীল প্রকৃতির পক্ষে আর এক ধাপ অগ্রসর হইবার একমাত্র সত্য সম্ভাবনা আছে।

বস্তুতঃ এই নূতন স্থিতি মানুষের চেতনা এবং জীবনের বর্ত্তমান বিধান উল্টাইয়া দিবে; কেননা ইহাতে অবিদ্যাময় জীবনের সমগ্র তত্ত্বের পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিবে। বলা চলে যে অবিদ্যাকে আস্বাদন করিবার, তাহার অতর্কিত আক্রমণ এবং বিপদসঙ্কুল অভিযানের বিস্ময়ের পুলকে অভিভূত হইবার জন্যই আত্মা নিশ্চেতনাতে নামিয়া জড়ের এই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন, নূতন সৃষ্টি করিয়া নূতনকে আবিষ্কার করিয়া আনন্দ রসাস্বাদন করিবেন এই জন্য তাঁহার এই বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া, জড়ের মধ্যে ক্রিয়া করিয়া অভাবনীয় নূতন নূতন সঙ্কটসঙ্কুল ঘটনার অতর্কিত আবির্ভাবে তাঁহাকে চমৎকৃত করিবে, নূতনকে অজানাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া জয় করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন, ইহার জন্যই চিৎপুরুষের মন ও প্রাণ চেতনার এই অভিযান; মানুষের জীবনে এই সমস্ত দুঃসাহসের অভিযানের মধ্য দিয়া তিনি চলিতে চান কিন্তু মনে হয় এই নূতন জীবনে অবিদ্যার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্তের কিছুই থাকিবে না। মানুষের জীবন আলোক ও অন্ধকার, লাভ এবং ক্ষতি, বাধা এবং বিপত্তি, অবিদ্যাজনিত সুখ এবং দুঃখ দিয়া গড়া; বোধশক্তিহীন অসাড় নিশ্চেতনার ভিত্তিতে অবস্থিত নির্ব্বর্ণ এবং উদাসীন জড়ের বুকে বহু বিচিত্র বর্ণের কত খেলা চলিতেছে, ইহাইত আমাদের জীবন। সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি, প্রাণময় সুখ এবং দুঃখ, বাসনা এবং বিপদ, হর্ষ এবং শোক, নিয়তির বিপর্য্যয় এবং অনিশ্চয়তা, সাধনা, দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রামের নেশায় যদি প্রাকৃত জীবনকে মাতাল না করে, সৃষ্টির সংবেগ, নূতন এবং অতর্কিতের উন্মাদনায় যদি প্রাণ অজানার অভিমুখে না ছুটে তবে মনে হয় বৈচিত্র্যহীন সে জীবনের

রস যে একেবারে শুকাইয়া যাইবে, তাহা যে একবোরে বিস্বাদ হইয়া উঠিবে। মনে হয়, যে জীবন এ সমস্ত অতিক্রম করিয়া যায় তাহা বৈশিষ্ট্যবিরহিত একটা শূন্য অথবা পরিবর্ত্তনহীন কোন রূপেরই এক অচলায়তন ; তাই মানুষ স্বর্গের যে মনোময় ছবি আঁকে তাহার মধ্যে নিত্য কাল ধরিয়া কেবল যেন একই সুর পুনঃ পুনঃ বাজিতে থাকে। কিন্তু ইহা একটি ভুল ধারণা ; কেননা বিজ্ঞানময় জীবনে প্রবেশ অনন্তের মধ্যেই প্রবেশ। ইহা এমন এক আত্মবিসৃষ্টি যাহাতে অনন্তকে অনন্তভাবে রূপায়িত করা হইবে ; আর সান্তের স্বার্থ ও সুযোগ অপেক্ষা অনন্তের সার্থক রূপায়ণ এত মহৎ ও বৃহৎ, এত অনন্ত বৈচিত্র্যময়, অমৃতময়, পরমানন্দময যে উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই চলে না। অবিদ্যার মধ্যে পরিণামধারা যাহা হইয়া উঠিতে আশা করিতে পারে বিদ্যাব মধ্যে পরিণাম তদপেক্ষা অনেক সুন্দর হইবে তাহাতে অনেক বেশী মহিমার প্রকাশ দেখা দিবে, তাহার মধ্যে সম্ভাবিতেব নিত্য উপচীয়মান বিপুল প্রসার আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তাহারা সকল দিক হইতে বৃহত্তর এবং তীব্রতর হইয়া উঠিবে। চিন্ময় পুরুষের চিরন্তন আনন্দ নিত্য নব রূপ ধারণ এবং তাহার পরম সৌন্দর্য্য অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সে পরম দেবতা চিরকিশোর, সেই অনন্ত শাশ্বত বস্তুর আনন্দ রসাস্বাদনও অফুরন্ত। অবিদ্যা যাহা সৃষ্টি করিতে পাবে বিজ্ঞানময় জীবন তদপেক্ষা অনেক পূর্ণ অনেক সার্থক অনেক প্রদীপ্ত ও রসোচ্ছল, তাহা হইবে বৃহত্তর ও মধুরতর নিত্য বিস্ময়ের বস্তু।

জড়প্রকৃতির মধ্যে যদি এক পরিণামধারা থাকে এবং চেতনা ও প্রাণ এই দুই মূল শক্তির সহিত সত্তার পরিণাম যদি জাগতিক বিধান হয় তাহা হইবে সত্তার পরিপূর্ণতা চেতনার পরিপূর্ণতা এবং জীবনের পরিপূর্ণতা হইবে সেই চরম লক্ষ্য যাহার দিকে আমরা অগ্রসর হইতেছি এবং আমাদের নিয়তিই এই যে, শীঘ্র অথবা বিলম্বে আমাদের মধ্যে সেই পরম প্রকাশ ঘটিবে। যে আত্মা চিৎপুরুষ বা সত্যবস্তু জড় ও প্রাণের আদিম অচেতনার মধ্য হইতে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তিনি সেই প্রাণ ও জড়ের মধ্যে তাঁহার সত্তা এবং চেতনাকে পূর্ণরূপে উন্মিষিত করিয়া তুলিবেন। জীবনের পরাভব বা বিফলতার মধ্য দিয়া তিনি নিজ স্বরূপে ফিরিয়া যাইবেন না, জীবনের মধ্যে নিজেকে চিন্ময়ভাবে পরিপূর্ণ করিয়াই তুলিবেন অথবা ব্যক্তিগতরূপে কাহারও যদি তাহার চরম নির্ব্বিশেষ তত্ত্বে ফিরিয়া যাওয়া লক্ষ্য হয় তবে সে তেমন অবস্থাতেও ফিরিতে পারিবে। অবিদ্যার মধ্যে আমাদের পরিণামধারা আত্মাকে

এবং জগৎকে আবিষ্কার করিবার পথে সুখ এবং দুঃখের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে চলিতেছে আজ যে তাহা শুধু অর্দ্ধ সার্থকতা লাভ করিতেছে, সর্ব্বদাই সে কিছু পাইতেছে আবার হারাইয়া বসিতেছে ইহা শুধু সেই পরিণামের আদি পর্ব্ব। এই পরিণামধারাই আমাদিগকে অবশ্যম্ভাবীরূপে একদিন জ্ঞানের মধ্যস্থিত পরিণামে পৌঁছাইয়া দিবে। তখন আমরা আমাদের পরমাত্মাকে লাভ করিব, চিৎপুরুষ নিজেকে ফুটাইয়া তুলিবেন, আজিও যাহা আমাদের অনধিগম্য সেই পরাপ্রকৃতির মধ্যে দিব্য পরমপুরুষ তাঁহার স্বরূপশক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবেন, ইহাই চিন্ময় পরিণামের ধ্রুব নিয়তি।

—সমাপ্ত—

সংশোধন

নির্ভুল করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। ছাপাইবার সময় কোন কোনও অক্ষরের নীচের উপরের বা পাশের চিহ্ন—যথা আ-কার ই-কার উ-কার রেফ প্রভৃতি—কোথাও কোথাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কয়েক স্থানে পূর্ণ, পরিপূর্ণ, সংস্পর্শ, অর্থ, ব্যর্থ, সামর্থ্য, নির্ণয় সমর্থন, সমর্পণ, অন্তর্গূঢ়, আদর্শ, উৎসর্গ, সংকীর্ণ, দীর্ণ, স্বর্গ প্রভৃতি শব্দের রেফের চিহ্ন পড়ে নাই। বুঝিবার বিশেষ অসুবিধা হইবে না মনে করিয়া সাধারণতঃ এ ধরণের ভুল সংশোধনে ধরা হয় নাই। যে কয়টি অপেক্ষাকৃত গুরুতর ভুল চোখে পড়িয়াছে অথবা যেখানে বুঝিতে কষ্ট হইবে মনে হইয়াছে, নিম্নে শুধু তাহাই দেওয়া হইল।

পৃষ্ঠা	ছত্র	যাহা আছে	যাহা হইবে
৪	১	অনভতি	অনুভূতি
৫	২	অ।র্থৎ	অর্থাৎ
২৩	১৩	বদ্ধিগম্য	বুদ্ধিগম্য
২৭	২৪	circumcient	circumconscient
৩০	২০	আবত	আবৃত
৫৬	৯	দিব্য পরুষ	দিব্য পুরুষ
„	„	নৈব্বক্তিকতা	নৈর্ব্যক্তিকতা
১৭	৬	সচনা	সূচনা
৪৭	১৭	মগত্নদ্দেশ্য	মহদুদ্দেশ্য
„	২৬	মানমজাতির	মানবজাতির
৫০	১৬	সমন্ধে	সম্বন্ধে
৫১	২	তপণ	তর্পণ
৬৭	২৪	বিশ্বপ্রকতি	বিশ্বপ্রকৃতি
৯৪	১৩	পূর্ণ শ্বৈর্য	পূর্ণৈশ্বর্য্য
৯৬	১৪	বলিত	বলিতে
৯৭	২৯	অনসারে	অনুসারে
১১৯	১১	গোযথ	গোযূথ
১২২	২	আমরাও	আমরা
১৩১	১৬	তথ	তথা

সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	যাহা আছে	যাহা হইবে
১৩১	১৭	বাহিরে	বাহিরের
"	১৮	সংস্কর	সংস্করণ
১৩৩	৯	গোণ	গৌণ
১৩৫	১৬	অমরত	অমরত্ব
·৩৭	১৪	ইহতে	হইতে
১৪০	২	সে	যে
"	২৩	অনুস্যত	অনুস্যূত
১৪৭	২৬	নতন	নূতন
১৫৭	১২-১৩	প্রয়োজনীয়িতা	প্রয়োজনীয়তা
১৮৫	৩০	সম	সমস্ত
১৯৩	৬	পূর্ণর্মিলন	পূর্ণমিলন
১৯৪	১৪	পণতাকে	পূর্ণতাকে
২০৮	২3	সংহৃত	সংহত
২২০	২১	সুকতি	সুকৃতি
২২৪	৮	প্রকতির	প্রকৃতির
২৫৪	৯	শিরোমর্ণি	শিরোমণি
২৮১	২০	বৈদ্যুতিক	বৈদ্যুতিক
২৯৬	১৭	ধর্ম্মকো	ধর্ম্মকে
৩৫২	১৩	নিজেকো	নিজেকে
৪২৩	১০	প্রকতিকে	প্রকৃতিকে
৪৩৩	১০	অনোন্য	অন্যোন্য
৪৩৪	১	নিশ্চেনার	নিশ্চেতনার
৪৮১	৩০	এবংসব	এবং সব
৪৯১	১S	সদ্‌বস্তুর	সদ্‌বস্তুর
৫০২	২৯	স্বয়ম্ভ	স্বয়ম্ভু
৫০৮	৪	অন্তরাবত্ত	অন্তরাবৃত্ত
৫১৫	১৭	আকতির	আকৃতির
৫৩৬	২১	পর্ণতা	পূর্ণতা
৫৫১	২৯	বক্তিগতভাবে	ব্যক্তিগতভাবে
"	৩০	একট	একটা